ঈমান ও আক্বাইদ

কলেমা-ই তাওহীদ

যে আক্বীদায় বিশ্বাস করলে ক্বিয়ামত-দিবসে নাজাত পাওয়া যাবে এবং অনন্তকাল জাহান্নামের আযাব হতে মুক্তি পাবে তা হচ্ছে কলেমা-ই তাওহীদ-এ বর্ণিত আক্বীদা।

কলেমা

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ (লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুহাম্মদুর রসূ-লুল্লা-হ)। অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রসূল।[১]

আল্লাহ তা'আলা তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ দাওয়াত প্রচার করার জন্য প্রেরণ করেছেন। ক্বোরআন মজিদে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন-

قُلْ اِنَّمَا يُوْحٰى اِلَىَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ○

তরজমাঃ আপনি বলুন, 'আমার প্রতিতো এ মর্মে ওহী হয় যে, নিশ্চয় তোমাদের ইলাহ এক আল্লাহ। তবে কি তোমরা মুসলমান? [সূরা আম্বিয়া, আয়াত- ১০৮]

এ কলেমা-ই তাওহীদ প্রচার করার জন্য আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে অন্যান্য নবী-রসূলও প্রেরণ করেছেন। অতএব, একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকে ইবাদতের উপযোগী বিশ্বাস করা, আল্লাহ তা'আলা যা কিছু হুকুম করেছেন এবং বিধি-বিধান দিয়েছেন তা কায়মনোবাক্যে মেনে নেয়া, স্বীকার ও পালন করার সাথে সাথে যা কিছু নিষেধ করেছেন তা থেকেও বিরত থাকাই হল প্রকৃত ইসলাম।

সুতরাং ইসলাম হল **لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ**-কে মনে প্রাণে বিশ্বাস করা এবং তা কথায় ও কাজে প্রমাণ করার নাম। আর **لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه**-এর সাথে **مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰه**-ও ইসলাম এবং ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হলো। ঈমানের এ দু'বিষয় একটি অপরটি হতে পৃথক নয়। দু'টিই একসাথে ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। উভয়ের উপর ঈমান আনা, মুখে স্বীকার করা ও কাজে তার প্রমাণ দেওয়াই হল প্রকৃত ঈমান।[২]

---

১. আল-ফিক্বহুল হানাফী 'আলা সাউবিহীল জাদীদ, পৃষ্ঠা ঃ ৫২২।
২. যারা 'মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ'কে কলেমা-ই তাওহীদের অংশ নয় বলে তারা মু'মিন নয়।

এ কারণে আল্লাহ তা'আলা তাঁর ও তাঁর রসূল-উভয়ের আনুগত্যের কথা একসাথে বর্ণনা করেছেন-

قُلْ اَطِيْعُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ الْكَافِرِيْنَ ○

তরজমাঃ আপনি বলে দিন, হুকুম মান্য করো আল্লাহ ও রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র; অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আল্লাহর পছন্দ হয় না কাফির।[৩]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন-

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ○ۜ

তরজমাঃ যে ব্যক্তি রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র নির্দেশ মান্য করেছে, নিঃসন্দেহে সে আল্লাহর নির্দেশ মান্য করেছে। আর যে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তবে আমি আপনাকে তাদের রক্ষার জন্য প্রেরণ করি নি।

[সূরা নিসা, আয়াত-৮০, তরজমা- কানযুল ঈমান]

রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর বিশ্বাস, তাঁর আনুগত্য এবং তাঁর দেওয়া বিধি-বিধান অনুসরণ ছাড়া ঈমানদার হওয়া যাবে না। তাই, ফিক্বহ্ শাস্ত্রে বলা হয়েছে- কেউ যদি **لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ**-এর উপর ঈমান আনে এবং **مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ**'র উপর ঈমান আনে না, তবে সে কাফির, শরীয়ত মতে সে ঈমানদার নয়।

অন্য আয়াতে ক্বোরআন মজিদে এরশাদ হয়েছে-

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ۚ

তরজমাঃ আল্লাহ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখেন ঈমানদারদেরকে, শাশ্বত বাণীতে, পার্থিব জীবনে এবং পরকালে। [সূরা ইব্রাহীম, আয়াত-২৭, তরজমা- কানযুল ঈমান]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত বারা ইবনে 'আযিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, এখানে 'শাশ্বত বাণী' দ্বারা কলেমা-ই তাওহীদ **لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ** -এর কথা বুঝানো হয়েছে। [মিশকাত শরীফ]

অধিকন্তু এ কলেমা **خبر متواتر** দ্বারা প্রমাণিত।[৪]

---

৩. সূরা আল-ই ইমরান; আয়াত- ৩২, তরজমা- কানযুল ঈমান।

৪. 'খবর-ই মুতাওয়াতির' বলে ওই হাদীসকে, যার বর্ণনাকারী প্রতিটি যুগে এতো বেশী যে, তাঁদের মিথ্যার উপর একমত হওয়া সম্ভবই নয়। [মুক্বাদ্দামা-ই শায়খুদ্ দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইত্যাদি]

কেননা, পূর্ববর্তী মুসলমানদের থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী মুসলমানগণ সকলেই এ কলেমা পড়েছেন, লিখেছেন এবং শিখেছেন। আর এ ধারা সর্বযুগেই অব্যাহত আছে এবং থাকবে। ক্বোরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলা কলেমা-ই তাইয়্যেবার উপমা এভাবে এরশাদ করেছেন-

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ
اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِى السَّمَآءِ ۙ

তরজমা ঃ আপনি কি লক্ষ্য করেন নি, আল্লাহ কিভাবে উপমা দিলেন পবিত্র 'কলেমা' বা বাক্যের? যেমন পবিত্র বৃক্ষ, যার মূল সুদৃঢ় এবং সেটার শাখা-প্রশাখা আসমানে। [সূরা ইব্রাহীম, আয়াত-২৪, তরজমা কানযুল ঈমান]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা হতে বর্ণিত, এখানে 'কলেমা-ই তাইয়্যেবা' দ্বারা 'কলেমা-ই শাহাদত' বুঝানো হয়েছে, যাতে তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ব ও তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রিসালত ও আল্লাহর প্রিয়তম বন্ধু হবার সাক্ষ্য রয়েছে। [তাফসীর -ই নূরুল ইরফান]

কলেমা-ই শাহাদত নিম্নরূপ-

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

অর্থাৎ- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি এ মর্মে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রিয় বান্দা ও তাঁর রসূল।

বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম ইসলামী আক্বীদাকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন-

১. ইলাহিয়্যাত (اَلْاِلٰهِيَّات) ২. নুবূয়ত (اَلنُّبُوَّة)

----<>---

ইলাহিয়্যাতের বিবরণ

নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ 'ইলাহিয়্যাত' (আল্লাহ সম্পর্কিত বিষয়াদি)'র অন্তর্ভুক্তঃ

আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বে বিশ্বাস করা (الايمان بوجود الله تعالى)

প্রত্যেক আক্বেল বালেগ নারী-পুরুষের উপর সর্বপ্রথম 'ফরযে আইন' হল আল্লাহর অস্তিত্বে অন্তরে বিশ্বাস করা। আল্লাহর অস্তিত্ব 'আযলী' (আনাদি) ও 'আবাদী' (অনন্ত)। তাঁর অস্তিত্ব মাখলূক্বের ন্যায় কাল, স্থান ও আকৃতি-প্রকৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; আল্লাহ তা'আলা স্থান-কাল-পাত্র হতে পবিত্র। তিনি এসবের বহু উর্ধ্বে।

আল্লাহর অস্তিত্বকে মুখে 'স্বীকার করা'ও ঈমানের পূবশর্ত। ঈমানের বিধান কার্যকর করার জন্য এটা জরুরী। আহলে সুন্নাতের দু' ইমাম মাতুরীদী ও ইমাম আশ'আরী এ অভিমতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁদের দলীল হল আল্লাহ তা'আলার বাণী-

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْٓا اٰبَآءَهُمْ اَوْ اَبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ كَتَبَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ ؕ وَيُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ؕ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ ؕ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۧ

তরজমাঃ আপনি পাবেন না ওই সব লোককে, যারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে আল্লাহ ও শেষ দিনের উপর এমনি যে, তারা বন্ধুত্ব রাখে ওই সব লোকের সাথে, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে, যদিও তারা তাদের পিতা অথবা পুত্র অথবা ভাই কিংবা নিজ জ্ঞাতি-গোত্রের লোক হয়। এরা হচ্ছে ওই সব লোক, যাদের অন্তরগুলোতে আল্লাহ ঈমান অঙ্কিত করে দিয়েছেন এবং তাঁর নিকট থেকে রূহ দ্বারা তাদের সাহায্য করেছেন আর তাদেরকে জান্নাত বা বাগানসমূহে নিয়ে যাবেন, সে গুলোর পাদদেশে নহরসমূহ প্রবহমান। সেগুলোর মধ্যে তারা স্থায়ী হবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এটা আল্লাহর দল। শুনছো! আল্লাহরই দল সফলকাম। [সূরা মোজাদালাহ; আয়াত-২২, তরজমা কানযুল ঈমান]

নিয়ন্ত্রিত চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, আকাশ, পর্বত, সমুদ্র-সব কিছুই মহান আল্লাহর অস্তিত্বের পক্ষে বড় দলীল। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন-

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ ؕ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ

তরজমাঃ এবং তিনিই পরাক্রমশালী আপন বান্দাদের উপর এবং তিনিই প্রজ্ঞাময়, অবহিত। [সূরা আন'আম, আয়াত-১৮, তরজমা-কানযুল ঈমান]

ক্বোরআন মজীদের অন্য আয়াতে এ প্রসঙ্গে এরশাদ হয়েছে-

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ط فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ط لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ط ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

তরজমা ঃ সুতরাং আপনি মুখমণ্ডল সোজা করুন-আল্লাহর ইবাদতের জন্য, একমাত্র তাঁরই হয়ে। আল্লাহর স্থাপিত বুনিয়াদ, যার উপর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর বানানো বস্তুকে বিকৃত করো না। এটাই সরল দ্বীন; কিন্তু বহু লোক জানে না। [সূরা রোম, আয়াত-৩০ ঃ তরজমা- কানযুল ঈমান]

'আল্লাহ'র এ পূত-পবিত্র নামটি তাঁর ওই মহান সত্তার পরিচয় বহন করে, যার উপর ঈমান আনা অপরিহার্য। এ ঈমান আনার অর্থ শুধু আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব স্বীকার করা নয়, বরং অস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গে তিনি অনাদি, অনন্ত, চিরঞ্জীব, নিরাকার বলেও স্বীকার করা চাই। [শরহে আক্বাইদে নাসাফী]

আল্লাহর সিফাত ও গুণাবলী স্বীকার করাও ঈমানের অঙ্গ। [শরহে আক্বা-ইদে নাসাফী]

'আল্লাহ' শব্দের স্ত্রী-লিঙ্গ, দ্বিবচন ও বহুবচন নেই।

আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়

সমস্ত সৃষ্টি-জগতের 'ইলাহ' (উপাস্য) একমাত্র আল্লাহ। সত্তার দিক থেকেও তিনি এক। অনুরূপ গুণাবলীর দিক থেকেও একক, অনন্য। তাঁর কোন শরীক নেই। ইরশাদ হয়েছে-

وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ

তরজমাঃ এবং তোমাদের মা'বূদ হলেন একমাত্র মা'বূদ। কোন মা'বূদ নেই কিন্তু তিনিই; মহান দয়ালু, করুণাময়] [সূরা বাক্বারা, আয়াত-১৬৩,তরজমাঃ কানযুল ঈমান।]

সূরা ইখলাসে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন-

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۝
وَلَمْ يُوْلَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝

তরজমাঃ আপনি বলুন, তিনি আল্লাহ, (তিনি) এক, আল্লাহ পরমুখাপেক্ষী নন; না তাঁর কোন সন্তান আছে এবং না তিনি কারো থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং না আছে কেউ তাঁর সমকক্ষ হবার। [সূরা ইখলাস, আয়াত ১- ৪]

একাধিক ইলাহর অস্তিত্বকে নাকচ করে পবিত্র ক্বোরআনে স্পষ্টভাবে এরশাদ হয়েছে-

لَوْ كَانَ فِيْهِمَا اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝

তরজমাঃ যদি আসমান ও যমীনের মধ্যে আল্লাহ ব্যতীত আরো খোদা থাকতো, তবে অবশ্যই উভয়টি ধ্বংস হয়ে যেতো। সূতরাং পবিত্রতা আল্লাহ আরশাধিপতির -ওই সব উক্তি থেকে, যেগুলো এরা রচনা করেছে।

[সূরা আম্বিয়া, আয়াত ঃ ২২, তরজমা ঃ কানযুল ঈমান]

একাধিক ইলাহ্‌র মতবাদ নিতান্তই ভ্রান্ত। অনুরূপ, ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের যথাক্রমে দ্বিত্ববাদ এবং ত্রিত্ববাদও সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, অলীক ও কল্পনাপ্রসূত। তারা আল্লাহর নবী ও রাসূলগণের মর্যাদা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছে। তাদের এ ভ্রান্ত ধারণা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন-

مَا الْمَسِيْحُ بْنُ مَرْيَمَ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَاُمُّهٗ صِدِّيْقَةٌ ط كَانَا يَأْ
كُلَانِ الطَّعَامَ ط اُنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْاٰيٰتِ اُنْظُرْ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ۝

তরজমা ঃ মরিয়ম-তনয় মসীহ নয়, কিন্তু একজন রসূল। তাঁর পূর্বে বহু রসূল গত হয়েছে এবং তাঁর মাতা সিদ্দীক্বাহ্ (সত্যনিষ্ঠ)। তারা উভয়ে খাদ্যাহার করতো। দেখো তো! আমি কেমন সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ তাদের জন্য বর্ণনা করছি! অতঃপর দেখো তারা কিভাবে কুঁজো হয়ে চলে যাচ্ছে!

[সূরা মা-ইদাহ, আয়াত ঃ ৭৫,তরজমা-কানযুল ঈমান]

উপরের বর্ণনা হতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। তিনি অদ্বিতীয় লা-শরীক, তাঁর কোন শরীক নেই। নেই কোন সহকারী ও সহযোগী। যাত ও সিফাত উভয় দিক থেকে তিনি অনন্য অদ্বিতীয়। তাঁর কোন অংশীদার নেই।

আল্লাহ্‌র যাত বা সত্তা

সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর ইস্‌মে যাত বা সত্তাবাচক নাম

বিশুদ্ধতম মতানুসারে 'আল্লাহ' (اللّٰه) শব্দটি ওই চিরন্তন সত্তার নাম, যাঁর অস্তিত্ব একান্ত অপরিহার্য, যিনি সমস্ত উত্তম গুণাবলীর অধিকারী। [আক্বাইদে নসফী]

বিভিন্ন আক্বাঈদ গ্রন্থে আল্লাহ তা'আলার সত্তার পরিচয় এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, "এ মহা বিশ্বের অবশ্যই একজন সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন। তিনি 'ক্বাদীম' অর্থাৎ অনাদি ও অনন্ত। তিনি সব সময় ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন। তিনি সমস্ত উত্তম গুণের অধিকারী ও সমস্ত দোষ-ক্রটি হতে পূত-পবিত্র। সব কিছুই তাঁর জ্ঞানের আওতাভুক্ত। তিনি সকল বিষয়ের উপর সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। সকল সৃষ্টি তাঁরই ইচ্ছাধীন।" [আক্বাইদে নসফী]

আল্লাহর সিফাত বা গুণাবলী

আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য অগণিত সিফাত বা গুণাবলী রয়েছে। আল্লাহর গুণাবলী আমাদের গুণাবলীর মত নয়। এ ঈমান রাখা সকলের উপর ফরয।

[শরহে ফিক্বহে আকবর]

ইমাম আবুল মনসুর মাতুরীদীর মতে, আল্লাহ্ তা'আলার সত্তাগত গুণ হল আটটি-

১. হায়াত

এটি আল্লাহ তা'আলার একটি বিশেষ গুণ, যা অনাদি ও অনন্ত। তিনি চিরঞ্জীব। তিনি সব সময় ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন। তিনি নিজেই এরশাদ করেছেন-

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ۚ o لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ط

তরজমাঃ আল্লাহ হন, যিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। তিনি নিজে জীবিত এবং অন্যান্যদের অধিষ্ঠিত রাখেন। তাঁকে না তন্দ্রা স্পর্শ করে, না নিদ্রা।

[সূরা বাক্বারা, আয়াত ঃ ২৫, তরজমা- কানযুল ঈমান]

২. ইল্ম বা জ্ঞান

আল্লাহ তা'আলা সর্ব বিষয়ে জ্ঞাতা। তাঁর মহান সত্তা যেমন অনাদি-অনন্ত, তেমনি তাঁর জ্ঞানও অনাদি, অনন্ত ও চিরন্তন। মরুভূমির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালু কণা হতে আরম্ভ করে সাগর-মহাসাগরের জলরাশির প্রতিটি বিন্দুও তাঁর জ্ঞানের বাইরে নয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

وَ اَسِرُّوا قَوْلَكُمْ اَوِ اجْهَرُوْا بِهٖ ط اِنَّهٗ عَلِیْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ o اَلَا یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ط وَ هُوَ اللَّطِیْفُ الْخَبِیْرُ o

তরজমাঃ এবং তোমরা নিজেদের কথা নীরবে বলো কিংবা সরবে, তিনি তো অন্তর্যামী। তিনি কি জানেন না, যিনি সৃষ্টি করেছেন? এবং তিনিই হন প্রত্যেক সুক্ষ্ম বিষয়ের জ্ঞাতা। [সূরা মুল্ক, আয়াত- ১৩, তরজমাঃ কানযুল ঈমান]

৩.ইরাদা বা ইচ্ছা

আল্লাহ তা'আলাই বিশ্বজগত সৃষ্টি করেছেন। তিনি নিজের ইচ্ছায় তা করেছেন। তিনি যেভাবে ইচ্ছা, সেভাবে সৃষ্টি করেছেন। তিনি কারো বাধ্য নন। পবিত্র ক্বোরআনে ইরশাদ করেন-

وَرَبُّكَ یَخْلُقُ مَا یَشَآءُ وَیَخْتَارُ

তরজমাঃ আপনার রব সৃষ্টি করেন, যা চান এবং পছন্দ করেন।

[সূরা ক্বাসাস, আয়াত-৬৮,তরজমা-কানযুল ঈমান]

৪. কুদরত বা শক্তি

আল্লাহ তা'আলা সর্বশক্তিমান। এ বিশ্ব, এর গতি এবং স্থিতি, সবই তাঁর অসীম কুদরত এবং শক্তিমত্তার বহিঃপ্রকাশ। প্রতিটি জিনিসের মধ্যে যে উদ্যম ও শক্তি নিহিত রয়েছে, ওই শক্তির উৎস সেটা নিজে নয়, বরং এর উৎস হচ্ছে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন-

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِیُعْجِزَهٗ مِنْ شَیْءٍ فِی السَّمٰوٰتِ وَلَا فِی الْاَرْضِ ط اِنَّهٗ كَانَ عَلِیْمًا قَدِیْرًا o

তরজমাঃ এবং আল্লাহ এমন নন যে, তাঁর আয়ত্ব থেকে কোন কিছু বের হতে পারে-আসমান সমূহ ও যমীনের মধ্যে। নিশ্চয় তিনি জ্ঞানময় শক্তিমান।

[সূরা ফাতির, আয়াত-৪৪, তরজমা- কানযুল ঈমান]

৫. শ্রবণশক্তি

মহান আল্লাহর গুণাবলীর মধ্যে শ্রবণ শক্তি তাঁর একটি অন্যতম গুণ। মহাবিশ্বের সব কিছু তিনি শুনতে পান। কি জোরে, কি আস্তে- সব আওয়াজই তিনি শুনতে পান। মাটির নিচে পিপীলিকার পায়ের আওয়াজ হোক, সমুদ্রের পানির নিচের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীটের সঞ্চালন-ধ্বনি হোক; সব আওয়াজই আল্লাহ তা'আলা শুনতে পান। যেমন ইরশাদ হয়েছে-

وَمَا یَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمَآءِ وَلَا اَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَلَا اَكْبَرَ اِلَّا فِیْ كِتَابٍ مُّبِیْنٍ o

তরজমাঃ আর আপনার রবের নিকট থেকে কোন অণু পরিমাণ বস্তুও অগোচর নয়-পৃথিবীতে, না আসমানে এবং না তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতর, আর না তদপেক্ষা বৃহত্তর, কোন বস্তুই নেই, যা এক সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।

[সূরা ইয়ূনুস, আয়াত-৬১, তরজমা- কানযুল ঈমান]

৬. দর্শন

যেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রোতা তেমনি তিনি সম্যক দ্রষ্টা। সৃষ্টির সব কিছুই তিনি দেখেন। সব কিছুই তাঁর গোচরীভূত। আলো-আঁধার, ছোট-বড় সব কিছুই তিনি সমানভাবে দেখেন, জানেন। যেমন ইরশাদ হয়েছে-

لَهٗ غَیْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط اَبْصِرْ بِهٖ وَ اَسْمِعْ ط

তরজমাঃ তাঁরই জন্য আসমানসমূহ ও যমীনের সমস্ত অদৃশ্য বিষয়; তিনি কতোই উত্তম দেখেন ও কতোই উত্তম শুনেন! [সূরা কাহফ, আয়াত-২৬, তরজমা-কানযুল ঈমান]

আসমান যমীনের সব গোপন অবস্থা তাঁর জানা আছে। তিনি কত সুন্দর দ্রষ্টা ও কত সুন্দর শ্রোতা!

৭. কালাম (বাণী)

নিঃসন্দেহে ‘কালাম’ গুণটি আল্লাহ তা‘আলার মধ্যে পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান। হুকুম-আহকাম আদেশ-নিষেধ সবকিছুই তিনি তার বাণীর মাধ্যমেই জারি করেছেন। তিনি যেমন অসীম ও অতুলনীয়, তাঁর এ গুণও অসীম ও অতুলনীয় । সুতরাং আল্লাহর বাণী বর্ণমালা ও ধ্বনি হতে মুক্ত। সমস্ত আসমানী গ্রন্থ তাঁর কালাম বা বাণীরই বহিঃপ্রকাশ। ক্বোরআন আল্লাহ্‌র কালাম (বাণী)। তা সৃষ্ট নয়; বরং চিরন্তন। ইরশাদ হয়েছে-

وَلَوْ اَنَّ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَّالْبَحْرُ يَمُدُّهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا

نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

তরজমাঃ এবং যদি পৃথিবীতে যত বৃক্ষ আছে সবই কলম হয়ে যায়, আর সমুদ্র তার কালি হয়, এরপর আরো সাতটি সমুদ্র হয়, তবুও আল্লাহর বাণীসমূহ শেষ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সম্মান ও প্রজ্ঞাময়। [সূরা লোক্বমান, আয়াত-২৭, তরজমা- কানযুল ঈমান]

৮. তাকভীন (সৃষ্টিকর্ম)

আসমান-যমীন, লাওহ-কলম, গাছপালা, জীব-জন্তু -এ সব কিছুই আল্লাহ তা‘আলা সৃষ্টি করেছেন। আমাদের এবং আমাদের কর্মের স্রষ্টাও তিনি। পবিত্র ক্বোরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে-

وَ اللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ

তরজমাঃ অথচ আল্লাহ্ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের কর্মগুলোকেও।

[সূরা সাফ্‌ফাত, আয়াত-৯৬, তরজমা-কানযুল ঈমান]

সৃষ্টি করার এ গুণটিও তাঁর অনাদি-অনন্ত। যখন ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা, তিনি সৃষ্টি করতে পারেন। সৃষ্টি করার জন্য তাঁর কোন নমুনার প্রয়োজন হয় না। এ মহা বিশ্বকে ধ্বংস করে তিনি পুনরায় তা সৃষ্টি করতে সক্ষম। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন-

اَوَ لَيْسَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ ؕ بَلٰى ۗ وَهُوَ

الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ○

তরজমাঃ এবং যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি সেগুলোর মতো আরো সৃষ্টি করতে পারেন না? কেন নয়? নিশ্চয় পারেন। আর তিনিই হন মহান স্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। [সূরা ইয়াসীন, আয়াত-৮১, তরজমা- কানযুল ঈমান]

সত্তাগত গুণ ব্যতীত আল্লাহ তা‘আলার যত গুণাবলী আছে, সবই তাঁর কর্মগুণ।

কর্মগত গুণ ওই সিফাত বা গুণাবলীকে বলা হয়, যেগুলোর মধ্যে সৃষ্টির সাথে তাঁর সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ রয়েছে। আল্লাহ তা‘আলার কর্মগত গুণ অসংখ্য ও অগণিত।

[শরহে ফিক্বহে আকবর]

এ দিকে ইশারা করে ক্বোরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে-

يَسْـَٔلُهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِىْ شَاْنٍ

তরজমাঃ তাঁরই নিকট প্রার্থনা করছে যতকিছু আসমানসমূহ ও যমীনে রয়েছে। প্রত্যহ তাঁর একেকটি (গুরুত্বপূর্ণ) কাজ রয়েছে।

[সূরা আররাহমান, আয়াত-২৯,তরজমা- কানযুল ঈমান]

আল্লাহর উপর ঈমানের দাবী

আল্লাহর উপর ঈমান যে সমস্ত বিষয় দাবী করে তা হল-

১. আল্লাহকে ভালবাসা (محبة الهٰى)
২. আল্লাহর আনুগত্য (اطاعة الهى)
৩. আল্লাহর উপর ভরসা (توكل على الله)

প্রত্যেকটার বিস্তারিত বিবরণ

এক. আল্লাহকে ভালবাসা

কোন জিনিসের সাথে অন্তরের সম্পর্ককে ভালবাসা বলে। অস্থায়ী দুনিয়ার সাথে ভালবাসা হলে সে ভালবাসা হবে অস্থায়ী। অবিনশ্বর রবের সাথে ভালবাসা হলে তা হবে চিরস্থায়ী। তাই একজন ঈমানদার দুনিয়ায় আল্লাহকে সবকিছুর উপর অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা বেশী ভালবাসে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা ক্বোরআন মজীদে ইরশাদ করেছেন-

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ

অর্থাৎ ঈমানদারের অন্তরে আল্লাহর ন্যায় কারো ভালবাসা নেই।

[সূরা বাক্বারা, আয়াত-১৬৫]

ঈমানদার যখন আল্লাহকে ভালবাসেন তখন তার নিজের কোন অভিলাষ থাকে না, সব কাজ আল্লাহর জন্য করে থাকেন। এ প্রসঙ্গে ক্বোরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে-

قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

তরজমাঃ আপনি বলুন! নিঃসন্দেহে আমার নামায, আমার ক্বোরবানী, আমার জীবন এবং আমার মরণ সবই আল্লাহর জন্য, যিনি রব সমগ্র জাহানের।

[সূরা আন‘আম, আয়াত-১৬২,তরজমা- কানযুল ঈমান]

ঈমানদার যখন নিজের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পায়না, বরং সর্বত্র আল্লাহ্‌র জল্‌ওয়া

দেখতে পায়, তখন তিনি পরিপূর্ণ ঈমানদার হন। আল্লাহর ভালবাসা ছাড়া তাঁর কাছে আর কিছুই থাকে না। এ প্রসঙ্গে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীস শরীফে ইরশাদ করেছেন-

مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَ اَبْغَضَ لِلّٰهِ وَاَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِاسْتَكْمَلَ الْاِيْمَان

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালবেসেছে, আল্লাহর জন্য শত্রুতা পোষণ করেছে, আল্লাহর ওয়াস্তে দান করেছে এবং আল্লাহরই নিমিত্তে রুখেছে, তাহলে ঈমান পূর্ণাঙ্গ হয়েছে। [সুনানে আবূ দাঊদ]

আল্লামা রুমী মসনভী শরীফে বলেছেন-

عشق آں شعلہ است کہ چوں کہ بروخت + ہر کہ جز معشوق باقی جملہ سوخت

উচ্চারণ ঃ ইশক্ব আঁ শো'লাহ্ আস্ত কেহ্ চোঁ-কেহ্ বরোখত
হারকেহ্ জুয্ মা'শূক্ব বাকী জুমলাহ্ সূখত।

অর্থাৎ ইশক্ব এমন একটি অগ্নিশিখা যে, যখন তা প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে, তখন সেটা আপন প্রেমাস্পদ ছাড়া সবকিছুকেই জ্বালিয়ে দেয়।

আল্লাহকে ভালবাসার পূর্বশর্তসমূহ

মুহাব্বতের **প্রথম পূবশর্ত** হল অধিক পরিমাণে মাহবূবের চর্চা করা। مَنْ اَحَبَّ شَيْئًا اَكْثَـرَ ذِكْـرَهٗ (অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন বস্তুকে ভালবাসে সে সেটার বেশী চর্চা করে।) আল্লাহ তা'আলা পবিত্র ক্বোরআন মজিদে ওইসব ব্যক্তির প্রশংসা করেছেন, যাঁরা আল্লাহকে ভালবাসেন এবং তাঁর যিকরে মশগুল থাকেন। যেমন এরশাদ হচ্ছে-

وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا

তরজমাঃ এবং ওইসব লোক, যারা রাত অতিবাহিত করে আপন রবের জন্য সাজদাহ্ ও ক্বিয়ামের মধ্যে। [সূরা ফোরক্বান, আয়াত-৬৪, তরজমা- কানযুল ঈমান]

আল্লাহ্ তা'আলার ভালবাসার **দ্বিতীয় পূর্বশর্ত** হল-আল্লাহর পরীক্ষার উপর ধৈর্যধারণ করা। রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

اَشَدُّ النَّاسِ بَلَآءً اَلاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْاَمْثَلُ فَالْاَمْثَلُ

অর্থাৎ সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন সম্মানিত নবীগণ, অতঃপর তাদের অনুগতগণ তারপর তাঁদের অনুগতগণ।

হযরত আইয়ূব আলাইহিস্ সালাম-এর ঘটনা ক্বোরআন মজীদে একাধিকবার এরশাদ হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে কঠিন শারীরিক রোগব্যাধি দিয়ে পরীক্ষা করেছেন। মুফাস্সিরগণ বলেন, হযরত আইয়ূব আলায়হিস্ সালাম প্রায় **১২** বছর

কঠিন রোগে আক্রান্ত ছিলেন। তাঁর স্ত্রী তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন তিনি যেন আল্লাহর কাছে আরোগ্য লাভের জন্য ফরিয়াদ করেন। তিনি উত্তরে বলেছিলেন, "আল্লাহর নি'মাতে আমার জীবন ভরপুর। সামান্য একটি পরীক্ষায় আমি ধৈর্যহারা হতে পারি না।" ১২ বছর পর স্ত্রীর জোর অনুরোধে তিনি আল্লাহর কাছে দো'আ করেছিলেন-

وَاَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ

তরজমাঃ এবং আইয়ুব আলায়হিস্ সালামকে (স্মরণ করুন) যখন সে আপন রবকে ডাকলো, 'আমাকে দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করেছে এবং তুমি সমস্ত দয়ালুর মধ্যে সর্বাধিক দয়ালু।' [সূরা আম্বিয়া, আয়াত-৮৩, তরজমা-কানযুল ঈমান]

দুই. আল্লাহর আনুগত্যের বিবরণ (اطاعت الهى)

মাহবূবের আনুগত্যের মধ্যেই পরিপূর্ণ মুহাব্বতের পরিচয় পাওয়া যায়। আল্লাহ তা'আলাকে ভালবাসার দাবী করে তাঁর আনুগত্য না করলে ওই দাবীর সত্যতা প্রমাণিত হয় না। আর এ জন্য ইসলাম ভালবাসার সাথে আনুগত্য প্রকাশের শিক্ষা দেয়। যেমন এরশাদ হয়েছে-

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

তরজমাঃ হে মাহবূব! আপনি বলে দিন, হে মানবকুল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবেসে থাকো, তবে আমার অনুসারী হয়ে যাও, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত-৩১, তরজমা- কানযুল ঈমান।]

কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অনুযায়ী জীবন যাপন করে এবং আল্লাহ তা'আলার হুকুম-আহকাম মেনে চলে, তবে আল্লাহ তাকে এমন নি'মাত দেন যে, সৃষ্টিকুলের সব কিছুই তার অনুগত হয়ে যায়। এরশাদ হয়েছে-

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَمَافِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ

তরজমাঃ এবং তিনি তোমাদের জন্য কাজে লাগিয়েছেন যা কিছু আসমানসমূহে রয়েছে এবং যা কিছু যমীনে, স্বীয় নির্দেশে।
[সূরা জা-সিয়াহ, আয়াত-১৩, তরজমা-কানযুল ঈমান।

এ বিষয়ে সায়্যেদুনা শেখ আব্দুল ক্বাদের জীলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর 'ফুতূহুল গায়ব' গ্রন্থে হাদীসে ক্বুদসী উদ্ধৃত করেছেন-

يَآ اِبْنَ اٰدَمَ اَنَا اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنَا اَقُوْلُ لِشَيْءٍ كُنْ فَيَكُوْنُ اَطِعْنِىْ اَجْعَلْكَ تَقُوْلُ

لِشَيءٍ كُنْ فَيَكُوْنُ وَقَدْ فَعَلَ بِكَثِيْرٍ مِّنْ اَنْبِيَآئِهٖ وَاَوْلِيَآئِهٖ وَخَوَاصِّهٖ مِنْ بَنِىْ اٰدَمَ

অর্থাৎ ‘‘আল্লাহ্ তা‘আলা এরশাদ করেন- হে আদম সন্তান! আমি হলাম আল্লাহ্, আমি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। আমি কোন বস্তুর উদ্দেশে যখন ‘কুন’ (হয়ে যা) বলি, তখন তা (সাথে সাথে) হয়ে যায়। তুমি আমার আনুগত্য করো। আমি তোমাকে এমনি শক্তিমান করবো যে, যদি তুমি কোন বস্তুর উদ্দেশে বলো- ‘কুন’ (হয়ে যা), তবে তাও (সাথে সাথে) হয়ে যাবে। বস্তুত তিনি আদম-সন্তানদের মধ্যে অনেক নবী, অনেক ওলী ও অনেক খাস বান্দাকে এমনই ক্ষমতা সম্পন্ন করেছেন।’’ যেমন- হুযূর সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হিজরতকালে সুরাক্বাহ্ ইবনে মালিককে পাকড়াও করার জন্য যমীনকে নির্দেশ দেওয়া মাত্রই যমীন সাথে সাথে হুযূরের আনুগত্য করে তাকে গ্রাস করতে থাকে। অতঃপর সুরাক্বাহ্ ক্ষমা প্রার্থনা করলে হুযূরের নির্দেশে যমীন তাকে ছেড়ে দেয় এবং সুরাক্বাহ ঈমান এনে সাহাবী হবার সৌভাগ্য লাভ করেন। হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম ক্বারূন ও তার সম্পদকে গ্রাস করার জন্য যমীনকে নির্দেশ দিলে যমীন তাঁর আনুগত্য করেছিলো। হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম মৃতকে জীবিত হতে বললে মৃত জীবিত হয়ে যেতো। তাঁর অন্যান্য ক্ষমতার বিবরণ তো পবিত্র ক্বোরআনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত ফারূক্বে আ’যম নীল নদকে নির্দেশ দিলে নীল নদ তা পালন করেছে এবং তার ফলশ্রুতিতে এযাবৎ পরিপূর্ণভাবে প্রবাহিত হয়ে আসছে। হুযূর গাউসে পাকের নির্দেশেও মৃত জীবিত হয়েছে। এ ঘটনা বহু কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। হুযূর গরীব নাওয়ায এক বুড়ির নিহত সন্তানকে জীবিত করেছিলেন। ওই সন্তান এরপর দীর্ঘদিন যাবৎ জীবিত ছিলো। এ ঘটনা ‘মু’ঈনুল আরওয়াহ’ সহ একাধিক জীবনী গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। [ফুতূহুল গায়ব, মাক্বালাহঃ পৃষ্ঠা-১৯]

শায়খ মুহাম্মদ শিরধীনী রাহমাতুল্লাহি আলায়হির ঘটনা

তিনি আল্লাহ তা‘আলার একজন প্রিয় বান্দা ছিলেন। তাঁর একমাত্র পুত্র-সন্তান কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে মুমূর্ষু হয়ে পড়লেও ওই দিকে তাঁর কোন খেয়াল ছিলো না। তিনি আল্লাহ তা‘আলার এবাদতে মগ্ন থাকতেন। এ সময় তাঁর স্ত্রী তাঁকে বললেন, ‘‘আপনি আল্লাহর প্রেমে এত বেশী বিভোর যে, আপনার এ সন্তান মারা গেলেও আপনার কোন পরোয়া নেই; কিন্তু আমি কাকে নিয়ে বাঁচবো।’’ এমতাবস্থায় তাঁদের ঘরে মালাকুল মাওত এসে হাযির। ইমাম নাবহানী ইমাম শা’রানীর বরাতে বলেন-ওই সময় স্ত্রীর কান্না দেখে শায়খ মুহাম্মদ শিরধীনী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি

হযরত আয্রাঈল আলায়হিস্ সালামকে সম্বোধন করে বললেন-

اِرْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ رَاجِعًا فَاِنَّ الْاَمْرَ نُسِخَ

অর্থাৎ আপনি আপন রবের দিকে ফিরে যান! কারণ, রূহ কব্জের নির্দেশ রহিত করা হয়েছে। [কামালুল আউলিয়া, পৃষ্ঠা-৩০২]

অতএব,মালাকুল মাওত চলে গেলেন এবং ওই ছেলে আরো ৩ বছর জীবিত ছিলো।

তিন. আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল বা ভরসা করার বিবরণ

ঈমানের **তৃতীয় দাবী** হলো আল্লাহ তা‘আলার উপর ভরসা করা। এ প্রসঙ্গে ক্বোরআন মজিদে এরশাদ হয়েছে-

وَقَالَ مُوْسٰى يَاقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِيْنَ

তরজমাঃ এবং মূসা বললো, ‘হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আল্লাহ্র উপর ঈমান এনে থাকো, তবে তাঁরই উপর নির্ভর করো, যদি তোমরা ইসলাম গ্রহণ করে থাকো। [সূরা ইউনুস, আয়াত-৮৪, তরজমা-কানযুল ঈমান]

সাধারণত মনে করা হয় যে, কোন কাজে আসবাব বা উপকরণাদি ছেড়ে দিয়ে শুধু আল্লাহ তা‘আলার উপর ভরসা করাই তাওয়াক্কুল। অথচ আল্লাহ তা‘আলার কাছে এমন তাওয়াক্কুল গ্রহণীয় নয়। পরিপূর্ণভাবে আসবাব বা উপকরণাদি গ্রহণ করে সেটার উপর ভরসা না করে শুধু আল্লাহ তা‘আলার উপর ভরসা করাই হচ্ছে তাওয়াক্কুল ।যেমন ক্বোরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে-

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا

তরজমাঃ তিনি পূর্বের রব, পশ্চিমের রব। তিনি ব্যতীত কোন মা’বূদ নেই। সুতরাং আপনি তাকেই কর্মবিধায়ক হিসেবে গ্রহণ করুন।

[সূরা মুয্যাম্মিল, আয়াত-৯, তরজমা কানযুল ঈমান]

মানুষকে আল্লাহ তা‘আলা চেষ্টা করার জন্য এবং আসবাব তালাশ করার জন্য নির্দেশ দিয়ে ইরশাদ করেছেন-

وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى

তরজমাঃ এবং এ যে, মানুষ পারে না কিন্তু আপন প্রচেষ্টায়।

[সূরা আন্নাজম, আয়াত-৩]

আল্লাহ তা‘আলার নির্দ্ধারিত নিয়ম হল মানুষকে সেটাই দেয়া হবে, যা সে মনেপ্রাণে চায়। হাদীস শরীফে একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। এক সাহাবী উটে চড়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে আসলেন। তিনি যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সালাম করতে আসলেন

তখন হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, “তোমার উট কোথায়?” উত্তরে তিনি বললেন,“আল্লাহর উপর ভরসা করে উট ছেড়ে চলে এসেছি।” তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, وَاعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ অর্থাৎ সেটাকে (উট) প্রথমে বাঁধো এবং আল্লাহর উপর ভরসা করো। [তিরমিযী শরীফ, মিনহাজুস্ সোয়ালিহীনঃ পৃ.২৪৬]

ইবাদতে তাওহীদ (توحيد فى العبادة) -এর বিবরণ

আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করা বৈধ নয়। অন্য কেউ ইবাদতের উপযুক্তও নয়। এ কারণেই যুগে যুগে যত নবী-রাসূল এ পৃথিবীতে এসেছেন, তাঁরা সকলেই এক আল্লাহর ইবাদতের প্রতিই মানুষকে আহ্বান করেছেন। সকল নবী-রাসূল তাঁদের সম্প্রদায়কে এ বাণীই প্রচার করেছেন-

قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ

অর্থাৎ-হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, যিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন উপাস্য নেই। [সূরা আ'রাফ ঃ আয়াত-৭৩, তরজমা- কান্‌যুল ঈমান]

ক্বোরআন মজীদে আরো এরশাদ হয়েছে-

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلاَ يُشْرِكْ بِعَبَادَةِ رَبِّهٖ اَحَدًا

অর্থাৎ-সুতরাং যার আপন রবের সাথে সাক্ষাৎ করার আশা আছে, তার উচিৎ যেনো সে সৎকর্ম করে এবং সে যেনো আপন রবের ইবাদতে অন্য কাউকে শরীক না করে। [সূরা কাহফ, আয়াত-১১০, তরজমা- কান্‌যুল ঈমান]

তাওহীদের গুরুত্ব ও ফযীলত

তাওহীদ তথা আল্লাহ্‌র একত্ববাদ হল ইসলামের প্রধান মূলমন্ত্র। একত্ববাদে বিশ্বাস ছাড়া কোন আমলই আল্লাহ্‌র দরবারে গ্রহণযোগ্য নয়। এ কারণেই তাওহীদে বিশ্বাস ও স্বীকৃতিকে হাদীস শরীফে ইসলামের প্রধান রুক্‌ন্ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

بُنِىَ الْاِسْلاَمُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ
وَاِقَامِ الصَّلاَةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

অর্থাৎ-ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত: ১. এ মর্মে সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই এবং হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল, ২. নামায কায়েম করা, ৩. যাকাত প্রদান করা, ৪. হজ্জ করা ও ৫. রমযানের রোযা রাখা।
[সহীহ বোখারী শরীফ, কিতাবুল ঈমান]

অপর এক হাদীসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

مَنْ شَهِدَ اَنْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدً ارَّسُوْلُ اللّٰهِ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ النَّارَ

অর্থাৎ-যদি কোন ব্যক্তি এ মর্মে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রসূল, তবে আল্লাহ তা'আলা তার উপর দোযখের আগুনকে হারাম করে দেবেন।
[মিশকাতুল মাসাবীহ, পৃষ্ঠা-১৫]

আরেক হাদীস শরীফে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

مَفَاتِيْحُ الْجَنَّةِ شَهَادَةُ اَنْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

অর্থাৎ-বেহেশ্‌তের চাবিগুচ্ছ হচ্ছে- এমর্মে সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। [মিশকাতুল মাসাবীহ ঃ পৃষ্ঠা-১৫]

হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যদি আসমান ও যমীন এবং এ দু'এর মধ্যস্থিত সমুদয় বস্তুকে এনে এক পাল্লায় রাখায় হয় আর لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ -এর সাক্ষ্যকে অপর পাল্লায় রাখা হয়, তবে لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ -কলেমার পাল্লা ভারী হবে।
[তাবরানী শরীফ ঃ পৃষ্ঠা- ৩৮৫]

হযরত যায়দ ইবনে আরক্বাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যদি কেউ আল্লাহর সাথে শির্‌ক করে মারা যায়, সে জাহান্নামে দাখিল হবে। আর কেউ যদি আল্লাহর সাথে শির্‌ক না করে (মু'মিন অবস্থায়) মারা যায়, সে জান্নাতে দাখিল হবে।
[মিশকাত শরীফঃ পৃষ্ঠা- ১৫]

শির্‌ক ও পৌত্তলিকতার বর্ণনা

'শির্‌ক'-এর আভিধানিক অর্থ অংশীদার বানানো। ইসলামের পরিভাষায়-

اَلشِّرْكُ اَنْ يُّثْبِتَ لِغَيْرِ اللّٰهِ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى شَيْئًا مِّنْ صِفَاتِهِ الْمُخْتَصَّةِ بِهٖ

অর্থাৎ-আল্লাহ্‌র বিশেষ গুণাবলী হতে কোন একটিকে 'গায়রুল্লাহ'র (আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো) জন্য সাব্যস্ত করাকে শির্‌ক বলা হয়।

অন্যভাষায়, শিরক হল- আল্লাহ্‌র সত্তা, গুণাবলী এবং ইবাদতে কাউকে শরীক করা। তাওহীদ ও শির্‌ক-একটি অপরটির সম্পূর্ণ বিপরীত। তাওহীদ ও শির্‌কের লড়াই বহু প্রাচীনকাল হতে চলে আসছে। হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম-এর

যামানায় বোত-প্রতিমার পূজা চলতো। এ সম্পর্কে ক্বোরআন মজীদে বর্ণনা এসেছে-

وَقَالُوْا لَا تَذَرُنَّ اٰلِهَتَكُمْ وَ لَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَّ لَا سُوَاعًا ۙ وَّلَا يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا ۝

তরজমাঃ এবং তারা বলেছে, 'তোমরা কখনো বর্জন করো না তোমাদের উপাস্যগুলোকে এবং কখনো বর্জন করো না ওয়াদ্দ, সুওয়া, ইয়াগূস, ইয়া'উক্ব ও নাস্‌রকে।' [সূরা নূহ, আয়াত-২৩, তরজমা- কান্‌যুল ঈমান]

প্রত্যেক নবী-রাসূল নিজ নিজ যামানায় তাঁদের উম্মতদের শির্ক হতে বিরত রাখার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। তাওহীদের দাওয়াত এবং শিরকের বিরুদ্ধে দ্ব্যর্থহীন ঘোষণায় হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালাম-এর ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ প্রসঙ্গে ক্বোরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে-

قَالَ اَفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْـًٔا وَّ لَا يَضُرُّكُمْ ۝ اُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝

তরজমাঃ বললো, 'তবে কি তোমরা আল্লাহ ব্যতীত এমন সবের পূজা করছো, যেগুলো না তোমাদের উপকার করতে পারে এবং না ক্ষতি করতে পারে? ধিক্কার তোমাদের প্রতি এবং ওই মূর্তিগুলোর প্রতি, যেগুলোকে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত পূজা করছো! তবে কি তোমাদের বিবেক নেই?

[সূরা আম্বিয়া, আয়াত-৬৬, তরজমা- কান্‌যুল ঈমান]

ঐতিহাসিকদের মতে, মক্কায় মূর্তিপূজার প্রবর্তন ও প্রচলন করেছিলো আমর ইবনে লুহাই নামক এক ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র যামানার প্রথম দিকে যে সব শির্ক প্রচলিত ছিলো, সেগুলোর মূলোৎপাটনের জন্য তিনি সর্বদা তৎপর ছিলেন। ক্বোরআন মজীদে লাত, মানাত, ওয্‌যা ইত্যাদি বোত-প্রতিমার নিন্দা করা হয়েছে এবং যারা এ সবের পূজায় লিপ্ত ছিলো, তাদেরকে অজ্ঞ, মূর্খ, অর্বাচীন এবং প্রবৃত্তি-পূজারী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। লাত, মানাত, ওয্‌যার আলোচনার পর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে-

اِنْ هِىَ اِلَّاۤ اَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوْهَاۤ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ؕ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْاَنْفُسُ ۚ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِّنْ رَّبِّهِمُ الْهُدٰى ۝

তরজমাঃ সেগুলোতো নয়, কিন্তু কিছু নাম, যেগুলো তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষগণ রেখে ফেলেছো। আল্লাহ সেগুলোর পক্ষে কোন সনদ অবতীর্ণ করেন নি। তারাতো নিছক কল্পনা ও প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করছে। অথচ নিশ্চয় তাদের নিকট, তাদের রবের নিকট থেকে হিদায়ত এসেছে।

[সূরা নাজ্‌ম, আয়াত-২৩, তরজমা-কান্‌যুল ঈমান]

অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে-

سَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَاۤ اَشْرَكْنَا وَلَاۤ اٰبَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَیْءٍ ؕ كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتّٰى ذَاقُوْا بَاْسَنَا ؕ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوْهُ لَنَا ؕ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَخْرُصُوْنَ ۝

তরজমাঃ এখন মুশরিকগণ বলবে, 'আল্লাহ ইচ্ছা করলে না আমরা শির্ক করতাম, না আমাদের পিতৃপুরুষগণ, না আমরা কোন কিছু হারাম সাব্যস্ত করতাম। এরূপেই তাদের পূর্ববর্তীগণ মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো। শেষ পর্যন্ত আমার শাস্তি ভোগ করেছে। আপনি বলুন, তোমাদের নিকট কি কোন জ্ঞান আছে যে, তা আমাদের নিকট পেশ করতে পারো? তোমরাতো নিছক কল্পনারই অনুসরণ করছো এবং তোমরা এভাবেই অনুমান করছো।[সূরা আন'আম, আয়াত-১৪৮, তরজমা- কান্‌যুল ঈমান]

অগ্নিপূজক সম্প্রদায় দু' মা'বূদে বিশ্বাসী। তারা কল্যাণের মা'বূদ হিসেবে 'ইয়াযদান' ও অকল্যাণের মা'বূদ হিসেবে 'আহ্‌রামান'-এ দু' দেবতায় বিশ্বাসী। (না'উযুবিল্লাহ)

অনুরূপ, হিন্দু সম্প্রদায় প্রধানতঃ তিন দেবতায় বিশ্বাসী ১. ব্রাহ্ম (সৃষ্টিকর্তা) ২.বিষ্ণু (রক্ষাকর্তা) এবং ৩. শিব (ধ্বংসকারী)।

উপরোক্ত আক্বীদা ও ধর্মবিশ্বাস- সবই জঘন্য শিরকের অন্তর্ভুক্ত। এর পরিণাম চিরস্থায়ী জাহান্নাম।

শির্কের প্রকারভেদ

শিরক প্রথমতঃ দু'প্রকার ঃ

১. শির্কে আকবর

২. শির্কে আস্‌গর

'শির্কে আকবর' হলো কোন সৃষ্টিকে আল্লাহ তা'আলার মত তাঁর যাত ও সিফাতে সমকক্ষ বা সমমর্যাদাসম্পন্ন মনে করা।

'শির্কে আস্‌গর' হলো ইবাদতের মধ্যে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির নিয়্যতের সাথে অন্য কোন উদ্দেশ্যও শামিল রাখা। যেমন লোক দেখানোর নিয়্যতে ইবাদত করা অথবা খ্যাতি বা সুনামের উদ্দেশ্যে দান- সদক্বাহ করা ইত্যাদি। [ফাতহুল মুলহিম]

আবার কোন কোন আলিম এ দু'টি শির্ককে 'শির্কে জলী' ও 'শির্কে খাফী' যথাক্রমে 'প্রকাশ্য শির্ক' ও 'অপ্রকাশ্য শির্ক' নামে আখ্যায়িত করেছেন।

'শির্কে খাফী' অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিষয়। তা থেকে বেঁচে থাকা খুবই কঠিন। 'শির্কে খাফী' হল যেমন কোন বিষয়ে আল্লাহর কুদরতের মধ্যে অন্য কিছুর প্রভাবেরও ধারণা করা।

‘শির্কে জলী’র আবার বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে-

১. **الشرك فى الربوبية** অর্থাৎ রাবূবিয়াতের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করা। (অন্য কথায় আল্লাহর মতো অন্য কাউকেও রব বা প্রতিপালক বলে বিশ্বাস করা।)

২. **الشرك فى الالوهية** অর্থাৎ ইলাহ হওয়ার মধ্যে অন্য কাউকে শরীক করা। (অন্য ভাষায় আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকেও ইলাহ বা উপাস্য বলে বিশ্বাস করা।)

৩. **الشرك فى العبادة** অর্থাৎ ইবাদতে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করা।

৪. **الشرك فى الصفات** অর্থাৎ আল্লাহর কোন বিশেষ গুণকে বান্দার জন্য সাব্যস্ত করা।

শির্কের কুফল

শির্ক গুরুতর অপরাধ। তাওবা বা আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করে ঈমান গ্রহণ করা ছাড়া এ গুনাহ মাফ হয় না। ক্বোরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে-

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ

তরজমাঃ নিশ্চয় আল্লাহ এটা মাফ করেন না যে, তাঁর কোন শরীক দাঁড় করানো হবে এবং এর নিম্ন পর্যায়ের যা কিছু আছে তা যাকে চান ক্ষমা করে দেন।

[সূরা নিসা, আয়াত-১১৬, তরজমা, কানযুল ঈমান]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِيْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ ○

অর্থাৎ- যে কেউ আল্লাহর শরীক করে সে যেনো পতিত হলো আসমান থেকে, অতঃপর পাখী তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যায়, অথবা বায়ু তাকে অন্যত্র নিক্ষেপ করে।

[সূরা হজ্জ, আয়াত-৩১, তরজমা-কানযুল ঈমান]

হাদীস শরীফেও শির্কের কুফল ও জঘন্য শাস্তি সম্পর্কে বহু বর্ণনা এসেছে।

‘শির্ক’ ও ‘কুফর’ সম্পর্কে আরো কিছু আলোচনা

‘শির্ক হচ্ছে ‘তাওহীদ’-এর বিপরীত আর ‘কুফর’ হচ্ছে ‘ঈমান’-এর বিপরীত। প্রত্যেক কিছুর সঠিক পরিচয় সেটার বিপরীত বস্তুটি দ্বারা সহজে পাওয়া যায়। আরবীতে একটি প্রসিদ্ধ প্রবাদ আছে-

اَلْاَ شْيَآءُ تُعْرَفُ بِاَضْدَادِهَا

অর্থাৎ “জিনিষগুলো আপন আপন বিপরীত বস্তু দ্বারা চেনা যায়।” যেমন- ‘মনের শান্তি’ ওই ব্যক্তিই অনুধাবন করতে পারে, যে কখনো মানসিক অশান্তি ভোগ করেছে। যে কখনো মানসিক অশান্তি ভোগ করে নি, সে মনের শান্তির তৃপ্তি বুঝতে পারবে না। দিনের আন্দাজ রাত ব্যতীত করা যায় না। অন্ধকার ব্যতীত আলোর আন্দাজ করা যায় না। অনুরূপ, মিথ্যা ও বাতিল সম্পর্কে যার ধারণা নেই সে কখনো ‘হক্ব’ বা সত্যের মাধুর্য ও মহিমা অনুধাবন করতে পারবে না।

সুতরাং যে ব্যক্তি ‘তাওহীদ’-এর সঠিক রূপরেখা সম্পর্কে সম্যক অবগত হবে, সে ‘শির্ক’ সম্পর্কেও সহজে জানতে পারবে। আর যে ‘ঈমান’ সম্পর্কে যথাযথভাবে জানতে পারবে সে কুফর সম্পর্কেও সহজে জানতে পারবে।

[‘মাক্বালা-ত-ই কাযেমী’ঃ পৃঃ ৩য় খণ্ড ১৮, কৃত সাইয়্যেদ আহমদ সা'ঈদ কাযেমী, গাযযালী-ই যমান, আল্লামা, পাকিস্তান, মাক্তাবাহ্-ই যিয়া-ইয়্যাহ্ কর্তৃক ডিসেম্বর ২০০১ সালে রাওয়ালপিন্ডিতে মুদ্রিত।]

সুতরাং এখন একই নিয়মে ‘শির্ক’ ও ‘কুফর’-এর সংজ্ঞা ও প্রাসাঙ্গিক আলোচনা করা যাক।

শিরক (شرك)

এক্ষুনি উল্লেখ করা হয়েছে যে, ‘শির্ক’ তাওহীদের বিপরীত। প্রথমে দেখুন ‘তাওহীদ’ কাকে বলে। ‘তাওহীদ’ (**توحيد**) হচ্ছে- যা কালেমা-ই ত্বাইয়্যেবাহ **لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ** (লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু)’র মধ্যে পূর্ণাঙ্গভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে- সত্য মা'বূদ আল্লাহ ব্যতীত কেউ নেই। অর্থাৎ সত্য উপাস্য একমাত্র আল্লাহ। আর একথা অন্তরে বিশ্বাস করা ও মুখে স্বীকার করার নাম ‘তাওহীদ’।

[আত্বইয়াবুল বয়ান ঃ কৃত সদরুল আফাযিল সাইয়্যেদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী, পৃষ্ঠা-১৮৪]

আল্লামা আলী ক্বারী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি ‘মিরক্বাতুল মাফাতীহ শরহে মিশ্কাতুল মাসাবীহ’তে লিখেছেন- ‘লা-ইলা-হা’ (**لَآ اِلٰهَ**) - এর মধ্যে **لَا** **نفى جنس** -এর জন্য ব্যবহৃত। অর্থাৎ প্রত্যেক ‘ইলাহ’ বা উপাস্যকে অস্বীকার করার জন্যই এ শব্দটি। আর **اِلَّا اللّٰهَ** সম্পর্কে কেউ কেউ বলেছেন- এ বাক্যাংশটা বিধেয় (**خبر لا**); কিন্তু সঠিক অভিমত হচ্ছে- বিধেয় উহ্য রয়েছে। সুতরাং ওই উহ্য বিধেয় সহকারে **لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه** বাক্যটির অর্থ দাঁড়ায়- “কোন সত্য উপাস্য (মা'বূদ) নেই- আল্লাহ ব্যতীত। কেননা, পবিত্র নাম আল্লাহ (**اَللّٰهُ**) হচ্ছে- সমস্ত উত্তম গুণের ধারক সত্তারই নাম এবং সত্য মা'বূদ যিনি, একমাত্র তাঁরই জন্য এটা নির্দিষ্ট নাম। সুতরাং এখানে ‘আল্লাহ’ শব্দের স্থলে যদি ‘রাহমান’ (পরম দয়ালু) বলা হয়, তবে নিরেট ‘তাওহীদ’ (একত্ববাদ) তা দ্বারা বিশুদ্ধভাবে বুঝা যেতো না। এটাও বলা হয়েছে যে, ‘তাওহীদ’ মানে কোন বস্তুকে ‘এক’ বলে সাব্যস্ত করা এবং এক বলে জানা। আর

‘তাওহীদ’-এর পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে- আল্লাহ তা‘আলার মহান যাত বা সত্তাকে ‘এক’ বলে সাব্যস্ত করা। তাছাড়া, তাঁকে আক্বীদা বা বিশ্বাসে, তারপর কথায় ও কাজে, তারপর নিশ্চিত বিশ্বাস ও পরিচিতিতে অতঃপর বাহ্যিক ও অন্তর্চক্ষু দ্বারা দর্শনে, অতঃপর প্রমাণিত ও স্থায়ীভাবে ‘এক’ বলে সাব্যস্ত করা।

[মিরকাত ঃ ১ম খন্ড, ৪৬ পৃষ্ঠার বরাতে ‘আত্বইয়াবুল বয়ান ঃ পৃষ্ঠা- ১৮৪]

সুতরাং এখন দেখুন ‘শির্ক’-এর সংজ্ঞা কি?

‘শিরক’ হচ্ছে যাকে কলেমা-ই তাইয়্যেবাহ্ ‘লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু’ বাতিল বা প্রত্যাখ্যান করেছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে মা’বূদ (উপাস্য) সাব্যস্ত করা। [আত্বইয়াবুল বয়ান, পৃষ্ঠা-১৮৪]

‘তাফসীর-ই খাযিন’-এ উল্লেখ করা হয়েছে- আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত করার অর্থ হচ্ছে তাঁর সাথে তিনি ব্যতীত অন্য কাউকে শরীক স্থির করা।

‘শরহে আক্বাইদে নাসাফী’তে উল্লেখ করা হয়েছে-

اَلْاِشْرَاکُ هُوَ اِثْبَاتُ الشَّرِیْکِ فِی الْاُلُوْهِيَّةِ بِمَعْنٰی وُجُوْبِ الْوُجُوْدِ كَمَا لِلْمَجُوْسِ اَوْبِمَعْنٰی اِسْتِحْقَاقِ الْعِبَادَةِ كَمَا لِعَبَدَةِ الْاَصْنَامِ

অর্থাৎ ‘শির্ক’ করার অর্থ হচ্ছে- ইলাহ্ (উপাস্য) হবার মধ্যে (কাউকে আল্লাহ্র সাথে) শরীক স্থির করা। ‘ইলাহ’ হওয়াও এ অর্থে যে, যিনি ‘ইলাহ’ তিনি চিরঞ্জীব, তাঁর অস্তিত্ব অপরিহার্য; যেমন অগ্নিপূজারীরা করে থাকে, অর্থাৎ আগুনকে তারা আল্লাহর সাথে এ অর্থে শরীক সাব্যস্ত করে যে, আগুনও আল্লাহর মতো চিরঞ্জীব ও অবিনশ্বর অস্তিত্ববিশিষ্ট। অথবা এ অর্থে যে, অন্য কেউ ইবাদতেরও উপযোগী। যেমন- মূর্তি পূজারীরা এ শির্ক করে থাকে, অর্থাৎ তারা তাদের মূর্তিগুলোকেও ইবাদতের উপযোগী বলে বিশ্বাস করে।’ (আল্লাহরই পানাহ্!)

[প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৮৫]

হযরত শায়খ আবদুল হক্ব মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর ‘আশি’‘আতুল লুম‘আত শরহে মিশ্কাতুল মাসাবীহ’তে লিখেছেন-

শির্ক তিন ধরনের

১. শির্ক ফিয্যাত (আল্লাহ্র মহান সত্তায় শির্ক করা)
২. শির্ক ফিস্ সিফাত (আল্লাহ্র গুণাবলীতে শির্ক করা) এবং
৩. শির্ক ফিল ইবাদত (ইবাদতে আল্লাহ্র শরীক স্থির করা)।

এর সারসংক্ষেপ হচ্ছে- শির্ক তিন প্রকারের হয়ে থাকে ঃ

এক. আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে চিরজীবী ও চিরস্থায়ী সত্তা বলে সাব্যস্ত করা।

দুই. আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে প্রকৃত স্রষ্টা বলে বিশ্বাস করা ও মুখে বলা।

তিন. আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করা অথবা ‘ইবাদতের উপযোগী বলে বিশ্বাস করা।

আবার এসব কথার সারসংক্ষেপ হচ্ছে-চিরজীবী অর্থাৎ নিজের সত্তা ও গুণাবলীতে স্বয়ংসম্পূর্ণ, সার্বভৌম, সত্তাগতভাবে কারো মুখাপেক্ষী নন এমন মহান সত্তা হলেন একমাত্র আল্লাহ তা‘আলা। অন্য কেউ নয়। আর শুধু তিনিই ইবাদতের উপযোগী। সুতরাং যদি কেউ কাউকে তাঁর সত্তা কিংবা গুণাবলীতে সত্তাগতভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অমুখাপেক্ষী বলে বিশ্বাস করে কিংবা ইবাদতের উপযোগী সাব্যস্ত করে সে মুশ্রিক। তাছাড়া, যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ‘ক্বাদীম’ অর্থাৎ তাকে তাঁর সত্তায় অন্য কারো অমুখাপেক্ষী বলে মানে সে মুশ্রিক (অংশীবাদী)।

যেমন আমাদের দেশের আর্যরা (হিন্দুরা), যারা আল্লাহ ব্যতীত আত্মা এবং মূল পদার্থকেও ‘ক্বাদীম’ (অবিনশ্বর, অমুখাপেক্ষী) এবং চিরজীবী, চিরস্থায়ী বলে বিশ্বাস করে। তারা ওইগুলোর সত্তাকে স্রষ্টা ও অমুখাপেক্ষী বলে বিশ্বাস করে, তাই তারা মুশরিক। অনুরূপ কেউ যদি কারো গুণাবলীকে তার সত্তাগত এবং ওই গুণাবলীতে তাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ, সার্বভৌম, সাধিষ্ঠ ও অমুখাপেক্ষী বলে বিশ্বাস করে সেও মুশরিক। চাই ওই গুণ বা বৈশিষ্ট্য জ্ঞান হোক, ক্ষমতা হোক, জীবন হোক, শ্রবণশক্তি কিংবা দৃষ্টিশক্তি হোক। উদাহরণ স্বরূপ, নক্ষত্রপূজারীদের ধারণা হচ্ছে- এ বিশ্বের পরিবর্তনগুলো নক্ষত্রগুলোর প্রভাবেই হয়ে থাকে। আর নক্ষত্রগুলোও ওই প্রভাব বিস্তারে সত্তাগতভাবে কারো মুখাপেক্ষী নয় বরং স্বয়ংসম্পূর্ণ। (না‘উযু বিল্লাহ্) এ আক্বীদা বা বিশ্বাসও শির্ক। এমনি বিশ্বাসে বিশ্বাসীরাও মুশরিক। অনুরূপ, যদি কেউ (আল্লাহ ব্যতীত অন্য) কারো ইবাদত করে, যাকে হিন্দুরা ‘পূজা’ বলে, ফার্সীতে বলে ‘পরস্তিশ’, সেও মুশরিক। যেমন মূর্তি-প্রতিমার পূজারীরা মূর্তির পূজা করে থাকে, আর সেগুলোকে পূজার উপযোগী মনে করে। তাই তারাও মুশরিক।

উল্লেখ্য, পক্ষান্তরে, যেসব লোক আল্লাহর প্রদত্ত গুণাবলী তাঁর বান্দার জন্য সাব্যস্ত করে, আর ওই গুণ বা বৈশিষ্ট্যগুলোকে আল্লাহর দান মনে করে, তারা মুশরিক নয়। উদাহরণ স্বরূপ, কেউ মানুষকে ‘শ্রোতা’ ও ‘দ্রষ্টা’ (سميع و بصير) বললো আর বিশ্বাস এটা রাখে যে, আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে শ্রুতি ও দৃষ্টি শক্তি দান করেছেন, তবে সে মু’মিন ও একত্ববাদী; মুশরিক নয়। মুশরিক তো তখনই হয়, যখন সে এ আক্বীদা বা বিশ্বাস রাখে যে, মানুষের জন্য শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি ‘যাতী’ (সত্তাগত, আল্লাহর দান নয়) আর সেও তাতে অন্য কারো মুখাপেক্ষী নয়। যেমন আল্লাহ তা‘আলা এরশাদ করেছেন-

فَجَعَلْنَاهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا

অর্থাৎ "আমি (আল্লাহ) তাকে শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন করেছি।" অথচ ক্বোরআন মজীদেই سميع و بصير (শ্রোতা ও দ্রষ্টা) আল্লাহ তা'আলার গুণবাচক নাম হিসেবে এরশাদ হয়েছে। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও মানুষকে তিনিই 'সামী' ও 'বাসীর' (শ্রোতা ও দ্রষ্টা) বলে বিশেষিত করেছেন। এটা শির্ক নয়। কেননা, মানুষের জন্য যে শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তি সাব্যস্ত হয়েছে তা আল্লাহর দানের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং ওই মানুষ অমুখাপেক্ষী হলো না। তাই এটা শির্কও হয়নি।

একথা অতিমাত্রায় হৃদয়ঙ্গম করে নিন যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো জন্য কোন একটি অণু-পরমাণু পরিমাণের উপর ইখতিয়ার কিংবা জ্ঞানকে সত্তাগত ও সার্বভৌমভাবে সাব্যস্ত করা হয়, তবে শির্ক হবে; 'আল্লাহর দান' বলে মানলে শির্ক হবে না।

বাস্তবিকপক্ষে, কাফির বস্তুর প্রভাবাদিকে কারণাদির সাথে সম্পৃক্ত করে থাকে, আর ওইগুলোকে অমুখাপেক্ষী, সার্বভৌম ও সত্তাগতভাবে প্রভাব বিস্তারকারী বলে বিশ্বাস করে। যেমন- নক্ষত্র পূজারীরা আসমানের দেহাংশগুলোর প্রভাবাদিতে বিশ্বাসী। তারা ওইগুলোকে স্বয়ং স্বাধীনভাবে প্রভাব বিস্তারকারী মনে করে। কিন্তু মুসলমানগণ আসবাব বা উপদানগুলোকে 'মাধ্যম' মনে করে। তারা ওই মাধ্যমরূপী উপাদানগুলোর আড়ালে আল্লাহর মহা কুদরতের অস্তিত্ব দেখতে পায়। প্রকৃত ক্ষমতা ও সত্তাগত ইখতিয়ার আল্লাহরই বলে বিশ্বাস করে। এ পার্থক্যটুকু যদি না থাকতো তবে তো মানুষ প্রতিটি কথায় মুশরিক হয়ে যেতো। তখন এমনি হতো-যদি বলি, "আমি দেখি" তবে মুশরিক, যদি বলি, "আমি শুনছি" তবে মুশরিক, যদি বলি, "আমি জীবিত" তবেও মুশরিক, যদি বলি, "আমি মওজুদ আছি" তবে মুশরিক, যদি বলি, "আমি সত্যবাদী" তবুও মুশরিক। কোন কথাই শির্কশূন্য হতো না। খাদ্য শক্তি যুগিয়েছে, পানি তৃপ্ত-তুষ্ট করেছে, ঔষধ উপকারী, সর্দি (ঠাণ্ডা) ক্ষতিকর-এসব ক'টি কথাও শির্ক হয়ে যেতো। ঈমানের কোন পথই অবিশিষ্ট থাকতো না। কিন্তু তেমনি নয়। শির্ক তখনই হবে, যখন কাউকে কোন গুণের ক্ষেত্রে সত্তাগতভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে। পক্ষান্তরে, যদি কাউকে সত্তাগতভাবে স্বাধীন-সার্বভৌম মনে না করে, বরং আল্লাহ তা'আলার মুখাপেক্ষী বলে মনে করে, অর্থাৎ তাঁরই দানক্রমে এ বৈশিষ্ট্য অর্জিত বলে বিশ্বাস করে, যেমন-বলছে তো 'আমি দেখছি', কিন্তু বিশ্বাস করে-আমার দেখার মধ্যে আমি আল্লাহ তা'আলার মুখাপেক্ষী, তিনি দেখার ক্ষমতা দিলে দেখতে পাই, তাহলে নিঃসন্দেহে সে একত্ববাদী (মু'মিন); মুশরিক নয়। এমতাবস্থায় কেউ তাকে মুশরিক বললে বা লিখলে সে মুর্খ, বিবেকভ্রষ্ট ও বিপথগামী। কেননা, তখন তাকে মুশরিক বলার অর্থ

এ হবে যে, আল্লাহ প্রদত্ত গুণে কাউকে গুনান্বিত মনে করাও শির্ক (না'উযু বিল্লাহ)। প্রকারান্তরে, সে বলতে চাচ্ছে যে, কারো প্রদত্ত দৃষ্টি এবং শ্রবণশক্তিও আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত; অন্য কারো মধ্যে তা আছে বললে শির্ক হবে। এটাতো সম্পূর্ণ বাতিল ও গোমরাহী। কেননা, আল্লাহ তা'আলার কোন গুণই কারো প্রদত্ত নয়। প্রতিটি গুণই তাঁর সত্ত্বাগত; উপার্জিত নয়। সুতরাং একথা সুস্পষ্ট হলো যে, আল্লাহ্ প্রদত্ত গুণাবলী কারো জন্য সাব্যস্ত করা মোটেই শির্ক হতে পারে না। কিন্তু এক শ্রেণীর মুসলমান নামধারী লোকও এখনো পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার যাত ও সিফাত (সত্তা ও গুণাবলী) সম্পর্কে অজ্ঞ। তারা এতটুকু জানে না যে, আল্লাহ তা'আলার সমস্ত গুণও 'যাতী' (সত্তাগত); কারো থেকে অর্জিত নয়। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য তাঁরই প্রদত্ত গুণাবলী সাব্যস্ত করলে শির্ক অনিবার্য হতে পারে না। পবিত্র ক্বোরআনে আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা আলায়হিস সালামের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন-

اِنِّىْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ اَنِّىْ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِ اللّٰهِ وَاُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَ اُحْيِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ فِىْ بُيُوْتِكُمْ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ـ

তরজমাঃ একথার ঘোষণা দিয়ে যে, 'আমি তোমাদের নিকট একটা নিদর্শন নিয়ে এসেছি, তোমাদের রবের পক্ষ থেকে যে, আমি তোমাদের জন্য মাটি দ্বারা পাখী সদৃশ আকৃতি গঠন করে থাকি, অতঃপর সেটার মধ্যে ফুৎকার করি। তখন সেটা তৎক্ষণাৎ পাখী হয়ে যায়- আল্লাহর নির্দেশে এবং আমি নিরাময় করি জন্মান্ধ ও সাদা দাগ সম্পন্ন (কুষ্ঠ রোগী)কে আর আমি মৃতকে জীবিত করি আল্লাহর নির্দেশে এবং তোমাদেরকে বলে দিই যা তোমরা আহার করো আর যা নিজ নিজ ঘরে জমা করে রাখো। নিশ্চয় এসব কথার মধ্যে তোমাদের জন্য মহান নিদর্শন রয়েছে যদি তোমরা ঈমান রাখো।

[পারা-৩, সূরা আ-লে ইমরান, আয়াত-৪৯, তরজমা- কানযুল ঈমান, বাংলা সংস্কারণ]

এ আয়াত শরীফে হযরত ঈসা 'আলা নাবিয়্যিনা ওয়া 'আলায়হিস্ সালাতু ওয়াত তাসলীমাত 'সৃষ্টি করা, অন্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য দান করা এবং মৃতকে জীবিত করা'র সম্পর্ক নিজের দিকে করেছেন। আর বলেছেন, তোমরা যা আহার করো এবং যা তোমরা ঘরে সঞ্চিত করে রাখছো তাও আমি জানি। আরো এরশাদ করেন, যদি তোমরা ঈমান রেখে থাকো তবে তাতে তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। আয়াতে তাওহীদের পতাকাবাহী, আল্লাহ তা'আলার রসূল হযরত ঈসা আলায়হি সালাতু ওয়াসসালাম-এর উক্তি হিদায়তেরই নমুনা, যা ক্বোরআন পাক উদ্ধৃত করেছে। সুস্পষ্ট ও নিশ্চিতভাবে বুঝা গেলো যে, সৃষ্টি করা, জীবিত করা ও

রোগ থেকে আরোগ্য দেওয়ার সম্পর্ক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো দিকে রচনা করা যদি এ বিশ্বাসে হয়ে থাকে যে, এসব ক্ষমতা তিনি আল্লাহর নিকট থেকে অর্জন করেছেন, তবে মোটেই শির্ক নয়। মোট কথা, শির্ক হচ্ছে দু'জন মা'বূদ অথবা আরো বেশী সাব্যস্ত করা। যেমন- আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ ফরমান-

لَا تَتَّخِذُوْا اِلٰهَيْنِ اثْنَيْنِ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ

তরজমাঃ তোমরা দু'জন ইলাহ্ (উপাস্য) গ্রহণ করো না। নিশ্চয় তিনি এক ইলাহ্।

[পারা-১৪, সূরা নাহ্ল]

আল্লাহ্ তা'আলার সত্তার গুণাবলী ও কার্যাদির গুণাবলীতে কাউকে তাঁর মতো সাব্যস্ত করা শির্ক; যেমন-শ্রুতিশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, কথা বলা, সৃষ্টি করা, রিয্ক দেওয়া, জীবিত করা, মৃত্যু ঘটানো, উপকার করা ও ক্ষতি করা। সুতরাং যে ব্যক্তি এ বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য উপাস্যও আছে, যে তার সত্তায় স্বাধিষ্ট (সার্বভৌম) অথবা গুণাবলীতে তাঁর মতো, অথবা কর্মে তাঁর শরীক, সৃষ্টি করে, রুজি দেয়, জীবিত রাখে, মৃত্যু ঘটায়, ক্ষতি করে, উপকার করে, এসব বিষয়ে সেও স্বাধীন, সার্বভৌম, সত্তাগতভাবে স্বাধিষ্ঠ, আল্লাহর অনুমতি ও দানের মুখাপেক্ষী নয়, তবে এমন আক্বীদা পোষণকারী নিশ্চিতভাবে মুশরিক; ঈমানের গন্ডি থেকে খারিজ। তার পরিণাম হচ্ছে সে দোযখে স্থায়ী হবে, সর্বদা জাহান্নামে থাকবে। এটাকে 'শির্ক-ই আকবর' বলে। এটাই 'তাওহীদ' (আল্লাহর একত্ববাদ)-এর বিপরীত। এ ধরনের বিশ্বাস করলে 'তাওহীদ'-এর দাবী বিনষ্ট হয়ে যায়। এরই প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন-

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ

তরজমাঃ নিশ্চয় আল্লাহ্, তাঁর সাথে শরীক করা (তথা কুফর করা) হলে তা তিনি ক্ষমা করেন না; এবং এতদ্ব্যতীত যা আছে তা যাকে চান ক্ষমা করেন।

এ ধরনের শির্ককে 'শির্ক-ই আকবর' (বৃহত্তম শির্ক) বলে। আরো লক্ষ্যণীয় যে, যখন শর্তহীনভাবে, শরীয়তের বচনগুলোতে শির্ক বলা হয়, তখন বেশীর ভাগ এ অর্থই হয়ে থাকে। এতদ্ব্যতীত, আরেক প্রকারের শির্ক রয়েছে। সেটাকে 'শির্কে আসগর' (ছোটতর শির্ক) বলে।

আর তা হচ্ছে বান্দা যদি ইবাদতে নিষ্ঠা অবলম্বন না করে, নিরেট আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইবাদত না করে বরং রিয়াকারী (লোক দেখানোর মানসে কোন কাজ) করে। যেমন হাদীস শরীফে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- اَلرِّيَآءُ شِرْكٌ خَفِيٌّ (রিয়া হচ্ছে গোপন শির্ক)।

[আত্তইয়াবুল বয়ান, পৃঃ ১৮৪]

পবিত্র ক্বোরআন ও হাদীস শরীফে এ উভয় প্রকারের শির্কের ভয়াবহ পরিণতির কথা এরশাদ হয়েছে। আল্লামা শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ওসমান আয্ যাহাবী

রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব 'আল-কাবা-ইর'-এ এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তা এখানে সবিশেষ প্রনিধানযোগ্য তিনি লিখেছেন।

শির্ক জঘন্যতম মহাপাপ

'কবীরাহ্ গুনাহ' (মহাপাপ) গুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা জঘন্য হচ্ছে- আল্লাহর সাথে শির্ক করা।

শির্ক আবার দু'প্রকার

এক. আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মাখলূক্বকে আল্লাহর সমতুল্য মনে করা এবং তাঁর সাথে সেগুলোর ইবাদত করা। যেমন- পাথর, গাছপালা, চন্দ্র-সূর্য ইত্যাদি।* গ্রহ-নক্ষত্র, ফিরিশ্তা ইত্যাদির বেলায়ও এ ধরনের আক্বীদা পোষণ করা এবং সেগুলোর ইবাদত করা। সর্বাপেক্ষা বড় শির্ক, যা সম্পর্কে মহামহিম আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন-

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ

তরজমাঃ নিশ্চয় আল্লাহ্, তাঁর সাথে কুফর (শির্ক) করার অপরাধ ক্ষমা করেন না এবং কুফরের নিম্ন পর্যায়ের যা কিছু আছে তা যাকে চান ক্ষমা করে দেন।

[সূরা নিসা, আয়াত-৪৮, তরজমা- কান্যুল ঈমান, বাংলা সংস্করণ]।

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন-

اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

তরজমা ঃ নিশ্চয় শির্ক চরম যুল্ম। [সূরা লোক্বমান, আয়াত-১৩, তরজমা- কান্যুল ঈমান]

আল্লাহ্ তা'আলা আরো এরশাদ ফরমান-

اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰهُ النَّارُ

তরজমাঃ নিশ্চয় যারা আল্লাহর সাথে (কাউকে) শরীক সাব্যস্ত করে, তবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন এবং তার ঠিকানা হচ্ছে দোযখ।

[সূরা মা-ইদাহ্, আয়াত-৭২, তরজমা, প্রাগুক্ত]

সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শির্ক করবে, অতঃপর মুশরিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে নিঃসন্দেহে সে জাহান্নামী হবে। যেমনিভাবে, যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ঈমান আনবে এবং মু'মিন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, সে জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত, যদিও (কোন পাপ কাজের জন্য) তাকে সাময়িকভাবে দোযখে শাস্তি দেওয়া হবে।

* এখানে লক্ষ্যণীয় যে, মুসলিম সমাজ নবী-রাসূল ও হক্বক্বানী লোক বা ওলীগণকে আদব ও সম্মান করে থাকেন। ক্বোরআন-হাদীসে এর আদেশ রয়েছে। কেউ তাঁদের ইবাদত করে না। এ আদব-ভক্তিকে 'পূজা' বা শির্ক মনে করা ভিত্তিহীন ও জঘন্য ভুল।

সিহাহ্ সিত্তার হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

اَلَا اُنَبِّئُکُمْ بِاَکْبَرِ الْکَبَآئِرِ (الحديث)

অর্থাৎঃ "আমি কি তোমাদেরকে সর্বাপেক্ষা বড় 'কবীরা গুনাহ' সম্পর্কে অবগত করবো না?" হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এটা তিনবার এরশাদ করেছেন। সাহাবা-ই কেরাম আরয করলেন, "হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল! সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তারপর এরশাদ করলেন-

اَلْاِشْرَاکُ بِاللّٰہِ وَ عُقُوْقُ الْوَالِدَیْنِ

(আল্লাহর সাথে শিরক করা এবং পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া।) ততক্ষণ পর্যন্ত হুযূর হেলান দেওয়া অবস্থায় ছিলেন। এবার সোজা হয়ে বসলেন। অতঃপর এরশাদ করলেন-

اَلَا وَقَوْلَ الزُّوْرِ اَلَا وَ شَہَادَۃَ الزُّوْرِ

(সাবধান, এবং মিথ্যা বলা, সাবধান! মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া থেকে বিরত থাকো।) অতঃপর তিনি এটা এতোবার বলতে লাগলেন যে, (বর্ণনাকারী বলেন) আমরা মনে মনে বলতে লাগলাম, "তিনি যদি ক্ষান্ত হতেন!" [বোখারী ও মুসলিম]

হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

اِجْتَنِبُوْا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ

অর্থাৎ "তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী বস্তু থেকে বেঁচে থাকো।" অতঃপর হুযূর ওইগুলোর মধ্যে 'আল্লাহর সাথে শিরক করার কথা উল্লেখ করেছেন। হুযূর আরো এরশাদ করেছেন-

مَنْ بَدَّلَ دِیْنَہٗ فَاقْتُلُوْہُ

"যে ব্যক্তি ইসলাম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করে, তাকে হত্যা করো।"

[আহমদ ও বোখারী]

শির্কের দ্বিতীয় প্রকার

শির্কের দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে- আমলগুলোতে রিয়া বা লোক দেখানো মনোভাব নিয়ে সম্পন্ন করা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ ফরমায়েছেন-

فَمَنْ کَانَ یَرْجُوْلِقَآءَ رَبِّہٖ فَلْیَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلَا یُشْرِکْ بِعَبَادَۃِ رَبِّہٖ اَحَدًا

তরজমা ঃ সুতরাং যার আপন রবের সাথে সাক্ষাত করার আশা আছে তার উচিত যেনো সে সৎকর্ম করে এবং সে যেনো আপন রবের ইবাদতে অন্য কাউকে শরীক না করে। [সূরা কাহ্‌ফ, আয়াত-১১০, তরজমা- কান্যুল ঈমান, বাংলা সংস্করণ]

অর্থাৎ শির্কে আকবর (বৃহত্তম শির্ক) থেকেও যেনো বাঁচতে থাকে, 'রিয়া' বা লোক দেখানো থেকেও, যাকে 'শির্কে আসগার' (ছোটতর শির্ক) বলা হয়।

[তাফসীর-ই খাযাইনুল ইরফান, পৃষ্ঠা-৫৫৫, বাংলা সংস্করণ]

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

اِیَّاکُمْ وَ الشِّرْکَ الْاَصْغَرَ

অর্থাৎ- তোমরা ছোটতর শির্ক থেকে বেঁচে থাকো)! সাহাবা-ই কেরাম আরয করলেন, "এয়া রসূলাল্লাহ্! ছোটতর শির্ক কি?" হুযূর এরশাদ করলেন, "রিয়া"। অর্থাৎ লোক-দেখানোর উদ্দেশ্যে নেক আমল করা। আল্লাহ তা'আলা ওই দিন বলবেন, যেদিন তিনি বান্দাদের আমলগুলোর প্রতিদান দেবেন-

اِذْھَبُوْا اِلٰی الَّذِیْنَ کُنْتُمْ تَرَآئُوْنَھُمْ بِاَعْمَالِکُمْ فِیْ الدُّنْیَا فَانْظُرُوْا ھَلْ تَجِدُوْنَ عِنْدَھُمْ جَزَاءً

অর্থাৎ (হে রিয়াকার বান্দারা!) দুনিয়াতে তোমরা তোমাদের আমলগুলো যাদেরকে দেখানোর জন্য করছিলে তাদের নিকট যাও! দেখো তাদের নিকট কোন প্রতিদান পাও কিনা!* রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- মহান আল্লাহ হাদীসে ক্বুদ্সীতে এরশাদ করেন-

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً اَشْرَکَ مَعِیْ فِیْہِ غَیْرِیْ فَھُوَا لِّذِیْ اَشْرَکَ وَاَنَا مِنْہُ بَرِیٌٔ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করলো, যাতে আমার সাথে অন্য কাউকে শরীক করলো, তবে সে শির্কই করলো। আমি তার প্রতি অসন্তুষ্ট। [মুসলিম, ইবনে মাজাহ্]

হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান-

مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللّٰہُ بِہٖ مَنْ یُرَائِیْ یُرَآئِیْ اللّٰہُ بِہٖ

অর্থাৎ যে অন্যকে শোনায়, আল্লাহ পাকও তার বেলায় মানুষকে শোনাবেন, যে অন্য কাউকে দেখায়, আল্লাহও তার সাথে সে ধরনের আচরণ করবেন।

[বোখারী ও মুসলিম, রিয়াদ্বুস্ সালেহীন, পৃঃ-৪৮১]

হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

رُبَّ صَآئِمٍ لَیْسَ لَہٗ مِنْ صَوْمِہٖ اِلَّا الْجُوْعُ وَالْعُطْشُ وَرُبَّ قَآئِمٍ لَیْسَ لَہٗ مِنْ قِیَامِہٖ اِلَّا السَّھْرُ

অর্থাৎ এমন অনেক রোযাদার রয়েছে, যার রোযায় ক্ষুধা-পিপাসা ছাড়া আর কিছুই অর্জিত হয় না। আর এমন অনেক রাত জাগরণকারী (রাত জেগে এবাদতকারী)

* ইমাম ইরাকী বলেছেন, ইমাম আহমদ এটা সহীহ সনদ সহকারে হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া, ইমাম বায়হাক্বী 'শু'আবুল ঈমান'এ ইবনে আবিদ্দুনিয়া মাহমূদ ইবনে লাবীদের হাদীস থেকে বর্ণনা করেছেন।ইমাম তাবরানী মাহমূদ ইবনে লবীদ থেকে, তিনি হযরত রাফি'ইবনে খাদীজ থেকে বর্ণনা করেছেন।]

আছে, যাদের রাত জাগা (অনিদ্রা) ছাড়া কোন লাভ হয় না।[ইবনে মাজাহ শরীফ] অর্থাৎ যখন নামায-রোযা মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হয় না, তখন তা'তে তার জন্য কোন সাওয়াব থাকে না।

হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, হুযূর নবী করীম এরশাদ করেছেন-

مَثَلُ الَّذِىْ يَعْمَلُ لِلرِّيَآءِ وَالسُّمْعَةِ كَمَثَلِ الَّذِى يَمْلَأُ كِيْسَهٗ حَصٰى ثُمَّ يَدْخُلُ السُّوْقَ لِيَشْتَرِىَ بِهٖ .... [الحديث]

অর্থাৎ ওই ব্যক্তির উপমা, যে মানুষকে দেখানো ও খ্যাতি অর্জনের জন্য সৎকর্ম করে, সে ওই ব্যক্তির ন্যায়, যে তার থলের মধ্যে কঙ্কর-পাথর ভর্তি করে নেয়, তারপর তা দ্বারা কিছু কেনার জন্য বাজারে প্রবেশ করে। অতঃপর যখন বিক্রেতার নিকট গিয়ে সেটার মুখ খোলে, তখন তো শুধু পাথরই থাকে। আর বিক্রেতা তা তার মুখের উপর ছুঁড়ে মারে এবং তার থলেতে কিছুই থাকে না। মানুষের এ সমালোচনা ব্যতীত 'সেতো তার থলেতে কিছুই ভর্তি করে নি' এবং তাকে এর বিনিময়ে কিছুই দেবে না। অনুরূপ, লোক দেখানো ও খ্যাতি অর্জনের জন্য যে আমল করে, তার জন্য তার আমলের প্রতিদান কিছুই থাকে না- মানুষের কিছু আলোচনা ব্যতীত। আখিরাতে তার জন্য কোন সাওয়াবই নেই।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন-

وَقَدِمْنَا اِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَآءً مَّنْثُوْرًا

তরজমাঃ এবং যা কিছু তারা কাজ করেছিলো আমি ইচ্ছা করে সেগুলোকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধূলি কণার বিক্ষিপ্ত অণু-পরমাণু করে দিয়েছি, যা ভেন্টিলেটরের মধ্য দিয়ে পতিত আলোকরশ্মিতে দৃষ্টিগোচর হয়।

[সূরা ফোরক্বান, আয়াত-২৩, তরজমা- কান্যুল ঈমান, বাংলা সংস্করণ]

অর্থাৎ ওইসব আমল, যেগুলো মহামহিম আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য ব্যতীত সম্পন্ন করা হয়, সেগুলোর সাওয়াব বাতিল করে দিই।

হযরত আদী ইবনে হাতিম তাঈ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়াহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, হুযূর এরশাদ করেছেন-

يُؤْمَرُ بِفِئَامٍ اَىْ جَمَاعَاتٍ مِّنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلَى الْجَنَّةِ حَتّٰى اِذَا دَنَوْا مِنْهَا وَاسْتَنْشَقُوْا رَآئِحَتَهَا وَنَظَرُوْا اِلٰى قُصُوْرِهَا وَاِلٰى مَا اَعَدَّ اللّٰهُ لِاَهْلِهَا فِيْهَا نُوْدُوْا اَنِ اصْرِفُوْهُمْ عَنْهَا فَاِنَّهُمْ لَا نَصِيْبَ لَهُمْ فِيْهَا فَيَرْجِعُوْنَ بِحَسْرَةٍ وَّنَدَامَةٍ مَا

رَجَعَ الْاَوَّلُوْنَ وَالْاٰخِرُوْنَ بِمِثْلِهَا فَيَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا لَوْ اَدْخَلْتَنَا النَّارَ قَبْلَ اَنْ تُرِيَنَا مَا اَرَيْتَنَا مِنْ ثَوَابِ مَا اَعْدَدْتَّ لِاَوْلِيَآئِكَ كَانَ اَهْوَنَ عَلَيْنَا فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى ذٰلِكَ مَا اَرَدْتُّ بِكُمْ ... [الحديث]

অর্থাৎ ক্বিয়ামতের দিন কিছু লোককে জান্নাতে প্রেরণের নির্দেশ দেওয়া হবে। যখন তারা জান্নাতের নিকটবর্তী হয়ে জান্নাতের ঘ্রাণ পাবে এবং জান্নাতীদের প্রাসাদগুলো ও আল্লাহর নি'মাতগুলো অবলোকন করবে, তখন ফিরিশতাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হবে-ওদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। জান্নাতের কোন কিছুই তাদের প্রাপ্য নেই। অতঃপর তারা নিরাশ হয়ে ফিরে যাবে। তারপর তারা বলবে, "হে আল্লাহ! তোমার প্রিয় বান্দাদের জন্য যে নি'মাতগুলো তৈরী করেছো, সেগুলো দেখানোর আগেই যদি আমাদেরকে দোযখে পাঠাতে, তবে তা আমাদের জন্য সহজতর হতো?" তখন আল্লাহ বলবেন, "তোমাদের সাথে আমি এরূপ আচরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। দুনিয়াতে তোমরা যখন একাকী থাকতে তখন কবীরা গুনাহে লিপ্ত হতে। আর যখন মানুষের সাথে মেলামেশা করতে, তখন মুত্তাক্বীদের মতো আমল করতে। এ আমল দিয়ে লোকদের কাছে তোমরা যে মনোভাব প্রকাশ করতে, আমার প্রতি কখনো ওই মনোভাব পোষণ করতে না। তোমরা লোকদের ভয় করতে, আমাকে ভয় করতে না। মানুষের জন্য তোমরা কোন কোন কাজ বর্জন করতে, আমার জন্য নয়, তোমরা মানুষকে সম্মান করতে, আমাকে নয়। তাই আজ আমি তোমাদেরকে আমার মহা প্রতিদান থেকে বঞ্চিত করে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাবো।" [আল-হাদীস]

এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে আরয করলেন, "মুক্তির পথ কি?" রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "তোমরা আল্লাহকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করো না, তবেই মুক্তি পাবে।" প্রশ্নকারী বললেন, "আল্লাহকে কিভাবে ধোঁকা দেওয়া হয়?" রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "তুমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশিত কোন কাজ আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে খুশী করার জন্য করলে তবেই আল্লাহর সাথে ধোঁকা করা হবে।"

হুযূর করীম আরো এরশাদ করেন, "তোমরা লোক দেখানো আমল (কর্ম) করা থেকে বিরত থাকো! কেননা, রিয়া হলো ছোটতর শির্ক। রিয়াকারীকে হাশরের দিনে সকলের সামনে চারটি নামে ডাকা হবে-

يَا مُرَائِىْ يَا غَادِرُ يَا فَاجِرُ يَا خَاسِرُ ضَلَّ عَمَلُكَ وَ بَطَلَ اَجْرُكَ فَلَا اَجْرَ لَكَ عِنْدَنَا اِذْهَبْ فَخُذْ اَجْرَكَ مِمَّنْ كُنْتَ تَعْمَلُ لَهٗ يَا مُخَادِعُ۔

অর্থাৎ ১. হে রিয়াকার! ২. যে বিশ্বাসঘাতক! ৩. হে অবাধ্য,অপরাধী! ৪. হে

ক্ষতিগ্রস্ত! তোমার আমল বাতিল হয়ে গেছে! অতএব, তোমার প্রতিদানও নষ্ট হয়ে গেছে। আমার নিকট তোমার কোন প্রতিদান নেই। হে প্রতারক! [ইবনে আবিদ্দুনিয়া]

আরো বর্ণিত আছে যে, এক বুযুর্গ ব্যক্তিকে বলা হলো, ‘‘ইখলাস কাকে বলে?’’ তিনি বললেন, ‘‘নেক আমলসমূহ নিজের পাপাচারগুলোর ন্যায় গোপন রাখাই হলো ইখলাস (নিষ্ঠা)।’’ পুনরায় কাউকে বলা হলো, ‘‘ইখলাস (নিষ্ঠা)’র উদ্দেশ্য কি?’’ তিনি বললেন, ‘‘কারো প্রশংসায় খুশী না হওয়া।’’ হযরত ফুদ্বায়ল ইবনে আয়ায রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেছেন, ‘‘মানুষের ভয়ে কোন নেক আমল বর্জন করা ‘রিয়া’। আর নিছক মানুষের সন্তুষ্টির জন্য কোন আমল করা শির্ক। আল্লাহর সাহায্যক্রমে, এ দু’টি বিষয় থেকে বেঁচে থাকার নামই ইখ্লাস বা নিষ্ঠা।’’

আল্লাহ পাক আমাদেরকে উভয় প্রকারের শির্ক থেকে হিফাযত করুন! আ-মী-ন!!

[কিতাবুল কাবা-ইর ঃ আল্লামা যাহাবী, পৃষ্ঠাঃ ৮-১১]

এ পর্যন্ত শির্কের সংজ্ঞা। প্রকারভেদ এবং কি কি কারণে শির্ক হতে পারে এবং কোন্ কোন্ আক্বীদা শির্ক নয়-এসব প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। এখন কুফর সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে-

কুফর (کفر)-এর বিবরণ

ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ‘কুফর’ হচ্ছে ‘ঈমান’-এর বিপরীত। সুতরাং ‘কুফর’ সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে ‘ঈমান’ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা দরকার। ঈমান (اِيْمَان) শব্দের আভিধানিক অর্থ ‘সত্য বলে মেনে নেওয়া’। আরবী ‘ঈমান’ (ايمَان) শব্দটি اَمن থেকে গৃহীত। এর অর্থ হচ্ছে ‘নিরাপত্তা’ ও ‘মানসিক প্রশান্তি।’ সত্যায়নের ক্ষেত্রেও কেউ কারো সত্যায়ন করলে সে যার সত্যায়ন করেছে তাকে ‘মিথ্যাবাদ দেওয়া’ ও ‘বিরোধিতা করা’ থেকে চিন্তামুক্ত করে দেয় । আরবী অলঙ্কার শাস্ত্র অনুসারে, ايمَان (ঈমান) শব্দের সাথে ‘بِ’ (বা) অব্যয় পদ সংযোজিত হলে আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে মৌখিক স্বীকারুক্তিও সংযোজিত হয়। কখনো কখনো ‘ঈমান’ শব্দের ব্যবহার ‘নির্ভর করা’ অর্থেও হয়ে থাকে। সুতরাং নির্ভরকারী ব্যক্তিও নিরাপদ ও মানসিক প্রশান্তি লাভ করে থাকে। এ অর্থের ভিত্তিতেই বলা হয়- مَآ اٰمَنْتُ اَنْ اَجِدَ صَحَابَةً অর্থাৎ ‘আমি ভরসা করতে পারছি না যে, আমি সফরসঙ্গীদের পেয়ে যাবো। [তাফসীর-ই বায়দ্বাভীঃ ১ম পারা]

আর শরীয়তের পরিভাষায় ‘ঈমান’ ওই সব বস্তুর সত্যায়নের নাম, যেগুলো নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা’আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত হবার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে জানা যায়। যেমন-‘তাওহীদ’(আল্লাহর একত্ববাদ),‘নুবূয়ত’ ও ‘বি’সাত’ (পুনরুত্থান), হিসাব-নিকাশ এবং প্রতিদান। প্রায়সব মুহাদ্দিস, এমনকি মু’তাযিলা ও

খারেজী সম্প্রদায় দু’টির মতেও শরীয়ত সম্মত পূর্ণাঙ্গ ঈমান হচ্ছে তিনটি জিনিষের সমন্বয়ের নামঃ ১. হৃদয়ের সাথে সত্য কথাগুলো নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করা। ২. মৌখিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া এবং ৩. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা ওইগুলোর দাবী অনুসারে আমল করা। [প্রাগূক্ত]

অবশ্য, অন্তরে বিশ্বাস হচ্ছে- মৌলিক ঈমান আর অবশিষ্ট দু’টি হচ্ছে- মু’মিন হিসেবে তাকে বিবেচনা করার পূর্বশর্ত ও মূল ঈমানের সৌন্দর্য বৃদ্ধিকারী।

সুতরাং যার শুধু আক্বীদা বা বিশ্বাস শুদ্ধ নয় সে মুনাফিক্ব, যার স্বীকারুক্তিতে ত্রুটি আছে সে কাফির-ই মুজাহির (প্রকাশ্য কাফির) আর যার শুধু আমল ঠিক নয়, মৌলিকভাবে বিশ্বাস আছে সে মু’মিন-ই ফাসিক্ব। সুতরাং যার আন্তরিক বিশ্বাস, মৌলিক বিশ্বাস, মৌখিক ঘোষণা এবং আমল বিশুদ্ধ ও যথাযথ সে মু’মিন-ই কামিল। এটা আহলে সুন্নাতের অভিমত। এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, এ তৃতীয় ব্যক্তি (যার প্রথম দু’টি শর্ত বিশুদ্ধ থাকলেও আমল ভাল নয়) সে সর্বসম্মতিক্রমে ফাসিক্ব; কিন্তু এ ‘ফাসিক’ মু’মিন থাকবে কিনা সে সম্পর্কে আহলে সুন্নাতের আক্বীদা হচ্ছে সে মু’মিন থাকবে। খারেজীদের মতে সেও কাফির, আর মু’তাযিলারা বলে সে মু’মিনও থাকবে না, কাফিরও হবে না বরং ‘ফাসিক্ব হওয়া’ একটি পৃথক ও স্বতন্ত্র স্তর। উল্লেখ্য, এ শেষোক্ত দু’টি অভিমতই (খারেজী ও মু’তাযিলাদের) বাতিল। এখানে আহলে সুন্নাতের (প্রথমমোক্ত) অভিমতই বিশুদ্ধ। [প্রাগূক্ত ঃ ১ম পারা]

কুফরের হাক্বীক্বত

কুফরের হাক্বীক্বত বা বাস্তবতা দু’প্রকারঃ ১. আভিধানিক ও ২. পারিভাষিক বা শরীয়তের পরিভাষা সংক্রান্ত।

আভিধানিক হাক্বীক্বত

‘কুফর’ (كفر) শব্দের আভিধানিক অর্থ ستر نعمت (নি’মাতকে গোপন করা)।

[তাফসীর-ই বায়দ্বাভী, ১ম পারা]

বস্তুতঃ নি’মাতকে গোপন করা মানে নি’মাত পেয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করা। অথবা নি’মাতের চর্চা না করা। এতদ্ভিত্তিতে ‘কুফর’ ‘কুফরান’ (كـفـران) -এর সমার্থক। কারণ, ‘কুফরান’ হচ্ছে ‘শুক্র’ (কৃতজ্ঞতা প্রকাশ)-এর বিপরীত।আলোচ্য ‘কুফর’ শব্দটির মূল বা উৎস হচ্ছে كَـــفــــرٌ (কাফরুন)। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে শর্তহীনভাবে গোপন করা। كَفُرٌ থেকে নির্গত করে ‘কৃষক’কে এবং রাতকেও كَافِرٌ (কাফির) বলা যেতে পারে। কারণ, কৃষক ফসলের বীজকে জমির গর্ভে এবং রাত তার অন্ধকাররূপী চাদরের নিচে সমস্ত বস্তুকে ঢেকে নেয়। একইভাবে ফলের ছিলকাকেও একই কারণে এ শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়।

পারিভাষিক হাক্বীক্বত

ইমাম গাযালী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি লিখেছেন, কুফর হচ্ছে-

تَكْذِيبُ الرَّسُوْلِ فِيْمَا جَاءَ بِهٖ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ

অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যেসব বিধান আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ে এসেছেন, ওইসব বিধানে রসূলুল্লাহ্কে অস্বীকার করা।

ক্বাযী বায়দ্বাভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি তাফসীর-ই বায়দ্বাভীতে লিখেছেন-

وَفِي الشَّرْعِ اِنْكَارُ مَا عُلِمَ بِالضَّرُوْرَةِ مَجِيْئُ الرَّسُوْلِ بِهٖ

অর্থাৎ শরীয়তে 'কুফর' বলে ওইসব বস্তুকে অস্বীকার করাকে, যেগুলো সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ওইগুলো নিয়ে এসেছেন।

কুফরের প্রকারভেদ

সহীহ্ বোখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারী আল্লামা কিরমানী বলেছেন, কিছু সংখ্যক বিজ্ঞ আলিম চার প্রকার কুফরের কথা বলেছেন। সুতরাং এ চার প্রকারের মধ্যে কোন এক প্রকার কারো মধ্যে পাওয়া গেলে সে কাফির; সে মাগফিরাত বা আল্লাহর ক্ষমা পাবার উপযোগী নয়-

১. 'কুফর-ই ইন্কার' (অস্বীকারজনিত কুফর)
২. 'কুফরে জুহূদ' (স্বীকারোক্তি প্রত্যাখ্যান জনিত কুফর)
৩. 'কুফর্-ই মু'আনাদাহ্' (গোঁয়ারতুমীজনিত কুফর) এবং
৪. 'কুফর-ই নিফাক্ব' (মুনাফিক্বসুলভ কুফর)।

কুফর-ই ইন্কার (کفر انکار) হচ্ছে- অন্তর ও রসনা উভয়টি দ্বারা অস্বীকার করা। আর দ্বীনের যে কোন বিষয়ই তার সামনে পেশ করা হোক না কেন, সে তা সম্পর্কে অজ্ঞ ও অস্বীকারকারী হয়। যেমন-আরবের প্রকাশ্য কাফিরগণ, যারা প্রকাশ্যভাবে কুফর করতো।

কুফর-ই জুহূদ (کفر جحود) হচ্ছে- অন্তরে তো মা'রিফাত বা পরিচিতি অর্জিত হয়েছে, কিন্তু মুখে স্বীকার করে না। যেমন- ইবলীসের কুফর।

কুফর-ই মু'আনাদাহ্ (کفر معانده) হচ্ছে- অন্তরে মা'রিফাত বা পরিচিতিও অর্জিত হয়েছে, মুখেও স্বীকার করেছে; কিন্তু তা গ্রহণ করে না। যেমন- খাজা আবূ তালিবের কুফর।

কুফর-ই নিফাক্ব (کفر نفاق) হচ্ছে- মুখে তো স্বীকার করে, কিন্তু অন্তর স্বীকার করে না। যেমন- মুনাফিক্বদের কুফর। [কিরমানী শরহে বোখারী]

কুফরী কালাম

ঈমান বিনষ্ট হবার মতোও কিছু কারণ রয়েছে। আল্লামা ক্বাযী সানাউল্লাহ পানিপথী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব 'মা-লা-বুদ্দমিন্হু'র শেষাংশে ফাতাওয়া-ই বোরহানীর বরাতে 'কুফরী বাক্যসমূহ' শিরোনামে এমন কিছু কলেমা বা বাক্য উল্লেখ করেছেন, যেগুলোর কারণে ঈমানদারের ঈমান বিনষ্ট হয়ে যায় এবং সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। মুসলমানদের জন্য সকল প্রকার কুফর থেকে বাঁচা অপরিহার্য। তাই এখানে কুফরী বাক্যগুলোর কিছুটা উল্লেখ করার প্রয়াস পেলাম-

১. আল্লাহ তা'আলারও সৃষ্টির ন্যায় শরীর আছে বলা কুফর।
২. দুনিয়ায় আল্লাহ্র দীদার অসম্ভব বলে মনে করা কুফর। কারণ, এটা ক্বোরআন ও হাদীস অস্বীকারের নামান্তর। অবশ্য প্রত্যেক মু'মিন বেহেশতে আল্লাহর দীদার লাভ করবেন। মি'রাজ শরীফে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর, আল্লাহর দীদার লাভ করা তাঁর বৈশিষ্ট্য ও মু'জিযা ছিলো ।
৩. যদি কেউ বলে, ''অমুক যদি খোদাও হয়ে যায়, তবুও আমি তার কাছ থেকে আমার প্রাপ্য উসূল করে ছাড়বো,'' তবে সে কাফির হয়ে যাবে।
৪. যকি কেউ বলে, ''স্বয়ং আল্লাহ্ তোর সাথে পারে না, আমি কিভাবে পারবো?'' তবে সে কাফির হয়ে যাবে।
৫. যদি কেউ বলে,''আমার জন্য আসমানে খোদা আছে, আর যমীনে আছো তুমি'', তবে সে কাফির হয়ে যাবে।
৬. যদি কারো সন্তান মারা যায়, সে যদি বলে, ''আল্লাহর তার প্রয়োজন ছিলো, তাই তাকে নিয়ে গেছে'' তবে সে কাফির হয়ে যাবে। আর যদি কেউ বলে, ''আল্লাহ তার প্রতি যুল্ম করেছেন'', তবুও সে কাফির হয়ে যাবে।
৭. যদি কোন মযলূম বলে, ''হে খোদা! তুমি তার তাওবা কবূল করো না! তুমি কবূল করলেও আমি করবো না'', তবে সে কাফির হয়ে যাবে।
৮. যদি কোন পাওনাদার বলে, ''আমার ঋণী যদি আল্লাহও হন, তবুও তাঁর কাছ থেকে আমার পাওনা উসূল করে নেবো'', তবে সে কাফির হয়ে যাবে। যদি বলে, ''তিনি যদি পয়গাম্বরও হন, তবুও আমার পাওনা উসূল করে নেবো'', তবুও সে কাফির হয়ে যাবে।
৯. যদি কেউ বলে, ''আল্লাহর হুকুম এমনই'' তখন অন্যজন বললো,''আল্লাহর হুকুম সম্পর্কে আমি কি জানি?'' তবে শেষোক্তজন কাফির হয়ে যাবে। (অবশ্য, অস্বীকার নয়, বরং আফসোস্ করে বললে কাফির হবে না।)

১০. যদি কেউ বলে,“হে আল্লাহ! আমার উপর অত্যাচার করবেন না”, তবে সঠিক অভিমতানুসারে, সে কাফির হয়ে যাবে। কারণ সে আল্লাহর পক্ষে অত্যাচারে বিশ্বাস করলো। এটা কুফর।

১১. যদি কেউ ‘বিস্‌মিল্লাহ্’ বলে মদ্যপান করে কিংবা যিনা-ব্যভিচার করে, তবে সে কাফির হয়ে যাবে। কেউ ‘বিস্‌মিল্লাহ’ বলে হারাম জিনিষ আহার করলেও সে কাফির হয়ে যাবে।

১২. যে ব্যক্তি এ বিশ্বকে নশ্বর (حـــادث) বলতে অস্বীকার করে, মৃত ব্যক্তিদের সশরীরে হাশর হওয়া স্বীকার করে না, আল্লাহ তা‘আলাকে প্রতিটি সৃষ্টির ও সৃষ্টি জগতের অনু-পরমাণূ সম্পর্কে অবগত ও জ্ঞাতা বলে বিশ্বাস করে না কিংবা এ ধরনের ধর্মীয় জরুরী বিষয়গুলো (ضـــروريات دين) কে অস্বীকার করে, তবে সে সর্বসম্মতিক্রমে কাফির হয়ে যাবে।

(উল্লেখ্য, রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দো‘আ কবূল হওয়া ‘যুরুরিয়াতে দ্বীন’ (দ্বীনের জরুরী বিষয়াদি)’র অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং হযরত ওমর ফারূক্ব ও আবূ জাহলের ব্যাপারে রসূল সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দো‘আ সংক্রান্ত বিষয়টিও ‘দ্বীনের জরুরী বিষয়াদি’র অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যদি কেউ মনগড়াভাবে বলে, “হুযূর দো‘আ করেছেন আবূ জাহলের পক্ষে, কিন্তু আল্লাহ তা কবূল না করে কবূল করলেন হযরত ওমর ফারূক্বকে, তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে।)

১৩. যদি কেউ বলে, “যদি অমুক নবী হয়, তবে আমি তার উপর ঈমান আনবো, আল্লাহ যদি আমাকে নামাযের আদেশ করেন, তবুও আমি তা সম্পন্ন করবো না” অথবা বললো, “যদি ক্বেবলা এদিকে হয়, তবে নামায পড়বো না,” তবে সে কাফির হয়ে যাবে।

১৪. যদি কেউ কোন সাক্ষী ছাড়া বিয়ে করে আর বলে, “আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূল বা ফিরিশ্‌তাদের সাক্ষী রেখেছি, তবে সে কাফির হয়ে যাবে। কারণ, সে শরীয়তকে নিয়ে উপহাস করলো। শরীয়ত নিয়ে উপহাস-ঠাট্টা করা কুফর।

১৫. যদি কেউ বলে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম -এর প্রতি অপবাদ দেয় কিংবা তাঁর চুল মুবারককেও অবজ্ঞা করে, তবে সে কাফির হয়ে যাবে।

১৬. যদি কেউ বলে, “হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম শত্রুদের ভয়ে কিছু খোদায়ী বিধান প্রচার করেন নি”, তবে সে কাফির হয়ে যাবে। রাফেযীরা এমনটি বলে থাকে। এমন কথা বলা কুফর।

১৭. যে ব্যক্তির সামনে ওই হাদীস শরীফ বর্ণনা করা হয়, যাতে হুযূর সাল্লাল্লাহু

তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন, “আমার হুজুরা মুবারক ও মিম্বর শরীফের মধ্যবর্তী স্থানটুকু, অথবা আমার ক্ববর শরীফ ও মিম্বর মুবারকের মধ্যবর্তী স্থানটুকু জান্নাতের বাগানগুলো থেকে একটি বাগান” আর ওই লোকটি বলে, “আমি তো শুধু মিম্বর ও কবরই দেখতে পাচ্ছি,অন্যকিছু দেখছি না”, তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। কারণ, তার এ কথা নবী করীমের পবিত্র বাণীর প্রতি ঠাট্টা ও অস্বীকৃতির নামান্তর হলো, যা কুফর বৈ-কিছুই নয়।

১৮. যে ব্যক্তি জেনেশুনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নামে মিথ্যা রচনা করে সে কাফির, দোযখেই তার ঠিকানা।

ইমাম তাবরানী তাঁর ‘আল-আওসাত্ব’-এ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন, একদিন এক ব্যক্তি অবিকল হুযূর সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মতো পোষাক পরে মদীনা মুনারাওয়ায় এক আহলে বায়তের বাড়িওয়ালার নিকট গিয়ে বললো,“হুযূর সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন মদীনা মুনাওয়ারার যে কোন বাড়ীওয়ালাকে তার জন্য একটা ঘর নির্মাণের কথা বলি।” লোকটির কথা শুনে তাঁরা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট লোক পাঠিয়ে বিষয়টি হুযূরকে জানালেন। তখন হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত আবূ বকর ও হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহুমাকে এরশাদ করলেন,“তোমরা তার নিকট যাও। তাকে জীবিত পেলে হত্যা করবে এবং তার মরদেহ আগুনে জ্বালিয়ে ফেলবে। আর যদি তোমরা পৌঁছতে পৌঁছতে সে মারা যায়, আমার মতে, তোমরা তাকে মৃতই পাবে, তাহলেও ওই মরদেহ জ্বালিয়ে ফেলবে।” অতঃপর তাঁরা গেলেন এবং তাকে মৃত অবস্থায়ই খুঁজে পেলেন। কারণ, পূর্ববর্তী রাতে লোকটি প্রস্রাব করতে বের হলে তাকে সাপ দংশন করেছিলো ও সে মারা গিয়েছিলো। সুতরাং তাঁরা তার মরদেহ আগুনে জ্বালিয়ে ফেলেছিলেন। আর ফিরে এসে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে তা জানালেন। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন,“যে ব্যক্তি জেনে শুনে আমার নামে মিথ্যাচার করবে সে যেনো তার ঠিকানা দোযখেই করে নেয়।”

[‘মাওদ্বূ-‘আত-ই কবীর, পৃষ্ঠাঃ ২২-২৩]

(কোন নবীর শানে কটুক্তি করা, সাধারণ উম্মতের সাথে তুলনা করা, আমাদের মতো অন্য দশ জনের মতো মনে করা, দোষে-গুণে মানুষ বলা, পিয়নের মতো ক্ষমতাহীন বলা, নিছক মাটির মানুষ বলা, নামাযে নবীর

খেয়ালকে গরু ও গাধা ইত্যাদির খেয়ালের সাথে তুলনা করা, হুযূরের ইলমে গায়ব বা আল্লাহ প্রদত্ত অদৃশ্য জ্ঞানকে জানোয়ার, পাগল ও শিশুর জ্ঞানের সাথে তুলনা করা, 'খাতামান্নবিয়্যীন' -এর অর্থ সর্বশেষ নবী না বলে 'আফযাল' (শ্রেষ্ঠ নবী) বলা, হুযূরের পবিত্র মীলাদ বা জন্মোৎসবকে কানাইয়্যার জন্মোৎসব ও খ্রিস্টানদের 'খ্রিস্টমাস'-এর সাথে তুলনা করা, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে মৃত নবী বলা এবং নিজের কিংবা অন্যের কল্যাণ সাধনে অক্ষম বলা, বড় ভাইয়ের মতো বলা, আল্লাহ মিথ্যা বলতে পারেন বলা, শয়তান ও মালাকুল মওতের জ্ঞানকে হুযূরের জ্ঞান অপেক্ষা বেশী বলা, নবীর নিকট দেয়ালের পেছনের জ্ঞান নেই বলা, হুযূর দেওবন্দে উর্দু শিখেছেন বলা, আল্লাহ তা'আলা হুযূরের মতো কোটি কোটি 'মুহাম্মদ' পয়দা করে নেবেন বলা, হুযূর ইন্তিকালের পর মাটিতে মিশে গেছেন বলা, নবী প্রতিটি মিথ্যা থেকে পবিত্র ও মা'সুম হওয়া জরুরী নয় বলা, নবীর প্রশংসাকে মানুষের মতো, বরং আরো সংক্ষিপ্ত করতে বলা, নবীকে আল্লাহর মর্যাদার সামনে চামার অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলা, নবীকে 'তাগূত' (শয়তান) বলা জায়েজ বলে মন্তব্য করা, নবীর মর্যাদা উম্মতের মধ্যে গ্রামের চৌধূরী ও জমিদারের মত মনে করা, নবী ও ওলীকে ইখতিয়ারবিহীন বলা, আমলের ক্ষেত্রে উম্মত নবী অপেক্ষাও বেড়ে যায় বলা, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে পুলসেরাত থেকে রক্ষা করার দাবী করা, 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ্ আশ্রফ আলী রসূলুল্লাহ বলা' ও সেটাকে সমর্থন করা, হুযূরকে দাজ্জালের বৈশিষ্ট্যের সাথে তুলনা করা, আল্লাহর সামনে সমস্ত নবী, ওলী একটা নাপাক ফোঁটা অপেক্ষাও নগণ্য বলা, দুরূদ-ই তাজের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা, মীলাদ শরীফ, মি'রাজ শরীফ, ওরশ শরীফ, খতম শরীফ, ৪০তম ফাতিহা খানী ও ইসালে সাওয়াবকে না-জায়েয, বিদ'আত ও হিন্দুদের প্রথা বলে মন্তব্য করাও বে-ঈমানীর নামান্তর। যেহেতু এসব উক্তি আল্লাহ, রসূল ও নবী-ওলীর শানে জঘন্যতম মানহানিকর।)

১৯. যদি কেউ বলে,''যদি ফিরিশ্‌তা বা পয়গাম্বরও বলেন যে, তোমার কাছে রূপা নেই, তবুও আমি বিশ্বাস করবো না'', তবে সে কাফির হয়ে যাবে। কারণ, সে নবীর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করলো।

২০. যদি কেউ বলে, ''হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম গম না খেলে আমরা হতভাগা হতাম না'', তবে সে কাফির হয়ে যাবে।

২১. শায়খাঈন অর্থাৎ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব ও হযরত ওমর ফারূক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমাকে কেউ গালি দিলে সে কাফির হয়ে যাবে।

২২. যদি কেউ বলে, ''নখ কাটা সুন্নাত'', তখন অপরজন বললো, ''তা যদিও

সুন্নাত তবুও আমি করবো না'' তবে সে কাফির হয়ে যাবে।

২৩. কেউ কাউকে বললো, ''নামায সম্পাদন করো'', জবাবে সে বললো, ''তুমি এতো নামায পড়ে কী পেয়েছো?'' অথবা বললো, ''আমি এতো নামায পড়েও কী পেলাম?'' তবে সে কাফির হয়ে যাবে।

২৪. যদি কেউ কাউকে বলে,''তুমি কাফির হয়ে গেছো, সে জবাবে বললো, ''আমাকে তোমার ধারণার ন্যায় কাফির ধরে নাও!'' তবে সে কাফির হয়ে যাবে।

২৫. যদি কেউ বলে,''আমার কাছে আল্লাহর চেয়ে নারী বেশী প্রিয়, তবে সে কাফির হয়ে যাবে। বিবাহিত হলে তার স্ত্রী তালাক্ব হয়ে যাবে। এরপর সে পুনরায় ঈমান গ্রহণ ও তাওবা ইত্যাদি করে নিলে, তারপর তার স্ত্রীর সাথে পুনরায় আক্বদ করে বিবাহ নবায়ন করতে হবে। অবশ্য কোন মুসলমান কোন কারণে কাফির হয়ে গেলে তার বেলায়ও এ বিধান প্রযোজ্য।

২৬. যদি কেউ বলে, ''খেলা-তামাশা আমাকে নামায-রোযা থেকে বিরত রেখেছে'', তবে সে কাফির হয়ে যাবে।

২৭. যদি কেউ বলে, ''তুমি কিছু দিন নামায পড়ো তবে বিরক্তি ও কষ্টের প্রেক্ষিতে বে-নামাযী হলে কী-স্বাদ তা অনুভব করতে পারবে,'' তবে সে কাফির হয়ে যাবে।

২৮. যদি কেউ বলে, ''ওলামা-ই দ্বীনের কাজও এটি, আর কাফিরদের কাজও একই।'', তবে সে কাফির হয়ে যাবে। অবশ্য যদি কোন নির্দিষ্ট আলিমের কোন মন্দ কর্মের প্রতি উদ্দেশ করে,পাইকারীভাবে ওলামা-ই দ্বীনের প্রতি অবজ্ঞার উদ্দেশ্য ছাড়া এমন কথা বলে তবে সে কাফির হবে না।

২৯. যদি কেউ কোন বিবাহিত মহিলাকে কুপরামর্শ দিতে গিয়ে বলে, ''তুমি মুরতাদ্দ হয়ে যাও; তবে তুমি তোমার স্বামী থেকে পৃথক হয়ে যেতে পারবে'', তবে এ পরামর্শদাতা কাফির হয়ে যাবে।

৩০ নিজের জন্য কিংবা অপরের জন্য কুফরীকে পছন্দ করাও কুফর।

৩১. কেউ মদপানের আসরে উচ্চাসনে বসে বক্তার ন্যায় হাস্যরস করলো, আর অন্যরা শ্রোতার ন্যায় বসে তার কথার সমর্থনে হেসে উঠলো, তবে এরা কাফির হয়ে যাবে। কারণ তারা সকলে জেনেশুনে গুনাহকে সমর্থন করলো ও হারাম কাজে উৎসাহ দিলো। যদি কেউ গলায় পৈতা ঝুলায় কিংবা কাফিরদের বিশেষ পোষাক পরে, তবে সে কাফির হয়ে যাবে। [কাযী বায়দ্বাভী, কৃত. তাফসীর-ই-বায়দ্বাভী] অবশ্য, যদি কেউ কাফিরদের অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য নিজের ঈমান ঠিক রেখে বাহ্যিকভাবে এমনটি করে, তবে কাযী আবূ হাফসের মতে কাফির হবে না, কিন্তু যদি ব্যবসায় উন্নতি কিংবা অন্য কোন স্বার্থে এমনটি করে, তবে সে কাফির হয়ে যাবে। ইত্যাদি।

এক মহা ভ্রান্তধারণা ‘পুনর্জন্মবাদ’ বা ‘জন্মান্তরবাদ’ [Transmigration of Souls]

এক শ্রেণীর অমুসলিমের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় যে, তারা বলে- ‘জনমে জনমে’, ‘কোন্ জনমে’, ‘প্রত্যেক জনমে’ ইত্যাদি। এটা একটা জঘন্য ভ্রান্ত ও শিরকী আক্বীদা। তাদের এ ভ্রান্ত আক্বীদা বা বিশ্বাসের নাম **تناسخ** (তানাসুখ) বা পুনর্জন্মবাদ কিংবা জন্মান্তরবাদ। এর অর্থ হচ্ছে জীবাত্মা এক শরীর থেকে অন্য শরীরে পৃথিবীতে স্থানান্তরিত হয় বলে বিশ্বাস করা।

[শরহে মাওয়াক্বিফ, আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব, শরহে আক্বাইদে নাসাফী, ক্বাওয়াইদুল ফিক্বহ]

এমন বিশ্বাস কালের বিবর্তনের এক পর্যায়ে এসে প্রাচীন জাতিপুঞ্জের হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে প্রসার লাভ করেছে। [প্রাগুক্ত]

এমন আক্বীদায় বিশ্বাসীরা হলো ওইসব সম্প্রদায়, যারা ধারণা করে যে, মৃত্যুর পর মানবাত্মা পূর্ববর্তী জীবদেহের চাইতে যথাক্রমে উঁচু কিংবা নিম্ন পর্যায়ের জীব দেহে স্থানান্তরিত হয়। দার্শনিকদের মতে, জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসীরা হচ্ছে এমন এক সম্প্রদায়, যাদের ধারণা হচ্ছে- মানুষ তার জীবদ্দশায় ‘পূর্ণাঙ্গ আত্মা’ (**نفوس كاملة**) অর্জনে সক্ষম হয় কিংবা সক্ষম হয় না। তাতে সক্ষম না হলে আত্মা অসম্পূর্ণ (**نفس ناقصه**) থেকে যায়।

যদি ‘নাফ্স-ই কামিলাহ’ (পূর্ণাঙ্গ আত্মা) অর্জিত হয়, তবে তা ব্যক্তির মধ্যে সর্বগুণে পূর্ণাঙ্গতা লাভের পর তার তিরোধানের সাথে সাথে তা দেহ থেকে বের হয়ে **عالم قدس** (পবিত্রাত্মার জগতে) এ দেহের সংমিশ্রণ ছাড়াই বাস করে। তখন দেহের সংমিশ্রণের কোন প্রয়োজনীয়তা তার থাকে না। এ মতবাদকে ‘নির্বানবাদ’ (**اَلْمُجَرَّدُ عَنِ الْعَلاَئِقِ الْجِسْمَانِيَّة**) বলে। আর মানুষের ‘অসম্পূর্ণ আত্মা’ (**نفوس ناقصه**), যা দেহে থাকাকালীন সময়ে পূর্ণতায় পৌঁছতে পারে নি, সেগুলোও বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় তিরোধানের পর পূর্ণতা লাভের জন্য প্রচেষ্টারত থাকে। প্রাচীন হিন্দু সম্প্রদায় এ ‘জন্মান্তরবাদ’-এ বিশ্বাসী। যেমন কবি জীবনানন্দদাস তার এমন বিশ্বাসকে নিম্নলিখিত কবিতায় প্রকাশ করেছেন-

আবার আসিব ফিরে,
ধান সিঁড়িটির তীরে।
এই বাংলায়;
হয়ত বা মানুষ নয়
শঙ্খ ছিল,
শালিকের বেশে।

উক্ত কবির ধারণা- মানুষ বক, শালিক, শঙ্খ, চিল হয়ে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসবে। উল্লেখ্য যে, এসব কুধারণা ইসলামী শাস্ত্রবিদদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এখানে আরো উল্লেখ্য যে, নবী, ওলী, গাউস, কুত্বব, আবদাল ও শহীদগণ ইন্তিকালের পর আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতা বলে সৃষ্টি জগতের কল্যাণ সাধন করতে সক্ষম। অন্য কোন আকৃতি ধারণ করে পৃথিবীতে পুনর্জন্ম লাভ করার তাঁদের কোন প্রয়োজন নেই। এমন কোন নিয়মও ইসলামে স্বীকৃত নয়।

জন্মান্তরবাদীরা আরো বলে থাকে-

এক. মানবাত্মা নিঃশেষ হয় না। কারণ তাদের মতে, নিঃশেষ হবার জন্য তা দেহের সাথে সংমিশ্রিত থাকা অপরিহার্য। যেহেতু মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে, তখন আত্মা দেহ থেকে পৃথক হয়ে যায়; সংমিশ্রিত থাকে না, সেহেতু তাই তা আর ফানা বা নিঃশেষও হয় না। (এখানে দেহের সাথে আত্মার সংমিশ্রণের শর্তটি ইসলামী আক্বীদার বিরোধী।)

দুই. তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে, আত্মা ও দেহের পুনরুত্থান (**البعث**) হবে না। (নাউযুবিল্লাহ!) কেননা, তাদের ধারণা মতে- কোন বস্তুর পুনঃসৃষ্টি হবার জন্য এর অংশ বিশেষ (**اجزاء**) অবশিষ্ট থাকা প্রয়োজন। অথচ **بسيط** (একক বস্তু) তথা আত্মা ফানা হবার পর অবশিষ্ট থাকে না। দেহও বিলীন হয়ে যায়। সুতরাং তাদের মতে আত্মা ও দেহ কোনটাই পুনরুত্থিত হবে না।

তিন. তারা বলে, মানবাত্মা পূর্ণতা লাভের জন্য দেহ বর্জিত হয়ে অন্যান্য আকৃতি ধারণ করে।

খণ্ডন

ওইসব ক'টি মতবাদই মনগড়া ও ভ্রান্ত; বরং আল্লাহ ও তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ সম্পর্কে যা বলেছেন তা-ই বাস্তব ও সত্য। ইসলাম বলে- পবিত্র ক্বোরআনের ভাষায়, রূহ যেহেতু আল্লাহর হুকুম (**امر رب**), সেহেতু রূহের মৃত্যু হয় না, বিলুপ্তও হয় না। কিন্তু মানব দেহ, এমনকি সব কিছুই ধ্বংসপ্রাপ্তও হতে পারে। (অবশ্য, কারো কারো দেহও অবিকৃত থাকে।) মহান স্রষ্টার কুদরতে ক্বিয়ামতে পুনরায় সবাই সৃষ্টিও হবে। সর্বশক্তিমান আল্লাহর জন্য কোন উপায়-উপকরণের প্রয়োজন হয় না। এ প্রথমোক্ত বিষয়ের প্রমাণ হচ্ছে এ আয়াতগুলো-

১.আল্লাহ তা'আলা এরশাদ ফরমায়েছেন-

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ

তরজমাঃ সব কিছু ধ্বংস হবে, কিন্তু ধ্বংস হবে না আল্লাহর পবিত্র সত্তা।

২. অন্য আয়াতে এরশাদ হচ্ছে-

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَّ يَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُوالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

তরজমাঃ অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠের উপর যতকিছু আছে সবই নশ্বর এবং চিরস্থায়ী স্থায়ী হবেন আপনার প্রতিপালকের সত্তা, যিনি মহামহিম ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ।

[৫৫:২৬-২৭]

এবার শেষোক্ত বক্তব্যের (পূনরুত্থান) পক্ষে প্রমাণ হচ্ছে নিম্নলিখিত আয়াতগুলো-

১. ثُمَّ اَنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُوْنَ

তরজমাঃ অতঃপর তোমরা ক্বিয়ামতের দিন পুনরুত্থিত হবে।

২. قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِىْ اَنْشَأَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ

তরজমাঃ আপনি বলে দিন, সেগুলো তিনিই জীবিত করবেন, যিনি প্রথমবারে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। [৩৬:৭৯]

৩. كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُهٗ

তরজমাঃ যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছি তেমনিভাবে তাকে পুনরায় সৃষ্টি করবো।

মৃত্যুর পর রূহ অন্য শরীরে মানুষের হোক, কিংবা পশুর হোক, স্থানান্তরিত হয়ে পুনরায় দুনিয়ায় আসে বলে বিশ্বাস করা, যাকে ‘পুনর্জন্মবাদ’ বা ‘জন্মান্তরবাদ’ বলা হয়, সম্পূর্ণ ভুল। এমন বিশ্বাস কুফর।

বস্তুত মৃত্যুর পর রূহ অন্য কোন শরীরে যায় না বরং সেটার পূর্ববর্তী শরীরের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে, যদিও মৃত্যুর কারণে তা শরীর থেকে পৃথক হয়ে যায়, তবুও ‘বরযখ’ বা কবর জগতে শরীরের উপর যা ঘটে তা রূহ বা আত্মা অনুভব করে।

মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির মর্যাদানুসারে তার রূহ ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় থাকে। মুসলমানের রূহ তার মর্যাদানুসারে বিভিন্ন জায়গায় থাকে। কতেক থাকে কবরে, কতেক ঝমঝম কুপের নিকট, কতেক আসমান-যমীনের মধ্যখানে, কতেক বিভিন্ন আসমানে; এমনকি কতেক সপ্তম আসমানেও স্থান পায়। কতগুলো আবার আসমানগুলোর উপরেও। কারো কারো রূহ আরশের নীচে আলোকবর্তিকার মধ্যে, করো কারো ‘আ’লা-ই ইল্লীয়্যীন’-এর মধ্যে অবস্থান করে। তবে যেখানেই থাকুক না কেন, তার শরীরের সাথে সম্পর্ক যথারীতি বজায় থাকে। কবরের পাশে কেউ আসলে তাকে চিনে, তার কথা শুনে, অথচ রূহ কবরের পাশে থাকার বা যাবার দরকার নেই। রূহের জন্য নিকটে ও দূরে এক সমান। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে- মুসলমানের রূহ তার জীবদ্দশায় পাখীর মতো দেহের পিঞ্জরায় আবদ্ধ ছিলো। মৃত্যুর পর তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

পক্ষান্তরে, কাফিরদের দুষ্ট আত্মাগুলোর কিছু সংখ্যক থাকে কবরে, চিতা বা শশ্মানে,

আর কিছু থাকে ইয়েমেনের বরহুত নামক নালায়। আর কতেক থাকে যমীনের বিভিন্ন স্তরে। কতেক থাকে সর্বনিম্নস্থান সিজ্জীনে। সেগুলো ও তাদের কবর, চিতা বা শশ্মানের পার্শদিয়ে যাতায়তকারীদেরকে দেখে, চিনে ও কথা শুনতে পায়। কিন্তু তার রূহ মৃত্যুর পরও পাখীর মতো পিঞ্জরাবদ্ধই থেকে যায়, কোথাও যাবার ক্ষমতা রাখে না।

আরো উল্লেখ্য যে, মৃত্যু মানে শরীর থেকে রূহ পৃথক হয়ে যাওয়া। অবশ্য রূহের মৃত্যু হয় না, রূহ বিলুপ্ত হয়ে যায় বলে ধারণাকারী বদ-আক্বীদাসম্পন্ন।

আরো উল্লেখ থাকে যে, আল্লাহর ইচ্ছাক্রমে দেহের সাথে রূহ একত্রিত হয়ে দুনিয়ায় পয়দা হয়ে প্রকাশ্যভাবে আমল করার সুযোগ শুধু একবারই হয়। পুনরায় কখনো হয় না। বরযখের আমলের যেমন সাওয়াব নেই, তেমনি সেটা দুনিয়াবী আমল হিসেবেও গণ্য নয়। অবশ্য, কেউ দুনিয়ার মতো কোন নেক কাজের সুযোগ লাভ করলে তা দ্বারা তিনি ইবাদতের তৃপ্তি পান । আল্লাহ প্রতিটি মানুষকে পুনরায় জীবিত করে ক্বিয়ামতে পুনরুত্থিত করবেন। এটাই ইসলামী আক্বিদা, এটাই সত্য। এতদ্ব্যতীত ‘জন্মান্তরবাদ’ ইত্যাদি হিন্দুয়ানী কুফরী ধারণা, বাতিল ও মনগড়া।

ঈমানের সপ্ত স্তম্ভ

১. الايمان بالله (আল্লাহতে ঈমান বা বিশ্বাস)

২. الايمان بالملائكة (ফিরিশ্‌তাতে বিশ্বাস)

৩. الايمان بالكتب (আসমানী কিতাবাদিতে বিশ্বাস)

৪. الايمان بالرسل (রসূলগণে বিশ্বাস)

৫. الايمان باليوم الاخر (শেষ দিবসে বিশ্বাস)

৬. الايمان بالقدر (অদৃষ্টে বিশ্বাস) এবং

৭. الايمان بالبعث بعد الموت (মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত ও উত্থিত হওয়ায় বিশ্বাস)

ঈমানের সপ্ত স্তম্ভের বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হলো

ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইসলামের পঞ্চ বুনিয়াদের প্রথম ও প্রধান বুনিয়াদ হচ্ছে ‘ঈমান’। ‘ঈমান’ আরবী শব্দ। এর অর্থ অন্তরের বিশ্বাস, শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান। [লিসানুল আরব]

শরীয়তের পরিভাষায় ঈমানের অর্থ বিজ্ঞ আলিমগণ বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। মুহাক্বক্বিক্ব আলিমগণ শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে যে সংজ্ঞা উল্লেখ করেছেন তা হলো-‘রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা’আলা আলায়হি ওয়াসালাম কর্তৃক আনীত সকল বিষয়, যা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত, বিস্তারিত হোক বা সংক্ষিপ্ত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

তা'আলা আলায়হি ওয়াসালাম-এর প্রতি আস্থাশীল হয়ে মনে-প্রাণে সেগুলোর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করাকে ঈমান বলে। [ক্বাওয়াইদুল ফিক্বহ, কৃত-মুফতি আমীমুল ইহসান]

অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে সাথে মুখে উচ্চারণ করাও ঈমানের অঙ্গ। মোটকথা, অন্তরের বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকারোক্তি এবং ইসলামের বিধানানুসারে আমল করা-এ তিনের সমন্বয়ে ঈমান। [শরহে আক্বীদা-ই তাহাভিয়াহ]

ঈমানের সাতটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। পবিত্র ক্বোরআন মজিদে ঈমানের বিষয়গুলো একসাথে বর্ণিত হয়নি। বিভিন্ন স্থানে এর বর্ণনা রয়েছে। যেমন ক্বোরআন মজীদের এক আয়াতে এরশাদ হয়েছে-

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ

তরজমাঃ রসূল ঈমান এনেছেন সেটার উপর, যা তাঁর রবের নিকট থেকে তাঁর উপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং মু'মিনগণও। সবাই ঈমান এনেছে আল্লাহর উপর, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর ফিরিশ্তাগণ এবং তাঁর রসূলগণের উপর। [২:২৮৫]

তাক্বদীর সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে-

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَ لَا فِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِىْ كِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا

তরজমাঃ পৌঁছেনা কোন মুসীবত পৃথিবীতে এবং না তোমাদের নিজেদের প্রাণগুলোতে কিন্তু তা একটা কিতাবের মধ্যে রয়েছে এরই পূর্বে যে, সেটাকে আমি সৃষ্টি করি। [সূরা হাদীদ, আয়াত-২২, তরজমা- কানযুল ঈমান]

ক্বিয়ামত ও পুনরুত্থান সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে-

وَاَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ

তরজমাঃ এবং এ জন্য যে, ক্বিয়ামত আগমনকারী, এতে কোন সন্দেহ নেই এবং এ যে, আল্লাহ উঠাবেন তাদেরকে, যারা কবরে রয়েছে। [সূরা হজ্জ, আয়াত-৭,তরজমা- কানযুল ঈমান]

হাদীস-ই জিব্রাঈলে হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে ঈমানের মৌলিক বিষয়গুলো এভাবে বর্ণিত হয়েছে-

مَا الْاِيْمَانُ قَالَ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ

অর্থাৎ-ঈমান কি? বললেন, বিশ্বাস করা আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতাগণ, তাঁর কিতাবগুলো, তাঁর রসূলগণ এবং শেষ দিবসে এবং তোমরা বিশ্বাস রাখবে তাক্বদীরের ভাল ও মন্দের উপর। [বোখারী শরীফ]

আমলের চেয়ে ঈমানের গুরুত্ব বেশী

তাক্বওয়া-পরহেযগারী সব কিছুই ঈমানের উপর নির্ভরশীল। পবিত্র ক্বোরআনের দর্শন মতে ঈমানদার ব্যক্তিই পরহেযগার ও সৎকর্মশীল। পবিত্র ক্বোরআন মজীদে আরো এরশাদ হয়েছে-

وَالَّذِىْ جَآءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهٖٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ

তরজমাঃ এবং যিনি এ সত্য নিয়ে তাশরীফ এনেছেন এবং যারা তাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে, তারাই খোদাভীতি সম্পন্ন। [সূরা যুমার, আয়াত-৩৩, তরজমা- কানযুল ঈমান]

ইসলামের দৃষ্টিতে ঈমানই হচ্ছে আমলের মূল ভিত্তি। যে কাজটি ঈমানের ভিত্তিতে সম্পাদিত হবে, তাই হচ্ছে তাঁর দৃষ্টিতে মূল্যবান এবং গুরুত্বপূর্ণ। যেখানে মূলতঃ ঈমানের কোন অস্তিত্ব নেই, সেখানে সকল আমলই হচ্ছে নিস্ফল ও অর্থহীন।

পবিত্র ক্বোরআন মজীদে আরো এরশাদ হয়েছে-

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ

তরজমাঃ নিশ্চয় যারা বলেছে, 'আল্লাহ আমাদের রব', অতঃপর অটল রয়েছে, তাদের উপর ফিরিশ্তা অবতীর্ণ হয়। [সূরা হা-মী-ম, আয়াত-৩০]

১. ঈমান বিল্লাহ : আল্লাহর উপর ঈমান

ঈমান বিল্লাহ বা আল্লাহর প্রতি ঈমানই হচ্ছে ঈমানের মৌলিক বস্তু। ঈমানের বাকী যত দিক বা বিভাগ আছে তা ওই এক মূলকান্ডের শাখা/প্রশাখা স্বরূপ।

[শরহে আক্বিদা-ই তাহাভীয়াহ]

ইসলামের যত মৌলিক বিধি-বিধান আছে তা এ উৎস থেকেই শক্তি সঞ্চয় করে থাকে। আল্লাহর প্রতি ঈমানের সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ -এর উপর আন্তরিক বিশ্বাস এবং মৌখিক স্বীকৃতির মাধ্যমে সেটা প্রমাণ করা। আর এ কারণে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে- مَنْ قَالَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ অর্থাৎ যে ব্যক্তি (আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে) লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ (কলেমা) বলবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[মিশ্কাত শরীফ]

২. ফিরিশ্তাদের প্রতি ঈমান

মহান আল্লাহর প্রতি ঈমানের পর ফিরিশ্তাদের প্রতি ঈমান আনা ফরয। ফিরিশ্তাগণ মহান আল্লাহর এক সম্মানিত বিশেষ সৃষ্টি। তাঁদেরকে আল্লাহ তা'আলা নূর দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তাঁরা অত্যন্ত জ্যোতির্ময় সূক্ষ্মদেহের অধিকারী। তাঁদের নিজেদের আকৃতি আছে। তবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করার ক্ষমতাও আল্লাহ তাঁদেরকে দিয়েছেন। তাঁরা পুরুষও নন, নারীও নন। তাঁদের কোন সন্তান-সন্ততিও নেই। তাঁরা অদৃশ্য, পানাহার ও নিদ্রামুক্ত। [শরহে ফিক্বহে আকবর]

ফিরিশ্তাগণ সকলেই নিষ্পাপ। তাঁরা আল্লাহর নাফরমানী করেন না। যাঁকে যে কাজে নিযুক্ত করা হয় তিনি যথাযথভাবে সে দায়িত্ব পালন করেন। বিন্দুমাত্র নাফরমানীও করেন না।

ক্বোরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন-

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ وَ مِيْكَالَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ

তরজমাঃ যে কেউ শত্রু হয় আল্লাহর, তাঁর ফিরিশ্তাদের, তাঁর রসূলগণের, জিব্রাঈলের এবং মীকাঈলের, তবে আল্লাহ কাফিরদের শত্রু।

[সূরা বাক্বারা, আয়াত-৯৮, তরজমা-কানযুল ঈমান]

ফিরিশ্তাগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য

আল্লাহ তা'আলা চারজন ফিরিশ্তাকে ফিরিশ্তাকুলের প্রধান বানিয়েছেন। তাঁরা হলেন-

এক. হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম। তাঁর প্রধান কাজ হল আল্লাহ তা'আলার বাণীসমূহ নবী ও রসূলগণের কাছে পৌঁছানো। তা ছাড়া আল্লাহ যখন যা নির্দেশ করেন তা কর্তব্যরত ফিরিশতাগণের কাছে পৌঁছানো।

দুই. হযরত ইসরাফীল আলায়হিস্ সালাম। তাঁর দায়িত্ব হলো ক্বিয়ামতের পূর্বক্ষণে আল্লাহর নির্দেশে সিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া। তিনি মোট দু'বার ফুৎকার দেবেন।

তিন. হযরত মীকাঈল আলায়হিস্ সালাম। তাঁর দায়িত্ব হলো সৃষ্টি জগতের জন্য বৃষ্টি-বাদল পরিচালনা করা এবং খাদ্যদ্রব্যের ব্যবস্থা করা।

চার. হযরত আযরাঈল আলায়হিস্ সালাম। ক্বোরআন ও হাদীস শরীফে তাঁকে 'মালাকুল মাওত' বলা হয়েছে। তাঁর দায়িত্ব হলো রূহ কব্জ করা।

আল্লাহ তা'আলার অগণিত ফিরিশ্তার মধ্যে মুনকার ও নকীর অন্যতম। তাঁরা মানুষের মৃত্যুর পর কবরে সাওয়াল-জাওয়াবের দায়িত্ব পালন করেন।

উল্লেখ্য, অন্যান্য অগণিত ফিরিশ্তা আল্লাহর নির্দেশ পালন ও তাঁর ইবাদত বন্দেগীতে রত আছেন।

৩. আসমানী কিতাবগুলোর উপর ঈমান

ইসলামের পরিভাষায় 'কিতাব' বলতে বুঝায় এমন গ্রন্থকে, যা মানব জাতির হিদায়ত তথা পথ নির্দেশের জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ হতে নবী-রসূলের উপর যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত আবূ যর গিফারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত হাদিস শরীফ থেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হতে জানা যায়-হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম হতে আরম্ভ করে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত মোট ১০৪ খানা কিতাব ও সহীফা নাযিল হয়েছে। এর মধ্যে চারটি প্রধান-

এক. তাওরীত, যা হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম-এর উপর নাযিল হয়েছে।

দুই. যাবূর, যা হযরত দাউদ আলায়হিস্ সালাম-এর উপর নাযিল হয়েছে।

তিন. ইন্জীল, যা হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম-এর উপর নাযিল হয়েছে।

চার. ক্বোরআন মজিদ, যা নাযিল হয়েছে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উপর। অবশিষ্ট ১০০খানা সহীফার মধ্যে ১০ খানা নাযিল হয়েছে হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম-এর উপর। ৫০ খানা হযরত শীস্ আলায়হিস্ সালাম-এর উপর, ১০ খানা হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম -এর উপর এবং ৩০ খানা নাযিল হয়েছে হযরত ইদরীস আলায়হিস্ সালাম-এর উপর। [তাফসীরে কবীর ঃ ইমাম রাযী]

ক্বোরআন মজীদের শুরুতে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন-

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ

তরজমাঃ এবং তারাই (মুত্তাক্বী), যারা ঈমান আনে সেটার উপর, যা হে মাহবূব! আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা আপনার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে।

[সূরা বাক্বারা, আয়াত-৪, তরজমা- কানযুল ঈমান।]

তবে আসমানী কিতাবগুলোর মধ্যে অনেক কিতাব এখন অনুপস্থিত। আর যেগুলো বর্তমানে পাওয়া যায়, সেগুলোর মধ্যে পবিত্র ক্বোরআন ছাড়া আর কোন কিতাবই মূল ভাষা ও অর্থে সুরক্ষিত নেই।

৪. নবী-রসূলগণের উপর ঈমান

আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির হিদায়তের জন্য যুগে যুগে নবী ও রসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। ইসলামের মৌলিক বিধানের মধ্যে নবী-রসূলগণের উপর ঈমান আনা অন্যতম। আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম হতে আরম্ভ করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত অসংখ্য নবী ও রসূল প্রেরণ করেছেন। পবিত্র ক্বোরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে-

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَ مِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ

তরজমাঃ এবং নিশ্চয় আমি আপনার পূর্বে রসূল প্রেরণ করেছি, যাদের মধ্যে কারো অবস্থাদি আপনার নিকট বর্ণনা করেছি এবং কারো কারো অবস্থাদি বর্ণনা করি নি। [সূরা মু'মিন, আয়াত-৭৮, তারজমা- কানযুল ঈমান]

আল্লাহ তা'আলা তাঁর স্বীয় সত্তার উপর ঈমান আনার সাথে সাথে নবী ও রসূলগণের উপর ঈমান আনার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। পবিত্র ক্বোরআনে এরশাদ হয়েছে-

كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَانُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ

অর্থাৎ-সবাই মেনে নিয়েছে আল্লাহ, তাঁর ফিরিশ্তাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ এবং তাঁর রসূলগণকে একথা বলে যে, 'আমরা তাঁর কোন রসূলের উপর ঈমান আনার মধ্যে তারতম্য করি না।' আর আরয করেছে, 'আমরা শুনেছি ও মান্য করেছি।' তোমার ক্ষমা হোক হে আমাদের রব এবং তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

[সূরা বাক্বারা, আয়াত-২৮৫, তরজমা- কানযুল ঈমান]

(এ বিষয়ে রেসালত অংশে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।)

৫. তাক্বদীরের উপর ঈমান

তাক্বদীরের উপর ঈমান রাখা ইসলামের মূল আক্বীদাসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্র উপর ঈমান আনা যেমন ফরয তেমনি তাক্বদীরের উপর ঈমান আনাও ফরয। ক্বোরআন মজিদে এরশাদ হয়েছে-

وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا

তরজমাঃ তিনি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করে সঠিক পরিমাণে রেখেছেন।

[সূরা ফোরক্বান, আয়াত-২, তরজমা- কানযুল ঈমান]

আল্লাহ্র ইলম বা জ্ঞান 'আযলী' (অনাদি), তিনি সর্বজ্ঞ। তাই অনাদি হতে অনন্তকাল পর্যন্ত যা কিছু প্রকাশ পাবে ও সংঘটিত হবে, তা তিনি অনাদিকাল হতে জানেন। এই জানার নামই তাক্বদীর। অন্যথায় আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা সব ধরনের ত্রুটি থেকে মুক্ত। এর (তাক্বদীর) মধ্যে সৃষ্টির কোন ইখতিয়ার নেই। আহলে সুন্নাতের আক্বীদা মতে, তাক্বদীরের সকল বিষয় মহান আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকুলের সৃষ্টির পূর্বেই স্থির করেছেন। মহান আল্লাহ্র এই স্থিরীকরণ বা নির্ধারণকে তাক্বদীর বলা হয়।

[তা'লীক্বুস্ সবীহ, ১ম খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা-৬৮]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَدَّرَ اللّٰهُ مَقَادِيْرَ الْخَلْقِ قَبْلَ اَنْ يَّخْلُقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ بِخَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ وَعَرْشُهٗ عَلَى الْمَاءِ

অর্থাৎ-হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টের তাক্বদীরগুলোকে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে স্থির করে রেখেছেন আর তাঁর আরশ পানির উপর। [মিশকাত শরীফ]

৬. ক্বিয়ামত বা আখিরাতের উপর ঈমান

আখিরাতের উপর ঈমান আনা ইসলামের মৌলিক আক্বীদাসমূহের অন্যতম। এ আক্বীদা ব্যতিরেকে ঈমান শুদ্ধ হয় না। পবিত্র ক্বোরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে-

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا ۢ بَعِيْدًا

তরজমাঃ আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে এবং তাঁর ফিরিশ্তাকুল, কিতাবসমূহ, রসূলগণ এবং ক্বিয়ামতকে অমান্য করে সে অবশ্যই দূরের পথভ্রষ্টতার মধ্যে পড়েছে।

[সূরা নিসা, আয়াত-১৩৬, তরজমা-কানযুল ঈমান]

'আখিরাত' বলতে মৃত্যুর পর থেকে অনন্তকালের দীর্ঘ সময়কে বুঝায়। এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে শিংগায় ফুৎকার, মহাপ্রলয় (ক্বিয়ামত), পুনরুত্থান, হিসাব, জান্নাত ও জাহান্নাম সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত। পরকাল নিশ্চিত। পরকালকে স্বীকার করা না হলে মানুষের গোটা জীবনটাই অর্থহীন হয়ে পড়ে। মানুষ পরকালের আশায় ভাল কাজ করে, মন্দকাজ হতে বিরত থাকে। পবিত্র ক্বোরআন মজিদে এ দিকে ইঙ্গিত করে এরশাদ হয়েছে-

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّ اَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ

তরজমা ঃ তবে তোমরা কি একথা মনে করছো যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে আমার প্রতি প্রত্যাবর্তন করতে হবে না?

[সূরা মু'মিন, আয়াত-১১৫, তরজমা- কানযুল ঈমান]

৭. পুনরুত্থান দিবসের উপর ঈমান

আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির সবকিছুই নির্ধারিত দিনে বিলীন করে দেবেন। এরপর একটি সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তাদের সবাইকে তিনি পুনর্জীবিত করে উঠাবেন। ঈমানের সপ্ত বিষয়ের মধ্যে পুনরুত্থান দিবসের উপর ঈমান আনা ফরয। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ক্বোরআন মজীদে এরশাদ করেছেন-

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّ نَسِىَ خَلْقَهٗ ؕ قَالَ مَنْ يُّحْىِ الْعِظَامَ وَهِىَ رَمِيْمٌ ○ قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِىْٓ اَنْشَاَهَآ اَوَّلَ مَرَّةٍ ؕ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ ○

তরজমা ঃ এবং আমার জন্য উপমা রচনা করেছে। আর নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে গেছে। বললো, 'এমন কে আছে, যে অস্থিগুলোতে প্রাণ সঞ্চার করবে যখন সেগুলো একেবারে পঁচেগলে যায়?' আপনি বলুন, 'সেগুলো তিনিই জীবিত করবেন, যিনি প্রথমবারে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁরই নিকট প্রত্যেক সৃষ্টির জ্ঞান রয়েছে।'

[সূরা ইয়াসীন, আয়াত- ৭৮, তরজমা- কানযুল ঈমান]

আক্বীদা সংক্রান্ত আরো কিছু বিষয়

‘আক্বাইদ’ আক্বীদা’র বহুবচন। ‘আক্বীদা’ মানে অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস। ‘আক্বাঈদ’ হচ্ছে ইসলামের মূল ভিত্তি।আক্বাইদের উপর নির্ভর করে আমলসমূহের গ্রহণযোগ্যতা। আমলের ক্ষেত্রে অবহেলা করলে পাপ হতে পারে, কিন্তু আক্বাইদ বিশুদ্ধ না হলে ইসলামের গন্ডি থেকে বের হয়ে খোদাদ্রোহী ও ঈমানহারা হবার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। তাই আক্বাইদ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

আল্লাহ তা‘আলার সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কিত আক্বীদাসমূহ

আক্বীদা-১ ঃ আল্লাহ এক, পবিত্র, অতুলনীয় ও নিষ্কলঙ্ক। তিনি প্রত্যেক পরিপূর্ণতা ও সৌন্দর্যের ধারক। কেউ কোন বিষয়ে তাঁর অংশীদার নয়, বরাবর কিংবা অগ্রগামীও নয়। তিনি তাঁর পরিপূর্ণ গুণাবলী সহকারে সব সময় ছিলেন, আছেন এবং সব সময় থাকবেন। চিরস্থায়ীত্ব কেবল তাঁর সত্তা ও গুণাবলীর জন্যই নির্দিষ্ট। তিনি ব্যতীত কোন কিছু আগে ছিলো না। তিনি সৃষ্টি করার কারণে সব কিছু হয়েছে। তাঁকে কেউ সৃষ্টি করেনি। তিনি কারো পিতাও নন, সন্তানও নন। স্ত্রী-স্বজন থেকে তিনি পবিত্র। তিনি পূর্ণ স্বাধীন। তিনি কোন বিষয়ে কারো মুখাপেক্ষী নন; বরং সবকিছু তাঁরই মুখাপেক্ষী। রিযক্ব প্রদান, জীবন দান ও মৃত্যু ঘটানো তাঁরই নিয়ন্ত্রণে। তিনি সবার মালিক। তিনি যা ইচ্ছা তা করতে পারেন। তাঁর নির্দেশের মধ্যে কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারে না, তাঁর মর্জি ব্যতীত এক বিন্দুও এদিক সেদিক হতে পারে না। তিনি প্রত্যেক প্রকাশিত, লুক্কায়িত, ঘটিত ও অঘটিত বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাতা। কোন জিনিস তাঁর ইলম বহির্ভূত নেই। সমগ্র জগতের সব কিছু তাঁরই সৃষ্টি। সবই তাঁর বান্দা। তিনি স্বীয় বান্দাদের জন্য তাদের মা-বাপ থেকে অধিক মেহেরবান, দয়ালু, ক্ষমাশীল ও তওবা গ্রহণকারী। তাঁর পাকড়াও খুবই কঠিন। তিনি রেহাই না দিলে এ পাকড়াও থেকে কেউ রেহাই পেতে পারে না। কারো সম্মান, অপমান তাঁরই ইচ্ছাধীন। যাকে ইচ্ছে ধনী এবং যাকে ইচ্ছে ফক্বীর করেন। হিদায়ত ও গোমরাহী তাঁরই পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। যাকে ইচ্ছে ঈমান নসীব করেন এবং যাকে ইচ্ছা তার আমলের কারণে তাকে কুফরীতে ছেড়ে দেন। তিনি যা কিছু করেন, তা হেকমতপূর্ণ ও ন্যায় ভিত্তিক। মুসলমানদেরকে জান্নাত প্রদান করবেন এবং কাফিরদেরকে দোযখের স্থায়ী আযাব প্রদান করবেন। তাঁর প্রতিটি কাজ প্রজ্ঞাপুর্ণ। তা বান্দার বুঝে আসুক বা না-ই আসুক। তাঁর নি’মাত বা করুণাসমূহ অসীম। তিনিই একমাত্র ইবাদতের উপযোগী। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদতের উপযোগী নয়।

আক্বীদা-২ ঃ আল্লাহ তা‘আলা শরীর ও জড়ত্ব থেকে পবিত্র; তাঁর মধ্যে এমন কিছু

নেই, যা শরীরের সাথে সম্পর্কিত; বরং এটা তাঁর ব্যাপারে অসম্ভব। সুতরাং তিনি স্থান, কাল, দিক, আকৃতি, ওজন, পরিমাণ, কম-বেশী, সংশ্রব, সংমিশ্রণ, জন্মগ্রহণ, জন্মদান, স্থানান্তর, ইন্তেকাল, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, গ্রহণ ইত্যাদি সমস্ত শারীরিক অবস্থাদি থেকে মুক্ত ও পবিত্র। ক্বোরআন-হাদীসে যেসব শব্দ এসেছে, যেমনঃ يَدٌ - وَجْهَه - رِجْلٌ - ضِحْكٌ وَغَيْرَهُ (আল্লাহর হাত, পা, চেহারা, মুখ, হাসি ইত্যাদি) সেগুলো আল্লাহর জন্য রূপকার্থেই গ্রহণ করতে হয়। কেননা ওইগুলোর প্রকৃত অর্থ আল্লাহর জন্য গ্রহণ করা অসম্ভব। সুতরাং ‘হাত’ দ্বারা ক্বুদরত, ‘চেহারা’ দ্বারা পবিত্র সত্তা গ্রহণ করতে হয়। এ প্রসঙ্গে কোন কোন ইমাম বলেছেন, এ শব্দগুলো হচ্ছে ‘মুতাশাবিহাত’-এর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ এগুলোর প্রকৃত অর্থ আল্লাহ তা‘আলা ও তাঁর রসূল-ই জানেন অর্থাৎ এর সঠিক অর্থ আল্লাহই ভাল জানেন, আর জানেন তাঁর রসূল। আল্লাহ ও রাসূলের উপর আমাদের ঈমান আছে। আল্লাহর জ্ঞান, বুদ্ধি ও হাত সৃষ্ট জীবের মতো নয়। তাঁর দেখা, শোনা ও কথা বলা মাখলূক্বের মতো মোটেই নয়; বরং এগুলো তাঁর জন্য যেভাবে শোভা পায় সেভাবে প্রযোজ্য।

আক্বীদা-৩ ঃ আল্লাহ তা‘আলার সত্তা ও গুণাবলী সৃষ্টও নয়, সীমিতও নয়।

আক্বীদা-৪ঃ আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী ব্যতীত যত কিছু আছে, সব কিছু নশ্বর অর্থাৎ প্রথমে ছিলো না, পরে হয়েছে।

আক্বীদা-৫ ঃ আল্লাহ তা‘আলার গুণাবলীকে সৃষ্ট বলা বা নশ্বর বলা শুধুই গোমরাহী ও বিভ্রান্তির পরিচায়কই নয়, বরং কুফরই।

আক্বীদা-৬ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা‘আলার সত্তা ও গুণাবলী ব্যতীত অন্য কোন জিনিসকে অবিনশ্বর মনে করে বা পৃথিবী নশ্বর হওয়ার বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করে, সে কাফির।

আক্বীদা-৭ঃ আল্লাহ তা‘আলা যেমন পৃথিবী ও পৃথিবীর সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা, তেমনি আমাদের সমস্ত আমল বা কর্মেরও তিনি সৃষ্টিকর্তা। আল্লাহ তা‘আলা ওয়াজিবুল ওজুদ অর্থাৎ তাঁর অস্তিত্ব অপরিহার্য এবং অস্তিত্বহীন হওয়া অসম্ভব।

আক্বীদা-৮ঃ কোন জিনিস আল্লাহ তা‘আলার জ্ঞানের বাইরে নয়- বর্তমান হোক কিংবা অবর্তমান, পরিপূর্ণ হোক বা আংশিক। সবকিছু আদিকাল থেকে জানতেন, এখনও সবকিছু তিনি জানেন এবং অনন্তকাল পর্যন্ত জানবেন। জিনিসসমূহ পরিবর্তন হয়; কিন্তু তাঁর জ্ঞানের পরিবর্তন হয় না। মনের কল্পনা ও ধারণা সম্পর্কে তিনি অবগত। তাঁর জ্ঞানের কোন শেষ নেই।

আক্বীদা-৯ঃ আল্লাহ্ তা‘আলার ইচ্ছা ব্যতীত কোন কিছু হতে পারে না। তিনি ভাল কাজের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং অসৎ কাজের প্রতি অসন্তুষ্ট হন।

আক্বীদা-১০ ঃ আল্লাহ তা‘আলা সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। কোন কিছু তাঁর কুদরতের বাইরে নয়।

আক্বীদা-১১ঃ ভাল ও মন্দ, কুফর ও ঈমান, আনুগত্য ও পাপ আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্দিষ্ট ও সৃষ্ট।

আক্বীদা-১২ঃ মূলত রিযক্বদাতা আল্লাহ তা'আলাই। ফিরিশতা প্রমুখ হলেন ওসীলা এবং মাধ্যম মাত্র।

আক্বীদা-১৩ ঃ আল্লাহ তা'আলার উপর কোন কিছু অপরিহার্য নয়; যেমন সাওয়াব দান করা বা শাস্তি দেওয়া বা এমন কোন কাজ করা, যা বান্দার জন্য উপকারী কোনটিই তাঁর উপর অপরিহার্য নয়। কারণ তিনি সর্বশক্তিমান। যা ইচ্ছে তা করেন, যা ইচ্ছে তা নির্দেশ দেন। সাওয়াব দেয়াটা তাঁর করুণা। আযাব দেয়াটা তাঁর ইনসাফ। তবে এটা তাঁর বড় মেহেরবাণী যে, তিনি তা-ই নির্দেশ দেন যা বান্দা করতে পারে। মুসলমানদেরকে নিশ্চয়ই স্বীয় মেহেরবাণীতে জান্নাত দান করবেন। আর কাফিরদেরকে স্বীয় ন্যায় বিচারে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। কারণ, তিনি ওয়াদা করেছেন কুফর ব্যতীত যে কোন গুনাহ ইচ্ছে করলে মাফ করে দেবেন। তাঁর ওয়াদা পরিবর্তিত হয় না।

আক্বীদা-১৪ ঃ আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার মুখাপেক্ষী নন। তাঁর কোন লাভ-ক্ষতি নেই। কেউ তাঁর লাভ-ক্ষতি করতে পারে না। তিনি যা কিছু করেন, এতে তাঁর নিজস্ব কোন লাভ-ক্ষতি নেই। দুনিয়া সৃষ্টি করার মধ্যে তাঁর কোন লাভ নেই। না করার মধ্যে তাঁর কোন ক্ষতি নেই। স্বীয় ইচ্ছা, ইনসাফ, কুদরত ও কামালিয়াত প্রকাশ করার জন্য মাখলূক্বকে সৃষ্টি করেছেন।

আক্বীদা-১৫ ঃ আল্লাহ তা'আলার প্রতিটি কাজে অনেক হিকমত রয়েছে, তা আমাদের বুঝে আসুক বা না-ই আসুক। এটা তাঁর হিকমত যে, দুনিয়ার এক জিনিসকে অপর জিনিসের উপায়ে পরিণত করেছেন। যেমন আগুনকে গরম পৌঁছানোর উপায়, পানিকে ঠান্ডা পৌঁছানোর উপায় করেছেন। চোখকে দেখার জন্য, কানকে শোনার জন্য সৃষ্টি করেছেন। যদি তিনি ইচ্ছে করেন, তাহলে আগুন ঠাণ্ডাদায়ক, পানি গরমদায়ক, চোখ শ্রবণকারী, কান দর্শনকারীও হতে পারতো।

আক্বীদা- ১৬ ঃ আল্লাহ তা'আলার জন্য যে কোন ধরনের কলঙ্ক ও দুর্বলতা অসম্ভব। যেমন মিথ্যা, মূর্খতা, ভুল-ভ্রান্তি, যুল্ম, নিলর্জ্জতা ইত্যাদি মন্দকাজসমূহ আল্লাহর জন্য অসম্ভব। যারা এটা মনে করে যে, আল্লাহ মিথ্যা বলতে পারেন, কিন্তু বলেন না, তারা মনে করে যে, আল্লাহ কলঙ্কময়, তবে স্বীয় কলঙ্ক গোপন করেন। তাদের ধারণা মতে, শুধু মিথ্যা কেন? সকল মন্দ কাজ, যেমন জুল্ম, চুরি, যেনা ইত্যাদি নিন্দনীয় দোষসমূহেরও একই অবস্থা হবে। অর্থাৎ তারা মনে করে যে, তিনি ক্ষমতা রাখেন কিন্তু করেন না, অথচ আল্লাহ তা'আলা এসব থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র, তিনি এসবের অনেক উর্ধ্বে। আল্লাহ তা'আলার জন্য কোন দুর্বলতা ও

দূষণীয় কাজকে সম্ভব মনে করা আল্লাহকে দোষত্রুটিপূর্ণ মনে করারই নামান্তর; বরং আল্লাহকে অস্বীকার করা বুঝায়; যা কুফর। এমন নিকৃষ্ট আক্বীদাসমূহ থেকে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেককে রক্ষা করুন।

তাক্বদীর

আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানে পৃথিবীতে যা কিছু ছিলো এবং বান্দার যা কিছু করার ছিলো, তা আগে থেকে আল্লাহ তা'আলা লিখে রেখেছেন। সুতরাং কারো ভাগ্যে কল্যাণ এবং কারো ভাগ্যে অকল্যাণ লিখা হয়েছে। এ লিখে দেয়ার এ অর্থ নয় যে, বান্দাকে বাধ্য করে দেয়া হয়েছে। বান্দা যেখানে যা করার ছিলো তা-ই তিনি জানতেন ও লিখে রেখেছেন। যদি কারো ভাগ্যে মন্দ আগে আসে তাহলে জানতে হবে যে, তাই সে করবে। আর যদি সে সৎকর্মপরায়ণ হতো তার ভাগ্যে কল্যাণই লিখা হতো। আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান বা লিখন কাউকে বাধ্য করেনি।

মাসআলা ঃ তাক্বদীরের বিষয়ে চিন্তাভাবনা, তর্কবিতর্ক নিষেধ। এতটুকু বুঝে নেয়া চাই যে, বান্দা পাথরের মত একেবারে অক্ষম নয়; বরং আল্লাহ তা'আলা মানুষকে ইখতিয়ার দিয়েছেন- সে একটি কাজ ইচ্ছে করলে করতে পারে আবার নাও করতে পারে। এ ইখতিয়ারের ভিত্তিতে ভালমন্দের ভাগী বান্দাকে করা হয়। নিজেকে একেবারে অক্ষম কিংবা একেবারে স্বাধীন মনে করা, উভয়টা গোমরাহী।

মাসআলাঃ মন্দকাজ করে 'খোদার ইচ্ছায় হয়েছে' বা 'তক্বদীরে ছিল বলে করেছে' এমন বলা অনুচিত ও বে-আদবী; বরং শরীয়তের নির্দেশ হচ্ছে ভাল কাজকে আল্লাহর প্রতি এবং মন্দ কাজকে স্বীয় নাফ্সের কুপ্রবৃত্তির প্রতি ইঙ্গিত ও সম্পৃক্ত করা।

নবী ও রসূল

আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে জানা যেমন প্রয়োজন, তেমনি এটাও জানা প্রয়োজন যে, নবীর জন্য কি কি বিষয় হওয়া চাই এবং কি কি না হওয়া চাই, যাতে মানুষ কুফর থেকে বিরত থাকে।

'রসূল' অর্থ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বান্দাদের কাছে প্রেরিত পুরুষ। তিনি আল্লাহর পয়গাম আনয়নকারী। তাঁর নিজের শরীয়ত ছিলো। আর 'নবী' হলেন অদৃশ্যের সংবাদদাতা, যাঁর কাছে ওহী নাযিল হতো। তিনি লোকরদেরকে আল্লাহর রাস্তা প্রদর্শনের জন্য আল্লাহর পয়গাম আনতেন। এ পয়গাম রসূল ও নবীর কাছে হয়তো ফিরিশতা নিয়ে আসতেন অথবা স্বয়ং 'নবী' প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে জ্ঞাত হতে পারতেন। সমস্ত রসূল নবীও, কিন্তু সমস্ত নবী পরিভাষায় রসূল নন; কারণ রসূলগণের কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ফিরিশতাদেরকে 'রসূল' এ

অর্থে বলা হয় যে, তাঁরা আল্লাহর পক্ষ থেকে পয়গাম আনয়নের মাধ্যম। (এটা আভিধানিক অর্থে। পারিভাষিক অর্থে নয়)।

সকল নবী পুরুষ ছিলেন। কোন জিন্ বা মহিলা নবী হয়নি। ইবাদত-রিয়াযত দ্বারা মানুষ নবী হতে পারে না। নবীর মর্যাদা পর্যন্তও পৌঁছতে পারে না। নবীগণ আল্লাহ তা'আলার মেহেরবাণী দ্বারাই নবী হয়েছেন। এ ব্যাপারে মানুষের প্রচেষ্টায় কোন কাজ হয় না। আল্লাহ তা'আলাই নবী মনোনীত করেন। যাঁকে এ দায়িত্বের উপযোগী করে সৃষ্টি করতেন, তিনি নবী হওয়ার আগে থেকেই সমস্ত মন্দ কাজ থেকে স্বভাবত দূরে সরে থাকতেন এবং ভাল কাজে নিয়োজিত ছিলেন। নবীর মধ্যে এমন কোন বিষয় থাকে না, যার জন্য মানুষ তাঁকে ঘৃণা করতে পারে। নবীর চাল-চলন, আকার-আকৃতি, বংশ, স্বভাব-চরিত্র, কথাবার্তা সবকিছু উত্তম ও নিষ্কলুষ। নবীর জ্ঞান পরিপূর্ণ। নবী সকল মানুষ থেকে অধিক বুদ্ধিমান হয়ে থাকেন। বড় বড় ডাক্তার বা দার্শনিকের জ্ঞান নবীর জ্ঞানের লক্ষ কোটি ভাগের একভাগও হতে পারে না। যে এটা বিশ্বাস করে যে, কোন ব্যক্তি স্বীয় প্রচেষ্টায় নবী হতে পারে, সে কাফির। যে এটা মনে করে যে, নবীর নুবূয়ত প্রত্যাহার করা যেতে পারে, সেও কাফির। নবী ও ফিরিশতা নিষ্পাপ হয়ে থাকেন অর্থাৎ তাঁদের থেকে কোন গুনাহ সংঘটিত হতে পারে না। আল্লাহর পয়গাম পৌঁছানোর ব্যাপারে নবীর কোন ভুল-ত্রুটি হতে পারে না। তা অসম্ভব। যে এটা মনে করে যে, নবী কিছু আহকাম জনগণের ভয়ে বা অন্য কারণে পৌঁছাননি, সে কাফির। নবীগণ সমস্ত মাখলূক্ব থেকে উৎকৃষ্ট; এমন কি ফিরিশতাদের থেকেও। ওলী যত বড় মর্যাদাশালী হোন না কেন, কোন নবীর সমান হতে পারেন না। যে ব্যক্তি নবী ব্যতীত অন্য কাউকে নবীর সমান কিংবা নবী থেকে উত্তম বলে, সেও কাফির।

আক্বীদা- ১ঃ নবীর তা'যীম 'ফরযে আইন' বরং সমস্ত ফরযের মূল। কোন নবীর যৎসামান্য নিন্দা ও অস্বীকৃতি কুফর [শেফা শরীফ ও ফাতাওয়া-ই হিন্দিয়া ইত্যাদি]

সমস্ত নবী আল্লাহ তা'আলার কাছে বড় সম্মানিত ও মর্যাদাবান। তাঁদেরকে আল্লাহ তা'আলার কাছে (মা'আযাল্লাহ) নগণ্য চামারের মত বলা, তুচ্ছ মনে করা, যেমন কোন কোন হতভাগা বলেছে, সুস্পষ্ট বে-আদবী এবং কুফর। নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম) নিজ নিজ কবর শরীফে তেমনি জীবিত, যেমন পৃথিবীতে ছিলেন। আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা পূর্ণ করার জন্য এক মুহূর্তের জন্য তাঁদের ওফাত হয়েছিলো। পুনরায় আল্লাহর হুকুমে জীবিত হয়ে গেছেন। তাঁদের যিন্দেগী শহীদদের যিন্দেগী থেকে অনেক উত্তম।

আক্বীদা-২ ঃ আল্লাহ তা'আলা নবীগণকে অদৃশ্য বিষয়সমূহ সম্পর্কে জ্ঞাত করেছেন। আসমান যমীনের প্রতিটি কণা প্রত্যেক নবীর সামনে সুস্পষ্ট। তাঁদের এ

অদৃশ্য জ্ঞান খোদা প্রদত্ত। সুতরাং তাঁদের এ জ্ঞান 'প্রদত্তজ্ঞান' হিসেবে গণ্য এবং আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান যেহেতু কারো প্রদত্ত নয় বরং তাঁর নিজস্ব তাই আল্লাহর জ্ঞান সত্তাগত হিসেবে গণ্য। সুতরাং যখন আল্লাহ তা'আলা এবং রসূলের জ্ঞানের পার্থক্য জানা গেলো, তখন এটা সুস্পষ্ট হলো যে, নবী ও রসূলকে খোদা প্রদত্ত ইলমে গায়বের অধিকারী বলে বিশ্বাস করা শির্ক নয়; বরং ঈমানের অংশ, যা বিভিন্ন আয়াত ও হাদীস শরীফ থেকে প্রমাণিত।

আক্বীদা-৩ঃ নবীগণের সংখ্যা নির্দিষ্ট করা না জায়েয। তাঁদের সঠিক সংখ্যার সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই আছে। কোন কোন বর্ণনায় ১ লক্ষ চব্বিশ হাজার, তিন লক্ষ ছত্রিশ হাজার ইত্যাদি এসেছে। তাও সংখ্যাধিক্য বুঝানোর অর্থে বলা যায়।

নবীগণের মর্যাদা

হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম সর্বপ্রথম মানুষ, তাঁর আগে মানুষের অস্তিত্ব ছিল না। সমস্ত মানুষ তাঁরই ঔরশজাত। আল্লাহ তা'আলা হযরত হাওয়া আলায়হাস সালামকে তাঁর বাম পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করেছেন। হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম দুনিয়ায় সর্বপ্রথম নবী। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে মাতা-পিতার মাধ্যম ছাড়া মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর খলীফা মনোনীত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সমস্ত জিনিস ও সেগুলোর নাম শিক্ষা দিয়েছেন।

ফিরিশতাগণকে হুকুম দেয়া হলো- আদমকে সাজদা কর। শয়তান ব্যতীত সবাই সাজদা করলেন। শয়তান অমান্য করলো, ফলে চিরদিনের জন্য অভিশপ্ত ও মরদূদ হয়ে গেলো। হযরত আদম আলায়হিস সালাম থেকে শুরু করে আমাদের নবী মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত অনেক নবী আগমন করেন। সর্বশেষ নবী ও রসূল হচ্ছেন সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠ হাবীব, আমাদের আ'ক্বা হযরত আহমদ মুজতবা মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম। তাঁর পরে কোন নবী হয়নি; হবেও না। যে ব্যক্তি আমাদের নবীর পরে বা তাঁর যুগে অন্য কোন নবীর আগমন সম্ভব বলে স্বীকার করে বা নুবূয়ত লাভকে জায়েয মনে করে, সে কাফির।

আমাদের নবীর বিশেষ বিশেষ ফযীলত ও পূর্ণতাসমূহ

আল্লাহ তা'আলা সমস্ত জগত সৃষ্টির আগে আমাদের হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে স্বীয় নূরের তাজাল্লী থেকে সৃষ্টি করেছেন। ফিরিশতাগণকে, আসমান-যমীন, আরশ-কুরসী ও সমস্ত জাহানকে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম -এর নূরের ঝলক থেকে তৈরি করেছেন। আল্লাহ তা'আলার জন্য খাস

ও তাঁরই অতুলনীয় শানের উপযোগী বিষয় ও গুণাবলী ব্যতীত যত কামালাত ও সৌন্দর্য আছে সবকিছু আল্লাহ তা'আলা আমাদের হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দান করেছেন। এমনকি অন্যান্য সমস্ত নবীর যত বৈশিষ্ট্য ছিলো সেগুলোও আমাদের নবীকে দেওয়া হয়েছে। সমস্ত জগতে কেউ কোন বৈশিষ্ট্যে হুযূরের বরাবর হতে পারে না। হুযূর করীম সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এবং আল্লাহ তা'আলার পরে তাঁর মর্যাদা। তিনি সমস্ত নবীর নবী এবং প্রত্যেকের জন্য তাঁর অনুসরণ অপরিহার্য। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সমস্ত ভান্ডারের চাবিসমূহ হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দান করেছেন। দ্বীন ও দুনিয়ার সমস্ত নি'মাত প্রদানকারী হলেন আল্লাহ, আর বন্টনকারী হলেন হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সশরীর মি'রাজ প্রদান করেছেন। অর্থাৎ আরশের উপর আহবান করে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় ঊর্ধ্বভ্রমণ করিয়েছেন এবং চাক্ষুষ দীদার দান করেছেন, স্বীয় কালাম শুনিয়েছেন এবং জান্নাত, দোযখ, আরশ-কুরসী ইত্যাদি সমস্ত কিছু পরিভ্রমণ করিয়েছেন। এসব কিছু রাতের সামান্য সময়ে ঘটেছিলো। ক্বিয়ামতের দিন তিনিই সর্বপ্রথম শাফা'আত করবেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সমীপে সুপারিশ করবেন। উম্মতের গুনাহ মাফ করাবেন, মর্যাদা বৃদ্ধি করাবেন। এছাড়া আরও অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যার বর্ণনা এ সংক্ষিপ্ত পরিসরে সম্ভব নয়।

আক্বীদা ঃ যে ব্যক্তি হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম -এর কোন উক্তি, কাজ, আমল ও অবস্থাকে তুচ্ছ কিংবা ঘৃণার চোখে দেখে, সে কাফির। [ক্বাযী খান, শিফা ইত্যাদি]

মু'জিযা

ওই অলৌকিক কাজ, যা সাধারণত অসম্ভব এবং নবী তাঁর নুবূয়তের সমর্থনে পেশ করেন, আর অস্বীকারকারীরাও অপরাগ হয়ে যায়। সেটাই হচ্ছে মু'জিযা। যেমন মৃতকে আল্লাহর অনুমতিক্রমে জীবিত করা, আঙ্গুলের ইশরায় চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করা ইত্যাদি। কোন অলৌকিক বিষয় যদি কোন নবীর মাধ্যমে প্রকাশ পায়, তবে তা হয় মু'জিযা, আর কোন ওলীর মাধ্যমে প্রকাশ পেলে তাকে কারামত বলা হয়। উল্লেখ্য, মু'জিযা দেখলে নবীর সত্যতা সম্পর্কে এ আস্থা জন্মে যে, যাঁর হাতে এমন অলৌকিক ক্ষমতা প্রকাশ পায় তিনি নিশ্চয় মহা শক্তিমান আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ। কেউ মিথ্যা নুবূয়ত দাবী করলে সে মু'জিযা দেখাতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলা মিথ্যুকদেরকে মু'জিযা দান করেন না। যদি দান করতেন, তবে আসল ও নকলের মধ্যে পার্থক্য করা যেতো না। উল্লেখ্য, কোন বে-দ্বীনের হাতে কোন অস্বাভাবিক বিষয় প্রকাশ পেলে সেটাকে বলা হয় 'ইস্তিদ্রাজ'।

আল্লাহ তা'আলার কিতাবসমূহ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রসূলগণের প্রতি নিজের কালাম-ই পাক অবতীর্ণ করেছেন। হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম-এর প্রতি তাওরাত, হযরত দাঊদ আলায়হিস্ সালাম-এর প্রতি যাবূর, হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম-এর প্রতি ইন্জীল, আমাদের আক্বা ও মাওলা নবীকুল শ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মদ মোস্তফার উপর ক্বোরআন নাযিল করেছেন এবং অন্যান্য নবীগণের প্রতি অন্যান্য সহীফা অবতীর্ণ করেছেন। পূর্ববর্তী উম্মগণ ওই সব কিতাবে রদবদল করে ফেলেছে এবং আল্লাহর আহকামকে পরিবর্তিত করে দিয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম -এর প্রতি ক্বোরআনে পাক অবতীর্ণ করেন। ক্বোরআন মজীদ এমন অদ্বিতীয় কিতাব, যার সমকক্ষ কোনটা হতে পারে না। পৃথিবীর সবাই মিলে চেষ্টা করলেও এমন কিতাব প্রণয়ন করতে অক্ষম। ক্বোরআনের মধ্যে সমস্ত জ্ঞান রয়েছে এবং প্রত্যেক কিছুর সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। চৌদ্দশ' বছর থেকে আজ পর্যন্ত ক্বোরআন তেমনি রয়েছে যেমন অবতীর্ণ হয়েছিলো; বরং সব সময় তেমনি থাকবে। সর্বযুগে চেষ্টা করলেও এর একটি হরফও পরিবর্তিত করতে পারবে না। যারা বলে, ক্বোরআনে পাকে কেউ পরিবর্তন-পরিবর্ধন করেছে বা মূল ক্বোরআন 'ইমামুল গায়বের' কাছে রয়েছে, তারা কাফির। এটা ওই ক্বোরআন, যা লওহ্-ই মাহফূয-এ সংরক্ষিত। এ ক্বোরআনের উপর ঈমান আনা প্রত্যেকের জন্য অপরিহার্য। এখন আর কোন নবীও আসবে না, আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন কিতাবও আসবে না। যে এর বিপরীত বিশ্বাস করে, সে মু'মিন নয়। হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম ক্বিয়ামতের পূর্বে আসবেন দ্বীনে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাহায্যকারী হিসেবে; নবী হিসেবে নয়।

ফিরিশতাগণের বর্ণনা

ফিরিশতাগণ নূরের শরীর বিশিষ্ট মাখলূক্ব, যাঁদেরকে আল্লাহ তা'আলা এ ক্ষমতা দিয়েছেন যে, যখন যে আকৃতি ধারণ করতে চান, সে আকৃতি ধারণ করতে পারেন। সেটা মানুষের আকৃতি হোক বা অন্য কিছুর। ফিরিশ্তাগণ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের বিপরীত কিছুই করেন না। কারণ তাঁরা মা'সুম, বড়-ছোট সব রকমের গুণাহ্ থেকে পবিত্র। আল্লাহ তা'আলা অনেক কাজ ফিরিশতাদের উপর সোপর্দ করেছেন। কোন ফিরিশ্তা জান কবজের জন্য নিয়োজিত, কোন ফিরিশতা বৃষ্টিপাত করার কাজে, কোন ফিরিশ্তা মায়ের পেটের শিশুর আকৃতি তৈরির কাজে, কোনটা আমলনামা লিখার কাজে এবং অন্যান্য ফিরিশতা অন্যান্য কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। ফিরিশতাগণ পুরুষও নন, নারীও নন। তাঁদেরকে আল্লাহর মতো ক্বদীম বা স্থায়ী মনে করা বা সৃষ্টিকর্তা মনে করা কুফর। কোন ফিরিশতার প্রতি সামান্য বেআদবীও কুফর। [আলমগীরী]

অনেক লোক স্বীয় শত্রুকে বা চাপ সৃষ্টিকারীকে আয্‌রাঈল ফিরিশতা বলে। এমনটি বলা না-জায়েয; বরং কুফরীর কাছাকাছি। ফিরিশতাগণের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা বা এমনই বলা যে, 'নেকীর শক্তিকে ফিরিশতা বলো, এ ছাড়া অন্য কিছু নয়'-এ উভয়ই কুফর।

জিনের বর্ণনা

জিনকে আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা এ শক্তি দিয়েছেন যে, যে আকৃতি ধারণ করতে চায়, করতে পারে। দুষ্ট ও বদকার জিনকে শয়তান বলা হয়। এরা মানুষের মত জ্ঞান, রূহ ও শরীর বিশিষ্ট হয়ে থাকে। এরা পানাহার করে, জীবন ধারণ, মৃত্যু বরণ এবং বংশ বিস্তার করে। এদের মধ্যে কাফির, মু'মিন, সুন্নী ও বদ মাযহাবী সব রকমের হয়ে থাকে। তাদের মধ্যে বদকারের সংখ্যা মানুষের তুলনায় বেশি। এদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা বা এমনই বলা যে 'জিন্ ও শয়তান নিছক অশুভ শক্তির নাম', কুফর।

মৃত্যু এবং কবরের বর্ণনা

প্রত্যেক লোকের বয়স নির্ধারিত। এর ব্যতিক্রম হতে পারে না। যখন পার্থিব যিন্দেগীর সময় পূর্ণ হয়ে যায়, তখন হযরত আযরাঈল আলায়হিস সালাম রূহ বের করার জন্য আসেন। তখন মৃত্যুবরণকারীর ডানে বামে যতদূর দৃষ্টি যায়, শুধু ফিরিশতা আর ফিরিশতা দেখা যায়। মুসলমানের কাছে রহমতের ফিরিশতা থাকেন এবং কাফিরের কাছে শাস্তির। ও সময় কাফিরের মনেও ইসলামের সত্যতার প্রতি আস্থা এসে যায়; কিন্তু তখন কারো ঈমান গ্রহণযোগ্য হয় না। কেননা, ঈমান হচ্ছে আল্লাহ ও রসূলের বর্ণিত বিষয়সমূহের উপর না দেখে বিশ্বাস করার নাম। কিন্তু এখনতো ফিরিশতাদেরকে দেখেই ঈমান আনছে। এজন্য এমন ঈমান আনা দ্বারা মু'মিন কিংবা মুসলমান হবে না।

মুসলমানদের রূহ সহজভাবে বের করা হয় এবং একে রহমতের ফিরিশতাগণ ইজ্জত সহকারে নিয়ে যান। আর কাফিরের রূহ বড় কঠোরতার সাথে বের করা হয় এবং একে আযাবের ফিরিশতাগণ খুবই লাঞ্ছনার সাথে নিয়ে যান। মৃত্যুর পর একই রূহ অন্য কারো শরীরে গিয়ে পুনরায় সমন্বিত হয়ে কেউ জন্মগ্রহণ করে না বরং ক্বিয়ামত আসা পর্যন্ত তা-ই আলমে বরযখে (দুনিয়া ও আখেরাতের মধ্যবর্তী জগত) থাকে। 'রূহ অন্য কারো শরীরে চলে যায়, চাই মানুষের হোক কিংবা পশু ইত্যাদির'-এ রকম ধারণা সম্পূর্ণ ভূল। এরূপ বিশ্বাস করা কুফুরী।

মৃত্যু হচ্ছে রূহ শরীর থেকে বের হয়ে যাওয়া। কিন্তু বের হওয়ার পর রূহ বিলীন হয়ে যায় না; বরং আলমে বরযখে থাকে এবং ঈমান ও আমলের তারতম্য অনুসারে

প্রত্যেক রূহের জন্য পৃথক পৃথক জায়গা নির্ধারিত আছে। ক্বিয়ামত আসা পর্যন্ত তা ওখানেই থাকবে। কারো রূহের জায়গা আরশের নিচে, কারো ইল্লিয়্যীনে, কারো রূহ যমযম কূপে, কারো রূহ কবরে থাকবে এবং কাফিরদের রূহ বন্দী অবস্থায় থাকবে। এদের কারো রূহ বরহুত কূপে, কারো রূহ সিজ্জীনে এবং কারো রূহ শ্মশানে বা কবরে থাকবে। যে কোন অবস্থায় রূহের মৃত্যু হয় না বা বিলীন হয় না বরং বহাল থাকে এবং যে অবস্থায় হোক, বা যেখানেই হোক স্বীয় শরীরের সাথে এক প্রকার সম্পর্ক বজায় রাখে। শরীরের কষ্টের কারণে সেটারও কষ্ট হয় এবং শরীরের আরামের কারণে সেটারও আরাম বোধ হয়। কেউ কবরের পার্শ্বে আসলে তাকে চিনে, দেখে এবং তার কথা শুনে। মুসলমান সম্পর্কে হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, যখন মুসলমান মারা যায়, তখন তার রূহের পথ খুলে দেয়া হয়, যেখানে ইচ্ছে যেতে পারে। হযরত শাহ আবদুল আযীয রহমাতুল্লাহি আলায়হি লিখেছেন, রূহের জন্য দূর ও নিকটবর্তী এক সমান, অর্থাৎ রূহের জন্য কোন জায়গা দূরের বা কাছের নেই বরং সব জায়গা একই বরাবর। যে এটা মনে করে যে, মৃত্যুর পর রূহ বিলীন হয়ে যায়, সে বদমাযহাবী। মৃত ব্যক্তি কথাও বলে। এ কথাবার্তা সাধারণ লোক ও জিন্ ছাড়া জীবজন্তু ইত্যাদিও শুনে থাকে।

দাফনের পর কবর মৃত ব্যক্তিকে এমন চাপ দেয় যে, তার এ পাঁজরের হাড় অপর পাঁজরে ঢুকে পড়ে। তবে মু'মিনদের নিকট কিন্তু সেটা তেমনি অনুভব হবে যেমন মা শিশুকে আদর করে জড়িয়ে ধরে চাপ দেয়। কিন্তু কাফির সেটা যথাযথভাবে অনুভব করে। যখন লোকেরা দাফন করে ফিরে যায়, তখন মৃত ব্যক্তি তাদের জুতোর আওয়াজও শুনতে পায়। ওই সময় মুনকার ও নাকীর নামক দু'জন ফিরিশতা আসেন। তাঁদের আকৃতি খুবই ভয়ংকর হয়ে থাকে। তাঁদের শরীর কালো, চোখদু'টি নীল এবং বড় বড় হয়ে থাকে, যেগুলো থেকে আগুনের মত ঝলক বের হয়। তাঁদের ভীতিকর চুল মাথা থেকে পা পর্যন্ত বিস্তৃত, দাঁত খুব বড় বড় তারা কবরে এসে মৃত ব্যক্তিকে ধাক্কা ও ধমক দিয়ে উঠায় এবং খুবই কঠোর ও কর্কশ ভাষায় তিনটি প্রশ্ন করে مَنْ رَبُّكَ (তোমার রব কে)? مَادِيْنُكَ (তোমার ধর্ম কি)? مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِىْ هٰذَا الرَّجُلِ (এই ব্যক্তির ব্যাপারে তুমি কী বলতে)? মৃত ব্যক্তি যদি মুসলমান হয়, তাহলে প্রথম প্রশ্নের উত্তর দেয় رَبِّىَ اللّٰهُ (আমার রব আল্লাহ)। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দেয় دِيْنِىَ الْاِسْلَامُ (আমার ধর্ম ইসলাম) এবং তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলে, هُوَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ইনি আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি রহমত ও শান্তি নাযিল হোক)। তখন আসমান থেকে আওয়াজ আসে, "আমার বান্দা সত্য বলেছে, তার জন্য জান্নাতী বিছানা বিছিয়ে দাও।" তখন জান্নাতের ঠাণ্ডা হাওয়া এবং সুগন্ধ আসতে থাকে এবং যতদূর পর্যন্ত দৃষ্টি যায়

ততদূর পর্যন্ত কবর সম্প্রসারিত ও আলোকিত করে দেয়া হয়। ফিরিশতাগণ বলবেন, "দুল্হানের মত শুয়ে যাও।" এটা নেক-পরহেযগার মুসলমানদের বেলায় হবে। গুনাহ্গার মুসলমানদের বেলায় তাদের গুনাহ্ অনুসারে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শাস্তি হবে। অতঃপর বুর্যুগানে কেরামের শাফা'আত, ঈসালে সাওয়াব ও মাগফিরাতের দো'আ, সর্বপোরি আল্লাহর মেহেরবাণীতে এ শাস্তি মাফ হয়ে যাবে। এরপর জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাবে। পক্ষান্তরে, মৃত ব্যক্তি যদি কাফির হয়, তবে সে প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে না এবং বলবে, هَاهْ هَاهْ لَا اَدْرِىْ (হায়! আফসোস! আমার তো কিছুই জানা নেই)। তখন এক আহবানকারী আসমান থেকে ডেকে বলবেন, "সে মিথ্যুক! তার জন্য আগুনের বিছানা বিছিয়ে দাও, আগুনের কাপড় পরিধান করাও।" আর জাহান্নামের ফিরিশতা নির্ধারিত হবেন। তারা বড় বড় হাতুড়ি দিয়ে মারতে থাকবেন এবং সাপ-বিচ্ছুও কামড়াতে থাকবে, ক্বিয়ামত পর্যন্ত নানা ধরনের শাস্তি হতে থাকবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : নবীগণ আলায়হিস্ সালাম থেকে কবরে কোন সওয়াল- জবাব নেই তাঁদের জন্য কবরের কোন চাপ তো দূরের কথা, নবীগণের শরীরকে যমীনের উপর হারাম করে দেওয়া হয়েছে। এমন কি কবরের সাওয়াল অনেক উম্মতকেও করা হবে না, যেমন- যারা ঈমানের সাথে শুক্রবার ও রমযান মাসে মৃত্যুবরণ করে। কবরে আরাম কিংবা কষ্ট দেওয়া এবং শরীরের অংশগুলোকে একত্রিত করা সর্বশক্তিমান আল্লাহর জন্য অসম্ভব কিছুই নয়। তখন আযাব ও সাওয়াব শরীর ও রূহ উভয়ের উপর হবে। শরীর যদিওবা গলে, জ্বলে মাটির সাথে মিশে যায়, তবুও সেটার উপরই আযাব ও সাওয়াব হবে। ওই শরীরেই রূহ্ আগমন করে ক্বিয়ামতের ময়দানে গমন করবে। এর নাম হাশর। এখন এর দ্বারা এটাও বুঝা গেল যে, ক্বিয়ামতের দিন রূহ্ স্বীয় প্রথম শরীরেই ফিরে আসবে। অন্য কোন নতুন শরীরে নয়। মৃত ব্যক্তিকে যদি কবরে দাফন করা না হয়, তাহলে যেখানে পড়ে রয়েছে বা ফেলে দেয়া হয়েছে, সেখানেই প্রশ্ন করা হবে এবং সেখানেই আযাব বা সাওয়াব পৌঁছাবে। এমনকি যাকে বাঘে খেয়ে ফেলছে, তাকে বাঘের পেটে সাওয়াল করা হবে এবং আযাব ও সাওয়াব সেখানেই হবে। কবরের আযাব ও সাওয়াবের অস্বীকারকারী গোমরাহ্।

মাসআলাঃ নবী, ওলী, আলেমে দ্বীন, শহীদ, হাফেযে ক্বোরআন, যিনি ক্বোরআনের উপর আমলও করেন এবং যিনি মুহব্বতের পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত, ওই ব্যক্তি, যে কখনো গুনাহ্ করেনি এবং যে ব্যক্তি সব সময় দুরূদ শরীফ পড়ে, তাদের শরীর মাটি হজম করতে পারে না, যে ব্যক্তি নবীগণের শানে এটা বলে, 'তাঁরা মরে মাটির সাথে মিশে গেছেন', সে গোমরাহ এবং নবীর শানে বে-আদবী প্রদর্শনকারী।

ক্বিয়ামত কিভাবে আসবে এবং এর লক্ষণসমূহ

একদিন সমস্ত দুনিয়া, মানুষ জীব-জন্তু, জিন, ফিরিশতা, আসমান-যমীন এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে, সব বিলীন হয়ে যাবে। আল্লাহ্ ব্যতীত কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। এরপর পুনরায় সবাইকে জীবিত করা হবে। একেই ক্বিয়ামত বলা হয়। ক্বিয়ামত আসার আগে কিছু লক্ষণ প্রকাশ পাবে। তন্মধ্যে কয়েকটি এখানে লিপিবদ্ধ করা হলোঃ

১. ভূমিধ্বস
২. দ্বীনী ইলম্ উঠে যাবে অর্থাৎ ওলামা-ই দ্বীনকে উঠিয়ে নেয়া হবে।
৩. মূর্খতা বৃদ্ধি পাবে।
৪. মদ্যপান ও যিনা বৃদ্ধি পাবে। গরু-গাধার প্রজননের মত মানুষের মধ্যে বেহায়াপনা বৃদ্ধি পাবে।
৫. পুরুষের সংখ্যা কম এনং নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। শেষ পর্যন্ত একজন পুরুষের ভাগে পঞ্চাশজন নারী পড়বে।
৬. ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে।
৭. আরবে ক্ষেত-খামার বাগান এবং নদীর উৎপত্তি হবে। ফোরাত নদী স্বীয় গুপ্তভান্ডার খুলে দেবে এবং তা সোনার পাহাড়ে পরিণত হবে।
৮. পুরুষ নিজের স্ত্রীর কথামত চলবে। মা-বাপের কথা শুনবে না। বন্ধু-বান্ধব নিয়ে সব সময় ব্যস্ত থাকবে এবং মা-বাবাকে অবজ্ঞা করবে।
৯. গান-বাজনা বৃদ্ধি পাবে।
১০. মানুষ পূর্বপুরুষদের প্রতি লা'নত করবে এবং তাঁদেরকে মন্দ বলবে।
১১. বদকার ও অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে সরদার বানানো হবে।
১২. ঘৃণিত লোক যাদের ভাগ্যে পরণের জুতো ও কাপড় পর্যন্ত জুটতো না, তারা বড় বড় প্রাসাদেই বিচরণ করবে।
১৩. মসজিদে লোকেরা চেঁচামেচি করবে।
১৪. হাতের মুঠোয় অগ্নিকণা নেয়ার মত ইসলামের উপর অটল থাকাটা খুব কঠিন হবে। এমন কি মানুষ কবরস্থানে গিয়ে আরজু করবে, আহা! আমি যদি এ কবরে হতাম!
১৫. সময়ের মধ্যে কোন বরকত হবে না। বছর মাসের মত, মাস সপ্তাহের মত, সপ্তাহ দিনের মত এবং দিন তেমনি হবে যেমন কোন কিছুতে আগুন লাগল এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে গেলো। অর্থাৎ সময় খুব তাড়াতাড়ি অতিবাহিত হবে।
১৬. হিংস্র জন্তু মানুষের সাথে কথা বলবে, চাবুকের অগ্রভাগ, জুতার ফিতা কথা বলবে, ঘরে যা কিছু হয়েছে, সব বলে দেবে। এমন কি মানুষের রান তাকে খবর দিবে।

১৭. সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত হবে। এ লক্ষণটা প্রকাশ পাওয়ার সাথে সাথে তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। ওই সময় থেকে আর ইসলাম গ্রহণ গৃহীত হবে না।

১৮. বড় দাজ্জালের আর্বিভাব ছাড়াও আরও ত্রিশজন দাজ্জাল প্রকাশ পাবে, যারা সবাই নবী হওয়ার দাবী করবে; অথচ নবীর আগমনের ধারা শেষ হয়ে গেছে। আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পরে কোন নবী আসবে না। ওইসব দাজ্জালের মধ্যে অনেকে অতিবাহিত হয়ে গেছে। যেমন, মুসাইলামা কায্যাব, তুলায়হা ইবনে খুয়াইলেদ, আসওয়াদ আনাসী, সাজাহ্, মির্যা আলী মুহাম্মদ বাব, মির্যা আলী হোসাইন বাহাউল্লাহ, মির্যা গোলাম আহমদ ক্বাদিয়ানী ও আবুল আ'লা মওদুদী প্রমুখ এবং আরো যারা আসার বাকী আছে, তারা নিশ্চয়ই আসবে।

১৯. **দাজ্জালের আবির্ভাবঃ** দাজ্জাল কানা অর্থাৎ একচোখ বিশিষ্ট হবে এবং খোদা বলে দাবী করবে। তার কপালে كافر (কাফির) লিখা থাকবে। প্রত্যেক মুসলমান তা পড়তে পারবে; কিন্তু কাফিররা তা দেখবে না। সে খুবই দ্রুততার সাথে পরিভ্রমণ করবে। চল্লিশ দিনের মধ্যে প্রথম দিন বছরের বরাবর হবে। দ্বিতীয় দিন একমাসের বরাবর। তৃতীয় দিন এক সপ্তাহের বরাবর এবং অবশিষ্ট দিনগুলো চব্বিশ ঘন্টা হিসেবে হবে। তার ফিৎনা খুবই মারাত্মক হবে। একটি বাগান ও একটি অগ্নিকুণ্ড তার সাথে থাকবে, যার নাম সে যথাক্রমে জান্নাত ও দোযখ রাখবে। যেখানেই যাবে এ দু'টি তার সাথে থাকবে। তার জান্নাত আসলে অগ্নিকুন্ড এবং তার জাহান্নাম আরামের জায়গা হবে। লোকদেরকে বলবে, "আমাকে খোদা বলে স্বীকার কর।" যে তাকে খোদা বলে স্বীকার করবে, তাকে স্বীয় জান্নাতে স্থান দেবে এবং যে অস্বীকার করবে, তাকে তার দোযখে নিক্ষেপ করবে। মৃতকে জীবিত করবে, পানি বর্ষণ করবে, যমীনকে যখন নির্দেশ দেবে, তখনই সব্জি উৎপন্ন করবে। পরিত্যক্ত জায়গা দিয়ে যখন যাবে, সেখানকার খনিজ সম্পদ মৌমাছির মত তার পেছনে পেছনে চলতে থাকবে। সে অনেক আজগুবী বিষয় দেখাবে। কিন্তু মূলতঃ এসব কিছু যাদুরই কারসাজী, বাস্তবে কিছুই হবে না। এ জন্য সে সেখান থেকে চলে যাওয়ার পর লোকদের কাছে কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। যখন পবিত্র মক্কা ও মদীনায় প্রবেশ করতে চাইবে, তখন ফিরিশতাগণ তার মুখ ফিরিয়ে দেবেন। সে এ দু'টি পবিত্র ভূ-খণ্ডে প্রবেশ করতে পারবে না। দাজ্জালের সাথে ইহুদী সেনারা যোগ দেবে।

২০. **হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম-এর আসমান থেকে অবতরণঃ** যখন দাজ্জাল সারা পৃথিবী ঘুরে শাম (সিরিয়া) দেশে পৌঁছবে, তখন হযরত ঈসা আলায়হিস্

সালাম আসমান হতে দামেস্কের জামে মসজিদে অবতরণ করবেন। ইমাম মাহদী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে ইমামতির জন্য হুকুম দেবেন। হযরত ইমাম মাহদী নামায পড়াবেন। অভিশপ্ত দাজ্জাল হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম-এর শ্বাসের সুঘ্রাণে গলতে থাকবে যেমন পানি দ্বারা লবণ গলে থাকে। তাঁর শ্বাসের ঘ্রাণ ততদূর পর্যন্ত যাবে, যতদূর তাঁর দৃষ্টি পৌঁছবে আর দাজ্জাল পালাবে। তিনি তার পিছু নেবেন এবং তার পিঠে বল্লম মেরে তাকে শেষ করে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেবেন। অতঃপর হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম ক্রুশ চিহ্ন ভেঙ্গে ফেলবেন। শুকর হত্যা করবেন। যত ইহুদী-খ্রিস্টান বেঁচে থাকবে, তারা সবাই তাঁর প্রতি ঈমান আনতে চাইবে। কিন্তু তিনি ঘোষণা দেবেন- হয়তো দ্বীন-ই মুহাম্মদী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর কলেমা পড়ো, নতুবা কতল। সুতরাং ওই সময় সমগ্র পৃথিবীতে একমাত্র দ্বীনে ইসলামই ক্বায়েম হবে এবং একমাত্র আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মাযহাবটা বলবৎ থাকবে। শিশু সাপের সঙ্গে খেলবে, বাঘ ও ছাগল একসাথে অবস্থান করবে। তিনি বিবাহ করবেন। সন্তানাদিও হবে। চল্লিশ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকবেন। ইন্তেকালের পর তাঁকে হুযূর করীমের নিকট রওযা-ই পাকে দাফন করা হবে।

২১. **হযরত ইমাম মাহদীর আবির্ভাব ঃ** হযরত ইমাম মাহদী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বংশোদ্ভূত হুসাইনী সাইয়্যেদ হবেন। তিনি ইমাম ও মুজতাহিদ হবেন। ক্বিয়ামতের সন্নিকটে যখন সারা দুনিয়ায় কুফ্রী বিস্তার লাভ করবে এবং ইসলাম শুধু পবিত্র মক্কা-মদীনায় অবশিষ্ট থাকবে, তখন সমস্ত ওলী ও আবদাল হিজরত করে সেখানে চলে যাবেন। মাসটি রমযান মাসই হবে। আবদাল কা'বা শরীফের তাওয়াফ করতে থাকবেন। হযরত ইমাম মাহদীও সেখানে থাকবেন। আওলিয়া-ই কেরাম তাঁকে চিনে ফেলবেন। তাঁর কাছে বায়'আত হওয়ার জন্য সবাই আরয করবেন। কিন্তু তিনি অপারগতা প্রকাশ করবেন। তখন অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসবেঃ هٰذَا خَلِيْفَةُ اللّٰهِ الْمَهْدِيُّ فَاسْمَعُوْا لَهٗ وَاَطِيْعُوْهُ (ইনি আল্লাহর খলীফা মাহদী। তাঁর কথা শুনো ও তাঁর হুকুম মান্য করো!) এরপর, তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করবে। অতঃপর ইমাম মাহদী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁদের সবাইকে সাথে নিয়ে শাম দেশে (সিরিয়া) চলে যাবেন।

২২. **ইয়াজুজ-মাজুজের অবস্থাঃ** ইয়াজুজ-মাজুজ হচ্ছে ইয়াফিস ইবনে নূহ আলায়হিস্ সালাম-এর বংশোদ্ভূত একটি গোত্র। তাদের সংখ্যা অনেক। তারা

পৃথিবীতে ঝগড়া-ফ্যাসাদ করতো, বসন্তকালে বের হতো। তরতাজা জিনিসগুলো খেয়ে ফেলতো, শুষ্ক জিনিসগুলো বিনষ্ট করে ফেলতো। এমনকি মানুষকে খেয়ে ফেলতো ও বন্য জীবজন্তু, সাপ-বিচ্ছু কিছুই তাদের হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছিলো না। হযরত যুল ক্বারনাঈন লোহা ইত্যাদির দেওয়াল তৈরি করে তাদের আগমন বন্ধ করে দিয়েছেন। যখন দাজ্জালকে হত্যা করে আল্লাহর নির্দেশে হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম মুসলমানদেরকে নিয়ে তূর পাহাড়ে যাবেন, তখন দেওয়াল ভেঙ্গে ইয়াজূজ মাজূজ বাহিনী বের হবে এবং পৃথিবীতে বড় ফিত্না-ফ্যাসাদ সৃষ্টি করবে, লুটপাট, মারামারি, হত্যা ইত্যাদি করবে। অবশেষে হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম-এর দো'আয় আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস ও বিলীন করে দেবেন।

২৩. **'দা-ব্বাতুল আরদ্বের আবির্ভাবঃ** এটা একটা অদ্ভূত ধরনের জন্তু। সাফা পাহাড় থেকে বের হবে। খুবই অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত শহর পরিভ্রমণ করবে। সুস্পষ্টভাবে কথা বলবে। তার হাতে হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম-এর লাঠি এবং হযরত সুলাইমান আলায়হিস্ সালাম-এর আংটি থাকবে। লাঠি দ্বারা মুসলমানদের মাথায় একটি উজ্জ্বল চিহ্ন এবং আংটি দ্বারা কাফিরদের মাথায় একটি কাল দাগ বসিয়ে দেবে। তখন প্রত্যেক মুসলমান ও কাফিরের মধ্যে পার্থক্য প্রকাশ পাবে। অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে চেনা যাবে। এ চিহ্ন কখনও পরিবর্তিত হবে না। যে কাফির সে কখনও ঈমান আনবে না। যে মুসলমান সে সব সময় ঈমানের উপর অটল থাকবে।

২৪. **সুগন্ধময় হিমেল প্রবাহ ঃ** হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম-এর ইন্তিক্বালের পর এক পর্যায়ে তখন এমন ঠাণ্ডা সুগন্ধময় হাওয়া প্রবাহিত হবে, যা লোকদের বগলের নিচ দিয়ে অতিবাহিত হবে, যার প্রতিক্রিয়ায় মুসলমানদের রূহ বের হয়ে যাবে এবং শুধু কাফির আর কাফিরই থেকে যাবে। ওইসব কাফিরের উপরই ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে।

ক্বিয়ামতের এ কয়েকটি লক্ষণ বর্ণনা করা হলো। এগুলোর মধ্যে কয়েকটি এ পর্যন্ত প্রকাশ পেয়েছে এবং বাকীগুলো প্রকাশ পায়নি। যখন সব লক্ষণ প্রকাশ পাবে এবং মুসলমানদের বগলের নিচ দিয়ে ওই সুগন্ধময় হাওয়া প্রবাহিত হবে, যা দ্বারা সমস্ত মুসলমান মারা যাবে, তখন থেকে চল্লিশ বছর যাবৎ এমনভাবে অতিবাহিত হবে যে, এর মধ্যে কারো কোন সন্তান পয়দা হবে না। অর্থাৎ ক্বিয়ামতের দিন চল্লিশ বছরের কম বয়সের কেউ থাকবে না এবং দুনিয়াতে শুধু কাফিরই থাকবে। 'আল্লাহ' বলার মত কেউ থাকবে না। কেউ দেওয়াল ধরাবস্থায় থাকবে, কেউ পানাহারে রত থাকবে। মোট কথা সবাই নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত থাকবে। হঠাৎ আল্লাহ্ তা'আলার

নির্দেশে হযরত ইস্রাফীল আলায়হিস্ সালাম শিঙ্গায় ফুঁক দিবেন। প্রথমে এর আওয়াজ মৃদু হবে। অতঃপর এর আওয়াজ ক্রমান্বয়ে বড় হতে হতে ভীষণ ও বিকট হয়ে যাবে। লোকেরা কান লাগিয়ে ওই আওয়াজ শুনবে এবং বেঁহুশ হয়ে পড়ে যাবে ও মারা যাবে। এরপর আসমান, যমীন, সাগর, নদী, পাহাড়, পর্বত, এমনকি স্বয়ং শিঙ্গা, ইস্রাফীল আলাইহিস্ সালাম ও সমস্ত ফিরিশতা ফানা হয়ে যাবে। ওই সময় একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কিছু থাকবে না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা যখন ইচ্ছে করবেন, যখন ইস্রাফীল আলাইহিস্ সালামকে জীবিত করবেন এবং শিঙ্গা তৈরি করে দ্বিতীয়বার ফুঁক দেবার নির্দেশ দান করবেন। শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার সাথে সাথে আগে ও পরের সব কিছু, ফিরিশতা, মানুষ, জিন, জীবজন্তু সবকিছু জীবিত ও মওজুদ হয়ে যাবে। লোকেরা কবরসমূহ থেকে বের হয়ে আসবে। তাদের আমলনামা তাদের হাতেই দেয়া হবে এবং সবাইকে হাশরের ময়দানে আনা হবে। এখানে সবাই হিসেব-নিকাশ ও পরিণতির অপেক্ষায় থাকবে। যমীন তামার হবে, সূর্য খুবই প্রখরতার সাথে মাথার খুবই নিকটে থাকবে। গরমের তেজে শরীর ঝলসে যাবে, জিহ্বা শুকিয়ে যাবে। অনেকের জিহ্বা বের হয়ে যাবে। অনেক ঘাম বের হবে। কারো গোড়ালী, কারো হাঁটু, কারো গলা এবং কারো মুখ পর্যন্ত ঘামে ডুবে যাবে। যার যেমন আমল তেমন কষ্ট পাবে। তদুপরি ওই ঘাম খুবই দুর্গন্ধময় হবে। এ অবস্থায় অতিদীর্ঘ সময় অতিবাহিত হবে। ওই দিনটা হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমতুল্য। এভাবে অর্ধ দিবস অতিবাহিত হওয়ার পর লোকেরা সুপারিশকারীর সন্ধান করবে, যিনি এ মুসীবত থেকে রেহাই দিতে পারেন এবং বিচার কার্যটা যেন সহসা হয়ে যায়।

লোকেরা পরস্পর পরামর্শ করে হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম-এর কাছে যাবে। তিনি বলবেন, হযরত নূহ আলাইহিস্ সালাম-এর কাছে যাও। তিনি হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর কাছে পাঠাবেন। হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম-এর কাছে যাবার জন্য বলবেন। হযরত মুসা আলায়হিস সালাম হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম-এর কাছে পাঠাবেন। হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম আমাদের আক্বা ও মাওলা রহমতে আলম সাইয়্যেদুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে ফরিয়াদ করবেন এবং সুপারিশ করার জন্য অনুরোধ করবেন । তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করবেন, "আমি এ কাজের জন্য প্রস্তুত।" এটা বলে তিনি আল্লাহ তা'আলার দরবারে সাজদায় পড়বেন। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ ফরমাবেন, "মাথা তুলুন! বলুন, (যা বলবেন) শুনা হবে, সুপারিশ করুন! (যা সুপারিশ করবেন) গৃহীত হবে।"

মানুষের হাত-পা ও শরীরের অন্যান্য অঙ্গ নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। যমীনের কোন অংশে কোন আমল করে থাকলে সেটাও সাক্ষ্য দেয়ার জন্য তৈরি থাকবে। কোন বন্ধু বা কোন সাহায্যকারী থাকবে না। বাপ ছেলের কাজে আসবে না এবং ছেলে বাপের কাজে লাগবে না। আমলসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। সারা জীবনের আমলসমূহ সামনেই থাকবে। গুনাহ থেকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। অন্য কোন জায়াগা থেকে নেকী লাভ করারও কোন পথ নেই। এ অসহায় অবস্থায় একমাত্র হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-ই সহায় হবেন। তিনি তাঁর আনুগত্যকারীদের জন্য সুপারিশ করবেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সুপারিশ কয়েক রকমের হবে। অনেক লোক তাঁর সুপারিশে বিনা হিসাব-নিকাশে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। অনেক লোক দোযখের উপযোগী হলেও হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সুপারিশে দোযখ থেকে রক্ষা পাবে। যেসব গুনাহ্গার মুসলমান দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে, তাদের অনেকে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সুপারিশে দোযখ থেকে রক্ষা পাবে। অনেক জান্নাতীর জন্য সুপারিশ করে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ছাড়াও অন্যান্য নবীগণ, সাহাবা, উলামা, আওলিয়া, শহীদগণ, হাফেয এবং হাজীগণও এরপর সুপারিশ করবেন। লোকেরা আলেমদেরকে তাদের সম্পর্কের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। যদি দুনিয়াতে কোন ব্যক্তি কোন আলেমকে ওযূ করার জন্য পানি এনে দিয়ে থাকে, সেটার কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়ে সুপারিশের জন্য বলবে এবং তিনি এর জন্য সুপারিশ করবেন। ক্বিয়ামতের এ দিন, যেটা পঞ্চাশ হাজার বছরের সমতুল্য হবে এবং যার মুসীবতসমূহ অগণিত ও একান্ত অসহনীয় হবে, নবী, ওলী ও নেক্কারদের জন্য তত হালকা করে দেয়া হবে যে, মনে হবে, যেন এক ওয়াক্ত নামায পড়ার সমতুল্য সময় লেগেছে বরং এর থেকেও কম সময় মনে হবে। এমনকি অনেকের জন্য এক পলকে সারাদিন অতিবাহিত হয়ে যাবে।

পরিশেষে, বেহেশতে মুসলমানরা সবচেয়ে বড় নি'মাত যেটা লাভ করবে, সেটা হলো আল্লাহর দিদার। এ পর্যন্ত হাশরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো। এবার মানুষের স্থায়ী নিবাসে যাবার পালা। কারো জুটবে আরামের নিবাস, যেখানে আরাম-আয়েশের কোন শেষ নেই। একে জান্নাত বলা হয়। কাউকে কষ্টের আবাসে যেতে হবে, যার কষ্টের কোন সীমা নেই। সেটাকে দোযখ বলা হয়। জান্নাত ও দোযখ সত্য। এগুলোর অস্বীকারকারী কাফির। জান্নাত ও দোযখ তৈরি হয়ে গেছে। এখনও মওজুদ আছে। এটা নয় যে, ক্বিয়ামতের দিন তৈরি করা হবে। ক্বিয়ামত,

হিসাব-নিকাশ, হাশর, সাওয়াব, আযাব, জান্নাত, দোযখ-এ সবকটি, যা মুসলমানদের মধ্যে প্রসিদ্ধ, অস্বীকারকারী কাফির। ক্বিয়ামত অবশ্যই ক্বায়েম হবে। এর অস্বীকারকারী কাফির।

হাশর রূহ ও শরীর উভয়ের উপর হবে। যে ব্যক্তি বলে- কেবল রূহ উঠবে, শরীর জীবিত হবে না, সেও কাফির। দুনিয়াতে রূহ যে শরীরে ছিল ওই রূহের হাশর ওই শরীরেই হবে। বিক্ষিপ্ত হয়ে গেলেও ওইগুলোকে মৃত্যুর পর একত্রিত করে ক্বিয়ামতে উঠানো হবে। হিসাব-নিকাশ হক্ব। আমলসমূহের হিসেব হবে। এর অস্বীকারকারী কাফির।

মীযান

মীযান হক্ব। এটা এক প্রকার পরিমাপক দণ্ড। এর দু'টি পাল্লা হবে। এতে লোকদের ভাল-মন্দ আমলসমূহ ওজন করা হবে। নেকীর পাল্লা ভারী হওয়া মানে দুনিয়াবী ওজনের বিপরীত উপরের দিকে উঠে যাওয়া।

পুলসিরাত্ব

পুলসিরাত হক্ব। এটা একটা পুল। সেটা জাহান্নামের উপরে হবে। চুল থেকে বেশী সরু এবং তলোয়ার থেকেও বেশী ধারালো। জান্নাতে যাবার এটাই একমাত্র পথ। সবাইকে এটার উপর দিয়ে যেতে হবে। কাফিররা এটা অতিক্রম করতে পারবে না। দোযখে পড়ে যাবে। মুসলমানগণ পার হয়ে যাবে। অনেকে পার হবে বিদ্যুৎ চমকের মত। অনেকে হাওয়ার মত, অনেকে দ্রুতগামী ঘোড়ার মত, অনেকে আস্তে আস্তে, অনেকে খুবই নাজুক অবস্থায় ও ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় পার হবে। যত ভাল আমল হবে, ততই তাড়াতাড়ি পার হবে।

হাউযে কাউসার

আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে যে 'হাউযে কাউসার দেয়া হয়েছে, তা সত্য। এর দৈর্ঘ্য এক মাসের পথ এবং প্রস্থও অনুরূপ। এর কিনারা স্বর্ণের, যার উপর মুক্তার গম্বুজ স্থাপিত আছে। এর তলদেশ ইয়াক্বূত (পদ্মরাগ মণি) ও অন্যান্য মুক্তা দ্বারা নির্মিত এবং এর পানি দুধের চেয়েও অধিক সাদা এবং মধু থেকেও অধিক মিষ্ট এবং মেশ্ক্ থেকে অধিক সুগন্ধময়। যে এর পানি একবার পান করবে, সে কখনও তৃষ্ণার্ত হবে না। ওখান থেকে পানি নেয়ার পাত্র তারকারাজি থেকেও সংখ্যায় অধিক। ওটাতে জান্নাত থেকে দু'টি নল দিয়ে পানি পতিত হয়। নল দুটির একটি স্বর্ণের এবং অপরটি রৌপ্যের।

মক্বামে মাহমুদ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় হাবীব মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি

ওয়াসাল্লামকে মক্বামে মাহমুদ দান করবেন, যেখানে আগের ও পরের সবাই তাঁরই প্রশংসা করবেন। [তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করবেন।]

লেওয়াউল হামদ

এটা একটা ঝাণ্ডা, আমাদের আক্বা মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ক্বিয়ামতের দিন লাভ করবেন, যার নিচে হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম থেকে শুরু করে হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম পর্যন্ত সমস্ত নবী, ক্বিয়ামত পর্যন্ত যত মুসলমান হয়েছে ও হবে এবং সমস্ত ওলী সমবেত হবেন।

জান্নাতের বর্ণনা

জান্নাত হচ্ছে একটি খুবই বড় ও খুবই উত্তম উদ্যান, যেটা আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের জন্য তৈরি করেছেন। এর দেয়াল হচ্ছে সোনা ও রূপার ইট এবং মুশকের সিমেন্ট দ্বারা তৈরি, মেঝে জাফরান ও আম্বরের তৈরি এবং পাথরসমূহ মুণিমুক্তার। এর মধ্যে জান্নাতীগণ থাকার জন্য খুবই সুন্দর হীরা ও মুক্তার বড় বড় মহল ও তাঁবু রয়েছে। জান্নাতের একশ'টি দরজা রয়েছে। প্রত্যেক দরজার প্রশস্ততা আসমান থেকে যমীনের দূরত্বের সমান। দরজার এক পাশ থেকে আর এক পাশে যেতে দ্রুতগামী ঘোড়ার সময় লাগে সত্তর বছর। জান্নাতে এর নি'মাতসমূহ তেমনি হবে, যা কেউ কল্পনাও করতে পারে না। নানা রকম ফলমূল, দুধ, মধু, পবিত্র শরাব, ভাল ভাল খাবার এবং উত্তম কাপড়, যেগুলো দুনিয়াতে পরার কারো সৌভাগ্য হয়নি, ইত্যাদি নি'মাত জান্নাতীদেরকে দেয়া হবে। খেদমত করার জন্য হাজার হাজার পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন গেলমান এবং সুহ্বতের জন্য পবিত্র হুর ও বিবিগণ, যেগুলো এতসুন্দর হবে যে, যদি এদের মধ্যে কেউ দুনিয়ার দিকে একবার উঁকি মেরে দেখে, তাহলে এর ঝলক ও সৌন্দর্যে সমস্ত মানুষ বেহুঁশ হয়ে যাবে। বেহেশ্‌তে কোন ঘুম আসবে না। কোন রোগ হবে না, কোন ভয় থাকবে না, কখনো মৃত্যু হবে না, কোন প্রকারের কষ্টভোগ করতে হবে না; বরং সব রকমের আরাম অর্জিত হবে, প্রত্যেক বাসনা পূর্ণ হবে এবং সবচেয়ে বড় নি'মাত হিসেবে তা'তে আল্লাহ তা'আলার দীদার নসীব হবে।

দোযখ

এটাও একটি গহ্বর, যার মধ্যে ঘোর অন্ধকার এবং খুবই উত্তপ্ত কালো আগুন বিরাজমান, যার মধ্যে আলোর কোন নাম নিশানা নেই। এটা বদকার ও কাফিরদের জন্য তৈরি করা হয়েছে। কাফিরদেরকে সব সময় এতে বন্দী রাখা হবে। এর আগুন প্রতি মুহূর্তে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। দোযখের আগুন এত উতপ্ত যে, সুঁই এর ছিদ্র বরাবরও যদি খুলে দেয়া হয়, তাহলে পৃথিবীর সমস্ত লোক এর গরমে মারা যাবে।

যদি জাহান্নামের কোন দারোগা দুনিয়াতে আসে, তাহলে তাঁর ভয়াল আকৃতি দেখে সমস্ত লোকের প্রাণ বের হয়ে যাবে। জাহান্নামীদেরকে নানা প্রকারের আযাব দেয়া হবে। বড় বড় সাপ ও বিচ্ছু কামড়াবে, ভারী ভারী হাতুড়ী দিয়ে মাথায় আঘাত করা হবে। যখন ভীষণ ক্ষুধা, তৃঞ্চা অনুভব হবে, তখন তেলে ফুটন্ত তলানি ও পুঁজ পান করার জন্য এবং কাঁটা বিশিষ্ট ও বিষাক্ত যাক্কুম ফল খাবার জন্য দেয়া হবে। যখন ওই ফল খাবে, তখন তা গলায় আটকে যাবে। ওটাকে অপসারিত করার জন্য পানি তালাশ করলে সেই ফুটন্ত পানি দেয়া হবে। সেই পানি পান করার ফলে নাড়িভুঁড়ি টুকরা টুকরা হয়ে বের হয়ে আসবে। কাফিররা আযাবে অতিষ্ঠ হয়ে যখন মৃত্যু কামনা করবে এবং মৃত্যুও আসবে না, তখন সবাই পরস্পর পরামর্শ করে জাহান্নামের দারোগা হযরত মালেক আলাইহিস্ সালামকে আহবান করে বলবে- আপনার রবকে বলে আমাদের ব্যাপারটা মীমাংসা করে ফেলুন। হযরত মালেক আলাইহিস্ সালাম হাজার বছর পর্যন্ত কোন উত্তর দেবেন না। হাজার বছর পর বলবেন, আমাকে কেন বলছো? তাঁকেই বল যার নাফরমানী করেছো। অতঃপর হাজার বছর পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলাকে তাঁর রহমতের বিভিন্ন নামে আহবান করবে। হাজার বছর পর্যন্ত কোন উত্তর দেবেন না। এরপর যা বলবেন, তা হচ্ছে- ''দূর হও, জাহান্নামে পড়ে থাকো, আমার সাথে কোন কথা বলো না।'' ওই সময় কাফিররা সকল প্রকারের কল্যাণ থেকে নিরাশ হয়ে যাবে এবং গাধার আওয়াজের মত চিৎকার করে কাঁদবে। প্রথমে চোখের পানি বের হবে এরপর বের হবে রক্ত। কাঁদতে কাঁদতে দু'গণ্ডদেশে কূপের মত গর্ত হয়ে যাবে। কান্নার রক্ত ও পুঁজ এত অধিক হবে যে, যদি এর উপর নৌকা রাখা হয়, তাহলে চলতে পারবে। জাহান্নামীদের আকৃতি এমন বিশ্রী হবে যে, যদি কোন জাহান্নামীকে দুনিয়াতে সেই আকৃতিতে আনা হয়, তাহলে এর বীভৎস চেহারা ও দুর্গন্ধের কারণে দুনিয়ার সমস্ত মানুষ মারা যাবে। শেষ পর্যন্ত কাফিরদের জন্য এটাই করা হবে যে, প্রত্যেক কাফিরকে প্রত্যেকের মাপ বরাবর সিন্ধুকে বন্ধ করা হবে। অতঃপর আগুন প্রজ্বলিত করা হবে এবং আগুনের তালা লাগানো হবে। এরপর এ সিন্দুককে আর একটি আগুনের সিন্দুকে রাখা হবে এবং উভয়ের মাঝখানে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হবে আর ওটাতেও তালা লাগিয়ে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। তখন প্রত্যেক কাফির মনে করবে যে সে ব্যতীত আর কেউ জাহান্নামে নেই। এটা আযাবের উপর আযাব এবং এ আযাব সব সময়ের জন্য থাকবে। সেটা কখনও শেষ হবে না। যখন সমস্ত জান্নাতী জান্নাতে প্রবেশ করবেন এবং জাহান্নামে কেবল ওইসব লোকেরাই রয়ে যাবে, যাদেরকে ওখানে সব সময় থাকতে হবে, তখন জান্নাত ও দোযখের

মাঝখানে মৃত্যুকে ভেঁড়ার আকৃতিতে এনে দাঁড় করানো হবে। অতঃপর এক আহবানকারী জান্নাতবাসীদেরকে আহবান করবে। তাঁরা ভয় পেয়ে উঁকি মেরে দেখবেন যে, বের হয়ে যাবার হুকুম হলো কিনা। এরপর জাহান্নামীদেরকে আহবান করবে। ওরা আনন্দিত হয়ে উঁকি মেরে দেখবে যে, মুসীবত থেকে মুক্তি দেয়ার নির্দেশ হলো কিনা। পুনরায় সবাইকে জিজ্ঞাসা করা হবে, এটাকে চিনো? সবাই বলবে, হ্যাঁ এটা মৃত্যু। অতঃপর সেটাকে যবেহ করা হবে, আর বলবে, হে জান্নাতবাসীগণ, তোমরা চিরস্থায়ী হয়ে গেছো। এখন আর মৃত্যু নেই এবং হে দোযখবাসীগণ, তোমরা চিরস্থায়ী হয়ে গেছো। আর মৃত্যু নেই। এতে জান্নাতীদের আনন্দের সীমা থাকবে না আর জাহান্নামীরা সীমাহীন মর্মাহত হবে-

نَسْئَلُ اللّٰهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِى الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

অর্থাৎ- আল্লাহর কাছে দ্বীন দুনিয়া, ও আখিরাতে ক্ষমা ও পানাহ্ চাই।

ঈমান ও কুফর

ঈমান হচ্ছে আল্লাহ ও রসুল কর্তৃক বর্ণিত সমস্ত বিষয় বিশ্বাস করা এবং আন্তরিকভাবে সত্য মনে করা। যদি কেউ এমন একটি বিষয়ও অস্বীকার করে, যা ইসলামী বিষয় বলে নিশ্চিতভাবে জানা আছে, তাহলে সে কাফির। যেমন ক্বিয়ামত, ফিরিশতা, জান্নাত, দোযখ, হিসেবকে বিশ্বাস না করা, অথবা নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাতকে ফরয মনে না করা বা ক্বোরআনকে আল্লাহর কালাম বলে বিশ্বাস না করা, ক্বোরআন বা কোন নবী ও ফিরিশতার প্রতি অবজ্ঞা করা বা কোন সুন্নাতকে নগণ্য বলা, শরীয়তের বিধান নিয়ে উপহাস করা, অনুরূপ ইসলামের কোন জানা ও প্রসিদ্ধ বিষয় অস্বীকার করা বা এতে সন্দেহ পোষণ করা নিঃসন্দেহে কুফর। মুসলমান হওয়ার জন্য ঈমান ও আস্থার সাথে সাথে মুখে বলাও জরুরী। যদি কোন বিপদের সম্মুখীন হয়, যেমন মুখ দিয়ে ঈমান বিরোধী কথা না বললে জীবন নাশের বা অঙ্গহানির সম্ভাবনা থাকে, এমতাবস্থায় জান বাঁচানোর জন্য অন্তরে ঈমান ঠিক রেখে ইসলাম বিরোধী কথাও বলা যেতে পারে, তবে না বলাটাই উত্তম ও সাওয়াবের কাজ। এমন অবস্থা ছাড়া অন্য কোন সময়ে মুখে কুফরী শব্দ বললেই কাফির হয়ে যাবে। অনুরূপ কুফরীর লক্ষণ বিশিষ্ট কাজ করলে কাফির সাব্যস্ত করা হবে। যেমন টিকি রাখা, ক্রুশচিহ্ন ঝুলানো, পৈতা পরা।

মুসলমান হওয়ার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, কেবল দ্বীন ইসলামকে সত্য ধর্ম মনে করা, দ্বীনের কোন জরুরী বিষয়কে অস্বীকার না করা এবং দ্বীনের প্রয়োজনীয় কোন বিষয়ের বিপরীত কাজ না করা এবং দ্বীনের প্রয়োজনীয় কোন বিষয়ের বিপরীত আক্বীদা পোষণ না করা; যদিও দ্বীনের সমস্ত বিষয় সম্পর্কে তার জ্ঞান না থাকে।

অতএব একেবারে মূর্খ ব্যক্তি, যে ইসলাম ও ইসলামের নবীকে হক্ব মনে করে এবং ইসলামী আক্বীদার বিপরীত কোন আক্বীদা পোষণ করে না, বরং কলেমা পড়েছে, তবে শুদ্ধভাবে পড়তে না পারলেও, সে মুসলমান ও মু'মিন; কাফির নয়। অবশ্য নামায, রোযা, হজ্ব ইত্যাদি আমল বর্জন করলে গুনাহগার হবে; কিন্তু মু'মিন হিসেবেই গণ্য হবে। কেননা আমল মূল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নয় বরং আমল দ্বারা ঈমানের নূর বৃদ্ধি পায়। আমলবিহীন মুসলমানকে ফাসিক্ব মু'মিন বলা হয়।

আক্বীদা ঃ যে জিনিসটা নিঃসন্দেহে হারাম, ওটাকে হালাল মনে করা এবং যেটা নিঃসন্দেহে হালাল ওটাকে হারাম মনে করা কুফর।

আক্বীদা ঃ কবীরা গুনাহ্র কারণে মুসলমান কাফির হয়ে যায় না; বরং মুসলমানই রয়ে যায়। যদি বিনা তওবায় মৃত্যুবরণ করে, তাহলে দীর্ঘকাল কঠিন আযাব ভোগ করার পর ঈমানের কারণে জান্নাত লাভ করবে। গুনাহর কারণে শাস্তি ভোগ করে ক্ষমা পাবে এবং এ ক্ষমা হয়তো আল্লাহ্ তা'আলার স্বীয় মেহেরবাণীতে কিংবা হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শাফা'আতের বদৌলতে লাভ করবে।

মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি কোন মৃত কাফিরের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বা কোন কাফির-মুরতাদকে মরহুম, মাগফুর বা জান্নাতী বলে অথবা কোন বিধর্মীকে জান্নাতী বলে, সে নিজেও কাফির।

আক্বীদা ঃ মুসলমানকে মুসলমান মনে করা এবং কাফিরকে কাফির জানা প্রয়োজন। নিশ্চিত কাফিরের ব্যাপারে সন্দেহ করলে নিজেই কাফির হয়ে যায়। এ জন্য শরীয়তের হুকুম বাহ্যিক আচরণের উপরই হয়ে থাকে। অবশ্য ক্বিয়ামতের দিন বাস্তবতা অনুসারে ফয়সালা হবে। এটাকে এভাবে বুঝে নিন যে, কোন কাফির ইহুদী, খৃষ্টান বা হিন্দু মৃত্যুবরণ করলো; কিন্তু আমাদের প্রতি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের হুকুম হচ্ছে তাকে কাফির মনে করা এবং তার সাথে কাফির হিসেবে আচরণ করা। অনুরূপ, যে প্রকাশ্যভাবে মুসলমান এবং তার কোন কথা বা কাজ ইসলাম বিরোধী পাওয়া যায়নি, তখন আমাদের উপর ফরয হচ্ছে তাকে মুসলমান মনে করা।

আক্বীদা ঃ কুফর ও ইসলাম ছাড়া তৃতীয় কোন স্তর নেই। মানুষ হয়তো মুসলমান নতুবা কাফির। কাফিরও নয়, মুসলমানও নয়, এ ধরনের কোন স্তর নেই; বরং এ উভয়ের যে কোন একটা মাত্র অবস্থান অবশ্যই রয়েছে।

আক্বীদা ঃ মুসলমান জান্নাতে প্রবেশ করার পর সব সময় জান্নাতে থাকবে; কখনো বের করে দেয়া হবে না এবং কাফির সব সময় দোযখে থাকবে; কখনো বের করা হবে না।

মাসআলা ঃ আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কাউকে ইবাদতের নিয়্যতে সাজদা করা শির্ক (কুফরী) এবং তা'যীমী সাজদা হারাম। এটাই হক্কানী ইমামগণের অভিমত।

[আয়যুবদাতুয্ যাকিয়্যাহ্ :কৃত- ইমাম আহমদ রেযা রাহ্মাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি]

বিদ‘আত

যে বিষয়টা কোনভাবেই হুযূর সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয়, সেটা বিদ‘আত। বিদ‘আত দু প্রকারঃ ১. বিদ‘আতে হাসানাহ্ ২. বিদ‘আতে সাইয়ে‘আহ্। বিদ‘আতে হাসানাহ্ হচ্ছে, যা কোন সুন্নাতের বিপরীত বা বিলুপ্তকারক নয়। যেমন মসজিদসমূহ পাকা করা, সোনালী হরফে ক্বোরআন শরীফ লিখা, মুখে নিয়্যত করা, ইলমে কালাম, ইলমে সরফ, ইলমে নাহ্ভ, ইলমে বিয়াযী, বিশেষ করে জ্যোতিষ্ক বিদ্যা ও অংক শাস্ত্র ইত্যাদি পড়া ও পড়ানো, আজকালকার মাদরাসাসমূহ, মিলাদ মাহফিল, ওয়াযের মাহফিল, সনদপত্র প্রদান, দস্তারবন্দী ইত্যাদি বিষয়, যা হুযূর সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে ছিলো না, ওইসব কাজ ‘বিদ‘আতে হাসানাহ’ (উত্তম বিদ‘আত)। এমনকি এ ধরনের অনেক বিদ‘আত ওয়াজিব পর্যন্ত হয়ে থাকে। তারাবীহ্ সম্পর্কে হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু এরশাদ করেছেন- نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هٰذِهٖ (এটা উত্তম বিদ‘আত)। বিদ‘আতে সাইয়ে‘আহ্ হচ্ছে সেটাই, যা কোন সুন্নাতের বিপরীত বা সুন্নাত বিলুপ্তকারী হয়ে থাকে। এমন বিদ‘আত মাকরূহ কিংবা হারাম।

ইমামত ও খিলাফত

ইমামত দু’প্রকারঃ

এক. ‘ইমামতে সুগরা’ অর্থাৎ ছোটতর ইমামত এবং **দুই.** ‘ইমামতে কুবরা’ অর্থাৎ বড়তর ইমামত।

নামাযের ইমামত হচ্ছে ‘ইমামতে সুগরা’, যার আলোচনা নামাযের অধ্যায়ে করা হবে। ‘ইমামতে কুবরা’ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতিনিধি হিসেবে মুসলমানদের সমস্ত দ্বীনি ও দুনিয়াবী কাজে শরীয়ত মুতাবেক সার্বিক হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা এবং পাপ নয় এমন সব বিষয়ে মুসলমানদের থেকে আনুগত্য আদায়ের অধিকার। এ ধরনের ইমামতের জন্য মুসলমান, আযাদ, পুরুষ, জ্ঞানী, প্রাপ্তবয়স্ক, ক্বোরাইশী ও সামর্থ্যবান হওয়া পূর্বশর্ত। অবশ্য স্বীয় যুগে সবচেয়ে উত্তম হতে হবে এমন ধরনের কোন শর্ত নেই।

মাসআলা ঃ ইমামের আনুগত্য সাধারণভাবে প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয; যদি ইমামের হুকুম শরীয়তের বিপরীত না হয়। শরীয়তের বিরুদ্ধে কারো হুকুমের আনুগত্য নেই।

মাসআলা ঃ এমন লোককে ইমাম মনোনীত করা চাই, যিনি সাহসী, রাজনীতিবিদ ও আলেম হবেন কিংবা ওলামায়ে কেরামের সাহায্যে কার্য পরিচালনা করেন।

মাসআলা ঃ মহিলা ও অপ্রাপ্ত বয়স্কের ইমামত না জায়েয।

খোলাফায়ে রাশেদীন

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পর বরহক্ব খলীফা ও

সার্বিক বিষয়ে ইমাম হচ্ছেন হযরত সায়্যেদুনা আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু। অতঃপর হযরত সায়্যেদুনা ওমর ফারূক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু, অতঃপর হযরত সাইয়্যেদুনা ওসমান গনী রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু ও অতঃপর হযরত সাইয়্যেদুনা মাওলা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু। এরপর হযরত সাইয়্যেদুনা ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু। তাঁদের খিলাফতকে ‘খিলাফতে রাশেদা’ বলা হয়। কারণ তাঁরা হুযূর সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সঠিক প্রতিনিধিত্বের পূর্ণ হক্ব আদায় করেছেন।

আক্বীদা ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পর ‘খিলাফতে রাশেদা’ ত্রিশ বছর পর্যন্ত স্থায়ী ছিলো। অর্থাৎ হযরত সায়্যেদুনা ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু ছয়মাস খিলাফত করার পর শেষ হয়ে যায়। আবার আমিরুল মু’মিনীন ওমর ইবনে আবদুল আযীযের খিলাফতও ‘খিলাফতে রাশেদা’ হিসেবে গণ্য হয়। আর শেষ যুগে হযরত ইমাম মাহদীর খিলাফতও ‘খিলাফতে রাশেদা’ হিসেবে বিবেচ্য হবে। হযরত আমীরে মু‘আবিয়া হচ্ছেন ইসলামী জগতের প্রথম ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ্। [তাকমীলুল ঈমান কৃত- কামাল ইবনে হুম্মাম]

আক্বীদা ঃ নবীগণ ও রাসূলগণের পর খোদার সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে জিন, মানুষ ও ফিরিশতা থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন হযরত সিদ্দীক্বে আকবর আবূ বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু। অতঃপর হযরত ফারূক্বে আ’যম, অতঃপর হযরত ওসমান এবং তারপর হযরত মাওলা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহুম। যে ব্যক্তি মাওলা আলীকে হযরত সিদ্দীক্বে আকবর বা ফারূক্বে আ’যম থেকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে, সে গোমরাহ ও বদমযহাবী।

সাহাবা-ই কেরাম ও আহলে বায়ত

সাহাবী ওই মুসলমানকে বলা হয়, যিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় দরবারে ঈমান সহকারে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং ঈমান সহকারে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। সমস্ত সাহাবী মর্যাদাবান, ন্যায়পরায়ণ তাক্বওয়া ও মানবিক গুণাবলীর অধিকারী এবং সম্মানের পাত্র। যখন কোন সাহাবীর আলোচনা হয়, তখন তা সম্মান পূর্বক হওয়া ফরয।

আক্বীদা ঃ কোন সাহাবীর প্রতি বদ আক্বীদা পোষণ করা গোমরাহী ও বদমাযহাবীর পরিচায়ক। হযরত আমীরে মু‘আবিয়া, হযরত আমর ইবনুল আস প্রমুখ সাহাবীর শানে বেআদবী করা রাফেযীদের আচরণ। হযরত শায়খাঈন অর্থাৎ হযরত আবূ বকর ও হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহুমার নিন্দা করা এবং তাঁদের খিলাফতকে অস্বীকার করা ফকীহ্গণের মতে কুফরী।

আক্বীদা ঃ কোন ওলী যতই মরতবার মালিক হোন না কেন, কোন সাহাবীর মর্যাদায় পৌঁছতে পারেন না। হযরত মাওলা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু-এর সাথে

হযরত আমীরে মু'আবিয়ার যুদ্ধে ইজতিহাদী ভুল ছিল, যা গুনাহ নয়। এ জন্য হযরত আমীরে মু'আবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে যালিম, বিপ্লবী, বিদ্রোহী এবং এ জাতীয় কোন মন্দ শব্দ বলা ও লিখা হারাম ও না-জায়েয; বরং অভিশপ্ত ও রাফেযীদের আচরণ। আহলে বায়ত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বিবিগণ এবং বংশধর সাহাবীদের মত তাঁদেরও অনেক ফযীলতের কথা ক্বোরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। সাহাবা ও আহলে বায়তের প্রতি মুহব্বত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি মুহব্বত বুঝায়।

আক্বীদা ঃ যারা ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে বিদ্রোহী বা ইয়াযীদকে বরহক্ব বলে, তারা মরদূদ, খারেজী ও জাহান্নামের উপযোগী। ইয়াযীদ নাহক্ব, ফাসিক্ব-ফাজির ও অভিশপ্ত হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

আক্বীদা ঃ যে সাহাবায়ে কেরাম ও আহলে বায়তের প্রতি মুহব্বত রাখে না, সে গোমরাহ্ ও বদমযহাবী।

মাসআলাঃ সাহাবা-ই কেরামের মধ্যে পরস্পর যেসব ঘটনাবলী হয়েছে, ওইগুলো নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করা জঘন্য হারাম। তাঁদের সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য অভিযুক্ত করা, তাঁদের সমালোচনা করা বা তাঁদের প্রতি খারাপ আক্বীদা পোষণ করা না জায়েয এবং আল্লাহ ও রসূলের প্রদত্ত আদর্শের বিপরীত।

ইসলামের কলেমাসমূহ ও কতিপয় পারিভাষিক শব্দ

ঈমান হলো ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের প্রথম ও প্রধান স্তম্ভ। ঈমান অর্থ বিশ্বাস। শরীয়তের পরিভাষায় আল্লাহ ও তাঁর সমস্ত গুণাবলী, ফিরিশতাগণ, আসমানী কিতাবসমূহ ও নবী-রসূলগণ এবং আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন, ওইগুলোকে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করা, আন্তরিকভাবে মান্য করাকে ঈমান বলা হয়। মুখে তা স্বীকার করা, ঈমান প্রকাশের পূর্বশর্ত। আমল হচ্ছে ঈমানের অলংকার। প্রধানতঃ ছয়টি কলেমা দ্বারা ঈমানের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। কলেমাগুলো নিম্নে প্রদত্ত হলো-

কলেমা তৈয়্যব

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

উচ্চারণ ঃ লা-ইলা-হা- ইল্লাল্লা-হু মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্।

অর্থ ঃ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল।

কলেমা-ই শাহাদাত

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

উচ্চারণ ঃ আশ্হাদু আল্ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহূ লা-শরী-কা লাহূ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূ-লুহূ।

অর্থ ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর

কোন শরীক নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর খাস বান্দা ও তাঁর রসূল।

কালেমা-ই তাওহীদ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَاحِدًا لَّاثَانِىَ لَكَ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ اِمَامُ الْمُتَّقِيْنَ رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

উচ্চারণঃ লা-ইলা-হা ইল্লা-আন্তা ওয়া- হিদাল্ লা-সা-নিয়া লাকা। মুহাম্মাদুর রসূ-লুল্লা-হি ইমামুল মুত্তাক্বী-না রসূ-লু রাব্বিল 'আ-লামী-ন।

অর্থ ঃ (হে আল্লাহ্) তুমি ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নেই। তুমি এক, তোমার কোন দ্বিতীয় নেই। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রসূল, পরহেয্গারদের ইমাম, বিশ্ব প্রতিপালকের পক্ষ হতে প্রেরিত (রাসূল)।

কালেমা-ই তামজীদ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ

উচ্চারণঃ সুবহা-নাল্লা-হি ওয়াল হামদু লিল্লা-হি ওয়ালা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবর ওয়ালা- হাউলা ওয়ালা- ক্বুওয়াতা ইল্লা-বিল্লা-হিল 'আলিয়্যিল 'আযী-ম।

অর্থঃ আল্লাহরই পবিত্রতা, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই এবং আল্লাহই সর্বাধিক মহান। না আছে সামর্থ্য, না আছে ক্ষমতা কিন্তু আছে (একমাত্র) আল্লাহরই নিকট, যিনি সুউচ্চ মহান।

ঈমান-ই মুজমাল

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِاَسْمَائِهٖ وَصِفَاتِهٖ وَقَبِلْتُ جَمِيْعَ اَحْكَامِهٖ وَاَرْكَانِهٖ

উচ্চারণঃ আ-মান্তু বিল্লা-হি কামা-হুয়া বিআসমা-ইহী ওয়া সিফা-তিহী ওয়া ক্বাবিলতু জামী-'আ আহ্কা-মিহী ওয়া আর্কা-নিহী।

অর্থ ঃ আমি আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান আনলাম। তিনি যেমন, তাঁর নামসমূহ ও তাঁর গুণাবলী সহকারে এবং আমি গ্রহণ করেছি তাঁর সমস্ত বিধান ও আরকানকে।

ঈমান-ই মুফাস্সাল

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰۤئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ

উচ্চারণঃ আ-মানতু বিল্লা-হি ওয়া মালা-ইকাতিহী ওয়া কুতুবিহী ওয়া রুসূলিহী ওয়াল ইয়াউমিল আ-খিরী, ওয়াল ক্বাদরি খায়রিহী-ওয়া শার্রিহী মিনাল্লা-হি তা'আলা ওয়াল বা'সি বা'দাল মাওত।

অর্থঃ আমি ঈমান আনলাম আল্লাহর উপর তাঁর ফিরিশতাদের উপর, তাঁর আসমানী কিতাবসমূহ, তাঁর রাসুলগণ এবং শেষ দিবসের উপর আর এর উপর যে, অদৃষ্টের ভালমন্দ আল্লাহ তা'আলার তরফ হতে এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের উপর।

কলেমা-ই রদ্দে কুফর

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَّ اَنَا اَعْلَمُ بِهٖ وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا

لاَ اَعْلَمُ بِهٖ تُبْتُ عَنْهُ وَتَبَرَّأْتُ مِنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ وَالْكِذْبِ وَالْغِيْبَةِ وَالْبِدْعَةِ وَالنَّمِيْمَةِ وَالْفَوَاحِشِ وَالْبُهْتَانِ وَالْمَعَاصِىْ كُلِّهَا وَاَسْلَمْتُ وَاَقُوْلُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযু বিকা মিন আন উশরিকা বিকা শায়আওঁ ওয়া আনা আ'লামু বিহী- ওয়া আস্তাগ্‌ফিরুকা লিমা- লা- আ'লামু বিহী- তুবতু 'আন্‌হু ওয়া তাবার্‌রা'তু মিনাল কুফরি ওয়াশ্ শির্কি ওয়াল কিস্‌বি ওয়াল গী-বাতি ওয়াল্ বিদ্'আতি ওয়ান্ নামী-মাতি ওয়াল ফাওয়া-হিশি ওয়াল্ বুহতা-নি ওয়াল মা'আ-সী কুল্লিহা ওয়া আস্‌লামতু ওয়া আক্বু-লু লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্-হি ।

শরীয়ত ও ফিক্বহ্ শাস্ত্রের পরিভাষাসমূহ

শরীয়তে প্রত্যেক প্রকার ভাল ও মন্দ কাজের জন্য কানূন (অনুশাসন) নির্দ্ধারণ করা হয়েছে। ওইসব কাজ সম্পর্কে পরিভাষাও নির্ণয় করা হয়েছে; যা'তে ওইসব কাজের তাৎপর্য ও প্রকৃতি প্রকাশ পায়। নিম্নে আমরা শরীয়তের পরিভাষাগুলো পেশ করছি। উল্লেখ্য, যেভাবে কোন ভাল কাজ বেশী ভাল হয়, তেমনি কোন মন্দ কাজও বেশী মন্দ হয়, তাই প্রত্যেক ভাল কাজের বিপরীতে মন্দ কর্মও চিহ্নিত করা হলোঃ

পুণ্যময় কাজ, যা সম্পন্ন করা জরুরী কিংবা যা সম্পন্ন করা শরীয়তে পছন্দনীয় সাব্যস্ত করা হয়েছে আর যা করলে সাওয়াব পাওয়া যায়-		পক্ষান্তরে	ওই মন্দ কাজ, যা থেকে বিরত থাকা জরুরী কিংবা যা করা শরীয়তে অপছন্দনীয়। আর যা সম্পন্ন করলে তিরস্কার কিংবা শাস্তি অবধারিত-
ক্রনং	**পুণ্যময় কাজগুলোর পারিভাষিক নাম**	ভাল কাজের বিপরীতে মন্দ কাজ	**বর্জনীয়/মন্দ কাজগুলোর পারিভাষিক নাম**
১.	ফরয		হারাম
২.	ওয়াজিব		মাকরূহ-ই তাহরীমী
৩.	সুন্নাত-ই মুআক্কাদাহ্		ইসা-আত
৪.	সুন্নাত-ই গায়র মুআক্কাদাহ্		মাকরূহ-ই তান্‌যীহী
৫.	মুস্তাহাব		খেলাফ-ই আওলা
৬.	মুবাহ্		[বিপরীত নেই]

প্রত্যেকটির সংজ্ঞা ও বিধান

ফরয

- এ কাজ করা অতীব অতীব জরুরী।
- যা শরীয়তের অকাট্য (قطعى) কৃত্ব'ঈ পর্যায়ের দলীলাদি দ্বারা প্রমাণিত।
- যার ফরয হওয়াকে অস্বীকারকারী কাফির।

- শরীয়তসম্মত ওযর ব্যতিরেকে যা বর্জনকারী ফাসিক্ব, গুনাহ্ কবীরাহ সম্পন্নকারী ও জাহান্নামের আযাবের উপযোগী।
- কোন ফরয কাজ ইচ্ছাকৃতভাবে শরীয়তের ওযর ব্যতীত জেনেশুনে ক্বাযা বা বজর্নকারীও ফাসিক্ব, কবীরাহ্‌গুনাহ্ সম্পন্নকারী ও জাহান্নামের শাস্তির উপযোগী। [ফাতাওয়া-ই রেযভিয়্যাহ্ : ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৪]

ওয়াজিব

- এ কাজ করা অতিমাত্রায় জরুরী।
- এটা শরীয়তে 'যন্নী' (ظنى) পর্যায়ের দলীলাদি দ্বারা প্রমাণিত।
- এর অস্বীকারকারী পথভ্রষ্ট ও বদ-মাযহাব।
- কোন শরীয়ত সম্মত ওযর ব্যতীত এ কাজ বর্জনকারী ফাসিক্ব ও) দোযখের শাস্তির উপযোগী।
- কোন ওয়াজিব কাজ ইচ্ছাকৃতভাবে একবার বর্জন করা সগীরাহ্ গুনাহ্, কিন্তু বারবার বর্জন করা কবীরাহ্ গুনাহ্

সুন্নাতে-ই মুআক্কাদাহ্

- যেকাজ করা জরুরী। এ কাজ সম্পন্ন করলে খুব বড় সাওয়াব পাওয়া যায়।
- যে কাজ হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সব সময় করেছেন, তবে কখনো কখনো ছেড়েও দিয়েছেন।
- ঘটনাচক্রে কখনো কখনো এ কাজ ছেড়ে দিলেও আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে তিরস্কৃত হবে। সেটা সব সময় বর্জন করার অভ্যাস করে নিলে আযাবের উপযোগী হতে হয়।
- সুন্নাত-ই মুআক্কাদাহ্ বিধানে 'ওয়াজিব'-এর কাছাকাছি। [ফাতাওয়া-ই রেযভিয়্যাহ্, ২য় খণ্ড পৃ.২৭৯]
- এসব সুন্নাতকে 'সুনান-ই হুদা' কিংবা সুনান-ই হাদ্‌য়ি বলা হয়।

সুন্নাত-ই গায়র মুআক্কাদাহ্

- যে কাজ সম্পন্ন করলে সাওয়াব পাওয়া যায়।
- যে কাজ হুযূর-ই করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সম্পন্ন করেছেন এবং বিনা ওযরে কখনো কখনো তা ছেড়েও দিয়েছেন।
- শরীয়তের দৃষ্টিতে এ সুন্নাত এমনই কাম্য যে, তা বর্জন করা অপছন্দনীয় সাব্যস্ত হয়েছে; কিন্তু তা সম্পন্ন না করলে কোন প্রকার শাস্তি কিংবা তিরস্কার নেই।
- এর অপর নাম 'সুন্নাত-ই যা-ইদাহ্,

মুস্তাহাব

- মুস্তাহাব হচ্ছে এমন প্রতিটি কাজ, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে পছন্দনীয়। আবার এ কাজ সম্পন্ন না করাও কোন প্রকার অপছন্দনীয় নয়।
- যে কাজ হয়তো হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম করেছেন, কিংবা সেটার প্রতি উৎসাহিত করেছেন, অথবা মুসলিম উম্মাহর শীর্ষস্থানীয় আলিমগণ তা পছন্দ করেছেন- যদিও হাদীস শরীফে এর উল্লেখ না থাকে।
- সম্পন্ন করলে সাওয়াব পাওয়া যায়, না করলে কোনরূপ তিরস্কার কিংবা আযাব দেই।

মুবাহ্

- ওই কাজকে বলে, যা করা ও না করা এক সমান। অর্থাৎ যা করলে যেমন কোন সাওয়াব পাওয়া যায় না, না করলেও তেমন কোন তিরস্কার কিংবা শাস্তি নেই।

হারাম

- যা বর্জন করা ও যা থেকে বিরত থাকা অতীব জরুরী।
- যা হারাম হবার প্রমাণ শরীয়তের 'ক্বত্ব'ঈ' (قطعى) পর্যায়ের দলীলাদি দ্বারা প্রমাণিত।
- যা হারাম হওয়াকে অস্বীকারকারী কাফির।
- যা একবার স্বেচ্ছায় সম্পন্নকারীও ফাসিক্ব, কবীরাহগুনাহ্ সম্পন্নকারী এবং জাহান্নামের শাস্তির উপযোগী।
- যা বর্জন করা সাওয়াবের কারণ।
- এটা ফরয কাজের বিপরীত।

মাকরূহ-ই তাহ্রীমী

- যে কাজ বর্জন করা ও যেগুলো থেকে বিরত থাকা অত্যন্ত জরুরী।
- যে গুলো শরীয়তবিরোধী হওয়া শরীয়তের 'যন্নী' (ظنى) পর্যায়ের দলীলাদি দ্বারা প্রমাণিত।
- যেগুলো সম্পন্ন করা হারামের কম পর্যায়ের 'কবীরা গুনাহ্'; কিন্তু কয়েকবার করলে কিংবা সবসময় করতে থাকলে কবীরাহ্ গুনাহ বলে সাব্যস্ত হয়।
- এমনসব কাজ সম্পাদনকারী 'ফাসিক্ব' ও শাস্তির উপযোগী এবং তা থেকে বিরত থাকা সাওয়াব।
- উল্লেখ্য, মাকরূহ-ই তাহরীমীর বিপরীতে রয়েছে 'ওয়াজিব।'

ইসা-আত (اساءت)

- যা বর্জন করা ও যা থেকে বেঁচে থাকা জরুরী।
- যা সম্পন্ন করা মন্দ, যা থেকে বেঁচে থাকা সাওয়াব।
- কখনো কখনো সম্পন্ন করলে যে কাজ তিরস্কার যোগ্য এবং সর্বদা করার অভ্যস্থ লোকটি শাস্তির উপযোগী।
- এটা সুন্নাত-ই মুকাক্কাদার বিপরীত।

মাকরূহ-ই তানযীহী

- যে কাজ সম্পন্ন করা শরীয়তে পছন্দনীয় নয়।
- যে কাজ করলে শাস্তি নেই, তবে সেটার অভ্যাস গড়ে নেয়া মন্দ।
- যে কাজ করা থেকে বিরত থাকলেও সাওয়াব পাওয়া যায়।
- এটা সুন্নাত-ই গায়র মুআক্কাদার বিপরীত।

খেলাফ-ই আওলা

- এটা ওই কাজকে বলে, যা বর্জন করা এবং যা থেকে বেঁচে থাকা উত্তম; কিন্তু করে ফেললেও ক্ষতি নেই।
- এটার অবস্থান মুস্তাহাব কাজের বিপরীতে।

---<>---

নুবূয়ত ও রিসালত

নুবূওয়ত ও রিসালতের প্রয়োজনীয়তা এবং নবী-রাসূল প্রেরণের কারণ

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, দুনিয়াতে তাদেরকে তাঁর 'খলীফা' বা প্রতিনিধি করেছেন এবং সৃষ্টিজগতের নেতৃত্ব তাদের হাতেই ন্যস্ত করেছেন। তাদের সুবিধার্থে আসমান ও যমীনের সবকিছুকে তাদের অধীনস্থ করেছেন, তাদের খেদমতে নিয়োজিত করেছেন এবং তাদেরকে 'আক্বল' বা বুদ্ধির মত অনন্য নি'মাত দ্বারা ধন্য করেছেন, যাতে তারা বুদ্ধি বা বিবেক দ্বারা মন্দ থেকে ভালকে পৃথক করতে পারে। অন্যদিকে তাদের মধ্যে কু-প্রবৃত্তি এবং এর সহায়ক শক্তিও দিয়েছেন, যা তাদেরকে নাফ্সের চাহিদানুযায়ী কাজকর্ম করতে অগ্রগামী করে, যা তাদেরকে অপরাধী-অত্যাচারী বানায়, অন্যের হক্ব নষ্ট করার মত জঘন্য অপরাধে লিপ্ত করে।

কোন মানব সন্তানের পক্ষে একাকী সমাজ-বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করা সম্ভব নয়। সে তার নিজের চাহিদা নিজেই মেটাবে তা হতে পারে না, বরঞ্চ সে স্বজাতির সাথে সহাবস্থান করবে, তাদের সাথে লেনদেন করবে, একে অপরকে সহযোগিতা করবে এবং পরস্পরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে ইত্যাদি। আর এ জন্য প্রয়োজন একটি জীবন বিধান বা সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়ম-কানুন। কারণ সবল দুর্বলের উপর চড়াও হয়, শক্তিশালী শক্তিহীনদের প্রতি যুল্ম করে; অথচ সাধারণ মানুষের বিবেকের পক্ষে তা নিয়ন্ত্রণ করা প্রায় দূরূহ ব্যাপার। কারণ মানুষের বিবেক-বুদ্ধির পরিধি সীমিত। এর মাধ্যমে তারা সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে না। যেমন- সুনির্দিষ্ট কোন জিনিসকে কোন একটি দল বা সম্প্রদায় ভাল বললে অন্য একটি দল তা মন্দ বলে। এমনকি ব্যক্তি বিশেষের বেলায়ও তা দেখা যায়। কোন একজন বিশেষ সময়ে একটি জিনিসকে ভাল মনে করে পছন্দ করে। আবার ওই নির্দিষ্ট জিনিসটিকে অন্য সময় মন্দ মনে করে অপছন্দ করে। সুতরাং এটাই প্রতীয়মান হল যে, নিছক 'আক্বল' বা বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা সাধারণ মানুষ কোন কিছুর ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছতে পারে না। কারণ, তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষের বিবেক-বুদ্ধি সীমিত।

মানুষকে শুধু এ সংক্ষিপ্ত ও অনিশ্চিত জীবনের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি; বরং তার জন্য অপেক্ষমান রয়েছে অনন্ত জীবন। সেখানে মু'মিনদের জন্য আল্লাহ তা'আলা প্রস্তুত করে রেখেছেন অফুরন্ত নি'মাতে ভরপুর জান্নাতসমূহ এবং কাফিরদের জন্য জাহান্নামের যন্ত্রনাদায়ক শাস্তিসমূহ। আর এসব কারণে মানুষ এমন সত্তার মুখাপেক্ষী, যে তাকে মহান রবের ইবাদতসমূহ এবং তাঁর নৈকট্য ও সন্তুষ্টির

পন্থাসমূহ বাতলিয়ে দেবে এবং সাথে সাথে ওই বিষয়াবলীও চিহ্নিত করে দেবে, যেগুলো বান্দাকে মহান রবের সন্তুষ্টি থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। কারণ তাঁর ক্রোধে নিপতিত হলে শাস্তি অবধারিত। এখানেও প্রজ্ঞাময় রবের মহত্ব ও মহা বদান্যতা যে, তিনি স্বীয় বান্দাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে যুগে যুগে বহু নবী ও রাসূল আলায়হিমুস্ সালাম প্রেরণ করেছেন, যাতে তাঁরা সৃষ্টিকুলকে ওই সমস্ত বিষয় বলে দেন, যা গ্রহণ করলে তাদের দুনিয়াবী যিন্দেগী ও আখিরাত সুন্দর ও সাফল্যমণ্ডিত হয়। এমতাবস্থায় আল্লাহ্র প্রেরিতদের হিদায়ত গ্রহণ না করলে তারা কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে এবং তাদের কোন ওযর তখন গ্রহণ করা হবে না। এটাই যুক্তিযুক্ত। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন-

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلاً

তরজমা ঃ আমি শাস্তিদাতা নই, যতক্ষণ না রসূল প্রেরণ করি।

[সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত-১৫, তরজমা কান্যুল ঈমান]

وَلَوْ اَنَّـا اَهْلَكْنَا هُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهٖ لَقَالُوْا رَبَّنَا لَوْلاَ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلاً فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَذِلَّ وَنَخْزٰى ○

তরজমা ঃ এবং যদি আমি তাদেরকে কোন শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করে দিতাম রসূল আসার পূর্বে, তবে তারা অবশ্যই বলতো, 'হে আমাদের রব! তুমি আমাদের প্রতি কোন রাসূল কেন প্রেরণ করোনি যাতে আমরা তোমার নিদর্শনসমূহের উপর চলতাম লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবার পূর্বে।

[সূরা ত্বোয়াহা, আয়াত-১৩৪, তরজমা- কান্যুল ঈমান]

সমস্ত নবী ও রসূলের মূল বাণী ছিল এক ও অভিন্ন এবং তাদের শরীয়ত বা জীবন-বিধান ছিলো ভিন্ন ভিন্ন

রাসূলগণ আলায়হিমুস্ সালাম দাওয়াত, আক্বীদা ও চারিত্রিক গুণাবলীর ক্ষেত্রে ছিলেন এক ও অভিন্ন; কিন্তু তাঁদের শরীয়ত বা জীবন বিধানে ভিন্নতা ছিলো। আর এ ভিন্নতা ছিলো নবী ও রাসূলগণ আলায়হিমুস্ সালাম-এর উম্মতদের ভৌগলিক অবস্থান ও যুগের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। অর্থাৎ তাঁরা (আলায়হিমুস্ সালাম)-এর দ্বীন প্রচারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ধর্মের মৌলিক বিষয়ে অভিন্নতা। সবাই এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহবান করেছেন। 'ফুরু'আত' বা ধর্মের অনুশাসনের বিষয়গুলো ভিন্ন ছিলো, মূলতঃ তা ছিলো স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে।

নবী ও রাসূলগণের অভিন্ন দাওয়াত বা আহবানের প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ এরশাদ করেন আমি কোন না কোন রাসূল প্রেরণ করেছি এ নির্দেশ প্রচারের জন্য যে,

তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগূত (শয়তান) থেকে দূরে থাকো। অতঃপর তোমাদের কতেককে আল্লাহ হিদায়ত দান করেন এবং কতকের উপর গোমরাহী অবধারিত হয়ে গেল। সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং দেখো মিথ্যারোপকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ক্বোরআন মজীদে এরশাদ করেন, ''আর আমি আপনার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করিনি, যার প্রতি আমি এ মর্মে ওহী নাযিল করিনি যে, 'আমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই।' অতএব, আমারই ইবাদত করো।'' [সূরা আম্বিয়া, আয়াত-২৫]

তাঁদের শরীয়তের প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, ''আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছি নির্দিষ্ট শরীয়ত ও নির্দিষ্ট পন্থা।''

[সূরা মা-ইদাহ, আয়াত-৪৮]

হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম বলেছেন, (পবিত্র ক্বোরআনের ভাষায়) ''আর আমি এসেছি আমার সামনে তাওরাতে যা আছে তার সত্যায়নকারীরূপে এবং তোমাদের জন্য কতিপয় বস্তু হালাল করার জন্য, যা তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে এবং আমি তোমাদের কাছে এসেছি নিদর্শন নিয়ে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে। সুতরাং তোমরা ভয় করো আল্লাহকে এবং আমাকে অনুসরণ করো।

[সূরা আলে ইমরান, আয়াত-৫০]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, ''আমার জন্য গনীমতের মাল-সামগ্রী হালাল করা হয়েছে।'' [মুসলিম শরীফ]

উপরিউক্ত আলোচনা ও দলিল-প্রমাণ থেকে বুঝা যায় যে, সমস্ত নবী ও রসূলের মূল বাণী এক ও অভিন্ন ছিলো। আর তা হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদ ও তদসম্পর্কিত আনুষাঙ্গিক বিষয়সমূহ, যেগুলোকে 'আক্বাইদে ইসলামী' বলা হয়, আর সবার শরীয়ত ছিলো স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে ভিন্ন ভিন্ন।

রিসালাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ঈমানের দ্বিতীয় ভিত্তি

হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার নির্বাচিত প্রিয় বান্দা এবং তাঁর মনোনীত নবী ও রাসূল। তিনি 'খাতামুল আম্বিয়া' বা শেষ নবী এবং আল্লাহ তা'আলার মুত্তাক্বী বান্দাদের ইমাম। সমস্ত নবী ও রাসূলের সরদার এবং তিনি মহান রাব্বুল আলামীনের প্রিয়তম বন্ধু। তিনি সমস্ত জ্বিন-ইনসানের প্রতি তথা সমগ্র সৃষ্টির প্রতি সত্য, হিদায়ত ও নূর সহকারে নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। [ইমাম তাহাভী]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর রিসালতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের দ্বিতীয় মূল ভিত্তি। আর যে তাঁর প্রতি ঈমান আনবে না তার জন্য জাহান্নাম অনিবার্য। যেমন আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন, ''আর যে ঈমান

আনে না আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রাসূলের প্রতি, তবে আমি তো প্রস্তুত করে রেখেছি কাফিরদের জন্য দোযখ।'' [সূরা ফাত্হ, আয়াত-১৩]

আর হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর রিসালতের প্রতি ঈমান আনার অর্থ হচ্ছে- তাঁর প্রতি এ মর্মে বিশ্বাস স্থাপন করা যে, তিনি আরবের শ্রেষ্ঠতম প্রখ্যাত ক্বোরাইশ বংশের হাশেমী গোত্রে তাশরীফ আনয়ন করেছেন। তিনি আল্লাহর প্রিয় বান্দা এবং সমগ্র সৃষ্টির প্রতি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। পুরো আরবের নেতৃত্ব তাঁর গোত্রের নিকট ন্যস্ত ছিলো। তাঁর সৌভাগ্যবান পিতা হচ্ছেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব এবং মাতা হলেন হযরত আমেনা বিনতে ওহাব। তাঁরা উভয়েই অভিজাত বংশ ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের। তাঁর বংশধারা হযরত ইসমাঈল ইবনে ইব্রাহীম আলায়হিমুস্ সালাম পর্যন্ত গিয়ে মিলিত হয়। হযরত আদম ও হাওয়া আলায়হিমাস্ সালাম হতে তাঁর পিতা-মাতা পর্যন্ত যাঁরা তাঁর নূরের আমানতদার ছিলেন, তাঁরা সবাই পূণ্যবান ও পূণ্যবতী এবং আল্লাহ্র একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলেন। এমনকি জাহেলী যুগের পাপ-পঙ্কিলতা তাঁর বংশধারাকে স্পর্শ করতে পারে নি। তিনি মক্কায় জন্ম গ্রহণ করেন। নুবূয়ত প্রকাশের পূর্বে অত্যন্ত পবিত্র ও পরিচ্ছন্নতার সাথে বড় হয়েছেন। অর্থাৎ শৈশব, কৈশোর ও যৌবনে তিনি তাঁর সমসাময়িক অন্য দশজনের মত ছিলেন না। জাহেলী যুগের কোন মন্দ স্বভাব তাঁর মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। চল্লিশ বছরের প্রকাশ্য জীবদ্দশায় তাঁর নুবূয়ত প্রকাশ পেয়েছে। পরবর্তীতে তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত করেছেন। নুবূয়তের মহান দায়িত্ব পালন শেষে তিনি তথায় ওফাত বরণ করেন এবং মদীনা মুনাওয়ারাতেই লোক-চক্ষুর অন্তরালে, রওযা-ই পাকে তাশরীফ নিয়ে যান। তাঁর উপর মহাগ্রন্থ ক্বোরআন করীম নাযিল হয়েছে, যা আল্লাহরই কালাম, যাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। তিনি জীবনে যা কিছু বলেছেন, অদৃশ্য জগতের যে সমস্ত বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন এবং হালাল ও হারাম সম্পর্কে যা বলেছেন সবকিছু সত্য, বাস্তবসম্মত এবং তা আল্লাহ তা'আলার 'ওহী' বা প্রত্যাদেশের নিরিখেই বলেছেন। সৃষ্টির মধ্যে তিনি সবার চেয়ে বেশী মর্যাদাবান ও সম্মানিত। তাঁর পরে অন্যান্য নবীগণ। তাঁকে সম্মান করা, সবকিছু থেকে তাঁর ভালবাসাকে প্রাধান্য দেয়া, এমনকি নিজের প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসা পরিপূর্ণ ঈমানের প্রমাণ।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসমূহ

পূর্বে আমরা নবী ও রাসূলগণের যে বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছি তা আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। তবে তাঁর এমন কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যেগুলো শুধু তাঁর সাথেই সম্পৃক্ত, অন্য কোন নবীর মধ্যে সেগুলো পাওয়া যায় না।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমাকে এমন পাঁচটি বিশেষত্ব দেয়া হয়েছে, যেগুলো আমার পূর্ববর্তী নবীগণের কাউকে দেয়া হয় নিঃ

এক. আমাকে গাম্ভীর্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব প্রদান করে সাহায্য করা হয়েছে, এক মাস পথের দূরত্বে অবস্থানরত শত্রুও আমার আগমণের সংবাদে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়।

দুই. আমার জন্য সমগ্র ভূ-খণ্ডকে মসজিদ (নামাযের যোগ্য স্থান) এবং পবিত্র করা হয়েছে। অতএব, আমার উম্মতের যে কোন ব্যক্তির যখন নামাযের সময় হয়, সে যেন তথায় নামায পড়ে নেয়।

তিন. আমার জন্য গনীমতের মাল (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) হালাল করা হয়েছে। আমার পূর্ববর্তী কারো জন্য তা বৈধ ছিল না।

চার. আমাকে 'শাফা'আত' (ক্বিয়ামত-দিবসের মহাসঙ্কটে এবং বৃহত্তম গুনাহ্গার উম্মতদের জন্য সুপারিশ করার ক্ষমতা) দেয়া হয়েছে।

পাঁচ. অন্যান্য নবীগণ প্রেরিত হয়েছেন বিশেষ কোন সম্প্রদায় বা জাতির প্রতি আর আমি প্রেরিত হয়েছি সমগ্র মানবজাতির প্রতি। [মুসলিম শরীফ]

এমনকি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হয়েছেন সমগ্র সৃষ্টির প্রতি, মানব ও জিন্ জাতি উভয়ের প্রতি। তিনি সবার নবী। তাঁর নুবূয়ত ও রিসালতের পরিধি ভৌগলিক সীমারেখা ও সুনির্দিষ্ট কালের গন্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়। তা হচ্ছে পুর্ববর্তী নবীগণের বিপরীত। কারণ, তাঁরা প্রেরিত হয়েছিলেন নির্দিষ্ট সময়ের নির্দিষ্ট জাতির প্রতি। আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নুবূয়তের পরিধির ব্যাপকতার পক্ষে পবিত্র ক্বোরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে। কয়েকটি আয়াত নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

এক. স্মরণ করুন, আমি আপনার প্রতি একদল জিন্‌কে আকৃষ্ট করেছিলাম। তারা ক্বোরআন পাঠ শুনছিলো। যখন তারা তার কাছে উপস্থিত হলো তখন পরস্পর বললো, নীরবে শ্রবণ করো। অতঃপর যখন ক্বোরআন পাঠ সমাপ্ত হলো, তখন তারা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে সতর্ককারীরূপে ফিরে গেলো। তারা বললো, 'হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এক কিতাব পাঠ শুনেছি, যা মূসার পরে নাযিল করা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থক এবং সত্য ও সরল-সঠিক পথের দিকে পরিচালিত করে।' [সূরা আহক্বাফ, আয়াত-২৯-৩০]

দুই. আপনি বলুন, 'আমার প্রতি ওহী প্রেরণ করা হয়েছে, যে জিনদের একটি দল মনযোগ সহকারে ক্বোরআন শ্রবণ, করেছে অতঃপর তারা নিজ সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গিয়ে বললো, 'আমরা তো শুনে এসেছি এক বিস্ময়কর ক্বোরআন।' [সূরা জিন, আয়াত ১]

তিন. বলুন, 'হে মানবজাতি! আমি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহর রাসূল, যিনি সমগ্র আসমান ও যমীনের মালিক, যিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই, যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। সুতরাং তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি ও তাঁর (পার্থিব ওস্তাদের নিকট) পড়াবিহীন, অদৃশ্যের সংবাদদাতা রসূলের উপর, যিনি আল্লাহ ও তাঁর বাণীসমূহের উপর ঈমান আনেন এবং তাঁরই গোলামী করো, তবে তোমরা পথ পাবে। [সূরা আ'রাফ, আয়াত-১৫৮]

চার. এবং আমার কাছে এ ক্বোরআন প্রেরিত হয়েছে যে, আমি এর মাধ্যমে তোমাদেরকে এবং যাদের কাছে এটা পৌঁছে সবাইকে সতর্ক করি। [সূরা আন'আম, আয়াত-১৯]

পাঁচ. আর যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের এবং নিরক্ষরদের বলুন, 'তোমরা কি আত্মসমর্পণ করেছো? যদি তারা আত্মসমর্পণ করে তবে অবশ্যই তারাও সরল-সঠিক পথ পাবে; কিন্তু যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আপনার দায়িত্ব তো শুধু পৌঁছিয়ে দেয়া। আর আল্লাহ বান্দাদের সম্যক দ্রষ্টা। [সূরা আলে-ইমরান, আয়াত ২০]

হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 'খাতামুন নাবিয়্যীন'

আল্লাহ সুবহা-নাহু ওয়া তা'আলা মানব জাতির হিদায়তের জন্য অসংখ্য নবী ও রাসুল এ পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। আর এ প্রেরণের ধারাবাহিকতায় সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ নবী হচ্ছেন আমাদের প্রিয় নবী আল্লাহ্র প্রিয় হাবীব রাহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম। তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা নুবূয়ত ও রিসালতের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন। তাঁর উপর অবতীর্ণ করেছেন সর্বশেষ আসমানী কিতাব মহাগ্রন্থ ক্বোরআন মজীদ। ক্বিয়ামত পর্যন্ত এটি আল্লাহর বান্দাদের জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাত শরীফের পর থেকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম আর কোনদিন মহান রব আল্লাহ তা'আলার ওহী নিয়ে যমীনে অবতরণ করবেন না। এরপর কেউ যদি নিজেকে আল্লাহর রাসূল বা নবী বলে দাবি করে আর যারা তা বিশ্বাস ও সমর্থন করবে অথবা কেউ যদি ভিন্ন কাউকে নবী বা রাসূল বলে আখ্যায়িত করে আর তা যদি কেউ সত্য বলে বিশ্বাস করে, তবে ইসলামী শরীয়তের আলোকে তারা সবাই নিঃসন্দেহে কাফির বলে গণ্য হবে।

হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবীঃ ক্বোরআন ও হাদীসের আলোকে

আল্লাহর বাণী (ক্বোরআন শরীফ)

হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন বরং তিনি আল্লাহর রাসূল ও সর্বশেষ নবী। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। [সূরা আহযাব; আয়াত ৪০]

'নবী' শব্দটি 'রাসূল' শব্দ থেকে ব্যাপক। বস্তুতঃ তিনি শেষ নবী এবং শেষ রাসূলও। ক্বিয়ামতের পূর্বে হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম পুনরায় অবতীর্ণ হওয়া নবী করীমের শেষ নবী হওয়ার পরিপন্থী নয়। কারণ তখন তিনি নবী বা রসূল হিসেবে আসবেন না; বরং আমাদের নবী করীমের উম্মত তথা উম্মতের 'ইমাম' হিসেবে আসবেন এবং হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এরই শরীয়ত মোতাবেক হুকুম-আহকাম পরিচালনা করবেন।

হাদীস শরীফ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন,''আমি এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণের দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমন একটি লোকের ন্যায়, যিনি একটি ঘর বানিয়েছেন খুব সুন্দর করে; কিন্তু তার এক পাশে একটি ইট পরিমাণ জায়গা অসম্পূর্ণ রেখেছেন। অতঃপর লোকেরা ঘুরে ঘুরে এই ঘর দেখছে এবং এর সৌন্দর্য দেখে বিস্ময় প্রকাশ করছে আর বলছে, 'আহা! এ ইটটি কেন বসানো হলো না?' হুযূর-ই আক্রাম বলেন, ''আমি ওই (ঘরকে পরিপূর্ণকারী) ইট এবং আমি 'খাতামুন্ নাবিয়্যীন (শেষ নবী)।" [মুসলিম শরীফ]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমার বেশ কিছু নাম রয়েছে। আমি মুহাম্মদ, আমি 'আহমদ', আমি 'মাহী' -আমার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা কুফরকে নিশ্চিহ্ন করবেন, আমি 'হাশের'-আমার কদমের সামনে সমস্ত লোককে একত্রিত করা হবে, আমি 'আক্বিব' এবং সমাপ্তকারী, যার পরে কোন নবী নেই। [বোখারী ও মুসলিম শরীফ]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, ছয়টি জিনিস দ্বারা অন্যান্য নবীগণের উপর আমাকে মর্যাদাবান করা হয়েছে। (আর সেগুলো হচ্ছে) আমাকে 'জাওয়ামি'উল কালিম' বা ব্যাপকার্থক বাক্য দেয়া হয়েছে। আমাকে ভীতসন্ত্রস্তকারী গাম্ভীর্য দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে। আমার জন্য গণীমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হালাল করা হয়েছে। আমার জন্য সমগ্র ভূ-খণ্ডকে মসজিদ বা ইবাদতের উপযোগী ও পবিত্র করা হয়েছে। আমি প্রেরিত হয়েছি সমগ্র সৃষ্টির প্রতি

এবং আমার দ্বারা নবী প্রেরণের ধারাবাহিকতার ইতি টানা হয়েছে। [মুসলিম শরীফ]

হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নুবূয়তের প্রমাণাদি

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যে আল্লাহ্‌র নবী, তার অসংখ্য প্রমাণ বা দলীল রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটা নিম্নে উপস্থাপন করা হচ্ছে-

▣ পবিত্র ক্বোরআন শরীফ

ঐশী কিতাব মহাগ্রন্থ ক্বোরআন মজীদ আল্লাহ্‌র কালাম বা বাণী। আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এমন কিতাব নবী করীমের উপর অবতীর্ণ হওয়াই তাঁর নুবূওয়তের অন্যতম প্রমাণ। এ ক্বোরআন শরীফ তাঁর সবচেয়ে বড় মু'জিযা। এটা দ্বারা তিনি জিন্ ও ইনসানকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন। চরম সাহিত্য-উৎকর্ষের যুগেও এ ক্বোরআন পাকের একটি ছোট সূরার মতো কেউ রচনা করতে পারেনি। এ ব্যাপারে আরবের ভাষাবিদগণ সম্পূর্ণ অক্ষম ছিলো। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন, "আমার খাস বান্দার উপর আমি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে যদি তোমাদের সন্দেহ হয়, তবে সেটার মত একটি সূরা নিয়ে এসো এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের সকল সহায়তাকারীদের আহ্বান করো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।" [সূরা বাক্বারা, আয়াত-২৩]

▣ গায়বের সংবাদ দেয়া

মূলতঃ 'নবী' শব্দের অর্থ আল্লাহ্‌র অদৃশ্য জগতের সংবাদদাতা। আর গায়েবের সংবাদ দেয়া তাঁর অন্যতম কাজ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র জীবন চরিত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তিনি অসংখ্য গায়বের সংবাদ দিয়েছেন। আর এ গায়বের সংবাদ দেয়াই তাঁর নুবূয়তের অন্যতম প্রমাণ। প্রসঙ্গতঃ কিছু সংখ্যক ইল্‌মে গায়বের প্রমাণাদি পেশ করা হচ্ছে-

- ক্বোরআন পাকে অসংখ্য গায়বের সংবাদ।
- হাদীস শরীফে অসংখ্য গায়বের সংবাদ রয়েছে। যেমন- হযরত রাসূল-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, "তোমরা আমার পরে আবূ বকর ও ওমরের আনুগত্য করবে।" [মুসনাদে ইমাম আহমদ]
- খিলাফত সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "খিলাফত ৩০ বছর থাকবে। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা যাকে চান তাঁকে অধিপতি করবেন।" [আবূ দাউদ শরীফ]

হযরত আম্মার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র শাহাদাতের ভবিষ্যদ্বাণী করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "আমার ওফাতের পর তোমাকে একটি বিদ্রোহী দল হত্যা করবে।" [মুসলিম শরীফ ও মুসনাদে ইমাম আহমদ] সত্যি তিনি সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হয়েছিলেন।

- আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজাশীর ইন্তিকালের দিনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর মৃত্যুর সংবাদ দেন এবং সাহাবা-ই কেরামকে নিয়ে তাঁর জানাযার নামায পড়েন। [বোখারী শরীফ]
- মূতার যুদ্ধে তিনজন মুসলিম সেনাপতি শহীদ হওয়ার সাথে সাথে লোক মারফত খবর আসার পূর্বেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মদীনা মুনাওয়ারায় বসে তা প্রচার করেছেন। তিনি সাহাবা-ই কেরামকে শত শত মাইল দূরের ঘটনাটি এমনভাবে বর্ণনা করলেন যেন তিনি চাক্ষুষভাবে দেখছেন। তখন তিনি বলেছেন, "এখন মুসলমানদের ঝাণ্ডা যায়দ ইবনে হারেসার হাতে। অতঃপর সে শহীদ হলে তা জাফর ইবনে আবূ তালিব গ্রহণ করেছে। সে শহীদ হলে তা আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা গ্রহণ করেছে। এখন সেও শাহাদতের উচ্চস্তরে পৌছে গেছে।" এই বর্ণনা দেয়ার সময় হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় চক্ষুযুগল থেকে অঝোরে অশ্রু-ধারা প্রবাহিত হচ্ছিলো। অতঃপর তিনি সংবাদ দিলেন, "এখন সাইফুল্লাহ্ (খালেদ ইবনে ওলীদ) ঝাণ্ডা নিয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে বিজয় দান করেছেন।"[বোখারী শরীফ]
- নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন উহুদ পাহাড়ে আরোহণ করলেন, তখন হযরত আবূ বকর, হযরত ওমর এবং হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম তাঁর সাথে ছিলেন। তখন পাহাড়ে কম্পন শুরু হলে তিনি বললেন, "হে উহুদ! শান্ত হও। তোমার উপর অবস্থান করছেন একজন নবী, একজন সিদ্দীক্ব এবং দু'জন শহীদ।" [বোখারী শরীফ]
  উক্ত হাদীসে হযরত ওমর ও হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার শাহাদাতের ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, যা হুযূরের অদৃশ্য জ্ঞানের জ্বলন্ত প্রমাণ।
- কিসরা ও ক্বায়সারের সাম্রাজ্য ও আধিপত্য ধ্বংস হবে, তা একদিন মুসলমানদের করায়ত্বে আসবে এবং তাদের সম্পদসমূহ আল্লাহর রাস্তায় বিলি-বন্টন করা হবে মর্মেও হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম অনেক পূর্বেই সংবাদ দিয়েছেন। [বোখারী শরীফ]
- হুযূরের নুবূয়তের প্রমাণাদির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে-পূর্ববর্তী অবতীর্ণ আসমানী কিতাবসমূহ তাঁর শুভাগমনের বার্তা প্রচার করেছে এবং তাঁর বৈশিষ্ট্য ও

চিহ্নসমূহ বর্ণনা করেছে। আমাদের ইমাম এবং মনীষীগণও ওই সমস্ত আসমানী কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে স্ব স্ব গ্রন্থাবলীতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বৈশিষ্ট্যাবলী বর্ণনা করেছেন। যেমন- আল্লামা সা'দ উদ্দীন তাফতাযানী প্রমুখ।

- এ প্রসঙ্গে ইমাম বোখারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদীস শরীফে হযরত 'আত্বা ইবনে ইয়াসার বলেন, ''একদা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল 'আসের সাথে দেখা হলে আমি তাঁর সমীপে আরয করলাম, ''তাওরীতে বর্ণিত হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বৈশিষ্ট্যসমূহ অনুগ্রহপূর্বক আমাকে বলুন।'' তিনি বললেন, ''হ্যাঁ, আল্লাহ্‌রই শপথ, তাওরীতে তাঁর এমন কিছু গুণাবলী পাওয়া যায়, যা ক্বোরআনেও বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ক্বোরআন পাকের মধ্যে বিশেষণ দ্বারা সম্বোধন করেছেন-'হে নবী', 'আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষী (হাযির-নাযির) হিসেবে', 'বেহেশতের সু-সংবাদ দাতা', 'দোযখের ভীতি প্রদর্শনকারী' এবং 'উম্মীদেরকে সতর্ককারী'রূপে। 'আপনি আমার খাস বান্দা' এবং 'আমার রাসূল', আমি আপনার নাম দিয়েছি, 'আল্লাহ্‌র উপর ভরসাকারী', আপনি কর্কশভাষীও নন, 'কঠোরও নন', 'আপনি হাট-বাজারে হৈ হুল্লোড়কারীও নন', 'মন্দের প্রতিশোধ মন্দ দিয়ে নেন এমনও নন', কিন্তু 'ক্ষমা আর ক্ষমাই আপনার আদর্শ'। 'ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত গোমরাহ্ সম্প্রদায়কে হিদায়ত না করা পর্যন্ত, সবাই একত্ববাদের স্বীকারোক্তি (লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু বলে) না দেয়া পর্যন্ত, গোমরাহ্‌দের চক্ষু, বধিরের কর্ণ ও কপটদের অন্তর গোমরাহীর আচ্ছাদন থেকে উন্মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ আপনাকে মৃত্যু দেবেন না।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বর্ণনা যে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে রয়েছে ক্বোরআন পাকে সেটার উল্লেখ রয়েছে। যেমন- আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ ''নিশ্চয় তাঁর (নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) উল্লেখ আছে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে''। [সূরা শু'আরা, আয়াত ১৯৬]

- ওইসব লোক, যারা দাসত্ব করবে এ (পার্থিব কোন ওস্তাদের নিকট) পড়াবিহীন অদৃশ্যের সংবাদদাতা রসূলের, যাঁকে লিপিবদ্ধ পাবে নিজেদের নিকট তাওরীত ও ইনজীলের মধ্যে; তিনি তাদেরকে সৎকর্মের নির্দেশ দেবেন এবং অসৎকাজে বাধা দেবেন আর পবিত্র বস্তুগুলো তাদের জন্য হালাল করবেন এবং অপবিত্র বস্তুসমূহ তাদের উপর হারাম করবেন; আর তাদের উপর থেকে ওই কঠিন বোঝা ও গলার শৃঙ্খল, যা তাদের উপর ছিলো, নামিয়ে অপসারিত করবেন। সুতরাং ওইসব লোক, যারা তাঁর উপর ঈমান আনে, তাঁকে সম্মান করে, তাঁকে সাহায্য করে এবং ওই নূরের অনুসরণ করে, যা তাঁর সাথে অবতীর্ণ হয়েছে, তারাই সফলকাম হয়েছে। [সূরা আ'রাফ, আয়াত-১৫৭, কানযুল ঈমান]

তাঁর অসংখ্য মু'জিযা বা অলৌকিক ঘটনা

চন্দ্রকে দ্বি-খণ্ডিত করা, আঙ্গুল মুবারক দিয়ে পানির ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হওয়া, অল্প খাদ্য দিয়ে অসংখ্য লোককে পরিতৃপ্ত করা, মৃত খেজুর বৃক্ষ তাঁর বিচ্ছেদে অবোধ শিশুর ন্যায় ক্রন্দন করা ইত্যাদি অসংখ্য মু'জিযা তাঁর নুবূয়তের প্রমাণ বহন করে।

আহলে কিতাবের নিকট তাঁর পরিচিতি

পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবের অনুসারীগণ তাদের কিতাবসমূহে আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বৈশিষ্ট্যাদির বর্ণনা পাওয়া এবং তা নবী করীমের যাহেরী জীবদ্দশায় বাস্তবে পাওয়া এবং এরই মাধ্যমে তারা নবী করীমকে শেষনবী হিসেবে স্থির করাও তাঁর নুবূওয়তের অন্যতম প্রমাণ। যেমন- আল্লাহ তা'আলার বাণী-

- ''যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তারা তাঁকে তেমনিভাবে চিনে, যেমন তারা তাদের সন্তানদেরকে চিনে। আর তাদের একটি দল জেনেশুনে সত্যকে গোপন করে''। [সূরা বাক্বারা, আয়াত-১৪৬]
- এটা কি তাদের জন্য দলীল নয় যে, বনী ইসরাঈলের আলিমগণ তাঁর (নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সম্বন্ধে জানে? [সূরা শু'আরা, আয়াত-১৯৭]
- হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (মদীনা পাকে ইহুদীদের তৎকালীন বড় আলিম)-এর নিকট যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র মদীনা পাকে আগমনের বার্তা পৌঁছলো, তখন তিনি হুযূর পাকের নিকট এসে বললেন, ''আমি আপনাকে এমন তিনটি বিষয়ে প্রশ্ন করবো, যেগুলোর উত্তর শুধু কোন নবীই দিতে পারেন। (নবী ছাড়া আর কেউ এ বিষয়গুলোর জ্ঞান রাখে না। প্রশ্নগুলো হচ্ছে)

১. ক্বিয়ামতের প্রথম আলামত কি?
২. জান্নাতবাসীদের প্রথম খাদ্য কি?
৩. কোন্ জিনিস সন্তানকে পিতার দিকে ঝোঁকাবে আর কোন্ জিনিস সন্তানকে তার মাতার দিকে ঝোঁকাবে?''

প্রশ্নগুলোর উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন,
১. ''ক্বিয়ামতের প্রথম চিহ্ন হচ্ছে- তখন এমন একটি আগুন আসবে, যা পূর্ব প্রান্তের মানুষকে তাড়িয়ে পশ্চিম দিকে নিয়ে যাবে।
২. আর জান্নাতবাসীর প্রথম খাদ্য হবে মাছের কলিজার অতিরিক্ত অংশ এবং ৩.

সন্তানের সাদৃশ্যের ব্যাপারটা হল, পুরুষ যখন স্ত্রী-সহবাস করে আর পুরুষের বীর্য (শুক্র) মাতৃগর্ভে আগে পৌঁছে তখন সন্তান পিতার সদৃশ হয়। আর যদি মায়ের বীর্য (ডিম্ব) পূর্বে গর্ভে পৌঁছে তখন সন্তান তার মায়ের মত হয়।"

এটা শুনে আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম নবী করীমের রিসালতের সত্যতা স্বীকার করে বললেন, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি নিশ্চয় আপনি আল্লাহর রাসূল।"

[বোখারী শরীফ, কিতাবুল আম্বিয়া]

- অন্য বর্ণনায় আছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম তাঁর জাতি-ভাইদের উদ্দেশে বলেছেন, "হে ইহুদী সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। ওই আল্লাহর শপথ, যিনি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই। নিশ্চয় তোমরা জানো তিনি (হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল এবং তিনি সত্যের বাণী নিয়ে এসেছেন।" [বোখারী শরীফ]
- রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস ক্বোরাঈশ নেতা আবূ সুফিয়ানের সাথে দীর্ঘ কথোপকথনের পর বললেন, "আপনি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সম্বন্ধে যা বলেছেন তা যদি সত্য হয়, তাহলে তিনি সত্য নবী। আর আমার এই রাজ্যও অচিরেই তাঁর পদানত হবে।"
- হযরত জাফর ইবনে আবূ তালিবের উদ্দেশে আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজাশী ক্বোরআন পাক শোনার পর বলেছেন, "নিশ্চয় এটি (ক্বোরআন শরীফ) এবং হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম যা নিয়ে এসেছেন, উভয়টি এক ও অভিন্ন উৎস থেকে আগত।"

উল্লেখ্য যে, অসংখ্য খ্রিষ্টান তাদের ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যে শেষ যমানায় প্রতিশ্রুত নবীর বৈশিষ্ট্য পেয়ে তাঁর উপর ঈমান এনেছে। এ প্রসঙ্গে ক্বোরআন পাকে এরশাদ হয়েছে, 'আপনি সব মানুষের চাইতে মুসলমানদের অধিক শত্রু ইহুদী ও মুশরিকদেরকে পাবেন এবং আপনি সবার চাইতে মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্বে অধিক নিকটবর্তী তাদেরকে পাবেন, যারা নিজেদেরকে খ্রিস্টান বলে। এর কারণ এ যে, খ্রিষ্টানদের মধ্যে আলিম রয়েছে, দরবেশ রয়েছে এবং তারা অহঙ্কার করে না। আর তারা রাসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা যখন শুনে, তখন আপনি তাদের চোখ অশ্রু-সজল দেখতে পাবেন, এ কারণে যে, তারা সত্যকে চিনে নিয়েছে। তারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা মুসলমান হয়ে গেলাম। অতএব, আমাদেরকেও মান্যকারীদের তালিকাভুক্ত করে নিন। আমাদের কি ওযর থাকতে পারে যে, আমরা আল্লাহর প্রতি এবং যে সত্য আমাদের কাছে এসেছে, তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবো না এবং এ আশা করবো না যে, আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে সৎ লোকদের মধ্যে প্রবিষ্ট

করবেন?' অতঃপর তাদেরকে আল্লাহ এ উক্তির প্রতিদান স্বরূপ এমন উদ্যান দেবেন, যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত তারা তাতে চিরকাল অবস্থান করবে। এটাই সৎকর্মশীলদের প্রতিদান। [সূরা; মা-ইদাহ, আয়াত-৮২-৮৫]

▣ তাঁর জীবনাদর্শ নুবূয়তের অন্যতম প্রমাণ

কেউ যদি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যক্তি-জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে গভীরভাবে গবেষণা করে, তাহলে তার সম্মুখে এটা সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠবে যে, তিনি আল্লাহর রাসূল। কারণ, কোন সাধারণ মানুষের মধ্যে এ ধরনের চারিত্রিক গুণাবলীর পরিপূর্ণভাবে সমাবেশ ঘটা অসম্ভব। যুগে যুগে মনীষীগণ, এমনকি অমুসলিম মনীষীগণও তাঁর জীবনী গবেষণা করে এটাই বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ পূতঃপবিত্র ব্যক্তিত্ব।

'নবী' ও 'রাসূল' -এর সংজ্ঞা এবং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য

নবী ঃ নবী মানবজাতির এমন স্বাধীন পুরুষকে বলে, যাঁর প্রতি আল্লাহ তা'আলা ওহী (আসমানী প্রত্যাদেশ) প্রেরণ করেছেন।

রসূল ঃ রাসূল মানবজাতির এমন স্বাধীন পুরুষকে বলে, যাঁর প্রতি আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ওহী বা প্রত্যাদেশ সম্বলিত শরীয়ত দিয়েছেন এবং তা প্রচারের নির্দেশও দিয়েছেন।

অতএব, বুঝা গেলো যে, নবী ও রাসূল মানবজাতি থেকেই হয়েছেন; ফিরিশ্‌তা ও জিনকে আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূল করেন নি। কেউ কেউ ধারণা করতো যে, নবী ও রাসূল ফিরিশ্‌তাদের মধ্য হতে হওয়া আবশ্যক। যেমন মক্কার কাফিররা বলেছিলো, 'আমাদেরকে কি একজন মানুষ হিদায়ত করবে?' তাদের এই ধারণা যে অমূলক ও অবাস্তব সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ক্বোরআন মজীদে এরশাদ করেন, 'যদি নবীকে ফিরিশতা করতাম তবুও তাঁকে পুরুষই (মানুষ) করতাম এবং তাদের উপর ওই সন্দেহ রাখতাম, যার মধ্যে তারা এখন পতিত।'

[সূরা আন'আম, আয়াত ৯, তরজমা- কানযুল ঈমান]

আর নবী-রাসূলগণ পুরুষ হওয়াও আবশ্যক। কারণ, নুবূয়ত ও রিসালত (তথা মানবজাতিকে আল্লাহর দ্বীনের প্রতি আহবান করা)-এর দায়িত্ব নারীদের জন্য প্রযোজ্য নয়। কেউ কেউ মনে করে যে, হযরত মরিয়ম আলায়হাস্ সালাম, হযরত আসিয়া আলায়হাস্ সালাম, হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম-এর মাতা এবং হযরত হাজেরা আলায়হাস্ সালাম নবী ছিলেন; কারণ তাঁদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা ওহী প্রেরণ করেছেন। কিন্তু উপরিউক্ত আয়াত (সূরা আন'আম, আয়াত-৯) দ্বারা প্রমাণিত

হলো যে, নারীকে আল্লাহ পাক নবী করেন নি; বরং পুরুষকেই নবী করেছেন। আর উপরিউক্ত সম্মানিত মহিলাদের প্রতি যে 'ওহী' এসেছে, ওই 'ওহী' মানে 'ইলহাম' (স্বর্গীয় প্রেরণা) মাত্র। [তাফসীর ও আক্বাইদ গ্রন্থাবলী]

নবী ও রাসূলের মধ্যে আরো কিছু পার্থক্য

- **নবী ঃ** নবী হলেন, যার উপর স্বতন্ত্র দ্বীন প্রচারের দায়িত্ব আরোপ করা হয়নি আর রাসূল হচ্ছেন যাঁর উপর স্বতন্ত্র দ্বীন প্রচারের দায়িত্ব আরোপ করা হয়েছে।
- নবী হচ্ছেন, যাঁর উপর আল্লাহর পক্ষ হতে কিতাব অবতীর্ণ হয় নি। আর রাসূল হচ্ছেন যাঁর উপর আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে।
- নবী, যিনি তাঁর পূর্ববর্তী রাসূলের শরীয়তকে সমর্থন করেন, মানুষকে সেটার প্রতি আহ্বান করেন, তাঁর কোন নতুন স্বতন্ত্র শরীয়ত থাকে না। আর রাসূল যিনি স্বতন্ত্রভাবে নতুন শরীয়ত নিয়ে এসেছেন।
- কারো কারো মতে, নবীগণের নিকট আল্লাহর ওহী নিয়ে সরাসরি ফিরিশতা আসেন না, পক্ষান্তরে রাসূলের নিকট আল্লাহ্‌র ওহী নিয়ে সরাসরি ফেরেশতা আসেন।

  মোটকথা, তাঁরা উভয়ে আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত ও নির্বাচিত এবং তাঁরা আল্লাহর প্রত্যাদেশ (ওহী) দ্বারা ধন্য। এ দৃষ্টিকোণ্‌ থেকে নবী ও রাসূল এক ও অভিন্ন।

ওহীর সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ

নুবূয়ত ও রেসালতের ক্ষেত্রে ওহী হচ্ছে প্রধান বিষয়, যার মাধ্যমে নবী ও রসূলগণ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আক্বীদা, ইবাদত, জীবনবিধান, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, উপদেশাবলী, হুকুম-আহকাম, তথা দ্বীন, দুনিয়া ও আখিরাত সম্পর্কিত সবকিছু পেয়ে থাকেন। অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁরা উল্লেখিত বিষয়গুলো পাওয়ার অন্যতম প্রধান মাধ্যম হচ্ছে ওহী।

ওহীর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে গোপনে তাৎক্ষণিকভাবে কোন বিষয়ে অবগত করা। সাধারণত এটা আল্লাহর পক্ষ হতেই তাঁর নবী-রসূল, ফেরেশ্‌তা ও বিশেষ কোন বান্দার প্রতি প্রেরণ করা হয়। আর পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে- আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাঁর নবী ও রসূলগণকে দ্বীন ও শরীয়ত সম্পর্কিত বিষয়াবলী এভাবে অবগত করা যে, তাঁরা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বুঝতে পারেন যে, এগুলোর সবই মহান রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে। মানুষের দুনিয়া ও আখিরাত সম্পর্কিত বিষয়াবলী, বিশেষ করে আমাদের চোখের আড়ালের, আল্লাহর অদৃশ্য জগতের বিষয়াবলী নবী ও রাসূলগণ আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে ওহী দ্বারা অবগত হয়ে মানব সমাজে প্রচার করেন।

সাধারণত ওহী তিন ধরনের। এর বর্ণনা আমরা ক্বোরআন পাকের মধ্যে পেয়ে থাকি। যেমন আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন, 'কোন মানুষের অবস্থা এমন নয়

যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন; কিন্তু ওহীর মাধ্যমে অথবা পর্দার অন্তরাল থেকে কিংবা তিনি কোন ফিরিশতা প্রেরণ করবেন, যে আল্লাহ যা চান তা তাঁর অনুমতিক্রমে পৌঁছিয়ে দেবে। নিশ্চয় তিনি অতি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী, প্রজ্ঞাময়।' [সূরা শূরা, আয়াত-৫১]

আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নবী ও রাসূলগণের প্রতি ওহী প্রেরণের পদ্ধতিসমূহের মধ্যে-

প্রথমটি হচ্ছে তাঁদের ঘুমন্ত অথবা জাগ্রত অবস্থায় অন্তরে সুনির্দিষ্ট বিষয়ে ভাব উদ্রেক হওয়া। তা থেকে তাঁরা বিষয়টি বুঝে নেন যে, এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। সে ব্যাপারে তাঁরা সুদৃঢ় মনোভাব পোষণ করেন।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে নবী ও রসূলগণ কর্তৃক আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখা ব্যতীত তাঁর কথা সরাসরি শোনা। যেমন হযরত মূসা আলায়হিস্‌ সালাম তূর পর্বতে গিয়ে আল্লাহর সাথে কথা বলতেন; কিন্তু তিনি আল্লাহকে দেখতেন না।

তৃতীয় পদ্ধতি হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী নিয়ে তাঁদের নিকট ফিরিশতা অবতীর্ণ হওয়া। বেশির ভাগ ওহী এ পদ্ধতিতে নাযিল হয়েছে। বিশেষ করে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ওহীর দায়িত্বে নিয়োজিত বুযুর্গ ফেরেশতা হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্‌ সালাম মহান রাব্বুল আলামীনের বাণী নিয়ে আসতেন। তিনি কখনো কখনো তাঁর মূল আকৃতিতে আর কখনো কখনো কোন সাহাবীর আকৃতিতে আসতেন। আর সাহাবীদের মধ্যে হযরত দাহ্‌ইয়া কালবী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র আকৃতিতে হযরত জিব্রাঈল নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসতেন।

নবী ও রসূলগণ আলায়হিমুস্‌ সালাম -এর বৈশিষ্ট্যাবলী

সমস্ত নবী ও রসূল, বিশেষকরে আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌ পাকের নূর থেকে সৃষ্ট। যদিও তাঁরা বাহ্যিকভাবে মানবীয় আকৃতিতে দুনিয়াতে এসেছেন। আল্লাহর ক্বুদরতে তাঁদের মধ্যে নূরানিয়াত ও মানবীয়তার সমন্বয় ঘটেছে। পিতার ঔরশে ও মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং মানবীয়তা তাঁদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো। তাই তাঁরা শারীরিকভাবে ব্যাথা-বেদনা, দুঃখ-কষ্ট, সুস্থতা-অসুস্থতা অনুভব করেন। তাঁরা পানাহার গ্রহণ করেন, বিবাহ-শাদী করেন, সন্তান-সন্ততি জন্ম দেন এবং ইনতিকালের স্বাদও গ্রহণ করেন। তবে সাধারণ মানুষের মৃত্যু ও তাঁদের ইন্‌তিক্বালের মধ্যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে। প্রত্যেক নবী ও রাসূলের ওফাত শরীফ তাঁদের ইখতিয়ার অনুসারে সংঘটিত হয়। তাঁদেরকে ইনতিকাল করা কিংবা না করার ইখ্‌তিয়ার দেওয়া হলেও তাঁরা ইন্‌তিকালকেই গ্রহণ করেছেন। তাঁদের রূহ মুবারকগুলো কব্‌জ করার প্রকৃতি এবং ধরনও স্বতন্ত্র। অতি যত্ন সহকারে এটা সম্পন্ন করা হয়।

তাঁদেরকে মূলত মহান আল্লাহ তা'আলা মানব জাতি থেকে নুবূয়ত ও রিসালতের মত গুরুদায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ার জন্য নির্বাচিত করেছেন। স্বয়ং রাব্বুল আলামীন তাঁদেরকে খুব সুন্দরভাবে আদব বা শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছেন। সাধারণ মানুষ থেকে বহু বেশী অনুগ্রহ দ্বারা তাঁদেরকে ধন্য করেছেন। মানবিক গুণে পূর্ণতার চরম শিখরে তাঁদেরকে সমাসীন করেছেন এবং সব প্রকার মানবীয় দুর্বলতা থেকে তাঁদেরকে মুক্ত রেখেছেন। মানবীয়তায়ও তাঁদের নূরানিয়াতের প্রভাব বিদ্যমান। তাঁদেরকে যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য দ্বারা ধন্য করা হয়েছে, তন্মধ্যে নিম্নে কিছু আলোকপাত করা হচ্ছে-

■ **'ইস্মত'** (সংরক্ষণ তথা নিষ্পাপ হওয়া।) আর তা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা নবী ও রাসূলগণের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন ব্যাপারসমূহকে বিশেষভাবে হেফাযত করেছেন। এরই ফলশ্রুতিতে তাঁরা আল্লাহর বাণী প্রচারের ক্ষেত্রে যে কোন ধরনের ভুল-ভ্রান্তি কিংবা অবহেলা থেকে মুক্ত ছিলেন। তাঁরা নুবূয়ত প্রকাশের পূর্বে এবং পরে কুফ্র থেকে এবং সব রকমের কবীরা গুণাহ, এমনকি সগীরা গুনাহ থেকেও পবিত্র। অর্থাৎ নবীগণ মা'সূম বা নিষ্পাপ। আর নিষ্পাপ হওয়ার গুণটা তাঁদের জন্য আল্লাহ তা'আলা অনিবার্য করেছেন- এ কারণেই যে, তাঁদেরকে তিনি মানব জাতির জন্য উত্তম আদর্শ বানিয়েছেন, অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় করেছেন। তাঁদের কথা মান্য করতে এবং তাঁদের কর্মের অনুসরণ করতে আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। বস্তুত যাঁদের অনুসরণ করা হবে, যাঁদেরকে আদর্শ হিসেবে মানা হবে, তাঁরা যদি নিষ্পাপ না হন তাহলে তাঁদের মানা ও অনুসরণের মধ্যে উপকারিতাই বা কি?

অতএব, সম্মানিত নবীগণ হলেন মানবজাতি থেকে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্বাচিত। মানবজাতিকে হিদায়ত এবং তাদের নিকট আল্লাহর বাণী ও শরীয়ত প্রচারের নিমিত্তে আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে মনোনীত করেছেন এবং তাঁদেরকে সুসজ্জিত করেছেন সুনিপুণ দৈহিক অবয়বেও। সাথে সাথে সব রকমের চারিত্রিক গুণাবলী ও পূর্ণতার সমাবেশ ঘটিয়েছেন তাঁদের সত্তায়। বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ যত ধরনের দোষ-ত্রুটি হতে পারে সবকিছু থেকে, তথা সবধরনের মানবীয় দুর্বলতা থেকে আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে মুক্ত রেখেছেন। আর এ হেফাযত শুধু নুবূয়ত প্রকাশের পরে নয়; বরং নুবূয়ত প্রকাশের পূর্বেও। এই ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়া জামা'আতের বিজ্ঞ আলিমগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

■ **অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও বোধশক্তি ঃ** নবী ও রাসূলগণের জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা, প্রজ্ঞা, বোধশক্তি ও সচেতনতা সাধারণ মানুষ থেকে অনেক বেশি। কারণ তা তাঁদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তর্ক-বিতর্কে তাঁরা খোদাদ্রোহীদেরকে পরাস্ত করতে সক্ষম। আর এ সকল বৈশিষ্ট্য তাঁদেরকে দেয়া হয়েছে এ জন্য যে, তাঁদের দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহর

দ্বীন প্রচার করা, মানুষকে সত্য ধর্মের প্রতি আহ্বান করা, ভ্রান্ত আক্বীদা দূরীভূত করা, মানুষের অন্তরে সঠিক আক্বীদা বা বিশ্বাসের বীজ বপন করা। আর এসব কিছুর জন্য তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সচেতনতা ও প্রজ্ঞা অত্যন্ত আবশ্যক। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা ক্বোরআন পাকে সম্মানিত নবীগণের কিছু ঘটনা উল্লেখ করেছেন। যেমন-

■ আল্লাহ তা'আলার বাণী, (নূহের সম্প্রদায় বলেছে) 'হে নূহ! তুমি আমাদের সাথে ঝগড়া করেছো, তুমি আমাদের সাথে অতি মাত্রায় ঝগড়া করেছো, সুতরাং তুমি সত্যবাদী হলে আমাদের যার ভয় দেখাচ্ছ তা আনয়ন করো।' [সূরা হুদ-৩২]

■ এবং এটা আমার দলীল, তা আমি ইব্রাহীমকে তার সম্প্রদায়ের মোকাবেলায় দান করেছি। আমি যাকে চাই বহু মর্যাদায় উন্নীত করি। নিঃসন্দেহে আপনার রব জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী। [সূরা আন'আম, আয়াত-৮৩, তরজমা কানযুল ঈমান]

■ হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর সাথে নমরূদের ঘটনাটি আল্লাহ তা'আলা ক্বোরআন মজীদে উল্লেখ করেছেন, যে বিতর্কের ঘটনায় হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম নমরূদকে পরাস্ত করেছিলেন- "তুমি কি ওই ব্যক্তির (নমরূদ) কথা ভেবে দেখোনি, যে ইব্রাহীমের সাথে তার প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিলো, যেহেতু আল্লাহ তাকে রাজত্ব দিয়েছিলেন। যখন হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম বললো, 'তিনি আমার প্রতিপালক, যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান'। তখন সে বললো, আমিও তো জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই। হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম) বললো, 'নিশ্চয় আল্লাহ সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদিত করেন, তুমি তাকে পশ্চিম দিক থেকে উদিত করো।' তখন সে (নমরূদ) হতবুদ্ধি হয়ে গেলো এবং আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।" [সূরা বাক্বারা: আয়াত ২৫৮]

■ এভাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উদ্দেশে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন, 'হে হাবীব! আপনি আপনার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান করুন প্রজ্ঞা ও সুন্দর উপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে উৎকৃষ্ট পন্থায় তর্ক করুন, যা তাদের জন্য প্রযোজ্য।' [সূরা নাহ্‌ল, আয়াত-১২৫]

■ **তাঁরা সম্ভ্রান্ত পরিবারের হন** অর্থাৎ তাঁদের পূর্বপুরুষগণ সম্মানিত ও মর্যাদাবান। তাঁরা উত্তম বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁদের সামাজিক অবস্থান সম্মানজনক ছিলো। যেমন- বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, "আল্লাহ তা'আলা শুধু সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত সম্প্রদায় থেকেই নবী প্রেরণ করেছেন।"[আল হাদীস]

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র ক্বোরআনে এরশাদ করেছেন, তারা বললো, 'হে শু'আয়ব! আপনি যা বলেন তার অনেক কথাই আমরা বুঝি না এবং আমরা তো আপনাকে আমাদের মধ্যে দুর্বল মনে করি। যদি আপনার স্বজনবর্গ না থাকতো, তবে আমরা অবশ্যই আপনাকে প্রস্তরাঘাত করে মেরে ফেলতাম। আর আপনি তো আমাদের উপর শক্তিশালী নন।' [সূরা হুদ, আয়াত-৯১]

উক্ত আয়াতে হযরত শু'আয়ব আলায়হিস্ সালাম সম্ভ্রান্ত পরিবারের হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। এভাবে প্রত্যেক নবী স্বীয় যুগের শ্রেষ্ঠ বংশের সন্তান ছিলেন। যেমন- আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিখ্যাত ক্বোরাইশ বংশের হাশেমী গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। রোমের বাদশাহ হেরাক্লিয়াস যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যাপারে আবূ সুফিয়ানকে বললো, "তোমাদের মধ্যে তাঁর সামাজিক মর্যাদা কেমন?" উত্তরে আবূ সুফিয়ান বললেন, "তিনি আমাদের মধ্যে মর্যাদাশীল ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান।" তখন হেরাক্লিয়াস বললো, "এভাবে রাসুলগণকে সম্মানিত বংশধারায় প্রেরণ করা হয়।" আর এর পেছনে কারণ হচ্ছে- নবী-রাসূলগণ সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান হওয়ার কারণেই একদিকে মানুষ যেমন তাঁদের কথার উপর আস্থাশীল হতে পারে, অন্যদিকে তেমনি তাঁরা কাফির-মুশরিকদের অত্যাচার প্রতিরোধ করতে পারেন।

■ **তাঁরা উত্তম চরিত্র ও মহৎ প্রাণের অধিকারী।** তাঁরা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের চরম শিখরে উপনীত। তাঁরা পূত-পবিত্র আত্মার অধিকারী। সামাজিক অনাচার-দূরাচার এবং কোন ধরনের মন্দ কার্যকলাপ তাঁদের ব্যক্তিত্বকে স্পর্শ করতে পারে নি। উদারতা, মহানুভবতা ও বদান্যতা তাঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অন্যতম। যেমন নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নুবূয়তের সত্যতার প্রমাণ হিসেবে হযরত খাদীজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই চিহ্নিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি (হযরত খাদীজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) বলেছেন, "কখনো না। মহান আল্লাহ তা'আলারই শপথ, আল্লাহ কখনো আপনাকে লাঞ্ছিত করবেন না। কেননা আপনি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করেন, সত্য কথা বলেন, নিঃস্বদের আশ্রয় দেন, অতিথিকে সমাদর করেন এবং বিপদগ্রস্থদের সাহায্য করেন"। [বোখারী শরীফ]

হেরাক্লিয়াস যখন আবূ সুফিয়ানকে প্রশ্ন করলো, "তিনি কি অবাধ্যাচারণ করেন?" উত্তরে আবূ সুফিয়ান বললেন, "না।" তখন হেরাক্লিয়াস বললো, "এটাই নবী-রসূলগণের চরিত্র।" আল্লাহ তা'আলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে তাঁর প্রতি ওহী প্রেরণ করার পূর্বে আইয়্যামে জাহেলিয়াতের মন্দ স্বভাব থেকে হেফাজত করেছেন। যেমন- বিশুদ্ধ হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ছোট বেলায়, কা'বা ঘর পুনঃনির্মাণের সময়, তাঁর চাচা হযরত আব্বাসের সাথে ইট বহন করেছিলেন। তখন হযরত আব্বাস তাঁর পরিহিত লুঙ্গি খুলে তাঁর কাঁধের উপর দিতে চাইলেন। তখন লজ্জায় তিনি বেঁহুশ হয়ে পড়ে যান। তখনই তাঁর কাপড় তাঁকে উত্তমরূপে পরিয়ে দেওয়া হলো। আরেকবার তাঁকে কোন এক খেলা-তামাশার অনুষ্ঠানে দাওয়াত করা হলে তাঁকে প্রচন্ড নিদ্রা পেয়ে যায় এবং ওই নিদ্রায় তাঁর সকাল হয়ে গেলো। ফলে

ওই অনুষ্ঠানে যা কিছু হয়েছে তা তিনি দেখেনও নি এবং তাতে অংশ গ্রহণও করেন নি। আর তাঁর নুবূয়ত প্রকাশের পূর্বে আরবদের মধ্যে তিনি সত্যবাদী ও আমানতদার হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তারা তাদের সম্পদ তাঁর নিকট গচ্ছিত রাখতো। আর তারা কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে তাঁর শরণাপন্ন হতো। এমনকি কাবাগৃহে কালো পাথর স্থাপনের ব্যাপারে যে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিলো, তাতে তারা তাঁর সমাধানকে মাথা পেতে মেনে নিয়েছিলো।

■ **মানুষের মধ্যে দুর্বল লোকেরাই প্রথমে তাঁদের অনুসারী হয়।** যেমন- হযরত নূহ আলায়হিস্ সালামকে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা বলেছিলো, (ক্বোরআনের ভাষায়) "আর আমাদের মধ্যে যারা নিতান্ত নিম্নস্তরের, তাও আবার স্থূল-বুদ্ধিসম্পন্ন, তাদের ছাড়া অন্য কাউকে আপনার অনুসরণ করতে দেখি না এবং আমাদের উপর আপনার কোন শ্রেষ্ঠত্ব দেখি না বরং আমরা আপনাকে মিথ্যাবাদী মনে করি।"

অর্থাৎ নবীগণের প্রতি প্রথমে ঈমান আনেন সমাজের দুর্বল মানুষগণ। এরপর ক্রমশ তাঁদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তারা দ্বীন-ধর্মের প্রতি অত্যন্ত আন্তরিক। ঈমান যখন তাদের আত্মার গভীরে পৌঁছে যায় তখন তাদের কেউ আর ধর্মবিমুখ হয় না। তারা আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূলের সন্তুষ্টি কামনায় সর্বস্ব উৎসর্গ করতে সদা প্রস্তুত।

এ প্রসঙ্গেও হেরাক্লিয়াস আবূ সুফিয়ানকে বলেছিলো, "আমি তোমাকে প্রশ্ন করেছি- 'সমাজের মোড়ল শ্রেণীর মানুষ কি তাঁকে অনুসরণ করে, না দুর্বল লোকেরা?' তুমি উত্তরে বলেছো, 'দুর্বল লোকেরাই তাঁর অনুসরণ করে।' স্বভাবত দুর্বলরাই রসূলের অনুসারী হয়।" আর আমি তোমাকে প্রশ্ন করেছি, 'ইসলাম গ্রহণ করার পর ধর্মের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে কেউ কি ধর্মান্তরিতও হয়?' তুমি বলেছো, 'না।' আর এভাবেই হয়ে থাকে। ঈমান যখন অন্তরের অন্তঃস্থলে পৌঁছে যায় তখন তার প্রভাব তার শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সঞ্চালিত হয়। ফলে তাঁরা ধর্মানুরাগী হয়, ধর্মান্তরিত হয় না।"

[সহীহ বোখারী শরীফ, ১ম খণ্ড]

■ **তাঁদের থেকে মু'জিযা প্রকাশ পায়।** তাঁদের নুবূয়ত ও রিসালতের স্বীকৃতি স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা তাঁদের হাতে এমন অলৌকিক শক্তি দেন, বা অলৌকিক ঘটনাসমূহ সংঘটিত করান, যা করা কোন মানুষ ও জিনের পক্ষে সম্ভব নয়। যেমন, মি'রাজ শরীফ, চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করা, ডুবন্ত সূর্যকে ফেরৎ আনা ইত্যাদি।

■ **সত্যবাদিতা তাঁদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।** যেমন আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন- "আর আমি তাদেরকে দান করলাম আমার রহমত এবং তাদেরকে দিলাম সুনাম, সুখ্যাতি।" [সূরা মরিয়াম, আয়াত- ৫০]

হে আমার রব! আমাকে হিকমত দান করুন এবং আমাকে পূণ্যবান লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন আর আমার সুখ্যাতি অব্যাহত রাখুন পরবর্তীদের মধ্যে।

[সূরা শু'আরা, আয়াত-৮৩-৮৪]

অতএব, 'সত্যবাদিতা' গুণটি নবী ও রাসূলগণের ক্ষেত্রে ওয়াজিব বা অনিবার্য। মিথ্যা বলার কথা তাঁদের বেলায় কল্পনাও করা যায় না।

■ তাঁদের বৈশিষ্ট্যাবলীর মধ্যে অন্যতম হল তাঁরা মানুষকে দ্বীনের প্রতি আহ্বান করেন, আল্লাহর ইবাদত তথা নামায, যাকাত, আত্মীয়তার বন্ধন ইত্যাদির প্রতি আহ্বান করেন। সম্রাট হিরাক্লিয়াস আবূ সুফিয়ানকে বলেছিলো, ''তিনি তোমাদেরকে কিসের নির্দেশ দেন?'' আবূ সুফিয়ান বলেছিলেন, ''তিনি আমাদেরকে নামায, যাকাত, আত্মীয়তার বন্ধন ও সততা অবলম্বনের নির্দেশ দেন।'' অতঃপর, হিরাক্লিয়াস বলেছিলো, ''তুমি যা বলেছো তা যদি সত্য হয় তাহলে তিনি সত্য নবী। তাছাড়া, আমার এই সাম্রাজ্য অচিরেই তাঁর আয়ত্বে চলে যাবে।'' আর মুসলমানরা যখন আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন, তখন বাদশাহ্ নাজাশী মুসলমানদের দলপতি হযরত জা'ফর ইবনে আবূ তালেব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে প্রশ্ন করেছিলেন, ''এটা কেমন ধর্ম, যা তোমাদের আপন সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে দিয়েছে?'' উত্তরে তিনি বলেন, ''হে মহান বাদশাহ! আমরা জাহেলী যুগের সম্প্রদায়। আমরা মূর্তি পূজা করতাম, মৃত ভক্ষণ করতাম, অশ্লীলতা ও বেহায়াপনায় লিপ্ত থাকতাম, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করতাম, প্রতিবেশীদের প্রতি সদাচরণ করতাম না, আমাদের মধ্যে শক্তিমানরা দুর্বলদের উপর চড়াও হতো। এ অবস্থা আমাদের মধ্যে চলতে লাগলো। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা আমাদের মধ্য থেকে আমাদের প্রতি এমন রাসূল প্রেরণ করেন, যাঁকে আমরা চিনি, যাঁর বংশধারা সু-পরিচিত, যাঁর সততা, আমানতদারী, চারিত্রিক নিষ্কলুষতা সম্পর্কে আমরা উত্তমরূপে জ্ঞাত। তিনি আমাদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করলেন এবং সত্য কথা বলতে, আমানত রক্ষা করতে, আত্মীয়তার বন্ধন সংরক্ষণ করতে, প্রতিবেশীর প্রতি সদয় হতে এবং হারাম ও রক্তপাত হতে বিরত থাকতে নির্দেশ দিলেন এবং অশ্লীলতা, মিথ্যা বলা, এতিমের সম্পদ আত্মসাৎ করা, কোন সাধ্বী মহিলাকে অপবাদ দিতে নিষেধ করেছেন। আমাদেরকে এক আল্লাহর ইবাদত করার নির্দেশ দিয়েছেন-আমরা যেন তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক না করি। এভাবে নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি ইবাদতেরও নির্দেশ দিয়েছেন। অতঃপর আমরা তাঁকে সত্য বলে মেনে নিয়েছি, তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি। তাই আমাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা আমাদের সাথে দুশমনী করছে, আমাদের নির্যাতন করছে। আমাদের উপর যখন তারা অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দিলো, তখন আমরা বাধ্য হয়ে আপনার দেশে হিজরত করেছি।''

■ সমস্ত নবী-রসূলের প্রতি ঈমান আনার হুকুম

প্রত্যেক মু'মিনের উপর নবী ও রসুলগণের প্রতি এই মর্মে ঈমান আনা ওয়াজিব যে, তাঁরা আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ। তাঁদেরকে আল্লাহ তা'আলা এ মহান দায়িত্ব (নুবূয়ত ও রিসালত) আঞ্জাম দেয়ার জন্য মানব জাতি থেকে নির্বাচিত করেছেন। তাঁরা সত্যবাদী ও নিষ্পাপ। নুবূয়ত ও রিসালত প্রকাশের পুর্বে এবং পরে তাঁদের থেকে কোন ধরনের ছোট কিংবা বড় গুণাহ সম্পাদিত হয় নি। তাঁরা সংখ্যায় অগণিত। হযরত আদম আলায়হিস সালাম-এর মাধ্যমে দুনিয়াতে নবী-রসূল প্রেরণের সূচনা হয় এবং আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণের মাধ্যমে এ ধারার পরিসমাপ্তি ঘটে। তিনিই সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ''রসূল ঈমান এনেছেন ওই সব বিষয়ের উপর, যেগুলো তাঁর প্রতি নাযিল করা হয়েছে, তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে এবং মু'মিনরাও ঈমান এনেছে। তারা সবাই ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফিরিশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি এবং তাঁর রসূলগণের প্রতি। তারা বলে, 'আমরা তাঁর রসূলদের মধ্যে পার্থক্য করি না'।'' [সূরা বাক্বারা, আয়াত-২৮৫]

নবী ও রসূলগণের সংখ্যা সঠিকভাবে নিরূপণ করা সম্ভব নয়। এরপরও ১,২৪,০০০ (এক লক্ষ চব্বিশ হাজার), ৩,৩৬,০০০ (তিনলক্ষ ছত্রিশ হাজার) মর্মে বর্ণনা পাওয়া যায়। তাঁদের সংখ্যা যতই হোক না কেন তাঁদের সবার উপর আমাদের ঈমান আনা ওয়াজিব। তাঁদের মধ্যে ২৫ জনের নাম পবিত্র ক্বোরআনের উল্লেখ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৫ জনকে اولوا العزم (উলুল্ 'আযম) বা দৃঢ় প্রত্যয়ী বলা হয়। কারণ তাঁদেরকে তাঁদের সম্প্রদায়গুলো অসহনীয় কষ্ট ও যন্ত্রণা দিয়েছে, তাঁদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। তাঁদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রিয় নবীকে সম্বোধন করে এরশাদ এরশাদ করেছেন, ''অতঃপর আপনি ধৈর্যধারণ করুন, যেভাবে পূর্ববর্তী রসূলগণ ধৈর্যধারণ করেছেন।'' [সূরা আহক্বাফ, আয়াত-৩৫]

আর اولوا العزم (উলুল 'আযম) রাসূলগণ হচ্ছেন- আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম, হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস সালাম, হযরত মুসা আলায়হিস সালাম, হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম ও হযরত নূহ আলায়হিস সালাম। তাঁদের প্রত্যেকের নুবূয়ত বা রিসালতের কথা কায়মনোবাক্যে স্বীকার করতে হবে; কোন অবস্থাতেই তা অস্বীকার করা যাবে না। কেউ অস্বীকার করলে সে কাফির হয়ে যাবে।

-----<>----

ভাল কাজের আদেশ আর মন্দকাজে নিষেধ করা

[اَلْاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكِرِ]

প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে পরিশুদ্ধ, ন্যায় ও সৎকর্মপরায়ণ হওয়া যেমন জরুরী, তেমনি সমাজের অন্যান্য মানুষকেও সৎকর্মপরায়ণ বানানো জরুরি। ইসলাম সৎকর্মের নির্দেশ দান ও অসৎকর্মে বাধা প্রদানের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। তাই এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

যুগশ্রেষ্ঠ আলেমে দ্বীন ও অলীয়ে কামেল আল্লামা ফক্বীহ আবুল্ লাইস্ নসর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম সমরক্বন্দী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর প্রণীত 'তাম্বীহুল গা-ফিলীন' গ্রন্থে বর্ণনা করেন, 'আ-মের বিল মা'রূফ ও না-হী আনিল মুন্কার' (ভাল কাজের নির্দেশদাতা ও মন্দ কাজে নিষেধকারী)-কে সর্বপ্রথম পাঁচটি বিষয় অর্জন করতে হবে-

১. 'ইলম'; অর্থাৎ 'মা'রূফ' (সৎকর্ম) এবং 'মুনকার' (মন্দকর্ম) সম্পর্কে তার জ্ঞান থাকতে হবে। অন্যথায় সে মা'রূফকে মুনকার এবং মুন্কারকে মা'রূফ মনে করে মানুষকে উল্টো পথে নিয়ে যাবে। (যা বাতিল ফির্ক্বার মৌলভী ও মূর্খ দিশারীদের দ্বারা অহরহ হচ্ছে।)
২. 'ইখলাস'; অর্থাৎ এ কাজ আল্লাহ-রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জন এবং দ্বীন ও ঈমানের উদ্দেশ্যে হওয়া।
৩. 'শফক্বত' অর্থাৎ- বিনম্র, দয়া ও স্নেহপরবশ হওয়া।
৪. 'সবূরান হালীমা'; অর্থাৎ অত্যন্ত ধৈর্য্যশীল ও সহনশীল হওয়া এবং
৫. 'আ-মিল হওয়া'; অর্থাৎ নিজেও ওই ভাল কাজটির সম্পাদনকারী এবং মন্দকাজটির বর্জনকারী হওয়া।

'মা'রূফ' ও 'মুন্কার' কাকে বলে?

উপরে উল্লিখিত প্রত্যেকটি বিষয়ের বিশ্লেষণ ইন্শা-আল্লাহ যথাস্থানে করা হবে। আমরা সর্ব প্রথম 'মা'রূফ' ও 'মুন্কার'-এর পরিচয় জানার চেষ্টা করবো।

আল্লামা রা-গিব ইস্ফাহা-নী 'আলমুফরাদা-ত' গ্রন্থে লিখেছেন-

اَلْمَعْرُوْفُ اِسْمٌ لِكُلِّ فِعْلٍ يُعْرَفُ بِالْعَقْلِ اَوِ الشَّرْعِ حُسْنُهٗ وَالْمُنْكَرُ مَا يُنْكَرُ بِهِمَا

অর্থাৎ :'মা'রূফ' হচ্ছে ওই কাজের নাম, যা উত্তম হওয়া সুস্থ বিবেক কিংবা শরীয়ত দ্বারা জানা যায় আর 'মুনকার' হচ্ছে ওই কাজ, যা মন্দ হওয়াও ওই দু'টি দ্বারা জানা যায়।

এর প্রায় কাছাকাছি অর্থেই ফক্বীহ আবুল্লাইস সমরক্বন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন-

اَلْمَعْرُوْفُ مَا كَانَ مُوَافِقًا لِلْكِتَابِ وَالْعَقْلِ وَالْمُنْكَرُ مَا كَانَ مُخَالِفًا لِلْكِتَابِ وَالْعَقْلِ

অর্থাৎ: যা কিতাব ও সুস্থ বিবেকের অনুরূপ হয় তা 'মা'রূফ' (ভালো) এবং যা কিতাব ও সুস্থ বিবেকের বিরোধী হয় তাই 'মুন্কার' (মন্দ)।

ইসলামে বিবেকের মর্যাদা কেন ও কখন?

'ইসলামী শরীয়ত' হচ্ছে মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নির্দেশিত এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদর্শিত পন্থার নাম। এতে কোন ত্রুটি নেই, ভ্রান্তি নেই, নেই কোন দুর্বল দিক। ইসলাম স্বভাবের ধর্ম। তাই এর সত্যতা যাচাই করতে ইসলাম সবাইকে খোলাখুলি আহবান করেছে। বিবেকহীন মূর্খের কাছে যাচাই শক্তি নেই। তাই ইসলাম বিবেক ও বিবেকবানকে মর্যাদা দিয়েছে।

তবে এর সাথে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য জুড়ে দেয়া হয়েছে। দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন চোখ আলোতে উঁচু-নিচু, সুন্দর-অসুন্দর সবই ফারাক্ব করতে পারে; কিন্তু রাতের অন্ধকার ছেয়ে গেলে কিংবা বাতি নিভিয়ে দিলে সামনের বস্তুটিও দেখতে পায় না। তদ্রূপ মানুষ বিবেক দিয়ে ভালমন্দ যাচাই করতে পারে সত্য, কিন্তু যখন মানুষের চিরশত্রু শয়তান হিংসা-বিদ্বেষ, ক্ষোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য ইত্যাদির কালো আঁধারে তার বিবেককে ছাইয়ে দেয় তখন সে দেখেও না দেখার, শুনেও না শোনার, বুঝেও না বুঝার এবং জেনেও না জানার মত আচরণ করতে থাকে। মন্দ কাজ করেও ধারণা করতে থাকে আমি খুব ভাল কাজ করেছি। পবিত্র ক্বোরআনে এদিকে ইঙ্গিত করেই এরশাদ হয়েছে-

وَلٰكِنْ قَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

তরজমা : তাদের অন্তরগুলো তো কঠিন হয়ে গেছে, যেহেতু তারা যেসব কাজ করছিলো, শয়তান তাদের সে সব কার্যক্রমকে তাদের দৃষ্টিতে সুশোভিত করে দেখিয়েছে। [সুরা আন'আম: আয়াত ৪৩]

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا وَلّٰى مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا كَاَنَّ فِىْٓ اُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ

তরজমা : যখন তার নিকট আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয়, তখন সে দম্ভের সাথে এমনভাবে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন সে ওইগুলো শুনতেই পায় নি, যেন তার দু'কানে বধিরতা রয়েছে। সুতরাং তাকে বেদনাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন।

[সুরা লোক্বমান: আয়াত ৭]

اِنَّکَ لَا تُسۡمِعُ الۡمَوۡتٰی وَلَا تُسۡمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ اِذَا وَلَّوۡا مُدۡبِرِیۡنَ ○ وَمَآ اَنۡتَ بِهٰدِی الۡعُمۡیِ عَنۡ ضَلٰلَتِهِمۡ ط اِنۡ تُسۡمِعُ اِلَّا مَنۡ یُّؤۡمِنُ بِاٰیٰتِنَا فَهُمۡ مُّسۡلِمُوۡنَ ○

তরজমা: নিশ্চয় আপনার শুনানো (কথা) শুনতে পায়না এবং না আপনার শুনানো (আহ্বান) বধির শুনতে পায় যখন ফিরে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে এবং না অন্ধ লোকদেরকে ভ্রান্তি থেকে আপনি হিদায়তকারী। আপনার শুনানো কথাতো তারাই শোনে যারা আমার নিদর্শনাবলীর উপর ঈমান আনে; সুতরাং তারা হচ্ছে মুসলমান।

[সূরা নামল, আয়াত ৮০, ৮১]

وَاِنَّ فَرِیۡقًا مِّنۡهُمۡ لَیَکۡتُمُوۡنَ الۡحَقَّ وَهُمۡ یَعۡلَمُوۡنَ

তরজমা: নিশ্চয় তাদের একটি সম্প্রদায় জেনে-শুনে সত্যকে গোপন করে।

[সূরা বাক্বারা: আয়াত- ১৪৬]

قُلۡ هَلۡ نُنَبِّئُکُمۡ بِالۡاَخۡسَرِیۡنَ اَعۡمَالًا ○ اَلَّذِیۡنَ ضَلَّ سَعۡیُهُمۡ فِی الۡحَیٰوةِ الدُّنۡیَا وَهُمۡ یَحۡسَبُوۡنَ اَنَّهُمۡ یُحۡسِنُوۡنَ صُنۡعًا

তরজমা: হে হাবীব, আপনি বলুন, আমি কি তোমাদেরকে ওই সব লোকের কথা জানিয়ে দেবো, যারা কর্মের দিক থেকে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত? তারাই ওই সব লোক, যাদের সকল কর্ম প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনেই ভ্রান্তির শিকার হয়ে বরবাদ হয়ে গেছে, অথচ তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করছে। [সূরা কাহফ, আয়াত-১০৩, ১০৪]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, সহজেই অনুমান করতে পারছেন যে, পবিত্র ক্বোরআনে বর্ণিত শয়তানের ফাঁদে পড়া এ শ্রেণীর লোকদের বিবেকবুদ্ধি কীভাবে ভাল-মন্দ যাচাইয়ের মাপকাঠি হতে পারে।

ভাল-মন্দ যাচাইয়ের উপায় কি?

ইসলাম মানব জীবনের সর্বপ্রকার ভালোর একটি নাম দিয়েছে ‘হিদায়ত’ (هَدَايَتُ) আর সামগ্রিক মন্দ কাজগুলোর নাম রেখেছে ‘দ্বলালত’ (ضَـــلالـــت) । প্রথমটি অর্জনের উপায় বা পথের নাম রেখেছে ‘আস্ সেরাতুল মুস্তাকীম’(اَلـــصِّـــــرَاطُ الۡمُسۡتَقِيۡمُ)।

ইসলামী দর্শনে সাধারণভাবে মানুষকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন- ‘মুন‘আম আলায়হিম’ (مُـنۡـعَـمُ عَـلَيۡهِمۡ) বা নি’মাতপ্রাপ্ত। তাঁদের পরিচয় দেয়া হয়েছে- নাবীয়্যীন, সিদ্দীক্বীন, শোহাদা ও সালেহীন নামে। দ্বিতীয় শ্রেণী ‘মাগদ্বূব আলাইহিম’ ও ‘দ্বোয়া-ল্লী-ন’ অর্থাৎ অভিশপ্ত ও পথভ্রান্ত নামে আখ্যায়িত। আর তৃতীয় দল এখান থেকেই উৎসারিত। অর্থাৎ যারা সরাসরি নি’মাত প্রাপ্ত না হলেও তারা অভিশপ্ত এবং পথভ্রষ্ট নয়; বরং তারা অনুগ্রহ তালাশকারী ও নি’মাতের প্রত্যাশী।

সেরাতে মুস্তাক্বীমের পরিচয়

অনুগ্রহ প্রাপ্তি ও নি’মাত অর্জন বা সেরাতে মুস্তাক্বীম লাভ করার জন্য এ তৃতীয় দলের মানুষদেরকে আল্লাহ তা‘আলা সরাসরি ক্বোরআন অনুসরণের কথা না বলে প্রথম শ্রেণীর লোকদের অনুসরণ করতেই পরামর্শ দিয়েছেন। বিশেষ করে নি’মাতপ্রাপ্তদের মাঝে প্রথম সারির হচ্ছেন নবীগণ, আর নবীগণের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন আল্লাহর প্রিয়তম রাসূল হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

পবিত্র ক্বোরআন ঘোষণা দিচ্ছে- ‘‘নিখাদ, সুন্দরতম ও শ্রেষ্ঠতম আদর্শ রয়েছে রাসূলুল্লাহর মাঝেই।’’ [সূরা আহযাব, আয়াত-২১]

‘‘ভাল-মন্দ যাচাইয়ে তথা গ্রহণ ও বর্জনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি তা‘আলা ওয়াসাল্লামই সত্যের মানদণ্ড (মি’ইয়ার-ই হক্ব) ।’’ [সূরা হাশর, আয়াত-৭]

ভালকে গ্রহণ আর মন্দকে বর্জন করে মহান আল্লাহর প্রিয়ভাজন হতে চাইলে নিশ্চিতভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেই অনুসরণ ও অনুকরণ করো। [সূরা আল-ই ইমরান, আয়াত-৩১]

ইত্তিবা’-ই রাসূলের বাস্তব সুফল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, এ বাস্তব চিত্রটি আল্লাহ তা‘আলা সূরা আল-ই ইমরান শরীফের ১০৩ নং আয়াতে করীমায় এরশাদ করেছেন। প্রিয় রাসূল রাহমাতুল্লিল আলামীন তাশরীফ আনয়নের পূর্বে কেমন ছিলো আরবের অবস্থা? মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসা, সহযোগিতা ও সহমর্মিতাপূর্ণ সমাজ ছিলোনা তখন। বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা আর ছোটদের প্রতি স্নেহ-মমতা তাদের কল্পনার অতীত ছিলো। গোটা সমাজটা ছিলো আগ্নেয়গিরির মত। হিংসা-বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা আর দাম্ভিকতার দাবানল যে কোন সময় সামান্য কিছুতেই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠতো। এর সর্বনাশা লাভার থাবায় দিনের পর দিন, মাসের পর মাস আর বছরের পর বছর জ্বলে পুড়ে ছারখার হতে থাকতো গোটা সমাজ। হঠাৎ ইসলামের শান্ত-শীতল মেঘে ছেয়ে গেলো আকাশ। মহান আল্লাহর করুণার বারি অঝোর ধারায় বর্ষিত হল। ওই রহমতের মূর্তপ্রতীক হয়ে আবির্ভূত হলেন হুযূর আপাদমস্তক নূর সৃষ্টির সেরা সত্তা সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আরবের বিরাণ ভূমিতে লাগল বসন্তের হাওয়া। অসত্য-অনাদর্শ আর অসুন্দর দূরীভূত হয়ে তদস্থলে সত্য-সুন্দর আর আদর্শ স্থাপিত হলো। পশুত্বের স্থলে মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো, দুশমনি আর প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহার বদলে ক্ষমা এবং ভালবাসা স্থান করে নিলো। ফখর-অহংকারের স্থান দখল করলো নম্রতা আর সহনশীলতা, স্বার্থপরতার জায়গায় পরের তরে আত্মোৎসর্গের স্পৃহা সৃষ্টি হলো। এমন এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন

ও ইনক্বিলাব এলো, যা গোটা আরব সমাজের চেহারাটাই পাল্টে দিলো। বেদুঈন বলে পরিচিত এ মরুবাসীদের হাতে নবীর গোলামীর বরকতে পৃথিবীর ইতিহাসে এক নতুন গতির সঞ্চার হয়েছিলো।

সত্য এবং মিথ্যার মৌলিক চাহিদা কি?

যা সত্য এবং ভালো বলে বিবেচিত এর মৌলিক দাবি হচ্ছে একে মনেপ্রাণে মানতে হবে, একে শ্রদ্ধা ও সম্মান করতে হবে। সমাজের সর্বস্তরে প্রয়োজনে জান-মালের বিনিময়ে হলেও একে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং সর্বত্র এর প্রচারকে জোরদার করতে হবে।

পক্ষান্তরে, যা অসত্য এবং মন্দ বলে চিহ্নিত হবে সর্বোতভাবে তাকে বর্জন করতে হবে, তার প্রতি অশ্রদ্ধা ও ঘৃণা প্রকাশ করতে হবে। সর্বোচ্চ ক্বোরবানী দিয়ে হলেও এর স্থায়িত্ব রোধ করতে হবে, একে সমাজ দেহ থেকে নির্মূল করতে হবে এবং সর্বশক্তি দিয়ে সমাজে এর প্রচার-প্রসার বন্ধ করতে হবে।

এ প্রেক্ষিতে ইসলাম কী চায়?

জীবনের সর্ব মূহুর্তে ও সর্বকাজে সর্ববিষয়ে একমাত্র রাসূলেরই অনুসরণ ও গোলামী করা, যাকে পবিত্র ক্বোরআন 'হক্ব' ও 'ইসলাম' নামে অভিহিত করেছে। মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা ও প্রতিটি সুস্থ বিবেকের বিবেচনা এবং সাক্ষ্য মতে এটাই ভাল ও সত্য। মুনাফিক্ব, স্বার্থপর ও ধান্ধাবাজদের রকমারি কারসাজি থেকে মুক্ত রাখতে ইসলামের উষালগ্ন হুযূর-ই আকরাম ও সাহাবায়ে কেরামের সোনালী যুগ থেকে এ পর্যন্ত, সাহাবীদের অনুকরণে তাবে'ঈন, তাব'ই তাবে'ঈন, আইম্মা-ই মুজতাহিদীন, ওলামা ও বুযুর্গানে দ্বীন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম-এর অনুসৃত পথ আর মত তথা ইসলামের মূলস্রোতধারা ও সঠিক রূপরেখা হচ্ছে সর্বসম্মত মতে 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত'। ইসলাম ও মুসলিম মিল্লাতের সার্বিক কল্যাণ সাধন এবং ইহ ও পরকালীন শান্তি ও মুক্তি অর্জনের একমাত্র পথ ও উপায় হচ্ছে 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত।'

কী করতে হবে মুসলমানদের?

প্রচার-প্রসারে ও সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠায় সর্বশক্তি উজাড় করে আত্মনিয়োগ করা এক অলংঘনীয় কর্তব্য। অন্যথায় সর্বব্যাপী হিদায়তের এ পয়গাম হাতে গোনা কয়েকটি দেশ এবং জাতিগোষ্ঠিতে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবে। এতে এক দিকে ইসলামের সাথে বে-ইনসাফী করা হবে, অন্যদিকে পৃথিবীর যে সব এলাকা অন্যায়-অনাচার ও অনাদর্শের ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে মানবতা ধুঁকে ধুঁকে মরছে, একটু আলোর প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছে, তাদের প্রতি করা হবে সীমাহীন যুলম। তাছাড়া এ দ্বীনের

যারা অনুসারী তারাওতো মাঝে মাঝে আশপাশের দূষিত পরিবেশের শিকার এবং বিজাতীয়দের প্রভাবে প্রভাবিত হতে পারে।

অতএব, এমন একদল লোকের বড়ই প্রয়োজন, যারা এ হক্বের পয়গাম মানুষের কাছে পৌঁছাবে, আপনজনদের অলস নিদ্রা থেকে জাগ্রত করবে, তাদের কর্ম-প্রেরণা যোগাবে, তাদের উদ্যম ও জযবাতকে হেফাযত করবে। অবশ্য এ কাজ একদিকে যেমন বড়ই প্রয়োজনীয়, অন্যদিকে তেমন খুবই কঠিনও। এ কাজে যারা ব্রতী হবেন তাদের একদিকে থাকতে হবে জ্ঞানের পর্যাপ্ততা, অন্যদিকে আখলাক্ব ও চারিত্রিক মাধুর্যে হবেন ভেতর-বাইরে সুন্নাতে রাসূলের বাস্তব ছবি, যারা হবেন সর্বোচ্চ ত্যাগী, ঈমানী দূরদর্শিতা, অন্তরদৃষ্টি ও রূহানী শক্তিসম্পন্ন। ইতিহাস জ্বলন্ত সাক্ষী- যতদিন ইসলামী অঙ্গনগুলো এ শ্রেণীর লোকে ধন্য ছিলো, ততদিন তাতে বসন্তের হাওয়াই প্রবহমান ছিলো। শরীয়তের শিক্ষাকেন্দ্র মাদরাসাগুলো যতদিন গাযালী, রাযী, সা'দী, বায়দ্বাবী এবং আধ্যাত্মিক কেন্দ্র খানক্বাহগুলো রূমী, লাহোরী, আজমীরী, সুলতানী ও শায়খ সরহিন্দীর মত যুগ শ্রেষ্ঠদের উপহার দিতে পেরেছে, ততদিন কুফরের আঁধারপুরীতেও ইসলামী নূরের আলো বিকশিত হতো, সত্যের শৌর্য ও বীরত্বের সামনে মিথ্যে আর বাতিল ছিল পর্যুদস্ত। আর বর্তমানে? হায়! কোন পন্ডিত বলেছিলেন -**رویم ببیں حالم مپرس** অর্থাৎ "আমার চেহারা দেখো, দুরবস্থার সকল আলামতই তো তাতে দেখতে পাচ্ছো। আমার অবস্থা জিজ্ঞেস করো না।" কারণ এ সব বর্ণনা করার না আমার মাঝে ক্ষমতা আছে, না তুমি ধৈর্য ধারণ করতে পারবে। আল্লামা ইক্ববাল রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি বলেন, "দুনিয়ার এ মুকুটহীন সম্রাট মুসলিম জাতির অন্তর আজ হা-হুতাশ করে কাঁদছে, কিন্তু এ কান্নার অবসান কিভাবে হবে তা সে নিজেও অনুভব করতে পারছে না। হে সবুজ গম্বুজের নীচে আরাম ফরমাঁ রাসূল! একটি বার রহমতের দৃষ্টি দান করুন!"

এ তো মহান আল্লাহর অবারিত করুণা!

সৃষ্টিকুলের একমাত্র স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা। স্বাধীনভাবে ইচ্ছা মাফিক সর্বোচ্চ সুন্দর ও নিখুঁতভাবে সাজিয়েছেন তাঁর প্রতিটি সৃষ্টিকে। আল্লাহ পাক ফরমাচ্ছেন-

مَا تَرٰى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ؕ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۙ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ○ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ ○

তরজমা: "তুমি করুণাময় আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিতে কোন কম-বেশী দেখতে পাবে না। আবার দৃষ্টি ফেরাও; কোন ত্রুটি দেখতে পাচ্ছ কি? অতঃপর তুমি বারবার তাকিয়ে দেখ- তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ ও পরিশ্রান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে।"

[সূরা মুলক, আয়াত- ৩,৪]

গোটা সৃষ্টি তাঁরই কর্তৃত্বাধীন। তিনি যেমন ইচ্ছা তেমন করতে পারেন। তিনি

ঈমান-ইসলাম ও আনুগত্যকে ভালবাসেন, কুফর-শির্ক ও সীমালঙ্ঘনকে পছন্দ করেন না। ইরশাদ ফরমাচ্ছেন -

اَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ

তরজমা: "শুনে রেখো! সৃষ্টি ও কর্তৃত্ব একমাত্র তাঁরই। [সূরা আ'রাফ, আয়াত- ৬৪]

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

তরজমা: "নিশ্চয় আল্লাহ্ তাওবাকারী ও পবিত্র লোকদের পছন্দ করেন ।" [সূরা বাক্বারা, আয়াত-২২২]

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

তরজমা: "নিশ্চয় আল্লাহ নেক্কারদের ভালবাসেন।" [সূরা বাক্বারা, আয়াত-১৯৫]

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

তরজমা: "যারা মু'মিন, আল্লাহ্ তাদের বন্ধু"। [সূরা বাক্বারা, আয়াত-২৫৭]

পক্ষান্তরে- **اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ** তরজমা: "নিশ্চয় তিনি কাফিরদের ভালবাসেন না।" [সূরা রূম, আয়াত- ৪৫]

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ

"নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।" [সূরা বাক্বারা, আয়াত- ১৯০]

اِنَّهُ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

"নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থির করে আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেন।" [সূরা মা-ইদাহ্, আয়াত-৭২]

এমতাবস্থায় সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলা গোটা জগতটাকে ইচ্ছে করলে কাফির মুশরিক, অসৎ ও সীমালঙ্ঘনকারীদের থেকে মুক্ত রাখতে এবং সমগ্র জগৎবাসীকে মূ'মিন বানিয়ে নিতে পারতেন। ইরশাদ ফরমাচ্ছেন-

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِى الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا

অর্থাৎ "আপনার পরওয়ারদেগার যদি চাইতেন, তবে পৃথিবীবাসী সবাই মু'মিন হয়ে যেতো।" [সূরা ইয়ূনুস:আয়াত-৯৯]

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার অধিকার এবং ক্ষমতা উভয়টা থাকা সত্ত্বেও জোর করে কাউকে মানতে বাধ্য করেননি, তবে বান্দারা ভালবাসা থেকে খড়খুটার মত পাপের স্রোতে ভেসে যাক সেটাও আল্লাহ পাক চান নি। তাইতো সৎপথ অর্থাৎ আল্লাহর দিকে ডাকতে মহান স্রষ্টা নবী-রাসূলগণকে প্রেরণ করলেন। তাঁদের এ কাজের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য বোঝাতে ইরশাদ করলেন-

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে, তার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে? [৪১ঃ ৩৩]

যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ সৎপথে মানুষকে ডাকার এ কঠিন ও গুরু দায়িত্ব

পরিপূর্ণভাবে পালন করেছেন। সবশেষে সর্বশ্রেষ্ঠ হিদায়েত বা সত্যের বাণী সহ সর্বশ্রেষ্ঠ পথ প্রদর্শক হয়ে তাশরীফ এনেছেন সৃষ্টির মূল আখেরী রাসূল 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মহান আল্লাহর প্রিয়তম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বোচ্চ দায়িত্ব পালন শেষে পরওয়ারদিগারের দরবার থেকে **اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ**-(আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম)-এর মহামর্যাদাবান স্বীকৃতি নিয়ে নশ্বর জগত থেকে পর্দা করেছেন, কিন্তু তাঁর আনীত হিদায়ত বা সত্যের বাণী যেমনটি ছিলো তেমনটি আছে। অনন্তকাল ধরে স্থায়ী থাকবে। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই এর হিফাযতের যামীনদার। ইরশাদ ফরমাচ্ছেন-

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ

"আমি নিজেই এ বাণী নাযিল করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।" [সূরা হিজর, আয়াত-৯]

এটা কীভাবে সংরক্ষিত সে সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক বলেন-

لَايَأْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ-

অর্থাৎ "সম্মুখ দিক বা পেছনের দিক সত্যের এ বাণীর নিকট বাতিল আসতে পারে না।" [সূরা হা-মীম সাজদাহ্, আয়াত-৪২]

রাসূলের এ জীবন্ত আদর্শের কীভাবে প্রসার ঘটবে?

মহান আল্লাহর নির্দেশ ছিলো-

يٰۤاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ

অর্থাৎ হে রাসূল, আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা পৌঁছিয়ে দিন।" [সূরা মা-ইদাহ, আয়াত-৬৭]

আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমাচ্ছেন- **اِنَّ الْعُلَمَاۤءَ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاۤءِ** অর্থাৎ নিশ্চয় উম্মতের আলেমে দ্বীনরাই নবীর উত্তরাধিকারী বা প্রতিনিধি। অর্থাৎ এ সত্য বাণীর সঠিক জ্ঞান যার কাছে রয়েছে তিনিই প্রধানতঃ এর প্রচার-প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালন করবেন।

জ্ঞানার্জন সম্পর্কে ইসলামের দিক নিদের্শনা

ইসলাম জ্ঞানার্জনকে দু'ভাগে ভাগ করেছেঃ

১. মৌলিক বিষয়ে জ্ঞানার্জন।অর্থাৎ বিশুদ্ধ আক্বীদা-বিশ্বাস, পাক-নাপাকী সম্পর্কে হুকুম-আহকাম জানা এবং নামায-রোযা ও অন্যান্য ফরয ওয়াজিব কিংবা হারাম-মাকরূহ ইত্যাদি বিষয়ে ইল্ম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর ফরযে আইন। পক্ষান্তরে, শাখা-প্রশাখা ও খুঁটিনাটি বিষয়ে জ্ঞানাহরণ করা 'ফরযে কেফায়া।'

জ্ঞানীদের কর্তব্য সম্পর্কে পবিত্র ক্বোরআন

আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত এরশাদ ফরমাচ্ছেন-

لِيَتَفَقَّهُوْا فِىْ الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ

অর্থাৎ তারা দ্বীনী জ্ঞান অর্জন করবে, যাতে স্বদেশ ও স্বগোত্রের কাছে ফিরে এসে তাদের সঠিক দিক-নির্দেশনা দেয়, যেন তারা ভ্রান্তির হাত থেকে বাঁচতে পারে।
[সূরা তাওবা, আয়াত- ১২২]

প্রতীয়মান হলো, জ্ঞানের স্বল্পতা ও আধিক্য মূল বিবেচ্য নয়; বরং অর্জিত জ্ঞান মতে নিজে আমল করে অন্যকে সাধ্যমত ভাল কাজের আদেশ আর মন্দ কাজে বাধা দেয়ার দায়িত্ব পালন করাই মুসলমানের দ্বীনী ও নৈতিক কর্তব্য।

মোটকথা, সাধ্যমত জ্ঞান অর্জন করে যে যে স্তরে আছেন, আলেম হোন কিংবা মসজিদের ইমাম, পীর হোন কিংবা মুরীদ, ব্যবসায়ী হোন অথবা চাকুরিজীবী, মালিক হোন কিংবা শ্রমিক, শাসক হোন বা প্রজা- আপন আপন যোগ্যতানুসারে চতুর্পার্শ্বের লোকদের প্রয়োজন মাফিক ভালো কাজের আদেশ আর মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার দায়িত্ব পালনে সদা সচেষ্ট থাকবেন।

সম্মিলিত দায়িত্ব পালনের প্রতি ইসলামের তাগিদ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একটি অতি মধুর সত্য কথা হচ্ছে- যে কোন বিষয়ে একাকী দায়িত্বপালনের চেয়ে কয়েকজন মিলে দায়িত্ব পালনের সুফল অতি দ্রুত পাওয়া যায়। পবিত্র ক্বোরআনও এ বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করেছে। এরশাদ হচ্ছে-

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○

তরজমা: তোমাদের মাঝে একটা দল এমন থাকা চাই, যারা কল্যাণের প্রতি আহবান জানাবে, ভাল কাজের নির্দেশ দেবে এবং মন্দ থেকে নিষেধ করবে, আর এ সব লোকই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে। [সূরা আল-ই ইমরান, আয়াত-১০৪]

এ থেকে বুঝা গেলো, 'আমর বিল মা'রূফ' ও 'নাহী 'আনিল মুনকার'-এর দায়িত্ব পালনকারীরা বড়ই সফলকাম। এটাও বলা যায় যে, যে গোষ্ঠী বা যে অঞ্চলে ভালোর আদেশকারী আর মন্দের নিষেধকারী থাকবে সে গোষ্ঠী বা সে অঞ্চলের মানুষ খোশ নসীব। তারা ইহ ও পরকালীন গযব ও আযাব থেকে রক্ষা পাবে। কারণ তাদের মাঝে ভালো কাজের চর্চা থাকবে এবং মন্দকাজ কখনও প্রতিষ্ঠা পাবে না।

যখন যেখানে কাফিরদের প্রতি ঈমানের, ফাসিক্বদের প্রতি তাক্বওয়ার, অসৎকে

সৎকাজের, মূর্খদেরকে জ্ঞানের, অলসকে জাগ্রত হবার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় আর সহীহ আক্বীদা ও আমলের প্রতি দাওয়াত এবং মন্দ কথা ও কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখার অপরিহার্য দায়িত্বটি মনে-প্রাণে, কথায়-আচরণে, অসি কিংবা মসি দ্বারা, অবস্থা ভেদে নরমে আর গরমে চালু থাকবে সেখানে মহান আল্লাহর রহমত নাযিল হয়। অন্যথায় মন্দ লোকদের সাথে ভালো বলে পরিচিত লোকেরাও (দায়িত্ব পালন না করার কারণে) পার্থিব জীবনেও আল্লাহ্‌র গযবের শিকার হয়ে যান।

ভালো কাজের নির্দেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ-এর দায়িত্ব পালনে অবহেলা করা অমার্জনীয় অপরাধ

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু বলেন- আল্লাহ তা'আলা বিশেষ কোন ব্যক্তির অপরাধের দরুণ পাইকারীভাবে সর্বসাধারণকে আযাব দেন না, কিন্তু সমাজে অপরাধপ্রবণতা প্রকাশ পাওয়ার পরও যখন সামর্থ্যবানরা বাধাদানে এগিয়ে আসেন না তখন ভালো ও মন্দ সকলেই পাইকারীভাবে শাস্তির উপযোগী হয়ে যায়।

হযরত ইয়ুশা' ইবনে নূন আলাইহিস সালাম-এর কাছে আল্লাহ তা'আলা ওহী নাযিল করলেন, ''আমি তোমার সম্প্রদায়ের চল্লিশ হাজার নেক্‌কার আর ষাট হাজার বদ্‌কার মোট এক লক্ষ লোককে ধ্বংস করে দেবো।'' আরয করলেন, ''হে আল্লাহ! বদ্‌কাররা তো শাস্তিযোগ্য, নেক্‌কারদের অপরাধ কী?'' আল্লাহ পাক বললেন, ''এরা আমার পক্ষে দায়িত্ব পালন করে নি; বরং অসৎদের প্রতিহত না করে পার্থিব স্বার্থে খাওয়া-দাওয়ায়, চলায় ও বলায় তাদের সঙ্গ দিয়েছে।''
[তাম্বীহুল গাফেলীন-২৯, ৩০, কৃত ফক্বীহ আবুল্লাইস সমরকুন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]

হযরত শেরে খোদা মুশকিলকোশা আলী মুরতাদ্বা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, ইরশাদ হচ্ছে, আমার উম্মত যখন প্রকৃত যালিমকে 'তুমি যালিম ও অন্যায়কারী' বলতেও ভয় পেতে শুরু করবে তখন আল্লাহ তাদের উপর থেকে রহমতের যিম্মাদারী প্রত্যাহার করে নেবেন। ফলে অবস্থা কেমন হবে তা পরবর্তী হাদীসে পাক থেকে অনুধাবন করুন।

প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবুদ্দারদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, ইরশাদ হচ্ছে- তোমরা সাধ্যমত 'আমর বিল মা'রূফ ও নাহী আনিল মুনকার' অর্থাৎ ভালো কাজের আদেশ আর মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার দায়িত্ব পালন করতে থাকো। অন্যথায় আল্লাহ তা'আলা তোমার উপর এমন যালিম শাসক নিযুক্ত করে দেবেন, যে তোমাদের বড়দের সম্মান আর ছোটদের স্নেহ করবে না। তোমাদের নেক্‌কাররা

প্রতিকারের জন্য দো'আ করলেও আল্লাহ কবূল করবেন না, সাহায্য চাইবে কিন্তু তিনি সাহায্য করবেন না। এমনকি তারা ক্ষমা চাইলেও আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাও করবেন না। [তাম্বীহুল গাফেলীন-পৃ.৩১]

সমাজে আহবানকারীর দায়িত্ব কি?

হাদীসে পাকে এসেছে, হযরত নো'মান ইবনে বশীর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি জাহাজে আরোহণ করে সাগর পাড়ি দিচ্ছে। শ্রেণীভেদে কেউ উপরে কেউ মাঝখানে, কেউ নিচের ডেক শ্রেণীতে আসন নিয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী উপরের শ্রেণীর লোকেরা সুযোগ-সুবিধা বেশি ভোগ করছে। বঞ্চিত হচ্ছে নিচের শ্রেণীর যাত্রী। এক পর্যায়ে সে একটি কুঠার নিয়ে জাহাজের তলদেশে আঘাত করা শুরু করলো। সবাই এসে বললো, তুমি কী করছো? সে বললো, ''আমি খুব কাছ থেকে পানি পেয়ে যাবো তাই জাহাজের তলদেশ ছিদ্র করছি।'' এখন কেউ বললো, ''চলো চলো, সে যা ইচ্ছা তাই করুক। পানি ঢুকবে তো সে মরবে আমাদের কি?'' অন্যরা বললো, ''না,না, জাহাজের তলদেশে ছিদ্র করতে দিওনা। কারণ তখন পানি ঢুকে গোটা জাহাজকে ডুবাবে। সেও মরবে আমাদেরও মারবে।'' প্রিয়তম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাচ্ছেন-এমতাবস্থায় উপরের শ্রেণীর লোকেরা তাকে বাধা দিলে তাকে বুঝিয়ে দিলে তাকেও বাঁচাল আর নিজেরাও বাঁচল। অন্যথায় ছিদ্রকারীর সাথে সবাই ধ্বংস ও সর্বনাশের শিকার হবে।

[মিশকাত, বাবুল আমরি বিল মা'রূফ ওয়ান্নাহী 'আনিল মুনকার, তাম্বীহুল গাফেলীন-পৃ.৩০]

কল্যাণের দিকে আহবানই এ মুসলিম উম্মাহর বৈশিষ্ট্য

পবিত্র ক্বোরআন ঘোষণা দিচ্ছে-

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ

তরজমা: তোমরা হলে শ্রেষ্ঠতম ওইসব উম্মতের মধ্যে, যাদের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে মানব জাতির জন্য; (যেহেতু) প্রকৃত সৎকাজের নির্দেশ তোমরাই দিচ্ছো আর মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখছো এবং আল্লাহর উপর (যথার্থ) ঈমান রাখছো।''

[সূরা আলে-ইমরান, আয়াত-১১০]

মর্মার্থ হচ্ছে-এ পর্যন্ত মানব সমাজে মানুষের কল্যাণ সাধনে আত্মনিবেদিত যত সম্প্রদায় পৃথিবীর বুকে আত্মপ্রকাশ করেছে, তাদের মধ্যে আখেরী নবীর উম্মতগণই সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ। কারণ, তাদের জীবন ধারণের উদ্দেশ্যটাই বড় মহান ও পবিত্র। তারা চায় সত্যের জয় হোক। দিকে দিকে হিদায়তের আলো ছড়িয়ে পড়ুক, উত্তম ও উন্নত চরিত্রের প্রসার ঘটুক। মিথ্যা, বাতিল ও ভ্রান্তির

অন্ধকার দূরীভূত হোক। সবলকে যালিম আর দুর্বলকে মযলুম ও ক্ষুধার্থ বানিয়ে দেয় এমন পশু সুলভ চরিত্র সমাজদেহ থেকে নির্বাসিত হোক। সর্বোপরি, নির্ভেজাল ও নিষ্কলুষ তাওহীদে তারা বিশ্বাস করে। অর্থাৎ তাওহীদে ইসলামের যে শিক্ষা সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠতম রাসূল তাদের দিয়েছেন তাকেই তারা সর্বদা লালন করে। অতএব, শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট পাওয়ার যোগ্যতা তারাই অর্জন করেছে।

পূর্ববর্তী উম্মতদের ব্যাপারে ক্বোরআন

ইরশাদ হচ্ছে-

كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوْهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ

তরজমা: (তোমাদের মাঝে) যারা অন্যায় কাজ করতো, তারা একে অপরকে বারণ করতো না। নিশ্চয় তারা অত্যন্ত নিকৃষ্ট কাজ করতো। [সূরা মা-ইদাহ, আয়াত-৭৯]

অন্যত্র এরশাদ ফরমাচ্ছেন-

لَوْلَا يَنْهٰهُمُ الرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ ط لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ

তরজমা: তাদের (ইহুদী-খ্রীষ্টান) পাদ্রী ও দরবেশগণ তাদেরকে অন্যায় কথা বলতে এবং অবৈধ (হারাম) ভক্ষণ করতে কেন নিষেধ করে না? (অর্থাৎ আমর বিল মা'রূফ ও নাহী আনিল মুনকারের দায়িত্ব কেন পালন করে না?) তারা নিঃসন্দেহে খুবই মন্দ কাজ করছে। [সূরা মা-ইদাহ, আয়াত-৬৩]

এ কাজে সফলতা অর্জন করতে হলে

ফক্বীহ আবুল্লাইস সমরক্বন্দী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি 'তাম্বীহুল গাফেলীন' কিতাবে লিখছেন- ভালো কাজের আদেশ আর মন্দ কাজ থেকে বারণ করার দায়িত্ব পালনকারীর অন্তরে অবশ্যই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও দ্বীনের সম্মান-এর খালেস নিয়্যত থাকতে হবে। তা কখনও নফসের প্রবৃত্তি বা ব্যক্তি স্বার্থে হতে পারবে না। এটাই আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার উপায়। অন্যথায় আল্লাহর সাহায্য ও করুণা থেকে বঞ্চিত হবে, ফলে কাজে সফলতা আসবে না। [পৃষ্ঠা- ৩১]

তিনি বলেন, হযরত ইকরামা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণিত আছে- জনৈক আবিদ ব্যক্তি একটি গাছের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। দেখতে পেলেন মানুষ আল্লাহর ইবাদত ছেড়ে দিয়ে ওই বৃক্ষটির (ইবাদত) উপাসনা করছে। তিনি খুব রাগান্বিত হয়ে বললেন, আল্লাহর ইবাদত না করে এ গাছের উপাসনা করা হচ্ছে? তিনি বাড়ীতে গিয়ে একটি কুঠার নিলেন এবং গাধার পিঠে আরোহণ করে ওই গাছটি কেটে ফেলার জন্যে রওনা দিলেন। পথে তাঁর সাথে মানুষের সূরতে আসা ইবলীসের

সাক্ষাত হলো। সে বললো, ''হুযূর আপনি কোথায় চললেন?'' তিনি বললেন, দেখলাম মানুষেরা আল্লাহর ইবাদত ছেড়ে ওই গাছটির পূজা-অর্চনা করছে। আমি আল্লাহর নামে শপথ করেছি, ওই গাছটি অবশ্যই কেটে ফেলবো।'' ইবলীস বললো, ''তাতে হুযূর আপনার কি? যারা গাছের উপাসনা করছে তারা আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এতে আপনারতো ক্ষতি নেই। ইবলীসের সাথে হুযূরের বাদানুবাদ হলো, মুকাবেলা হলো একে একে তিনবার। প্রত্যেক বারই ইবলীস পরাজিত হলো। শেষ পর্যন্ত ইবলীস লা'নাতুল্লাহি আলাইহি বললো, ''হুযূর! আপনি গাছটি না কেটে চলে গেলে প্রত্যেক দিন আমি আপনাকে চারটি করে স্বর্ণমুদ্রা দেবো। তা দিয়ে আপনি নিশ্চিন্তে আল্লাহর ইবাদতও করতে পারবেন এবং কিছুটা দান-খয়রাতও করে আল্লাহর বান্দাদের খিদমত করতে পারবেন। প্রত্যুষে বিছানা ওলটাতেই নিশ্চিতভাবে পেয়ে যাবেন।'' আবিদ সাহেব ইবলীসের কথায় চিন্তা-ভাবনা করে তাতে রাজী হলেন এবং ফিরে গেলেন। পরপর দু'তিন দিন তিনি যথারীতি স্বর্ণ মুদ্রা হাতে পেলেন। কিন্তু পরবর্তী দিন থেকে স্বর্ণমুদ্রা আসা বন্ধ হয়ে গেলো। তখনই আবিদ সাহেব কুঠার কাঁধে নিয়ে বৃক্ষ নিধনে বের হয়ে পড়লেন। পথে ইবলীসের দেখা হলো। রাগান্বিত হয়ে তিনি বললেন, ''তুমি ওয়াদা রাখোনি, এক্ষুনি গাছ কেটে ফেলবো।'' মানুষরূপী ইবলীস বাধা দিলো। উভয়ের মধ্যে মোকাবেলা হলো। এবার ইবলীস বিজয়ী হলো। অনেক চেষ্টা করেও তাকে কাবু করা গেলো না। বারবার আবিদ সাহেব পরাজিত হলেন। তিনি প্রথম দিনের কথা মনে করে আশ্চর্যবোধ করতে লাগলেন। ইবলীস বললো, 'হুযূর! আপনি প্রথম দিন আল্লাহ-রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জন এবং ইসলামের স্বার্থরক্ষার গরজে এসেছিলেন। আপনার সাথে আল্লাহর সাহায্য ছিলো। তাই আমি পরাস্ত হয়েছিলাম। কিন্তু আপনার সে খোদাপ্রেম স্বর্ণ মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছেন। আল্লাহর সাহায্য থেকে আজ আপনি বঞ্চিত। তাই শয়তানী শক্তির কাছে আপনাকে পরাজয় বরণ করতে হয়েছে।' [তাম্বীহুল গাফেলীন, পৃষ্ঠা-৩০]

যা নিতান্ত অপরিহার্য

সুপ্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!

আমরা শুরুতেই বলেছি যে, 'আমর বিল মা'রূফ ও নাহী আনিল মুনকার'-এর দায়িত্ব পালনকারীকে অবশ্যই পাঁচটা গুণ অর্জন করতে হয়, যেগুলো তার সাধনায় সফলতা নিশ্চিত করে- ১.জ্ঞান, ২. ইখলাস বা নিষ্ঠা, ৩. নম্রতা, ৪. ধৈর্যশীলতা ও ৫. আমেল (নিজেও আমলকারী) হওয়া। এ সবক'টি বিষয়ের এবার কিছু ব্যাখ্যামূলক আলোচনার দেখুন-

- **ইল্‌ম বা জ্ঞান-** অর্থাৎ সৎকাজের আদেশ আর অসৎকাজে বাধা দান করতে হলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তার কাছে অবশ্যই জ্ঞান থাকতে হবে। কারণ যে বিষয়ে সে জানে না, সে ওই বিষয়ে কখনও সঠিক শিক্ষা দিতে পারে না। কথায় আছে-

জ্ঞানের প্রদীপ মনে নাহি জ্বলে যার
কখনো ঘোচেনা তার ভ্রম-অন্ধকার।

অর্থাৎ অন্ধকারে হাবুডুবু খাওয়া একজন মানুষ অন্যকে আলোর সন্ধান দেবে কিভাবে? তাই জ্ঞানার্জনের বিকল্প নেই। ইসলামী দুনিয়ায় শুরু থেকে এ পর্যন্ত মুর্তাদ, মুনাফিক্ব, খারেজী, রাফেযী, শিয়া, মু'তাযিলী, ওহাবী, লা-মাযহাবী, আহলে হাদীস, দেওবন্দী, তাবলীগী ও মওদূদীসহ যতগুলো আগাছা-পরগাছা কথায় কথায় হারাম, শির্ক, বিদ'আত ও নাজায়েয ইত্যাদির ধুয়া তুলে আজ মুসলিম ঐক্যের মেরুদণ্ডকে সোজা হতে দিচ্ছে না। যারা নবী-রসূল, আউলিয়া-ই কেরাম এমনকি আল্লাহ তা'আলার শানেও অশোভন বেয়াদবী করাকে নিজেদের একটা নিত্য অভ্যাসে পরিণত করে রেখেছে, তা তাদের একমাত্র মূর্খতা ও অজ্ঞতারই কুফল। প্রকৃত ইলম অর্জন এবং জ্ঞানচর্চাই পারে মুসলিম মিল্লাতকে এ অশুভ চক্র ও করুণ পরিণতি থেকে রক্ষা করতে ও ইসলামের সঠিক রূপরেখা 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত'র পতাকাতলে শামিল করতে।

- **আল্লাহ-রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জন ও ইসলামের স্বার্থে দায়িত্বপালন**-এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা নিঃসন্দেহে সকলেরই জানা। আজকের মুসলিম দুনিয়ায় ব্যক্তি ও দলের স্বার্থে দ্বীন ও ধর্মকে বিকিয়ে দেয়ার প্রতিযোগিতার প্রবণতা দিবালোকের মতই স্পষ্ট। ইখ্‌লাস ও নিষ্কলুষ রসূল-প্রেমের টানেই সেদিন বদর, উহুদ, খন্দক্ব ও হুনাইনে অবারিত ধারায় খোদায়ী সাহায্য আসমান থেকে নাযিল হয়েছিলো। বর্তমানে প্রাকৃতিক কিংবা পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সর্বক্ষেত্রে চতুর্মুখী সমস্যায় জর্জরিত মুসলমানরা। তাদের আপন বলতে কেউ নেই। নদীর স্রোতে ভাসা শেকড়হীন শেওলার মত কখনও উজানে আবার কখনও ভাটিতে, শীতের হিমেল বাতাসে কখনো দক্ষিণ কিনারায়, আবার কখনো দক্ষিণা বায়ুর ধাক্কা খেয়ে উত্তর পারে আশ্রয় নেয়। কোথায় তার ঠিকানা? কেন এ অস্বস্তিকর পরিস্থিতির শিকার? দেয়ালে পিঠ ঠেকেছে, খোদায়ী সাহায্য নেই কেন? উত্তর সোজা। ব্যক্তিগত, দলীয় ও দুনিয়াবী স্বার্থের বেড়াজাল থেকে বের হয়ে আসতে পারেনি বলে। সময় ফুরিয়ে যায়নি। 'আল্ হুব্বু ফিল্লাহ্, ওয়াল বুগ্‌দু ফিল্লাহ্' অর্থাৎ 'কাউকে ভালবাসা কিংবা কারো প্রতি অসন্তুষ্টি আল্লাহরই ওয়াস্তে' হলে তথা আল্লাহ-রাসূলের মুহাব্বতে ও দ্বীনের স্বার্থে কাজে ব্রতী হলে আজও পালে হাওয়া লাগবে।

- **নম্রতা, স্নেহ-মমতা ও ভালবাসা।** সৎকাজের আদেশ আর অসৎ কাজে নিষেধ করতে গেলেই এ মৌলিক গুণটি তার অবশ্যই থাকতে হবে। এটা আল্লাহ পাকেরই বিশেষ গুণ। শয়তানী প্ররোচনার শিকার হয়ে পাপকে পূণ্য আর অন্যায়কে ন্যায় বলে মনে করে অহরহ যারা পাপের ফাঁদে আটকে গেছে, তারা এক প্রকার মানসিক রোগী। এদেরকে এ পঙ্কিলতা থেকে ছাড়িয়ে আনতে চাইলে মমতাময়ী মাতা এবং ভালোবাসাপূর্ণ বিনম্র ভাষার অভিজ্ঞ চিকিৎসকের ভূমিকায় নেমে কাজ করতে হবে। মহা মর্যাদাবান পয়গাম্বর সায়্যেদুনা হযরত মূসা ও হারূন আলাইহিমাস্ সালামকে ফেরআউনের কাছে প্রেরণের সময় আল্লাহ পাক ইরশাদ ফরমান- فَقُوْلَا لَهٗ لَيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى অর্থাৎ "তার সাথে কিছু নরম সুরে কথা বলো, সে যেন উপদের্শ গ্রহণ করে অথবা তার অন্তরে ভয়ের উদ্রেক হয়। [সূরা ত্বোয়াহা, আয়াত-৪৪] বুঝা যাচ্ছে- প্রতিপক্ষ যতই অবাধ্য ও ভ্রান্ত বিশ্বাস ও চিন্তাধারার বাহক হোক না কেন, সৎকাজের আদেশদাতাকে তার সাথেও হিতাকাঙ্ক্ষীর সুরে নম্রভাবে কথাবার্তা বলতে হয়। যার ফলে সে কিছু চিন্তাভাবনা করতে পারে এবং তার অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হতে পারে।

এটা ছিলো আমাদের প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র ও একটি স্বভাবজাত গুণ। মহান রাব্বুল ইজ্জত এ মহান গুণটিকে কেন্দ্র করে প্রিয় রাসূলের প্রশংসা ক্বুদরতের যবানে করছেন-

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ

তরজমা : অতঃপর কেমনই আল্লাহ্র কিছু দয়া হয়েছে যে, হে মাহবূব! আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন। আর যদি আপনি রূঢ় ও কঠোর চিত্ত হতেন, তবে তারা নিশ্চয় আপনার আশপাশ থেকে পেরেশান হয়ে যেতো।

[সূরা আল-ই ইমরান, আয়াত-১৫৯]

হে হাবীব! এটা আল্লাহ পাকের খাস রহমত তথা তাঁরই ঘোষণা মতে আপনার 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' হওয়ার মূর্তিমান প্রমাণ যে, এত বড় অপরাধের পরও আপনি তাদের সাথে বিনম্র ও কোমল ব্যবহার করছেন; পক্ষান্তরে আপনি কঠোর ব্যবহার করলে শাস্তির ভয়ে তারা আপনার ধারেকাছে আসার সাহসও করতো না। আজ প্রিয়তম রাসূলের বিরাট-বিশাল উদারতাপূর্ণ ক্ষমা সুন্দর আচরণে তারা বুঝতে পেরেছে ইহ ও পরকালে খোদায়ী আশ্রয়ের ঠিকানা মানেই রাসূলে পাকের দরবার।

অনন্ত-অসীম ক্ষমতার আধার বিশ্ববিধাতার সর্বোচ্চ ক্ষমতা আর ক্ষমার বর্ণনাসমৃদ্ধ একটি আয়াতে করীমা পেশ করছি। এরশাদ হচ্ছে-

وَمَآ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْ عَنْ كَثِيْرٍ ۗ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ ۚ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ○

তরজমা : এবং তোমাদেরকে যে মুসীবৎ স্পর্শ করেছে তা তাঁরই কারণে, যা তোমাদের হাতগুলো উপার্জন করেছে এবং বহু কিছু তো তিনি ক্ষমা করে দেন। এবং তোমরা পৃথিবীতে (তাঁর) আয়ত্ব থেকে বের হতে পারো না, আর আল্লাহর মোকাবেলায় তোমাদের না আছে কোন বন্ধু, না কোন সাহায্যকারী

[সূরা শুরা, আয়াত-৩০, ৩১]

- **'সবর'** অর্থাৎ ধৈর্য্যশীল হওয়া। কল্যাণের পথে মানুষকে আহবান করা বড়ই জরুরী- বড়ই উত্তম কাজ তো বটেই, সাথে সাথে বড়ই দুরূহ, সীমাহীন কঠিনও বটে। পৃথিবীতে অসংখ্য নবী-রাসূল এসেছেন আল্লাহরই নির্দেশে আল্লাহর পথে মানুষকে ডাকতে। তারপর এমন কেউ নেই যিনি যুল্ম নিপীড়নের শিকার হননি। শুধু সম্পদ আর মান নয়, দেশান্তরও হতে হয়েছে, আবার প্রাণও দিতে হয়েছে অনেককে। পবিত্র ক্বোরআন বলছে-

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّيَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَاْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ○

তরজমা: ওইসব লোক, যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকারকারী হয় এবং পয়গাম্বরগণকে অন্যায়ভাবে শহীদ করে, আর ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশদাতাদেরকে হত্যা করে, তাদের সুসংবাদ দিন বেদনাদায়ক শাস্তির।

[সূরা আল-ই ইমরান, আয়াত-২১]

সর্বশ্রেষ্ঠ ও আখেরী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে আল্লাহ পাক বলেন-

وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ ○

তরজমা: এবং নিশ্চয় আমার জানা আছে যে, তাদের কথায় আপনার অন্তর সংকোচিত হয়। [সূরা হিজর, আয়াত-৯৭]

আরো ইরশাদ হচ্ছে-

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِىْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ

"**অর্থাৎ** এবং হে হাবীব! আপনি ধৈর্যধারণ করুন এবং আপনার ধৈর্য আল্লাহরই সাহায্যক্রমে, আর তাদের জন্য দুঃখ করবেন না এবং তাদের প্রতারণার কারণে আপনি মনঃক্ষুন্ন হবেন না।" [সূরা নাহল, আয়াত-১২৭]

সূরা লোক্বমান শরীফের ১৭নং আয়াতে করীমায় আল্লাহ্ তা'আলা হযরত লোকমানের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন-

يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى
مَآ اَصَابَكَ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ

তরজমা: (হযরত লোকমান বলেন,) হে আমার বৎস! নামায কায়েম রাখো এবং সৎকাজের আদেশ দাও আর অসৎ কাজে নিষেধ করে যাও এবং (এ পথে) যে আপদ-বিপদ তোমার উপর আপতিত হয় তার উপর ধৈর্য ধারণ করো। নিশ্চয় এগুলো সাহসিকতার কাজ।" [সূরা লোক্বমান, আয়াত-১৭]

ধৈর্যধারণ স্বয়ং একটি পূণ্যময় কাজ। জীবনে সফলতা পেতে চাইলে কেবল ব্যক্তি জীবনে নয় সমাজের সর্বস্তরে ধৈর্যের প্রশিক্ষণ ও অনুশীলন থাকতে হবে। এদিকে ইঙ্গিত করেই ক্বোরআন মজীদে এরশাদ হচ্ছে-

وَالْعَصْرِ ۙ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۙ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۙ

তরজমা: সর্বোত্তম সময়টির শপথ, মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মাঝেই নিপতিত কিন্তু যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে এবং পরস্পরকে সত্যের জন্য জোর দিয়েছে আর ধৈর্যধারণের উপদেশ দিয়েছে। [সূরা আসর]

সার্বিক সফলতা আল্লাহ তা'আলার দয়া ও সাহায্যের উপরই নির্ভরশীল। আর এ সাহায্য ও সফলতার প্রতিশ্রুতি মহান আল্লাহ 'সাবির' অর্থাৎ ধৈর্যশীলদেরকেই দান করেছেন। তিনি এরশাদ ফরমাচ্ছেন-

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ

"নিশ্চয় আল্লাহ সবরকারীদের সাথে রয়েছেন।" [সূরা বাক্বারা, আযাত-১৫৩]

وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ

"ওইসব সবরকারীকে সুসংবাদ শুনাও।" [সূরা বাক্বারা, আয়াত-১৫৫]

- **আমেল হওয়া।** অর্থাৎ নিজেও ভালো কাজটির সম্পাদনকারী এবং মন্দ কাজটির বর্জনকারী হওয়া। অন্যথায় লজ্জা আর গ্লানির শিকার হতে হয়। ধর্মীয় অনুশাসন যারা নিজেরাই মেনে চলে তারা আমলহীন লোকদের আদেশ-উপদেশ মেনে চলার পরামর্শ দিলে সুফল বেশী হয়।

ইহুদী আলিমদের প্রতি খোদায়ী ভৎর্সনা

পবিত্র ক্বোরআনে সূরা আ'রাফ শরীফে ১৫৭ নম্বর আয়াতে করীমায় রয়েছে, আল্লাহ্র প্রিয়তম রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পৃথিবীতে তাশরীফ আনয়ন, তাঁর পবিত্র স্বত্ত্বা ও গুণাবলীর বিস্তারিত বর্ণনা ইহুদী-খৃষ্টানদের

তাওরাত ও ইঞ্জীল কিতাবে রয়েছে। এ কারণে তাদের পাদ্রীরা অতি আপনজনদের কাছে অনেক সময় আখেরী নবীর সত্যতা স্বীকার করতো। ফলে এরই সুবাদে অনেক সাধারণ ইহুদী ঈমান গ্রহণের সুযোগ পেয়েছিলো; অথচ স্বয়ং ওই পুরোহিতরা পার্থিব স্বার্থের মোহে ঈমান গ্রহণ করেনি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ওই সব ইহুদী পুরোহিতদের উদ্দেশ্য করে এরশাদ ফরমাচ্ছেন-

اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ

তরজমা: "তোমরা কি মানুষকে সৎকর্মের নির্দেশ দিচ্ছো আর নিজেদের আত্মাগুলোকে ভুলে বসেছো? অথচ তোমরা তো কিতাব (তাওরাত) তিলাওয়াত করছো! [সূরা বাক্বারা, আয়াত-৪৪] অর্থাৎ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ এ রাসূলের সত্যধর্মে ঈমান না আনার পরিণতি সম্পর্কে ভালো করেই জানো।

হাদীসে পাকে এ শ্রেণীর লোকদের করুণ পরিণতি ও ভয়ঙ্কর শাস্তির বর্ণনা এসেছে। হযরত সাইয়্যেদুনা আনাস ইবনে মালেক ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম থেকে বর্ণিত, রাসূলে মু'আযযম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাচ্ছেন-মি'রাজের রাতে আমি এমন কিছু সংখ্যক লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম, যাদের জিহ্বা ও ঠোঁট আগুনের কাঁচি দিয়ে কাটা হচ্ছিলো। জিজ্ঞেস করলাম, জিব্রাঈল, এরা কারা? জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম বললেন, এরা আপনার উম্মতের পার্থিব স্বার্থান্বেষী কিছু সংখ্যক উপদেশদাতা লোক, যারা অপরকে তো সৎকাজের নির্দেশ দিতো; কিন্তু নিজেদের খবর রাখাতো না। [তাম্বীহুল গাফেলীন-৩১]

প্রিয় নবী এরশাদ ফরমাচ্ছেন, কতিপয় জান্নাতবাসী কতেক দোযখবাসীকে অগ্নিদগ্ধ হতে দেখে জিজ্ঞেস করবেন, "তোমরা কী কারণে দোযখে প্রবেশ করলে? অথচ আল্লাহরই শপথ, আমরাতো ওইসব সৎকাজের বদৌলতেই জান্নাত লাভ করেছি, যা তোমাদেরই কাছে শিখেছিলাম?" ওই সব দোযখবাসী বলবে, "হাঁ, আমরা মুখে অবশ্যই বলতাম কিন্তু নিজেরা তা কাজে পরিণত করতাম না।"

[মিশকাত শরীফ, বাবুল আমর বিল মা'রূফ, পৃষ্ঠা-৪৩৬]

কল্যাণের পথে কে কিভাবে ডাকবে

প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবূ সা'ঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী এরশাদ ফরমাচ্ছেন- তোমাদের কেউ কোন অন্যায় সংঘটিত হতে দেখলে তার উচিত হবে শক্তি প্রয়োগ করে তা প্রতিহত করা, যদি বল প্রয়োগের সামর্থ্য না থাকে তবে উপদেশমূলক কথায় সংশোধনের চেষ্টা করবে। তাও যদি সম্ভব না হয়, তবে অন্তরে ঘৃণা পোষণ করবে। অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা পোষণ ঈমানদারদের দুর্বলতম

ঈমানের পরিচয়। রাজা-বাদশাহ্ তথা সমাজের ক্ষমতাবান ব্যক্তি শক্তি প্রয়োগ করে মন্দ প্রতিহত করার দায়িত্ব পালন করবেন। আর প্রত্যেক জ্ঞান সম্পন্ন লোক আপন জ্ঞানানুসারে জনসাধারণকে সৎ কাজের নির্দেশ দেবে এবং অসৎ কাজে বাধা দেবে। আর সর্বসাধারণ মুসলমানরা নিজেরাও মন্দ থেকে বিরত থাকবে এবং মনে প্রাণে মন্দকে ঘৃণা করবে। মোট কথা হচ্ছে প্রত্যেক মুসলমনাকেই পরিবেশ ও অবস্থানুযায়ী নিজের যোগ্যতানুসারে কল্যাণের দিকে অন্য মানুষকে ডাকার এবং অকল্যাণ থেকে বাঁচানোর কর্তব্য পালন করে যেতে হবে। এটা তার ঈমানের দাবি।

পবিত্র ক্বোরআনে মু'মিন ও মুনাফিক্বের পরিচয়

এরশাদ হচ্ছে-

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ط

তরজমা: এবং মুসলমান নর ও মুসলমান নারীগণ একে অপরের বন্ধু; সৎকর্মের নির্দেশ দেয় এবং অসৎ কর্মে নিষেধ করে, নামায ক্বায়েম রাখে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ মান্য করে। [সূরা তাওবা, আয়াত-৭১] পক্ষান্তরে-

اَلْـمُنَافِقُوْنَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْض يَأْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَيَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْ ط نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ ط اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ ○

তরজমা: মুনাফিক্ব নর ও মুনাফিক্ব নারীগণ এক থলের একই বস্তু, অসৎ কর্মের নির্দেশ দেয় এবং সৎকর্মে নিষেধ করে আর নিজেদের মুষ্ঠি বন্ধ রাখে। তারা আল্লাহ্কে ছেড়ে বসেছে। সুতরাং আল্লাহও তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছেন। শিচয় মুনাফিক্বরা সেই পাকা নির্দেশ অমান্যকার। [সূরা তাওবা, আয়াত-৬৭]

সৎকাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধাদানের অপরিহার্যতা

নবীগণের পরে মানবকুলে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব সাইয়্যেদুনা হযরত আবূ বকর ছিদ্দীক্বে আকবর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন- হে মুসলমানগণ! তোমরা এ আয়াতে করীমা তিলাওয়াত করো-

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ ط

অর্থাৎ "হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের চিন্তা করো। পথভ্রষ্টরা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না, যখন তোমরা হিদায়তের উপর অটল থাকো।"

[সূরা মা-ইদাহ, আয়াত-১০৫]

হয়তো তোমরা ধারণা করে রেখেছো যে, তোমরা যখন হিদায়তের উপর আছো তখন কেউ গোমরাহ বা পথভ্রষ্ট হয়ে গেলেও তোমাদের ক্ষতি কি? ছিদ্দীক্বে আকবর

বলেন- তোমাদের এ ধারণা ঠিক নয়। যেহেতু আল্লাহ পাক এখানে একটি শর্তারোপ করেছেন- اِذَا اهْتَدَيْتُمْ অর্থাৎ "যখন তোমরা হিদায়তের উপর থাকো।" আর হিদায়তের মর্ম হলো 'আমর বিল মা'রূফ' ও 'নাহি আনিল মুনকার'। আমি শুনেছি, প্রিয়তম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করছেন- যারা পাপ কাজ হতে দেখেও বা অন্যায়কারীকে অন্যায় করতে দেখেও সাধ্যানুযায়ী বাধা দেয়ার বা দমন করার চেষ্টা করে না, আল্লাহ তা'আলা হয়তো অবিলম্বে তাদেরকেও অপরাধীদের অর্ন্তভুক্ত করে একযোগে আযাবে নিক্ষেপ করবেন।

[মিশকাত শরীফ পৃষ্ঠা-৪৩৬]

চলমান বিশ্ব ও মুসলিম জাতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!

পবিত্র ক্বোরআন এরশাদ করছে

اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ الصّٰلِحُوْنَ

তরজমা: এ ভূমির অধিকারী আমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাগণই হবে।

[সূরা আম্বিয়া, আয়াত-১০৫]

আরো এরশাদ হচ্ছে-

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِىْ نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ○

তরজমা: এটা হচ্ছে ওই বাগান, যার অধিকারী আমি আপন বান্দাদের থেকে তাকেই করবো, যে খোদাভীরু। [সূরা মারয়াম, আয়াত ৬৩]

এখন, সৎকর্ম বলতে বুঝায় রাসূলের অনুসরণে কাজ করাকে। অন্যদিকে রাসূল যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকলেই তো পরহেযগার হওয়া যায়। আর এ গুণাবলী যাদের, তারাইতো মুসলিম জাতি। তা হলে বলা যায় মুসলমানরাই পৃথিবীর এবং বেহেস্তের বৈধ অধিকারী; কিন্তু বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতি তার সম্পূর্ণ উল্টো। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে মুসলমানরা যেন পৃথিবীতে এক নামের এ গৃহে অভিবাসী জনগোষ্ঠীর নাম। অন্য কোন গ্রহলোক থেকে পৃথিবী নামের এ গৃহে এসে এরা আশ্রয় নিয়েছে। বিশ্বব্যাপী এখন মুসলমান খেদাও আন্দোলন চলছে। মুসলিম জাগরণের কবি আল্লামা ইক্ববাল অনেক আগেই বলেছিলেন-

بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا + رہگئی اپنے لئے ایک خیالی دنیا

"বিশ্ব আজি অন্যেরে চায়, মুসলমানে চায়না ফিরে
কাল্পনিক এক দুনিয়া আছে এই জাতির তরে।"

কেন এই করুণ পরিণতি?

আল্লামা ইক্ববাল রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেন-

عصر ما مارا ز ما بیگانہ کرد + از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد

অর্থাৎ : আধুনিকতার চোখ ধাঁধানো চাকচিক্য আজ আমাদেরকে আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছে। ফলে আমরা ভুলে গিয়েছি আমাদের আসল পরিচয়। এমনকি সত্যদর্শনের একমাত্র দর্পণ প্রিয়তম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনিন্দ্যসুন্দর নূরানী চরিত্র থেকেও আমাদেরকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। তাই -

تا شعار مصطفیٰ از دست رفت + قوم را رمز بقا از دست رفت

অর্থাৎ যখন থেকে নবীর আদর্শ মুসলমানের ব্যক্তি ও সমাজ জীবন থেকে নির্বাসিত হয়েছে, তখন থেকেই তাদের অস্তিত্ব হয়েছে বিপন্ন।

মুসলমান তার জীবনযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। থেমে নেই তার চলার গতি। কিন্তু কোন্ দিকে যাচ্ছে সে? কোথায় তার গন্তব্য? তার কাজের ফল কে ভোগ করছে? আল্লামা ইক্ববাল রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি বলছেন-

وائے قومے کشتۂ تدبیر غیر + کار او تخریب خود تعمیر غیر

অর্থাৎ:"আফসোস, দুশমনের ষড়যন্ত্রের শিকার এ মুসলিম জাতির জন্যে; যারা নিজেদের সর্বনাশ আর শত্রুদের কল্যাণ সাধনে লিপ্ত।"

প্রিয় আশেক্বে রাসূল ভাইয়েরা!

মুসলমানদের বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে শত্রুদের ষড়যন্ত্র বুঝতে আল্লামা রূমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একটি সুন্দর কাহিনীর অবতারণা করেছেন। তিনি বলেছেন, একজন সাদাসিধে সরলমনা মুসলমান বাজার থেকে ক্বোরবানীর জন্যে মোটাতাজা একটি ছাগল কিনে বাড়ীর দিকে ফিরছিলেন। ছাগলের গলায় অনেক লম্বা একটি দড়ির এক প্রান্ত ঝুলিয়ে অন্যপ্রান্ত হাতের মুঠোয় ধরে তিনি হাঁটছিলেন। এক সুচতুর চোর এ দৃশ্য দেখে ঝুলন্ত রশির মাঝখানে কেটে দিয়ে ছাগল নিয়ে চম্পট দিলো। বেশ কিছুক্ষণ পর লোকটি পেছনে ফিরে দেখে ছাগল নেই। এবার ছাগলের খোঁজে পেছনের পথে যেতে যেতে দেখতে পেলো এক ব্যক্তি এক কূয়ার ধারে বসে হাউ মাউ করে কাঁদছে। আসলে সে-ই ছিল ছাগল চোর। ছাগলটি দূরে আড়ালে রেখে এখানে বাহানা করে কাঁদতে বসেছে। লোকটি কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলল, "ভাই, আমার পাঁচশ দিরহাম ভর্তি একটি থলে কূয়ার পানিতে পড়ে গেছে। ডুব-সাঁতার কিছুই জানি না। তাই কূয়াতে নেমে টাকাগুলো ওঠাতে পারছি না। কেউ তুলে দিলে তাকে অবশ্যই অর্ধেকটা দিয়ে দিতাম। সরল লোকটি ভাবলো, মন্দ কি? ছাগাল তো খুঁজে পাওয়ার আশা নেই। এখন এ টাকাগুলো তুলে নিতে পারলে

কয়েকটা ছাগলের টাকা হয়ে যাবে। চোরটি পাকা-পাকি ওয়াদা করলো অর্ধেক টাকা অবশ্যই দিয়ে দেবে। ছোট অন্তর্বাসটা পরণে রেখে সব জামা-কাপড় খুলে কান্নারত (চোর) লোকটার কাছে জমা রেখে প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় টাকা উদ্ধারের আশায় কূয়ায় নেমে পড়লো। সে তো একের পর এক ডুব দিয়ে টাকার খোঁজে ব্যস্ত। এ দিকে চোর তার সব জামা-কাপড়ও নিয়ে উধাও। শেষ পর্যন্ত টাকা না পাওয়ার কথা জানাতে উপরের দিকে চেয়ে দেখে লোকটা নেই। বুঝতে পারলো সে ধোঁকাবাজি করেছে। অর্থাৎ অতি সরলতায় তার ছাগলও গেছে পরনের কাপড়ও গেছে।

একই অবস্থা আজ মুসলিম জাতির। তারা ইহুদী-খ্রিস্টান, মুনাফিক্ব, বে-ঈমানদের প্রতারণার শিকার হয়ে একদিকে পার্থিব সহায়-সম্পদ সব হারিয়েছে, অন্যদিকে প্রিয়তম রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনিন্দ্য সুন্দর নিষ্কলুষ আদর্শ বিসর্জন দিয়ে পাশ্চত্যের বাহ্যিক চাকচিক্যময় অর্ধ-উলঙ্গ বরং নগ্ন পরিবেশেই গা ভাসিয়ে দিয়েছে।

পরিত্রাণের উপায় কি?

ক্বলন্দরে লাহোরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-

بمصطفیٰ برساں کہ دیں ہمہ اوست + اگر باو نہ رسیدی تمام بولہبی ست

অর্থাৎ "যদি একজন পরিপূর্ণ দ্বীনদার ধার্মিক মুসলমান হতে চাও তবে নিজেকে পুর্ণাঙ্গরূপে রাসূলে মুজতাবা মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অকৃত্রিম প্রেমযুক্ত আদর্শের মাঝে বিলীন করে দাও। তা না হলে তোমার এবং আবূ লাহাবের মাঝে কোন তফাৎ নেই।"

প্রতীয়মান হলো, ইহ ও পরকালে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে শান্তি, সুখ ও সমৃদ্ধ জীবন লাভ করতে হলে ব্যক্তি, পরিবার এবং সমাজে নবীর আদর্শ অনুশীলনের বিকল্প কোন উপায় নেই।

গাউসে পাকের প্রেমিক বন্ধুরা!

তা হলে আসুন, ১. শান্তি, মুক্তি ও নাজাতের এ পথে বিপথগামী মানুষকে ডাকতে নিজেদের মাঝে যোগ্যতা গড়ে তুলি।

২. সৎকাজের আদেশ আর অসৎ কাজে বাধা দেয়াকে একজন মু'মিন হিসেবে অপরিহার্য দায়িত্ব মনে করি।

৩. অন্যকে যা বলি তা নিজেও যথাযথভাবে আমল করার চেষ্টা করি।

৪. এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জনের নিমিত্তে অভিজ্ঞ-দ্বীনদার সুন্নী আলিমদের লিখিত কিতাবাদি অধ্যয়ন করতে থাকি।

৫. ভালবাসা এবং নম্রতার সাথে বুঝানোর চেষ্টা করি।
৬. কারো ভুল-ভ্রান্তি মানুষের সামনে না বলে একান্ত নির্জনে ডেকে ভদ্রতার সাথে বলি । এতে সুফল পাওয়া যাবে। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাচ্ছেন- ''একজন মু'মিন আরেকজন মু'মিনের জন্যে আয়নার মত।'' অর্থাৎ যে কোন দোষত্রুটি নীরবে নিঃশব্দে জানিয়ে দেবে।
৭. সচ্চরিত্রবান ও ধৈর্যশীল হওয়ার এবং একমাত্র আল্লাহ-রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়্যতে দায়িত্ব পালন করি।
৮. যথাসম্ভব সাদাসিধে জীবন-যাপন করি । এতে মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করা সম্ভব হয়।
৯. মানুষের শ্রেণী এবং তার অবস্থা অনুযায়ী কথা বলার চেষ্টা করি।
১০.যথাসম্ভব সোজা-সরল পন্থায় ও সহজ ভাষায় বুঝানোর চেষ্টা করি এবং
১১.সর্বাগ্রে নিজের পরিবার-পরিজন সন্তান-সন্ততি তথা অধীনস্থদের সৎকাজে উদ্বুদ্ধ ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করি।

এ বিষয়ে মহান রাব্বুল আলামীন এরশাদ ফরমাচ্ছেন-

يٰۤاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا

অর্থাৎ ''হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো।'' [সূরা তাহরীম, আয়াত-৬]

প্রিয়তম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন ওইগুলো নিজেরাও গ্রহণ করি, অপরকে গ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করি। আর রাসূল যে সব কাজ করতে নিষেধ করেছেন, সে সব কাজ থেকে নিজেরাও বিরত থাকি এবং অপরকেও তা করতে নিষেধ করি।

হে আল্লাহ, আমাদেরকে ইখ্লাস ও মুহাব্বতের সাথে সর্বোত্তম পন্থায় ''ভালো কাজের আদেশ আর মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার মতো গুরু দায়িত্ব পালন করার তৌফিক নসীব করুন! আমীন বিহুরমতি সাইয়্যেদিল মুরসালীন।

------<>-----

পবিত্রতার বিবরণ

আল্লাহ পাকের ইবাদত করার জন্য পবিত্রতা হচ্ছে পূর্ব শর্ত। হাদীস শরীফে আছে, পবিত্রতা ঈমানের অর্ধাংশ। নিয়ম অনুযায়ী ওযূ ও গোসলের মাধ্যমে পবিত্রতা হাসিল হয়। ওযূ হচ্ছে নামাযের প্রথম পূর্বশর্ত। ওযূ ব্যতীত নামায শুদ্ধ হয় না। ওযূ নামাযের চাবি স্বরূপ। ওযূর অনেক ফযীলতও রয়েছে।

হযরত আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, ক্বিয়ামত দিবসে আমার উম্মতকে যখন আহবান করা হবে, তখন তাদের হাত-পা ও চেহারায় ওযূর আলামত উদ্ভাসিত অবস্থায় দেখা যাবে। [বুখারী ও মুসলিম]

অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত আছে- যখন কোন মুসলমান ওযূ করে, তখন তার কুল্লির পানির সাথে তার মুখের গুনাহ্, নাকের মধ্যে পানি প্রবেশ করে নাক ধৌত করার সময় নাকের গুনাহ্, চেহারা ধোয়ার সময় মাথার গুনাহ্ এবং পা ধৌত করার সময় পায়ের গুনাহ্ পানির সাথে বেরিয়ে যায়। [নাসাঈ শরীফ]

মুসলিম শরীফের একটি বর্ণনায় আছে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ''পূর্ণ ওযূর মাধ্যমে বান্দার গুনাহ্ মাফ হয় এবং আল্লাহ পাকের নিকট তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।''

ওযূর বিবরণ

ওযূ তিন প্রকার

১. ফরয; যেমন নামাযের জন্য ওযূ করা।
২. ওয়াজিব; যেমন তাওয়াফ করার জন্য ওযূ করা।
৩. মোস্তাহাব; যেমন মুখস্থ ক্বোরআন তেলাওয়াতের জন্য, নিদ্রা যাওয়ার জন্য, গোসলের জন্য এবং সর্বদা ওযূর সাথে থাকার জন্য ওযূ করা।

অযূর নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اَتَوَضَّأَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ وَاسْتِبَاحَةً لِّلصَّلَاةِ وَتَقَرُّبًا اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى

উচ্চারণঃ নাওয়াইতু আন আতাওয়াদ্দ্বাআ লিরাফ'ইল হাদাসি ওয়াসতিবাহাতাল্ লিস্ সালাতি ওয়াতাক্বার্‌রুবান ইলাল্লাহি তা'আলা।

অতঃপর ওযূর নিম্নলিখিত দো'আ পড়তে হয়-

بِسْـمِ اللّٰـهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى دِيْنِ الْاِسْلَامِ اَلْاِسْلَامُ حَقٌّ وَّ الْكُفْرُ بَاطِلٌ اَلاِسْلَامُ نُوْرٌ وَالْكُفْرُ ظُلْمَةٌ –

উচ্চারণঃ বিসমিল্লা-হিল আলিয়্যিল আযী-ম, ওয়াল হামদু লিল্লা-হি আলা দ্বী-নিল ইসলাম, আল ইসলা-মু হাক্বকুন, ওয়াল কুফরু বা-তিলুন, আল ইসলা-মু নূরুন, ওয়াল কুফ্রু যুলমাতুন।

অর্থঃ মহান ও শ্রেষ্ঠ আল্লাহর নামে আরম্ভ। ইসলাম ধর্মের উপর কায়েম থাকার জন্য সব প্রশংসা আল্লাহর। ইসলাম সত্য, কুফর মিথ্যা। ইসলাম জ্যোর্তিময় ও কুফর, অন্ধকারময়।

ওযূর ফরয

ওযূতে চার ফরযঃ ১. কপালের চুল উঠার স্থান থেকে থুতনীর নিচে পর্যন্ত এবং এক কানের লতি থেকে অপর কানের লতি পর্যন্ত সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল ধৌত করা, ২. কনুই সহ দু'হাত ধোয়া, ৩. মাথার এক চর্তুথাংশ পরিমাণ মসেহ্ করা এবং ৪. পায়ের গোড়ালীসহ ধৌত করা।

ওযূর সুন্নাত

১. ওযূর নিয়্যত করা, ২. ওযূর শুরুতে বিসমিল্লাহ পাঠ করা, ৩. কব্জি পর্যন্ত দু' হাত তিনবার ধৌত করা, ৪. মিসওয়াক করা, ৫. কুল্লি করা, ৬. গরগরা করা, ৭. উত্তমরূপে নাক সাফ করা (রোযাদার হলে গরগরা করবে না এবং নাকের ভিতর পানি পৌঁছাবে না), ৮.দাড়ি খেলাল করা, ৯. সমস্ত মাথা মসেহ করা, ১০. উভয় কান মসেহ করা, ১১. হাত-পায়ের আঙ্গুলসমূহের খিলাল করা, ১২. প্রত্যেক অঙ্গ তিনবার ধৌত করা এবং ১৩. তারতীব অনুসারে ওযূ করা।

ওযূর মোস্তাহাব

১. ক্বেবলামুখী হয়ে বসে ওযূ করা, ২. ডান দিক থেকে ওযূ আরম্ভ করা, ৩. ডান হাতে পানি নিয়ে বাম হাতে নাক সাফ করা, ৪. ঘাড় মসেহ্ করা, ৫. প্রত্যেক অঙ্গ ভালভাবে মালিশ করা, ৬. বামহাত দ্বারা উভয় পা ধোয়া, ৭. অন্য লোকের সাহায্য ছাড়া ওযূ করা, ৮. ওযূর সময় কথা না বলা, ৯. আবশ্যক পরিমাণ পানি খরচ করা, ১০. ওযূ শেষে ক্বেবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে অবশিষ্ট কিছু পানি পান করা, ১১. প্রত্যেক অঙ্গ ধোয়ার সময় বিসমিল্লাহ পড়া, ১২. অযূ শেষে দুরূদ শরীফ ও কলেমা শাহাদাত পাঠ করা।

ওযূর মাকরূহ

১. মুখের উপর সজোরে পানি নিক্ষেপ করা, ২. বাম হাতে কুল্লি করা ও নাকে পানি দেওয়া, ৩. তিন বারের বেশী ওযূর অঙ্গ ধৌত করা, ৪. নাপাক জায়গায় বসে অযূ করা, ৫. ওযূর তারতীবের প্রতি খেয়াল না করা, ৬. দুনিয়াবী কোন কথা বলা, ৭. পানি অপচয় করা।

ওযূ ভঙ্গের কারণ

প্রস্রাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে মলমূত্র বা অন্য কিছু বের হলে, ২. মুখ ভরে বমি হলে, ৩. ক্ষতস্থান থেকে রক্ত বা পুঁজ বের হয়ে গড়িয়ে পড়লে, ৪. দাঁত বা মুখ থেকে রক্ত বের হয়ে থুথু পরিমাণ বা এর বেশী হলে, ৫. চিৎ বা কাত হয়ে অথবা কোন কিছুর সাথে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লে, ৬. রুকু'-সাজদা বিশিষ্ট নামাযে অট্টহাসি দিলে, ৭. মাতাল বা জ্ঞানহারা হলে এবং ৮. স্ত্রী ও পুরুষের গুপ্ত অঙ্গ একত্রিত হলে।

ওযূর নিয়ম

যখন ওযূ করতে হয়, তখন ওযূর দো'আ পাঠ করে কব্জি পর্যন্ত তিনবার হাত ধৌত করবে, আঙ্গুল খিলাল করবে। তারপর ডান হাতে পানি নিয়ে গরগরাসহ তিনবার কুল্লি করবে। কুল্লি করার আগে মিস্ওয়াক করতে হয়। অতঃপর ডান হাতে পানি নিয়ে বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুল দ্বারা উত্তমরূপে নাক সাফ করে দু'হাতে পানি নিয়ে সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল এমনভাবে ধৌত করবে যেন চুল গজানোর স্থান থেকে থুতনীর নিচে পর্যন্ত এবং ডান কানের লতি থেকে বাম কানের লতি পর্যন্ত কোন জায়গা অবশিষ্ট না থাকে। দাড়ি থাকলে সেটাও ধুয়ে ও খিলাল করে নিতে হবে। তবে হজ্ব বা ওমরাহর ইহরাম অবস্থায় দাড়ি খিলাল করবে না। এরপর ডানহাত কনুইসহ, বামহাত কনুসইসহ তিনবার ধৌত করবে। এরপর সমগ্র মাথা একবার এভাবে মসেহ করবে যে, উভয় হাত ভিজিয়ে বৃদ্ধাঙ্গুলী ও শাহাদত আঙ্গুল বাদ দিয়ে উভয় হাতের অবশিষ্ট আঙ্গুলগুলোর পরস্পর মাথা মিলিয়ে এবং এ ছয় আঙ্গুলের পেটের অগ্রভাগ মাথার উপর রেখে পিছনের দিকে ঘাড় পর্যন্ত এমনভাবে নিয়ে যাবে যেন উভয় হাতের শাহাদাত ও বৃদ্ধাঙ্গুলদ্বয় এবং দু'হাতের তালু মাথা থেকে আলগা থাকে। এবার দু'হাতের তালু দ্বারা সামনের দিকে টেনে ঘাড় থেকে মাথার দু'পাশ মসেহ করবে। তারপর শাহাদত আঙ্গুলের অগ্রভাগ দ্বারা কানের ভিতরের এবং বৃদ্ধাঙ্গুল দ্বারা কানের পেছনের ভাগ মসেহ করবে। অতঃপর উভয় হাতের আঙ্গুলের পিঠ দ্বারা ঘাড় মসেহ করবে। উল্লেখ্য যে, গলা মাসেহ করা মাকরূহ। অবশেষে বাম হাত দ্বারা প্রথমে ডান পা এবং পরে বাম পা গোড়ালির উপরিভাগ পর্যন্ত তিনবার ধৌত করবে এবং পায়ের আঙ্গুল খিলাল করবে। ওযূ শেষ হওয়ার পর এ দো'আ পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাজ্'আলনী মিনাত্ তাওয়াবী-না ও ওয়াজ্'আলনী মিনাল মুতাত্বাহ্হিরীন।

ওযূ সম্পর্কীয় বিভিন্ন মাসায়েল

নামায, সাজদা-ই তেলাওয়াত ও নামায-ই জানাযা আদায় করা এবং ক্বোরআন শরীফ স্পর্শ করার জন্য ওযূ করা ফরয। বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ করার জন্য ওযূ করা ওয়াজিব।

জানাবতের গোসলের পূর্বে, নাপাকি অবস্থায় পানাহার ও ঘুমানোর পূর্বে ওযূ করা সুন্নত। আযান, ইক্বামত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর রওযা মুবারকের যিয়ারত, আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা এবং সাফা-মারওয়া সা'ঈ করার জন্য ওযূ করা সুন্নাত। ঘুমানোর পূর্বে এবং ঘুম থেকে উঠার পর অযূ করা মোস্তাহাব।

মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার অথবা উঠানোর পর, স্ত্রী সহবাসের পূর্বে, ক্রোধান্বিত অবস্থায়, মুখস্থ ক্বোরআন পাঠ করার জন্য, হাদীস বা দ্বীনী ইল্ম শিক্ষা গ্রহণ বা শিক্ষা প্রদানের জন্য, ধর্মীয় কিতাব স্পর্শ করার জন্য, (ঘটনাচক্রে) মিথ্যা বলার পর, গালি দেওয়ার পর, মুখে খারাপ শব্দ বের হওয়ার পর, বিধর্মীদের শরীরের সাথে স্পর্শ হওয়ার পর, গীবত করার পর এবং অট্টহাসির পর ওযূ করা মুস্তাহাব। একবার অযূ ভঙ্গ হলে পুনরায় ওযূ করে নেওয়া মোস্তাহাব।

শৌচকার্যের বিবরণ

মল-মূত্র ত্যাগ করার সময় কা'বা শরীফের দিকে মুখ করা বা পিঠ দেওয়া হারাম- সেটা ঘরের ভিতর হোক বা খোলা জায়গায় হোক। মল-মূত্র ত্যাগ করার সময় চন্দ্র-সূর্যের দিকে মুখ বা পিঠ কোনটা করতে নেই। বাতাসের দিকে মুখ করে প্রস্রাব করা নিষেধ এবং এমন জায়গায় প্রস্রাব করা নিষেধ, যেখান থেকে ছিটকে উড়ে আসে। মল-মূত্র ত্যাগ করার পূর্বে (পায়খানা বা প্রস্রাব খানার বাইরে) নিম্নলিখিত দো'আটি পড়া মুস্তাহাব।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উ-যুবিকা মিনাল খুবসে ওয়াল খাবা-ইস।

অতঃপর প্রথমে বাম পা ভিতরে প্রবেশ করাবে। কাজ সমাধা হওয়ার পর ঢিলা-কুলুক ও ইস্তিঞ্জার পর শরীর ঢেকে বের হয়ে আসবে। বেরিয়ে আসার সময় প্রথমে ডান পা বের করতে হবে এবং বের হয়ে এ দো'আটি পড়বে-

غُفْرَانَكَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّىْ مَايُؤْذِيْنِىْ وَاَمْسَكَ عَلَىَّ مَا يَنْفَعُنِىْ

উচ্চারণঃ গোফরা-নাকা। আলহামদু লিল্লা-হিল্ লাযী আযহাবা 'আন্নী মা ইয়ূযী-নী ওয়া আমসাকা 'আলাইয়্যা মা-ইয়ানফা'উনী।

হায়য ও নিফাসের বর্ণনা

প্রাপ্ত বয়স্কা মহিলার গোপনাঙ্গ থেকে মাসে মাসে যে খুন (রক্ত) বের হয়, সেটাকে হায়য বলা হয়। রোগের কারণে যে রক্ত বের হয়, সেটাকে ইস্তিহাযা এবং সন্তান প্রসবের পর যে রক্ত বের হয়, সেটাকে 'নিফাস' বলে।

মাসআলাঃ হায়যের সময়সীমা কমপক্ষে তিন দিন তিন রাত। বেশী হলে দশ দিন দশ রাত। অতএব দশদিন দশ রাত থেকে বেশী সময় রক্ত বের হলে দশদিন পর্যন্ত হায়েয ধরা হবে এবং পরবর্তী সময়ের রক্ত 'ইস্তেহাযা' (রোগ) হিসেবে গণ্য হবে।

মাসআলাঃ মেয়েলোকের কমপক্ষে নয় বছর বয়সে হায়য শুরু হয় এবং পঞ্চান্ন বছর বয়স হচ্ছে হায়য এর সর্বোচ্চ সময়।

মাসআলাঃ গর্ভবতী মহিলার রক্ত বের হলে তা 'ইস্তিহাযা'।

মাসআলাঃ সন্তান প্রসবের পর চল্লিশ দিনের পরও রক্ত বের হলে, চল্লিশ দিন 'নিফাস' হিসেবে গণ্য হবে এবং বাকী দিনগুলো 'ইস্তিহাযা' হিসেবে গণ্য হবে।

জরুরী মাসআলা ঃ সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার কিছু দিন পর চল্লিশ দিনের পূর্বে নিফাসের রক্তস্রাব বন্ধ হলে পাক-পবিত্র হয়ে নামায-রোযা অবশ্যই পালন করতে হবে।

হায়য ও নিফাস অবস্থায় করণীয়

হায়য ও নিফাসের অবস্থায় নামায পড়া এবং রোযা রাখা হারাম।

হায়য ও নিফাসের অবস্থায় নামায আল্লাহর পক্ষ হতে মাফ করা হয়েছে। ওই নামাযগুলোর ক্বাযা পড়ার প্রয়োজন নেই। অবশ্য রোযার ক্বাযা অন্য সময় করা ফরয।

হায়য ও নিফাসের অবস্থায় ক্বোরআন শরীফ তিলাওয়াত করা, তা দেখেই হোক বা মুখস্থ এবং তা স্পর্শ করা হারাম।

কাগজের টুকরায় কোন আয়াত লিখা আছে। সেটা স্পর্শ করাও হারাম।

ক্বোরআন শরীফ যদি জুয্দানে আবৃত থাকে, তাহলে ওই জুয্দান স্পর্শ করলে কোন ক্ষতি নেই।

হায়য ও নিফাসের অবস্থায় ক্বোরআন তেলাওয়াত ব্যতীত অন্যান্য যিক্র, কলেমা পাঠ, দুরূদ শরীফ পাঠ ইত্যাদি জায়েয। ওযূ করে পড়া উত্তম।

হায়য ও নিফাসের সময় স্ত্রীসঙ্গম করা হারাম। অবশ্য একসাথে বসা, শোয়া, পানাহার করা ও চুমু খাওয়ার মধ্যে কোন ক্ষতি নেই।

ইস্তিহাযার সময় নামায, রোযা কোনটাই মাফ নয় এবং এ অবস্থায় স্ত্রীসঙ্গম করাও বৈধ।

গোসলের বিবরণ

গোসল চার প্রকারঃ ১. ফরয গোসল, ২. ওয়াজিব গোসল, ৩. সুন্নত গোসল, ৪. মুস্তাহাব গোসাল।

গোসল ফরয হওয়ার কারণ

১. যৌন উত্তেজনাবশতঃ বীর্য বের হলে, ২. স্বপ্নদোষ হলে, ৩. স্ত্রী সহবাস করলে, ৪. পুরুষের লিঙ্গের অগ্রভাগ স্ত্রীর লিঙ্গে প্রবেশ করলে (বীর্যপাত হোক বা না-ই হোক), ৫.মেয়েদের হায়য বা নিফাস হলে, ৬. সমকাম কিংবা হস্ত মৈথুন করে বীর্যপাত ঘটালে ।

গোসল ওয়াজিব হওয়ার কারণ

১. নাপাক অবস্থায় বেদ্বীন মুসলমান হলে, ২. স্বপ্নদোষ দ্বারা ছেলে বালেগ হলে, ৩. হায়য বা স্বপ্নদোষ দ্বারা মেয়ে বালেগ হলে।

সুন্নাত গোসল

১. জুমু'আর নামাযের জন্য গোসল করা, ২. দুই ঈদের নামাযের জন্য গোসল করা, ৩. হাজীদের জন্য আরাফাতের দিন দুপুরের পর গোসল করা, ৪. ইহরামের জন্য গোসল করা।

মুস্তাহাব গোসল

১. পাক অবস্থায় বে-দ্বীন মুসলমান হলে, ২. শবে বরাত, ৩. শবে- ক্বদর, ৪. সূর্য গ্রহণ বা ইস্তিসক্বার নামাযের পূর্বে, ৫. বেঁহুশ, মাতাল, পাগল ভাল হলে, ৬. মক্কা ও মদীনা শরীফে প্রবেশ করার জন্য, ৭. জিলহজ্ব মাসের নয় তারিখ দিবাগত রাত্রে মুয্দালিফায় অবস্থানের জন্য, ৮.তাওয়াফে যিয়ারত করার জন্য, ৯. শয়তানকে কঙ্কর নিক্ষেপ করার পূর্বে, ১০. গুনাহ্ থেকে তাওবা করার জন্য, ১১. মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার পর নিজে গোসল করা।

গোসলের ফরয

গোসলের ফরয তিনটিঃ ১. গরগরাসহকারে ভালরূপে কুল্লি করা, ২. নাকে পানি দেওয়া, ৩. সমস্ত শরীর একবার ভালরূপে ধোয়া যেন শরীরের কোন জায়গা শুষ্ক না থাকে।

গোসলের সুন্নাত

১. কব্জি পর্যন্ত উভয় হাত তিনবার করে ধোয়া, ২. নিজের লজ্জা স্থান ধৌত করা, ৩. শরীরের কোথাও নাপাকী লেগে থাকলে তা ধৌত করা, ৪. গোসলের পূর্বে পূর্ণ ওযূ করা, ৫. ওযূর সময় পানিতে পা ডুবানো থাকলে গোসলের পর তা ধৌত করা, ও ৬. সমস্ত শরীর তিনবার ধৌত করা।

গোসলের মুস্তাহাব

১. গোসলের নিয়্যত করা, ২. ক্বেবলামূখী হয়ে গোসল করা, ৩. পরিমিত পরিমাণ পানি ব্যবহার করা, ৪. শরীর ভালরূপে ঘষে মেজে ধৌত করা, ৫. গোসলের পর শরীর ঢেকে ফেলা এবং ৬. তাড়াতাড়ি শরীর ঢেকে ফেলা।

গোসলের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اَغْتَسِلَ لِرَفْعِ الْجَنَابَةِ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন আগতাসিলা লিরাফা'ইল জানাবাহ্।
অর্থাৎ নাপাকী দূর করার নিমিত্তে আমি গোসলের নিয়্যত করলাম।

গোসলের নিয়ম

সর্বপ্রথম গোসলের নিয়্যত করবে। তারপর দু'হাত কব্জি পর্যন্ত তিনবার করে ধৌত করবে। এরপর লজ্জাস্থান ধৌত করবে। অতঃপর শরীরের কোথাও নাপাকী থাকলে ধুয়ে ফেলবে। তারপর ওযু করবে। তারপর ডান কাঁধে, তারপর বাম কাঁধে তিনবার করে পানি প্রবাহিত করবে। অতঃপর মাথায় তিনবার পানি ঢেলে গোটা শরীর মালিশ করে ধৌত করবে।

তায়াম্মুম-এর বিবরণ

পানির অভাবে কিংবা কোন কারণে পানি ব্যবহারে অক্ষম হলে তায়াম্মুমের নিয়্যতের সাথে মাটি অথবা মাটি জাতীয় পাক জিনিস দ্বারা হাত ও মুখ মসেহ্ করাকে তায়াম্মুম বলে।

যে যে কারণে তায়াম্মুম করা যায়

১. পানি ব্যবহারে রোগ বৃদ্ধি অথবা আরোগ্য লাভে বিলম্ব হওয়ার আশঙ্কা থাকলে, ২. একবর্গ মাইলের মধ্যে পানি পাওয়া না গেলে, ৩. পানি আনতে হিংস্র জীব বা শত্রুর ভয় থাকলে, ৪. কূপ থেকে পানি উঠানোর কোন ব্যবস্থা না থাকলে, ৫. পানি খরিদ করার সামর্থ্য না থাকলে, ৬. ঠাণ্ডা পানি ব্যবহারে অসুখ বাড়লে এবং গরম পানি পাওয়া না গেলে, ৭. ঈদের জামা'আত শুরু হয়েছে, ওযু করতে গেলে জামা'আত না পাওয়ার সম্ভাবনা হলে এবং ৮. জানাযার নামায শুরু হয়ে গেলে তায়াম্মুম করে নামাযে শরীক হওয়া যাবে।

তায়াম্মুমের ফরয

১. নিয়্যত করা, ২. মুখ মণ্ডল মসেহ্ করা, ৩. কনুই সহ উভয় হাত মসেহ্ করা।

তায়াম্মুমের সুন্নাত

১. ‘বিসমিল্লাহ’ পড়ে তায়াম্মুম করা, ২. মাটি বা মাটি জাতীয় জিনিসের উপর দু’হাত মারা, ৩. হাত ঝেড়ে নেয়া, ৪. প্রথমে মুখমণ্ডল মসেহ্ করা, তারপর ডান হাত, অতঃপর বাম হাত তারতীব অনুযায়ী মসেহ করা এবং ৫. পরপর অবিশ্রান্তভাবে মসেহ্ করা।

তায়াম্মুমের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اَتَيَمَّمَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ وَاسْتِبَاحَةً لِلصَّلٰوةِ وَتَقَرُّبًا اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى

উচ্চারণঃ নাওয়াইতু আন আতাইয়াম্মামা লিরাফ‘ইল হাদাসি ওয়াস্‌তিবা-হাতাল্ লিস্‌সালা-তি ওয়া তাক্বাররুবান্ ইলাল্লা-হি তা‘আলা।

তায়াম্মুম করার নিয়ম

প্রথমে নিয়্যত করে পাক মাটি, ধূলা-বালি, অথবা মাটি জাতীয় জিনিসের উপর দুই হাতের তালু, আঙ্গুল খোলা রেখে এমনভাবে মারবে যেন এ সকল জায়গায় ঠিকমত মাটি লাগে। তারপর তা ঝেড়ে ফেলে সারা মুখমন্ডল একবার মসেহ করবে। তারপর পুনরায় সেভাবে হাত মেরে বাম হাতের তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলী আলাদা রেখে বাকী তিন আঙ্গুল ও হাতের তালুর একাংশ দ্বারা ডান হাতের পিঠ কুনুই পর্যন্ত মসেহ্ করবে। অতঃপর তর্জনী ও বৃদ্ধ আঙ্গুল ও হাতের তালুর অবশিষ্ট অংশ দ্বারা হাতের ভিতরের অংশ মসেহ করবে। অনুরূপ ডান হাত দিয়ে হাম হাত মসেহ্ করবে এবং পরে দু’হাতের আঙ্গুলগুলো পরস্পরের মধ্যে ঢুকিয়ে খিলাল করবে। উল্লেখ্য যে, তায়াম্মুমে মাথা বা পায়ে মসেহ্ করা হয় না।

যে যে কারণে তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়

যে সব কারণে ওযু ভেঙ্গে যায় বা গোসল ওয়াজিব হয়, ওসব কারণে তায়াম্মুমও ভঙ্গ হয়ে যায়। তাছাড়া পানি ব্যবহারে সামর্থ্যবান হওয়ার সাথে সাথে তায়াম্মুম ভেঙ্গে যায়।

মাসআলাঃ ১. এরূপ কোন জায়গায় পৌঁছলে, যার এক মাইলের ভিতর পানি রয়েছে, তাহলে তায়াম্মুম ভেঙ্গে যাবে। পানি পর্যন্ত পৌঁছার প্রয়োজন নেই। অবশ্য ঘুমন্ত অবস্থায় পানির এলাকা অতিক্রম করলে তায়াম্মুম ভঙ্গ হবে না। ২. রোগী গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করেছিলো, কিন্তু এখন সুস্থ হয়ে গেছে এবং গোসল করলে কোন ক্ষতি হবে না, তাহলে তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং ৩. এতটুকু পানি পাওয়া গেল, যাদ্বারা ওযূর অঙ্গসমূহ কেবল একবার করে ধোয়া যাবে, তাহলে তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যাবে।

অন্যান্য মাসায়েল

এক মুষ্ঠি পরিমাণ দাড়ি রাখা নবীগণের সুন্নত তথা ওয়াজিব। গোঁফ ঠোঁটের সাথে মিশিয়ে কাটা সুন্নাত। গলার দাড়ি কাটলে কোন অসুবিধা নাই। বগলের কেশ ক্ষুর দ্বারা মুণ্ডানো দুরস্ত আছে। নাকের ভিতরের কেশ টেনে উপড়ে ফেলার চেয়ে কাঁচি দ্বারা কেটে ফেলা উত্তম। নাভির নীচের কেশ পুরুষের জন্য ক্ষুর দ্বারা মুণ্ডানো উত্তম। স্ত্রী লোকের চিমটা দ্বারা উপড়ে ফেলা উচিত। তবে কোন ঔষধ লাগিয়েও পরিস্কার করা যেতে পারে। এ জন্য উন্নত মানের রেজার ব্যবহার করা যায়। ভাল লোমনাশক ক্রীম দ্বারাও পরিষ্কার করা যায়। স্ত্রী লোকদের মাথার চুল মুণ্ডানো বা কাটা বৈধ নয়। নাভির নীচের কেশ, হাত-পায়ের নখ সপ্তাহে একবার, অপরাগতায় দু’সপ্তাহে একবার, তাতেও অপারগ হলে চল্লিশ দিনে একবার মুণ্ডানো ও কেটে সাফ করা উচিত। এর বেশী বিলম্ব করা মাকরূহ। প্রত্যেক জুমু‘আর দিন ওইরূপ পরিস্কার হওয়া অতি উত্তম। চুল ও নখ কেটে মাটির নীচে পুঁতে ফেলা উত্তম। পুরুষের জন্য সোনার অলংকার বা আংটি পরা হারাম। পশ্চিম দিকে পা রেখে শয়ন করা মাকরূহ তাহরীমী। পশ্চিম দিকে থুথু ফেলাও হারাম। ডান দিকে থুথু না ফেলে বাম দিকে থুথু ফেলা উত্তম।

----.---

মিস্‌ওয়াক

১. مسواک (মিস্‌ওয়াক) ও سواک (সিওয়াক) سوک (সূ-ক) থেকে গঠিত। এর অর্থ ‘মাজা’। ‘মিসওয়াক’ হচ্ছে দাঁতগুলো মাজার বস্তু। শরীয়তের পরিভাষায় ‘মিসওয়াক’ হচ্ছে গাছের ওই শাখা, যা দ্বারা দাঁতগুলো পরিস্কার করা হয়। সুন্নাত হচ্ছে- তা যেনো কোন ফুল কিংবা ফলবান গাছ না হয়, তিক্ত গাছের শাখা হয়, হাতের কনিষ্ঠা আঙ্গুলের সমান মোটা হয় এবং দৈর্ঘ্যে যেনো এক বিঘত অপেক্ষা বেশী না হয়; আর মিসওয়াক যেনো দাঁতগুলোর প্রস্থে করা হয়, দৈর্ঘ্যে নয়, দাঁতবিহীন ব্যক্তি ও নারীরা মাড়িতে আঙ্গুল বুলিয়ে নেবেন।

কোন কোন স্থানে মিসওয়াক করা সুন্নাতঃ ওযূতে, ক্বোরআন তেলাওয়াত করার সময়, দাঁতগুলো হলদে বর্ণের হলে, ক্ষুধা পেলে, বেশীক্ষণ যাবৎ নিশ্চুপ থাকলে এবং বিনিদ্র থাকার কারণে মুখ থেকে দুর্গন্ধ বের হলে। ইমাম শাফে‘ঈর মতে (মিস্‌ওয়াক) নামাযের সুন্নাত; ওযূর নয়। কারণও স্পষ্ট যে, তাঁদের মতে, রক্ত বের হলে ওযূ ভঙ্গ হয় না। সুতরাং মিস্‌ওয়াক করার কারণে যদি দাঁতে রক্তও বের হয়ে আসে, তবুও তাঁর মতে নামায বিশুদ্ধ হবে। কিন্তু আমাদের মাযহাব অনুসারে প্রবহমান রক্ত ওযূ ভঙ্গ করে দেয়।

মিসওয়াকের ফজিলত

মিসওয়াকের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়। মিসওয়াকের মাধ্যমে মুখের পবিত্রতা অর্জিত হয়। মিসওয়াক করা সকল নবীর সুন্নত। মিসওয়াক করে সালাত আদায় করলে ৭০ গুণ বেশী সওয়াব পাওয়া যায়। মাথার ব্যথা ও কাশি দূর হয়। দাঁত মজবুত হয় ও দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পায়। পাকস্থলী এবং শরীর শক্তিশালী হয়। ইত্যাদি ইত্যাদি।

মসজিদের গুরুত্ব ও আদাব

'মসজিদ' (مَسْجِدٌ) আরবী শব্দ। এটা 'সাজদাহ' (سَجْدَةٌ) থেকে গৃহীত। 'সাজদাহ্' মানে وَضْعُ الْجَبْهَةِ عَلَى الْاَرْضِ অর্থাৎ কপাল যমীনের উপর রাখা। এ কাজটি ইবাদতের জন্যও করা হয় এক সময়। সম্মান প্রদর্শনের জন্যও করা হতো। ইবাদতের জন্য জন্য সাজদা কেবলই আল্লাহ্ তা'আলার জন্য করা যাবে; তিনি ব্যতীত অন্য কারো জন্য করলে তা হবে 'শির্ক'। এতে কারো দ্বিমত নেই। আর কারো প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন সাজদা করা আমাদের ইসলামী শরীয়তে সম্পূর্ণ হারাম। হযরত আদম আলায়হিস্ সালামের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য ফিরিশতাদের সাজদা একমাত্র তাঁদের জন্য খাস ছিলো। হযরত ইয়ূসুফ আলায়হিস্ সালামকে তাঁর পিতা-মাতা ও ভাইগণ সাজদা করেছিলেন- হয়ত 'স্বপ্নের বাস্তবায়ন' স্বরূপ অথবা তা তাঁদের শরীয়তে জায়েয ছিলো বলেই। আমাদের দ্বীন ও শরীয়তে তা নিষিদ্ধ ও হারাম। [তাফসীর ও ফিক্বহ্র কিতাবাদি]

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষ ও জিন্ জাতিকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহর ইবাদতের জন্য। সুতরাং পৃথিবীপৃষ্ঠে তাঁরই ইবাদতের জন্য মসজিদ নির্মাণ করা হয়। তাই মসজিদে আল্লাহর ইবাদত ব্যতীত দুনিয়াবী কথাবার্তা পর্যন্ত জায়েয নয়। তদুপরি, মর্যাদায়ও 'মসজিদ' স্বতন্ত্র। দুনিয়ার বুকে শ্রেষ্ঠ ভূ-খণ্ড হচ্ছে 'মসজিদ'। পুরুষ ঘর কিংবা বাজারে নামায আদায় করার চেয়ে মসজিদে জমা'আত সহকারে আদায় করার সাওয়াব ২৫গুণ বেশী। অন্য বর্ণনায় আছে, একাকী নামায সম্পন্ন করার চেয়ে জমা'আত সহকারে সম্পন্ন করার সওয়াব ২৭গুণ বেশী। [সহীহ্ বোখারী শরীফ]

পৃথিবীতে সর্বপ্রথম মসজিদ হচ্ছে মক্কায় অবস্থিত কা'বা ঘর। এর চল্লিশ বছর পর মসজিদে আক্বসা নির্মিত হয়। পূর্ববর্তী যুগে নির্দিষ্ট জায়গা ব্যতীত নামায আদায় করা যেতো না। আমাদের আক্বা ও মাওলা হুযূর-ই আক্রামের বৈশিষ্ট্যাদির মধ্যে একটি এও যে, সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠকে 'মসজিদ' (তথা নামাযের উপযোগী) করা হয়েছে। সুতরাং পৃথিবীর সর্বত্র মসজিদ নির্মাণ করা হতে থাকে।

নিম্নলিখিত আয়াত শরীফ থেকে মসজিদ নির্মাণ ও আবাদ করার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনুমিত হয়-

اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ
وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰى اُولٰٓئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ

তরজমা: নিশ্চয় মসজিদসমূহ তারাই আবাদ করে, যারা আল্লাহ ও ক্বিয়ামত

দিবসের উপর ঈমান আনে, নামায কায়েম রাখে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকেও ভয় করে না; সুতরাং এটাই সন্নিকটে যে, এসব লোক সৎপথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। [সূরা তাওবা, আয়াত-১৭ঃ তরজমা- কান্‌যুল ঈমান]

হুযূর-ই আক্বদাস সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, পুরুষের নামায মসজিদে জমা'আত সহকারে, ঘরে ও বাজারে পড়ার চেয়ে পঁচিশগুণ বেশী (সাওয়াবদায়ক)। ইমাম বোখারী, মুসলিম, মালিক, তিরমিযী ও নাসাঈ হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, জামা'আত সহকারে নামাযের মর্যাদা একাকী পড়া অপেক্ষা সাতাশগুণ বেশী। আর এও যে, যখন কেউ উত্তমরূপে ওযূ করে মসজিদের জন্য বের হয়, তখন তার প্রতিটি কদমের বিনিময়ে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, গুনাহ্ ঝরে যায় এবং যখন সে নামায পড়ে তখন ফিরিশ্তাগণ তার উপর দুরূদ প্রেরণ বা রহমতের দো'আ-প্রার্থনা করতে থাকেন, যতক্ষণ সে তার মুসাল্লার উপর থাকে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত সে নামাযের জন্য অপেক্ষারত থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে নামাযের মধ্যে আছে মর্মে গণ্য হয়।

[ইমাম বোখারী, মুসলিম, আবূ দাঊদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্ হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সূত্রে এ হাদীস শরীফ বর্ণনা করেছেন।]

অন্য বর্ণনায় আছে- প্রতিটি কদমের বিনিময়ে দশটি করে নেকী লিখা হয় আর যখন সে ঘর থেকে বের হয়, ফিরে আসা পর্যন্ত তাকে নামাযরত লোকদের মধ্যে লিপিবদ্ধ করা হয়।

[ইমাম আহমদ ও আবূ ইয়া'লা প্রমুখ হযরত ওক্ববা ইবনে 'আমির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে এ হাদীস শরীফ বর্ণনা করেছেন]

এও বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযূ করে নামাযে গেলো ও মসজিদে নামায পড়লো, তার মাগফিরাত হয়ে যাবে।

[ইমাম নাসাঈ হযরত ওসমান ইবনে আফফান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন।]

যে ব্যক্তি ৪০ দিন যাবৎ জমা'আত সহকারে এভাবে নামায সম্পন্ন করে যে, সে তাকবীর-ই ঊলা (তাকবীর-ই তাহরীমা) ইমামের সাথে পাবে, তার জন্য দু'টি 'মুক্তি' লিপিবদ্ধ করা হয়- একটি মুক্তি দোযখ থেকে, আরেকটি 'নিফাক্ব' (মুনাফিক্বী) থেকে। [তিরমিযী শরীফ]

মসজিদের আদাব

১. প্রথমে ডান পা দিয়ে 'সালাম' বলে প্রবেশ করবেন। (অবশ্য যদি উপস্থিত লোকেরা যিকর ও দরসে মশগুল না থাকে।) সালামের বাক্য হবে- 'আস্‌সালামু আলায়না মির্ রাব্বিনা ওয়া 'আলা ইবা-দিল্লাহিস্ সা-লেহীন'। আর দো'আ পড়বেন- ''আস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলা রসূলিল্লাহ। আল্লাহুম্মাফ্‌তাহলী

আবওয়াবা রাহমাতিকা।" আর বের হবার সময় প্রথমে বাম পা বের করবে আর বলবে- "আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা মিন্ ফাদ্বলিক্বা ওয়া রাহমাতিকা।"

২. মসজিদে প্রবেশ করার পর 'মাক্‌রূহ ওয়াক্বত না হলে দু' রাক'আত 'তাহিয়্যাতুল মসজিদ'-এর নামায পড়বে।

৩. দুনিয়াবী কথাবার্তা বলবে না।

৪. বেচাকেনা করবে না, ৫. খোলা তরবারি নিয়ে প্রবেশ করবে না, ৬. মানুষের ঘাড়ের উপর দিয়ে লাফিয়ে এগুবে না, ৭. জায়গার জন্য ঝগড়া করবে না, ৮. এমনভাবে বসবে না যেন অপরের জন্য জায়গা সংকীর্ণ হয়ে যায়, ৯. নামাযীর সম্মুখ দিয়ে পার হবে না, ১০. মসজিদে থুথু ফেলবে না, ১১. আঙ্গুলগুলো মটকাবে না, ১২. অপবিত্র বস্তু, পাগল ও শিশু থেকে মসজিদকে মুক্ত রাখবে, ১৩. অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকর করবে। [আলমগীরী]

১৪. মসজিদে পানাহার করবে না। অবশ্য যদি ই'তিকাফের নিয়্যত করে মসজিদে প্রবেশ করে কিংবা ই'তিকাফাবস্থায় অবস্থানরত থাকে তবে মসজিদে পানাহার করা বৈধ।

আযানের বর্ণনা

আযানের পূর্বে ও পরে সালাত ও সালাম

ক্বোরআন-হাদীসের আলোকে আযানের পূর্বে ও পরে সালাত ও সালাম মুস্তাহাব। দুরূদ শরীফ পাঠকের দশটি সওয়াব অর্জিত হয়, দশটি গুনাহ্ মাফ হয়, দশটি দরজাত বুলন্দ হয়। অনুরূপ যারা শ্রবণ করে তাদেরও।

[কিতাবুল ফিক্বহ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আহ, কৃতঃ আল্লামা আব্দুর রহমান জাযীরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।]

আযানের নিয়ম ও শব্দসমূহ

দুরূদ শরীফ ও আযানের মধ্যভাগে একটু বিলম্বজনিত ব্যবধান রেখে মসজিদের বাইরে উঁচু জায়গায় ক্বেবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে উভয় কানের ছিদ্রে আঙ্গুল রেখে বা কানের উপর হাত রেখে اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর) বলবে। পুনরায় সামান্য বিরতি দিয়ে اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর) বলবে। তারপর দু'বার اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ) বলবে। তারপর দু'বার اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ (আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ) বলবে। তারপর ডান দিকে মুখ ফিরিয়ে দু'বার حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ (হাইয়্যা আলাস্ সালাহ্) বলবে এবং বাম দিকে মুখ ফিরিয়ে দু'বার حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ (হাইয়্যা আলাল ফালাহ্) বলবে। এরপর ক্বেবলার দিকে মুখ করে اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর)

বলবে। এরপর একবার لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু) বলে আযান শেষ করবে। এরপর প্রথমে দুরূদ শরীফ, তারপর এ দু'আটি পড়বেঃ

আযানের দো'আ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّآمَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَآئِمَةِ اٰتِ (سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا) مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَنِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهٗ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادِ۔

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা রাব্বা হা-যিহিদ্ দা'ওয়াতিত্তা-ম্মাতি ওয়াস্‌সালা-তিল ক্বা-ইমাতি আ-তি (সাইয়্যেদানা ওয়া মাওলানা) মুহাম্মাদানিল ওয়াসী-লাতা ওয়াল ফাদ্বী-লাতা ওয়াদ্ দারাজাতার রাফী-'আতা ওয়াব্‌আস্‌হু মাক্বা-মাম মাহমূ-দানিল্লাযী ওয়া'আদ্‌তাহূ ওয়ারযুক্বনা- শাফা-'আতাহূ ইয়াওমাল ক্বিয়া-মাতি ইন্নাকা লা-তুখ্‌লিফুল মী-'আদ।

মাসআলাঃ ফজরের আযানে حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ (হাইয়্যা আলাল ফালাহ্) বলার পর দুবার اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ (আস্‌সালাতু খায়রুম মিনান্ নঊম) বলবে।

মাসআলাঃ জুমু'আসহ পাঁচ ওয়াক্বত ফরয নামাযের জন্য আযান সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্ বরং ওয়াজিবের মত। অর্থাৎ যদি আযান দেয়া না হয়, তাহলে ওখানকার সমস্ত লোক গুনাহগার হবে। [খানিয়া, হিন্দিয়া, দুররুল মুখতার ও রুদ্দুল মুহতার]

মাসআলাঃ যদি কেউ ঘরে নামায পড়ে এবং আযান না দেয়, তাহলে মাকরূহ নয়। কারণ তার জন্য মহল্লার মসজিদের আযানই যথেষ্ট।

মাসআলাঃ আযানের ওয়াক্বত ওটাই, যা নামাযের ওয়াক্বত।

মাসআলাঃ ওয়াক্বত হওয়ার পর যেন আযান দেয়া হয়। যদি ওয়াক্বত হওয়ার আগে আযান দেয়া হয়, তাহলে ওয়াক্বত হওয়ার পর পুনরায় আযান দিতে হবে।

[ক্বাযী খান, শরহে বেক্বায়া, আলমগীরী, হেদায়া, নেহায়া]

মাসআলাঃ আযানের মুস্তাহাব ওয়াক্বত ওটাই, যা নামাযের মুস্তাহাব ওয়াক্বত।

মাসআলাঃ যদি প্রথম ওয়াক্বতে আযান হয় এবং শেষ ওয়াক্বতে নামায হয়, তখন আযানের সুন্নাত আদায় হবে। [দুররুল মুখতার ও রদ্দুল মুহতার]

মাসআলাঃ ফরয নামাযসমূহ ব্যতীত অন্য কোন নামাযের জন্য আযান নেই। বিতর, জানাযা, দু' ঈদ, সুন্নাত, তারাবীহ, ইস্‌তিসক্বা, চাশ্‌ত, চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ ও নফল নামাযের জন্য আযান নেই। [আলমগীরী ও অন্যান্য কিতাব]

মাসআলাঃ মহিলাদের জন্য উচ্চস্বরে আযান-ইক্বামত বলা মকরূহে তাহরীমী।

কোন মহিলা যদি আযান দেয়, তবে গুনাহগার হবে এবং তার দেওয়া আযান পুনরায় দিতে হবে।

মাসআলাঃ মহিলাদের ওয়াক্‌তিয়া নামায বা ক্বাযা নামাযের জন্য আযান ও ইক্বামত মকরূহ, যদিও জামা'আত সহকারে আদায় করে; বরং তাদের জমা'আতই মকরূহ। [দুররুল মুখতার ও অন্যান্য কিতাব]

মাসআলাঃ জুমু'আর দিন শিশু, অন্ধ ও ওযূবিহীন ব্যক্তির আযান শুদ্ধ। [দুররুল মুখতার]

মাসআলাঃ তবে ওযুবিহীন অবস্থায় আযান দেওয়া মকরূহ। [মারাক্বিল ফালাহ্]

মাসআলাঃ আযান তিনিই দেবেন, যিনি নামাযের ওয়াক্তসমূহ সনাক্ত করতে পারেন এবং যে ওয়াক্ত সনাক্ত করতে পারে না, সে মুআয্যিনের সাওয়াব পাবার উপযোগী নয়। [বাযযাযিয়া, আলমগীরী, গুনিয়া, ক্বাযীখান]

মাসআলাঃ যদি মুআয্যিনই ইমাম হয়ে থাকেন, তাহলে উত্তম। [আলমগীরী]

মাসআলাঃ আযানের মাঝখানে কথাবার্তা বলা নিষেধ। যদি কথা বলে ফেলে, তাহলে পুনরায় শুরু থেকে আযান দেবে। [সগীরী]

মাসআলাঃ আযানে গানের মত সুর করা অর্থাৎ গানের মতো আযান দেয়া, اَللّٰـهُ -এ 'আল্লাহ' শব্দের প্রথম অক্ষরকে টেনে 'আ-ল্লাহু' বলা বা আকবরের প্রথম اَكْبَـرُ অক্ষর আলিফকে টেনে 'আ-কবর বলা অথবা اَكْبَــرُ আকবর শব্দের 'বা'কে টেনে 'আকবা-র' বলা হারাম। শুদ্ধভাবে ভাল ও উচ্চ শব্দে আযান দেয়া উত্তম। [হিন্দিয়া, দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার]

মাসআলাঃ যদি আযান নিম্নস্বরে হয়ে থাকে, তাহলে পুনরায় আযান দেবে এবং এ ক্ষেত্রে প্রথম জাম'আত উৎকৃষ্ট জাম'আত নয়। [ক্বাযী খান]

মাসআলাঃ আযান মিনারে বা মসজিদের বাইরে দিতে হবে। মসজিদের অভ্যন্তরে যেন আযান দেয়া না হয়। [খুলাসা, আলমগীরী ও ক্বাযী খান]

আযানের জবাব

আযান শুনলে এর জবাব দেয়া চাই। অর্থাৎ মুআয্যিন যে বাক্য বলবে সেটা শুনার পর শ্রোতাও ওই বাক্য বলবে। তবে حَیَّ عَلَى الصَّلٰوةِ (হাইয়্যা আলাস সালাহ) ও حَیَّ عَلَى الْفَلَاحِ (হাইয়্যা আলাল ফালাহ)-এর জবাবে لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ (লা-হাওলা ওয়ালা- কুওয়াতা ইল্লা-বিল্লা-হ) বলবে। কিন্তু, উভয়টা বলা উত্তম; বরং সম্ভব হলে এটাও বলবে مَا شَآءَ اللّٰـهُ كَانَ وَمَالَمْ یَشَأْ لَمْ یَكُنْ (মা- শা- আল্লা-হু কানা ওয়ামা- লাম ইয়াশ' লাম ইয়াকুন।) [রুদ্দুল মুহতার, আলমগীরী]

মাসআলাঃ اَلصَّلٰوةُ خَیْرٌ مِّنَ النَّوْمِ (আস্‌সালাতু খায়রুম মিনান্ নাউম)-এর জবাবে

صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ وَبِالْحَقِّ نَطَقْتَ (সাদাক্বতা ওয়া বারারতা ওয়া বিল হাক্বক্বি নাতাক্বতা) বলবে। [দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার]

মাসআলাঃ অপবিত্র অবস্থায়ও আযানের জবাব দেয়া যাবে। হায়য ও নেফাসওয়ালী মহিলা, খুৎবা শ্রবণকারী, জানাযার নামায আদায়কারী এবং যে সহবাসে রত কিংবা শৌচাগারে আছে এমন লোক জবাব দেবে না।

মাসআলাঃ যখন আযান হয়, তখন ওই সময়ের জন্য সালাম, কালাম, সালামের জবাব ও অন্যান্য যাবতীয় কার্যাদি বন্ধ করে দেবে। এমনকি ক্বোরআন মজীদ তেলাওয়াত করার সময় আযানের আওয়াজ পৌঁছলে তেলাওয়াত বন্ধ করে দেবে এবং মনযোগ সহকারে আযান শুনবে ও জবাব দেবে। ইক্বামতেও অনুরূপ করবে। [দুররুল মুখতার, আলমগীরী]

যে আযানের সময় কথাবার্তায় মশগুল থাকে, তার জন্য মা'আ-যাল্লা জীবনের মন্দ পরিসমাপ্তি হওয়ার ভয় আছে। [ফাতাওয়ায়ে রেযভীয়াহ্]

মাসআলাঃ রাস্তা দিয়ে যাবার সময় আযানের আওয়াজ আসলো, আযান শেষ না হওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকবে ও আযান শুনবে এবং এর জবাব দেবে। [আলমগীরী, বাযযাযিয়া]

ইক্বামত

ইক্বামতের মাসআলাঃ ইক্বামত আযানের মত অর্থাৎ যে আহকাম আযানের জন্য বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলো ইক্বামতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অবশ্য কিছু কিছু বিষয়ে পার্থক্য আছে। যেমনঃ ইক্বামতে 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ' বলার পর দু'বার قَـــدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ (ক্বাদ ক্বামাতিস সালাহ্) বলতে হয়। ইক্বামত আযানের মত উচ্চস্বরে বলবে না বরং উপস্থিত সকলে শুনার মত বললে চলবে। ইক্বামতের বাক্যগুলো তাড়াতাড়ি বলতে হয়। মাঝখানে কোন বিরতি নেই এবং কানে হাত বা আঙ্গুল দিতেও হয় না। ফজরের ইক্বামতে اَلصَّلٰوةُ خَیْرٌ مِّنَ النَّوْمِ (আস্‌সালাতু খায়রুম মিনান্ নঊম) বলতে হয় না। আর ইক্বামত মসজিদের অভ্যন্তরেই দেয়া হয়।

মাসআলাঃ যদি ইমাম ইক্বামত বলেন, তাহলে ক্বাদ ক্বা-মাতিস্ সালাত বলার সময় আগে অগ্রসর হয়ে ইমামের জায়নামাযে চলে যাবেন। [দুররুল মুখতার, রুদ্দুল মুহতার, গুনিয়া, আলমগীরী ইত্যাদি]

মাসআলাঃ ইক্বামতের সময়ও হাইয়্যা আলাস্ সালাহ ও হাইয়া আলাল ফালাহ্ বলার সময় ডান দিকেও বামদিকে মুখ ফেরাবে। [দুররুল মুখতার]

মাসআলাঃ ইক্বামতের সময় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করা মাকরূহ; বরং বসে যাবে। যখন 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ' বলবে তখন দাঁড়িয়ে যাবে। অনুরূপ যে সব লোক আগে থেকে মসজিদে মওজুদ থাকে, তাঁরাও বসে থাকবে। যখন মুকাব্বির 'হাইয়্যা

আলাল ফালাহ্' বলবেন, তখন দাঁড়াবে। ইমামের জন্যও একই হুকুম। [আলমগীরী]

মাসআলাঃ জুমু'আর খোৎবা সমাপ্ত করার পর ইক্বামতের সময় ইমাম জায়নামাযের উপর দাঁড়িয়ে থাকা উত্তম। অবশ্য বসাও জায়েয। বলাবাহুল্য, মুসাল্লীগণ বসে থাকবে এবং মুআয্যিন 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ্' বললে দাঁড়াবে। আজকাল এটা অনেক জায়গায় ইমাম জায়নামাযের উপর না দাঁড়ালে ইক্বামত দেয়া হয় না। এটা সুন্নাতের বিপরীত।

মাসআলাঃ আযান কিংবা ইক্বামতের মাঝখানে কথা বলা নাজায়েয। যদি মুআয্যিন বা মুক্বাব্বিরকে কেউ সালাম করে, তাহলে এর জবাব দেবে না এবং শেষ হবার পরও জবাব দেয়া ওয়াজিব নয়। [আলমগীরী]

মাসআলাঃ ইক্বামতের জবাব মুস্তাহাব। এর জবাবও আযানের জবাবের মত। শুধু এতটুকু পার্থক্য রয়েছে যে, قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ (ক্বাদ ক্বা-মাতিস্ সালাত)-এর জবাবে اَقَامَهَا اللّٰهُ وَاَدَامَهَا مَادَامَتِ السَّمٰوَاتُ وَالْاَرْضُ (আক্বা-মাহাল্লা-হু ওয়া আদা-মাহা, মা-দা-মাতিস্ সামা-ওয়া-তু ওয়াল আরদ্বু) বলবে। [আলমগীরী]

অথবা اَقَامَهَا اللّٰهُ وَاَدَامَهَا وَجَعَلَنَا مِنْ صَالِحِي اَهْلِهَا اَحْيَاءً وَّ اَمْوَاتًا (আক্বা-মাহাল্লা-হু ওয়া আদা-মাহা-ওয়া জা'আলানা-মিন সা-লিহী আহলিহা আহ্ইয়া-আওঁ ওয়া আম-ওয়া-তা-) বলবে। [বাহারে শরীয়ত]

মাসআলাঃ যদি আযান দেয়ার সময় জবাব দেয়া না হয়, তাহলে বেশী দেরী না হলে পরক্ষণে জবাব দিয়ে দেবে। [দুররুল মুখতার]

মাসআলাঃ মুখে উচ্চারণ করে খুৎবার আযানের জবাব দেয়া মুক্বতাদীদের জন্য জায়েয নয়। [দুররুল মুখতার]

মাসআলাঃ আযান ও ইক্বামতের মাঝখানে বিরতি দেওয়া সুন্নাত। আযান দেয়ার সাথে সাথে ইক্বামত বলা মাকরূহ। মাগরিবের সময় বিরতি যেন তিনটি ছোট আয়াত বা একটি বড় আয়াত পড়ার বরাবর হয়। আর অন্যান্য নামাযে আযান ও ইক্বামতের মাঝখানে ততক্ষণ পর্যন্ত যেন অপেক্ষা করে, যাতে জামা'আতের পাবন্দ লোকেরা এসে যায়; কিন্তু মাকরূহ সময় এসে যাওয়া পর্যন্ত দেরী করা যাবে না।

---<>---

নামাযের বিবরণ

ইসলামের পাঁচটি মূল স্তম্ভঃ কলেমা (ঈমান), নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাত। নামায অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনগণকে সর্বপ্রথম নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন।

শিশুর বয়স যখন সাত বছর হবে, তখন তাকে নামায পড়ার জন্য শিক্ষা ও নির্দেশ দিতে হবে। সে যখন দশ বছরে পদার্পণ করবে, তখন তাকে নামায পড়তে বাধ্য করতে হবে। না পড়লে প্রহার/ শাসনের মাধ্যমে নামায পড়াতে হবে।

নামাযের ফযীলত

নামায ইসলাম ধর্মের একটি স্তম্ভ। যে নামায ক্বায়েম করে সে তার ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করে। যে নামায বর্জন করে, সে ধর্মকে বরবাদ করে দেয়। [আল হাদীস]

হযরত রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামায এবং এক জুমু'আহ্ থেকে অন্য জুমু'আহ্ এবং রমযান শরীফের রোযা পরবর্তী রমযান পর্যন্ত সব গুনাহ্ নিশ্চিহ্ন করে দেয়। [সহীহ মুসলিম]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমি রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম, এয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় ইবাদত কি? তিনি উত্তরে বললেন, ওয়াক্ত অনুযায়ী নামায পড়া। [বুখারী ও মুসলিম শরীফ]

হযরত আবূ যার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, একদা শীতকালে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বাইরে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। তিনি গাছের দু'টি ডাল হাতে নিলেন। উক্ত ডাল দু'টি থেকে পাতা ঝড়ে পড়ছিলো। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, "আবূ যার! যে বান্দা আল্লাহর ওয়াস্তে নামায পড়ে, তার গুনাহসমূহ এভাবে ঝরে যায়, যেভাবে এ দু'টি ডাল থেকে পাতা ঝরছে।"

হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি নিজ ঘরে ওযূ করে ফরয আদায় করার জন্য মসজিদে গমন করে, তার প্রতিটি পদক্ষেপে এক একটা গুনাহ মাফ হয় এবং তার এক একটা মর্তবা বুলন্দ হয়।" [মুসলিম শরীফ]

হযরত আবূ উমামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহর বান্দা যখন নামায পড়ার জন্য দণ্ডায়মান হয়, তখন তার জন্য বেহেশতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। তাঁর এবং আল্লাহ তা'আলার মাঝখানে পর্দাসমূহ সরিয়ে ফেলা হয়। বেহেশতের রূপসী হুর তাঁর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে।" [তাবরানী]

যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন পর্যন্ত ফজর ও এশার নামায জামা'আত সহকারে আদায়

করবেন, আল্লাহ পাক তাঁকে দোযখের আগুন ও মুনাফেক্বী থেকে নাজাত দেবেন।

হাদীস শরীফে আছে, হযরত আবূ সা'ঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ছেড়ে দেয়, জাহান্নামের দরজায় তার নাম লিখে দেওয়া হয়।

বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারূক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বিভিন্ন প্রদেশের গভর্ণরদের নিকট নির্দেশ পাঠালেন, আমার কাছে তোমাদের সব কাজ থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো ওয়াকৃত অনুসারে নামায পড়া। যে নামায ঠিকমত আদায় করেছে, সে তার ধর্মকে রক্ষা করেছে, আর "যে ব্যক্তি নামায বাদ দেয় (ওয়াক্বত্ অনুসারে সম্পন্ন কর না) সে অন্যান্য কর্তব্য কাজ তো অবশ্যই বরবাদ করে দেবে।"

হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "হে আমার সাহাবীগণ! তোমরা বলো, যদি তোমাদের কারো বাড়ীর আঙ্গিনায় একটি পুকুর থাকে, যদি সে প্রত্যেহ ওই পুকুরে পাঁচবার করে গোসল করে, তবে তার শরীরে কোনরূপ ময়লা থাকতে পারে কি?" তদুত্তরে সাহাবীগণ বললেন-"না, থাকতেই পারে না।" হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা হচ্ছে পাঁচ ওয়াক্বত্ নামাযের দৃষ্টান্ত। ওই নামাযগুলো দ্বারা আল্লাহ পাক তোমাদের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেবেন।

নামাযের ওয়াক্ব্তসমূহ

দৈনিক পাঁচবার নামায পড়া ফরয। এ নামাযের জন্য শরীয়তের নির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত আছেঃ ১. ফজর, ২. যোহর, ৩. আসর, ৪. মাগরিব ও ৫. এশা।

ফজরের নামাযের ওয়াক্ব্ত

সুবহে সাদেক্ব থেকে শুরু করে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত ফজরের নামাযের সময়। সুবহে সাদেক হচ্ছে এমন এক প্রকার আলো, যা সূর্য উদিত হওয়ার আগে পূর্ব আকাশের কিনারায় প্রকাশ পায় এবং ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। শেষ পর্যন্ত আকাশের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং চারদিক উজ্জ্বল হয়ে যায়।

যোহরের নামাযের ওয়াক্ব্ত

দ্বি-প্রহরে সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে প্রত্যেক জিনিষের ছায়ামূল ব্যতীত দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত। অর্থাৎ ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় কোন জিনিসের ছায়া যদি চার আঙ্গুল পরিমাণ থাকে, আর জিনিষটি হলো আট আঙ্গুল পরিমাণ লম্বা, তাহলে ওই জিনিসটার ছায়া যখন সর্বমোট বিশ আঙ্গুল পরিমাণ দীর্ঘ হবে, তখন যোহরের নামাযের ওয়াক্ব্ত

শেষ হয়ে যাবে। উল্লেখ্য যে, জুমু'আর নামাযের ওয়াক্ব্ত হচ্ছে যোহরের নামাযের ওয়াক্ব্তের অনুরূপ।

আসরের নামাযের ওয়াক্ব্ত

যোহরের ওয়াক্ত শেষ হবার সাথে সাথে আসর নামাযের ওয়াকৃত শুরু হয় এবং সূর্য সম্পূর্ণ অস্ত যাওয়া পর্যন্ত স্থায়ী হয়। সূর্য অস্ত যাওয়ার বিশ মিনিট পূর্ব থেকে আসরের নামায পড়া মাকরূহ।

মাগরিবের নামাযের ওয়াক্ব্ত

মাগরিবের ওয়াক্ব্ত হচ্ছে সূর্য ডুবার পর থেকে পশ্চিম আকাশের সাদা আভা চলে যাওয়া পর্যন্ত। সাদা আভাটা লালিমা বিলুপ্ত হওয়ার পর পশ্চিমাকাশে সুবহে সাদেকের সাদা আভার মত উত্তর দক্ষিণে বিস্তার লাভ করে।

এশার নামাযের ওয়াক্ব্ত

মাগরিবের পর থেকে সুবহে সাদেক্বের পূর্ব পর্যন্ত এশার নামাযের ওয়াক্ব্ত বলবৎ থাকে। তবে মধ্য রাত্রির পূর্ব পর্যন্ত সময়ে এশার নামায পড়ে নেয়া উত্তম। বিত্‌রের নামায এশার নামাযের পরে পড়তে হয়; পূর্বে নয়।

যেসব সময়ে নামায পড়া নিষেধ

সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও ঠিক দুপুর-এ তিন সময়ে ফরয, ওয়াজিব, নফল, ক্বাযা নামায পড়া এবং তিলাওয়াতে সাজদা করা জায়েয নয়। যদি আসরের নামায না পড়ে থাকে, তবে ওই দিনের আসরের নামায সূর্যাস্তের সময় পড়তে পারবে; কিন্তু এতটুকু দেরী করা হারাম; ওই সময়ে আদায়কৃত ওইদিনের আসরের নামাযও মাকরূহ।

মাসআলাঃ জানাযা যদি নিষিদ্ধ সময়ে আনা হয়, তাহলে ওই সময় জানাযার নামায পড়ে নেয়া মাকরূহ নয়। তবে জানাযা যদি আগে থেকেই মজুদ ছিলো এবং দেরী করার কারণে মকরূহ সময় হয়ে গেলো, ওই অবস্থায় জানাযার নামায পড়া মকরূহ।

মাসআলাঃ উপরোক্ত তিন ওয়াক্তে তিলাওয়াতে ক্বোরআন মজীদ ভাল নয়। যিক্‌র ও দরূদ শরীফ পাঠে নিয়োজিত থাকা উত্তম।

মাসআলাঃ বারটি নির্দিষ্ট সময়ে নফল নামায পড়া নিষেধঃ

১. সুবহে সাদেক্ব থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত ফজরের দু'রাকাত সুন্নাত ব্যতীত অন্য কোন নফল নামায পড়া জায়েয নয়।

২. জামা'আতের ইক্বামত থেকে জাম'আত শেষ হওয়া পর্যন্ত নফল ও সুন্নাত পড়া মকরূহ তাহরীমী। অবশ্য যদি ফজরের জাম'আত শুরু হয় এবং এটা অনুমিত

হয় যে, সুন্নাত পড়ার পরও জামা'আত পাওয়া যাবে তখন জামা'আত থেকে পৃথক জায়গায় সুন্নাত পড়ে যেন জামা'আতে শরীক হয়। আর যদি এটা অনুমিত হয় যে, সুন্নাত পড়তে গেলে জামা'আত মিলবেনা, তাহলে সুন্নাত ত্যাগ করে জামা'আতে শরীক হবে এবং সূর্যোদয়ের পর সুন্নাত আদায় করবে।

ফজর ব্যতীত অন্য নামাযসমূহে জামা'আত পাওয়ার দৃঢ় ধারণা থাকলেও ইক্বামত হয়ে যাবার পর সুন্নাত পড়া না-জায়েয।

৩. আসরের নামাযের পর সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত নফল নামায পড়া নিষেধ।

৪. সূর্য ডুবার পর থেকে মাগরিবের ফরয পড়া পর্যন্ত নফল নামায পড়া জায়েয নয়।

৫. যখন ইমাম জুমু'আর খুতবা দেয়ার জন্য দাঁড়ান, তখন থেকে জুমু'আর ফরয নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত নফল নামায পড়া নিষেধ।

৬. ঠিক খুৎবা দেয়ার সময়, সেটা প্রথম খুৎবা হোক কিংবা দ্বিতীয় খুৎবা হোক, অথবা ঈদের খুৎবা হোক কিংবা সূর্য গ্রহণ, ইসতিসক্বা, হজ্ব ও বিবাহের খুৎবা হোক, কোন নামায এমনকি ক্বাযাও জায়েয নয়। কিন্তু 'সাহেবে তারতীব' অর্থাৎ নিয়মিত নামায আদায়কারীর জন্য খুৎবার সময় ক্বাযা নামায পড়ার অনুমতি রয়েছে।

মাসআলাঃ কেউ জুমু'আর সুন্নাত শুরু করার পর ইমাম খুৎবা দেয়ার জন্য স্বীয় জায়গা থেকে উঠলেন, তাহলে সে যেন চার রাকা'আত পূর্ণ করে।

৭. উভয় ঈদের নামাযের আগে নফল নামায পড়া মাকরূহ। ঘরে হোক কিংবা ঈদাগাহে হোক, অথবা হোক মসজিদে। [আলমগীরী, দুররুল মোখতার]

৮. ঈদের নামাযের পরও নফল নামায মাকরূহ, ঈদগাহে হোক বা মসজিদে। তবে ঘরে পড়লে মাকরূহ নয়। [আলমগীরী, দুররুল মোখতার]

৯. আরাফাতের ময়দানে যোহর ও আসর মসজিদে নামরায় ইমামের সাথে পড়লে এক সাথে পড়তে হয়। তখন এর মাঝখানে কিংবা পরে নফল ও সুন্নাত পড়া মাকরূহ।

১০. মুযদালিফাতেও যে মাগরিব ও এশা এক সাথে পড়া হয়, এর মাঝখানে নফল ও সুন্নাত পড়া মাকরূহ। কিন্তু পরে পড়লে মাকরূহ নয়। [আলমগীরী, দুররুল মোখতার]

১১. যা দ্বারা মনের মধ্যে অস্বস্তি সৃষ্টি হয় এবং তা দূর করা সম্ভব হওয়া সত্ত্বেও দূর না করে, তখন যে কোন নামায পড়া মাকরূহ। যেমন প্রস্রাব, পায়খানা বা বায়ূর হাজত হওয়া অবস্থায় নামায পড়া মাকরূহ। অবশ্য যদি সময় না থাকার কারণে এমতাবস্থায়ও পড়ে নেয়, তবে তা পরে দ্বিতীয়বার পড়বে। অনুরূপ, খাবার সামনে আনা হলো এবং খাওয়ার আগ্রহ সৃষ্টি হলো, অথবা অন্য কোন এমন বিষয়ের সম্মুখীন হলো, যেটা সমাধা না হলে মনে স্বস্তিবোধ আসে না এবং নামাযের মধ্যে একাগ্রতা সৃষ্টি হয় না, এমতাবস্থায় নামায পড়া মাকরূহ।

[দুররুল মোখতার ইত্যাদি]

নামাযের পূর্বশর্তসমূহ

নামায শুরুর পূর্বে ৭টি ফরয কাজ সম্পন্ন করতে হয়। সেগুলো হচ্ছে ঃ

১. শরীর পাক করা, ২. কাপড় পাক করা, ৩. নামাযের স্থান পাক হওয়া, ৪. সতর আবৃত রাখা, ৫. ক্বেবলামুখী হওয়া এবং ৬. নিয়্যত করা। এগুলো সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলোঃ

১. শরীর পাক করা ঃ ওযূর প্রয়োজন হলে ওযূ করতে হবে। গোসলের প্রয়োজন হলে গোসল সেরে নিতে হবে। শরীয়ত সম্মত কারণে ওযূ ও গোসল করতে সক্ষম না হলে তায়াম্মুম করে নিতে হবে। ওযূ, গোসল এবং তায়াম্মুম সম্পর্কে ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। এ সম্পর্কে আরো কয়েকটি জরুরী বিষয় জেনে রাখা উচিত। যেমন-

ক. অনেকের শরীর দুর্বল। রাতে গোসল করলে তদের সর্দি কাশি বা অন্যকোন ধরনের শারীরিক ক্ষতি হয়। এ ধরনের কেউ কেউ সহবাসজনিত বা অন্য কোনো কারণে নাপাক হলে অসুস্থতার ভয়ে গোসল করে না এবং ফজরের নামায ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দেয়। আর দিনের বেলায় গোসল করে নামাযের ক্বাযা করে এটা উচিত নয়। আল্লাহকে ভয় করা উচিত। জানা উচিত ওযরবশতঃ তায়াম্মুম ওযূ ও গোসলের স্থলাভিষিক্ত। এমতাবস্থায় তায়াম্মুম করে নামায পড়ে নেয়া উচিত। নামায ছেড়ে দেয়া উচিৎ নয়।

খ. অপরাগ অবস্থায় শুধু গোসলের ফরযগুলি আদায় করে গোসল করা যাবে। যেমন একবার গরগরা করে কুল্লি করে নাকে ভালোভাবে পানি দিয়ে শরীরের প্রতিটি লোম সম্পূর্ণরূপে ভিজে যায় এমনভাবে সারা শরীরে একবার পানি বইয়ে নিলেই গোসল হয়ে যাবে। গোসলের পরে পুনরায় ওযূ করার দরকার নেই। তবে এমন করা মাকরূহ।

গ. যদি শরীরের অর্ধেক ধু'লে ক্ষতি হয়, তবে তায়াম্মুম করতে হবে।

ঘ. গোসলের সময় মেয়েদের জন্য চুলের বেনী খোলার প্রয়োজন নেই। চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছলেই যথেষ্ট হবে।

ঙ. ফোঁড়া কিংবা কোনো ক্ষতের কারণে শরীরের কোন অংশে পট্টি বা ব্যান্ডেজ বাঁধা থাকলে ওই স্থানের উপর ভেজা হাতে মসেহ্ করে নিতে হবে।

চ. যে ব্যক্তির এমন কোনো রোগ আছে, যে রোগের কারণে তার ওযূ রাখা সম্ভব হয় না, যেমন প্রমেহ রোগের কারণে ফোঁটা ফোঁটা বীর্য নির্গত হওয়া ইত্যাদি অথবা বহুমূত্র রোগের কারণে অনিচ্ছা সত্ত্বেও যার ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব নির্গত হয় কিংবা এ জাতীয় অন্য যে কোন রোগ থাকলে ওই ব্যক্তিকে প্রতি ওয়াক্বতের নামাযের আগে তাজা ওযূ করে ওই অবস্থায়ই নামায পড়ে নিতে

হবে। ওই নামাযের ওয়াক্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার ওযূ থাকবে। আর যতক্ষণ তার ওই রোগ থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার পরিধানের ওই কাপড়সহ সে নামায পড়তে পারবে। এই সব নিয়ম না জানার কারণে কোন কোন উপরোক্ত রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি নামায ছেড়ে দেয় এবং বলে, ‟আমার ওযূ থাকে না। আমি নামায পড়বো কিভাবে?” শরীয়তের হুকুম অনুযায়ী এরকম অবস্থায়ও নামায পড়া যাবে। একথা জানার পরও দ্বিধা সন্দেহে লিপ্ত হওয়া চরম মুর্খতা ছাড়া আর কিছু নয়।

২. **কাপড় পাক রাখাঃ** নামায পড়তে চাইলে কাপড় পাক রাখতেই হবে। কাপড় পাক করার মাসায়েল ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। এ সম্পর্কে আরো কিছু কথা জেনে নেয়া ভালো। যেমন-

ক. এক দিরহামের বেশী পরিমাণ নাপাকী সঙ্গে থাকলে তার নামায হবে না।

খ. রাস্তঘাটের পানি ও কাদার ছিটকে কাপড়ে লাগলে কাপড় নাপাক হবে না।

গ. সাধারণ বৃষ্টির পানি পাক।

৩. **নামাযের স্থান পাক হওয়াঃ** নামাযের জায়গা পাক হতে হবে। নামাযীর পা রাখবার স্থান পাক হওয়া সর্বসম্মতভাবে ফরয। সাজদার স্থানও পাক থাকা ফরয। সাজদারত অবস্থায় দু' হাত, দু' হাঁটু এবং বগল ও বুকের মাঝখানের স্থানও পাক হওয়া জরুরী।

এ সম্পর্কে আরো দু'/একটি কথা জেনে রাখা প্রয়োজন। যেমন-

ক. নাপাক স্থানে পাতলা কাপড় বিছিয়ে নামায পড়লে যদি কাপড়ের নিচের স্থান দৃষ্টিগোচর হয়, তবে এ অবস্থায় নামায হবে না।

খ. অবশ্য ওই স্থানের উপর শক্ত মোটা কাপড় বা মোটা জায়নামায বিছিয়ে নামায পড়লে নামায বিশুদ্ধ হয়ে যাবে।

গ. কোনো কাপড়ের অর্ধেক পাক আর অর্ধেক নাপাক হলে কাপড়টি ভাঁজ করে পাক অংশ উপরে রেখে নামায পড়তে হবে।

৪. **সতর ঢেকে রাখাঃ** যে সমস্ত অঙ্গ ঢেকে রাখা ফরয নামাযের মধ্যে সেগুলি ঢেকে রাখতে হবে। পুরুষদের জন্য নাভির নিচে থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে রাখা ফরয। আর স্ত্রীলোকের জন্য মুখমণ্ডল, দু' হাতের কব্জি এবং দুই পায়ের গোড়ালী ছাড়া সমগ্র শরীর ঢেকে রাখা ফরয।

এ সম্পর্কে আরো কিছু নিয়ম কানুন জেনে রাখা একান্ত জরুরীঃ

ক. কোনো স্ত্রী লোক যদি এতো পাতলা আঁচল বা ওড়না দিয়ে মস্তক আবৃত করে যাতে করে মাথার চুলের এক চতুর্থাংশ দেখা যায়-তবে তার নামায হবে না।

খ. স্ত্রীলোকের নামাযে হাতের কব্জির উপরের অংশ খোলা থাকলে নামায হবে না। প্রকৃত কথা এ যে, স্ত্রীলোকদের যে সমস্ত অঙ্গ ঢেকে রাখা ফরয, ওই সমস্ত

অঙ্গের কোনটার চার ভাগের এক ভাগ নামাযের মধ্যে অনাবৃত হলেই নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে।

গ. এ অবস্থায় মেয়েদেরকে মোটা চাদর দিয়ে সমস্ত শরীর আবৃত করে নিয়ে নামায পড়তে হবে।

ঘ. অপরের দৃষ্টি থেকে নিজের গুপ্তস্থান ঢেকে রাখা ফরয। নিজে দেখতে নিষেধ নেই। নামায পড়ার সময় যদি নিজের গুপ্তস্থান দেখে ফেলে, তবুও তার নামায হয়ে যাবে; কিন্তু মাকরূহ তাহরীমী হবে। আর অন্য কেউ তার গুপ্ত স্থান দেখে ফেললে তার নিজের নামায হবে না।

৫. **ক্বেবলামুখী হয়ে দাঁড়ানোঃ** কা'বা শরীফ যেদিকে, সেদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে হবে। এ সম্পর্কে আরো কিছু কথাও জানার আছে। যেমন-

ক. কেউ কোনো নতুন জায়গায় উপস্থিত হলে অথবা দূরের পথ পাড়ি দিতে কোনো যানবাহনে থাকা অবস্থায় নামাযের সময় কেবলা কোন্ দিকে তা স্থির করতে না পারলে, কাছে উপস্থিত কাউকে জিজ্ঞেস করে কেবলা সম্পর্কে তাকে জেনে নিতে হবে।

খ. জিজ্ঞাসা করার লোক না পাওয়া গেলে মনে মনে ক্বেবলা সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে। তারপর যেদিকে কা'বা শরীফ আছে বলে মনে দৃঢ় বিশ্বাস হয় সেদিকে মুখ ফিরিয়েই নামায পড়ে নিতে হবে। নামাযের পর যদি জানতে পারে যে, যেদিকে মুখ করে সে নামায পড়েছে সেদিকে ক্বেবলা ছিলো না, তবুও তার নামায হয়ে যাবে। পুনরায় তাকে সঠিক ক্বেবলামুখী হয়ে নামায পড়তে হবে না।

গ. মনে মনে চিন্তা না করেই যদি কেউ কোন একদিকে মুখ করে নামায পড়ে নেয়, তবে তার নামায হবে না, যদিও পরে জানা যায় যে, তার ক্বেবলা ঠিকই ছিলো। কারণ, কেবলা না জানা থাকলে মনে মনে চিন্তা করে ক্বেবলা ঠিক করাই শরীয়তের নিয়ম।

৬. **নিয়্যত করাঃ** নিয়্যত করা মানে সংকল্প স্থির করা। কোন্ ওয়াক্তের কোন্ নামায পড়া হচ্ছে সে সম্পর্কে মনস্থির করতে হবে। যেমন কেউ যদি মনে মনে খেয়াল করে- আমি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে যোহরের নামায বা আসরের নামায পড়ছি তবুও তার নিয়্যত করা হয়ে যাবে। মনে মনে নিয়্যত করা ফরয। মুখে নিয়্যত উচ্চারণ করা ফরয নয়; মুস্তাহাব।

এ সম্পর্কে আরো কিছু কথা জেনে নেয়া প্রয়োজন। যেমন-

ক. সুন্নত, নফল এবং তারাবীর নামাযে 'আল্লাহর ওয়াস্তে নামায পড়ছি'- এরকম খেয়াল করে নামায শুরু করলেই নামায হয়ে যাবে। সুন্নাত, নফল অথবা তারাবীহ্ নির্দিষ্ট করে না বললেও চলবে।

খ. ফরয নামাযের বেলায় ফজর, যোহর বা আসর কোন্ ওয়াক্তের নামায পড়া

হচ্ছে তা নির্দিষ্টভাবে খেয়াল করে নিতে হবে।

গ. ইমামের জন্য ইমামতির নিয়্যত করা পূর্বশর্ত নয়। যদি কোন ব্যক্তি কোনো ওয়াক্বতের ফরয নামায পড়তে শুরু করে দেয় ওই সময় যদি অন্য কোনো নামাযী এসে তাকে অনুসরণ করে (ইক্বতেদা করে) নামাযে শরীক হয়, তবুও তার নামায হয়ে যাবে; কিন্তু মোক্বতাদীর (অনুসরণকারী) ইক্বতেদার (অনুসরণ) নিয়্যত করা পূর্বশর্ত। মোক্বতাদীকে 'এ ইমামের অনুসরণ করলাম' মর্মে খেয়াল অবশ্যই করতে হবে।

ঘ. যোহরের ওয়াক্বতের নামাযে দাঁড়িয়ে যদি কেউ ভূলবশতঃ আসরের নামায পড়ছি মর্মে মুখে উচ্চারণ করে তবুও তার যোহরের নামায হয়ে যাবে। কারণ মুখের নিয়্যত ফরয নয়। মনের নিয়্যত ফরয।

ঙ. নিয়্যতের সঙ্গে সঙ্গে তাকবীরে তাহরীমা (আল্লাহু আকবর) মুখে বলে নামায শুরু করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, ওয়াক্বত মতো নামায আদায় করা জরুরী। প্রত্যেক নামাযের জন্য নির্দিষ্ট ওয়াক্বত (সময়) আছে। ওয়াক্বত শুরু হওয়ার আগে নামায পড়লে নামায আদায় হবে না। আবার ওয়াক্বত শেষ হলে নামায 'ক্বাযা' হয়ে যাবে। প্রত্যেক নামাযের মোস্তহাব ওয়াক্বত, মকরূহ ওয়াক্বত এবং নামাযের নির্দিষ্ট সময় সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে এবং খেয়াল রাখতে হবে যেন সকল প্রকার নামায মোস্তাহাব সময়ে আদায় করা যায়। ইতোপূর্বে নামাযের ওয়াক্বত বা সময় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

---<>---

দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের বিবরণ

ফজরের নামায

ফজরের নামায ৪ রাক'আতঃ ২ রাক'আত সুন্নত এবং ২ রাক'আত ফরয।

ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাত নামাযের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا۔ اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ۔

উচ্চারণঃ নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাক্'আতাই সালাতিল্ ফাজ্‌রে। সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ শারীফাতে আল্লাহু আক্‌বর।

ফজরের দুই রাক'আত ফরয নামাজের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ۔ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ۔

উচ্চারণঃ নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাক্'আতাই সালাতিল্ ফাজ্‌রে। ফারদুল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ শারীফাতে আল্লাহু আক্‌বর।

যোহরের নামায

যোহরের নামায ১২ রাক'আতঃ ৪ রাক'আত সুন্নাত, ৪ রাক'আত ফরয, ২ রাক'আত সুন্নাত ও ২ রাক'আত নফল।

যোহরের ৪ রাক'আত সুন্নাত নামাজের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعٰتِ صَلٰوةِ الظُّهْرِ ۔ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ۔

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা আরবা'আ রাক্'আ-তে সালাতিয্ যোহরে। সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আক্‌বর।

যোহরের ৪ রাক'আত ফরয নামাযের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعٰتِ صَلٰوةِ الظُّهْرِ ۔ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ۔

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা আরবা'আ রাক্'আ-তে সালাতিয্ যোহরে। ফারদ্বুল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আক্বর।

যোহরের ২ রাক'আত সুন্নাত নামাযের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الظُّهْرِ - سُنَّةُ رَسُوْلِ لِلّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ -

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাক'আতাই সালাতিয্ যোহরে। সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আক্বর।

২ রাক'আত নফল নামাযের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ النَّفْلِ - مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণঃ নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'য়ালা রাক'আতাই সালাতিন নাফলে মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আক্বর।

আসরের নামায

আসরের নামায ৮ রাক'আত ঃ ৪ রাক'আত সুন্নাত ও ৪ রাক'আত ফরয।

আসরের ৪ রাক'আত সুন্নত নামাযের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعٰتِ صَلٰوةِ الْعَصْرِ - سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ -

উচ্চারণঃ নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা আরবা'আ রাক'আ-তে সালাতিল আসরে। সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আক্বর।

আসরের ৪ রাক'আত ফরয নামাযের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعٰتِ صَلٰوةِ الْعَصْرِ - فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ -

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা আরবা'আ রাক'আ-তে সালাতিল আসরি। ফারদ্বুল্লাহে তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আক্বর।

মাগরিবের নামায

মাগরিবের নামায ৭ রাক'আতঃ ৩ রাক'আত ফরয, ২ রাক'আত সুন্নাত এবং ২ রাক'আত নফল

মাগরিবের ৩ রাক'আত ফরয নামাযের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى ثَلٰثَ رَكْعٰتِ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ - فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ -

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা সালা-সা রাক'আ-তে সালাতিল মাগ্‌রিব। ফারদ্বুল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আক্বর।

মাগরিবের ২ রাক'আত সুন্নাত নামাযের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ - سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ -

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাক্'আতাই সালাতিল মাগ্‌রিব। সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আক্বর।

২ রাক'আত নফল নামাযের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ النَّفْلِ - مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ -

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাক'আতাই সালাতিন নাফলি মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আক্বর।

এশার নামায (বিত্‌র সহ)

এশার নামায ১৭ রাক'আতঃ ৪ রাক'আত সুন্নাত, ৪ রাক'আত ফরয, ২ রাক'আত সুন্নাত ও ২ রাক'আত নফল। ৩ রাক'আত বিত্‌র ও ২ রাক'আত শফিউল বিত্‌র (নফল)।

এশার চার রাক্'আত সুন্নাতের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعٰتِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ -

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা আরবা'আ রাক'আ-তে সালাতিল এশা। সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবর।

এশার ৪ রাক'আত ফরয নামাযের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعٰتِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ - فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ -

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা আরবা'আ রাক'আ-তে সালাতিল 'এশা। ফারদুল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবর।

এশার ২ রাক'আত সুন্নাত নামাযের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ سُنَّةُ - رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ -

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাক'আতাই সালাতিল 'এশা। সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবর।

২ রাক'আত নফল নামাযের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ النَّفْلِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ -

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাক'আতাই সালাতিন নাফলি মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবর।

বিত্র নামায

বিত্র নামায তিন রাক্'আত। এটা এশার নামাযের পর পড়তে হয় এবং সোব্হে কাযেব পর্যন্ত পড়ার সময় থাকে। বিত্র নামাযের নিয়্যত নিম্নে দেওয়া গেল-

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى ثَلٰثَ رَكْعٰتِ صَلٰوةِ الْوِتْرِ - وَاجِبُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ -

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা সালাসা রাক'আ-তে সালাতিল বিত্রি। ওয়াজিবুল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবর।

বিত্র নামাযের নিয়্যত বেঁধে প্রথম দুই রাক'আতে সূরা ফাতিহার পর যে কোন সূরা মিলাতে হয়। তারপর প্রথম বৈঠকে তাশাহুদ পড়ার পর দাঁড়িয়ে তৃতীয় রাক'আতে সূরা ফাতিহার পর 'সূরা ইখলাস' পড়ে পুনরায় 'আল্লাহু আকবর' বলে কান পর্যন্ত হাত উঠানোর পর হাত বেঁধে দো'আ কুনূত পড়তে হয়, তারপর রুকু', সাজদা করে নামায শেষ করতে হয়।

দো'আ কুনূত

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَانَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ -

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্না- নাস্তা'ঈনুকা ওয়া নাস্তাগ্ফিরুকা ওয়া নু'মিনু বিকা ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইকা ওয়া নুস্নী আলাইকাল খায়রা ওয়া নাশকুরুকা ওয়ালা নাকফুরুকা ওয়া নাখলা'উ ওয়া নাতরুকু মাঁইয়্যাফ্জুরুকা আল্লা-হুম্মা ইয়্যা-কা না'বুদু ওয়া লাকা নুসাল্লী ওয়া নাস্জুদু ওয়া ইলাইকা নাস্'আ-, ওয়া নাহ্ফিদু ওয়া নারজূ রাহ্মাতাকা ওয়া নাখ্শা- 'আযা-বাকা ইন্না আযা-বাকা বিল্ কুফ্ফা-রি মুলহিক্ব।

অর্থঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা তোমার নিকট সাহায্য চাই ও তোমারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি, তোমার উপর ঈমান রাখি, তোমার উপর নির্ভর করি, তোমার উত্তম প্রশংসা করি এবং তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। আমরা তোমার অকৃতজ্ঞ হই না এবং যারা তোমাকে মানে না আমরা তাদের থেকে পৃথক হয়ে যাই এবং তাদেরকে পরিত্যাগ করি। হে আল্লাহ! আমরা একমাত্র তোমারই এবাদত করি এবং তোমারই উদ্দেশ্যে নামায পড়ি ও সাজদা করি এবং আমরা তোমারই নৈকট্য লাভের জন্য চেষ্টা করি ও গতিশীল হই এবং আমরা তোমার রহমতের আশা রাখি ও তোমার আযাবকে ভয় করি। নিশ্চয় তোমার আযাব কাফিরদেরকে ঘিরে ধরবে।

২ রাক'আত শাফী'উল বিত্র নামাযের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ شَفِيْعِ الْوِتْرِ نَفْلاً مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ -

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাক্'আতাই সালাতিল শফি'ইল বিত্রি নফলান্ মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবর।

মেয়েলোক ও পুরুষের নামাযের মধ্যে পার্থক্য

মেয়েলোক ও পুরুষের নামাযের মধ্যে পার্থক্য এ যে, তাকবীরে তাহরীমার সময় পুরুষেরা আস্তিন ও চাদর থেকে হাত বের করে আর মেয়েরা হাত বের না করে উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত আর পুরুষ কান পর্যন্ত উঠিয়ে তাকবীরে তাহরীমা বলবে। তারপর পুরুষ নাভীর নিচে আর মেয়েরা বুকের উপর হাত বাঁধবে। পুরুষরা বাম হাতের কব্জিকে ডান হাতের বৃদ্ধা ও কনিষ্ঠা আঙ্গুল দ্বারা শক্তভাবে ধরবে, ডান হাতের বাকী আঙ্গুল তিনটি ডান হাতের উপর থাকবে। আর মেয়েরা শুধু বাম হাতের উপর ডান হাত রাখবে। পুরুষরা রুকু'তে মাথা পিঠ ও কোমর বরাবর রেখে হাটু ধরবে, হাতের আঙ্গুলগুলো ফাঁকা রেখে আর হাঁটু সম্মুখে না ঝুলিয়ে, মেয়েরা হাঁটু পর্যন্ত হাত যায় এমননিভাবে হাঁটু সম্মুখে ঝুঁকাবে এবং আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে রাখবে । সাজদায় পুরুষেরা উরু হতে পেট এবং বগল, হাত ও কুনুই যমীন হতে আলাদা রাখবে, মেয়েরা রানের সাথে পেট বগলের সাথে বাহু একত্রে এবং কুনুই যমীনে মিলিয়ে রাখবে। পুরুষেরা দুই পায়ের আঙ্গুলী ক্বেবলা মুখী করে পা খাড়া করে আর মেয়েরে দুই পা ডানে বিছিয়ে রাখবে। বসতে পুরুষেরা ডান পা খাড়া রেখে বাম পা ডানে বিছিয়ে সেটার উপর বসবে। আর মেয়েরা দুই পা ডানে বিছিয়ে উরু দিয়ে যমীনে বসবে। মেয়েরা পূর্ণ নামাযের সূরা ক্বির'আতে তাকবীর, সানা, তাসবীহ্, দো'আ, দুরূদ ইত্যাদি সর্বদা চুপে চুপে পড়বে।

জুমু'আর নামায

শুক্রবার যোহরের পরিবর্তে মসজিদে গিয়ে ২ রাক'আত ফরয নামায জাম'আত সহকারে আদায় করতে হয়; এটাই জুমু'আর নামায। শুক্রবার জুমু'আর নামাযের আযান হলে সাংসারিক সমস্ত কাজ কর্ম নিষিদ্ধ হয়ে যায় এবং জুমু'আর নামাযের জন্য প্রস্তুত হতে হয়।

জুমু'আর নিম্নলিখিত নামাযগুলো সম্পন্ন করা হয়

তাহিয়্যাতুল ওযূ-২ রাক্'আত, দুখূলুল মসজিদ-২ রাক্'আত, ক্বাব্লাল জুমু'আহ-৪ রাক্'আত, ফরয নামায-২ রাক্'আত, বা'দাল জুমু'আহ্-৪ রাক্'আত, সালাতুল ওয়াক্ত-২ রাক্'আত, এবং নফল-২ রাক্'আত। সর্বমোট ১৮ রাক'আত ।

তাহিয়্যাতুল ওযূ ২ রাক্'আত

নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ تَحِيَّةِ الْوُضُوْءِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণঃ নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাক'আতাই সালাতি তাহিয়্যাতিল ওযূ। সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল্ কাবাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবর।

তারপর ২ রাক'আত দুখূলুল মস্জিদ

নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ دُخُوْلِ الْمَسْجِدِ ـ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাক্'আতাই সালাতে দুখূলিল্ মসজিদ। সুন্নাতু রাসূলিল্লাহে তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল্ কাবাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবর।

তারপর ৪ রাক'আত ক্বাবলাল জুমু'আহ্

নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعٰتِ صَلٰوةِ قَبْلِ الْجُمُعَةِ ـ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা আর্বা'আ রাক্'আ-তে সালাতে ক্বাবলিল জুমু'আতি। সুন্নাতু রাসূলিল্লাহে তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবর।

এরপর ইমাম দু'টি খুৎবা পড়বেন এরপর জামা'আতের সাথে দুই রাক'আত ফরয নামায আদায় করবেন। খুৎবা শ্রবণ করা ওয়াজিব, সুতরাং খুৎবা আরম্ভ হলে যে কোন প্রকার নামায পড়া নিষেধ।

ফরয নামায ২ রাক্'আত

নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُسْقِطَ عَنْ ذِمَّتِىْ فَرْضَ الظُّهْرِ بِاَدَاءِ رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْجُمُعَةِ ـ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى اِقْتَدَيْتُ بِهٰذَا الْاِمَامِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণঃ নাওয়াইতু আন্ উসক্বিতা 'আন্ যিম্মাতী ফারদ্বায্ যোহরে বিআদা-ই রাক'আতাই সালাতিল জুমু'আতি। ফারদ্বুল্লাহি তা'আলা, ইক্ব্তাদাইতু বিহা-যাল্ ইমাম, মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবর।

ফরয নামাযের পর ৪ রাক‘আত বা’দাল জুমু‘আহ্ পড়তে হয়

নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعٰتِ صَلٰوةِ بَعْدِ الْجُمُعَةِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণঃ নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা‘আলা আর্বা‘আ রাক্‘আ-তে সালাতে বা’দিল জুমু‘আতি। সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তা‘আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা’বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবর।

তারপর দু’রাক‘আত সালাতুল ওয়াক্বতের নামায

নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْوَقْتِ ـ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা‘আলা রাক্‘আতাই সালাতিল্ ওয়াক্বতে। সুন্নাতু রাসূলিল্লাহে তা‘আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবর।

তারপর ২ রাক‘আত নফল নামায পড়ে নামায শেষ করবে। এটার নিয়্যত ও নিয়ম যোহরের নফল নামাযের অনুরূপ।

জুমু‘আর প্রথম খোৎবা

[কৃত, আ’লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা রহমাতুল্লাহি আলায়হি]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْخُطْبَةُ الْاُوْلٰى

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ فَضَّلَ سَيِّدَنَا مَوْلٰنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ جَمِيْعًا وَاَقَامَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلْمُذْنِبِيْنَ الْمُتَلَوِّثِيْنَ الْخَطَّائِيْنَ الْهٰلِكِيْنَ شَفِيْعًا فَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلٰى كُلِّ مَنْ هُوَ مَحْبُوْبٌ وَّ مَرْضِىٌّ لَّدَيْهِ صَلَاةً تَبْقٰى وَتَدُوْمُ بِدَوَامِ الْمَلِكِ الْحَيِّ الْقَيُّوْمِ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ

اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ اَرْسَلَهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ، اَمَّا بَعْدُ فَيَآ اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ رَحِمَنَا وَرَحِمَكُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى اُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِىْ بِتَقْوَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فِى السِّرِّ وَالْاِعْلَانِ فَاِنَّ التَّقْوٰى سَنَامُ ذُرَى الْاِيْمَانِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ كُلِّ شَجَرٍ وَّ حَجَرٍ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ وَّ اَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ وَاقْتَفُوْا اٰثَارَ سُنَنِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ صَلَوَاتُ اللّٰهِ تَعَالٰى وَسَلَامُهٗ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ فَاِنَّ السُّنَنَ هِىَ الْاَنْوَارُ وَزَيِّنُوْا قُلُوْبَكُمْ بِحُبِّ هٰذَ النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ اَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيْمِ فَاِنَّ الْحُبَّ هُوَ الْاِيْمَانُ كُلُّهٗ اَلَا لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَّا مَحَبَّةَ لَهٗ اَلَا لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَّا مَحَبَّةَ لَهٗ اَلَا لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَّا مَحَبَّةَ لَهٗ رَزَقَنَا اللّٰهُ تَعَالٰى وَاِيَّاكُمْ حُبَّ حَبِيْبِهٖ هٰذَا النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ اَكْرَمُ الصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيْمِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضٰى وَاسْتَعْمَلَنَا وَاِيَّاكُمْ بِسُنَّتِهٖ وَحَيَّانَا وَاِيَّاكُمْ عَلٰى مَحَبَّتِهٖ وَتَوَفَّانَا وَاِيَّاكُمْ عَلٰى مِلَّتِهٖ وَحَشَرَنَا وَاِيَّاكُمْ فِىْ زُمْرَتِهٖ وَسَقَانَا وَاِيَّاكُمْ مِنْ شَرْبَتِهٖ شَرَابًا هَنِيْئًا مَّرِيْئًا سَائِغًا لَّا نَظْمَأُ بَعْدَهٗ اَبَدًا وَاَدْخَلَنَا وَاِيَّاكُمْ فِىْ جَنَّتِهٖ بِمَنِّهٖ وَرَحْمَتِهٖ وَكَرَمَتِهٖ وَرَأْفَتِهٖ اِنَّهٗ هُوَ الرَّؤُفُ الرَّحِيْمُ ـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَلْبِرُّ لَا يَبْلٰى وَالذَّنْبُ لَا يُنْسٰى وَالدَّيَّانُ لَا يَمُوْتُ ـ اِعْمَلْ مَاشِئْتَ كَمَا تَدِيْنُ تُدَانُ ـ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ـ بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ اِنَّهٗ تَعَالٰى مَلِكٌ كَرِيْمٌ جَوَّادٌ بَرٌّ رَّؤُفٌ رَّحِيْمٌ اَقُوْلُ قَوْلِىْ هٰذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِىْ وَلَكُمْ وَلِسَآئِرِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ـ

জুমু'আর দ্বিতীয় খোৎবা

[কৃত, আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা রহমাতুল্লাহি আলায়হি]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْخُطْبَةُ الثَّانِيَّةِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ اَرْسَلَهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ اَبَدًا ـ لَا سِيَّمَا عَلٰى اَوَّلِهِمْ بِالتَّصْدِيْقِ وَاَفْضَلِهِمْ بِالتَّحْقِيْقِ اَلْمَوْلَى الْاِمَامِ الصِّدِّيْقِ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاِمَامِ الْمُشَاهِدِيْنَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا الْاِمَامِ اَبِيْ بَكْرِ نِالصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ وَعَلٰى اَعْدَلِ الْاَصْحَابِ مُزَيِّنِ الْمِنْبَرِ وَالْمِحْرَابِ الْمُوَافِقِ رَايُهٗ لِلْوَحْيِ وَالْكِتَابِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا الْاِمَامِ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَغَيْظِ الْمُنَافِقِيْنَ اِمَامِ الْمُجَاهِدِيْنَ فِيْ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ اَبِيْ حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ وَعَلٰى جَامِعِ الْقُرْاٰنِ كَامِلِ الْحَيَاۤءِ وَالْاِيْمَانِ مُجَهِّزِ جَيْشِ الْعُسْرَةِ فِيْ رِضَى الرَّحْمٰنِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا الْاِمَامِ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاِمَامِ الْمُتَصَدِّقِيْنَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ اَبِيْ عَمْرٍو عُثْمَانَ ابْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ وَعَلٰى اَسَدِ اللّٰهِ الْغَالِبِ اِمَامِ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ حَلَّالِ الْمُشْكِلَاتِ وَالنَّوَائِبِ دَفَّاعِ الْمُعْضَلَاتِ وَالْمَصَاۤئِبِ اَخِي الرَّسُوْلِ وَزَوْجِ الْبَتُوْلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا الْاِمَامِ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاِمَامِ الْوَاصِلِيْنَ اِلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ اَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ كَرَّمَ اللّٰهُ

تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى ابْنَيْهِ الْكَرِيْمَيْنِ السَّعِيْدَيْنِ الشَّهِيْدَيْنِ الْقَمَرَيْنِ الْمُنِيْرَيْنِ النَّيِّرَيْنِ الظَّاهِرَيْنِ الْبَاهِرَيْنِ الطَّيِّبَيْنِ الطَّاهِرَيْنَ سَيِّدِنَا اَبِيْ مُحَمَّدِ نِ الْحَسَنِ وَاَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا وَعَلٰى اُمِّهِمَا سَيِّدَةِ النِّسَاۤءِ الْبَتُوْلِ الزَّهْرَاۤءِ فِلْذَةِ كَبِدِ خَيْرِ الْاَنْبِيَاۤءِ صَلَوٰتُ اللّٰهِ تَعَالٰى وَسَلَامُهٗ عَلٰى اَبِيْهَا الْكَرِيْمِ وَعَلَيْهَا وَعَلٰى بَعْلِهَا وَابْنَيْهَا وَعَلٰى عَمَّيْهِ الشَّرِيْفَيْنِ الْمُطَهَّرَيْنِ مِنَ الْاَدْنَاسِ سَيِّدِنَا اَبِيْ عُمَارَةَ حَمْزَةَ وَاَبِي الْفَضْلِ الْعَبَّاسِ وَعَلٰى سَاۤئِرِ فِرَقِ الْاَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ يَا اَهْلَ التَّقْوٰى وَاَهْلَ الْمَغْفِرَةِ ـ اَللّٰهُمَّ انْصُرْ مَنْ نَصَرَ دِيْنَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ رَبَّنَا يَا مَوْلَانَا وَاجْعَلْنَا مِنْهُمْ وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَ دِيْنَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ رَبَّنَا يَا مَوْلَانَا وَلَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ ـ عِبَادَ اللّٰهِ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاۤءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ تَعَالٰى اَعْلٰى وَاَوْلٰى وَاَجَلُّ وَاَعَزُّ وَاَتَمُّ وَاَهَمُّ وَاَعْظَمُ وَاَكْبَرُ ـ

নামাযের নিময়

নামায পড়ার নিয়ম হচ্ছে ওযূ সহকারে ক্বেবলামুখী হয়ে এভাবে দাঁড়াবে যেন দু' পায়ের মাঝখানে চার আঙ্গুলের মত ফাঁক থাকে এবং হাত কান পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে বৃদ্ধাঙ্গুলি দু'টি কানের লতিতে লাগাবে এবং অন্যান্য আঙ্গুলগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় থাকবে আর একেবারে মিলিয়ে বা প্রসারিত করে রাখা হবে না। তখন হাতের তালু যেন ক্বেবলার দিকে এবং দৃষ্টি সাজদার জায়গার দিকে থাকে। অতঃপর যে ওয়াক্বতের নামায পড়া হয়, সেটার দৃঢ় নিয়্যত করে 'আল্লাহু আকবর' বলে হাত নিচে নামিয়ে নাভীর নিচে এমনভাবে বাঁধবে যেন ডান হাতের তালু বাম হাতের কব্জির উপর স্থাপন করে মাঝখানে তিন আঙ্গুল কব্জির পিঠের উপর রেখে বৃদ্ধাঙ্গুল ও কনিষ্ঠাঙ্গুল দ্বারা কব্জিকে জড়িয়ে ধরে। এরপর এ 'সানা' পড়বেঃ

سُبْحَانَکَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِکَ وَتَبَارَکَ اسْمُکَ وَتَعَالٰی جَدُّکَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُکَ

উচ্চারণঃ সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবা-রাকাসমুকা ওয়া তা'আলা-জাদ্দুকা ওয়া লা-ইলা-হা গাইরুকা।

অতঃপর আ'উযু বিল্লাহ্ ও বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম পড়ে সূরা 'ফাতিহা পড়বে' এবং সূরা ফাতিহার শেষভাগে নিম্নস্বরে 'আ-মী-ন' বলবে। এরপর যে কোন সূরা বা মোট তিন আয়াত বা তিন আয়াত সমতূল্য এক আয়াত পাঠ করবে। এবার 'আল্লাহু আকবর' বলে রুকূ'তে যাবে এবং হাত দ্বারা এমনভাবে হাঁটু ধরবে যেন হাতের তালু হাঁটুর উপর থাকে এবং আঙ্গুলগুলো ছড়িয়ে থাকে। পিঠ সোজা থাকবে এবং মাথা পিঠের বরাবর হবে। উঁচু নিচু যেন না হয়। আর দৃষ্টি পায়ের দিকে থাকবে এবং কমপক্ষে তিনবার سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِيْم (সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম) পড়ার পর سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ (সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ্) বলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে, সে এরপর দাঁড়ানো অবস্থায় বলবে رَبَّنَا لَکَ الْحَمْدُ (রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ) পুনরায় 'আল্লাহু আকবর' বলে এমনভাবে সাজদায় যাবে যে, প্রথমে হাঁটু যমীনে রাখবে, এরপর হাত, অতঃপর উভয় হাতের মাঝখানে এমনভাবে মাথা রাখবে যেন প্রথমে নাক, পরে কপাল স্থাপন করবে। নাকের মাথা যমীনে লেগে থাকবে এবং দৃষ্টি নাকের দিকে থাকবে। বাহু পাঁজর থেকে, পেট রান থেকে এবং রান পায়ের গোছা থেকে পৃথক রাখবে এবং উভয় পায়ের আঙ্গুলসমূহ ক্বেবলার দিকে থাকবে আর আঙ্গুলগুলোর পেট যমীনে লেগে থাকবে। হাতের তালু বিছানো থাকবে এবং আঙ্গুলসমূহ ক্বেবলার দিকে থাকবে আর তিনবার سُبْحَانَ رَبِّیَ الْاَعْلٰی (সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা) বলবে। অতঃপর এমনভাবে মস্তক উত্তোলন করবে যেন প্রথমে মাথা, তারপর নাক, মুখ ও হাত উঠাবে এবং ডান পা দাঁড় করিয়ে আঙ্গুলসমূহ ক্বেবলামুখী করে রাখবে আর বাম পা বিছিয়ে সেটার উপর ভালমতে সোজা হয়ে বসবে এবং হাতের তালু বিছিয়ে রানের উপর হাঁটুর কাছে এমনভাবে রাখবে যেন উভয় হাতের আঙ্গুলগুলো ক্বেবলার দিকে থাকে এবং আঙ্গুলগুলোর মাথা যেন হাঁটুর কাছে থাকে। পুনরায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে 'আল্লাহু আকবর' বলে দ্বিতীয় সাজদা করবে। দু' সাজদার মধ্যখানেও বিভিন্ন দো'আ বর্ণিত আছে। তবে সংক্ষেপে 'আল্লাহুম্মাগ্‌ফিরলী' বললেও চলবে। এ দ্বিতীয় সাজদাটাও প্রথম সাজদার মত। এরপর মাথা উঠাবে এবং হাত হাঁটুর উপর রেখে পায়ের তালুর উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। দাঁড়ানোর সময় বিনা কারণে হাত যমীনে রাখবে না। এভাবে এক রাক'আত পূর্ণ হয়ে গেল। এবার পুনরায় কেবল 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম' বলে 'আলহামদু' ও অন্য একটি সূরা পড়বে এবং প্রথম রাক'আতের মত রুকূ' ও সাজদা করবে এবং দ্বিতীয় সাজদা থেকে মাথা উঠিয়ে ডান পা দাঁড় করিয়ে বাম পা বিছিয়ে সেটার উপর বসে যাবে এবং পড়বেঃ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْکَ اَيُّهَا النَّبِیُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَکَاتُهٗ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰی عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ۔

উচ্চারণঃ আত্তাহিয়্যাতু লিল্লা-হি ওয়াস্‌সালাওয়া-তু ওয়াত্তায়্যিবা-তু আস্‌সালামু আলাইকা আইয়ুহান নবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহূ আস্‌সালামু আলাইনা- ওয়া 'আলা 'ইবা-দিল্লা-হিস সা-লিহীন। আশহাদু-আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ- ওয়া রাসূ-লুহু।

এটাকে 'তাশাহ্‌হুদ' বলা হয়। তাশাহ্‌হুদ পড়ার সময় যখন 'লা'- শব্দের নিকটবর্তী হবে, তখন ডান হাতের মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলী গোলাকার করে কণিষ্ঠাঙ্গুল ও এর পাশের আঙ্গুলগুলো হাতের তালুর সাথে লাগাবে এবং 'লা-' বলার সাথে সাথে শাহাদাত আঙ্গুল উঠাবে; কিন্তু এদিক সেদিক নাড়াচাড়া করবে না। 'ইল্লা' বলার সাথে সাথে নামিয়ে ফেলবে এবং অন্যান্য আঙ্গুলগুলোকে স্বাভাবিক অবস্থায় ছেড়ে দেবে কিংবা সোজা করে ফেলবে। এবার যদি দু'রাক'আত থেকে বেশী পড়তে হয়, তাহলে শুধু তাশাহ্‌হুদ পড়ার পর দাঁড়িয়ে যাবে এবং আগের মত রাক'আতগুলো পড়বে। কিন্তু ফরয নামাযের বেলায় পরবর্তী রাক'আতসমূহে 'আল-হামদু'র সাথে অন্য সূরা পড়ার প্রয়োজন নেই। দু' রাক্'আতের পর আর বেশী না পড়লে কিংবা তৃতীয় কিংবা চতুর্থ রাক্'আত মিলালে, এ তৃতীয় কিংবা চতুর্থ রাক্'আতের পর শেষ বৈঠকে বসবে। আর এ শেষোক্ত অবস্থা দু'টিতে তাশাহ্‌হুদ পড়বে। আর এ উভয় অবস্থায় তাশাহ্‌হুদের পর এ দুরূদ শরীফ পড়বেঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّيْتَ عَلٰی سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ اِنَّکَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔ اَللّٰهُمَّ بَارِکْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکْتَ عَلٰی سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ اِنَّکَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা সাল্লি 'আলা সাইয়্যেদিনা মুহাম্মদিওঁ ওয়া 'আলা আলে সাইয়্যেদিনা মুহাম্মদিন কামা সাল্লাইতা 'আলা সাইয়্যেদিনা ইব্রাহী-মা ওয়া 'আলা আলে সাইয়্যেদিনা ইব্রাহী-মা ইন্নাকা হামী-দুম মাজীদ।

আল্লা-হুম্মা বারিক 'আলা সাইয়্যেদিনা মুহাম্মদিওঁ ওয়া 'আলা আলে সাইয়্যেদিনা মুহাম্মদিন কামা বা-রাকতা 'আলা সাইয়্যেদিনা ইব্রাহী-মা ওয়া 'আলা আলে সাইয়্যেদিনা ইব্রাহী-মা ইন্নাকা হামী-দুম মাজীদ।

এর পর পড়বেঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِمَنْ تَوَالَدَ وَلِجَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ اَلْاَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْاَمْوَاتِ اِنَّكَ مُجِيْبُ الدَّعْوَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَآاَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মাগ্‌ফিরলী ওয়া লিওয়া-লিদাইয়্যা ওয়া লিমান তাওয়া-লাদা ওয়া লিজামী'ইল মু'মিনী-না ওয়াল মু'মিনা-তি ওয়াল মুসলিমী-না ওয়াল মুসলিমী-না ওয়াল মুসলিমা-তিল আল- আহইয়া-ই নিমহুম ওয়াল আম্‌ওয়াতি। ইন্নাকা মুজী-বুদ্দা'ওয়া-তি। বিরাহ্‌মাতিকা এয়া আরহামার রা-হিমী-ন।

অথবা অন্য কোন দো'আ মা'সূরা পড়বে। যেমন-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী যোয়ালামতু নাফসী যুলমান কাসী-রাওঁ ওয়ালা-ইয়াগফিরুয্ যুনূ-বা ইল্লা- আনতা ফাগরিলী মাগফিরাতাম মিন ইনদিকা ওয়ারহামনী ইন্নাকা আনতাল গাফুরুর রহীম ।

এরপর ডানদিকে মুখ করে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ (আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ) বলবে অনুরূপ বাম দিকে মুখ ফিরিয়েও বলবে। এখন নামায শেষ হয়ে গেলো। এবার হাত উঠিয়ে যে কোন একটি মুনাজাত করবে । যেমন-

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ دَارَ السَّلَامِ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা আন্‌তাস্ সালাম ওয়ামিনকাস্ সালাম ফাহায়্যিনা রাব্বানা বিস্ সালাম ওয়াআদখিলনাল জান্নাতা দারাস্ সালাম।

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ

উচ্চারণঃ রাব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাওঁ ওয়াফিল আ-খিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়া ক্বিনা আযা-বান নার।

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ ـ اَللّٰهُمَّ اَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِى الْاُمُوْرِ كُلِّهَا وَاَجِرْنَا مِنْ خِزْىِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْاٰخِرَةِ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা আ'ইন্নী- 'আলা- যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবা-দাতিকা, আল্লা-হুম্মা আহসিন 'আ-ক্বিবাতানা ফিল উমূ-রি কুল্লিহা ওয়া আজিরনা মিন খিয্‌য়িদ দুন্‌ইয়া, ওয়া আযা-বিল আখিরাহ ।

এ দো'আ পড়ে মুখের উপর হাত বুলিয়ে নেবে। উল্লেখিত নিয়মটাও হচ্ছে ইমাম বা

একাকী নামায আদায়কারীর জন্য। কিন্তু নামাযী যদি মুক্তাদী হয় অর্থাৎ জমা'আত সহকারে নামায পড়ে তখন ইমামের পেছনে কোন ক্বির'আত পড়বে না অর্থাৎ আলহামদু ও অন্য সূরা পড়বে না। ইমাম ক্বির'আত সরবে পড়ুক বা নিরবে পড়ুক, ইমামের পিছনে কোন ক্বির'আত পড়া জায়েয নয়। আর যদি নামাযী মহিলা হয়, তাহলে তাকবীর-ই তাহরীমার সময় কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠাবে এবং বাম হাতের তালু বুকের উপরে এবং ডান হাতের তালু বাম হাতের উপর রাখবে। রুকু'তে সামান্য ঝুঁকবে অর্থাৎ এতটুকু ঝুঁকবে যে হাঁটুর উপর হাত রাখবে এবং হাতের আঙ্গুলসমূহ মিলিয়ে রাখবে আর পিঠ ও পা একটু ঝুঁকিয়ে রাখবে। পুরুষদের মত বেশী সোজা করবে না এবং সাজদায় বাহু পাঁজরের সাথে মিলিয়ে রাখবে এবং পেট রানের সাথে ও পায়ের গোছার সাথে এবং পায়ের গোছা যমীনের সাথে লাগিয়ে রাখবে আর উভয় পা ডানদিকে বের করে দেবে। বৈঠকের সময়ও উভয় পা ডান দেকে বের করে দেবে এবং বাম পাছার উপর বসবে আর উভয় হাত উভয় রানের উপর রাখবে।

যে নিয়ম বর্ণিত হলো, এর মধ্যে কতেক বিষয় ফরয। সেগুলো ব্যতীত নামায হবেই না। কতেক ওয়াজিব, সেগুলো ইচ্ছাকৃতভাবে ত্যাগ করা গুনাহ্ এবং নামায পুনরায় পড়া ওয়াজিব আর অনিচ্ছাকৃতভাবে বর্জন করলে সাজদা-ই সাহ্ভ ওয়াজিব আর কতগুলো সুন্নাতে মু'আক্কাদাহ, সেগুলো নিয়মিত বাদ দেয়া গুনাহ; আর কতগুলো মুস্তাহাব। সেগুলো করলে সাওয়াব; আর না করলে গুনাহ্ নেই।

নামাযের ৬টি পূর্বশর্ত

১. শরীর পাক হওয়া, ২. কাপড় পাক হওয়া, ৩. স্থান পাক হওয়া, ৪. সতর ঢাকা, ৫. ক্বেবলামুখী হওয়া, ৬. নিয়্যত করা।

নামাযের অভ্যন্তরীণ ফরযসমূহ

নামাযের অভ্যন্তরে সাতটি ফরয রয়েছেঃ তকবীরে তাহরীমা অর্থাৎ প্রথমে 'আল্লাহু আকবর' বলা যেটা দ্বারা নামায শুরু হয়, ২. ক্বিয়াম অর্থাৎ ফরয-ওয়াজিব ক্বির'আত আদায় করতে যতক্ষণ সময় লাগে, ততক্ষণ দাঁড়ানো, ৩. ক্বির'আতে অর্থাৎ কমপক্ষে বড় এক আয়াত কিংবা ছোট তিন আয়াত পড়া, ৪. রুকূ' অর্থাৎ এতটুকু ঝুঁকা যে, হাত বাড়ালে যেন হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছে যায়, ৫.সাজদা অর্থাৎ কপাল যমীনে লাগানো, ৬. শেষ বৈঠক অর্থাৎ নামাযের রাক'আতসমূহ পূর্ণ করার পর পুরো তাশাহ্হুদ পড়ার পরিমাণ বসা, ৭.এমন কর্ম করে নামায থেকে বের হওয়া, যা দ্বারা নামায ভঙ্গ হয়ে যায়। এ কর্মটা 'সালাম' হওয়া ওয়াজিব।

নামাযের ওয়াজিবসমূহ

তাকবীরে তাহরীমায় 'আল্লাহু আকবর' বলা, পুরা আলহামদু শরীফ পড়া, সূরা বা আয়াত মিলানো, ফরয নামাযে প্রথম দু'রাক'আতে ক্বিরআত পড়া অর্থাৎ আলহামদু ও এর সাথে অন্য সূরা বা আয়াত মিলানো (ফরযের দু'রাক'আতে এবং নফল,

বিতর ও সুন্নাতের প্রত্যেক রাক'আতে ক্বিরআত ওয়াজিব)। আলহামদু ও সূরার মাঝখানে বিস্‌মিল্লাহ ও আমীন ব্যতীত অন্য কিছু না পড়া, ক্বিরআত শেষ করার সাথে সাথেই রুকূ' করা, এক সাজদার পর দ্বিতীয় সাজদা হওয়া, তা'দীলে আরকান অর্থাৎ রুকূ' থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানো (ক্বাউমাহ্) এবং দু'সাজদার মধ্যখানে বসা (জলসাহ্) কমপক্ষে একবার সুবহানাল্লাহ বলার সময় পরিমাণ অপেক্ষা করা। প্রথম বৈঠক, যদি ওই নামায ফরয, বিতর ও সুন্নাত নামাযের প্রথম বৈঠক হয়, তাশাহ্হুদ পড়া তবে উভয় বৈঠকে পূর্ণ তাশাহ্হুদ পড়া, সালাম ফেরানো, বিত্রে দো'আ ক্বুনূত পড়া, দুই ঈদের তাকবীর, (অর্থাৎ অতিরিক্ত ছয় তাকবীর) উচ্চস্বরের নামাযে ইমামের উচ্চস্বরে ক্বিরআত পড়া এবং নিম্নস্বরের নামাযে নিম্নস্বরে ক্বিরআত পড়া, প্রত্যেক ফরয ও ওয়াজিব যথাস্থানে আদায় করা, তিলাওয়াতের সাজদা দেয়া, ইমাম যখন ক্বিরআত পড়ে (উচ্চস্বরে হোক বা নিম্নস্বরে) তখন মুক্ত্তাদীর নিশ্চুপ থাকা। ক্বিরআত ব্যতীত সমস্ত ওয়াজিবে ইমামের অনুসরণ করা।

নামাযের সুন্নাতসমূহ

১. 'আল্লাহু আকবার' (তাকবীর-ই তাহরীমা) বলার সময় পুরুষ কানের লতি পর্যন্ত এবং স্ত্রী লোক কাঁধ বরাবর দু'হাত উত্তোলন করা এবং হাত দু'টি তোলার সময় আঙ্গুলগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় খোলা রাখা, ২. ইমাম উচ্চস্বরে তাকবীর বলা এবং তাকবীর-ই তাহরীমার পর ফরয, সুন্নাত, বিতর, নফল, তারাবীহ্ ইত্যাদি যাবতীয় নামাযে ইমাম, মুক্বতাদী এবং একা নামাযী প্রত্যেকে 'সানা' পড়া, ৩. তারপর নিরবে 'আ'ঊযু বিল্লাহ্' ও 'বিসমিল্লাহ্' পুরোপুরি পড়া, ৪. ইমাম, মুক্বতাদী ও একাকী নামায সম্পন্নকারী সূরা ফাতিহার পর 'আ-মী-ন' নিরবে বলা, ৫. পুরুষ ডান হাত বাম হাতের কব্জির উপর রেখে নাভীর নিচে বাম হাতের তালু দ্বারা ধরা। স্ত্রী লোক বুকের উপর ডান হাত বাম হাতে কব্জির উপর রেখে বাম হাতের তালু দ্বারা বুক চেপে ধরা, ৬. রুকূ'তে যাবার সময় তাকবীর বলা এবং রুকূ'তে দু' হাতের তালু দ্বারা আঙ্গুলগুলো নিচের দিকে রেখে দু'হাঁটুর গ্রন্থি চেপে ধরা, ৭. রুকূ'তে 'সুবহানা রাব্বিয়াল 'আযীম তিনবার বলা, ৮. রুকু' থেকে সোজা হয়ে দাঁড়াবার সময় একাকী নামায সম্পন্নকারী 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ্' ও 'রাব্বানা লাকাল হামদ' উভয়টি বলা এবং জামা'আতে নামায সম্পন্নকারী ইমাম 'সামি'আল্লা-হু লিমান হামিদাহ্' বললে মুক্বতাদী শুধু 'রাব্বানা-লাকাল হামদ' বলা, ৯. সাজদায় যাবার সময় তাকবীর বলতে বলতে যাওয়া আর সাজদায় হাঁটু দু'টি ও হাত দু'টি যমীনের উপর রাখা, ১০. সাজদায় 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা' তিনবার বলা, ১১. সাজদা থেকে তাকবীর বলতে বলতে উঠে পুরুষগণ বাম পা বিছিয়ে

ডান পা খাড়া রেখে বাম পায়ের উপর বসা আর স্ত্রীলোক নিতম্বের উপর বসে পা দু'টি ডান দিকে বের করে দেওয়া, ১২. দু' সাজদার মধ্যবর্তী সময়ে সোজা হয়ে বসা এবং রুকূ' থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানো, ১৩. শেষ বৈঠকে দুরূদ শরীফ ও দো'আ-ই মাসূরা পাঠ করা, ১৪. তারপর ডান ও বাম দিকে সালাম ফিরিয়ে নামায সমাপ্ত করা।

নামাযের মুস্তাহাবসমূহ

১. নামাযের মধ্যে যথাসাধ্য হাঁচি বন্ধ করার চেষ্টা করা এবং হাই আসলে মুখে হাত রাখা, ২. জামা'আত সহকারে নামায পড়ার সময় মুআয্যিন 'হাইয়্যা 'আলাল ফালাহ্' বলার সময় নামাযের জন্য দাঁড়ানো আর 'ক্বাদ্ ক্বামাতিস্ সালাহ্' বলার সময় ইমাম নামায আরম্ভ করা, ৩. রুক্বু'তে মাথা ও পিঠ সোজা ও সমান রাখা এবং সাজদায় যাবার সময় প্রথমে দু' হাঁটু, তারপর দু'হাত, তারপর নাক, তারপর কপাল মাটিতে রাখা। আর উঠার সময় প্রথমে কপাল, তারপর নাক উত্তোলন করা, ৪. সাদহাহ্ হতে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হলে দু' হাতের তালু দ্বারা দু'হাটুর গ্রন্থির উপর ভর করে উঠা, ৫. নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় দু' পায়ের মধ্যবর্তী স্থানে চার আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁক রাখা, ৬. বৈঠকে দু'জানুর উপর দু'হাত রাখা, ৭. বিজোড় সংখ্যায় তাসবীহ্ পাঠ করা, ৮. সাজদায় পেট থেকে বাহু দু'টি পৃথক রাখা, পেটকেও রান থেকে পৃথক রাখা এবং রানকে গোছা থেকে পৃথক রাখা; কিন্তু স্ত্রীলোক এ সবের বিপরীত করবে। অর্থাৎ প্রত্যেক অঙ্গ মিলিয়ে রাখবে, ৯. দাঁড়ানো অবস্থায় সাজদার জায়গায় দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা, ১০. রুকু'তে পায়ের পিঠের উপর দৃষ্টি রাখা, ১১. বসা অবস্থায় দু' রানের মধ্যবর্তী স্থানে দৃষ্টি রাখা, ১২. নামাযের নিয়্যত করার সময় চাদরের ভিতর থেকে হাত দু'টি বের করা।

সাজদা-ই সাহ্‌ভের বিবরণ

যে সব বিষয় নামাযে ওয়াজিব, সেগুলো থেকে যদি কোন ওয়াজিব ভুলে বাদ পড়ে যায়, তাহলে সাজদা-ই সাহ্ভ ওয়াজিব। এ সাজদা দেয়ার নিয়ম হচ্ছে শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়ার পর ডান দিকে সালাম ফিরিয়ে দু'টি সাজদা করবে এবং পুনরায় শুরু থেকে তাশাহহুদ দুরূদ শরীফ ও দো'আ মা'সূরাহ্ পড়ে সালাম ফেরাবে।

মাসআলাঃ যদি কোন ওয়াজিব বাদ পড়ে এবং এর জন্য সাজদা-ই সাহ্ভ না করে এবং এভাবে নামায শেষ করে ফেলে, তাহলে নামায পুনরায় পড়া ওয়াজিব।

মাসআলাঃ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ওয়াজিব বাদ দেয়, তাহলে সাজদা-ই সাহ্ভ যথেষ্ট নয়; বরং নামায পুনরায় পড়া ওয়াজিব।

মাসআলাঃ যে সব বিষয় নামাযে ফরয, যদি ওগুলো থেকে কোন বিষয় বাদ পড়ে,

তাহলে নামায হবে না এবং সাজদা-ই সাহ্ভও যথেষ্ট নয়, বরং পুনরায় পড়া ফরয।

মাসআলাঃ ওইসব বিষয়, যেগুলো নামাযে সুন্নাত বা মুস্তাহাব; যেমন, আ'উযুবিল্লাহ, বিস্মিল্লাহ, আমীন, তাসবীহসমূহ, বাদ পড়লেও সাজদা-ই সাহ্ভ ওয়াজিব নয়, বরং নামায হয়ে যাবে।[রদ্দুল মুহতার, গুনিয়া] তবে নামায পুনরায় পড়ে নেয়া ভাল।

মাসআলাঃ যদি এক নামাযে কয়েকটা ওয়াজিব বাদ পড়ে, তাহলে সবকটির জন্য সাজদা-ই সাহ্ভ একবারই যথেষ্ট। [রুদ্দুল মুহতার]

মাসআলাঃ যদি প্রথম বৈঠকে পূর্ণ তাশাহহুদ পড়ার পর তৃতীয় রাক'আতের জন্য না দাঁড়িয়ে ভুলবশতঃ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ (আল্লা-হুম্মা সাল্লে আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ) পর্যন্ত পড়ে নেয়, তাহলে সাজদা-ই সাহ্ভ ওয়াজিব হবে। অবশ্য কিছু না পড়ে নিশ্চুপ থাকলেও সাজদা-ই সাহ্ভ ওয়াজিব।
[দুররুল্ল মুখতার, রদ্দুল মুহতার]

মাসআলাঃ ক্বিরআত ইত্যাদি পড়ার সময় চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেল এবং তিনবার সুব্হানাল্লাহ বলার পরিমাণ দেরী হয়ে গেল, তাহলে সাজদা-ই সাহ্ভ ওয়াজিব।
[রুদ্দুল মুহতার]

মাসআলাঃ দু' রাক'আতকে চার রাক'আত মনে করে সালাম ফিরানোর পর স্মরণ হলো, তাহলে বাকী নামায পূর্ণ করে যেন সাজদা-ই সাহ্ভ করে। [আলমগীরী]

মাসআলাঃ তা'দীলে আরকান, অর্থাৎ রুকূ' থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানো এবং দু' সাজদার মধ্যখানে সোজা হয়ে বসা ইত্যাদির মাধ্যমে যথাযথভাবে নামায আদায় করতে ভুলে গেলে সাজদা-ই সাহ্ভ ওয়াজিব। [হিন্দিয়া]

মাসআলাঃ মুক্বতাদী তাশাহহুদ শেষ করার আগেই ইমাম তৃতীয় রাক'আতের জন্য দাঁড়িয়ে গেল। এক্ষেত্রে মুক্বতাদীর জন্য তাশাহহুদ পূর্ণ করে দাঁড়ানো ওয়াজিব, যদিওবা বিলম্ব হয়।

মাসআলাঃ মক্বতাদী রুকূ' বা সাজদায় তিনবার তাসবীহ পাঠ করার আগেই ইমাম মাথা উঠিয়ে নিয়েছেন, তাহলে মুক্বতাদীও মাথা উঠিয়ে নেবে এবং অবশিষ্ট তসবীহ্ বাদ দেবে।

মাসআলাঃ যে ব্যক্তি ভুলে প্রথমে বৈঠক করেনি এবং তৃতীয় রাক'আতের জন্য দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল, সে যদি এতটুকু দাঁড়ায় যে বৈঠকের কাছাকাছি আছে, তাহলে বসে যাবে, এবং সাজদা-ই সাহ্ভের প্রয়োজন হবে না। আর যদি এতটুকু উঠে যায় যে দাঁড়ানোর কাছাকাছি হয়ে গেছে, তাহলে দাঁড়িয়ে যাবে এবং শেষে সাজদা-ই সাহ্ভ করবে। [শরহে বেক্বায়া, হেদায়া ইত্যাদি]

মাসআলাঃ যদি শেষ বৈঠক করার কথা ভুলে যায় এবং দাঁড়িয়ে যায়, তাহলে ওই রাক'আতের সাজদা করার আগে স্মরণ হলে সেটা বাদ দিয়ে বসে যাবে এবং নামায

পূর্ণ করে সাজদা-ই সাহ্ভ আদায় করবে। আর যদি সেই রাক'আতে সাজদা করে ফেলে, তাহলে নামাযের 'ফরয হওয়া' বাতিল হয়ে যাবে; যদি ইচ্ছা করে তবে আরও এক রাক'আত মিলিয়ে নেবে এবং সাজদাহ্-ই সাহ্ভ করবে, তবে তখন সবটুকু নফল হয়ে যাবে। ফরয পুনরায় পড়বে। [হেদায়া, শরহে বেক্বায়া ইত্যাদি]

মাসআলাঃ যদি শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়ে ভুলে দাঁড়িয়ে গেল, তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত সেই রাক'আতের সাজদা না করে থাকে, বসে যাবে এবং পুনরায় তাশাহহুদ পড়ে সাজদা-ই সাহ্ভ দিয়ে নামায সম্পন্ন করবে। আর যদি সেই রাক'আতের সাজদা করে নেয় তখনও ফরয আদায় হবে, তবে আর এক রাক'আত পড়ে দিতে হবে এবং সাজদা-ই সাহ্ভ করবে। তখন শেষের দু' রাক'আত নফল হয়ে যাবে। অবশ্য মাগরিবের সময় আর এক রাকাত মিলাবে না। [হেদায়া, শরহে বেকায়া ইত্যাদি]

মাসআলাঃ যদি এক রাক'আতে তিন সাজদা করে বা দু রুকু' করে বা প্রথম বৈঠক ভুলে গেল, তাহলে সাজদা-ই সাহ্ভ করবে।

মাসআলাঃ নফলের প্রত্যেক দ্বিতীয় রাক্'আতের বৈঠক শেষ বৈঠক অর্থাৎ ফরয। যদি বৈঠক না করে দাঁড়িয়ে যায় তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত ওই রাক'আতের সাজদা না করে থাকে, বৈঠকে ফিরে যাবে এবং সাজদা-ই সাহ্ভ আদায় করবে। ওয়াজিব নামায, যেমন বিত্‌রের বেলায় ফরয নামাযের হুকুমই প্রযোজ্য। সুতরাং যদি বিতরের প্রথম বৈঠকের কথা ভুলে যায়, তাহলে এর জন্য ওই হুকুম প্রযোজ্য, যা ফরয নামাযে প্রথম বৈঠক ভুলে গেলে করতে হয়। [দুররুল মুখতার]

মাসআলাঃ দো'আ কুনূত ভুলে গেলে সাজদা-ই সাহ্ভ করবে। কুনূতের তকবীর বলতে ওই তকবীরকে বোঝানো হয়েছে, যা ক্বির'আতের পর দো'আ কুনূত পড়ার জন্য বলা হয়। [আলমগীরী]

জামা'আতের বর্ণনা

ইসলামে জামা'আতে নামায পড়ার প্রতি খুবই জোর দেয়া হয়েছে এবং এর সাওয়াবও অধিক। এমনকি জামা'আত বিহীন নামায থেকে জামা'আত সহকারে নামাযের সাওয়াব সাতাশ গুণ বেশী।

মাসআলাঃ পুরুষদের জামা'আত সহকারে নামায পড়া ওয়াজিব। বিনা কারণে একবারও জামা'আত বর্জনকারী গুনাহের ভাগী ও শাস্তির উপযোগী হবে।

মাসআলাঃ জুমু'আহ্ ও দু' ঈদে জামা'আত পূর্বশর্ত। অর্থাৎ জামা'আত ছাড়া নামায হবে না।

মাসআলাঃ তারাবীতে জামা'আত সুন্নাতে কেফায়া অর্থাৎ মহল্লার কিছু লোক জামা'আত সহকারে পড়লে সবার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। আর যদি সবাই জামা'আত ত্যাগ করে, তাহলে সবাই গুনাহের ভাগী হবে।

মাসআলাঃ রমযান শরীফের বিতরের জামা'আত মুস্তাহাব।

মাসআলাঃ মহল্লার মসজিদের নির্ধারিত ইমাম আযান-ইক্বামত সহকারে সুন্নাত মুতাবেক জামা'আত পড়ে ফেলার পর দ্বিতীয় বার আযান ইক্বামত সহকারে প্রথমটার মত জামা'আত কায়েম করা মকরূহ। তবে যদি আযান ছাড়া মেহরাব থেকে সরে দ্বিতীয় বার জামা'আত পড়া হয়, তবে তাতে কোন দোষ নেই। আর যদি প্রথম জামা'আত আযানবিহীন সম্পন্ন হয় বা নিম্নস্বরে আযান হয়ে থাকে, তাহলে পুনরায় জামা'আত পড়া হলে, এ জামা'আত দ্বিতীয় জামা'আত হিসেবে গণ্য হবে না। [দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার]

মাসআলাঃ যে ব্যক্তি জামা'আত হারিয়ে ফেলল তার উপর অন্য মসজিদে গিয়ে জামা'আত তালাশ করা আবশ্যক নয়। তবে অন্য মসজিদের জামা'আতে শামিল হতে পারলে সওয়াব পাবে।

জামা'আতের ফযীলত

আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা ক্বোরআন মজীদে ইরশাদ ফরমান وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ রুকূ'কারীদের সাথে রুকূ' করো। জামা'আতের ফযীলত সম্পর্কে অনেক হাদীসও রয়েছে। যেমন-হযরত সায়্যেদুনা আনাস্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তাজেদারে মদীনা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে কেউ আল্লাহ আয্যা ওয়াজাল্লা-এর জন্য চল্লিশ দিন তকবীরে উলার (প্রথম তাকবীর) সাথে জামা'আত সহকারে নামায পড়ে, তার জন্য দু'টি মুক্তি লিখে দেয়া হয়ঃ এক. দোযখ থেকে, দুই. মুনাফেক্বী থেকে। [তিরমিযী]

হযরত সায়্যেদুনা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তাজেদারে মদীনা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, জামা'আত সহকারে নামায, একাকী পড়ার চেয়ে সাতাশ স্তর উর্ধ্বে। [বুখারী ও মুসলিম শরীফ]

জামা'আতের ব্যাপারে অবহেলা না করা চাই। 'যিন্দেগীকে মৃত্যুর আগে গনীমত মনে করো'-এ হাদীস শরীফের আলোকে এর পূর্ণ সময়টা মুনাফাদায়ক কাজে ব্যয় করে যথাসম্ভব জামা'আত সহকারে নামায আদায় করে অধিক সাওয়াবের ভাণ্ডার গড়ে তোলা চাই।

হযরত সায়্যেদুনা আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, সরকারে মদীনা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন, যে ব্যক্তি জামা'আত সহকারে যোহরের নামায পড়বে, আল্লাহ আয্যা ওয়াজাল্লা তাকে প্রতি অক্ষরের বিনিময়ে, যা তার মুখ থেকে বের হয়েছে, পাঁচটি হুর ও পাঁচটি মহল জান্নাতে দান করবেন এবং ক্বিয়ামতের দিন এ নামায তার কাছে বোরাক্বের আকৃতিতে আসবে, যার উপর সে আরোহণ করে বিদ্যুৎ গতিতে পুলসেরাত পার হয়ে যাবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে। [তায্‌কিরাতুল ওয়া-'ইযীন]

হযরত সায়্যেদুনা ওসমান গনী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, সরকারে মদীনা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ফরমান, যে জামা'আত সহকারে এশার নামায পড়লো, সে যেন অর্ধরাত ক্বিয়াম করলো (অর্থাৎ ইবাদতে অতিবাহিত করলো) এবং যে ফজরের নামায জামা'আত সহকারে পড়লো, সে যেন পুরো রাতই ক্বিয়াম করলো।(অর্থাৎ পুরো রাত ইবাদতে অতিবাহিত করলো)।

ফজর ও এশার নামায জামা'আত সহকারে আদায়কারীর পুরো রাতের ইবাদতের সওয়াব অর্জিত হয়। এছাড়াও আল্লাহ তা'আলার অগণিত পুরস্কারের বারিধারা বর্ষিত হয়।

বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি সব সময় পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামা'আত সহকারে পড়তে থাকে, আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা তাকে পাঁচটি জিনিস দান করবেনঃ ১. তার অভাব দূরীভূত করবেন, ২. কবর আযাব থেকে নিরাপদ রাখবেন, ৩. ক্বিয়ামতের দিন তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, ৪. দ্রুত উড়ন্ত পাখীর ন্যায় পুলসেরাত পার হয়ে যাবে এবং ৫.বিনা হিসেব-নিকাশে জান্নাতে প্রবেশ করবে। ইমাম যত পরহেযগার হবেন, জামা'আতের সাওয়াবও তত বেশী অর্জিত হবে।

সরকারে মদীনা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোন পরহেযগার ইমামের পেছনে নামায পড়লো, সে যেন বনী ইসরাঈলের নবীগণের মধ্য থেকে কোন এক নবী আলাইহিস্ সালাম-এর পেছনে নামায পড়লো, আর যে ব্যক্তি কোন এক আমলদার আলিমের পেছনে নামায আদায় করলো, সে যেন আমার পেছনে নামায পড়লো। [তাযক্বিরাতুল ওয়া-'ইযীন]

যে ইসলামী ভাই আন্তরিকভাবে নামায পড়ার জন্য চেষ্টা করে, যেমন ঘর থেকে ভালমতে ওযূ করে জামা'আত সহকারে নামায আদায় করার অভিপ্রায়ে মসজিদের দিকে যাত্রা করলো কিন্তু সেখানে পৌঁছে জানতে পারলো যে, জামা'আত শেষ হয়ে গেছে, তখন যেহেতু তার নিয়্যত জামা'আতে যোগদান করার ছিলো এবং এর জন্য সে যথাসাধ্য চেষ্টাও করেছে, সেহেতু সে জামা'আতের সাওয়াব লাভ করবে। যেমন- হযরত সাইয়্যেদুনা আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়ালাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হুযূর তাজেদারে মদীনা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, যে ভালমতে ওযূ করে মসজিদে গমন করে এবং লোকদেরকে এমতাবস্থায় পায় যে, নামায পড়ে নিয়েছে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকেও জামা'আত সহকারে নামায আদায়কারীদের মত সাওয়াব দেবেন এবং তার সাওয়াবের মধ্যে কোন কমতি হবে না। [আবু দাঊদ]

কোন জায়গায় কয়েকজন মুসলমান ভাই একত্রিত হলে এবং কোন মসজিদও না থাকলে জামা'আত সহকারে নামায আদায় করা যায়। তখন তাদের মধ্যে যদি কেউ

জামা'আত পড়ানোর উপযুক্ত থাকে, তাহলে নিশ্চয় জামা'আত করা চাই। এমনকি যদি দু'জন মুসলমান ভাইও হয়ে থাকে, তাহলে উভয়ে মিলে যেন জামা'আত কায়েম করে। তবে শর্ত হলো যে, যিনি ইমাম হবেন, তার ইমামতির যোগ্যতা থাকতে হবে এবং তার মধ্যে ইমাম হওয়ার শর্তসমূহ পাওয়া যেতে হবে। যেমন- হযরত সায়্যেদুনা আবূ মূসা আশ'আরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, "দু'জন বা ততোধিক নিয়েও জামা'আত হয়।" [ইবনে মাজা]

সানী জামাত

এক জামা'আত হয়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয় জামা'আতও করা যেতে পারে। দু'জন বা দু' এর অধিক মুসলমান উপস্থিত থাকলে জামা'আত ক্বায়েম করে নেবে। যদি মাত্র একজন জামা'আত থেকে বঞ্চিত থাকে, তাহলে অন্য একজন মুসল্লী, যে নামায পড়ে ফেলেছেন, সে যেন তার পেছনে নফল আদায়কারীর নিয়্যতে ইক্বতিদা করবে, যাতে তার জামা'আতের সাওয়াব অর্জিত হয়; কিন্তু ফজর, আসর ও মাগরিবের নামায যিনি পড়ে নিয়েছেন, তিনি নফল আদায়কারী হতে পারেন না। কেবল যোহর ও এশার ফরয আদায়কারীর পেছনে নফল পড়তে পারেন।

হযরত সায়্যেদুনা আবূ সা'ঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, এক সাহাবী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মসজিদে উপস্থিত হলেন। তখন সরকারে মদীনা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমালেন, কে আছো একে সাহায্য করার? অর্থাৎ তার সাথে নামায আদায় করে যেন সেও জামা'আতের সাওয়াব লাভ করে। এক ব্যক্তি অর্থাৎ সায়্যিদুনা আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর সাথে নামায পড়লেন।

জমা'আতে নামায বর্জন করার অপকারিতা

হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তি জামা'আত সহকারে নামায পড়ার ব্যাপারে অবহেলা করবে, আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা তাকে বারটি মুসীবতে জড়িত করবেন। এ বারটি মুসীবত হচ্ছে, তিনটি মুসীবত দুনিয়াতে আসবে, তিনটি মুসীবত মৃত্যুর সময়, তিনটি মুসীবত কবরে এবং তিনটি মুসীবত ক্বিয়ামতের দিনে। যে তিন মুসীবত দুনিয়াতে আসবে, সেগুলো হচ্ছে-আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা তার রুজি-রোজগার থেকে বরকত ওঠিয়ে নেবেন, তার থেকে নেক্কারদের নূর বিদূরিত হবে এবং সমস্ত ঈমানদারের কাছে সে অপছন্দনীয় হবে।

মৃত্যুর সময়ে তিন মুসীবত হচ্ছে- ১. তার রূহ এমতাবস্থায় কব্জ করা হবে যে, সে তৃষ্ণার্ত হবে। এমনকি সে সমস্ত নদীর পানি পান করে নিলেও মৃত্যুর সময় তৃষ্ণার্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে। ২. তার রূহ খুবই কষ্টের সাথে বের হবে এবং ৩. তার ঈমান বিনষ্টের আশঙ্কা থাকবে। (না'ঊযুবিল্লাহ)

কবরে যে তিন মুসীবত সম্পর্কে ইরশাদ করা হয়েছেঃ ১. প্রথম মুসীবত হলো মুনকার ও নকীর খুবই কঠোরতার সাথে প্রশ্ন করবেন, ২. কবরের মধ্যে ঘোর অন্ধকার হবে এবং ৩. তৃতীয় মুসীবত হলো, কবর এমন সংকীর্ণ হয়ে যাবে যে, উভয় পাঁজরের হাড্ডি একাকার হয়ে যাবে।

ক্বিয়ামতের তিন মুসীবতের অবস্থা হচ্ছে- সরকারে দু'আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর আলীশান ফরমান, সে ক্বিয়ামতের দিন যে তিন মুসীবতের সম্মুখীন হবে, তা হলোঃ ১. হিসেব-নিকাশ খুবই কড়াকড়ির সাথে হবে, ২. তার উপর আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লার গযব হবে এবং ৩. আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা তাকে আগুনের শাস্তি দেবেন। [দুররাতুন নাসেহীন]

জামা'আত বর্জন করার জন্য বিশটি অজুহাত

১. এমন রোগী, যার মসজিদ পর্যন্ত যেতে কষ্ট হয়, ২. পঙ্গু, ৩. যার পা কাটা গেছে, ৪. যার অর্ধাঙ্গ রোগ হয়েছে, ৫. এমন বৃদ্ধ যে মসজিদ পর্যন্ত যেতে অপরাগ, ৬. অন্ধ, যদিওবা কেউ হাত ধরে মসজিদ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়, ৭. ভীষণ বৃষ্টি, ৮. মসজিদে যাওয়ার পথে অতিরিক্ত কাদা, ৯. ভীষণ ঠাণ্ডা, ১০. ঘোর অন্ধকার, ১১. ঘুর্ণিঝড়, ১২. মাল বা খাবার বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা, ১৩. এ ভয়ে যে কর্জ দাতা ধরে ফেলবে, ১৪. পায়খানার কষ্ট, ১৫. প্রস্রাবের কষ্ট, ১৬. পেট থেকে ঘন ঘন বায়ু বের হওয়ার ওযর, ১৭. খাবার উপস্থিত এবং মনটাও খাবারের দিকে, ১৮. কাফেলা চলে যাওয়ার ভয়, ১৯. যালিমের ভয়, ২০. রোগীর সেবাশুশ্রুষা- জামা'আত সহকারে নামায পড়তে গেলে রোগীর কষ্ট হয় বা সে ভয় পায়। এ সমস্ত অজুহাতের যে কোন একটির কারণে জামা'আত বর্জনকারী গুনাহ্গার হবে না। [বাহারে শরীয়ত]

প্রথম কাতারের ফযীলতঃ হযরত সায়্যিদুনা আবূ হোরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, সরকারে মদীনা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, যদি লোকেরা জান্তো যে আযান ও প্রথম কাতারে কি আছে, তাহলে লটারী ছাড়া কেউ সুযোগ পেতো না। তাই এর জন্য লটারী প্রয়োজন হতো। [বোখারী, মুসলিম]

আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা এবং তার মাসুম ফিরিশতাগণ প্রথম কাতারের নামাযীদের উপর রহমত প্রেরণ করেন। এজন্য প্রথম কাতারে স্থান পাওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করুন। প্রায় সময় প্রথম কাতারে জায়গা থাকা সত্ত্বেও আমাদের অনেকে অবহেলার কারণে পেছনের কাতারে পড়ে থাকে। নিম্নের হাদীস পড়ুন এবং প্রথম কাতারের গুরুত্ব ও ফযীলত বুঝার চেষ্টা করুন-

হযরত সায়্যেদুনা আবূ উমামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তাজেদারে মদীনা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, আল্লাহ আয্যা

ওয়া জাল্লা এবং তাঁর ফিরিশতাগণ দুরূদ প্রেরণ করেন প্রথম কাতারের উপর। সাহাবা-ই কেরাম আলাইহিমুর রিদ্বওয়ান পুনরায় আরয করলেন, এয়া রাসুলাল্লাহ্! (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) দ্বিতীয়ের উপরও? হুযূর-ই করীম ফরমালেন, দ্বিতীয়ের উপরও।

হযরত সায়্যেদুনা আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত তাজেদারে মদীনা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, যে কাতারকে মিলাবে আল্লাহ তাকে মিলাবেন এবং যে কাতার ছিন্ন করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ছিন্ন করবেন। যতক্ষণ প্রথম কাতারে একজনেরও জায়গা খালি থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত কখনো দ্বিতীয় কাতার শুরু করবেন না।

কাতারসমূহ ঠিক করার ব্যাপারে আমাদের পূর্ণ মনযোগ দেয়া চাই। কারণ কাতারসমূহ পূর্ণ করার মধ্যে অগণিত ফযীলত রয়েছে এবং কাতার ঠিক করার সময় সজাগ দৃষ্টি রাখা চাই, যেন কোথাও জায়গা খালি না থাকে এবং কাতার এলোমেলোও না হওয়া চাই। কাতারসমূহকে এলোমেলো করে রাখা আমাদের প্রিয় আক্বা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াআলিহি ওয়াসাল্লাসাম-এর নিকট খুবই অপছন্দনীয় ছিলো।

মাসবূক্ব সম্পর্কিত মাসা-ইল

মাসবূক্ব হচ্ছে যে ব্যক্তি জামা'আতে ওই সময় শামিল হয়, যখন ইমাম এক বা একাধিক রাক'আত পড়ে নেন। মাসবূক্বকে নামায শেষ পর্যন্ত ইমামের সাথে এবং বাদ পড়া রাক'আতগুলো একাকী আদায় করতে হয়।

মাসআলাঃ মাসবূক্ব ইমামকে বৈঠকে পেলে এভাবে শামিল হবে যে, প্রথমে নিয়্যত করে দাঁড়াবে এবং সোজা দাঁড়ানো অবস্থায় তকবীর-ই তাহরীমা বলবে। তারপর আরেকটি তাকবীর বলে ইমামের সাথে শামিল হবে, তাড়াহুড়া করবে না।

মাসআলাঃ মাসবূক্ব যদি চার রাক'আত বিশিষ্ট নামাযের চতুর্থ রাক'আতে জামা'আতে শামিল হয়, তাহলে সে ইমাম সালাম ফেরানোর পর দাঁড়িয়ে যাবে এবং আলহামদু ও অন্য একটি সূরা পড়ে এক রাক'আত পূর্ণ করে বৈঠক করবে এবং তাশাহ্হুদ পড়ে পুনরায় দাঁড়িয়ে যাবে এবং ওই রাক'আতেও আল্হামদু এবং অন্য একটি সূরা পড়বে আর এ রাক'আতে বৈঠক করবে না বরং আরো এক রাক'আত কেবল আলহামদু পড়ে শেষ বৈঠক করে নামায সমাপ্ত করবে।

মাসআলাঃ মাসবূক্ব যদি মাগরিবের তৃতীয় রাক'আতে শামিল হয়, তাহলে ইমামের সালাম ফেরানোর পর দাঁড়িয়ে যাবে। আলহামদু ও অন্য একটি সূরা সহকারে এক রাক'আত পড়ে বৈঠক করে পুনরায় দাঁড়িয়ে যাবে এবং আলহামদু ও অন্য একটি সূরা পড়ে আরেক রাক'আত পূর্ণ করবে এবং শেষ বৈঠক করে নামায

করবে। অর্থাৎ দু'রাক'আতেই আলহামদু ও অন্য সূরা পড়বে। এখানে ইমামের সাথে বৈঠকসহ আরও দু' বৈঠক হবে।

মাসআলাঃ যদি দু'রাক'আত বিশিষ্ট নামাযে প্রথম রাক'আত হয়ে যায়, তাহলে ইমামের পর মাসবূক্ব আলহামদু ও অন্য একটি সূরা সহকারে এক রাক'আত পড়বে।

মাসআলাঃ মাসবূক্ব যদি ভুলে ইমামের সাথে সালাম ফিরিয়ে নেয়, তাহলে নামায ভঙ্গ হবে না, বাদবাকী নামায ওঠে একাকী পড়ে নেবে। যদি ইমামের সাথে সাথে সালাম ফিরিয়ে নেয়, তাহলে সাজদা-ই সাহ্ভ দিতে হবে না, আর যদি ইমামের একটু পরেই সালাম ফেরায়, তাহলে সাজদা-ই সাহ্ভ ওয়াজিব হবে এবং যদি ইচ্ছাকৃতভাবে এ মনে করে সালাম ফিরানো যে, আমাকেও ইমামের সাথে ফিরানো উচিত, তাহলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। পুনরায় প্রথম থেকে ওই নামায পড়তে হবে। [দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার]

মাসআলাঃ কেউ ফরয নামায একাকী শুরু করলো এবং প্রথম রাক'আতের সাজদা করার আগে জামা'আত শুরু হয়ে যায়, এমতাবস্থায় স্বীয় নামায ভঙ্গ করে জামা'আতে শরীক হয়ে যাবে।

মাসআলাঃ যদি তিন রাক'আত পড়ার পর জামা'আত শুরু হয়, তাহলে জামা'আতে শামিল হওয়া যাবে না, একাকীই চার রাক'আত পূর্ণ করবে এবং পরে নফলের নিয়্যতে জামা'আতে শরীক হয়ে যাবে। কিন্তু আসরের নামাযে শামিল হওয়া যাবে না, কারণ আসরের পর নফল নাজায়েয।

মাসআলাঃ নফল কিংবা সুন্নাত অথবা ক্বাযা শুরু করলো এবং এমতাবস্থায় জামা'আত শুরু হলে নামায ভঙ্গ করবে না; শেষ করেই জামা'আতে শরীক হবে। অবশ্য নফল যদি চার রাক'আতের নিয়্যতে শুরু করে, তাহলে দু'রাক'আত পড়ে ভেঙ্গে ফেলবে। আর যদি তিন বা দু'রাকআতের হয়, তাহলে পূর্ণ করবে।

নামায ভঙ্গকারী বিষয়সমূহের বর্ণনা

মাসআলাঃ কথা বলা নামায ভঙ্গকারী। (অর্থাৎ নামাযে কথা বললে নামায ভঙ্গ হয়ে যায়, সেটা ইচ্ছাকৃত হোক বা ভুলে হোক, যৎ সামান্য কথা হোক বা বেশী।)

মাসআলাঃ এমন ধরনের কথাই নামায ভঙ্গ করে, যাতে এতটুকু আওয়াজ হয় যে, যদি কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকে তবে কমপক্ষে নিজে শুনতে পায়।

মাসআলাঃ কাউকে ভুলে সালাম করলে নামায ভঙ্গ হয়ে যায়, যদিওবা শুধু 'আস্সালামু' বলা হয় এবং 'আলাইকুম' বলেনি।

মাসআলাঃ মুখে সালামের জবাব দিলে নামায ভঙ্গ হয়ে যায় এবং হাত বা মাথার ইশারায় যদি সালামের জবাব দেয় তাহলে তা মাকরূহ। [দুররুল মুখতার, আলমগীরি]

মাসআলাঃ আনন্দদায়ক সংবাদের জবাবে 'আলহামদুলিল্লাহ' বললো বা মন্দ সংবাদে 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজে'উন' পড়লো অথবা আর্শ্চযজনক খবর শুনে 'সুবহানাল্লাহ' বা 'আল্লাহু আকবর' বললো, তাহলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে।

মাসআলাঃ মুক্বতাদী স্বীয় ইমাম ছাড়া অন্য কাউকে লোকমা দিলে নামায ভঙ্গ হয়ে যায়।

মাসআলাঃ ইমাম যদি স্বীয় মুক্ব্তাদী ছাড়া অন্য কারো লোক্বমা গ্রহণ করে, তাহলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে।

মাসআলাঃ আহ্ উহ্ জাতীয় শব্দ কোন ব্যাথা বা মুসবীবতের কারণে যদি বের হয় বা আওয়াজ করে কাঁদলে বা অন্য কোন শব্দ সৃষ্টি হলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি কান্নার আওয়াজ বা কোন শব্দ বের না হয়, তাহলে কোন ক্ষতি নেই। [আলমগীরী, রদ্দুল মুহতার]

মাসআলাঃ রুগীর মুখ দিয়ে অনিচ্ছাকৃতভাবে আহ, উহঃ শব্দ বের হলে নামায ভঙ্গ হবে না। অনুরূপ হাঁচি, হাই ও ঢেকুরে অনিচ্ছাকৃত শব্দ বের হলে তা মাফ। [দুররুল মুখতার]

মাসআলাঃ ফুঁকের মধ্যে আওয়াজ না হলে, নামায ভঙ্গকারী নয়। কিন্তু ইচ্ছাকৃত করাটা মকরূহ। আর যদি ফুঁকে হরফ বের হয়, যেমন উফ, তুক, তাহলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। [গুনিয়া]

মাসআলাঃ নামাযের মধ্যে ক্বোরআন মজীদ দেখে বা মেহরাব ইত্যাদির লিখা দেখে ক্বোরআন পড়লে নামায ভঙ্গ হয়ে যায়। অবশ্য যদি স্মরণ থেকে পড়া হয় এবং লেখার প্রতি দৃষ্টি পড়ে, তাহলে কোন ক্ষতি নেই। [রদ্দুল মুহতার]

মাসআলাঃ নামাযের আমল বর্হিভূত কিংবা নামাযকে সঠিক করার উদ্দেশ্য ব্যতীত 'আমলে কাসীর' করলে নামায ভঙ্গ হয়ে যায়। তবে 'আমলে ক্বলীল' করলে নামায ভঙ্গ হয় না। যে কাজটা করলে দূর থেকে দেখলে মনে হয় না যে, ওই ব্যক্তি নামাযে আছে বরং নামাযে নেই বলেই দৃঢ় ধারণা করা হয়, সে কাজকে 'আমলে কাসীর' বলা হয়, আর যে কাজটা করলে দূর থেকে দেখলে মনে হয় নামাযের মধ্যে আছে তাহলে সেটাকে 'আমলে ক্বলীল' বলা হয়।

মাসআলাঃ নামাযরত অবস্থায় জামা বা পায়জামা পরলে বা তহ্বন্দ বাঁধলে নামায ভঙ্গ হয়ে যায়।

মাসআলাঃ নামাযের মধ্যে পানাহার করলে যে কোন অবস্থায় নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। ইচ্ছাকৃত হোক বা ভুলে হোক, সামান্য হোক বা বেশী হোক, এমনকি তৈলবীজ না চিবায়ে গিলে ফেললে বা কোন ফোঁটা মুখে পতিত হলে তা গিলে ফেললে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে।

মাসআলাঃ নামাযের কোন রোকন বাদ পড়লে এবং সেটা সেই নামাযে আদায় করা না হলে, নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে।

মাসআলাঃ বিনা কারণে নামাযের কোন শর্ত বাদ দিলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে।

মাসআলাঃ শেষ বৈঠকের পর নামাযের সাজদা বা তিলাওয়াতে সাজদার কথা স্মরণ হলো, তাহলে ওটা আদায় করার পর পুণরায় বৈঠক না করলে, নামায হবে না।

মাসআলাঃ সাপ, বিচ্ছু মারলে নামায ভঙ্গ হয় না, যদি তিন কদম ও তিন আঘাতের প্রয়োজন না হয়; কিন্তু মারতে যদি তিন কদম বা এর অধিক এদিক সেদিক যেতে হয় বা তিন এর অধিক আঘাত করতে হয়, তাহলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে।

মাসআলাঃ নামাযে সাপ, বিচ্ছু মারার অনুমতি আছে, যদিওবা নামায ভঙ্গ হয়ে যায়।

মাসআলাঃ নামাযের অবস্থায় সাপ, বিচ্ছু মারা ওই সময় মুবাহ, যখন নিজের সামনের দিক দিয়ে যায় এবং কামড়াবে বলে ভয় হয়। যদি কামাড়ানোর ভয় না থাকে, তাহলে মাকরূহ। [আলমগীরী]

মাসআলাঃ এক রোকনে তিনবার চুলকালে নামায ভঙ্গ হয়ে যায়; অর্থাৎ একবার চুলকায়ে হাত সরিয়ে নিল, আবার চুলকায়ে হাত সরিয়ে নিল, পুনরায় চুলকাল এবং হাত সরিয়ে নিল। যদি একবার হাত রেখে কয়েকবার চুলকানো হয়, তাহলে একবার চুলকানোই হলো এবং নামায ভঙ্গ হবে না। [আলমগীর, গুনিয়া]

মাসআলাঃ তকবীর-ই তাহরীমা ব্যতীত অন্যান্য তকবীরে اَللّٰهُ (আল্লাহ)-এর اَلِف (আলিফ) কে কিংবা اَكْبَر (আকবর)-এর اَلِف (আলিফ) কে টেনে বললে অর্থাৎ আ-ল্লাহু আ-কবর বললে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি তাকবীর তাহরীমাতে এ রকম করা হয়, তাহলে নামায শুরুই হলো না। [দুররুল মুখতার ও অন্যান্য কিতাব]

মাসআলাঃ ক্বিরাত বা দোয়া মাসূরায় যদি এমন কোন ভুল হয় যাদ্বারা অর্থ বিকৃত হয়ে যায়, তাহলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে।

মাসআলাঃ নামাযীর সামনে দিয়ে মানুষ বা পশু গেলে, নামায ভঙ্গ হয় না। অবশ্য সামনে দিয়ে গমনকারী মানুষ গুনাহগার হবে। নামাযীর সামনে দিয়ে গমনকারী যদি জানতো যে এতে কী গুনাহ্, তাহলে চল্লিশ বছর দাঁড়িয়ে থাকা এমনকি মাটিতে ধ্বসে যাওয়াকে ভাল মনে করতো, তবুও নামাযীর সামনে দিয়ে কখনও গমন করতো না।

মাসআলাঃ যদি মাঠে নামাযীর সামনের তিন গজ বাদ দিয়ে গমন করে, তাহলে কোন দোষ নেই। কিন্তু ঘরে বা মসজিদে এ রকম করা যায় না।

মাসআলাঃ নামাযীর সামনে যদি সুতরাহ্ হয়, তাহলে সুতরার বাইরে দিয়ে গমন

করলে কোন ক্ষতি নেই। সুতরাহ্ হচ্ছে লাঠি কিংবা এ জাতীয় কোন বস্তু দ্বারা অন্তরাল তৈরি করা। সুতরাং এ সুতরাহ্ বা অন্তরাল একহাত উঁচু এক আঙ্গুল বরাবর মোটা হওয়া চাই। [দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার]

মাসআলাঃ সুতরাহ্ সামনের ডান দিকে স্থাপন করা উত্তম।

মাসআলাঃ গাছ, পশু, মানুষ ইত্যাদিও সুতরাহ্ হিসেবে বিবেচিত হয়। [গুনিয়া]

মাসআলাঃ জামা'আতের মধ্যে ইমামের সুতরাহ্ মুক্ব্তাদীর জন্য যথেষ্ট, মুক্ব্তাদীদের জন্য পৃথক পৃথক সুতরার প্রয়োজন নেই; সুতরাং জামা'আত চলাকালীন সময়ে মসজিদে মুক্ব্তাদীর সামনে দিয়ে গমন করা হলে কোন ক্ষতি নেই। [রদ্দুল মুহতার]

মাসআলাঃ নামাযীর সামনে দিয়ে গমনকারীদের বাধা দিতে চাইলে সুবহানাল্লাহ বলবে কিংবা উচ্চস্বরে ক্বিরাত পড়বে বা হাত দ্বারা ইশারা করবে; কিন্তু বার বার এ রকম না করা চাই। কারণ 'আমলে কাসীর' হয়ে গেলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। [দুররুল মুখতার, রুদ্দুল মুহতার]

নামাযের মাকরূহসমূহের বর্ণনা

মাসআলাঃ নামাযে কাপড়, শরীর বা দাড়ি নিয়ে খেলা করা মাকরূহ তাহরীমী। কাপড় গুটিয়ে নেয়া, যেমন সাজদায় যাবার সময় সামনে ও পেছন থেকে কাপড়গুটিয়ে নেয়া, যদিওবা আশপাশ থেকে রক্ষার জন্য হয়ে থাকে, মকরূহ তাহরীমী। আর যদি বিনা কারণে হয়, তাহলে এবং কাপড় ঝুলিয়ে দেয়া, যেমন মাথা ও কাঁধের উপর থেকে এভাবে ছেড়ে দেয়া যেন উভয় কিনারা ঝুলে থাকে, তাহলে মাকরূহ তাহরীমী।

মাআসলাঃ যদি জামা, শার্ট ইত্যাদি না পরে বরং পিঠের উপর এবং অন্য কিনারা পেটের উপর ঝুলিয়ে দেয়া মাকরূহ-ই তাহরীমী।

মাসআলাঃ কম্বল,চাদর ও শালের কিনারা ঝুঁলিয়ে রাখা নিষেধ ও মাকরূহে তাহরীমী। তবে যদি এক কিনারা অন্য কাঁধে হয় এবং অপর কিনারা ঝুলে থাকে তাহলে কোন ক্ষতি নেই। [দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার]

মাসআলাঃ জামার হাত বা আস্তিন গুটিয়ে নামায পড়া মকরূহে তাহরীমী। [দুররুল মুখতার]

মাসআলাঃ পুরুষ তার চুলের খোপা বেঁধে নামায পড়া মকরূহ তাহরীমী। আর নামাযরত অবস্থায় খোপা বাঁধলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে।

মাসআলাঃ কঙ্কর সরানো মাকরূহ তাহরীমী, তবে সুন্নাত মুতাবেক সাজদা আদায় করা না গেলে একবার সরানো যায়। আর যদি সরানো ছাড়া ঠিকমত ওয়াজিব আদায় না হয়, তাহলে একবার ওয়াজিব, যদিওবা কয়েকবার সরাতে হয়। [দুররুল মুখতার]

মাসআলাঃ আঙ্গুল মোচড়ানো, এক হাতের আঙ্গুল অন্য হাতের আঙ্গুলসমূহের ফাঁকে ঢুকানো মাকরূহ তাহরীমী। [দুররুল মুখতার]

মাসআলাঃ নামাযের জন্য যাবার সময় ও নামাযের জন্য অপেক্ষারত অবস্থায় উল্লেখিত কাজ দুটি মাকরূহ।

মাসআলাঃ কোমরে হাত রাখা মাকরূহ তাহরীমী, নামায ছাড়াও কোমরে হাত রাখা অনুচিত। [দুররুল মুখতার]

মাসআলাঃ নামাযে এদিক সেদিক মুখ ফিরিয়ে দেখা মকরূহ তাহরীমী, যদিও বা সামান্য মুখ ফিরানো হয়। তবে যদি মুখ না ফিরিয়ে কেবল চোখের কোণায় বিনা প্রয়োজনে এদিক সেদিক থাকায়, তাহলে মাকরূহ তানযীহী। অবশ্য কোন সঙ্গত প্রয়োজনে এভাবে তাকানোতে কোন ক্ষতি নেই। আসমানের দিকে দৃষ্টি দেয়াও মাকরূহ তাহরীমী।

মাসআলাঃ তাশাহহুদ বা দু'সাজদার মাঝখানে কুকুরের মত বসা (অর্থাৎ হাঁটু দু'টি বুকের সাথে লাগিয়ে হাত দু'টি মাটিতে রেখে পাছার উপর ভর করে বসা), পুরুষের সাজদায় বাহু বিছিয়ে দেয়া, কোন ব্যক্তির মুখোমুখি নামায পড়া ইত্যাদি মকরূহে তাহরীমী।

মাসআলাঃ যদি এমনভাবে কাপড় জড়ানো হয় যে, হাতও বাইরে থাকে না, তাহলে মাকরূহে তাহরীমী। এমননিতে বিনা প্রয়োজনে জড়ানো অনুচিত। অনুরূপ নাক-মুখ বেঁধে রাখাও মাকরূহ তাহ্রীমী।

মাসআলাঃ জামা, চাদর মওজুদ থাকা সত্ত্বেও কেবল পায়জামা বা লুঙ্গি পরে নামায পড়া মাকরূহ তাহরীমী। তবে না থাকলে মাফ।

মাসআলাঃ কোন আগমনকারীর জন্য নামায দীর্ঘায়িত করা মাকরূহ তাহরীমী। তবে জামা'আত পাবার উদ্দেশ্যে দু' এক তাসবীহ বরাবর দীর্ঘায়িত করা মাকরূহ নয়। [আলমগীরী]

মাসআলাঃ মাঝখানে কোন অন্তরাল ছাড়া কবর সামনে নিয়ে নামায পড়া মাকরূহ তাহরীমী। [দুররুল মুখতার, আলমগীরী]

মাসআলাঃ জবর দখলকৃত জায়গায় বা অপরের ক্ষেতে যেখানে শস্য মওজুদ রয়েছে বা জীবিত ক্ষেতের উপর নামায পড়া মাকরূহ তাহরীমী।

মাসআলাঃ কবরস্থানে যে জায়গাটি নামাযের জন্য নির্দিষ্ট এবং ওই জায়গায় যদি কারো কবর না থাকে, তাহলে নামায পড়লে কোন ক্ষতি নেই। মাকরূহ ওই সময় হয়ে থাকে, যখন কবর সামনে হয়, এবং নামাযী ও কবরের মাঝখানে সুতরাহ পরিমাণ কোন অন্তরাল না থাকে। অন্যথায় যদি ডানে, বামে, পেছনে কবর থাকে বা সুতরাহ বরাবর কোন কিছু অন্তরাল হিসেবে থাকে, তাহলে মাকরূহ নয়। [আলমগীরী, গুনিয়া, ক্বাযী খান]

মাসআলাঃ কাফিরদের ইবাদতখানায় নামায পড়া মাকরূহে তাহরীমী। কারণ সেটা শয়তানের জায়গা, বরং ওখানে যাওয়াও নিষেধ।

মাসআলাঃ উল্টা কাপড় পরিধান করে বা এমনি গায়ের উপর রেখে নামায পড়া মাকরূহে তাহরীমী। অনুরূপ আচকান, শিরওয়ানী ইত্যাদি বোতাম না লাগিয়ে যদি নামায পড়া হয় এবং আচকান ইত্যাদির নিচে জামা ইত্যাদি না থাকে ও বুক খোলা থাকে, তাহলে মাকরূহ তাহরীমী। আর যদি নিচে জামা ইত্যাদি থাকে, তাহলে মাকরূহ তানযীহী। [বাহারে শরীয়ত]

মাসআলাঃ যে কাপড়ে কোন প্রাণীর ছবি থাকে, সে কাপড় পরে নামায পড়া মাকরহে তাহরীমী। নামায ছাড়াও এমন কাপড় পরা নাজায়েয।

মাসআলাঃ যদি ছবি নামাযীর উপর অর্থাৎ ছাদে অঙ্কিত হয় বা ঝুলানো থাকে, বা সাজদার জায়গায় থাকে, তাহলে সেখানে বা ছবির উপর সাজদা দেয়া মাকরূহে তাহরীমী। অনুরূপ নামাযীর সামনে, ডানে বামে ছবি থাকা মাকরূহ তাহরীমী, পেছনে থাকাও মাকরূহ।

মাসআলাঃ যদি ছবি বিছানায় থাকে এবং ওটার উপর সাজদা পতিত না হয়, তাহলে মকরূহ নয়। [হেদায়া, ফতহুল ক্বদীর]

মাসআলাঃ ছবি যদি কোন প্রাণীর না হয়, যেমন পাহাড়, নদী, গাছ, ফুল, পাতা ইত্যাদির হয়ে থাকে, তবে কোন ক্ষতি নেই। [ফতহুল ক্বদীর]

মাসআলাঃ থলে বা পকেটে ছবি অদৃশ্যভাবে থাকলে নামায মাকরূহ হয় না। [দুররুল মুখতার]

মাসআলাঃ ছবি অঙ্কিত কাপড়ের উপর অন্য কাপড় বিছিয়ে নিলে সেটার উপর নামায মাকরূহ হবে না। [রদ্দুল মুহতার]

মাসআলাঃ ছবি যদি অবমাননার জায়গায় থাকে, যেমন জুতা খোলার জায়গায় কিংবা এমন জায়গায় যেখানে পা মোছা হয়, তাহলে তা নামাযের জন্য ক্ষতিকারক নয়। তবে শর্ত হলো যে, সেটার উপর যদি সিজদা না পড়ে। [দুররুল মুখতার]

মাসআলাঃ যদি ছবি এত ছোট হয় যে, দাঁড়িয়ে তাকালে সেটার শরীরের অংগ সমূহ পৃথক পৃথক দেখা যায় না, তাহলে এ ধরনের ছবি নামাযীর আগে, পেছনে, ডানে, বামে থাকলে নামায মাকরূহ হবে না।

মাসআলাঃ যদি ছবির পূর্ণ চেহারা বিলীন করে দেয়া হয়, তাহলে মাকরূহ নয়। [হেদায়া ইত্যাদি]

মাসআলাঃ ছবির উল্লেখিত আহ্‌কাম হচ্ছে নামাযের ব্যাপারে; নামাযের বাইরে ছবি রাখা সম্পর্কে হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যে ঘরে কুকুর কিংবা ছবি থাকে, ওই ঘরে রহমতের ফিরিশ্‌তা আসেন না। [ফতহুল ক্বদীর ও অন্যান্য কিতাব]

মাসআলাঃ ছবি তোলা ও তোলানো উভয়টা হারাম। হাতে হোক বা ক্যামেরায় হোক, উভয়ের একই হুকুম, তবে বিশেষ প্রয়োজনে অনুমতি আছে।

মাকরূহে তানযীহী

মাসআলাঃ রুকূ'-সাজদায় বিনা প্রয়োজনে তাসবীহ্ তিনবারের কম বলা মাকরূহ তানযীহী। তবে যদি সময় সংকীর্ণ হয় বা গাড়ী চলে যাবার ভয় হয়, তাহলে কোন দোষ নেই।

মাসআলাঃ অন্য কাপড় মওজুদ থাকা অবস্থায় কাজ কর্মের কাপড় দ্বারা নামায পড়া মাকরূহ তানযীহী, অন্যথায় মাকরূহ নয়।

মাসআলাঃ অলসতা করে খালি মাথায় নামায পড়া অর্থাৎ টুপি বোঝা বা গরম মনে করে খালি মাথায় নামায পড়া মাকরূহ তানযীহী। আর যদি নামাযকে নগণ্য মনে করে খালি মাথায় নামায পড়ে অর্থাৎ যদি এ রকম মনে করা হয় যে, নামায কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়, যার জন্য টুপি, পাগড়ী পরা চাই, তাহলে এটা কুফরী এবং যদি বিনয় প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে খালি মাথায় নামায পড়া হয়, তাহলে মুস্তাহাব। [দুররুল মুখতার, বাহার]

মাসআলাঃ নামাযে টুপি পড়ে গেলে তা উঠিয়ে নেয়া উত্তম, যদি 'আমলে কাসীর' না হয়। অন্যথায় নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। বার বার উঠাতে হলে, বাদ দেয়া চাই। [দুররুল মুখতার, বাহার]

মাসআলাঃ মাথা থেকে বালি বা খড়কুটা পরিস্কার করা মাকরূহ, যদি এর দ্বারা নামাযে কোন অস্বস্তিবোধ না হয়। যদি অহংকারের কারণে পরিস্কার করা হয়, তাহলে মকরূহে তাহরীমী। আর যদি অস্বস্তিকর হয় বা মন বিগড়ে যায়, তাহলে কোন দোষ নেই। নামাযের পর পরিস্কার করলে কোন ক্ষতি নেই; বরং পরিস্কার করে ফেলা উচিত; যেন কোন রিয়ার ধারণা না আসে। [আলমগীরী]

মাসআলাঃ প্রয়োজনবোধে কপাল থেকে ঘাম মুছে ফেলা, বরং সে ধরনের যাবতীয় 'আমলে ক্বলীল' (সামান্য কাজ), যা নামাযীর জন্য উপকারী, তা জায়েয। আর যা উপকারী নয়, তা মাকরূহ। [আলমগীরী]

মাসআলাঃ নামাযে নাক দিয়ে পানি বের হলে, তা মাটিতে পড়া থেকে মুছে ফেলা উত্তম। আর যদি মসজিদে হয়, তাহলে মুছে ফেলা আবশ্যক, যেন মসজিদে পতিত না হয়। [আলমগীরী]

মাসআলাঃ নামাযে বিনা কারণে চার জানু হয়ে বসা মাকরূহ। তবে কোন ওযর থাকলে ক্ষতি নেই। অবশ্য নামায ছাড়া অন্য কোন সময় এ রকম বসলে কোন ক্ষতি নেই। [দুররুল মুখতার]

মাসআলাঃ সাজদায় যাবার সময় হাঁটুর আগে হাত রাখা এবং সাজদা থেকে উঠার সময় বিনা কারণে হাতের আগে পা উঠানো মাকরূহ। [গুনিয়া]

মাসআলাঃ রুকূ'তে মাথা পিঠ থেকে উপরে বা নিচে রাখা মাকরূহ। [গুনিয়া]

মাসআলাঃ উঠার সময় আগে পরে পা উঠানো মাকরূহ্।

মাসআলাঃ উকুন বা মশা যখন বিরক্ত করে, তখন মেরে ফেললে কোন ক্ষতি নেই। তবে যেন 'আমলে কাসীর' প্রকাশ না পায়। [গুনিয়া,বাহার]

মাসআলাঃ মসজিদের ছাদে নামায পড়া মাকরূহ, তবে ভিতরে জায়গা খালি না থাকলে পড়া যাবে। [আলমগীরী]

মাসআলাঃ কোন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বা বসে কথা বলছে। যদি তার কথা দ্বারা মনে পরিবর্তন না আসে, তাহলে তার পেছনে নামায পড়া মাকরূহ নয়। [দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার]

মাসআলাঃ বিনা কারণে হাত দ্বারা মাছি, মশা তাড়ানো মাকরূহ্। [আলমগীরী]

মাসআলাঃ যে সব জিনিস মন আকর্ষণ করে, সেগুলোর সামনে নামায মাকরূহ। যেমন সাজসজ্জা, খেলাধুলা ইত্যাদি।

মাসআলাঃ নামাযের জন্য দৌড়াঁনো মাকরূহ্ । [রদ্দুল মুহতার]

নামায ভঙ্গের অজুহাতসমূহ

[অর্থাৎ কোন্ কোন্ অবস্থায় নামায ভঙ্গ করা জায়েয]

মাসআলাঃ কোন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি যদি সাহায্য প্রার্থনা করে, কোন নির্দিষ্ট নামাযী বা সাধারণভাবে যে কোন লোকজনকে আহবান করে বা কেউ পানিতে ডুবে যাচ্ছে বা আগুনে পুড়ে যাচ্ছে বা কোন অন্ধ পথিক কুপে পতিত হচ্ছে, এসব অবস্থায় নামায ভঙ্গ করা ওয়াজিব, যদি ওই নামাযী তাকে রক্ষা করার ক্ষমতা রাখে। [দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার]

মাসআলাঃ প্রস্রাব, পায়খানার প্রয়োজন অনুভব করলে অথবা কাপড় বা শরীরে এতটুকু নাপাকী দেখলে, যাদ্বারা নামায নাজায়েয হয়না বা নামাযীকে কোন অপরিচিতা মহিলা স্পর্শ করলে, এসব অবস্থায় নামায ভঙ্গ করা মুস্তাহাব, যদি জামা'আতের ওয়াক্ত থাকে। আর যদি প্রস্রাব-পায়খানার জোর খুব বেশী হয়, তাহলে জামা'আত চলে গেলেও ভঙ্গ করা যাবে। তবে ওয়াক্তের কথা খেয়াল রাখতে হবে। [রদ্দুল মুহতার]

মাসআলাঃ যদি নফল নামায পড়া অবস্থায় মা-বাপ, দাদা-দাদী প্রমুখ উর্ধ্বতনের পক্ষ থেকে ডাক দেয়া হয় এবং নামাযরত অবস্থার কথা তাদের জানা না থাকে, তাহলে নামায ভঙ্গ করবে এবং ডাকের জবাব দিবে। [দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার]

কয়েকটি সূরা

সূরা ফাতিহা

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহমা-নির রাহী-ম

আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ ۙ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ۙ مٰلِكِ يَوۡمِ الدِّيۡنِ ؕ اِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَاِيَّاكَ نَسۡتَعِيۡنُ ؕ اِهۡدِنَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِيۡمَ ۙ صِرَاطَ الَّذِيۡنَ اَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ ۙ۬ غَيۡرِ الۡمَغۡضُوۡبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا الضَّآلِّيۡنَ ۧ

উচ্চারণ ঃ আল্ হামদু লিল্লা-হি রাব্বিল্ আ-লামী-ন। আররাহ্মা-নির রাহী-ম। মা-লিকি ইয়াওমিদ্দী-ন। ইয়্যা-কা না'বুদু ওয়া ইয়্যা-কা নাস্তা'ঈ-ন্। ইহ্দিনাস্ সিরা-ত্বাল মুসতাক্বী-ম। সেরা-ত্বাল্ লাযী-না আন্'আম্তা আলাইহিম; গাইরিল্ মাগদ্বুবি আলায়হিম ওয়া লাদ্ দ্বোয়া---ল্লী-ন। (আ-মী-ন)

তরজমাঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সমস্ত জগতবাসীর মালিক (রব), পরম দয়ালু করুণাময়। বিচার-দিনের মালিক, আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করো; তাদেরই পথে, যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছো; তাদের পথে নয়, যাদের উপর গযব নাযিল হয়েছে এবং পথ ভ্রষ্টদের পথেও নয়।

সূরা ফীল

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহমা-নির রাহী-ম

আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়

اَلَمۡ تَرَ كَيۡفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصۡحٰبِ الۡفِيۡلِ ؕ اَلَمۡ يَجۡعَلۡ كَيۡدَهُمۡ فِىۡ تَضۡلِيۡلٍ ۙ وَّاَرۡسَلَ عَلَيۡهِمۡ طَيۡرًا اَبَابِيۡلَ ۙ تَرۡمِيۡهِمۡ بِحِجَارَةٍ مِّنۡ سِجِّيۡلٍ ۙ فَجَعَلَهُمۡ كَعَصۡفٍ مَّاۡكُوۡلٍ ۧ

উচ্চারণঃ আলাম তারা কাইফা ফা'আলা রাব্বুকা বিআস্হা-বিল্ ফী-ল। আলাম্ ইয়াজ্'আল্ কাইদাহুম্ ফী- তাদ্বলী-লিওঁ ওয়া আর্সালা 'আলাইহিম্ ত্বায়াইরান আবা-বী-ল্। তারমী-হিম্ বি হিজি-রাতিম মিন্ সিজ্জী-ল। ফাজা'আলাহুম্ কা'আসফিম্ মা'কূ-ল।

তরজমাঃ হে মাহবুব! (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়কা ওয়াসাল্লাম!) আপনি কি দেখেননি, আপনার প্রতিপালক ওই সকল হস্তীবাহিনীর কী অবস্থা করেছেন? তাদের চক্রান্তকে কি ধ্বংসে পতিত করেননি? এবং তাদের উপর পাখীর ঝাঁকসমূহ প্রেরণ করেছেন, যেগুলো তাদেরকে কংকর-পাথর দিয়ে মেরেছিলো। অতঃপর তাদেরকে ভক্ষিত ক্ষেত্রের পল্লবের ন্যায় করেছেন।

সূরা ক্বোরাঈশ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহমা-নির রাহী-ম

আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۙ اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ۚ فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ۙ
الَّذِىْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ۵ وَّ اٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۚ

উচ্চারণঃ লি-ঈলা-ফি ক্বোরাইশিন্ ঈ-লা-ফিহিম্ রিহ্‌লাতাশ্ শিতা-ই ওয়াস্ সোয়াইফ্। ফাল্‌ইয়া'বুদূ রাব্বা হা-যাল্ বাইতিল্লাযী- আত্ব'আমাহুম্ মিনজূ-'ইওঁ ওয়া আ-মানাহুম মিন্ খাওফ্।

তরজমাঃ এ জন্য যে, ক্বোরাঈশকে আকর্ষণ প্রদান করেছেন। তাদের শীতকাল ও গ্রীষ্মকাল উভয়ের পরিক্রমার আকর্ষণ প্রদান করেছেন। সুতরাং তাদের উচিৎ যেন তারা এ ঘরের প্রতিপালকের বন্দেগী করে, যিনি তাদেরকে ক্ষুধার্তাবস্থায় আহার দিয়েছেন এবং তাদেরকে এক ভীষণ ভীতি থেকে নিরাপত্তা দান করেছেন।

সূরা মা'ঊন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহমা-নির রাহী-ম

আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়

اَرَاَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ۗ فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ۙ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى
طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۗ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۙ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۙ الَّذِيْنَ
هُمْ يُرَآءُوْنَ ۙ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ۚ

উচ্চারণঃ আরাআইতাল্লাযী- ইয়ুকায্‌যিবু বিদ্দী-ন। ফাযা-লিকাল্লাযী- ইয়াদু''উল ইয়াতী-ম, ওয়ালা- ইয়াহুদ্দু 'আলা- ত্বা'আ-মিল্ মিস্‌কী-ন। ফাওয়াইলুল্ লিল্ মুসাল্লী-নাল্ লাযী-না হুম্ 'আন্ সালা-তিহিম্ সা-হূ-ন। আল্লাযী-না হুম্ ইয়ুরা----উ-না ওয়া ইয়াম্‌না'উ-নাল মা-'উ-ন।

তরজমাঃ আচ্ছা দেখুন তো- যে ধর্মকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, অতঃপর সে ওই ব্যক্তি, যে এতিমকে ধাক্কা দেয় এবং মিসকীনকে আহার দেয়ার প্রেরণা প্রদান করে না। সুতরাং ওই নামাযীদের জন্য অনিষ্ট আছে, যারা আপন নামায থেকে ভুলে বসেছে। ওই সকল ব্যক্তি, যারা লোক দেখানো (ইবাদত) করে এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রী চাইলে দেয় না।

সূরা কাউসার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহমা-নির রাহী-ম

আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়

اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ۗ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۗ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ۚ

উচ্চারণঃ ইন্না---আ'ত্বাইনা-কাল্‌কাওসার। ফাসল্লি লিরাব্বিকা ওয়ান্‌হার। ইন্না শা-নিআকা হুয়াল আব্‌তার।

তরজমাঃ (হে মাহবুব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়কা ওয়াসাল্লাম)! নিশ্চয় আমি আপনাকে কাওসার (অসংখ্য সৌন্দর্য ও গুণাবলী) দান করেছি। সুতরাং আপনি আপনার প্রতিপালকের জন্য নামায পড়ুন এবং ক্বোরবানী করুন। নিশ্চয় আপনার শত্রুই সকল মঙ্গল থেকে বঞ্চিত।

সূরা কাফেরূ-ন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহমা-নির রাহী-ম

আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۙ لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۗ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۚ وَلَآ اَنَا
عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۙ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۗ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ ۚ

উচ্চারণঃ ক্বুল্ ইয়া---আইয়্যুহাল কা-ফিরূ-ন। লা---আ'বুদূ মা-তা'বুদূ-ন। ওয়ালা---আন্‌তুম্ 'আ-বিদূ-না মা-আ'বুদু। ওয়ালা---আনা 'আ-বিদুম মা- 'আবাত্তুম ওয়ালা---আনতুম আ-বিদূ-না মা--আ'বুদ; লাকুম্ দ্বী-নু-কুম্ ওয়া লিয়া দ্বী-ন।

তরজমাঃ আপনি বলুন, হে কাফিরগণ! আমি উপাসনা করছি না যার তোমরা উপাসনা কর, না তোমরা উপাসনা করছ যাঁর আমি উপাসনা করছি এবং না আমি উপাসনাকারী যার তোমরা উপাসনা করো আর আমি যার উপাসনা করি তার উপাসনাকারী তোমরা নও। তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম এবং আমার জন্য আমার ধর্ম।

সূরা নাস্‌র

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহমা-নির রাহী-ম

আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়

اِذَا جَآءَ نَصۡرُ اللّٰهِ وَالۡفَتۡحُ ۙ﴿۱﴾ وَرَاَیۡتَ النَّاسَ یَدۡخُلُوۡنَ فِیۡ دِیۡنِ اللّٰهِ اَفۡوَاجًا ۙ﴿۲﴾
فَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّکَ وَاسۡتَغۡفِرۡهُ ؕ اِنَّهٗ کَانَ تَوَّابًا ﴿۳﴾

উচ্চারণঃ ইযা- জা----আ নাসরুল্লা-হি ওয়াল্ ফাত্‌হু; ওয়া রাআইতান্‌নাসা ইয়াদ্‌খুলূ-না ফী-দী-নিল্লা-হি আফ্‌ওয়া-জা-ন, ফাসাব্‌বিহ্ বিহাম্‌দি রাব্বিকা ওয়াস্‌তাগ্‌ফিরহু ইন্নাহূ- কা-না তাওয়া-বা-।

তরজমাঃ যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে এবং আপনি লোকদেরকে দেখবেন যে, তারা আল্লাহর দ্বীনে দলে দলে প্রবেশ করছে। অতঃপর আপনি স্বীয় প্রতিপালকের প্রশংসাকারীরূপে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর নিকট থেকে (উম্মতের জন্য) ক্ষমা চান!। নিশ্চয় তিনি তাওবা ক্ববূলকারী।

সূরা লাহাব

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহমা-নির রাহী-ম

আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়

تَبَّتۡ یَدَاۤ اَبِیۡ لَهَبٍ وَّ تَبَّ ؕ﴿۱﴾ مَاۤ اَغۡنٰی عَنۡهُ مَالُهٗ وَ مَا کَسَبَ ؕ﴿۲﴾ سَیَصۡلٰی نَارًا ذَاتَ
لَهَبٍ ۚ﴿۳﴾ وَّ امۡرَاَتُهٗ ؕ حَمَّالَةَ الۡحَطَبِ ۚ﴿۴﴾ فِیۡ جِیۡدِهَا حَبۡلٌ مِّنۡ مَّسَدٍ ﴿۵﴾

উচ্চারণঃ তাব্বাত্ ইয়াদা---আবী লাহাবিওঁ ওয়াতাব্ব্। মা-আগ্‌না- 'আনহু মা-লুহূ ওয়ামা-কাসাব। সাইয়াস্‌লা- না-রান্ যা-তা লাহাবিওঁ ওয়াম্‌রাআতুহ্, হাম্মা-লাতাল হাত্বাব। ফী-জী-দিহা-হাবলুমমিম্‌মাসাদ।

তরজমাঃ আবূ লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হয়ে যাক এবং সে ধ্বংস হয়ে গেছে। তার কোন কাজে আসেনি তার ধন-সম্পদ এবং না যা সে উপার্জন করেছে। অতি শীঘ্রই সে লেলিহান আগুনে প্রবিষ্ট হবে এবং তার স্ত্রী, যে লাকড়ির বোঝা মাথায় বহনকারিনী। তার গলায় খেজুরের বাকলের রশি।

সূরা ইখ্‌লাস

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহমা-নির রাহী-ম

আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়

قُلۡ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ﴿۱﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ﴿۲﴾ لَمۡ یَلِدۡ ۬ۙ وَ لَمۡ یُوۡلَدۡ ۙ﴿۳﴾ وَ لَمۡ یَکُنۡ لَّهٗ کُفُوًا اَحَدٌ ﴿۴﴾

উচ্চারণঃ কুল্ হুওয়াল্লা-হু আহাদ্। আল্লা-হুস্ সামাদ। লাম্ ইয়ালিদ্ ওয়ালাম্ ইয়ূ-লাদ্। ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহূ- কুফু-য়ান আহাদ্।

তরজমাঃ আপনি বলুন! আল্লাহ এক, আল্লাহ পরমুখাপেক্ষী নন। তিনি কাউকে জন্ম দেন্‌নি এবং তিনি কারো থেকে জন্ম নেননি এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।

সূরা ফালাক্ব

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহমা-নির রাহী-ম

আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়

قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ الۡفَلَقِ ۙ﴿۱﴾ مِنۡ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ﴿۲﴾ وَ مِنۡ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۙ﴿۳﴾ وَ مِنۡ
شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِی الۡعُقَدِ ۙ﴿۴﴾ وَ مِنۡ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ﴿۵﴾

উচ্চারণঃ কুল্ আ'ঊ-যু বিরাব্বিল্ ফালাক্ব। মিন শার্‌রি মা-খালাক্ব। ওয়ামিন শার্‌রি গা-সিক্বিন ইযা- ওয়াক্বাব। ওয়া মিন শার্‌রিন্ নাফ্‌ফা-সা-তি ফিল্ 'ওক্বাদ। ওয়া মিন্ শার্‌রি হা-সিদিন ইযা- হাসাদ্।

তরজমাঃ আপনি বলুন, আমি তাঁরই আশ্রয় গ্রহণ করছি, যিনি প্রভাতের সৃষ্টিকর্তা- তাঁর সৃষ্টিকুলের অনিষ্ট থেকে এবং অন্ধকারাচ্ছন্নকারী থেকে, যখন তা অস্তমিত হয় এবং ওই সকল মেয়েদের অনিষ্ট থেকে, যারা গ্রন্থিসমূহে ফুৎকার দেয় এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে, যখন সে (আমার প্রতি) হিংসাপরায়ণ হয়।

সূরা নাস্

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহমা-নির রাহী-ম

আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়

قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ﴿۱﴾ مَلِکِ النَّاسِ ۙ﴿۲﴾ اِلٰهِ النَّاسِ ۙ﴿۳﴾ مِنۡ شَرِّ الۡوَسۡوَاسِ ۬ۙ
الۡخَنَّاسِ ۙ﴿۴﴾ الَّذِیۡ یُوَسۡوِسُ فِیۡ صُدُوۡرِ النَّاسِ ۙ﴿۵﴾ مِنَ الۡجِنَّةِ وَ النَّاسِ ﴿۶﴾

উচ্চারণঃ কুল আ'ঊ-যু বিরাব্বিন্ না-স্। মালিকিন্ না-স। ইলা-হিন্ না-স। মিন্ শার্‌রিল ওয়াস্‌ওয়া-সিল্ খান্না-স। আল্লাযী- ইয়ুওয়াস্‌ভিসু ফী- সুদূ-রিন না-স, মিনাল্ জিন্নাতি ওয়ান্না-স্।

তরজমাঃ আপনি বলুন, আমি তাঁর আশ্রয়ে এসেছি, যিনি সকল মানুষের প্রতিপালক, সকল মানুষের অধিপতি, সকল লোকের খোদা- তার ক্ষতি থেকে, যে অন্তরে কুমন্ত্রণা ছড়ায় এবং লুকিয়ে থাকে, যে মানুষের অন্তরসমূহে- কু-প্ররোচনা দেয়- জিন্ ও মানুষ।

কতিপয় নফল নামায

ইশ্‌রাক্বের নামায

সময় ও নিয়মঃ ফজরের নামায শেষ করে, ওই জায়নামাযে বসেই আল্লা-হু আল্লা-হু যিক্‌র করতে করতে সূর্য উদিত হয়ে আলো ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথেই দু'রাক'আত করে চার রাক'আত ইশ্‌রাকের নামায পড়তে হয়। সূরা ফাতিহার সাথে অন্য যে কোন সূরা মিলিয়ে পড়াই এর নিয়ম।

দু'রাক'আত ইশ্‌রাক্ব নামাযের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْاِشْرَاقِ ۔ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى
مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লা-হি তা'আলা রাক'আতাই সালাতিল ইশ্‌রাক্ব। সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারী-ফাতি আল্লাহু আকবর।

এটা সুন্নাতে গায়র মোআক্কাদাহ্, অর্থাৎ নফল পর্যায়ের নামায।

ফযীলতঃ এই নামায আদায়কারী একটি হজ্ব ও একটি ওমরা পালনের সমতুল্য সাওয়াব পাবে। আল্লাহ্ তা'আলা তার ওই দিনের সমস্ত কাজ নিজ রহমতে সমাধান করে দেয়ার জন্য যিম্মাদার হয়ে যান এবং তার জন্য বেহেশতে ৭০টি প্রাসাদ তৈরি করেন। [শরহে বেক্বায়া]

চাশ্‌তের নামায

সময় ও নিয়ম ঃ ইশ্‌রাক্বের নামাযের পর হতেই চাশ্‌তের নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয়ে দ্বিপ্রহরের আগ পর্যন্ত থাকে। এ নামাযের অপর নাম 'দ্বোহার নামায'। এটা দু'দু' রাক্'আত করে নিয়্যত বেঁধে আট রাক'আত পর্যন্ত পড়া যায়। আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রায়ই চার রাক'আত পড়তেন। আলহামদু ও অন্য যে কোন সূরা মিলিয়ে এ নামায পড়া যায়। এটাও সুন্নাতে গায়র মোয়াক্কাদাহ্।

দু'রাক'আত চাশ্‌ত বা দ্বোহার নামাযের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الضُّحٰى ۔ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى
مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাক্'আতাই সালাতিদ্ব্ দ্বোহা, সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা- জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবর।

ফযীলত

১. আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি দ্বোহার নামায আদায় করে, সে ব্যক্তি একটি কবুল হজ্ব ও একটি ওমরার সওয়াব পায়।" হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম একটু চুপ থেকে আবার বলেন, পূর্ণ, পূর্ণ এক হজ্ব ও এক ওমরার সওয়াব পাবে"। [মিশকাত শরীফ]

২. নবীকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি নিয়মিতভাবে দ্বোহার নামায আদায় করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেন যদি তা সমুদ্রের ফেনাপুঞ্জের সমানও হয়।" [মিশকাত শরীফ]

দ্বোহার নামায আদায়কারীর সমস্ত অভাব-অভিযোগ আল্লাহ তা'আলা দূর করে দেন। [হিস্‌নে হাসীন, আল ক্বাওলুল জামীল]

আওয়াবীনের নামায

'সালাতুল আওয়াবীন' বা আওয়াবীনের নামাযের সময়সীমা মাগরিবের নামাযের ফরয ও সুন্নাতের পর হতে আরম্ভ হয়ে এশার নামাযের সময় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে। এ সময় দু' দু' রাক'আত করে ছয় রাক'আত নফল নামায পড়ার বিধান রয়েছে। এ নামায পড়ায় অনেক সাওয়াব রয়েছে। তিরমিযী শরীফে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, "যে ব্যক্তি মাগরিবের পর ছয় রাক'আত (আওয়াবীন) নামায আদায় করবে, সে ব্যক্তি একাধারে বার বছর পর্যন্ত দিনে রোযা রেখে সারারাত্রি জেগে ইবাদত-বন্দেগী করার সমপরিমাণ সাওয়াব লাভ করবে।" এ নামাযে অত্যোধিক ফযীলতের কারণেই বুযুর্গানে দ্বীন নিয়মিত এ নামায আদায় করে থাকেন এবং ভক্ত অনুরক্ত ও মুরীদদেরকে এ নামায পড়ার তাগিদ দিয়ে থাকেন।

দু'রাক'আত আওয়াবীন নামাযের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْاَوَّابِيْنَ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ
الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণঃ নাওয়াইতু-আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাক'আতাই সালাতিল আওয়াবীন, মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবর।

আওয়াবীনের নামায পড়ার নিয়মঃ সাধারণভাবে অন্যান্য সুন্নাত ও নফল নামাযের ন্যায়ই সূরা ফাতিহার পর যে কোন সূরা-ক্বিরআত মিলিয়ে আওয়াবীন নামায পড়া যায়। তবে ক্বাদেরিয়া তরীক্বার মাশা-ইখে কেরাম এ নামাযে সূরা ফাতিহার পর প্রতি রাক'আতে তিনবার করে সূরা এখলাস পড়ার নিয়মকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ পবিত্র হাদীস শরীফে এসেছে, "যে ব্যক্তি তিনবার সূরা ইখলাস পাঠ করে, তাকে এক খতম ক্বোরআন পাঠের সাওয়াব দান করা হয়। সুতরাং প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ফাতিহার সাথে তিনবার সূরা এখলাস মিলানোর মাধ্যমে এ নামায সম্পন্ন করা উত্তম।

তাহাজ্জুদের নামায

ফজীলত

১. বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট অতিপ্রিয় হচ্ছে রাতের নামায। তাহাজ্জুদ যে ব্যক্তি প্রত্যহ পড়বেন, নবী-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁকে অবশ্যই স্বপ্নযোগে দর্শন দান করবেন।

২. বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, ''ফরয নামাযের পর তাহাজ্জুদ নামাযের মতো ফযীলতপূর্ণ অন্য কোন নামায নেই।'' [আবূ দাঊদ শরীফ]

৩. মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, ''তাহাজ্জুদের নামায আদায়কারীর উপর আল্লাহ্ তা'আলা এত খুশী হয়ে যান যে, তিনি স্বীয় রহমতের সবগুলো দরজা খুলে দিয়ে ওই বান্দার প্রতি মুহব্বতের কারণে সর্বনিম্ন আকাশে স্বীয় তাজাল্লী বিচ্ছুরিত করেন।'' [আবূ দাঊদ শরীফ]

৪. হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, আমলকারী স্বামী-স্ত্রী যখন তাদের শয্যা ছেড়ে তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য উঠে যায়, তখন মা'বূদ খুশী হয়ে ফিরিশ্তাগণকে ডেকে বলতে থাকেন, ''ওহে ফিরিশতাগণ! দেখো দেখো! ওরা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে আগে উঠেছে, সে অপরের গায়ে পানি ছিঁটিয়ে দিচ্ছে উঠতে চায় না বলে।'' [নাসাঈ শরীফ]

৫. 'ইরশাদুত্ব ত্বালেবীন' নামক কিতাবে লিখা আছে, নিয়মিতভাবে তাহাজ্জুদ নামায আদায়কারীকে হাশর ময়দান হতে বেহেশতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য হযরত আদম সফীউল্লাহ আলায়হিস্ সালাম, হযরত ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ আলায়হিস্ সালাম, হযরত ঈসা রূহুল্লাহ আলায়হিস্ সালাম এবং স্বয়ং বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর প্রধান চারজন সাহাবী হযরত আবূ বকর, হযরত ওমর, হযরত ওসমান, হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম ও প্রধান চারজন ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল, মীকাঈল, ইস্রাফীল ও আযরাঈল আলায়হিমুস্সালাম জামা'আতসহকারে আসবেন।

তাহাজ্জুদ নামাযের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ التَّهَجُّدِ ـ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى
مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণঃ নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাক'আতাই সালাতিত্ তাহাজ্জুদ। সুন্নাতু রাসূলিল্লা-হি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লা-হু আকবর।

তাহাজ্জুদ নামায পড়ার সময় ও নিয়মঃ এ নামাযের সময় হচ্ছে- রাতে ঘুম থেকে উঠার পর হতে শুরু হয়ে সুবহে সাদেক্ব পর্যন্ত। এ নামায সর্বাধিক ১২ রাক'আত। দু'দু' রাক্'আত করে নিয়্যত বেঁধে প্রত্যেক রাক্'আতে একবার 'আল্হামদু' শরীফ ও ৩ বার 'ক্বুলহুওয়াল্লাহ্' শরীফ বা অন্য যে কোন সূরা মিলিয়ে এ নামায পড়তে হয়। তারপর সাধ্যমত অন্যান্য দো'আ-দুরূদ পড়ে মুনাজাত করা চাই। এ নামাযে দেহ ও মনের রোগমুক্তি এবং নিজের মা-বাপ বংশধরগণসহ বিশ্ব মুসলিমের গুনাহ্ মাফের জন্য দো'আ করা অতীব ফলদায়ক।

সালাতুত্তাস্বীহ

একদা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপন চাচা হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে বললেন, ''চাচা! আমি কি আপনাকে দান করব না? সুসংবাদ দেব না? দশটি মর্তবা লাভের অধিকারী করব না? তা হচ্ছে আপনি যদি চার রাক'আত 'সালাতুত্তাস্বীহ' (তাসবীহ্র নামায) পড়েন তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা আপনার বিগত গুনাহ ও আগাম গুনাহ্, জানা গুনাহ্ ও অজানা গুনাহ্, ইচ্ছাকৃত, অনিচ্ছাকৃত, প্রকাশ্য গুনাহ্ ও অপ্রকাশ্য গুনাহ্ মাফ করে দেবেন।''

অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন- ''যদি আপনার সামর্থ্য থাকে, তাহলে পত্যহ একবার এ নামায পড়ুন। যদি তা না পারেন, তাহলে প্রত্যেক জুমু'আর দিনে পড়ুন। যদি তাও না পারেন, তবে মাসে একবার করে পড়ুন। যদি তাও না পারেন, তাহলে বৎসরে একবার পড়ুন। যদি তাও না পারেন, তাহলে জীবনে একবার হলেও এ নামায পড়া চাই।'' [মুসলিম শরীফ]

সালাতুত্তাসবীহ্র নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ التَّسْبِيْحِ ـ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى
مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণঃ নাওয়াতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা আরবা'আ রাকা'আ-তি সালাতিত্ তাসবীহ্। সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবর।

নিয়মঃ অন্যান্য নামাযের নিয়মে চার রাক'আত সালাতুত্তাস্বীহ'র নিয়্যত করে সানা পড়ার পর নিম্নের কলেমাটি ১৫ বার পড়বে, তারপর সূরা ফাতিহা ও তার সঙ্গে একটি সূরা মিলিয়ে রুকু'তে যাওয়ার আগে নিম্নোক্ত কলেমাটি ১০ বার পড়বে।

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ সুব্হানাল্লা-হি ওয়াল হাম্দু লিল্লা-হি ওয়া লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবর।

(অর্থঃ আল্লাহ পবিত্রতম এবং সব প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই এবং আল্লাহ সর্বাধিক মহান।) তারপর রুকূ'তে গিয়ে প্রথমে রুকূ'র তাসবীহ্ সুব্হানা রাব্বিয়াল্ 'আযী-ম ৩ বার পাঠ করে উক্ত কলেমাটি পড়বে ১০ বার। তারপর 'সামি'আল্লা-হু লিমান্ হামিদাহ' বলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে 'রাব্বানা লাকাল হাম্দ' বলবে। তারপর উক্ত কলেমাটি পড়বে ১০ বার। তারপর আল্লা-হু আকবর বলে সাজদায় গিয়ে সাজদার তাসবীহ 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা' ৩ বার পড়ে উক্ত কলেমাটি পড়বে ১০ বার। তারপর আল্লাহু আকবর বলে সোজা হয়ে বসে সেই কলেমাটি পড়বে ১০ বার। এবং দ্বিতীয় সাজদায় 'সুবহা-না রাব্বিয়াল আ'লা' ৩ বার পড়ে এ কলেমা ১০ বার পড়বে। তারপর আল্লা-হু আকবর বলে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় রাক'আত একই নিয়মে শুরু করবে। উল্লেখ্য, এ পর্যন্ত প্রথম রাক'আতে কলেমাটি সর্বমোট ৭৫ বার পঠিত হলো।

এভাবে প্রত্যেক রাক'আতে ৭৫ বার হিসেবে চার রাক'আত নামাযে সর্বমোট ৩০০ বার কলেমাটি পাঠ করতে হবে। প্রথম ও শেষ বৈঠকে যথানিয়মে তাশাহ্হুদ ইত্যাদি পড়তে হবে। [বুখারী শরীফ]

মুসাফিরের নামায

কেউ যদি নিজ বসত বাড়ী বা আবাস স্থল হতে ৬১ মাইল বা ৯৮ (কি.মি.) দূরত্বে অবস্থিত কোন স্থানে গমন করার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়, তবে সে ব্যক্তি শরীয়তের পরিভাষায় 'মুসাফির' বলে গণ্য হবে। গন্তব্যস্থানে পৌঁছার পর যতক্ষণ পর্যন্ত সে সেখানে ১৫ (পনের) দিন বা ততোধিক সময় অবস্থান করার নিয়্যত বা সংকল্প না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে 'মুসাফির' হিসাবেই গণ্য হবে। এমন কি কেউ যদি কোন স্থানে পৌঁছার পর সেখানে কতদিন অবস্থান করবে, তা নিশ্চিত না হওয়ার কারণে পনের দিন ইক্বামত তথা স্থায়ী হওয়ার নিয়্যত না করে এবং এমনি অনিশ্চিত অবস্থায় মাসের পর মাস কিংবা বৎসরের পর বৎসরও অতিবাহিত হয়ে যায়, তথাপি সে ব্যক্তি মুসাফিররূপে গণ্য হবে। অনুরূপভাবে সামুদ্রিক জাহাজ, রেলগাড়ি, স্টিমার, লঞ্চ ও উড়োজাহাজে কর্মরত বা অবস্থানকারী ব্যক্তি যদিও মাসের পর মাস কিংবা বৎসরের পর বৎসর এ সকল যানবাহনে অবস্থান করে, তথাপি ওই ব্যক্তি মুসাফির হিসেবেই গণ্য হবে। কেননা, এসব যানবাহন ইক্বামত তথা স্থায়িত্বের মেয়াদকাল অর্থাৎ ১৫ দিন একই স্থানে স্থির থাকে না।

মুসাফিরের হুকুম

মুসাফির (৬১ মাইল তথা ৯৮ কিলোমিটার) বা ততোধিক দুরত্বে সফরকারী ব্যক্তি নিজ বসতবাড়ীর চৌহদ্দি ছেড়ে বের হয়ে যাওয়ার পর কোথাও কমপক্ষে ১৫ দিন বা ততোধিক সময়ের জন্য ইক্বামত বা স্থায়ী হওয়ার নিয়্যত না করা কিংবা সফর

শেষে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত মুসাফির হিসেবে গণ্য হবে। এরূপ মুসাফিরকে চার রাক'আত বিশিষ্ট ফরয নামায তথা যোহর, আসর ও এশার ফরয নামায একাকী পড়াকালে কিংবা স্বয়ং ইমামতি করে পড়াকালে কিংবা মুসাফির ইমামের পেছনে নামায পড়াকালে (ইমামের সাথে) চার রাক'আতের স্থলে দু'রাক'আত পড়ার বিধান দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ তা'আলা ক্বোরআন মজীদে মুসাফিরের সফরের কষ্ট বিবেচনা করে তার জন্য এ বিধান দিয়েছেন। এভাবে নামায কমিয়ে পড়াকে শরীয়তের পরিভাষায় 'ক্বসর' বলা হয়। খোদা প্রদত্ত এ সুযোগ গ্রহণ করা ওয়াজিব। কোন মুসাফির ইচ্ছাকৃতভাবে ওই সুযোগ গ্রহণ না করলে ওয়াজিব বর্জন করার গুনাহে গুনাহ্গার হবে। দু'রাক'আতের স্থলে পূর্ণ নামায পড়লে নামায হবে না। এ তিন ওয়াক্বতের ফরয ব্যতীত অন্যসব নামায পুরাপুরিই পড়তে হবে। এ সব নামাযে মুসাফির ব্যক্তি ইমামতি করলে তিনি দু'রাক'আত পড়ে সালাম ফিরানোর পর মুক্বীম মুসল্লিগণ দাঁড়িয়ে অবশিষ্ট নামায একাকী পূর্ণ করে নেবে। ক্বসর নামায পড়াকালে মনে মনে এরূপ নিয়্যত করলেই চলবে যে মুসাফির হিসেবে আমি অমুক ওয়াক্বত ফরয নামায চার রাক'আতের স্থলে দু'রাক'আত পড়ার মনস্থ করলাম। কেহ ইচ্ছা করলে আরবীতেও নিম্নরূপ নিয়্যত করতে পারে-

ক্বসর নামাযের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْنِ قَصْرًا مِّنْ اَرْبَعِ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الظُّهْرِ - فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাক'আতাইনে ক্বাসরাম্ মিন আরবা'ই রাকাআ-তি সালাতিয্ যোহরি। ফারদ্বুল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জ্বিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবর।

আসর ও এশার ওয়াক্বতের সালা'তিয যোহরের স্থলে 'সালাতিল্ আসর' কিংবা 'সালাতিল এশা' বলতে হবে।

ক্বাযা নামায

কাযা নামাযের বিবরণ

বিশেষ কারণে কোন ওয়াক্বতের নামায সেটার নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে পড়তে না পারলে সেটা পরে সম্পন্ন করাকে 'ক্বাযা' বলে ।

কোন অনিবার্য কারণবশত: অথবা ভুলবশত: নামায ক্বাযা হলে ক্বাযা নামায সম্পন্ন করার পর ক্বাযা হবার দরুন যে গুনাহ্ হয়েছে তজ্জন্য আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে তাওবা করে ক্ষমা চাইতে হবে ।

ক্বাযা নামাযের নিয়ম

কাযা নামায তারতীব অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হয়, যেমন, কোন ব্যক্তির ফজর ও যোহরের নামায ক্বাযা হলো, তাকে আসরের নামায পড়ার আগে প্রথমে ফজর তারপর যোহরের নামাযের কাযা পড়তে হবে। তারপর সে আসরের নামায পড়বে। পাঁচ ওয়াক্বত পর্যন্ত নামায ক্বাযা হলেও এ ধারাবাহিক তারতীব পালন করতে হবে। অর্থাৎ কারো যে কোন ওয়াক্বত থেকে পাঁচ ওয়াক্বতের নামায ক্বাযা হলো তাহলে সে এ পাঁচ ওয়াক্বতের নামায ক্বাযা করার পর যে ওয়াক্বতের নামায আসবে, ওই ওয়াক্বতের নামায ক্বাযা নামায সম্পন্ন করার পূর্বে ওয়াক্বতিয়া নামায পড়লে তা শুদ্ধ হবে না। কিন্তু 'নিম্নলিখিত তিনটি' কারণে উল্লিখিত তারতীব পালন করতে হয় নাঃ

১. ক্বাযা নামাযের কথা স্মরণ না থাকায় ওয়াক্বতিয়া নামায সম্পন্ন করে নিলো। এমতাবস্থায় ওই ওয়াক্বতিয়া নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে।

২. যদি সময় এতই সংকীর্ণ হয় যে, ক্বাযা নামায সম্পন্ন করলে ওয়াক্বতিয়া নামায ক্বাযা হয়ে যাবার পূর্ণ সম্ভাবনা থাকে। এমতাবস্থায় ওয়াক্বতিয়া নামায সম্পন্ন করে নেবে।

৩. যদি কাযা নামাযের সংখ্যা ছয় কিংবা ততোধিক হয়ে যায়, তাহলে তারতীব পালন করা জরুরী নয়।

ছয় বা ততোধিক ওয়াক্বতের নামায কাযা হলে ফজরের ক্বাযা ফজরের সময়, যোহরের ক্বাযা যোহরের সময় এবং আসরের কাযা আসরের সময়-এভাবে সম্পন্ন করবে।

স্মর্তব্য যে, ফরয নামাযের ক্বাযা করা ফরয। অনুরূপ, ওয়াজিব ও সুন্নাত নামাযের ক্বাযা করাও যথাক্রমে ওয়াজিব ও সুন্নাত।

ক্বাযা নামাযের নিয়্যত

ফজরের নামায ক্বাযা হলে নিয়্যত এভাবে করবে-

نَوَيْتُ اَنْ اَقْضِىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ الْفَائِتَةِ- فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى
مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণঃ নাওয়াইতু আন্ আক্বদ্বিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাক্'আতাই সালাতিল ফাজরিল ফা-ইতাতি। ফারদ্বুল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা-জিহাতিল কা'বাতিশ শরীফাতি আল্লাহু আকবার।

বলাবাহুল্য, যোহরের চার রাক্'আত ফরয নামাযের ক্বাযা করতে হলে নিয়্যতে 'রাক্'আতাই' এর স্থলে বলতে হবে 'আরবা'আ রাক্'আ-তি', আর মাগরিবের তিন রাক'আত ক্বাযা করার সময় বলবে 'সালাসা রাক্'আ-তি'। এভাবে আসর ও এশা এবং বিতরের নামাযের কাযাও যথাক্রমে 'আরবা'আহ্' ও সালাসাহ্ রাক্'আ-তি' বলতে হবে।

স্মরণ রাখা জরুরিঃ ফজরের সুন্নাতের বেলায়, সুন্নাত দু' রাক'আত পড়লে জামাত না পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে জামায়াতে শামিল হয়ে যাবে, আর এ সুন্নাতের ক্বাযা সূর্যোদয়ের পর থেকে দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে পড়া উত্তম।

আর যদি ফজরের ফরয ও সুন্নাত উভয়টি ফাওত (হাত ছাড়া) হয়ে যায়, তাহলে ফরয ও সুন্নাত যোহরের নামাযের পূর্ব পর্যন্ত ক্বাযা করা যাবে।

আর যোহরের সময় সুন্নাত চার রাক্'আত পড়লে জামাত চলে যাবার আশঙ্কা হলে প্রথমে জামা'আতে সামিল হয়ে যাবে। তারপর 'দু রাক্'আত নির্দিষ্ট সুন্নাত পড়ার পর এ পূর্ববর্তী চার রাক'আত সুন্নাত পড়বে।

আর কোন অনিবার্য কারণে জুমার নামায জামা'আতে না পেলে জুমার পরিবর্তে যোহরের নামায পড়তে হবে। আর জুমা না পাওয়ার কাফ্ফারা স্বরূপ কিছু টাকা পয়সা কিংবা চাউল বা আটা সাদক্বাহ্ করবে।

ওমরী ক্বাযা

যে ব্যক্তি বালেগ হবার পর যথারীতি পাঞ্জেগানা নামায আদায় করেনি এবং জীবনে তার অনেক ওয়াক্ত্তের নামায ক্বাযা হয়ে গিয়েছে, এরূপ ব্যক্তি অনুমান করে অতীতের ক্বাযা নামাযসমূহ সম্পন্ন করাকে 'ওমরী ক্বাযা' বলা হয়। এর সহজ নিয়ম এ যে, প্রত্যেক ওয়াক্ত্তের নামাযের সঙ্গে সমপরিমাণ ফরয নামায ক্বাযা হিসাবে পড়তে থাকা। এভাবে ক্বাযা পালন করতে করতে যখন নিজ অন্তরে এরূপ সুদৃঢ় ধারণা জাগবে যে, এতদিনে আমার অতীতের জীবনের ক্বাযা নামাযসমূহ আদায় হয়ে গেছে, তখন থেকে ক্বাযা পড়া ত্যাগ করতে হবে। এভাবে ক্বাযা নামায আদায় করে দেওয়া প্রত্যেক মুসলমানেরই কর্তব্য। অন্যথায় ক্বিয়ামতের দিন এক ওয়াক্ত্তের নামাযের জন্য দীর্ঘ ৮০ 'হোক্ববা' পরিমাণ সময় দোযখের আগুনে জ্বলতে হবে। ১ হোক্ববা মতান্তরে দুনিয়ার পাঁচশত বৎসরের সমান।

ক্বাযা নামায সম্পর্কে আরো কিছু জরুরী বিষয়

যার যিম্মায় ক্বাযা নামায থেকে যায় সে যেন অতি শীঘ্রই নামাযগুলোর ক্বাযা সম্পন্ন করে নেয়। এটা ওয়াজিব। অবশ্য, শিশু পালন কিংবা নিজের অতি প্রয়োজনীয় কারণে বিলম্ব করাও জায়েয। অবশ্য এ প্রয়োজনীয় কাজ-কর্ম সম্পাদনের ফাঁকে ফাঁকে সময় সুযোগ পাওয়া মাত্র ক্বাযা নামাযগুলো পড়ে নেবে, যাতে ক্বাযা নামায পূর্ণ হয়ে যায়। [রদ্দুল মুহতার, দুররুল মুখতার, খণ্ড ২, পৃ. ৬৪৬]

জীবনের কাযা নামাযের হিসাব

যে ব্যক্তি জীবনে কখনো নামায পড়েনি। এখন তাওফীক্ব হয়েছে, 'ওমরী ক্বাযা' পড়ার ইচ্ছা করছে, তাহলে সে বালিগ হওয়ার সময় থেকে নামাযগুলো হিসাব করে নেবে। আর যদি বালিগ হবার দিন, তারিখ জানা না থাকে, তাহলে যেহেতু সাধারণতঃ মেয়েরা ৯ বছরে ও ছেলেরা ১২ বছরে বালিগ হয়, সেহেতু ওই সময় থেকে হিসাব করে ছুটে যাওয়া নামাযগুলোর ক্বাযা করে নেবে।

[ফাতাওয়া-ই রেযভিয়াঃ খণ্ড ৮, পৃ. ১৪৫]

ক্বাযা করার সময় ধারাবাহিকতা রক্ষা করা

'ওমরী ক্বাযা' পড়ার সময় এ নিয়মও পালন করা যেতে পারে যে, প্রথমে সকল ফজরের নামায পড়ে নেব। তারপর সকল যোহরের নামায, তারপর আসরের সকল ফরয নামায, তারপর মাগরিবের সকল ফরয ও তারপর এশার সকল ফরয নামায, তারপর সকল বিতর ক্বাযা করবে।

[ফাতাওয়া-ই আলমগীরী, ক্বাযী খান, খণ্ড-১, পৃ. ১০৯]

ওমরী ক্বাযা পড়ার নিয়ম প্রসঙ্গে আরো কিছু কথা

প্রত্যেক দিনের ক্বাযা করতে সর্বমোট ২০ রাক'আত ফরয ফজরের ফরয নামাযের ক্বাযা পড়তে হয়ঃ ২ রাক্'আত যোহরের ৪ রাক'আত ফরয, আসরের ৪ রাক্'আত ফরয, মাগরিবের ৩ রাক'আত ফরয, এশা'র ৪ রাক্'আত ফরয এবং বিতরের ৩ রাক'আত ওয়াজিব নামায।

আর প্রত্যেকবার নিয়্যত করার সময় বলবে- ফজরের ক্বাযা পড়ার সময় ফজরের সর্বপ্রথম অথবা সর্বশেষ যে নামায আমার ক্বাযা রয়েছে তা আমি আদায় করছি। যোহর, আসর, মাগরিব, এশা ও বিতরের ক্বাযা করার সময়ও প্রত্যেকবার এভাবে বলবে।

ক্বাযা নামায গোপনে সম্পন্ন করবেন

ক্বাযা নামাযগুলো গোপনে সম্পন্ন করবেন। অন্য কেউ, এমনকি পরিবারবর্গ এবং ঘনিষ্ট বন্ধু-বান্ধবের নিকটও প্রকাশ করবে না। তাদের কাউকে এভাবে বলবে না যে, আমার অমুক নামায ক্বাযা হয়ে গেছে কিংবা আমি 'ওমরী ক্বাযা' সম্পন্ন করছি। কেননা, গুনাহর কথা প্রকাশ করাও 'মাকরূহ-ই তাহরীমী' তথা গুনাহর কাজ। [রদ্দুল মুহতার (শামী): খণ্ড-২, পৃ. ৬৫০]

'জুমু'আতুল বিদায়' ওমরী কাযা

হাকীমূল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান আলায়হির রাহমাহ্ বর্ণনা করেছেন- 'জুমু'আতুল বিদা'র দিন যোহর ও আসর নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে ১২ রাক'আত নফল নামায নিম্নলিখিত নিয়মে পড়া যায়-

দু' দু' রাক'আতের নিয়্যত করতে হবে। প্রত্যেক রাক্'আতে সূরা ফাতিহার পর একবার আয়াতুল কুরসী, ৩ বার সূরা ইখলাস (ক্বুল হুয়াল্লা-হু আহাদ), একবার সূরা ফালাক্ব (ক্বুল আ'উযু বিরাব্বিল ফালাক্ব) ও ১ বার সূরা না-স (ক্বুল আ'উযু বিরাব্বিন নাস) পড়বেন।

এর উপকারিতা হচ্ছে- যে পরিমাণ নামায জীবনে ক্বাযা হয়েছে, তার ক্বাযা হয়ে যাবার গুনাহ্, ইনশা-আল্লাহ্ ক্ষমা হয়ে যাবে। এখানে স্মর্তব্য যে, যেসব ফরয ও ওয়াজিব নামায ছুটে গেছে সেগুলোর ক্বাযা তো পড়তেই হবে। তবে ক্বাযা করাও গুনাহ্। সেই গুনাহর ক্ষমার জন্য এ আমল করলে সুফল পাওয়া যাবে।

[ফাতাওয়া-ই রেযভিয়্যাহ্, খণ্ড- ৮, পৃ. ১৪৫, রেযা ফাউণ্ডেশন, লাহোর]

ক্বসর নামাযের ক্বাযা

যদি সফররত অবস্থায় কোন নামায ক্বাযা হয়ে যায়, তবে তা সফররত অবস্থায় কিংবা স্থায়ী বাসস্থানে ফিরে আসার পর ক্বাযা করতে মনস্থ করে, তবে ক্বাযাও ক্বসর করতে হবে। পক্ষান্তরে, নিজ বাসস্থানে থাকাকালীন কোন ছুটে যাওয়া (ক্বাযা) নামায সফররত অবস্থায় 'ক্বাযা' পড়তে চাইলে, পূর্ণ নামাযই ক্বাযা করতে হবে। [রদ্দুল মুহতারঃ খণ্ড ২, পৃ. ৫৩৭]

রোগীর নামায

যে ব্যক্তি রোগের কারণে দাঁড়াতে পারে না, সে বসে নামায পড়তে পারে। বসে বসে রুকূ' করবে এবং সামনের দিকে ভালমতে ঝুঁকে 'সুবহা-না রাব্বিয়াল 'আযীম বলবে। পুনরায় সোজা হয়ে যাবে এর পর স্বাভাবিক অবস্থায় যেভাবে সাজদা করা হয়, সেভাবে সাজদা করবে। যদি বসেও পড়তে না পারে, তাহলে চিৎ হয়ে শুয়ে শুয়ে পড়বে। এমনভাবে শু'বে যেন পা ক্বেবলার দিকে থাকে এবং হাঁটু খাড়া থাকে এবং মাথার নিচে বালিশ ইত্যাদি দেবে, যেন মাথা উঁচু হয়ে মুখ ক্বেবলার দিকে হয়ে যায়। রুকূ', সাজদা ইশারায় করবে, অর্থাৎ মাথাকে যতটুকু ঝুঁকানো যায়, ততটুকু সাজদার জন্য ঝুঁকাবে এবং রুকূ'র জন্য এর থেকে কম ঝুঁকাবে। অনুরূপ ডান বা বাম পার্শ্বের উপর শু'য়েও ক্বেবলার দিকে মুখ করে নামায পড়া যায়।

মাসআলাঃ যে রোগীর এমন অবস্থা হয়ে যায় যে, রাক'আত ও সাজদার সংখ্যা স্মরণ থাকে না, তাহলে তার নামায আদায় করার প্রয়োজন নেই।

[দুর্রুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার]

মাস্আলাঃ সমস্ত ফরয নামায, বিতর, উভয় ঈদের নামায এবং ফজরের সুন্নাতে দাঁড়ানো ফরয। যদি বিনা কারণে এ সব নামায বসে পড়া হয়, তাহলে নামায আদায় হবে না। [দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার]

মাস্আলাঃ দাঁড়ানো যেহেতু ফরয সেহেতু বিনা কারণে এটা বর্জন করা অনুচিত। অন্যথায় নামায হবে না। এমন কি যদি লাঠি বা খাদেম বা দেয়ালে ঠেঁস দিয়ে দাঁড়ানো যায়, তাহলে সেভাবে দাঁড়িয়ে পড়াটা ফরয। যদি কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়াতে পারে, তাহলে দাঁড়িয়ে নামায শুরু করা ফরয। অতঃপর বসে নামায পূর্ণ করবে, অন্যথায় নামায হবে না। সামান্য জ্বর, মাথা ব্যথা বা এ ধরনের নগণ্য কষ্টসমূহ, যেগুলো নিয়ে মানুষ চলাফেরা করে, কখনও ওযর হিসেবে গণ্য হবে না। এমনি সাধারণ অসুখে যে সব নামায বসে পড়বে, সেগুলো শুদ্ধ হবে না, ওইগুলোর ক্বাযা অপরিহার্য। [গুনিয়া, বাহারে শরীয়ত ও অন্যান্য কিতাব]

মাস্আলাঃ যে ব্যক্তি দাঁড়ালে ফোঁটা ফোঁটা পায়খানা হয় বা যখম থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়, কিন্তু বসে পড়লে তেমনটি হয় না, তাহলে অন্য কোন উপায়ে তা বন্ধ করা না গেলে তার জন্য বসে পড়া ফরয।

মাস্আলাঃ মুসল্লী এতটুকু দুর্বল যে, মসজিদে জাম'আত পড়ার জন্য গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে পারে না, আর ঘরে পড়লে দাঁড়িয়ে পড়তে পারে, তাহলে ঘরেই পড়বে। জাম'আত সহকারে পড়তে পারলে ভাল, নতুবা একাকী পড়বে।

[দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার]

মাস্আলাঃ রোগী যদি দাঁড়িয়ে নামায পড়তে গেলে ক্বিরআত মোটেই পড়তে পারে না, তাহলে বসে পড়বে। কিন্তু দাঁড়িয়ে যদি যৎ সামান্যও পড়তে পারে, তাহলে যতটুকু দাঁড়িয়ে পড়া যায়, ততটুকু দাঁড়িয়ে পড়া ফরয। অবশিষ্ট নামায বসে পড়বে।

[দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার]

---<>---

জানাযার নামাযের বর্ণনা

জানাযার নামায ফরযে কেফায়া। কিছুলোক মিলিত হয়ে মৃতের জানাযা-নামায ও তার কাফন দাফন সম্পন্ন করে নিলে সবাই দায়মুক্ত হবে। অন্যথায় সবাই গুনাহ্গার হবে। এর ফরয হওয়াকে যে অস্বীকার করে, সে কাফির।

মাসআলাঃ জানাযার নামাযের জন্য জমা'আত পূর্বশর্ত নয়। এক ব্যক্তিও যদি পড়ে নেয়, আদায় হয়ে যাবে। [আলমগীরী]

জানাযার নামাযের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُؤَدِّىَ اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتِ صَلٰوةِ الْجَنَازَةِ فَرْضِ الْكِفَايَةِ اَلثَّنَاءِ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَالصَّلٰوةِ عَلٰى النَّبِىِّ وَالدُّعَاءِ لِهٰذَا الْمَيِّتِ اِقْتَدَيْتُ بِهٰذَا الْاِمَامِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণঃ নাওয়াইতু আন্ উওয়াদ্দিয়া আরবা'আ তাকবীরা-তি সালা-তিল জানা-যাতি ফারদ্বিল কেফায়াতি আস্সানা-ই লিল্লা-হি তা'আলা ওয়াস্সালা-তি আলান্নাবিয়্যি ওয়াদ্দো'আ-ই লি-হাযাল মাইয়্যেতি, ইক্ব'তাদাইতু বি-হাযা-ল ইমা-মি, মুতাওয়াজ্জিহান ইলা- জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতে আল্লাহু আকবর।

মৃত ব্যক্তি স্ত্রীলোক হলে **لِهٰذَا الْمَيِّتِ** (লিহা-যাল্ মাইয়্যেতি)-এর পরিবর্তে **لِهٰذِهِ الْمَيِّتِ**(লিহা-যিহিল মাইয়্যেতি) বলতে হবে।

আর ইমাম ইক্বতাদাইতু বিহাযাল ইমাম-এর পরিবর্তে 'আনা ইমামুন লিমান হাদ্বারা ওয়ামাই ইয়াহদ্বুরু' বলবেন। জানাযার নামাযের নিয়্যত করে কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে আল্লাহু আকবার বলে হাত নামিয়ে যথারীতি নাভীর নিচে বেঁধে নেবে এবং নিম্নলিখিত সানা পড়বে-

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَائُكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ

উচ্চারণঃ সুবহা-নাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহাম্দিকা ওয়া তাবা-রাকস্মুকা ওয়া তা'আলা- জাদ্দুকা ওয়া জাল্লা সানা-উকা ওয়া লা- ইলা-হা গাইরুকা।

এরপর হাত না উঠিয়ে 'আল্লাহু আকবর' বলবে এবং দুরূদ শরীফ পড়বে। ওই দুরূদ শরীফ পড়া উত্তম, যা নামাযে পড়া হয়। অবশ্য, সম্ভব হলে 'আল্লাহুম্মা সল্লি'র পর 'ওয়া সাল্লিম' বর্দ্ধিত করে পড়বে। তখন কামা-সাল্লায়তা'র সাথে 'ওয়া

সাল্লামতা বৃদ্ধি করবে। এরপর পুনরায় 'আল্লাহু আকবর' বলে এ দো'আটি পড়বে-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَآئِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ بِرَحْمَتِكَ يَاۤ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

উচ্চারণঃ আল্লাহু-মাগ্ফির লিহাইয়্যিনা ওয়া মাইয়্যিতিনা ওয়া শাহিদিনা ওয়া গা-ইবিনা ওয়া ছাগীরিনা ওয়া কাবীরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া উন্সা-না। আল্লা-হুম্মা মান আহ্ইয়াইতাহূ মিন্না-ফা আহয়িহী আলাল ইসলাম ওয়া মান তাওয়াফ্ফাইতাহূ মিন্না ফাতাওয়াফ্ফাহু আলাল ঈমান। বিরাহমাতিকা এয়া আরহামার রা-হিমী-ন।

এরপর 'আল্লাহু আকবর' তথা শেষ তাকবীর বলবে। অতঃপর সালাম ফেরাবে।

মাসআলাঃ যার উপরোক্ত দোয়া স্মরণ না থাকে, সে অন্য কোন একটি দোয়া মা'সূরা পড়ে নেবে।

মাসআলাঃ জানাযার চার তাকবীরের মধ্যে কেবল প্রথম তকবীরে হাত উঠাবে, বাকীগুলোতে উঠাবেনা আর চতুর্থ তকবীর বলার সাথে সাথে হাত খুলে নেবে ও সালাম ফেরাবে।

মাসআলাঃ যদি মৃত নাবালেগ হয়, তাহলে তৃতীয় তকবীরের পর এ দো'আ পড়বেঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّ اجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّ ذُخْرًا وَّ اجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّ مُشَفَّعًا

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মাজ্'আলহু লানা ফারাত্বাওঁ ওয়াজ্'আলহু লানা- আজরাওঁ ওয়া যুখরাওঁ ওয়াজ'আলহু লানা- শা-ফি'আওঁ ওয়া মুশাফ্ফা'আ-। যদি বালিকা হয়, তাহলে উপরোক্ত দো'আয় اِجْعَلْهُ-এর জায়গায় اِجْعَلْهَا পড়বে। অবশ্য মৃত যদি বালেগ হবার পর পাগল হয়ে যায়, তাহলে তার জানাযা নামাযে না-বালেগ শিশুদের জানাযার দো'আটি পড়লে যথেষ্ট হবে। [গুনিয়া, বাহার]

মাসআলাঃ জানাযার নামাযের রোকন অর্থাৎ ফরয দু'টিঃ চার-তকবীর ও ক্বিয়াম। সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্ তিনটিঃ ১. আল্লাহ্ তা'আলার সানা পাঠ, ২. দুরূদ শরীফ পড়া ও ৩. মৃত ব্যক্তির জন্য দো'আ করা।

মাসআলাঃ যেহেতু ক্বিয়াম ফরয, সেহেতু বিনা কারণে বসে বা বাহনের উপর নামায পড়লে হবে না। তবে যদি মৃত ব্যক্তির ওলী বা ইমাম অসুস্থতার কারণে বসে নামায পড়ে এবং মুক্তাদীগণ দাঁড়িয়ে পড়ে, তবে নামায শুদ্ধ হবে।

[দুররুল মুখতার ও রদ্দুল মুহতার]

মাসআলাঃ যার কয়েক তকবীর বাদ পড়ে গেছে, সে ইমাম সালাম ফিরানোর পর বাদ পড়া তকবীরগুলো বলে নেবে। আর যদি এ ভয় হয় যে, পড়তে গেলে দো'আ

পূর্ণ করার আগে লোকেরা মুর্দাকে কাঁধে উঠিয়ে নেবে, তাহলে কেবল তাকবীর বলে নেবে এবং দো'আ বাদ দেবে। [দুররুল মুখতার]

মাসআলাঃ যে ব্যক্তি চতুর্থ তকবীর বলার পর আসলো, ইমাম তখনও সালাম ফেরাননি, তাহলে 'আল্লাহু আকবার' বলে জম'আতে শরীক হয়ে যাবে এবং ইমামের সালাম ফেরানোর পর তিনবার 'আল্লাহ আকবর' বলে নেবে। [দুররুল মুখতার]

মাসআলাঃ যে সব বিষয় দ্বারা অন্যান্য নামায ভঙ্গ হয়ে যায়, ওইসব বিষয় দ্বারা জানাযার নামাযও ভঙ্গ হয়ে যায়। শুধু একটি বিষয় যে, মহিলা পুরুষের পাশাপাশি হয়ে গেলে, এতে জানাযার নামায ভঙ্গ হবে না। [আলমগীরী]

মাসআলাঃ জানাযার নামাযের জন্যও ওইসব পূর্বশর্ত প্রযোজ্য, যেগুলো অন্যান্য নামাযের জন্য নির্ধারিত। যেমন- ১. পবিত্র হওয়া, (নামাযীর শরীর, কাপড় ও নামাযের জায়গা পাক হওয়া), ২. সতর ঢাকা, ৩. ক্বেবলার দিকে মুখ করা ও ৪. নিয়্যত করা। অবশ্য জানাযার জন্য সময় নির্দিষ্ট নেই এবং তকবীর-ই তাহরীমা পৃথক রোকন বা পূর্বশর্ত নয়; বরং প্রথম তাকবীরও জানাযার চার তাকবীরের শামিল। [রদ্দুল মুহতার]

জানাযার পূর্বশর্ত হচ্ছে মৃতকে গোসল করানো এবং পবিত্র কাফন পরিধান করানো। জানাযা সামনে থাকা এবং জানাযা মাটির উপর রাখা। কোন জন্তু ইত্যাদির উপর রাখা হলে, নামায হবে না।

মাসআলাঃ প্রত্যেক মুসলমানের জানাযার নামায যেন পড়া হয়, যদিও সে বড় গুনাহ্গার হয়। তবে কয়েক প্রকার গুনাহগারের নামায পড়তে নেই। যেমন ১. বিদ্রোহী, যে বরহক্ব ইমামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বের হলো এবং সেই বিদ্রোহী অবস্থায় মারা গেলো এবং ২. ডাকাত, যে ডাকাতি করা অবস্থায় মারা যায়।

[আলমগীরী, দুররুল মুখতার, বাহার]

মাসআলাঃ জানাযার নামাযে ইমামতির হক সর্বাগ্রে ইসলামী শাসকের।অতঃপর ক্বাযীর। এরপর জুমু'আর ইমামের। তারপর মহল্লার ইমামকে অগ্রাধিকার দেয়া মুস্তাহাব। তবে মহল্লার ইমাম ওলী অপেক্ষা উত্তম হতে হবে, অন্যথায় ওলী উত্তম।

[গুনিয়া, দুররুল মুখতার]

মাসআলাঃ মৃত ব্যক্তির নিকটাত্মীয় অনুপস্থিত এবং দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় উপস্থিত রয়েছে। এক্ষেত্রে দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ই নামায পড়াবে। অনুপস্থিত বলতে এতটুকু দুরত্বকে বুঝানো হয়, যেখান থেকে আসার অপেক্ষা করা ক্ষতিকর।

[রদ্দুল মুহতার]

মাসআলাঃ মহিলার কোন ওলী না থাকলে, স্বামী নামায পড়াবে। স্বামীও না থাকলে প্রতিবেশী পড়াবে। অনুরূপ পুরুষের ক্ষেত্রেও ওলী না থাকলে প্রতিবেশী অন্যান্যদের উপর অগ্রাধিকার পাবে। [দুররুল মুখতার, বাহার]

মাসআলাঃ মহিলা ও শিশুগণ জানাযার নামাযের ওলী হওয়ার যোগ্যতা রাখে না।

মাসআলাঃ জানাযার নামাযে তিন কাতার করা উত্তম। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যার নামায তিন কাতারে পড়া হবে তার মাগফিরাত হয়ে যাবে। যদি সর্বমোট সাতজন হয়ে থাকে, তাহলে একজন ইমাম হবে তিনজন প্রথম কাতারে, দু'জন দ্বিতীয় কাতারে এবং একজন তৃতীয় কাতারে দাঁড়াবে। [গুনিয়া,বাহার]

মাসআলাঃ ইমাম মৃত ব্যক্তির বুকের সামনে দাঁড়ানো মুস্তাহাব। মৃত ব্যক্তি থেকে দূরে না হওয়া চাই।

মাসআলাঃ মসজিদে জানাযার নামায যে কোন অবস্থায় মকরূহে তাহরীমী। লাশ মসজিদের ভিতরে হোক বা বাইরে অথবা সব নামাযী মসজিদের ভিতরে হোক বা কিছু অংশ। [দুররুল মুখতার]

মাসআলাঃ জুমু'আর দিন কেউ মারা গেলে, জুমু'আর আগে কাফন-দাফনও নামায সম্পন্ন করে নিতে পারলে, করে নেয়া চাই। জুমু'আর পর বেশী লোক হবে, এ ধারণায় রেখে দেয়া মাকরূহ। [রদ্দুল মুহতার]

মাসআলাঃ মৃত ব্যক্তিকে যদি নামায না পড়ে দাফন করা হয় ও মাটি চাপাও দিয়ে দেয়া হয়, তাহলে তার কবরের উপর নামায পড়বে। যদি মৃতদেহ ফেটে যাওয়ার সন্দেহ না হয়, আর যদি মাটি না দিয়ে থাকে, তাহলে বের করে নামায পড়ার পর দাফন করবে। [রদ্দুল মুহতার, দুর্রুল মুখতার]

মাসআলাঃ মুসলমানদের শিশু বা মুসলমান মহিলার শিশু জীবিত জন্ম গ্রহণ করার পর মারা গেলে, তাকে গোসল ও কাফন দেয়া হবে এবং নামায পড়বে আর যদি মৃত জন্ম হয়, তাহলে এমনি গোসল করিয়ে পবিত্র কাপড়ে জড়িয়ে দাফন করে ফেলবে। তার জন্য নামায ও সুন্নাত তরীক্বা মত গোসল ও কাফনের প্রয়োজন নেই।

মাসআলাঃ যে শিশুর মাথা বের করে জন্ম হলো এবং বুক বের হওয়া পর্যন্ত জীবিত ছিল অতঃপর মারা গেল, তাহলে ওকে জীবিত জন্ম হয়েছে বলে ধরা হবে। আর যে শিশুর পা বের করে জন্ম হলো এবং কোমর বের হওয়া পর্যন্ত জীবিত ছিল অতঃপর মারা গেল, তাহলে তাকেও জীবিত ধরা হবে। যদি উল্লেখিত পরিমাণ বের হওয়ার আগে মারা যায়, যদিওবা ক্রন্দন করে থাকে, তবুও তাকে মৃত জন্ম হয়েছে বলে ধরা হবে। [দুর্রুল মুখতার, রুদ্দুল মুহতার]

মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার নিয়ম

যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেবে, সে প্রথমে ওযূ করে নেবে। গোসলের স্থানের চারিদিকে পর্দার ব্যবস্থা করে নিতে হবে। কুল (বড়ই) পাতার সিদ্ধ পানি দ্বারা গোসল করাতে হয়। এটা না পেলে সাদা পানি ব্যবহার করতে পারবে। প্রথমে মৃত ব্যক্তিকে খাটের উপর শায়িত করে নাভী হতে হাঁটু পর্যন্ত কাপড় দিয়ে ঢেকে দেবে।

তারপর পায়খানা-প্রসাবের স্থান এক খণ্ড কাপড় দ্বারা মসেহ্ করবে। মৃত ব্যক্তির গুপ্তস্থানের দিকে একেবারেই দৃষ্টিপাত করবেনা। তারপর ওযূ করাবে। ওযূর মধ্যে প্রথমে মুখ তারপর দুই হাত কুনুই পর্যন্ত ধৌত করবে। অতঃপর মাথা মসেহ্ করবে। এর পর উভয় পা ধৌত করবে। মুখ ও নাকের ভিতর পানি দেবে না। কাপড় ভিজিয়ে মুখ ও নাকের ভিতর মুছে নেবে। মাথা ও দাড়ি সাবান দ্বারা ধৌত করবে। তৎপর মৃতকে বাম করটে উপর শুইয়ে ডান পার্শ্বে পানি ঢালবে, যাতে সমস্ত শরীর ভাল মতে ধোয়া যায়। তারপর ডান করটের উপর শুইয়ে বাম পার্শ্বে পানি ঢালবে, যাতে সমগ্র শরীর ভালভাবে ধোয়া যায়। তারপর মৃতকে হেলান দিয়ে বসিয়ে আস্তে আস্তে পেটে চাপ দিতে হয়। এতে মল বের হলে ধুয়ে ফেলবে। এ জন্য ওযূ বা গোসল পুনরায় করাতে হবে না। গোসলের পর শুকনা কাপড় দিয়ে শরীর মুছে ফেলবে। নখ কাটবে না। দাড়ি ও মাথায় চিরুনী ব্যবহার করবে না। মাথায় ও দাঁড়িতে আতর-গোলাপ লাগাবে। সাজদার জায়গায় কর্পুর লাগাবে। পুরুষকে পুরুষ লোক দ্বারা এবং স্ত্রীলোককে স্ত্রীলোক দ্বারা গোসল দিতে হয়; কিন্তু নাবালেগকে উভয়েই গোসল দিতে পারে। স্বামী স্ত্রীকে গোসল দিতে পারবে না। স্বামী মৃত স্ত্রীকে দেখতে ও কবরে নামাতে পারবে এবং স্ত্রীর খাট বহন করতে পারবে।

কাফন

পুরুষ মৃতের কাফন তিনখানা কাপড় দ্বারা দেওয়া সুন্নত। যথাঃ ১ লেফাফা- এটা সর্ব প্রথম বিছাতে হয়। এটা মৃত ব্যক্তির দেহ হতে কিছু বেশী লম্বা রাখতে হয়; যাতে দুই প্রান্তে বাঁধতে অসুবিধা না হয়, ২. ইযার- এটা মৃত ব্যক্তির মাথা হতে পা পর্যন্ত লম্বা হতে হবে এবং ৩. কামীজ- এটা গলা হতে পা পর্যন্ত লম্বা রাখতে হয়, কিন্তু আস্তিন ও কল্লি বিহীন হতে হবে।

মেয়েলোকের জন্য পাঁচ খানা কাপড় দ্বারা কাফন দেওয়া সুন্নত। যথাঃ ১. পিরহান, ২.ইযার, ৩. ওড়না বা সেরবন্দ- এর দ্বারা মাথা ঢাকতে হয়। এটা দুই হাত দৈর্ঘ্য ও আধ হাত চওড়া হবে, ৪. লেফাফা; ইযার ও লেফাফা মাথা হতে পা পর্যন্ত লম্বা হওয়া আবশ্যক এবং ৫. সীনাবন্দ- এটা দৈর্ঘ্যে তিন হাত লম্বা এবং বগল হতে হাঁটু পর্যন্ত চওড়া হতে হবে। আর্থিক অভাব হলে পুরুষের জন্য দুই কাপড়, যথা- ইযার ও লেফাফা এবং স্ত্রীলোকের জন্য তিন কাপড় যথা- ইযার, লেফাফা ও সেরবন্দ দিলেও চলবে।

কাফন বিছানোর নিয়ম

পুরুষের জন্যঃ খাটের উপর প্রথমে লেফাফা, লেফাফার উপর ইযার এবং ইযারের উপর কোর্তার অর্ধেক এমনভাবে বিছাবে যাতে মৃতকে কোর্তার উপর রাখলে

অবশিষ্টাংশ মাথার উপর দিয়ে আনলে বরাবর হয়ে গায়ে লাগে। ইযারকে প্রথমে বামদিক হতে জড়িয়ে, পরে ডান দিক হতে জড়াবে, তারপর লেফাফাও বামদিক হতে জড়িয়ে, পরে ডান দিক হতে জড়াবে। কাফন খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে মাথা, বুক ও পায়ের নিকট সুতা দ্বারা বেঁধে দেবে।

স্ত্রীলোকের জন্যঃ প্রথমে সীনাবন্দ, তারপর লেফাফা, তারপর ইযার অতঃপর পিরহান বিছিয়ে মৃতকে সেগুলোর উপর শোয়াবে। তারপর প্রথমে পিরহান পরাবে। মাথার চুলগুলি দুইভাগ করে উভয় কাঁধের দিক হতে এনে পিরহানের উপর রাখবে। অতঃপর সেরবন্দ দ্বারা মাথা জড়িয়ে দু'পাশ হতে এনে বুকের উপর রাখবে। আর ইযারকে বাম দিক হতে জড়িয়ে পরে ডান দিক হতে জড়াবে। তারপর লেফাফাও এইরূপে জড়াবে। সবশেষে সেরবন্দ দ্বারা মাথা জড়িয়ে দু'পাশ হতে এনে বুকের উপর রাখশেষে সীনাবন্দ জড়াবে। কাফনের উপর আতর গোলাপ লাগাবে।

দাফন

মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা-

প্রথমে কবরের মধ্যে মৃত ব্যক্তির দুইজন পরহেযগার নিকটতম আত্মীয় নেমে দাঁড়াবে; উপর হতে অন্য লোকে মৃতকে ধরে তাদের হাতে দেবে। কবরে নামানোর সময় নিচের দোয়াটি পড়বেঃ

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ

উচ্চারণঃ বিস্‌মিল্লাহি ওয়া 'আলা মিল্লাতি রাসূ-লিল্লাহ্।

অর্থঃ আল্লাহ্ তা'আলার নামে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রচারিত ধর্মের উপর।

মৃতের মাথা কবরের উত্তর প্রান্তে ক্বেবলামুখী করে রাখবে। স্ত্রীলোককে কবরে নামানোর সময় কবরের চতুর্দিকে পর্দা করতে হবে। মৃত স্ত্রীলোককে কবরে নামানোর জন্য যাদের সঙ্গে বিবাহ জায়েয নাই, তাদের কেউ কবরে নামাবে। তাদের কেউ না থাকলে পরহেযগার লোক কবরে নামাবে। তারপর যথানিয়মে দাফন কার্য সম্পন্ন করবে।

কবর যিয়ারত

কবর যিয়ারত করা সুন্নাত। যিয়ারত দ্বারা যিয়ারতকারী ও মৃত উভয়ে উপকৃত হয়। প্রতি সপ্তাহে একদিন যিয়ারত করা চাই। শুক্র, বৃহস্পতি, শনি ও সোমবার যিয়ারত করা উত্তম। সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে জুমু'আর দিন সকাল বেলা। আওলিয়া কেরামের মাযারসমূহে সফর করতে যাওয়া জায়েয। আওলিয়া কেরাম খোদাপ্রদত্ত ক্ষমতাবলে

তাঁদের যিয়ারতকারীদের উপকার করেন। তবে সেখানে সাজদা করা সম্পূর্ণরূপে হারাম।

মাসআলাঃ মহিলাদেরকে কবর যিয়ারত থেকে বাধা দানের মধ্যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে। কারণ কবর-মাযার যিয়ারতে বের হয়ে ঘরে ফিরে আসা পর্যন্ত তারা লা'নতের উপযোগী হয়। [ফাত্ওয়া-ই রেযভিয়া, বাহার]

কবর যিয়ারতের নিয়ম

পায়ের দিক থেকে গিয়ে মৃত ব্যক্তির মুখের সামনে দাঁড়াবে এবং নিম্নলিখিত দো'আ পড়বে।

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ دَارِ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ اَنْتُمْ لَنَا سَلَفٌ وَّاِنَّا اِنْشَآءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ . نَسْئَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ يَرْحَمُ اللّٰهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ. اَللّٰهُمَّ رَبَّ الْاَرْوَاحِ الْفَانِيَةِ وَالاَجْسَادِ الْبَالِيَةِ وَالْعِظَامِ النَّخِرَةِ اَدْخِلْ هٰذِهِ الْقُبُوْرَ مِنْكَ اَرْوَاحًا وَّ رَيْحَانًا وَّ مِنَّا تَحِيَّةً وَّ سَلَامًا ـ

উচ্চারণঃ আস্‌সালামু আলাইকুম আহ্‌লা দারি ক্বাওমিম মু'মিনীনা আনতুম লানা সালাফুঁ ওয়া ইন্না- ইনশা- আল্লাহু বিকুম লাহিক্বূন, নাসআলুল্লাহা লানা ওয়ালাকুমুল্ 'আফ্‌ওয়া ওয়াল 'আফিয়াতা ইয়ারহামুল্লাহুল মুস্তাক্বদিমীনা ওয়াল মুস্তা'খিরীন। আল্লাহুম্মা রাব্বাল আরওয়াহিল ফা-নিয়াহ্ ওয়াল আজসাদিল বা-লিয়াহ, ওয়া 'ইযা-মিন নাখিরাহ। আদখিল হাযিহিল কুবূরা মিন্‌কা আরওয়াহান ওয়া রায়হানাওঁ ওয়ামিন্না তাহিয়্যাতাওঁ ওয়াসালা-মান।

এরপর সূরা ফাতেহা পাঠ করবে এবং বসতে চাইলে এতটুকু দুরত্বে বসবে, যে পরিমাণ দুরত্বে তার জিন্দেগীতে তার পাশে বসা হতো। [রদ্দুল মুহতার]

মাসআলাঃ মৃত ব্যক্তির মাথার দিক দিয়ে আসবে না। সেটা মৃত ব্যক্তির কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ তখন মৃত ব্যক্তিকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে হয়। [রদ্দুল মুহতার, বাহার]

মাসআলাঃ কবরস্থানে গেলে আলহামদু শরীফ, الٓمّٓ থেকে مُفْلِحُوْنَ পর্যন্ত, আয়াতুল কুরসী, اٰمَنَ الرَّسُوْلُ থেকে শেষ পর্যন্ত, সূরা ইয়াসীন একবার এবং সূরা তাকাসুর এক বার এবং সূরা ইখলাস সাতবার অথবা এগারবার পাঠ করবে এবং এ সবের সাওয়াব মৃত ব্যক্তির রূহে পৌঁছাবে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে- যে এগার বার সূরা ইখলাস পড়ে সাওয়াব মৃতদেরকে পৌঁছাবে, সেও মৃতদের সংখ্যা বরাবর সওয়াব লাভ করবে।

পরিশেষে, উভয় হাত বুক পর্যন্ত উত্তোলন করে আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করবে।

ঈসালে সাওয়াব

নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, সদক্বাহ্, খায়রাত এবং সব রকমের ইবাদত, নেক আমল, ফরয ও নফলের সাওয়াব মৃতদেরকে পৌঁছানো যায়। তাদের সবার কাছে এ সাওয়াব পৌঁছবে এবং তা যে পৌঁছায় তার সাওয়াবের মধ্যে কোন কমতি হবে না। খোদার রহমতে এটা আশা করা যায় যে, সবার পূর্ণ সাওয়াব অর্জিত হবে। এ রকম নয় যে, ওই সওয়াব ভাগাভাগি হয়ে যাবে। [শরহে আক্বাইদ, হেদায়া, আলমগীরী, রদ্দুল মুহতার] বরং আশা করা যায় যে, ওই সাওয়াব যে পৌঁছাবে সে ওইসব সাওয়াবপ্রাপ্ত মৃতদের সমান পাবে। যেমন কেউ কোন নেক কাজ করলো, যার সাওয়াব হল কমপক্ষে দশ। সে এর সাওয়াব দশজন মৃতব্যক্তিকে পৌঁছালো, তাহলে প্রত্যেকে দশ দশ লাভ করবে এবং যে পৌঁছালো সে একশ' লাভ করবে আর এক হাজারকে পৌঁছালে দশ হাজার লাভ করবে। এভাবে যত বেশী জনকে পৌঁছাবে, তত বেশী লাভ করবে। [ফাতাওয়া-ই রেযভিয়া]

মাসআলাঃ কবরে ফুল দেয়া ভাল কাজ। এ ফুল যতক্ষণ তাজা থাকবে, ততক্ষণ তসবীহ পাঠ করবে এবং মৃত ব্যক্তির আত্মা তৃপ্তিবোধ করবে। [রদ্দুল মুহতার, বাহার] অনুরূপ জানাযার উপর ফুলের মালা দিলে কোন ক্ষতি নেই। [বাহারে শরীয়ত]

মাসআলাঃ কবরের উপর থেকে তাজা ঘাস উঠিয়ে ফেলা অনুচিত। কারণ ঘাসের তসবীহ দ্বারা রহমত অবতীর্ণ হয় এবং কবরবাসীর আরামবোধ হয়, আর ঘাস উপড়ে ফেললে তা দ্বারা মৃত ব্যক্তির হক্ব বিনষ্ট করা হয়। [রদ্দুল মুহতার ও বাহার]

মাসআলাঃ আওলিয়া ও ওলামায়ে কেরামের মাযারের উপর গিলাফ দেয়া জায়েয, যদি এ উদ্দেশ্যে হয় যে, মাযারবাসীদের মর্তবা সাধারণ লোকদের সামনে প্রকাশ পাবে এবং লোকেরা তাঁদের সম্মান করবে ও বরকত হাসিল করবে। [রদ্দুল মুহতার]

কবর তালক্বীনের নিয়ম

মুর্দাকে দাফন করার পর ক্বেবলার দিকে মুখ করে মাথার দিক থেকে পায়ের দিক পর্যন্ত লোটা দ্বারা তিনবার পানি ঢালবে। অতঃপর এ দো'আটি পাঠ করবেনঃ

سَقَى اللّٰهُ ثَرَاهُ (هَا) وَبَرَّدَ اللّٰهُ مَضْجَعَه (هَا) وَجَعَلَ الْجَنَّةَ مَثْوَاهُ (هَا)

এরপর কবরের মাথার পার্শ্বে বসে কবরের দিকে মুখ করে এবং ক্বেবলার দিকে বাহু করে অথবা কবরের দিকে মুখ করে পূর্ব দিকে দাঁড়িয়ে এ দোয়া পাঠ করবেনঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ . لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ـ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ ـ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَ يُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ دَآئِمٌ

قَائِمٌ قَاهِرٌ قَادِرٌ عَادِلٌ فَاضِلٌ لَّا يَنَامُ وَلَا يَمُوْتُ وَلَا يَفُوْتُ وَلَا يَحُوْلُ وَلَا يَزُوْلُ اَبَدًا ذُوا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ ـ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ـ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ ـ كُلُّ شَيْئٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ ـ رَبُّكَ ذُوالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ـ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ . ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ ـ

তারপর মুর্দা পুরুষ হলে এভাবে বলবেনঃ

يَا عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ اَمَةِ اللّٰهِ اُذْكُرِ الْعَهْدَ الَّذِىْ

আর মহিলা হলে বলবেনঃ

يَا اَمَةَ اللّٰهِ بِنْتَ حَوَّآءَ اُذْكُرِى الْعَهْدَ الَّذِىْ خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنْ دَارِ الدُّنْيَا اِلٰى دَارِ الْاٰخِرَةِ وَهُوَ شَهَادَةُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَاَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَّاَنَّ النَّارَ حَقٌّ وَاَنَّ الْمَوْتَ حَقٌّ وَّاَنَّ الْقَبْرَ حَقٌّ وَّاَنَّ الْمُنْكَرَ وَالنَّكِيْرَ حَقٌّ وَاَنَّ السُّؤَالَ حَقٌّ وَّ اَنَّ الْجَوَابَ حَقٌّ وَّاَنَّ الْحِسَابَ حَقٌّ وَّ اَنَّ الْمِيْزَانَ حَقٌّ وَّ اَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ وَّ اَنَّ الْحَوْضَ حَقٌّ وَّ اَنَّ الْقِصَاصَ حَقٌّ وَّ اَنَّ الشَّفَاعَةَ حَقٌّ وَّاَنَّ الصِّرَاطَ حَقٌّ وَّاَنَّ الْحَشْرَ حَقٌّ وَّاَنَّ رُؤْيَةَ اللّٰهِ تَعَالٰى فِى الْجَنَّةِ لِلْمُؤْمِنِيْنَ حَقٌّ وَاَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّارَيْبَ فِيْهَا وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ وَاَنِّىْ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّاحِدًا وَّ بِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا هٰذَا اَوَّلُ مَنْزِلٍ مِّنْ مَّنَازِلِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِىْ مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى.

اَلْاٰنَ يَأْتِيْكَ الْمَلَكَانِ الْكَرِيْمَانِ الْمُوَكَّلَانِ الْمُحَاسِبَانِ فَلَا يُفْزِعَاكَ وَلَا

يُرْهِبَاكَ وَلاَ يُرَوِّعَاكَ وَلاَ يُهَوِّلاَكَ فَاِنَّهُمَا خَلْقٌ مِّنْ خَلْقِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَاِذَا سَأَلَكَ مَنْ رَّبُّكَ وَمَنْ نَّبِيُّكَ وَمَا اِمَامُكَ وَمَا دِيْنُكَ وَمَا قِبْلَتُكَ وَمَنْ اِخْوَانُكَ فَقُلْ اَللّٰهُ رَبِّىْ وَمُحَمَّدٌ نَّبِيِّ وَالْقُرْاٰنُ اِمَامِىْ وَالْكَعْبَةُ قِبْلَتِىْ وَالْاِسْلاَمُ دِيْنِىْ وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُسْلِمُوْنَ كُلُّهُمْ اِخْوَانِىْ عَلٰى ذٰلِكَ خُلِقْتَ وَعَلٰى ذٰلِكَ حَيِيْتَ وَعَلٰى ذٰلِكَ مُتَّ وَعَلٰى ذٰلِكَ تُبْعَثُ (تُبْعَثِيْنَ) اِنْ شَآءَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَاَنْتَ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ ثَبَّتَكَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِىْ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِىْ الْاٰخِرَةِ ـ يَآ اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِىْ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِىْ فِىْ عِبَادِىْ وَادْخُلِىْ جَنَّتِىْ ـ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاَهْلِ الْقُبُوْرِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَاجْعَلِ اللّٰهُمَّ فِىْ قُبُوْرِهِمُ الضِّيَآءَ وَالنُّوْرَ وَالْفُسْحَةَ وَالسُّرُوْرَ وَالْبَهْجَةَ وَالْحُبُوْرَ وَالْمَغْفِرَةَ عَلٰى اَهْلِ الْقُبُوْرِ اِنَّكَ مَلِكٌ رَّبٌّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ . دَعْوَاهُمْ فِيْهَا سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلاَمٌ وَاٰخِرُ دَعْوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

এভাবেও তালক্বীন করা যায়

দাফনের পর সবাইকে দূরে সরিয়ে দিয়ে তালক্বীনকারী কবরের উপরিভাগে মৃতের বক্ষ বরাবর আঙ্গুল কিংবা লাঠির মাথা রেখে (মৃতের নাম ও তার মায়ের নাম ধরে يَافُلاَنُ بْنَ فُلاَنَةَ ৩ বার সম্বোধন করবেন; মৃত মহিলা হলে يَافُلاَنَةُ بِنْتَ فُلاَنَةٍ তারপর) নিম্নলিখিত ইবারতটি বলতে বলতে তালক্বীন করবেন-

هٰذَا اَوَّلُ مَنْزِلِكَ مِنْ مَنَازِلِ الْاٰخِرَةِ وَاٰخِرُ مَنْزِلِكَ مِنْ مَنَازِلِ الدُّنْيَا، هٰذَا دَارُ الْوَحْشَةِ هٰذَا دَارُ الْغُرْبَةِ وَهٰذَا دَارُ الظُّلْمَةِ لاَتَخَفْ وَلاَتَحْزَنْ ـ اِذَا جَآءَكَ مَلَكَانِ اَسْوَدَانِ اَزْرَقَانِ يَسْأَلاَنِكَ عَنْ رَّبِّكَ وَعَنْ دِيْنِكَ وَعَنْ نَبِيِّكَ وَعَنْ قِبْلَتِكَ فَقُلْ بِلِسَانٍ فَصِيْحٍ وَاِعْتِقَادٍ

صَحِيْحٍ : أَشْهَدُ أَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَّرَسُوْلًا وَّبِالْقُرْاٰنِ اِمَامًا وَّبِالْكَعْبَةِ قِبْلَةً وَّبِالْمُؤْمِنِيْنَ اِخْوَانًا وَّبِحَلَالِ اللّٰهِ حِسَابًا وَّبِحَرَامِ اللّٰهِ عِقَابًا وَّاِنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَارَيْبَ فِيْهَا، اِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ ـ اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ بِحَقِّ قَوْلِكَ الْقَدِيْمِ: يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ.

يَاعَبْدَ اللّٰهِ ! يَسْأَلَانِكَ عَنْ رَّبِّكَ قُلْ رَبِّىَ اللّٰهُ وَيَسْأَلَانِكَ عَنْ دِيْنِكَ قُلْ دِيْنِىَ الْاِسْلَامُ وَيَسْأَلَانِكَ عَنْ نَبِيِّكَ قُلْ نَبِيِّىْ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ وَيَسْأَلَانِكَ وَمَاكُنْتَ تَقُوْلُ فِىْ هٰذَا الرَّجُلِ الَّذِىْ بُعِثَ فِيْكُمْ قُلْ بِاِعْتِقَادٍ صَحِيْحٍ هٰذَا نَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰمَنْتُ بِنُبُوَّتِهٖ وَرِسَالَتِهٖ وَاتَّبَعْتُ بِكِتَابِهٖ وَبِشَرِيْعَتِهٖ، لَآاِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحٰبِهٖ أَجْمَعِيْنَ -

এর পরবর্তী দো‘আ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ ذُنُوْبَهٗ وَاسْتُرْ عُيُوْبَهٗ وَنَوِّرْ قَبْرَهٗ. اَللّٰهُمَّ نَقِّهٖ مِنَ الذُّنُوْبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ. اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ خَطَايَاهُ كَمَا بَاعَدْتَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. اَللّٰهُمَّ وَسِّعْ قَبْرَهٗ وَاَدْخِلْهُ مُدْخَلًا كَرِيْمًا بِحَقِّ نَبِيِّكَ وَالْأَنْبِيَآءِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهٖ وَصَلَوَاتُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ وَسَلَامُهٗ، يَآ أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ-

দাফনের পর কবরে আযান

দাফনের পর কবরে আযান দেওয়া মুস্তাহাব। এতে মৃতের উপকার হয় এবং কবরে সাওয়াল জবাব সহজ হয়। বুযর্গানে দ্বীনের মধ্যে অনেকে এর উপর আমল করেছেন। আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি কবরের উপর আযান দেওয়ার ফজীলত বর্ণনায় একটি স্বতন্ত্র প্রামাণ্য পুস্তিকা রচনা করেন। সেটার নাম 'ঈযানুল আজর ফী হুকমি আযানিল কবর।' তিনি প্রচুর দলীলের মাধ্যমে কবরের উপর আযানকে মুস্তাহাব প্রমাণ করেছেন।

ফাতিহার নিয়ম

'ফাতিহা' বিষয়টি মুসলিম মিল্লাতে সুন্নাত-ই রসূল এবং বুযুর্গানে দ্বীনের অনুসৃত একটি উত্তম আমল। এর নিয়ম হল সর্ব প্রথমে ওযু করা। এর পর ক্বেবলামুখী হয়ে বসে যে সকল জিনিসের উপর ফাতিহা দিতে হবে, তা সামনে রাখতে হয়। সামনে রাখা ভাল ও জায়েয। যদি ফাতিহার দ্রব্য ঢাকা থাকে, উম্মুক্ত করে দিতে হয় এবং লুবান-আগর বাতি জ্বালিয়ে মুস্তাহাব নিয়মে ফাতিহা দিতে হয়। ফাতিহার প্রারম্ভে এগার বার দরূদ শরীফ পড়ে ক্বোরআন শরীফের কয়েক রুকু' কিংবা সূরা তিলাওয়াত করার পর একবার সূরা কাফিরূন পড়া উত্তম। তাছাড়া-

একবার সূরা বাক্বারা (কমপক্ষে আলিফ-লাম-মীম থেকে মুফলিহূন পর্যন্ত)

اَلٓـم . ذٰلِکَ الْـكِتَـابُ لاَ رَيْـبَ فِيْـهِ . هُـدًى لِّـلْمُتَّقِيْنَ . الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ ـ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْکَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ . اُوْلٰئِکَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ .

একবার করে নিম্নলিখিত আয়াতগুলো পড়বে

١ . وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لاَاِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمِ ٢ . اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ وَمَا اَرْسَلْنَاکَ اِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ ٣. مَاكَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ خَاتَمَ النَّبِيّٖنَ وَكَا نَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِيْمًا اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰآاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ٥ . سُبْحَانَ رَبِّکَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

উচ্চারণঃ ১. ওয়া ইলা-হুকুম্ ইলা-হুন্ ওয়া-হিদুন, লা-ইলা-হা ইল্লা- হুয়ার রাহমা-নুর রাহী-ম। ২. ইন্না রাহমাতাল্লা-হি ক্বারী-বুম্ মিনাল্ মুহ্‌সিনী-ন্। ওয়ামা আরসালনা-কা ইল্লা রাহমাতাল্লিল 'আ-লামী-ন ৩. মা-কানা মুহাম্মাদুন্ আবা-আহাদিম্ মির্‌রিজা-লিকুম ওয়ালা-কির্ রাসূলাল্লা-হি ওয়াখা-তামান্ নাবিয়্যী-ন, ওয়াকা-নাল্লাহু বিকুল্লি শায়ইন আলী-মা- ৪. ইন্নাল্লা-হা ওয়া মালা----ইকাতাহূ ইয়ুসাল্লূ-না আলান্ নাবিয়্যি, ইয়া--- আইয়ু-হাল লাযী-না আ-মানূ-সাল্লূ-আলায়হি ওয়াসাল্লিমূ- তাসলী-মা- এবং ৫. সুব্‌হা-না রাব্বিকা রাব্বিল ইয্‌যাতি আম্মা ইয়াসিফূ-ন; ওয়া সালা-মুন 'আ-লাল মুরসালী-ন ওয়ালহামদু লিল্লা-হি রাব্বিল্ 'আ'লামী-ন।

উল্লেখিত আয়াতসমূহ পড়ার পর উভয় হাত উত্তোলন করে আরয করতে হবে, হে প্রতিপালক! আমি পবিত্র ক্বোরআন শরীফ থেকে যা তিলাওয়াত করেছি; (যদি খাবার দ্রব্যাদি শিরনী বা অন্য কোন হালাল উপার্জিত বস্তু সামনে থাকে, তাহলে এরও নামোল্লেখ করে বলবে, হে আল্লাহ! ক্বোরআন পাক থেকে এখন যা কিছু পড়া হয়েছে এবং খানা বা শিরনী ইত্যাদির সাওয়াব হুযূর সারকার ও ফাখর-ই মাওজূদাত সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র রূহে বখশিশ করুন, তারপর আম্বিয়া ও মুরসালীন আলাইহিমুস্ সালাম, আমাদের হুযূর করীমের পবিত্র স্ত্রীগণ সহ পরিবার-পরিজন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম-এর পবিত্রাত্মায়, সকল সাহাবা-ই কেরাম, তাবি'ঈন, তাব'ই তাবি'ঈন রিদ্ব্ওয়ানুল্লাহি আনহুম আজমা'ঈন-এর পাক আত্মাসমূহে প্রদান করে সমূদয় বুযর্গানে-ই দ্বীন, আইম্মাহ্ -ই- মুজতাহিদীন, সকল উম্মত-ই মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর রূহে পৌঁছিয়ে দিন। বিশেষতঃ গাউস-ই আ'যম রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, খাজা গরীব নাওয়ায রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এবং যে বুযুর্গের নামে ফাতিহা দেয়া হবে, তাঁর নাম নিয়ে বলতে হবে যে, তাঁর রূহ মুবারক এবং তাঁর পরিবার-পরিজনের ও ভক্ত-অনুরক্ত আর মরহুম মুরীদদের আত্মাসমূহের উপর, বিশেষ করে সকল মুসলমান নর-নারীর আত্মায় এর সাওয়াব পৌঁছিয়ে দিন।

বুযর্গান-ই দ্বীন ছাড়া অন্য কারো ফাতিহা দেয়ার সময় এর পরে ওই ব্যক্তির নাম ও পিতার নাম নিয়ে বলবে, অমুকের পুত্র অমুকের রূহে সাওয়াব প্রদান করে হুযূর সারওয়ার-ই কা-ইনাত ফখর-ই মাওজুদাত সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাদক্বায় তার উপর আপনার রহমতের বারিধারা বর্ষণ করুন এবং তাঁকে ক্ষমা করে আপনার দয়া ও করুণার পাশে আশ্রয় দিয়ে রহম করুন। আ-মী-ন।

উপরোক্ত আয়াতসমূহ জানা না থাকলে কেবল সূরা ফাতিহা ও চার কুল পড়েও ফাতিহা দেয়া যায়।

ইসক্বাত অর্থাৎ নামায রোযার কাফ্ফারার বর্ণনা

‘ইসক্বাত’-এর শাব্দিক অর্থ হল- ফেলে দেয়া। ফিক্বহ্ শাস্ত্রের পরিভাষায় এর অর্থ হলো- মৃত ব্যক্তির যিম্মায় যে সব ফরয-ওয়াজিব অনাদায়ী রয়ে যায়, ওইগুলো থেকে তাকে দায়মুক্ত করা।

ইসক্বাতের উপকার হল- মুসলমানের যিম্মায় শরীয়তের অনেক বিধান ইচ্ছাকৃত কারণে, অবহেলা বা ভূলবশতঃ থেকে যায়, যা সে স্বীয় জীবনে আদায় করতে পারেনি এবং রেহাই পাবারও উপায় নেই। পবিত্র শরীয়ত এ অবস্থায় মৃত ব্যক্তির মুক্তিলাভের কিছু নিয়ম বর্ণনা করেছে। যদি মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশ ওই নিয়ম অনুসারে আমল করে, তাহলে মৃত বেচারা রেহাই পেতে পারে। এ নিয়মটার নাম হচ্ছে ‘ইসক্বাত’। ইসক্বাত আসলে মৃতের জন্য এক প্রকার সাহায্য। সুন্নী মুসলমানরা এ কাজটা অতি গুরুত্বসহকারে সম্পন্ন করেন কিন্তু। দেওবন্দী-ওহাবীরা যেভাবে জীবিত মুসলমানদের শত্রু, তদ্রূপ মৃতদেরও শত্রু। তারা মৃতের উপকার করা থেকে লোকদেরকে বাধা দেয়। মোটকথা মৃত্যুর পরও তাদের পিছু ছাড়ে না।

ইসক্বাতের নিয়ম হচ্ছে- প্রথমে মৃত ব্যক্তির বয়স নির্ণয় করুন। অতঃপর এর থেকে মহিলার বেলায় নয় বছর এবং পুরুষের বেলায় বার বছর বাদ দিন। এখন যত বছর অবিশষ্ট আছে, এতে হিসাব করে দেখুন কত দিন সে বে-নামাযী বা বে-রোযাদার ছিল এবং এর ক্বাযাও আদায় করেনি, এর একটা আনুমানিক হিসাব নির্ণয় করুন। সেই হিসাব অনুপাতে প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য এক ফিত্রার পরিমাণ হিসাব করুন। প্রতিটি রোযার জন্যও একেকটি ফিৎরা হিসেবে হিসাব করুন। তাহলে এক দিনে ছয় নামাযের (পাঁচ ফরয, এক ওয়াজিব বিত্র) জন্য ফিদিয়া আসে পনর সের গম, এক মাসের জন্য এগার মণ গম এবং এক বছরের জন্য আসে ১৩২ মণ গম। যদি কারো যিম্মায় বিশ বছরের নামায অনাদায়ী থেকে যায়, তাহলে কয়েক হাজার মণ গম খয়রাত করতে হবে। হয়তো কোন বড় ধনীর পক্ষে তা সম্ভব হতে পারে, কিন্তু গরীবের জন্য তা অসম্ভব। তাদের জন্য একটি উপায় হলো, মৃতের ওয়ারিশের সামর্থানুসারে একমাসের গম বা এর সমমূল্যের টাকা নেবে এবং কোন মিসকীনকে দিয়ে দেবে। ওই মিস্কীন আবার অন্য মিস্কীনকে বা স্বয়ং মালিককে দান করবে। সে পুণরায় ওই মিসকীনকে সাদক্বা করবে। প্রত্যেক বারে সাদক্বায় এক মাসের নামাযের ফিদিয়া আদায় হয়ে যাবে। এভাবে ১২ বার সদকা করলে এক বছরের ফিদিয়া আদায় হয়ে গেল। এভাবে বকেয়া কয়েকবার আদান প্রদান করলে সম্পূর্ণ

ফিদিয়া আদায় হয়ে যাবে। নামাযের ফিদিয়া আদায় করার পর এভাবে রোযার ফিদিয়া আদায় করুন। এতে আশা করা যায়, দয়াময় আল্লাহ্ তা’আলা মাফ করবেন। এটাই হচ্ছে ইসক্বাতের সঠিক নিয়ম।

বাংলাদেশে কোথাও কোথাও আরেকটা প্রথা প্রচলিত আছে যে, মসজিদ থেকে নিয়ে কিংবা দোকান থেকে ক্রয় করে এক কপি ক্বোরআন শরীফ সংগ্রহ করে এর উপর একটি টাকা রাখে এবং কয়েকজন লোক এতে হাত লাগায়। অতঃপর পুনরায় ক্বোরআন শরীফটা মসজিদে ফেরত দেয় কিংবা হাদিয়া হিসেবে কাউকে দিয়ে দেয়। এমন করার ফলে নামাযের ফিদিয়া আদায় হয় না। তাদের ধারণা হলো, ক্বোরআন অমূল্য বস্তু। সুতরাং ক্বোরআন শরীফের একটি কপি খয়রাত করে দিলে, সব নামাযের ফিদিয়া আদায় হলে গেল। এটা ভুল ধারণা। কেননা এখানে তো ক্বোরআনের কাগজ মুদ্রণ ও খরচটাই বিবেচ্য। যদি এ কপিটার দাম দুশ’ টাকাও হয়, তাহলে দু’শ টাকা দামেরই সাওয়াব পাবে। তা না হলে ওই সমস্ত ধনী, যাদের হাজার হাজার টাকা যাকাত ওয়াজিব হয়, তারা এত টাকা খরচ করতে যাবে কেন, কেবল একটি ক্বোরআন শরীফ দান করে দিলেই হলো। মোট কথা হলো এ নিয়ম বিশুদ্ধ নয়, অর্থাৎ এটা দ্বারা ইসক্বাতের উদ্দেশ্যে পূর্ণ হবে না।

----<>----

চাঁদ দেখার বিবরণ

রমযানের রোযা, ঈদ, হজ্ব, কোরবানী, শবে বরাত, শবে ক্বদর, আশুরা ও শবে মি'রাজ শরীফের মত অতীব ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানসমূহ চাঁদের তারিখের উপর নির্ভরশীল। তাই অধিকাংশ ওলামা-ই কেরামের মতে বার চাঁদের মধ্যে পাঁচটি মাসের চাঁদ দেখা ওয়াজিব আলাল কেফায়া। অর্থাৎ প্রত্যেক এলাকাবাসীর মধ্যে কম পক্ষে একজন চাঁদ দেখলে সবাই গুনাহ্ থেকে দায়মুক্ত হবে। পাঁচটি চাঁদের মধ্যে শা'বান, রমযান, শাওয়াল, জিলক্বদ ও জিলহজ্ব। বাকি মাসসমূহের চাঁদ দেখা মুস্তাহাব ও অনেক সাওয়াব। [ফাতাওয়ায়ে রযভিয়া ইত্যাদি]

প্রিয় নবী সরকারে দো'আলম হুযূর পুরনূর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমরা চাঁদ দেখে রোযা শুরু কর এবং চাঁদ দেখে ইফতার (ঈদ) কর, আর যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে যায় তবে শা'বান মাসকে ত্রিশ দিনে পূর্ণ করে নাও। [বুখারী ও মুসলিম শরীফ]

জরুরী মাসআলাঃ যেহেতু চান্দ্র মাস ২৯ ও ৩০ দিনে পরিপূর্ণ হয়, কোন চান্দ্র মাস ২৯ দিনের কম হয় না, তদ্রূপ ৩০ দিনের অধিকও হয় না, সেহেতু শা'বানের ২৯ তারিখ সন্ধ্যা বেলায় মাহে রমযানের নতুন হেলাল (চাঁদ) দেখবে, শা'বানের ২৯ তারিখ রমযানের চাঁদ দেখা গেলে পরদিন থেকে রমযানের রোযা শুরু করবে। যদি শা'বানের ২৯ তারিখ সন্ধ্যায় রমযানের চাঁদ দেখা না যায়, তবে শা'বানের ত্রিশদিন পূর্ণ করে রমযানের রোযা শুরু করবে। শা'বানের ৩০ তারিখ রমযানের চাঁদ দেখা না গেলেও পরদিন থেকে রমযানের রোযা শুরু করতে হবে। [আলমগীরী]

জরুরী মাসআলাঃ চন্দ্রের উদয়স্থল পরিস্কার না থাকা অবস্থায় বা কুয়াশা ও মেঘাচ্ছন্ন থাকাবস্থায় রমযানের রোযা ফরয হওয়ার জন্য শুধু একজন মুসলমান বালেগ (প্রাপ্ত বয়স্ক) আক্বেল (বিবেকবান) আদেল (যে কবীরা গুনাহ হতে বিরত থাকে এবং বার বার সগীরাহ্ গুনাহ করে না) ও মসতুর (যার বাহ্যিক অবস্থা শরীয়ত সম্মত, কিন্তু অভ্যন্তরীণ অবস্থা জানা নেই)-এর সাক্ষ্য যথেষ্ট, সে পুরুষ হোক বা মহিলা, অবশ্য রমযান ব্যতীত ঈদ বা অন্যান্য মাসের চন্দ্র উদয়ের ব্যাপারে আকাশ পরিস্কার না থাকাবস্থায় কমপক্ষে দু'জন উপরোক্ত গুণাবলী সম্পন্ন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলার সাক্ষ্য অবশ্যই জরুরী। হ্যাঁ আকাশ বা চন্দ্রের উদয়স্থল পরিস্কার থাকা অবস্থায় চন্দ্র উদয়ের ব্যাপারে অনেক লোকের সাক্ষ্য অপরিহার্য, চাই রমযানের ব্যাপারে হোক বা ঈদের ব্যাপারে হোক বা অন্য মাসের ব্যাপারে হোক। অনেক লোক বলতে শরীয়তের ক্বাযী বা রাষ্ট্রের পক্ষ হতে নিযুক্ত স্থানীয় প্রশাসন যতজন সাক্ষীর প্রয়োজন মনে করেন, ততজন সাক্ষীর সাক্ষ্য নিয়ে ক্বাযী বা সরকার কর্তৃক নিযুক্ত স্থানীয় প্রশাসন চাঁদ দেখার ঘোষণা দেবেন। [হেদায়া ও রদ্দুল মুহতার ইত্যাদি]

জরুরী মাসআলাঃ শুধু রেডিও, টিভির খবর এবং জ্যোতিষের ধারণা চন্দ্র উদয়ের ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য নয়। রমযান বা ঈদের চন্দ্র উদয়ের ব্যাপারে ক্বাযী বা সরকার কর্তৃক নিযুক্ত স্থানীয় প্রশাসনের নিকট উপরোক্ত গুণাবলী সম্পন্ন সাক্ষীর প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য অপরিহার্য, সাক্ষ্য দেওয়ার সময় বলবে, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, অমুক স্থানে বা অমুক এলাকায় আমি রমযান বা ঈদের নতুন চাঁদ দেখেছি।" অন্য শব্দ দ্বারা সাক্ষ্য প্রদান করলে তা গৃহীত হবে না। যেমনঃ ক্বাযী বা সরকার কর্তৃক নিযুক্ত প্রশাসনের নিকট কয়েকজন বলল- অমুক স্থানে চাঁদ দেখা গেছে অথবা অমুক অমুক ব্যক্তি চাঁদ দেখেছে- এ জাতীয় শব্দে সাক্ষ্য দান যথেষ্ট নয়। তদ্রূপ টেলিগ্রাম বা টেলিফোন বা যান্ত্রিক উপায়ে ক্বাযী বা স্থানীয় প্রশাসনের নিকট চন্দ্র উদয়ের সাক্ষ্য প্রদান করলে তাও গৃহীত হবে না, যেভাবে মামলা-মোক্বদ্দমায় হাকিমের নিকট সাক্ষীগণ প্রত্যক্ষভাবে সাক্ষ্য প্রদান করতে হয়, তদ্রূপ চন্দ্র উদয়ের বেলায়ও ক্বাযী বা স্থানীয় প্রশাসনের নিকট প্রত্যক্ষভাবে সাক্ষ্য প্রদান করতে হবে। অনুরূপ চন্দ্র না দেখে গুজব, পঞ্জিকা, সংবাদ পত্রের ভিত্তিহীন ও সন্দেহমূলক খবর, ক্বাযী বা সরকার কর্তৃক নিয়োজিত স্থানীয় প্রশাসনের নিকট চন্দ্র উদয়ের সাক্ষ্যদান ছাড়া শুধু রেডিও, টিভির খবরের উপর ভিত্তি করে, অনুরূপ জ্যোতিষী বা গণকের গণনার উপর নির্ভর করে শরীয়ত মোতাবেক চাঁদ দেখা প্রমাণিত হয় না। [শরহুল আশবাহ, হুমুভী ও কানূনে শরীয়ত ইত্যাদি]

জরুরী মাসআলাঃ গ্রাম বা শহরের অনেক লোক রমযানের নূতন চাঁদ দেখলে সকলের উপর রমযানের রোযা পালন করা অপরিহার্য হয়ে যায়। অবশ্য যদি কোন গ্রামের মাত্র ২/১ জন লোক শা'বানের ২৯ তারিখ সন্ধ্যাবেলায় রমযানের চাঁদ দেখল, কিন্তু সেখানে কোন ক্বাযী বা সরকার কর্তৃক নিযুক্ত প্রশাসন নেই, তবে গ্রামের লোকদেরকে একত্রিত করে চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দেবে। সাক্ষ্যদাতা যদি আদিল বা সত্যবাদী হয় তবে সকলের উপর পরদিন হতে রমযানের রোযা পালন করতে হবে। নতুবা শা'বান মাস ৩০ দিন পূর্ণ করার পর থেকে রমযানের রোযা শুরু করবে। [কানূনে শরীয়ত ইত্যাদি]

সারা বিশ্বে একই দিনে রোযা ও ঈদ প্রসঙ্গ

যদি কোন এক শহরে বা রাষ্ট্রে রমযান বা শাওয়ালের নূতন চাঁদ দেখা যায়, তবে অন্য শহর বা রাষ্ট্রে (যেখানে চাঁদ দেখা যায় নাই) রোযা ও ঈদ পালন করতে হবে কি না? এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ আছে। বিশেষতঃ হানাফী মাযহাবের পূর্ববর্তী ওলামা-ই কেরামের মতে বিশ্বের কোন এক স্থানে চাঁদ দেখা গেলে সারা বিশ্বে একই সময়ে রোযা ও ঈদ পালন করবে। তবে শর্ত হল নির্দিষ্ট তারিখেই চাঁদ দেখা সংক্রান্ত সাক্ষ্য চাঁদ দেখা না যাওয়া স্থানে কাযী বা

সরকার কর্তৃক নিযুক্ত প্রশাসনের নিকট প্রদান করতে হবে অথবা বিভিন্ন কাফেলা বা দল-উপদল চাঁদ দেখা না যাওয়ার স্থানে ক্বাযী বা সরকার কর্তৃক নিযুক্ত প্রশাসনের নিকট সাক্ষ্য প্রদান করতে হবে। শুধু রেডিও, টেলিভিশন, বেতারযন্ত্র অথবা যান্ত্রিক উপায়ে বিশ্বের কোন এক প্রান্তে চাঁদ দেখার খবর প্রচার করলে হানাফী মাযহাবের পূর্ববর্তী ফক্বীহগণের মতেও অন্য দেশে (যেখানে চাঁদ দেখা যায় নি) রোযা ও ঈদ পালন করা শুদ্ধ হবে না। যেহেতু রোযা ও ঈদ পালন করা চাঁদ দেখার সাক্ষ্যের উপর নির্ভরশীল,খবরের উপর নয়। [বাহারে শরীয়ত ইত্যাদি]

তবে হানাফী মাযহাবের পরবর্তী ওলামা-ই কেরাম ও শাফে'ঈ মাযহাবের অধিকাংশ ইমামগণ সারা বিশ্বে চন্দ্র উদয়ের ভিন্নতার কারণে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, সারা বিশ্বে একই দিনে রোযা ও ঈদ পালন করা যাবে না। যেহেতু নামায যেমনিভাবে সূর্যের গতি ও সময়ের উপর নির্ভরশীল, তেমনি রোযা ও ঈদ চন্দ্র উদয়ের সময়সীমার উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ সারা বিশ্বে সূর্য উদয়ের ভিন্নতা যে রকম গ্রহণীয়, তদ্রূপ অধিকাংশ ইমামগণের মতে চন্দ্র উদয়াস্তের ভিন্নতাও গ্রহণীয়। সুতরাং হানাফী মাযহাবের পরবর্তী ওলামা-ই কেরামের মতে নিকটতম শহর বা রাষ্ট্রের (যেখানে চন্দ্র উদয়ের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়) কোন এক প্রান্তের চন্দ্র দেখা অপর দূরবর্তী প্রান্তের জন্য যথেষ্ট নয়। উল্লেখ্য যে, যে দেশ বা শহর পায়ে হেঁটে বা স্বাভাবিক নিয়মে অতিক্রম করতে কমপক্ষে এক মাসের অধিক সময় লাগে সে শহর বা দেশে রোযা বা ঈদ পালন করা অন্য শহর বা দেশের চাঁদ উদয়ের উপর নির্ভরশীল নয়। কোন কোন ইমাম বলেন- যতদুর এলাকাকে এক দেশ মনে করে সে এলাকার যে কোন স্থানে চন্দ্র উদয়ের সাক্ষী পাওয়া গেলে উক্ত সমগ্র এলাকায় রোযা ও ঈদ পালন করতে হবে। আর তা না হলে বরং ভিন্ন সময়ে চন্দ্র উদয় হতে দেখা গেলো, যেমন বাংলাদেশে তার বিপরীত তারিখে চন্দ্র উদয় হলো, উভয় দেশ হানাফী পরবর্তী ওলামা-ই কেরামের মতে এক হুকুমের আওতায় আসতে পারে না। হাফেযুল হাদীস ওসমান বিন আলী যায়ল'ঈ হানাফী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি 'শরহুল কান্য' কিতাবে 'মুতাআখ্‌খেরীনে আহনাফ' বা পরবর্তী হানাফীগণের মতকে অধিকতর উত্তম বলে গ্রহণ করেছেন। [সিরাজিয়া,বাদা-ই'উস্ সানা-ই']

---<>---

রোযা

রোযা ইসলামী শরিয়তের পঞ্চ বুনিয়াদের অন্যতম তাৎপর্যবহ ইবাদত। সাইয়্যেদুনা হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম হতে সাইয়্যেদুনা হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম পর্যন্ত সকল নবী-রাসূলের শরিয়তেও তাঁদের উম্মতগণের উপর রোযা একটি ফরয এবাদত হিসেবে বিধিবদ্ধ ছিল। মানব সত্তার আত্মিক উৎকর্ষ ও দৈহিক সুস্থতা সাধনে রোযার অপরিসীম প্রভাব ও উপকারিতা রয়েছে। নামায, সাজদা ইত্যাদি ইবাদত ফিরিশতা, জিন্‌সহ অন্যান্য মাখলুক্বও সম্পন্ন করে থাকে। কিন্তু রোযা একমাত্র মানব জাতিরই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। নাফ্‌স ও রূহ পরস্পর চরম শত্রু। পানাহার দ্বারা নাফ্‌স শক্তিশালী হয় এবং রূহ দুর্বল হয়। আর রোযা পালনের মধ্য দিয়ে রূহ শক্তিশালী হয়। তা দ্বারা রূহ পবিত্র, পরিশুদ্ধ ও উন্নত হয়। একবিংশ শতাব্দির চিকিৎসা বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের এযুগেও চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে পরিকল্পিত উপায়ে পানাহার নিয়ন্ত্রণ অনেক রোগ-ব্যাধির মোক্ষম চিকিৎসা। আর তা সহজে অর্জিত হয় সিয়াম সাধনা বা রোযা পালনের মাধ্যমে। ওযূ-গোসল দ্বারা মু'মিন নামায, ক্বোরআন তেলাওয়াত ও মসজিদে প্রবেশ ইত্যাদি ইবাদতের উপযুক্ত রূপে গণ্য হয়। অনুরূপ সিয়াম পালনের মধ্য দিয়ে বান্দা আল্লাহর দিদার-দর্শন লাভের যোগ্য বলে গণ্য হয়। নাফ্‌সের কামনা-বাসনা নিয়ন্ত্রণ, আধ্যাত্মিক অগ্রগতি সাধন, ক্ষুধার্ত-পিপাসার্ত, অভাবী-অসহায়দের জ্বালা-যন্ত্রণা অনুধাবন করে তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন, মানব মনে আল্লাহর ইবাদত-আনুগত্যের জযবা সৃষ্টি ইত্যাদির ক্ষেত্রে রোযার কার্যকারিতা অপরিসীম। এ কারণে পবিত্র ক্বোরআন ও হাদীস-ই রাসূলের মধ্যে ইখ্‌লাস বা একনিষ্ঠতার সাথে রোযা পালনের উপরও অতীব গুরুত্বারোপ করা হয়েছে-

রোযার সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ

صــــــــوم আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা, পরিত্যাগ করা ও সরল-সোজা হওয়া ইত্যাদি। [তাফসীর-ই কবীর ও তাফসীর-ই নঈমী]

নিরবতা পালনকেও صــــوم বলা হয়। কেননা এক সময় পূর্ববর্তী কোন কোন শরীয়তে কথোপকথন থেকেও 'বিরত থাকা' হতো। যেমন, পবিত্র ক্বোরআনে এরশাদ হয়েছে- اِنِّىْ نَـذَرْتُ لِـلرَّحْمٰنِ صَوْمًا অর্থাৎ- আমি আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের মানসে صــوم তথা কথোপকথন হতে বিরত থাকার মান্নত করেছি। [সূরা মারয়াম] আরবী ভাষায় দুপুরকেও صَـوْمُ النَّهَارُ বলা হয়। কেননা, এ সময় সূর্য স্থির

ও সোজা হয়ে যায়। আরবীতে আরো বলা হয়- صَـامَ الْـفَرَسُ অর্থাৎ ঘোড়া দাঁড়িয়ে গেছে। অর্থাৎ- চলার গতি ত্যাগ করেছে। [তাফসীর-ই কবীর ও তাফসীর-ই নঈমী]

ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায় صوم এর সংজ্ঞা হলো- اَلـصَّوْمُ هُوَالْاِمْسَاكُ عَنِ الْاَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ نَهَارًا مَعَ النِّيَّةِ অর্থাৎ- মু'মিন নর-নারীর সুবহি সাদিক্ব হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ইবাদতের নিয়্যতে সকল প্রকার পানাহার ও স্ত্রী সহবাস তথা কামাচার থেকে বিরত থাকাকে শরীয়তের পরিভাষায় রোযা বলা হয়।
[মুখতাসারুল কুদুরী ও তাফসীর-ই নঈমী]

উল্লেখ্য যে, صيـــام শব্দটি قيـــام এর ন্যায় মাসদার রূপেও ব্যবহৃত হয়। আবার صوم ও صائم এর বহুবচনরূপেও ব্যবহৃত হয়। যেমন نائم এর বহুবচন نيام এবং قائم এর বহুবচন قيام ।

রোযার প্রকারভেদ

ইসলামী আইন শাস্ত্রবিদ ফোক্বাহায়ে কেরাম ফিক্বহ শাস্ত্রের কিতাবসমূহে বর্ণনা করেছেন-রোযা প্রধানতঃ দু'প্রকার। ফরয রোযা আর নফল রোযা। [মুখতাসারুল কুদুরী]

ফরয রোযা আবার দু'ভাগে বিভক্ত। যথা-

প্রথমতঃ ওই সকল ফরয রোযা, যেগুলো আদায় করা নির্দিষ্ট সময়-কালের সাথে সংশ্লিষ্ট। যেমন- মাহে রমযান শরীফের ফরয রোযা আর সুনির্দিষ্ট দিন-কালের সাথে সংশ্লিষ্ট মান্নতের রোযা।

এ সকল ফরয রোযা রাত্রিকালীন নিয়তের মাধ্যমেও শুদ্ধ হবে। আবার রাত্রিকালে ভুলবশতঃ নিয়্যত করা না হলে সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ার পূর্বে নিয়্যতের মাধ্যমেও রোযা বৈধ হয়ে যাবে।

দ্বিতীয়তঃ ওই সকল ফরয রোযা, যেগুলো সম্পন্ন করার জন্য সময় নির্দিষ্ট নেই, মু'মিনের দায়িত্বে ওইগুলো বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। যেমন, মাহে রমযানের রোযার ক্বাযা আদায় করা, সাধারণ মান্নতের তথা সুনির্দিষ্ট সময়-কালের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এমন মান্নতের রোযা এবং বিভিন্ন প্রকারের কাফ্ফারার রোযা ইত্যাদি। এ সকল ফরয রোযা রাত্রিকালীন নিয়্যতের মাধ্যমেই একমাত্র শুদ্ধ ও বৈধ হয়। কেননা এসব রোযার জন্য শরীয়তের পক্ষ থেকে সময় নির্ধারিত নেই। তাই সুবহি সাদিক্বের পূর্বে নিয়্যত করার মধ্য দিয়ে সময়কে রোযার জন্য নির্দিষ্ট করা বাঞ্ছনীয়।

নফল রোযা আবার দুই ভাগে বিভক্ত। যথা, ১. নফলে মাসনূন অর্থাৎ- সুন্নাতে রাসূলের আলোকে নফল এবং ২. নফলে মুস্তাহাব। দশ মুহাররম্ (আশূরা)'র রোযা, আইয়্যামে বীদ্ব তথা প্রতি চান্দ্র মাসের তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখের রোযা, আরফা-দিবসের রোযা, সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোযা এবং পবিত্র শাওয়াল মাসের ছয় রোযা ইত্যাদি নফলে মাসনূনের রোযা। সকল প্রকার নফল রোযা

সূর্যাস্তের পর হতে পরদিন সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ার পূর্ববর্তী সময়ে নিয়্যত করার মধ্য দিয়ে শুদ্ধ ও বৈধ হয়। [আলমগীরী, দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার]

এ ছাড়া অন্যান্য সময়ে স্বেচ্ছায় রোযা পালন করা নফলে মুস্তাহাব। উল্লেখ্য যে, বছরে পাঁচ দিন অর্থাৎ- দুই ঈদের দুই দিন, এগার, বার ও তের যিলহজ্জ, (আইয়্যামে তাশরীক্বে) রোযা রাখা সম্পূর্ণরূপে হারাম। [প্রাগুক্ত]

রোযা কবে ও কিভাবে ফরয হয়

ইসলামী আইন শাস্ত্র বিশারদ ফোক্বাহায়ে কেরাম ও হাদীস বেত্তাদের মতে, রোযা দ্বিতীয় হিজরীর দশ শাওয়াল পবিত্র মদীনা মুনাওয়ারায় ফরয হয়।
[দুররে মুখতার, তাফসীরে খাযা-ইনুল ইরফান ও খাযিন]

প্রথমে দশ মুহররম আশুরার একটি মাত্র রোযা ফরয হয়। পরবর্তীতে এ বিধান রহিত হয়ে প্রতি চান্দ্র মাসের তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখের, তথা আইয়ামে বীদ্বের রোযা ফরয হয়। এরপরে এ বিধান রহিত হয়ে মাহে রমযানের একমাসব্যাপী রোযা ফরয হয়; কিন্তু মু'মিনগণের এখতিয়ার ছিল- হয়তো রোযা পালন করবে অথবা প্রতিটি রোযার পরিবর্তে অর্ধ সা' পরিমাণ গম কিংবা তার মূল্য ফিদিয়া হিসেবে আদায় করবে। পরবর্তীকালে এ বিধানও রহিত হয়ে মাহে রমযান শরীফে রোযা পালন করা বাধ্যতামূলক হয়ে যায়।

রোযা ফরয হওয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে পূর্ববর্তী শরীয়তের ন্যায় ইসলামেও ইফতারের পর হতে এশা তথা ঘুমিয়ে পড়ার পূর্ব পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সহবাস বৈধ ছিল। এ কঠোর বিধান সাহাবায়ে কেরামের উপর কষ্টকর হওয়ার কারণে পরবর্তীতে এটা রহিত হয়ে সুবহি সাদিক্বের পূর্ব পর্যন্ত পানাহার বৈধ হয়। কিন্তু স্ত্রী সহবাস হারাম হিসেবে বলবৎ থাকে। একদা সাইয়েদুনা ওমর ফারুক্বে আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এবং আরো কতিপয় সাহাবীর পক্ষ থেকে এশার নামাযের পর স্ত্রী সহবাসের ঘটনা ঘটে যায়। আমিরুল মু'মনীন সাইয়্যেদুনা ওমর ফারূক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু গোসল করে কান্নাকাটি করতে লাগলেন এবং নিজকে তিরস্কার করতে শুরু করলেন। অতঃপর রাসূলে খোদা হাবীবে কিবরিয়া সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে সাইয়্যেদুনা ওমর ফারূক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়কা ওয়াসাল্লাম! আপনার পবিত্রতম দরবারে আমি আমার অপরাধী ও অবাধ্য নাফসের ওযর পেশ করে আরয করছি যে, এশার নামাযের পর আমি স্বীয় স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়েছি। তখন আরো কয়েকজন সাহাবী দাঁড়িয়ে আরয করলেন- হে আল্লাহর রাসূল! আমরাও উক্ত অপরাধে জড়িত হয়েছি। তখনই ক্বোরআন মজীদে নাযিল হয়

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَآئِكُمْ الْاٰيَة - অর্থাৎ- রোযার রাত্রিকালে স্ত্রী সহবাস তোমাদের জন্য হালাল করা করা হয়েছে। [সূরা বাক্বারা, আয়াত- ১৮৭]

এটা দ্বারা অতীতের অপরাধের ক্ষমা এবং সুবহি সাদিক্বের পূর্ব পর্যন্ত স্ত্রী সহবাস হালাল হওয়ার সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।

[তাফসীর-ই দুররে মানসূর, রূহুল মা'আনী, তাফসীর-ই নঈমী]

তাফসীরে দুররে মানসূর শরীফে উল্লেখিত আছে যে, নামাযের বর্তমান বিধান যেভাবে পর্যায়ক্রমে হয়েছে, তেমনি রোযা ফরয হওয়ার বেলায়ও। নামায সর্বপ্রথম মি'রাজ রজনীতে পঞ্চাশ ওয়াক্ত ফরয হয়। অতঃপর সাইয়্যেদুনা মূসা কলীমুল্লাহ আলায়হিস সালামের আবেদনক্রমে রাসূলে করীম রঊফুর রহীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ফরিয়াদের প্রেক্ষিতে নামাযের পরিমাণ কমিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত করা হয়। প্রথমতঃ নামায প্রতি ওয়াক্বত দুই রাক'আত করে ফরয করা হয়। পরবর্তীতে সফরের অবস্থায় দুই রাক'আত ফরয বহাল রাখা হয় এবং মুক্বীম অবস্থায় দুই রাক'আত বৃদ্ধি করে চার রাক'আত ফরয করা হয়।

[তাফসীর-ই আহমদী ও দুররে মানসূর]

রোযার ফযীলত

পবিত্র ক্বোরআনে করীম এবং হাদীসে নবভী শরীফে রোযার অপরিসীম ফযীলত,বরকত ও মহিমা বিবৃত হয়েছে, যা দ্বারা প্রমাণিত হয় রোযা একটি অতীব বরকতময় ও তাৎপর্যবহ ইবাদত। নিম্নে তার কিছুটা আলোচনা করা হলো।

আল্লাহ পাক ক্বোরআন মজীদে এরশাদ করেছেন-

يَـاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۙ اَيَّامًا مَّعْدُوْدَاتٍ ط فَـمَـنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ط وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ط فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ط وَاَنْ تَـصُـوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ط شَهْـرُ رَمَضَانَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْـقُـرْاٰنُ هُـدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَـمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ط وَمَـنْ كَـانَ مَرِيْضًا اَوْعَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ط يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْـرَ وَلَا يُـرِيْـدُ بِـكُـمُ الْعُسْرَ وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

তরজমাঃ হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয হয়েছিলো; যাতে তোমাদের পরহেযগারী অর্জিত হয়।

নির্দিষ্ট দিনসমূহ। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে কেউ রুগ্ন হও কিংবা সফরে থাকো, অতঃপর ততসংখ্যক রোযা অন্যান্য দিনসমূহে। আর যাদের মধ্যে এর সামর্থ্য না থাকে তারা এর বিনিময়ে দেবে একজন মিসকীনের খাবার। অতঃপর যে ব্যক্তি নিজ থেকে সৎকর্ম অধিক করবে, তবে তার জন্য উত্তম এবং রোযা রাখা তোমাদের জন্য অধিক কল্যাণকর, যদি তোমরা জানো।

রমযান মাস, যাতে ক্বোরআন অবতীর্ণ হয়েছে, মানুষের জন্য হিদায়ত ও পথ-নির্দেশ এবং মীমাংসার সুস্পষ্ট বাণীসমূহ। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাস পাবে, সে যেন অবশ্যই সেটার রোযা পালন করে। আর যে ব্যক্তি রুগ্ন হয়, কিংবা সফরে থাকে, তবে তত সংখ্যক রোযা অন্যান্য দিনসমূহে। আল্লাহ্ তোমাদের উপর সহজই চান এবং তোমাদের উপর ক্লেশ চান না; আর এ জন্য যে, তোমরা সংখ্যা পূরণ করবে এবং আল্লাহর মহিমা বর্ণনা করবে, এর উপর যে, তিনি তোমাদেরকে হিদায়ত করেছেন আর যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

[সূরা বাক্বারা, আয়াত- ১৮৩, ১৮৪ ও ১৮৫]

উপরোক্ত আয়াতে করীমার আলোকে প্রমাণিত হয়,বছরে সুনির্দিষ্ট এক মাস মাহে রমযান শরীফে সিয়াম পালনের সার্থকতা ও সাফল্য হলো পরবর্তী সময়ে তাক্বওয়া নির্ভর জীবন অতিবাহিত করা। যে তাক্বওয়া পরহেযগারী আল্লাহ ও তাঁর প্রিয়তম রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সন্তুষ্টি অর্জন ও পরকালীন জীবনের শান্তি এবং মুক্তি অর্জনের মহা অবলম্বন। সিয়ামের সাফল্য নাফ্সের কুপ্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ ও তাক্বওয়া ভিত্তিক জীবন চর্চার মধ্যে নিহিত।

হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

১

وَعَـنْ اَبِـىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ عَـمَـلِ ابْـنِ اٰدَمَ يُـضَـاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا اِلٰى سَبْعِ مِائَةِ ضَعْفٍ قَالَ اللّٰهُ تَـعَالٰى اِلَّا الصَّوْمَ فَاِنَّهٗ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهٖ يَدَعُ شَهْوَتَهٗ وَطَعَامَهٗ مِنْ اَجْلِىْ ـ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهٖ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَآءِ رَبِّهٖ ـ

অর্থাৎ (সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী-ই রাসূল সাইয়্যেদুনা) হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল-ই আকরাম নূরে মুজাস্সাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- আদম সন্তানের সকল নেক আমলের সাওয়াব বর্ধিত করা হয়। একটি নেক আমলের সাওয়াব দশগুণ থেকে সাতশতগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে প্রদান করা হয়। আল্লাহ্

তা'আলা বলেন, কিন্তু রোযার বিষয় ব্যতিক্রম। কেননা, রোযা আমারই জন্য। আর আমি নিজেই এর প্রতিদান দেবো। রোযাদার আমার উদ্দেশ্যে তার মনের কামনা-বাসনার বস্তু ও পানাহার বর্জন করে। রোযাদারের জন্য দুই প্রকারের বিশেষ আনন্দ রয়েছেঃ এক প্রকারের আনন্দ ইফতারের সময় আর দ্বিতীয় প্রকারের আনন্দ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দীদার-দর্শন লাভের মুহূর্তে। [সহীহ্ বোখারী ও মুসলিম শরীফ]

উপরোক্ত হাদীসের আলোকে প্রতীয়মান হয় রোযা একটি ব্যতিক্রমধর্মী এবাদত। অন্যান্য সকল নেক আমলের মধ্যে রিয়া-লৌকিকতার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু রোযার মধ্যে লৌকিকতার সম্ভাবনা নেই। অন্যান্য নেক আমলের প্রতিদান জান্নাত; কিন্তু রোযার প্রতিদান হলো আল্লাহ পাকের দীদার-দর্শন ও সন্তুষ্টি।

২

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلصِّيَامُ وَالْقُرْاٰنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَقُوْلُ الصِّيَامُ اَىْ رَبِّ اِنِّىْ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهْوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِىْ فِيْهِ وَيَقُوْلُ الْقُرْاٰنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِىْ فِيْهِ فَيُشَفَّعَانِ ـ

অর্থাৎ সাইয়্যেদুনা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল-ই পাক সাহেবে লাওলাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, রোযা ও ক্বোরআন (ক্বিয়ামত দিবসে) রোযাদারের জন্য (আল্লাহ্র দরবারে) সুপারিশ করবে। রোযা আরয করবে- হে রাব্বুল আলামীন! আমি আপনার এ বান্দাকে দিনের বেলায় পানাহার ও মনের কামনা-বাসনার বস্তু গ্রহণ করা থেকে বিরত রেখেছি। অতএব, আজ আমার সুপারিশ তার পক্ষে কবূল করুন। আর ক্বোরআন বলবে- আমি তাকে রাতের বেলায় নিদ্রা থেকে বিরত রেখেছি। অতএব, আমার সুপারিশ তার পক্ষে কবূল করুন! অতঃপর রোযা ও ক্বোরআন উভয়ের সুপারিশ রোযাদারের পক্ষে কবূল করা হবে।

[বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান]

এ হাদীসের আলোকে প্রমাণিত হলো- রোযা এমন একটি আমল, যা ক্বিয়ামত দিবসের কঠিন মুহূর্তে আল্লাহর দরবারে রোযাদারের মুক্তির নিমিত্তে গ্রহণযোগ্য সুপারিশকারী হবে।

৩

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكٰوةٌ وَزَكٰوةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ [رواه ابن ماجة]

অর্থাৎ (নবী প্রেমে নিবেদিতপ্রাণ সাহাবী সাইয়্যেদুনা) হযরত আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল-ই করীম রঊফুর রহীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, প্রতিটি বস্তুর যাকাত রয়েছে। আর দেহের যাকাত হলো রোযা। [ইবনে মাজাহ শরীফ]

এ হাদীসে রোযাকে দেহের যাকাতরূপে গণ্য করে মু'মিন নর-নারীদের সুসংবাদ দেয়া হলো যেভাবে যাকাত আদায়ের মাধ্যমে সম্পদ পবিত্র, ধ্বংসের হাত থেকে নিরাপদ এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তেমনি রোযা পালনের মধ্য দিয়ে দেহ পাপ-পঙ্কিলতার কালিমা হতে পবিত্র, স্বাস্থ্যহানিকর রোগ-ব্যাধি হতে মুক্ত এবং আত্মিক শান্তি বৃদ্ধি পায়।

৪

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّآئِمِ عِنْدَ فِطْرِهٖ دَعْوَةٌ مُّسْتَجَابَةٌ

অর্থাৎ রাসূলে খোদা হাবীবে কিবরিয়া সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, ইফতারের সময় রোযাদারের জন্য একটি মাক্ববূল দো'আ রয়েছে। [আবূ দাউদ শরীফ]

৫

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاِحْتِسَابًا غُفِرَلَهٗ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاِحْتِسَابًا غُفِرَلَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَّاِحْتِسَابًاغُفِرَلَهٗ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ [متفق عليه]

অর্থাৎ (আসহাবে সুফ্ফার অন্যতম সাহাবী-ই রাসূল সাইয়্যেদুনা) হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে খোদা আশরাফে আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি প্রকৃত ও পরিপূর্ণ ঈমানের সাথে সাওয়াব লাভের প্রত্যাশায় মাহে রমযানের রোযা পালন করবে তার জীবনের পূর্ববর্তী সমুদয় গুনাহ্ ক্ষমা করা হবে। আর যে ব্যক্তি প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গ ঈমানের সাথে সাওয়াব লাভের আশায় মাহে রমযানের রাত জেগে ইবাদত করবে তার জীবনের পূর্ববর্তী সমুদয় পাপ মার্জনা করা হবে। আর যে ব্যক্তি প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গ ঈমান সহকারে সওয়াব লাভের আশায় শবে ক্বদরে ইবাদত-বন্দেগী করবে তার অতীত জীবনের সকল পাপ ক্ষমা করে দোয়া হবে।

[সহীহ বোখারী ও মুসলিম শরীফ]

এ হাদীসে বারংবার ঈমানকে পূর্বশর্ত করে মু'মিনকে তাগিদ দেয়া হলো যে, ঈমানদারের শারিরীক, আর্থিক ও আত্মিক সকল প্রকার ইবাদত-বন্দেগী আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট কবুল হয়ে পরকালীন জীবনে নাজাতের অবলম্বন হওয়ার পূর্বশর্ত হলো সঠিক ও বিশুদ্ধ ঈমান আক্বীদার অধিকারী হওয়া। ঈমান বিহীন আমল অমুসলিমদের জনহিতকর ও সমাজ কল্যাণমূলক সৎকর্মের ন্যায়। আল্লাহ-রাসূলের দরবারে এহেন সৎকর্মের কোনরূপ গ্রহণযোগ্যতা নেই। উপরোক্ত হাদীসে আরো সুসংবাদ দেয়া হলো যে, মাহে রমযান শরীফে দিনের বেলায় রোযা পালন, রাতে নফল ইবাদত এবং শবে ক্বদরের ইবাদত-বন্দেগী মু'মিন নর-নারীর জীবনের সমুদয় পাপের পাওয়ার গ্যারান্টি।

৬

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ اَبْوَابٍ مِّنْهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانَ لَايَدْخُلُهُ اِلَّا الصَّآئِمُوْنَ ۔ [متفق عليه]

অর্থাৎ (প্রসিদ্ধ সাহাবী-ই রাসূল সাইয়্যেদুনা) হযরত সাহল ইবনে সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে আকরাম নূরে মুজাস্‌সাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, বেহেশতে আটটি দরজা রয়েছে। তন্মধ্যে একটির নাম হলো 'রাইয়্যান', যা দ্বারা একমাত্র রোযাদারগণ বেহেশতে প্রবেশ করার সৌভাগ্য অর্জন করবে। [সহীহ বোখারী ও মুসলিম শরীফ]

৭

وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِالْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بَعَّدَ اللّٰهُ وَجْهَهٗ مِنَ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا ۔ [متفق عليه]

অর্থাৎ প্রসিদ্ধ সাহাবী-ই রাসূল সাইয়্যেদুনা আবূ সা'ঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে পাক সাহেবে লাওলাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে স্বেচ্ছায় একটি মাত্র রোযা পালন করবে আল্লাহ পাক তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে সত্তর বছরের দূরত্বের ব্যবধানে সরিয়ে রাখবেন। [সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম শরীফ]

৮

وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ جَعَلَ اللّٰهُ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا كَمَا بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ [رواه الترمزى]

অর্থাৎ- প্রসিদ্ধ সাহাবী-ই রাসূল সাইয়্যেদুনা হযরত আবূ উমামা বাহেলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে খোদা ইমামুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে একটি মাত্র রোযা পালন করবে আল্লাহ রব্বুল আলামীন তার এবং জাহান্নামের মধ্যে আসমান-যমীনের মধ্যবর্তী বিশাল ব্যবধানের ন্যায় একটি গর্ত সৃষ্টি করে দেবেন। (যাতে রোযাদার জাহান্নামের তাপ ও গন্ধ কিছুই উপলব্ধি করতে না পারে।) [তিরমিযী শরীফ]

উপরোক্ত হাদীসে নবভী শরীফের আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, রোযা জাহান্নাম থেকে রক্ষার ঢাল স্বরূপ। যেমন, অন্য রেওয়ায়তে আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ অর্থাৎ- রোযা ঈমানদারের জন্য ঢাল স্বরূপ।

৯

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ اَبْوَابُ السَّمَآءِ وَفِىْ رِوَايَةٍ فُتِحَتْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ اَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ وَفِىْ رِوَايَةٍ فُتِحَتْ اَبْوَابُ الرَّحْمَةِ [متفق عليه]

অর্থাৎ হাদীসে নবভী শরীফের একনিষ্ঠ খাদেম সাহাবী-ই রাসূল সাইয়্যেদুনা হযরত আবূ হোরায়রাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম রউফুর রহীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, (রহমত, মাগফিরাত ও জাহান্নাম থেকে নাজাতের সওগাত নিয়ে) যখন মাহে রমযান শুরু হয়, তখন আসমানের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করা হয়। আর এক রেওয়ায়তে বর্ণিত হয়েছে, জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয় আর জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানদেরকে জিঞ্জিরাবদ্ধ করা হয়। অন্য রেওয়ায়তে রয়েছে- রহমতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়।

[সহীহ্ বোখারী, সহীহ মুসলিম ও মিশকাত শরীফ]

১০

وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ اٰخِرِ يَوْمٍ مِّنْ شَعْبَانَ فَقَالَ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ اَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيْمٌ شَهْرٌ مُّبَارَكٌ شَهْرٌ فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ جَعَلَ اللّٰهُ صِيَامَهٗ فَرِيْضَةً وَقِيَامَ لَيْلِهٖ

تَطَوُّعًا ـ مَنْ تقرَّبَ فِيْهِ بِخَصْلَةٍ مِّنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ اَدّٰى فَرِيْضَةً فِيْمَا سِوَاهُ وَمَنْ اَدّٰى فَرِيْضَةً فِيْهِ كَانَ كَمَنْ اَدّٰى سَبْعِيْنَ فَرِيْضَةً فِيْمَا سِوَاهُ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيْهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ [رواه البيهقى فى شعب الايمان]

অর্থাৎ (প্রসিদ্ধ সাহাবী-ই রাসূল সাইয়্যেদুনা) হযরত সালমান ফারেসী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মাহে শা'বানের শেষ দিবসে আমাদের সম্মুখে খুত্‌বা প্রদানকালে এরশাদ করলেন, হে মানব জাতি! তোমাদের উপর একটি আযীমুশ্‌শান বরকতময় মাস ছায়া বিস্তার করেছে, যে মাসে সহস্র মাসের চেয়েও অধিক উত্তম একটি রজনী রয়েছে। (অর্থাৎ শবে ক্বদর) এ মাসে রোযা পালনকে আল্লাহ পাক ফরয এবং রাতে ইবাদত করাকে নফলরূপে সাব্যস্ত করেছেন। যে ব্যক্তি এ মহিমান্বিত মাসে একটি নফল আদায় করে নৈকট্য অর্জনে তৎপর হবে সে অন্যান্য মাসে ফরয আদায়কারীর ন্যায় প্রতিদান পাবে। আর যে ব্যক্তি এমাসে একটি ফরয আদায় করবে সে অন্য মাসের ৭০টি ফরয আদায়কারীর সমান সাওয়াব পাবে। এটা সবর ও সংযমের মাস আর সবরের প্রতিদান হলো জান্নাত। এটা পরস্পর সহমর্মিতার মাস। এটা মুমিনের রিযক্ব বৃদ্ধি পাবার মাস।

[বায়হাক্বী শরীফ, শু'আবুল ঈমান এর বরাতে মিশকাত শরীফ, সিয়াম অধ্যায়]

১১

وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَهِدَ شَهْرَ رَمُضَانَ فِىْ مَكَّةَ وَصَامَ وَقَامَ اللَّيْلَةَ بِمَا تَيَسَّرَ كَتَبَ اللّٰهُ لَهٗ وَلِمَقَامِهٖ ثَوَابَ مِائَةِ اَلْفِ رَمُضَانَ وَثَوَابَ عِتْقِ عَبْدٍ وَثَوَابَ رُكُوْبِ الْفَرَسِ فِى الْجِهَادِ كُلَّ يَوْمٍ وَكَتَبَ لَهُ الْحَسَنَةَ كُلَّ لَيْلَةٍ وَنَهَارٍ [رواه ابن ماجة]

অর্থাৎ মুফাস্‌সিরকুল সরদার সাইয়্যেদুনা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে আকরাম নূরে মুজাস্‌সাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি পবিত্র মক্কা মুকাররমায় মাহে রমযান শরীফ পাবে এবং দিনের বেলায় রোযা পালন করবে ও রাতের বেলায় যতটুকু সম্ভব নফল ইবাদত করবে আল্লাহ রব্বুল আলামীন তার আমলনামায় অন্য স্থানের এক লক্ষ রমযানের সাওয়াব লিপিবদ্ধ করে দেবেন এবং প্রতিদিন একটি গোলাম আযাদ করার এবং প্রতিদিন জেহাদের জন্য ঘোড়ায় সাওয়ার হবার সাওয়াব লিবিপদ্ধ করে দেবেন এবং প্রতি দিবা-রজনী তার আমল নামায় সওয়াব লিবিপদ্ধ করা হবে। [ইবনে মাজাহ শরীফ]

১২

প্রসিদ্ধ সাহাবী-ই রাসূল সাইয়্যেদুনা হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে খোদা আশরাফে আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, পবিত্র মাহে রমযান শরীফে আমার উম্মতকে এমন পাঁচটি বিষয় দেয়া হয়েছে, যা আমার পুর্ববর্তী অন্য কোন নবীকে দান করা হয়নিঃ

প্রথমতঃ মাহে রমযানের প্রথম রজনীতে আল্লাহ পাক আমার উম্মতের প্রতি দয়ার নজরে তাকান। যার প্রতি আল্লাহর রহমতের নজর পতিত হবে তাকে কখনো আযাব দেবেন না।

দ্বিতীয়তঃ রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর নিকট মেশকের চেয়েও অধিক উত্তম।

তৃতীয়তঃ প্রতি দিবা-রজনী ফিরিশতারা রোযাদারের জন্য মাগফিরাত কামনা করে থাকেন।

চতুর্থতঃ আল্লাহ পাক জান্নাতকে হুকুম দিয়ে বলেন, হে বেহেশত! তৈরী হও, আমার রোযাদার বান্দাগণের জন্য সৌন্দর্যমন্ডিত হও। অতি সত্বর তাঁরা দুনিয়ার ক্লান্তি হতে এখানে এসে যেন বিশ্রাম নিতে পারে।

পঞ্চমতঃ যখন শেষ রাত্রি হয় তখন আল্লাহ পাক সকল রোযাদারকে ক্ষমা করে দেন। কেউ আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এটা কি শবে ক্বদরে? জবাবে হাবীবে খোদা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, না তুমি কি দেখতে পাওনা দায়িত্ব পালনকারী দায়িত্ব পালন শেষে পারিশ্রমিক পেয়ে থাকে? [বায়হাক্বী শরীফ]

১৩

সাহাবী-ই রাসূল সাইয়্যেদুনা হযরত আবূ উমামা বাহেলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর-খিদমতে আরয করলাম, "হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে কোন নেক আমলের হুকুম দিন।" আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "রোযা পালন করাকে নিজের জন্য বাধ্যতামূলক করে নাও। কেননা, তার সমান আর কোন আমল নেই। আমি পুনরায় আরয করলাম, "আমাকে কোন নেক আমলের হুকুম দিন।" আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পুনরায় এরশাদ করলেন, "রোযা পালনকে বাধ্যতামূলক করে নাও।কারণ সেটার সমতুল্য অন্য কোন নেক আমল নেই।" আমি আবার একই প্রশ্ন করলে তিনিও আমাকে একই আমলের হুকুম দিলেন।

[নাসাঈ শরীফ, সহীহ ইবনে খুযায়মা ও হাকেম]

১৪

প্রসিদ্ধ সাহাবী-ই রাসূল সাইয়্যেদুনা হযরত আবূ মাস'উদ গিফারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি একটি দীর্ঘ হাদীসে রাসূল বর্ণনা করেছেন-

সেখানে রয়েছে, রাসূলে আকরাম নূরে মুজাস্সাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "আল্লাহর বান্দারা যদি জানতো রমযান কি জিনিষ, তবে আমার উম্মত কামনা করতো যেন পুরো বছরই রমযান হয়ে যায়।

[সহীহ ইবনে খুযায়মা]

১৫

সাহাবী-ই রাসূল সাইয়্যেদুনা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে পাক সাহেবে লাওলাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "আল্লাহ পাকের নিকট আমল সাত প্রকার। তন্মধ্যে দু' প্রকারের আমল ওয়াজিবকারী। আর দু' প্রকারের আমলের প্রতিদান বরাবর। আরেক প্রকারের আমলের বদলা দশ গুণ। অন্য এক প্রকারের আমলের প্রতিদান সাতশ' গুণ। আরেক প্রকারের আমল এমন রয়েছে, যার সাওয়াব আল্লাহ পাকই জানেন। অতএব ওইগুলো হচ্ছে-

১. বান্দা এমন অবস্থায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে মিলিত হবে, যখন সে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করতো এবং আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করতো না। তার জন্য বেহেশত ওয়াজিব।
২. বান্দা এমতাবস্থায় আল্লাহর সাথে মিলিত হবে, যখন সে আল্লাহর সাথে শরীক করতো, তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব।
৩. যে ব্যক্তি অসৎ কর্ম করে তার সাজাও অসৎ কর্মের সম পরিমাণ।
৪. যে ব্যক্তি নেক আমলের নিয়্যত করেছে, কিন্তু নেক আমল করেনি তাকে একটি নেক আমলের সাওয়াব দান করা হবে।
৫. আর যে ব্যক্তি নেক আমল করেছে তাকে দশ গুণ সওয়াব দেয়া হবে।
৬. যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে ব্যয় করেছে তাকে সাতশ' গুণ সাওয়াব দেয়া হবে। এক দিরহাম ব্যয় করলে সাতশ' দিরহামের সাওয়াব এবং এক দিনার ব্যয় করলে সাতশ' দিনার ব্যয়ের সাওয়াব দেয়া হবে।
৭. আর রোযা একমাত্র আল্লাহরই জন্য। এর সাওয়াব (কত অপরিসীম তা) আল্লাহই জানেন। (তাই তিনিই সেটার প্রতিদান দেবেন।)

[ত্বাবরানী ফিল আওসাত ও বায়হাক্বী শরীফ]

সাহ্রী ও ইফতারের ফযীলত

وَعَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَحَّرُوْا فَاِنَّ فِى السَّحُوْرِ بَرْكَةٌ (متفق عليه)

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর একনিষ্ঠ খাদিম সাহাবী সাইয়্যেদুনা হযরত আনাস ইবনে মালেক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম রঊফুর রহীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- তোমরা সাহ্রী আহার করো। কেননা, সাহ্রী গ্রহণের মধ্যে বরকত রয়েছে। [সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ عَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ اَهْلِ الْكِتَابِ اَكْلَةُ السَّحْرِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

অর্থ্যাৎ প্রখ্যাত সাহাবী-ই রাসূল সাইয়্যেদুনা হযরত 'আমর ইবনুল 'আস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে আকরাম নূরে মুজাস্সাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- আমাদের রোযা ও আহলে কিতাব ইয়াহুদী-নাসারাদের রোযার মধ্যে পার্থক্য হলো সাহ্রী গ্রহণ করা।

[সহীহ্ মুসলিম শরীফ]

(তারা সাহরী করে না, কারণ এশার নামাযের পর থেকে তাদের উপর পানাহার হারাম ছিলো। ইসলামে পুরো রাত পানাহার হালাল করা হয়েছে।)

وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَفْطَرَ اَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلٰى تَمْرٍ فَاِنَّهٗ بَرْكَةٌ فَاِنْ لَّمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلٰى مَآءٍ فَاِنَّهٗ طَهُوْرٌ [رواه احمد و الترمذى وابوداؤد وابن ماجه والدارمى]

অর্থাৎ সাইয়্যেদুনা হযরত সালমান ইবনে আমের রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- যখন তোমাদের মধ্যে কেউ ইফতার করার ইচ্ছা করে সে যেন খেজুর দিয়ে ইফতার করে। কেননা, খেজুর বরকতময়। আর যদি খেজুর না পায় তবে যেন পানি দিয়ে ইফতার করে; কেননা, পানি পবিত্র করে।

[মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী শরীফ, আবূ দাঊদ ও ইবনে মাজাহ্ শরীফ]

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَا لَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَحَبُّ عِبَادِىْ اِلَىَّ اَعْجَلُهُمْ فِطْراً [رواه الترمزى]

অর্থাৎ (নবী প্রেমে নিবেদিতপ্রাণ সাহাবী সাইয়্যেদুনা) হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এরশাদ ফরমায়েছেন- আমার নিকট অধিকতর প্রিয় ওই বান্দা, যে তাড়াতাড়ি ইফতার করে। (যাতে ইয়াহুদী-নাসারাদের সাথে সামঞ্জস্য না হয়। কেননা, তারা বিলম্বে ইফতার করে।) [তিরমিযী শরীফ]

প্রসিদ্ধ সাহাবী সাইয়্যেদুনা হযরত আবূ সা'ঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে আকরাম নূরে মুজাস্সাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, সাহ্রীর সবই অপরিসীম বরকতে পরিপূর্ণ। সুতরাং তা ত্যাগ করো না, যদিওবা এক চুমুক পানি পান করেও তা সম্পন্ন করা হয়। কেননা, সাহ্রী আহারকারীর উপর আল্লাহ পাক এবং তাঁর ফেরেশতারা রহমত বর্ষণ করে থাকে। [মুসনাদে ইমাম আহমদ]

সাইয়্যেদুনা হযরত সালমান ফারেসী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে খোদা আশরাফে আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-যে ব্যক্তি হালাল আহার্য দ্বারা অথবা পানি দ্বারা একজন রোযাদারকে আহার করাবে আল্লাহর ফেরেশতারা মাহে রমযান শরীফে তার জন্য মাগফেরাত কামনা করবে। আর সাইয়্যেদুনা জিব্রাইল আলায়হিস্ সালাম পবিত্র শবে ক্বদরে তার জন্য (আল্লাহর দরবারে) গুনাহ্ মাফ চাইবে।

অন্য এক রেওয়ায়তে রয়েছে, যে ব্যক্তি হালাল উপার্জনের সাহায্যে মাহে রমযানের রোযাদারকে ইফতার করাবে মাহে রমযানের সকল রজনীতে ফিরিশতারা তার উপর রহমত বর্ষণ করবে এবং সাইয়্যেদুনা জিব্রাইল আলায়হিস্ সালাম লাইলাতুল ক্বদরে তার সাথে করমর্দন করবে।

আর এক রেওয়ায়তে রয়েছে- যে ব্যক্তি রোযাদারকে পানি পান করাবে আল্লাহ পাক তাকে আমার হাউযে কাউসার থেকে পানি পান করাবেন। ফলে ওই ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করা পর্যন্ত পিপাসার্ত হবে না। [ত্বাবরানী ফিল কবীর]

রোযা সম্পর্কে আরো কিছু আলোচনা

صَــوْم বা রোযার আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ ইতোপূর্বে (২১২ পৃষ্ঠায়) উল্লেখ করা হয়েছে । তা হচ্ছে রোযাকে আরবীতে صَـــــــــوْم (সাউম) বলা হয়। এর আভিধানিক অর্থ-বিরত থাকা বা দূরে থাকা। শরীয়তের পরিভাষায়, ইবাদতের নিয়্যতে সুব্হে সাদেক্ব হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সর্বপ্রকার পানাহার ও যৌন সম্ভোগ হতে বিরত থাকাকে صَــوْم বা রোযা বলা হয়। নামাযের ন্যায় মাহে রমযানের রোযাও ফরযে আইন।

মাহে রমযানের রোযা ফরযে আইন হওয়ার দলীল

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ج فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ط وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ط

তরজমাঃ মাহে রমযান এমন একটি পবিত্র মাস, যে মাসে ক্বোরআন মজীদ অবতীর্ণ হয়েছে, এমতাবস্থায় যে, উক্ত ক্বোরআন মানব গোষ্ঠির জন্য পথ প্রদর্শনকারী, হিদায়তের উজ্জ্বল প্রমাণ এবং সত্য আর অসেত্যর মধ্যে পার্থক্যকারী। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ পবিত্র মাসকে পাবে, অবশ্যই যেন সে সেটার রোযা পালন করে। আর যদি কেউ উক্ত মাসে অসুস্থ হয়ে পড়ে কিংবা সফরে থাকে, তবে তারা অন্য দিনসমূহে রোযাগুলোর ক্বাযা করবে। [২য় পারাঃ সূরা বাক্বারা]

জরুরী মাসআলাঃ রমযানুল মোবারকের রোযা মুসলমান, বালেগ, জ্ঞানী (যে পাগল নয়) সুস্থ নর-নারী ও হায়য ও নেফাস হতে মুক্ত রমনীদের উপর একান্ত অপরিহার্য বা ফরযে আইন। অস্বীকার ও ঠাট্টা করলে কাফির আর বিনা কারণে ইচ্ছাকৃতভাবে ও অবহেলা বশতঃ আদায় না করলে কবীরা গুনাহ্গার ও ফাসিক্ব হয়ে যায়। [রদ্দুল মুহতার ও আলমগীরী ইত্যাদি]

রোযার বিভিন্ন প্রকারের বিস্তারিত বিবরণ

ক. ফরয রোযাঃ যেমন মাহে রমযানের রোযা ও রমযানের ক্বাযা রোযা। সুতরাং মেয়ে লোকেরা মাসিক ঋতুস্রাব ও প্রসবান্তে রক্তক্ষরণের সময় মাহে রমযানের রোযা পালন করবে না, পরে অবশ্যই ক্বাযা করবে । তদ্রূপ যে ব্যক্তি তিন মন্‌জিল কিংবা তার অধিক দুরত্বের সফর করার নিয়্যতে যাত্রা শুরু করবে এবং ১৫ দিনের ভিতরে বাড়ী ফেরার আশা রাখে, যদি সে সফরের সময় মাহে রমযানের রোযা পালন না করে তবে অবশ্যই পরে ক্বাযা পালন করবে। আর যে

ব্যক্তি রমযান মাসে ভীষণ রোগে আক্রান্ত হয়, আর অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পারদর্শী মুসলমান ডাক্তার রোযা পালনে রোগ বেড়ে যাওয়ার আশংকা প্রকাশ করলে অথবা রমযানের রোযা পালন রোগাক্রান্ত ব্যক্তির জন্য সম্ভবপর না হলে পরে অবশ্যই ক্বাযা করবে। যদি পরেও সম্ভব না হয় তবে প্রক্যেকটি রোযার বদলে অর্ধসা' (দুই সের তিন ছটাক আধা তোলা পরিমাণ গম অথবা আটা) বা সমপরিমাণ মূল্য গরীব মিসকীনদেরকে ফিদিয়া (অর্থাৎ রোযার বিনিময়) স্বরূপ প্রদান করবে। এ ব্যাপারে পরম করুণাময় এরশাদ করেনঃ

اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ط فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ط

وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ

অর্থাৎ তোমাদের উপর নির্দিষ্ট এক মাস রমযানের রোযা ফরয করা হয়েছে, তবে যদি কেউ তোমাদের মধ্যে পীড়িত হয়ে যায়, কিংবা সফরে থাকে, তবে অন্য সময়ে ক্বাযা করবে, আর যে ক্বাযা করার সামর্থ্য রাখবে না, সে (প্রতিটি রোযার পরিবর্তে) একজন অভাবীকে অন্ন (উপরোক্ত পরিমাণে ফিদিয়া) প্রদান করবে। [সূরা বাক্বারা]

খ. ওয়াজিব রোযাঃ যেমন মান্নাতের রোযা। এটা বান্দার মান্নত অনুসারে আদায় করতে হবে। নির্দিষ্ট দিনের মান্নত হলে নির্দিষ্ট দিনে রাখতে হবে। আর মান্নত নির্দিষ্ট না হলে (নিষিদ্ধ দিনগুলো ব্যতীত) যে কোন দিন রাখবে। তদ্রূপ কোন ব্যক্তি নফল রোযা শুরু করার পর প্রয়োজনে ভেঙ্গে ফেললে তা অন্যদিন ক্বাযা করা ওয়াজিব।

গ. সুন্নাত রোযাঃ যা বরকতময় দিনসমূহে রাখার জন্য হাদীসে এরশাদ হয়েছে। যেমন মুহররমের দশম তারিখে আশুরার রোযা ও সোমাবরের রোযা। এটা সুন্নাত ও এতে অত্যোধিক সাওয়াব রয়েছে।

ঘ. নফল রোযাঃ যেমন নিষিদ্ধ দিনসমূহ ছাড়া যে কোন দিন ইবাদতের নিয়্যতে রোযা পালন করা। শাওয়াল মাসের ছয় রোযা, প্রতি চান্দ্র মাসের ১৩,১৪ ও ১৫ তারিখের রোযা, শুক্রবারের রোযা, শবে বরাতের রোযা ও ৯ জিলহজ্ব আরফাহ্ দিবসের রোযা ইত্যাদি নফল রোযাগুলোর অন্তর্ভুক্ত।

[বাহারে শরীয়ত ও শরহে মুসলিম- আল্লামা নাওয়াভী ইত্যাদি]

ঙ. হারাম ও নিষিদ্ধ রোযাঃ যা রাখার ব্যাপারে শরীয়তে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। যেমন দু'ঈদের দু'দিন ও জিলহজ্ব মাসের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখে রোযা রাখা হারাম।

চ. মাকরূহ রোযাঃ যেমন স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ছাড়া স্ত্রী নফল রোযা

পালন করা। ইফতার ও সেহেরী ছাড়া রোযা রাখা ইত্যাদি।

জরুরী মাসআলাঃ উল্লেখ্য যে মাহে রমযানের রোযা ব্যতীত অন্যান্য রোযা যেমন, নফল, সুন্নাত, ক্বাযা ও ওয়াজিব রোযাসমূহ শুরু করার পর ভঙ্গ-করলে শুধু একটার পরিবর্তে একটাই ক্বাযা করতে হবে কিন্তু রমযানের ফরয রোযা কেউ যদি বিনা প্রয়োজনে ইচ্ছা করে ভঙ্গ করে তবে একটি রোযার বদলে অন্য সময় একটি ক্বাযা রোযা ও ষাটটি একাধারে কাফ্ফারার রোযা আদায় করতে হবে, মাঝখানে ফাঁক দিতে পারবে না। তবুও তা মর্যাদা ও সাওয়াবের ক্ষেত্রে মাহে রমযানের রোযার সমতুল্য হবে না।

[কিতাবুল ফিক্বহ্ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আহ্ ইত্যাদি]

রোযার মূল্যায়নগত প্রকারভেদ

১. যাহেরী রোযা ঃ যা আমরা পানাহার ও স্ত্রী সহবাস পরিত্যাগ করার মাধ্যমে আদায় করে থাকি।

২. বাতেনী বা গোপনীয় রোযাঃ এটা ক্বলব বা আত্মাকে ভিন্নমুখী না করে সম্পূর্ণরূপে পরম করুণাময়ের প্রতি বিলীন করে দেওয়া ও হিংসাবিদ্বেষ ত্যাগ করে স্বীয় আত্মাকে মাহে রমযানের করুণা লাভে ধন্য করা। মূলতঃ এটাই আত্মশুদ্ধি। এটা যতক্ষণ পর্যন্ত মানব হৃদয়ে হাসিল হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত জাহেরী রোযা বা দৈহিক উপবাস কোন কাজে আসবে না।

৩. প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যেঙ্গের রোযাঃ যেমন অশ্লীল আলাপ, মিথ্যা কথা ও পরনিন্দা থেকে মুখকে হেফাযত করা মুখের রোযা, গুনাহ্র কাজ থেকে চক্ষু ফিরিয়ে রাখা চক্ষুদ্বয়ের রোযা, হাতে কুকর্ম না করা হাতের রোযা, মন্দ কাজের দিকে অগ্রসর না হওয়া পদযুগলের রোযা। প্রকৃত অর্থে এটাই রোযার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। [তাফসীরে রুহুল বয়ান ইত্যাদি]

যে সব কারণে রোযা ভঙ্গ হয়ে যায় এবং ক্বাযা ও কাফ্ফারা উভয়টা ওয়াজিব হয়

১. রমযান মাসের ফরয রোযা নিয়্যত করে রাখার পর বিনা প্রয়োজনে ইচ্ছা করে পানাহার ও স্ত্রী সহবাস করলে।

[তবে রমযান ব্যতীত অন্য মাসে মান্নতের রোযা বা নফল রোযা অথবা রমযানের ক্বাযা রোযা রাখা আরম্ভ করার পর ইচ্ছা করে ভঙ্গ করলে একটার পরিবর্তে শুধু একটা পরে ক্বাযা করবে, কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। তদ্রূপ কোন মুসাফির বা রোগী অথবা নাবালেগ কিংবা মজনূন (পাগল) রমযানের রোযা আরম্ভ করার পর এবং রোগী সুস্থ হওয়ার পর রমযানের একটি রোযার পরিবর্তে শুধু একটি

রোযা ক্বাযা করবে, আর নাবালেগ রমযানের রোযা ভঙ্গ করলে ক্বাযাও ওয়াজিব হবে না। যেহেতু সে শরীয়তের হুকুম-আহকামের আওতার বাইরে।]

২. রমযানের রোযা নিয়্যত করে রাখার পর রোযা অবস্থায় ইচ্ছা করে সামনে বা পিছনের রাস্তায় সঙ্গম করলে বা করালে।

৩. সিংঙ্গা দেওয়ার দরুণ কিংবা সুরমা দেওয়ার দরূণ অথবা চতুস্পদ জন্তুর সাথে যৌন সঙ্গম করার দরুণ বা স্ত্রী কিংবা অন্য রমনীকে স্পর্শ অথবা চুমু দেওয়ার দরূণ রোযা ভঙ্গ হয়েছে ধারণা করে ইচ্ছাকৃত রোযা অবস্থায় পানাহার করলে।

উপরোক্ত কারণে রমযানের একটি রোযার বদলে অন্য সময়ে একটি ক্বাযা রোযা ও কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। [জওহারাহ্ ও বাহারে শরীয়ত ৫ম খন্ড]

কাফ্ফারার বিবরণ

ক. একজন গোলাম বা বাঁদী আযাদ করা।

খ. তা সম্ভবপর না হলে লাগাতার (মাঝখানে ভঙ্গ করা ছাড়া) রমযানের একটি রোযার বদলে অন্য সময়ে ষাটটি (৬০) রোযা রাখা।

গ. তাও সম্ভবপর না হলে ৬০ (ষাট) জন মিসকীন ও অভাবীকে পেট ভরে খানা দেওয়া বা সমপরিমাণ খানার মূল্য পরিশোধ করা।

কাফ্ফারার ষাট রোযা যেন একাধারে হয়, কোন কারণে মাঝখানে বাদ দিলে পুণরায় ষাট রোযা নূতন করে একাধারে আদায় করতে হবে। অবশ্য কোন মহিলার কাফ্ফারার একাধারে ষাট রোযা আদায় করাবস্থায় যদি মাসিক হায়েয্ বা ঋতুস্রাব শুরু হয়ে যায়, তবে হায়য থেকে পবিত্র হওয়ার পর কাফ্ফারার বাকী রোযা আদায় করবে। [রদ্দুল মুহতার, বাহারে শরীয়ত ইত্যাদি]

যে সব কারণে রোযা ভঙ্গ হয়ে যায় এবং শুধু ক্বাযা ওয়াজিব হয়

নিম্নলিখিত কারণসমূহে যদি কোন রোযা ভঙ্গ হয়ে যায়, তবে শুধু ক্বাযা অর্থাৎ (একটি রোযার পরিবর্তে একটি রোযা আদায় করা) ওয়াজিব হয়ঃ

১. কোন রোযাদার রোযা অবস্থায় ইচ্ছা করে কোন অখাদ্য বস্তু যেমন মাটি, ঘাস, তুলা, কাগজ, কাঠ ও পাথর ইত্যাদি ভক্ষণ করলে।

২. কুল্লি করার সময় হঠাৎ পানি পেটের ভিতরে প্রবেশ করলে।

৩. জবরদস্তি বা জানের ভয়ে অথবা অঙ্গহানির হুকমি দেওয়ায় বাধ্য হয়ে পানাহার করলে।

৪. বাধ্য হয়ে স্ত্রী সহবাস বা যৌন সঙ্গম করলে।

৫. নিদ্রাবস্থায় রোযাদারকে কেউ কোন খাদ্যবস্তু আহার করালে। (তবে শর্ত হল যে জাগ্রত হওয়ার পর রোযাদার এ ব্যাপারে ওয়াকিফহাল বা অবহিত হতে হবে।)

৬. বৃষ্টির পানি অথবা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ঘাম বা অশ্রু মুখে পড়ার পর তা গিলে ফেললে।

৭. কানে তরল পদার্থ অথবা তৈল প্রবেশ করালে।

৮. পেট ও মাথার ক্ষতস্থানে তরল ঔষধ লাগানোর ফলে তা পেটে বা মস্তিস্কে পৌঁছলে।

৯. অনিচ্ছাকৃতভাবে মুখ ভরে বমি আসলে অথবা তা পুনরায় গিলে ফেললে।

১০. রাত মনে করে ভোরে অথবা সুবহে সাদেক্বের সময় সাহরী (পানাহার) অথবা স্ত্রী সহবাস করলে, পরে জানতে পারল যে সাহরী কিংবা স্ত্রী সহবাসের সময় সুবহে সাদিক্ব ছিলো।

১১. সন্ধ্যা মনে করে সূর্য অস্তমিত না হতেই ইফতার করলে।

১২. ভুলক্রমে আহার করায় রোযা নষ্ট হয়েছে মনে করে পুনরায় আহার করলে।

১৩. নিদ্রাবস্থায় সঙ্গম করলে।

১৪. বেহুশ অবস্থায় কেহ রোযাদারের সাথে সঙ্গম করলে।

১৫. নিয়্যত ও সাহরী ছাড়া রমযান মাসে দিনের বেলায় সুবহে সাদিক্ব হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সহবাস না করলেও পরবর্তীতে এক দিনের একটি রোযা ক্বাযা করতে হবে।

১৬. রোযাদার দাঁত হতে জিহ্বা বা হাত দ্বারা চনা পরিমাণ কোন বস্তু বের করে খেয়ে ফেললে, অনুরূপ দাঁত হতে রক্ত বাহির হয়ে যদি গলার ভিতরে চলে যায় এবং রক্তের স্বাদ ভিতরে অনুভূত হয়। অনুভূত না হলে ক্বাযা ওয়াজিব হবে না।

১৭. অল্প বমি মুখে আসার পর তা ইচ্ছা করে গিলে ফেললে।

১৮. যৌন উত্তেজনার সাথে স্ত্রী বা কোন রমনীকে চুমা দেওয়ার পর অথবা শরীর স্পর্শ করার পর বীর্যপাত হলে।

১৯. নাকে তরল ঔষধ প্রবেশ করালে ও ইচ্ছা করে নশ টানলে।

২০. রমযান মাসে সকালে রোযার নিয়্যত না করে দ্বি-প্রহরের পর রোযার নিয়্যত করে পানাহার করলে।

২১. ছোট নাবালেগা মেয়ের সাথে (যে সঙ্গমের উপযোগী নয়) বা মৃত লাশ ও পশুর সাথে সঙ্গম করলে, যদি বীর্যপাত হয়।

২২. হস্ত মৈথুন করে অথবা স্ত্রীর রান বা পেটে হাত দিয়ে স্বেচ্ছায় বীর্য বের করলে অবশ্য হস্ত মৈথুনের ফলে বীর্য বের না হলে ক্বাযা ওয়াজিব হবে না। [দুররুল মুখতার ইত্যাদি]

২৩. সুস্থাবস্থায় নিয়্যত সহকারে রোযা শুরু করার পর পাগল হয়ে গেলে,

পরবর্তীতে জ্ঞান ফিরে আসলে উক্ত দিনের রোযার ক্বাযা করবে।

২৪. নিয়্যত সহকারে রোযা শুরু করার পর রোযাবস্থায় মহিলাদের মাসিক ঋতু (হায়েয) ও প্রসবকালীন রক্ত (নিফাস) জারী হলে।

২৫. রমযান মাসে সুবহে সাদিক্বের পূর্বে স্ত্রী সহবাসে নিয়োজিত হলো, সুবহে সাদিক্ব হওয়ার সাথে সাথে পৃথক হয়ে রমযানের রোযা শুরু করে দিলে, উক্ত দিনের রোযার ক্বাযা করা ভাল। কাফ্ফারা নয়।

২৬. রোযাবস্থায় ভুলবশতঃ স্ত্রী সঙ্গমে নিয়োজিত হলে, স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে পৃথক হয়ে গেল, তাহলে ক্ষতি নেই, কিন্তু স্মরণ হওয়ার পরও যদি সহবাস অবস্থায় থেকে যায়, তাহলে উক্ত দিনের ক্বাযা ওয়াজিব হবে; কাফ্ফারা নয়।

২৭. হুক্কা, তামাক, সিগারেট পান করার দরুণ রোযা ভঙ্গ হয়ে যায় এবং ক্বাযা অপরিহার্য হয়। [আলমগীরী, রদ্দুল মুহতার ও বাহরে শরীয়ত ইত্যাদি]

মাসআলাঃ মুসাফির সফর থেকে রমযান মাসের দিনের বেলায় স্বদেশে ফিরে আসলে, মহিলারা হায়য-নেফাস থেকে রমযানের দিনের বেলায় পবিত্র হলে, মজনূনের (পাগল) জ্ঞান ফিরে আসলে, রোগী রমযানের দিনের বেলায় রোগ হতে মুক্ত হলে, কেউ বাধ্য করে রোযা ভাঙ্গালে, পানি হঠাৎ করে গলার ভিতরে চলে গেলে ভোর (সুবহে সাদেক্ব) হওয়ার পর রাত আছে মনে করে সাহরী গ্রহণ করলে, ইফতারের সময় না হওয়া সত্ত্বেও সূর্য অস্ত গিয়েছে মনে করে ইফতার করলে, এমতাবস্থায় দিনের বাকী অংশ রোযার মত অতিবাহিত করা ওয়াজিব, পরে ক্বাযাও ওয়াজিব। অবশ্য নাবালেগ অথবা কাফির যদি রমযানের যে কোন দিনে বালেগ অথবা মুসলমান হয় তবে পরবর্তীতে উক্ত দিনের ক্বাযা রোযা তাদের উপর ওয়াজিব নয়। কিন্তু উক্ত দিনের বাকি সময়টুকু রোযাদারের মত অতিবাহিত করা অপরিহার্য। [দুররুল মোখতার ও কানূনে শরীয়ত]

মাস্আলাঃ মৃত ব্যক্তির যিম্মায় যদি রোযার ক্বাযা থাকে এবং তিনি সম্পদও রেখে যান আর রোযার ফিদিয়া আদায় করার জন্য ওলি-ওয়ারিসানকে ওসীয়ত করে যান তবে অবশ্যই যেন তার পক্ষ হতে প্রতি রোযার বিনিময়ে গরীব-মিসকীনকে ফিদিয়া আদায় করা হয়। রোযার ফিদিয়া হল অর্ধ সা' বা দুই সের তিন ছটাক আধা তোলা= ২ কেজি ৫০ গ্রাম গম বা আটা অথবা সমপরিমাণ মূল্য প্রতিটি রোযার বিনিময়ে প্রদান করবে। হ্যাঁ, যদি তিনি ওসীয়ৎ নাও করে যান, কিন্তু সম্পদ রেখে যান্ তবে ওলী-ওয়ারীশান মৃত ব্যক্তির ক্বাযা নামায ও ক্বাযা রোযার ফিদিয়া আদায় করা খুবই উপকারী ও উত্তম। [বাহারে শরীয়ত: ৫ম খন্ড]

মাস্আলাঃ শিশুর বয়স দশ বছর হওয়ার পর যদি রমযান শরীফের রোযা রাখার শক্তিমান হয়, তবে যেন তাকে রোযা রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়, না রাখলে যেন

বাধ্য করা হয়। অবশ্য দশ/এগার বৎসরের অপ্রাপ্ত বয়সের শিশু রমযান শরীফের রোযা রাখার পর ভঙ্গ করলে ক্বাযা আদায়ের নির্দেশ দেওয়া যাবে না। কিন্তু নামাযের বেলায় পুনরায় পড়ার নির্দেশ প্রদান করবে। [রদ্দুল মুহ্তার ইত্যাদি]

রোযার মাকরূহসমূহ

১. গীবত, চুগলী, গালি-গালাজ, বেহুদা কথা-বার্তা বলা, কারো অন্তরে কষ্ট দেওয়া, আল্লাহর বান্দাগণের উপর যুল্ম করা, অশ্লীল কথাবার্তা, বেহায়াপনা ও ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বলা হারাম ও গুনাহ্। রোযা অবস্থায় এ সমস্ত নিষিদ্ধ কাজ করা আরো জঘন্য। সুতরাং এ সবের কারণে রোযা মাকরূহ হয়ে যায়। তবে ক্বাযা ও কাফ্ফারা ওয়াজিব হয় না, কিন্তু রোযাদার অবশ্যই গুনাহ্গার হবে এবং রোযার সাওয়াব অনেক কমে যাবে। [বাহারে শরীয়ত: ৫ম খন্ড ইত্যাদি]

২. বিনা প্রয়োজনে রোযাদার কোন খাদ্য জাতীয় বস্তুর স্বাদ গ্রহণ করা বা কোন শক্ত খাদ্য দ্রব্য যেমন রুটি ইত্যাদি চিবানো মাকরূহ। অবশ্য স্বামী বা মুনিব যদি বদ মেজাজী হয় কিংবা শিশু যদি এত ছোট হয় যে, তাকে দেয়ার মত অন্য কোন গরম খাদ্য না থাকে, এমতাবস্থায় তাকে রুটি চিবিয়ে নরম করে দেওয়া মাকরূহ নয়। অবশ্য স্বাদ গ্রহণের সময় এবং চিবিয়ে নরম করার সময় সতর্ককতা অবলম্বন করতে হবে যেন নিজের কণ্ঠনালীর ভিতরে কিছু প্রবেশ না করে, বরং সামান্য মুখে রেখে স্বাদ অনুভব করে বা রুটি চিবানোর সাথে সাথে থুথু ফেলে দেবে এবং চিবানো রুটি বের করে ফেলবে। অসতর্কাবস্থায় রোযা ভেঙ্গে যাওয়ার আশঙ্কা অত্যন্ত বেশী। [দুররে মোখতার ইত্যাদি]

৩. রোযা অবস্থায় স্ত্রীকে চুমু দেওয়া, জড়িয়ে ধরা ও শরীর স্পর্শ করা মাকরূহ। যদি বীর্যপাত হওয়ার বা সহবাসে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা হয়, স্ত্রীর মুখ বা ঠোঁটে চুমু দেওয়া রোযাদারের জন্য যে কোন অবস্থায় মাকরূহ। [কানূনে শরীয়ত ইত্যাদি]

৪. অধিক রূপচর্চার জন্য সুরমার ব্যবহার এবং দাড়ি এক মুষ্ঠি পরিমাণ থাকা সত্ত্বেও আরো লম্বা করার জন্য দাঁড়িতে তৈল ব্যবহার করা রোযাদারের জন্য মাকরূহ। [দুররুল মোখতার, ইত্যাদি]

৫. রোযাদারের জন্য গোসল ও ওযূতে কুল্লি করার সময় ও নাকে পানি দেওয়ার সময় অতিরিক্ত করা মাকরূহ। যেহেতু এমতাবস্থায় ভিতরে পানি প্রবেশের ভয় থাকে। [আলমগীরী ইত্যাদি]

৬. থুথু মুখে জমিয়ে গিলে ফেলা, রোযাদারের জন্য মাকরূহ।

৭. পায়খানা ও প্রস্রাবের পর ইস্তিন্জা বা পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করার সময় অতিরিক্ত করা রোযাদারের জন্য মাকরূহ। যেহেতু এমতাবস্থায় অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করলে সামনে-পেছনের রাস্তা দিয়ে ভিতরে পানি প্রবেশের আশঙ্কা

থাকে। তবে রোযা ছাড়া অন্য অবস্থায় অপচয় না হলে মাকরূহ নয়।

৮. পুকুরে গোসল করার সময় পানির ভিতর বায়ু ছাড়া রোযাদারের জন্য মাকরূহ। যেহেতু এতেও পানি প্রবেশের আশঙ্কা থাকে।

৯. সাহরীর জন্য দেরী করা রোযাদারের জন্য মুস্তাহাব, তবে তত বেশী দেরী করা মাকরূহ, যার কারণে সুবহে সাদেক্ব হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা হয়।

উল্লেখিত ও বর্ণিত বিষয়সমূহ দ্বারা রোযা মাকরূহ হয়ে যায়। তবে ক্বাযা ও কাফ্ফারা ওয়াজিব হয় না, রোযার নেকী ও সাওয়াব কমে যাবে।

[ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, রদ্দুল মোহ্তার ও বাহারে শরীয়ত ইত্যাদি।]

রোযা অবস্থায় জায়েজ কাজগুলি

রোযা অবস্থায় মিস্ওয়াক করা, দাড়ি, গোঁফ ও চুলে তৈল দেওয়া, গোলাপ, মুশ্ক ও আতরের ঘ্রাণ লওয়া, আতর ও সুরমার ব্যবহার, ওযূ গোসলের সময় স্বাভাবিকভাবে কুল্লি করা ও নাকে পানি দেওয়া, ওযূ- গোসল ছাড়াও ঠাণ্ডার জন্য নাকে, মুখে ও শরীরে পানি ঢালা জায়েয; বরং মিস্ওয়াক করা, আতর ও সুরমার ব্যবহার যেভাবে রোযা ছাড়াও সুন্নাত, তদ্রূপ রোযা অবস্থায়ও সুন্নাত। ফরয গোসলে যেমনিভাবে কুল্লি করা ও নাকে পানি দেওয়া রোযা ছাড়া ফরয, তেমনিভাবে রোযা অবস্থায়ও ফরয, তবে রোযা অবস্থায় কুল্লি ও নাকে পানি দেওয়ার সময় অতিরিক্ত করবে না এবং রোযা অবস্থায় গরগরাও করবে না। যেহেতু এতে কণ্ঠনালীর ভেতরে পানি প্রবেশ করার আশঙ্কা থাকে। [বাহারে শরীয়ত ইত্যাদি]

যা রোযাকে নষ্ট করে না

১। রোযা স্মরণ না থাকা অবস্থায় রোযাদার ভুলবশতঃ দিনের বেলায় পানাহার বা স্ত্রী সঙ্গম করলে রোযা নষ্ট হয় না। তবে স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে ওই পানাহার বা স্ত্রী সহবাস পরিহার করতে হবে। রোযার কথা স্মরণের পরেও যদি পানাহার ও স্ত্রী সঙ্গমে লিপ্ত থাকে, তবে অবশ্যই রোযা নষ্ট হয়ে যাবে।

২। ধোঁয়া, ধুলি-বালি ও মাছি কণ্ঠনালীর ভিতরে ঢুকে গেলে রোযা নষ্ট হয় না, তবে ইচ্ছাকৃতভাবে যদি কোন রোযাদার মাছি গিলে ফেলে, অথবা ধোঁয়া বা নশ্ টেনে ভিতরে প্রবেশ করায়, তবে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে।

৩। শিঙ্গা বসালে রোযা নষ্ট হয় না।

৪। থুথু বা কফ্ গিলে ফেললে রোযা নষ্ট হয় না, তবে সতর্ক থাকা চাই।

৫। দাঁত হতে রক্ত বের হয়ে যদি ভেতরে চলে যায় এবং রক্তের স্বাদ যদি ভিতরে অনুভব না হয় তবে রোযা নষ্ট হবেনা, আর যদি রক্তের স্বাদ কণ্ঠনালীর ভিতরে অনুভব হয়, তবে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে।

৬। সুবহে সাদিক্বের আগ হতে সাহ্রী খাওয়া শুরু করেছিল। এদিকে সুবহে সাদিক্ব

হলে গেল। সুবহে সাদিক্ব হওয়ার সাথে সাথে যদি খানা বা গ্রাস মুখ থেকে ফেলে দেয়, তা'হলে রোযা নষ্ট হবে না, আর যদি সুবহে সাদিক্ব হওয়ার পরেও খানা বা গ্রাস খেয়ে ফেলে তবে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে।

৭। তিল, সরিষা, রায় পরিমাণ কোন খাদ্য বস্তু চর্বন করার পর থুথুর সাথে যদি কণ্ঠনালীর ভিতরে চলে যায়, তবে রোযা নষ্ট হবে না। হ্যাঁ, যদি এর স্বাদ কণ্ঠনালীতে অনুভব হয় তবে রোযা নষ্ট হবে।

৮। গোসল বা মাথায় পানি ঢালার সময় যদি পানি কানে প্রবেশ করে, এতে রোযা নষ্ট হয় না।

৯। স্বপ্নদোষ হলে রোযা নষ্ট হয় না।

১০। অপবিত্রাবস্থায় ভোর করলে বা সারাদিন গোসল না করে নাপাক থাকলে রোযা নষ্ট হয় না, তবে এভাবে ইচ্ছা করে দীর্ঘক্ষণ গোসল না করা গুনাহ্ ও হারাম।

১১। মহিলার সামনের ও পিছনের রাস্তা ছাড়া অন্য স্থানে সঙ্গম করলে বা হস্ত মৈথুন করলে যদি বীর্য বাহির না হয় তবে রোযা নষ্ট হবে না। তবে এ ধরনের কাজ জঘন্যতম হারাম ও গুনাহ্। অবশ্য এ ধরনের কাজে যদি বীর্য বের হয়ে যায় তবে রোযা নষ্ট হয়ে যায়।

১২। কোন রমনীর দিকে দৃষ্টিপাত করলে বা কোন মহিলার লজ্জাস্থানের দিকে নজর করলে অথবা সঙ্গমের খেয়াল করার কারণে যদি বীর্যপাতও হয়ে যায় তবে রোযা নষ্ট হবে না । অবশ্য, এ সমস্ত কাজ অত্যন্ত বর্জনীয় ও নিন্দনীয়।

১৩। চতুষ্পদ জন্তু ও মৃত রমনীর সাথে সঙ্গম করলে যদি বীর্যপাত না হয় তবে রোযা নষ্ট হবে না। বীর্যপাত হলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। তবে এ জাতীয় কাজ হারাম ও গুনাহ্।

১৪। জিন্ পরীর সাথে সঙ্গম করলে যদি বীর্যপাত না হয় তবে রোযা নষ্ট হবে না, বীর্যপাত হলে রোযা নষ্ট হয়ে যায়। হ্যাঁ যদি জিন্-পরী মানুষের আকৃতি ধারণ করে, তবে সঙ্গমের সময় বীর্যপাত না হলেও রোযা নষ্ট হয়ে যাবে এবং ক্বাযা ও কাফ্ফারা উভয়টা ওয়াজিব হবে।

[আলমগীরী, রদ্দুল মোহতার, বাহারে শরীয়ত ও কানুনে শরীয়ত ইত্যাদি]

রোযাবস্থায় ইনজেকশন, ইনহেলার, ইনস্যুলিন ও স্যালাইন ব্যবহারের বিধান

এ কথা চির সত্য যে, মুখ, কান ও নাক দিয়ে তরল ঔষধ পেটে বা মস্তিস্কে প্রবেশ করালে অথবা পেট ও মাথার ক্ষতস্থানে তরল ঔষধ লাগানোর ফলে তা পেটে বা মস্তিস্কে পৌঁছলে রোযা নষ্ট হয়ে যায়, যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং যদি কোন খাদ্য জাতীয় তরল বস্তু বা তরল ঔষধ ইন্জেকশন ও স্যালাইনের মাধ্যমে পেটে ও

মস্তিস্কে পৌঁছানো হয়, তবে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে, পরে তা ক্বাযা করতে হবে। কিন্তু যে সমস্ত ইন্জেকশন হাত-পায়ের রগ বা শরীরের মাংসে পুশ্ (ব্যবহার) করে রগে বা মাংসে ঔষধ ঢুকানো হয়, যা অধিকাংশ হাকিম ও পারদর্শী ডাক্তারের অভিমতানুযায়ী সরাসরি পেটে বা মস্তিস্কে পৌঁছে না; বরং তা শরীরের রক্তে মিশে যায়, এ ধরনের ইনজকেশন দ্বারা কোন কোন বিজ্ঞ গবেষক ওলামা-ই কেরামের মতে রোযা নষ্ট হবে না। যেহেতু তরল ঔষধ ব্যবহারে রোযা নষ্ট হবে তখনই, যখন উক্ত ঐষধ পেট বা মস্তিস্কে পৌঁছে যায়। নতুবা রোযা নষ্ট হবে না, যেমন শরীরের যে কোন ক্ষতস্থানে তরল ঔষধ লাগালে রোযা নষ্ট হবে না, যদি তা পেট বা মস্তিস্কে না পৌঁছে, এমনকি অধিকাংশ ওলামা-ই কেরাম বিশেষতঃ ইমাম-ই আ'যম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি ও ইমাম মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র মতে পুরুষের প্রস্রাবের রাস্তায় তরল ওষধ, পানি বা তৈল প্রবেশ করালে রোযা নষ্ট হবে না; যেহেতু পুরুষের প্রস্রাবের রাস্তায় তৈল বা পানি বা তরল ঔষধ দিলে তা অভিজ্ঞ ডাক্তার ও হাকিমগণের মতে পেট বা মস্তিস্কে পৌঁছে না, তবে মহিলার লজ্জাস্থান বা প্রস্রাবের ছিদ্রে তৈল বা পানি বা তরল ঔষধ প্রবেশ করালে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। কারণ তখন তা পেটে পৌঁছে যায়।

[জরুরী মাসায়েল, কৃতঃ মুফতী জালাল উদ্দিন আহমদ আমজাদী]

এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য ও স্মর্তব্য যে, রোযা অবস্থায় ইনজেকশান ব্যবহার করলে রোযা নষ্ট হবে কিনা, তার জবাবে বর্তমান বিশ্বের মুফতীগণের ভিন্ন ভিন্ন মত দেখা যায়। মতান্তরে, রোযা অবস্থায় ইনজেকশান ব্যবহার না করাই নিরাপদ। এতে রোযা নষ্ট হবার আশঙ্কা থেকে মুক্ত থাকা যায়। তদুপরি, ইনজেকশান ইফতারের পর রাতের বেলায়ও প্রয়োজনে নেওয়া যায়।

অনুরূপ, যে সমস্ত রোগী **ইনহেলার** ব্যবহার ব্যতীত রোযা পালন করতে অক্ষম হয়, তারা রমযানের পর সুস্থ হলে ইনহেলার ব্যবহারকৃত দিনগুলোর রোযা ক্বাযা করে দেবেন। আর সুস্থ না হলে রমযানের ওই প্রতিটি রোযার পরিবর্তে একজন মিসকীনকে রোযার ফিদিয়া স্বরূপ দু'বেলা খাবার কিংবা এর মূল্য প্রদান করবে।

ইন্স্যুলিন সাধারণতঃ ডায়াবেটিসের রোগীরা আহারের কিছুক্ষণ পূর্বে ব্যবহার করে থাকেন, যা রোযা অবস্থায় ব্যবহার করলে রোযা নষ্ট হবার আশঙ্কাই বেশী থাকে। তাই ইনস্যুলিন ইফতারের ঠিক সময়ে গ্রহণ করে কিছুক্ষণ পর ইফতার সামগ্রী আহার করবে।

পায়খানার রাস্তায় ডোজ ব্যবহার, নাক, কান ও চোখের ড্রপ ব্যবহারে রোযা নষ্ট হবার আশঙ্কা বেশী। যেমন, সম্মানিত ফক্বীহগণ রোযারত অবস্থায় নশ্ টানতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং রোযারত অবস্থায় ডোজ ব্যবহার, নাক, কান ও চোখে ড্রপ ব্যবহার থেকে বিরত থাকাই নিরাপদ। অতএব, এসব বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরী।

কি কি কারণে রোযা না রাখার অনুমতি আছে বা রোযা ভঙ্গ করতে পারে

১. মহিলাদের গর্ভাবস্থায়, ২. স্তন্য দান, ৩. সফর, ৪. অসুস্থতা, ৫. বার্ধক্য, ৬. জীবন নাশের আশংকা, ৭. মস্তিস্ক বিকৃতি ও ৮. জিহাদ।

এসব কারণে রমযানের রোযা না রাখার অনুমতি আছে এবং এসব কারণ দূরীভূত হওয়ার পর বাদ পড়া রোযাসমূহের প্রতিটি রোযার বদলে একটি করে ক্বাযা আদায় করতে হবে।

মাসআলাঃ গর্ভবতী ও স্তন্যদাত্রী মহিলা রোযা রাখলে নিজের জীবনের বা গর্ভের শিশুর অথবা দুগ্ধপায়ী শিশুর জীবন নাশের আশঙ্কা হয়, তাহলে রোযা না রাখার অনুমতি আছে বা রোযা ভঙ্গ করতে পারে। স্তন্যদাত্রী শিশুর মা ও ধাত্রী একই বিধানের আওতাভুক্ত। তদ্রূপ অসুস্থতার দরূন রোযা না রাখার অনুমতি আছে তখনই, যখন রোগ বৃদ্ধির বা বিলম্বে আরোগ্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সুস্থ ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হওয়ার নিছক খেয়াল অথবা বাহানা করে রোযা ছেড়ে দেয়ার অনুমতি নেই। দৃঢ় ধারণা ও পূর্ণ বিশ্বাসের তিনটি ধরন বা লক্ষণ আছেঃ এক. রোগ বৃদ্ধির বা জীবন নাশের বাহ্যিক লক্ষণ পাওয়া গেলে, দুই. নিজস্ব অভিজ্ঞতা এবং তিন. এমন অভিজ্ঞ ও পারদর্শী মুসলিম ডাক্তারের পরামর্শ; যে ফাসেক্ব নয়। উক্ত বিষয়সমূহের কোন একটি পাওয়া না গেলে বরং নিছক খেয়াল ও কল্পনার ভিত্তিতে বা ফাসিক্ব ডাক্তারের পরামর্শক্রমে রমযানের রোযা ভঙ্গ করলে ক্বাযা ও কাফ্ফারা উভয়টা আবশ্যক হবে। [রদ্দুল মুহতার ইত্যাদি]

উল্লেখ্য যে, কোন অনভিজ্ঞ চিকিৎসক সামান্য সর্দির মত রোগের কারণেও রোযা ভঙ্গের নির্দেশ ও পরামর্শ দিলে তার পরামর্শক্রমে রোযা ভঙ্গ করা যাবে না।

মাস্আলাঃ যে সফররত অবস্থায় রোযা না রাখার অনুমতি আছে, তা দ্বারা শর'ঈ সফর বুঝানো হয়েছে। সাধারণ বা মা'মুলী ৮/১০ মাইলের সফরের কারণে রোযা ভঙ্গ করার অনুমতি নেই। শর'ঈ সফর বলতে তিন মঞ্জিল বা ৫৭/৬১ মাইল বা আরো অধিক পথ পায়ে হেঁটে বা যে কোন বাহনে চড়ে কিংবা যান্ত্রিক উপায়ে অতিক্রম করা এবং ১৫ (পনর) দিনের ভিতরে স্বীয় অবস্থানে ফিরে আসার কিংবা অন্যত্র সফর করার নিয়্যত করা। তবে মুসাফিরের যদি সফরের সময়ে কোন ক্ষতি না হয় তবে সফরে রমযানের রোযা রাখা উত্তম ও অনেক সাওয়াবদায়ক। অবশ্য কোন মুসাফির যদি শর'ঈ অর্ধদিবসের বা সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে যাওয়ার আগে রমযান মাসে নিজ গৃহে বা স্বীয় অবস্থানে ফিরে আসে, কিন্তু তখনো সে কিছু আহার করে নি, তাহলে ওই দিনের রোযার নিয়্যত করে রোযা পূর্ণ করা তার উপর ওয়াজিব। [কানুনে শরীয়ত ইত্যাদি]

মাস্আলাঃ অধিক ক্ষুধা ও তৃষ্ণার দরুণ যদি প্রাণহানির বা মস্তিস্ক বিকৃতির নিশ্চিত

আশঙ্কা হয় অথবা সর্প দংশনের ফলে প্রাণহানির দৃঢ় আশঙ্কা হয় তবে রোযা ভেঙ্গে ফেলবে। পরে ক্বাযা করবে। [রদ্দুল মুহতার বাহারে শরীয়ত ইত্যাদি]

মাস্আলাঃ অতিশয় বৃদ্ধ লোক, যে বয়স বৃদ্ধির কারণে এমন দুর্বল হয়ে পড়েছে যে, রোযা রাখতে পারছে না, ভবিষ্যতেও রাখার আশা করতে পারে না, তবে তার জন্য রোযা না রাখার অনুমতি আছে। অবশ্য সে রমযানের প্রতিটি রোযার পরিবর্তে ফিদিয়া স্বরূপ একজনের ফিত্রা বরাবর দুই সের তিন ছটাক আধা তোলা=দুই কেজি পঞ্চাশ গ্রাম গম বা আটা অথবা সমপরিমাণ মূল্য একজন মিসকীনকে প্রদান করবে। হ্যাঁ, রোযার ফিদিয়া আদায় করার পর যদি পরবর্তীতে রোযা রাখার শক্তি এসে যায়, তবে রমযানের প্রতিটি রোযার বদলে একটি করে রোযার ক্বাযা করবে। তখন ফিদিয়া নফল সাদক্বাহ্ হিসেবে গণ্য হবে। [হিদায়া ও আলমগিরী ইত্যাদি]

৯. দুই ঈদের দিন ও ক্বোরবানীর ঈদের পরের তিন দিন অর্থাৎ শাওয়াল মাসের ১ তারিখ ও জিলহজ্বের ১০, ১১, ১২ ও ১৩ তারিখ, বৎসরে মোট ৫ (পাঁচ) দিন যে কোন রোযা রাখা হারাম। উক্ত দিনসমূহে কেউ নফল রোযা পালন করলে অবশ্যই ভঙ্গ করে ফেলবে। পরে উক্ত রোযার ক্বাযা আদায় করতে হবে না অবশ্য যদি কেউ উক্ত নিষিদ্ধ দিনসমূহে রোযা রাখার মান্নত করে, তবে উক্ত দিনসমূহের পরে মান্নতের রোযা পূর্ণ করবে। [বাহারে শরীয়ত ও কিতাবুল আশ্বাহ ইত্যাদি]

১০.মেহমান ও মাতা-পিতার সন্তুষ্টির জন্য নফল রোযা ভঙ্গ করতে পারে, তবে তা পরে ক্বাযা করবে। অবশ্য মেহমানের কারণে নফল রোযা ভঙ্গ করতে পারে দ্বি-প্রহরের পূর্বে, তার পরে নয়। মা-বাবার কারণে আসরের পূর্ব পর্যন্ত নফল রোযা ভঙ্গ করার অনুমতি আছে। উল্লেখ্য যে, মা-বাবা বা মেহমানের কারণে মাহে রমযানের ফরয রোযা ও ক্বাযা রোযা ভঙ্গ করার অনুমতি নেই। [আলমগীরী ও কানূনে শরীয়ত ইত্যাদি]

১১.কোন মুসলমানের দাওয়াতে অংশ গ্রহণের জন্য দ্বি-প্রহরের পূর্বে নফল রোযা ভঙ্গ করার অনুমতি আছে, তবে উক্ত নফল রোযার ক্বাযা করবে। অবশ্য দাওয়াতে অংশ গ্রহণের জন্য রমযানের ফরয ও ক্বাযা রোযা ভঙ্গ করার অনুমতি নেই। [কানূনে শরীয়ত]

১২.স্বামীর অনুমতি ছাড়া নফল ও মান্নতের রোযা রাখলে স্বামীর নির্দেশে স্ত্রী নফল ও মান্নতের রোযা ভঙ্গ করতে পারে। তবে পরে স্বামীর অনুমতি নিয়ে ক্বাযা করবে। অবশ্য রমযানের ফরয রোযা ও ক্বাযা রোযা স্বামীর আদেশে ভঙ্গ করবে না। [কিতাবুল আশবাহ ইত্যাদি]

১৩.হুঁশ ও জ্ঞানের মধ্যে যদি সত্যই ত্রুটি ও ব্যতিক্রম দেখা যায়, তবে রোযা ভঙ্গ করার অনুমতি আছে; কিন্তু পরবর্তীতে ক্বাযা করবে। [বাহারে শরীয়ত]

১৪.রোযা ভঙ্গ করার জন্য যদি স্বামী বা অন্য কেউ বাধ্য করে, এমনকি ভঙ্গ না করলে প্রাণহানি বা অঙ্গহানির ভয় হয়, তবে যে কোন রোযা এমনকি রমযানের রোযা পর্যন্ত ভঙ্গ করার অনুমতি আছে। পরে অবশ্যই ক্বাযা করবে। [দুররে মোখতার ইত্যাদি]

১৫,যদি কোন ব্যক্তি শপথ করে বলে যে, যদি তুমি রোযা ভঙ্গ না করো, তবে আমার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে, তবে রোযা ভঙ্গ করার অনুমতি আছে। অবশ্য পরে ক্বাযা করবে। [দুর্রে মোখতার ইত্যাদি]

কয়েকটি নফল রোযার ফযীলত

নফল রোযার অনেক ফযীলত ও সাওয়াব রয়েছে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন অধিক নফল রোযা রাখতে গিয়ে শরীর দুর্বল হয়ে না পড়ে, ফলে ফরয বাদ্ পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা হয়। নফল রোযাসমূহের মধ্যে ৯ মুহররম ও ১০ মুহররম আশুরার রোযা, যিলহজ্বের ৯ তারিখে আরফাহ্ দিবসের রোযা, মাহে শাওয়ালের ছয় রোযা, শা'বানের ১৫ তারিখের রোযা, সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোযা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নিষিদ্ধ দিনসমূহ ছাড়া ইবাদতের নিয়্যতে যে কোন দিন নফল রোযা রাখা যায়।

হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আশুরার রোযা নিজেও রেখেছেন, অন্য লোকদেরকেও রাখার জন্য আদেশ দিয়েছেন। আরো এরশাদ করেছেন যে, আশুরার রোযা এক বৎসর আগের গুনাহ্সমূহ দূর করে দেয়। [সহীহ্ মুসলিম ও তিরমিযী শরীফ ইত্যাদি]

আশুরার রোযার সাথে ৯ মুহররমের রোযাকে মিলিয়ে নেওয়া নেহায়ত উত্তম, যেন ইহুদীদের ও আমাদের মধ্যে আমলের দিক দিয়ে তারতম্য হয়ে যায়; কারণ ইহুদীরা আশুরার একটি রোযা পালন করে।

আরাফার দিবস বা যিলহজ্বের নয় তারিখের রোযাকে হুযূর-ই আনোয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হাজার হাজার রোযার সমতুল্য বলেছেন। অবশ্য হাজীদের জন্য, যারা আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করছেন তাদের জন্য, উক্ত দিনের রোযা মাকরূহ। (যাতে তারা হজ্বের আহকাম পালনে দুর্বল হয়ে না পড়ে।) [বায়হাক্বী শরীফ ইত্যাদি]

শাওয়ালের ছয় রোযা সম্পর্কে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি রমযানের ফরয রোযা রাখলো এবং রমযানের পর শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযা (নফল) পালন করলো, সে যেন সারা বৎসর রোযা পালন করলো। (অর্থাৎ সারা বৎসর রোযা পালনের সাওয়াব তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করা হবে।) [ইবনে মাজাহ্ ইত্যাদি]

উক্ত ছয় রোযা বিরতি দিয়েও রাখা যায় এবং এক সাথেও রাখা যায়। [দুররুল মোখতার ইত্যাদি]

----<>----

ইফতার এবং সাহ্রীর মাসাইল

সূর্য অস্ত যাওয়ার পর পানাহারের মাধ্যমে রোযা ভঙ্গ করাকে শরীয়তের পরিভাষায় ইফ্তার বলা হয়, আর শেষ রাতে সুব্হে সাদিক্বের পূর্বে আহার গ্রহণ করাকে সাহ্রী বলা হয়। ইফ্তার ও সাহরী উভয়টা সুন্নাতে রাসূল ও নেহায়ত বরকতময়। রোযাদার নিজেও ইফ্তার এবং সাহরী গ্রহণ করবে এবং সম্ভব হলে স্বীয় হালাল রুজি হতে অপর রোযাদারকে ইফ্তার ও সাহরীতে শরীক করাবে। এতে অনেক সাওয়াব ও রহমত লাভ হয়। তবে সূর্য ডুবে যাওয়ার পর ইফ্তারে বিলম্ব না করা আর সুব্হে সাদিক্বের আগ পর্যন্ত সাহেরী গ্রহণে বিলম্ব করা সুন্নাত ও পুণ্যময়। অবশ্য সূর্যাস্ত নিশ্চিত হওয়ার পরই ইফতার বরকতময়।

[দুররে মোখতার ও বাহারে শরীয়ত ইত্যাদি]

হালাল রুজি দ্বারা কোন রোযাদারকে ইফতার করানোর ফযীলত সম্পর্কে প্রিয় নবী সরকারে দু'আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, কোন রোযাদারকে হালাল খাদ্য দ্রব্য দিয়ে অথবা সম্ভব না হলে শুধু পানি দিয়ে ইফতার করালে মাহে রমযানের সারা মাস ফিরিশ্তারা তাঁর জন্য ইস্তিগফার করে। স্বয়ং হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম শবে ক্বদরে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

[তাবরানী শরীফ ইত্যাদি]

অন্য হাদীসে হুযূর সরওয়ারে কা-ইনাত সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- তোমরা সেহেরী খাও, যেহেতু সাহ্রীর মধ্যে বরকত রয়েছে।

[বুখারী ও মুসলিম]

ইফ্তারের দোয়া

হুযূরে আকরাম সাল্লাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইফ্তারের সময় নিম্নলিখিত দো'আটি প্রায়শ পাঠ করতেন-

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা লাকা সুমতু ওয়া 'আলা রিযক্বিকা আফ্তারতু।

অর্থঃ হে আল্লাহ একমাত্র তোমার সন্তুষ্টির জন্য রোযা রেখেছি এবং তোমার প্রদত্ত রিযক্ব দ্বারা ইফতার করছি। [আবূ দাঊদ শরীফ ইত্যাদি]

সুতরাং ইফ্তারের সময় উক্ত দো'আ পাঠ করা ও যতটুকু সম্ভব দুরূদ শরীফ পাঠ করা নেহায়ত পূণ্যময় ও মুস্তহাব।

রোযার নিয়্যত

প্রত্যেক রোযার জন্য (ফরয হোক কিংবা মান্নতের রোযা হোক অথবা নফল হোক) নিয়্যত করা অর্থাৎ অন্তরে দৃঢ় সংকল্প করা একান্ত জরুরী; তবে রোযার নিয়্যতে

সাহরী গ্রহণ করা নিয়্যতের স্থলাভিষিক্ত হয়। নিয়্যত আরবী ভাষায় করা অপরিহার্য নয়। মনে মনে নিজ ভাষায় নিয়্যত করা যায়। তবে মুখে নিয়্যত করা মুস্তাহাব। প্রত্যেক প্রকারের রোযার নিয়্যত সূর্য অস্ত যাওয়া থেকে পরদিন দ্বি-প্রহরের আগ পর্যন্ত করা যায়। দ্বি-প্রহরের পরে নিয়্যত করলে উক্ত দিনের রোযা শুদ্ধ হবে না। সুতরাং মাহে রমজানের ফরয রোযার নিয়্যত যদি কোন ব্যক্তি সুব্হে সাদিক্বের পূর্বে না করে, তবে অবশ্যই যেন দ্বি-প্রহরের আগে নিয়্যত করে। উল্লেখ্য যে, মাহে রমযানের প্রতিটি রোযার জন্য আলাদা আলাদা নিয়্যত করবে। যদিও মাহে রমযানের দো'আ, মান্নতের রোযা ও নফল রোযার নিয়্যত দিনের বেলায় ও দ্বি-প্রহরের আগ পর্যন্ত করা যায়, কিন্তু রাতের বেলায় অর্থাৎ সুব্হে সাদিক্বের পূর্বে নিয়্যত করা মুস্তাহাব।

[জওহারাহ্ ও রদ্দুল মুহতার ইত্যাদি]

রাতের বেলায় মাহে রমযানের রোযার নিয়্যত এভাবে করবে-

نَوَيْتُ اَنْ اَصُوْمَ غَدًا مِّنْ شَهْرِ رَمَضَانَ الْمُبَارَكِ فَرْضًا لَّكَ يَا اَللّٰهُ فَتَقَبَّلْ مِنِّىْ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ .

উচ্চারণঃ নাওয়ায়তু আন্ আসূমা গাদাম্ মিন্ শাহরে রমদ্বানাল মুবারকে ফদ্বাল্ লাকা এয়া আল্লা-হু ফা তাকাব্বাল্ মিন্নী ইন্নাকা আন্তাস্ সামী'উল 'আলীম।

অর্থঃ আমি আগামীকাল মাহে রমযানের ফরয রোযা তোমার সন্তুষ্টির জন্য পালন করার নিয়্যত করেছি। হে আল্লাহ্! আমার পক্ষ হতে তুমি ক্বূল করো। নিশ্চয় তুমি শ্রবণকারী ও প্রত্যেক বিষয়ে জ্ঞাতা।

তবে দিনের বেলায় দ্বি-প্রহরের আগ্ পর্যন্ত নিয়্যত করলে (গাদান)-এর স্থলে هٰذَا لِيَوْمِ (হা-যাল ইয়াওম) অর্থাৎ 'অদ্যকার দিনের রোযা' বলবে। বাকি শব্দাবলী একই রকম থাকবে।

তারাবীহ্ নামাযের বর্ণনা

এ নামায এশার নামাযের পর হতে সুব্হে সাদিক্বের পূর্ব পর্যন্ত পড়া যায় যায়। এশার নামাযের ফরয ও দুই রাক'আত সুন্নাতের পর এবং বিতরের পূর্বে পড়তে হয়। তারাবীহ্র নামায দু' রাক'আত করে বিশ রাক'আত পড়তে হয়। এ নামাযের নিয়্যত নিম্নে দেওয়া গেল-

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ التَّرَاوِيْحِ - سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ.

উচ্চারণঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাক'আতাই সালাতিত্

তারাবীহ। সুন্নাতু রাসূলিল্লাহে তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবর।

যদি উপযুক্ত হাফিয পাওয়া যায়, যিনি ক্বোরআন শরীফ ভালভাবে মুখস্ত করেছেন ও শরীয়তের বিধানানুযায়ী চলেন এবং টাকা পয়সার লোভ না করেন শুধু আল্লাহর ওয়াস্তে তারাবীহ্‌র নামাযে ক্বোরআন শরীফ খতম করেন, তেমনি উপযুক্ত হাফিযের পেছনে তারাবীহ্‌র নামায পড়বেন। উল্লেখিত শর্তানুযায়ী হাফিয পাওয়া না গেলে একা অথবা কয়েকজন মিলে উপযুক্ত ইমামের পিছনে জমা'আতের সাথে 'সূরা তারাবীহ'র নামায পড়াই উত্তম।

প্রতি চারি রাক'আত তারাবীহ নামাযের পরক্ষণে বসে নিম্নলিখিত দো'আ পাঠ করবেনঃ

سُبْحَانَ ذِى الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ سُبْحَانَ ذِى الْعِزَّةِ وَالْعَظْمَةِ وَالْهَيْبَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْجَبَرُوْتِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَيِّ الَّذِىْ لَا يَنَامُ وَلَا يَمُوْتُ اَبَدًا اَبَدًا سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبَّنَا وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ

উচ্চারণঃ সুবহা-না যিল মুলকি ওয়াল্ মালাকূ-তি সুবহা-না যিল ইয্‌যাতি ওয়াল্ আয্‌মাতি ওয়াল্ হাইবাতি ওয়াল্ ক্কুদ্‌রাতি ওয়াল্ কিব্‌রিয়া-ই ওয়াল্ জাবারূ-তি সুবহানাল্ মালিকিল হায়্যিল্লাযী- লা- ইয়ানা-মু ওয়া লা-ইয়ামূ-তু আবাদান-আবাদা-; সুব্বূ-হুন্ ক্কুদ্দূ-সুন্ রাব্বুনা- ওয়া রাব্বুল মালা-ইকাতি ওয়ার্ রূহ।

তারপর এ মুনাজাত করবেন

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ يَا خَالِقَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ بِرَحْمَتِكَ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا كَرِيْمُ يَا سَتَّارُ يَا رَحِيْمُ يَا جَبَّارُ يَا خَالِقُ يَا بَارُّ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا وَخَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ .

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্না- নাস্‌আলুকাল জান্নাতা ওয়া না'উ-যুবিকা মিনান্না-র ইয়া- খা-লিকাল জান্নাতি ওয়ান্না-রি বিরাহ্‌মাতিকা ইয়া-আযী-যু, এয়া- গাফ্‌ফা-রু, ইয়া- কারীমু, ইয়া- সাত্তা-রু, ইয়া- রাহী-মু ইয়া- জাব্বা-রু, ইয়া- খা-লিক্কু, ইয়া-বা-র্‌রু, আল্লা-হুম্মা আজির্‌না ওয়া খাল্লিস্‌না মিনান্না-রি, ইয়া মুজী-রু, ইয়া মুজী-রু, ইয়া মুজী-রু, বি-রাহমাতিকা এয়া-আরহামার রা-হিমী-ন।

মাস্‌আলাঃ তারাবীহ্‌র সময় হচ্ছে এশার ফরয পড়ার পর থেকে সুবহে সাদিক্বের পূর্ব পর্যন্ত। [হিদায়া]

মাস্‌আলাঃ তারাবীহ্‌র জাম'আত সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্-ই কেফায়া। যদি মসজিদের

সবলোক তারাবীহ্‌র জাম'আত বাদ দেয়, তাহলে সবাই গুনাহগার হবে। আর যদি কেউ ঘরে একাকী পড়ে নেয়, তাহলে গুনাহগার হবে না। [হেদায়া, ক্বাযী খান]

মাস্‌আলাঃ রাত্রের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করা মুস্তাহাব এবং অর্ধ রাতের পরে পড়লেও মাকরূহ নয়। [রদ্দুল মুহতার, বাহার]

মাস্‌আলাঃ তারাবীহ পুরুষদের জন্য যেমন সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্, তেমনি মহিলাদের জন্যও সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্। এটা বাদ দেয়া না-জায়েয। [ক্বাযী খান]

মাস্‌আলাঃ তারাবীহ্‌র বিশ রাক'আত দুই রাক'আত করে দশবার সালাম ফিরিয়ে পড়তে হয় এবং প্রতি চার রাক'আত পড়ার পর, চার রাক'আত পড়তে যতটুকু সময় লেগেছে, ততক্ষণ যাবৎ আরাম করার জন্য বসা মুস্তাহাব। এ আরামের জন্য বসাকে তারাবীহাহ্ বলা হয়। [আলমগীরী, ক্বাযী খাঁন]

মাস্‌আলাঃ তারাবীহ্‌র বিশ রাক'আতের পর পঞ্চম তরবীহাও মুস্তাহাব। তবে যদি পঞ্চম তারবীহাহ্ লোকদের কাছে বোঝা মনে হয়, তাহলে না করা চাই। [আলমগীরী, অন্যান্য কিতাব]

মাস্‌আলাঃ তারাবীহ্‌র মধ্যে এটার ইখতিয়ার রয়েছে যে, চুপচাপ বসে থাকবে অথবা কিছু কলেমা, তাসবীহ, ক্বোরআন শরীফ কিংবা দুরূদ শরীফ পড়তে থাকবে। একাকী নফলও পড়া যায়। [ক্বাযী খান]

মাস্‌আলাঃ যে এশার ফরয নামায জমা'আত সহকারে পড়েনি, তারাবীহ্ জামা'আত সহকারে পড়েছে, সে বিতর একাকী পড়বে। [দুর্‌রুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার]

মাসআলাঃ যদি এশার ফরয নামায জাম'আত সহকারে পড়া হয় এবং তারাবীহ একাকী পড়া হয়, তাহলে বিত্‌রের জম'আতে শরীক হতে পারে। [দুর্‌রুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার]

মাস্‌আলাঃ তারাবীহ্‌র কিছু রাক'আত বাকী থাকা অবস্থায় ইমাম যদি বিতর পড়ার জন্য দাঁড়িয়ে যায়, তাহলে ফরয নামায জম'আত সহকারে পড়ে থাকলে ইমামের সাথে বিত্‌র আদায় করবে। অতঃপর তারাবীহ্‌র অবশিষ্ট নামায পড়ে নেবে। এটাই উত্তম। তবে তারাবীহ্‌র নামায পূর্ণ করে বিতর একাকী পড়াও জায়েয। [আলমগীরী, রদ্দুল মুহতার]

মাস্‌আলাঃ এক ইমাম যদি দু'মসজিদে তারাবীহ পড়ায় এবং উভয় মসজিদে পুরোপুরি পড়ায়, তাহলে না-জায়েয। তবে মুক্তাদী যদি উভয় মসজিদে পুরাপুরি পড়ে, তাহলে ক্ষতি নেই। কিন্তু দ্বিতীয় বার পড়ার সময় বিতর পড়া না-জায়েয, যদি প্রথমবার পড়ে থাকে। [আলমগীরী]

মাস্‌আলাঃ তারাবীহ্ মসজিদে জম'আত সহকারে পড়া উত্তম। যদি ঘরে জম'আত সহকারে পড়া হয়, তাহলে জম'আত বর্জনের গুনাহ্ হলো না; কিন্তু সে ওই সাওয়াব পাবে না, যা মসজিদে পড়লে পেতো। [আলমগীরী]

মাস্আলাঃ অপ্রাপ্ত বয়স্কের পেছনে প্রাপ্ত বয়স্কের নামায হবে না। হেদায়া প্রণেতা এটাকে সঙ্গত বলেছেন। ফত্হুল ক্বদীরেও এটাকে সঠিক বলা হয়েছে। আলমগীরীতে এটা সঠিক হওয়ার ব্যাপারে জোর দিয়েছেন।

মাস্আলাঃ সারা মাসের তারাবীহ্সমূহে একবার ক্বোরআন মজীদ খতম করা সুন্নতে মু'আক্কাদাহ্। দু'বার খতম ভাল এবং তিন বার খতম করা আরো উত্তম। লোকদের অলসতার কারণে খত্মে ক্বোরআন যেন বাদ দেয়া না হয়। [দুর্রুল মুখতার]

শাবীনাহ্

এক রাতে পুরা ক্বোরআন মজীদ তারাবীহ্তে খতম করাকেও শাবীনাহ্ বলা হয়। উল্লেখ্য, তারাবীহ্র বাইরেও এক রাতে পুরো ক্বোরআন খতম করার প্রচলন দেখা যায়। তারাবীহ্র নামাযে উক্ত শবীনাহ্তো যথানিয়মে ক্বোরআন পাঠ হলে উত্তম ও সাওয়াবদায়ক কাজ। আর আশপাশের লোকদের ঘুমের কিংবা রোগীর ব্যাঘাত না ঘটিয়ে কিংবা অন্য কারো অসুবিধা না করে নির্দ্ধারিত স্থানে নামাযের বাইরে শাবীনাহ্ সম্পন্ন করায়ও কোন ক্ষতি নেই; বরং পবিত্র ক্বোরআন মজীদ তিলাওয়াত ও শ্রবণের সাওয়াব পাওয়া যায়।

উল্লেখ্য, আমাদের যুগে প্রচলন আছে যে, হাফিয এত তাড়াতাড়ি পড়ে যে, বর্ণের উচ্চারণের কথাতো বাদই দিলাম, শব্দ পর্যন্ত বুঝে আসেনা। শ্রবণকারীদেরও এ অবস্থা হয়ে থাকে যে, কেউ বসে থাকে, কেউ শুয়ে থাকে, কেউ ঝিমুতে থাকে, যখন ইমাম রুকূ'র তাকবীর বলে, তখন সবাই তাড়াতাড়ি নিয়্যত বেঁধে রুকূ'তে চলে যায়। এমনটি করা না-জায়েয। হাফিয যদি নাম প্রচারের জন্য তাড়াতাড়ি পড়ে, তাহলে এতে রিয়ার গুনাহ্ও অতিরিক্ত যোগ হবে।

ই'তিকাফের বর্ণনা

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে খোদা আশরাফে আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মাহে রমযান শরীফের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন।
[সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম শরীফ]

মুফাস্সির কুল সরদার সাইয়্যেদুনা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে পাক সাহেবে লাওলাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- ই'তিকাফকারী গুনাহ থেকে বিরত থাকে এবং নেক আমল দ্বারা এত অধিক পরিমাণ সাওয়াব লাভ করে যেন সে সকল নেক্ আমল সম্পন্ন করলো। [ইবনে মাজাহ্ শরীফ]

ইমাম আলী মক্বাম সাইয়্যেদুনা ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে আকরাম শাহে দু'আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি

ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- যে ব্যক্তি মাহে রমযান শরীফে দশ দিন ই'তিকাফ করে সে যেন দু'টি হজ্ব ও দু'টি ওমরাহ পালনকারীর সমপরিমাণ সাওয়াব লাভ করে। [বায়হাক্বী শরীফ]

উপরোক্ত রেওয়ায়তসমূহের আলোকে প্রমাণিত হয় যে, ই'তিকাফ একটি উত্তম ইবাদত। এর বদৌলতে গুনাহ থেকে বিরত থাকার এবং সর্বক্ষণ আল্লাহর ইবাদতে নিয়োজিত থাকার সৌভাগ্য নসীব হয়। অন্য দিকে দুনিয়ায় থেকে দুনিয়াবিমুখ জীবন যাপনের একটি সুযোগ সৃষ্টি হয়। আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রতি বছর মাহে রমযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন।

'ই'তিকাফ' আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হলো অবস্থান করা। আর ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, মসজিদে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে নিয়্যত সহকারে অবস্থান করাকে ই'তিকাফ বলা হয়। ই'তিকাফ তিন প্রকার। যথা-

১. **ওয়াজিব,** যেমন- মান্নতের ই'তিকাফ। এহেন ই'তিকাফে রোযা পূর্বশর্ত;এমনকি কেউ যদি একমাস রোযাবিহীন ই'তিকাফের মান্নত করে তারপরও রোযা সহকারে ই'তিকাফ পালন করাই ওয়াজিব হবে। রোযাবিহীন ই'তিকাফের মান্নত শুদ্ধ হবে না। কেউ যদি রাতে ই'তিকাফ করার মান্নত করে তার এ মান্নত শুদ্ধ হবে না। কারণ, রাতে রোযা রাখার সুযোগ নেই।

২. **সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ,** যেমন- মাহে রমযানের শেষ দশ দিন ই'তিকাফ করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ আলাল কেফায়াহ। এখানেও রোযা রাখা পূর্বশর্ত। রোযাবিহীন এ ই'তিকাফও শুদ্ধ হবে না। মহল্লার সবাই যদি এ প্রকারের ই'তিকাফ পালন না করে, তবে সবাই গুনাহার হবে। আর একজনও যদি আদায় করে, তবে সবাই দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে।

৩. **মুস্তাহাব,** এ প্রকারের ই'তিকাফের জন্য রোযা কিংবা নির্দিষ্ট সময়সীমা কোনটাই পূর্বশর্ত নয়; বরং মসজিদে প্রবেশকালে ই'তিকাফের নিয়্যত করলে মসজিদে অবস্থানকালীন সময়ে ই'তিকাফকারী হিসাবে গণ্য হবে এবং ই'তিকাফের সাওয়াব লাভ করবে। মসজিদ হতে বের হয়ে গেলে ই'তিকাফ শেষ হয়ে যাবে। [দুররে মুখতার, আলমগীরী]

ই'তিকাফকারী দু'টি প্রয়োজনে মসজিদ থেকে বের হওয়া জায়েয, একটি প্রাকৃতিক প্রয়োজন। যথা- প্রসাব-পায়খানা, অযূ-গোসল। আর দ্বিতীয়টি শর'ঈ প্রয়োজন। যথা- জুমু'আহ্র জাম'আত আদায়ের জন্য যদি যেতে হয়। এছাড়া বিনা ওযরে মসজিদ হতে বের হলে ই'তিকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে, ই'তিকাফের ক্বাযা ওয়াজিব হবে। কোন ব্যক্তিকে দেখা কিংবা আগুনে জ্বলন্ত ব্যক্তিকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে অথবা মামলার সাক্ষ্যদানের জন্য কিংবা অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখা অথবা জানাযার নামায পড়ার জন্য মসজিদ হতে বের হলে ই'তিকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে, ক্বাযা ওয়াজিব হবে।
[আলমগীরী ও অন্যান্য ফিক্বহ গ্রন্থ]

ওয়াজিব ই'তিকাফ প্রসঙ্গে আরো কিছু আলোচনা

যদি কেউ মান্নত করে যে, আমার অমুক কাজ হয়ে গেলে আমি এক বা দুই দিন (বা আরো বেশী দিন) ই'তিকাফ করবো। মান্নত পূরণ হলে রোযা সহ মসজিদে মান্নত অনুসারে ইবাদতের নিয়্যতে ই'তিকাফ করতে হবে। এটা ওয়াজিব। নতুবা গুনাহ্‌গার হবে। অবশ্য ওয়াজিব ই'তিকাফের জন্য মুখে মান্নত করা পূর্বশর্ত। শুধু অন্তরের মান্নতের দ্বারা ই'তিকাফ ওয়াজিব হয় না। [আলমগীরী ইত্যাদি]

সুন্নাত ই'তিকাফ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা

প্রত্যেক মাহে রমযানের শেষ দশ দিন মহল্লাবাসী থেকে যে কোন একজন ইবাদতের নিয়্যতে রমযানের রোযা সহ মসজিদে অবস্থান করা সুন্নাতে মোআক্কাদাহ্ 'আলাল কেফায়া। মহল্লা বা এলাকা হতে যদি কেউ উক্ত ই'তিকাফ পালন না করে, তবে সবাই গুনাহ্‌গার হবে। যে কোন একজন পালন করলে সকলেই দায়মুক্ত হয়ে যায়। ইচ্ছা করলে মহল্লার সকলেই ই'তেকাফ পালন করতে পারে। সবাই সুন্নাত ও মুহাস্তাবের সাওয়াব পাবে। যেহেতু সরওয়া-ই কা-ইনাত হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মাহে রমযানের শেষ দশ দিন শবে ক্বদর তালাশ করার জন্যে সকল সাহাবীকে এ'তিকাফ করার জন্য উৎসাহিত করেছেন, নিজেও উক্ত ই'তিকাফ নেহায়ত গুরুত্ব সহকারে পালন করেছেন। [মিশকাত ও বুখারী ইত্যাদি]

উক্ত ই'তিকাফের জন্য ২০ রমযানের সূর্যাস্তের পূর্ব হতে ই'তিকাফের নিয়্যত করলে, কিন্তু মসজিদে ই'তিকাফের জন্য প্রবেশ না করলে সুন্নাতে মোআক্কাদা আদায় হবে না এবং ৩০ রমযানের সূর্যাস্তের পূর্বে মসজিদ হতে বের হয়ে গেলে সুন্নাতে মোআক্কাদা আদায় হবে না। ৩০ রমজান সূর্যাস্তের পর অথবা ২৯ রমযান চাঁদ উদয়ের সঠিক খবরের পর মসজিদ হতে বের হবে। মহিলারা ঘরে ই'তিকাফ করবে। মহিলারা মসজিদে ই'তিকাফ করা মাকরূহ। অবশ্য তাদের জন্যও মাহে রমযানের শেষ দশ দিন ই'তিকাফ পালন করা সুন্নাত। ই'তিকাফ শুদ্ধ হওয়ার জন্য মুসলমান, বিবেক সম্পন্ন (যে পাগল নয়) এবং মহিলাদের বেলায় হায়য (মাসিক ঋতুস্রাব ও নিফাস (প্রসবোত্তরকালীন রক্তক্ষরণ) থেকে মুক্ত হওয়া জরুরী ও পূর্বশর্ত। এ'তিকাফের জন্য জুমু'আহ্ মসজিদ হওয়াও পূর্বশর্ত নয়। যে কোন মসজিদে ই'তিকাফ জায়েয, যদিও উক্ত মসজিদে পঞ্জেগানা জমাত ঠিকভাবে আদায় হয় না। ই'তিকাফাবস্থায় বিনা কারণে মসজিদ থেকে বের হওয়া হারাম। মহিলাদের বেলায় ঘরের নির্ধারিত কামরা থেকে বের হওয়া হারাম। মু'তাকিফ বা (ই'তিকাফ পালনকারী) ছাড়া অন্য কারো জন্য মসজিদে থাকা-খাওয়ার ব্যাপারে নেহায়ত সতর্কতা অবলম্বন করবে। মসজিদ যেন নোংরা না হয়। অর্থাৎ সদা স্মরণ

রাখবে- এটা আল্লাহর পবিত্র ঘর ও ইবাদতের খাস্ স্থান। সেটাকে নোংরা করা মসজিদের প্রতি চরম অবহেলা ও নিঃসন্দেহে গুনাহ্। [রদ্দুল মোহতার ও বাহারে শরীয়ত]
(ওহাবী সম্প্রদায়ের কিছুলোক তাবলীগের নামে আজে-বাজে সবকিছু নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করে মসজিদকে নিজের ঘরের মত ব্যবহার করে, আল্লাহর পবিত্র ঘরকে একেবারে নোংরা করে ফেলে। এটা মুর্খতা ও আল্লাহর ঘরের প্রতি অবমাননা বৈ কিছু নয়? আল্লাহর ঘরের পবিত্রতা রক্ষা করা প্রতিটি মুসলমানের জন্য একান্ত অপরিহার্য। তাই ওহাবীদের তাবলীগের নামে মসজিদ নোংরা করার ব্যাপারে সকলের সজাগ দৃষ্টি রাখা জরুরী।)

যে যে কারণে এ'তিকাফাবস্থায় মসজিদ হতে বের হওয়া যায়

মাসআলাঃ গোসল, পায়খানা, প্রস্রাব, ইস্তিন্‌জা, ওযূ (যদি ওযূ গোসলের ব্যবস্থা মসজিদ সংলগ্ন জায়গায় না থাকে), জুমু'আর নামাযের জন্য (যদি উক্ত মসজিদে জুমু'আহ্ না হয়) এবং আযানের জন্য (যদি মিনারা মসজিদের বাহিরে হয়) বের হওয়ার অনুমতি আছে; কিন্তু অন্য কোন কারণে, যেমন পানাহারের জন্য, এমনকি জানাযার নামাযের জন্যও ই'তিকাফাবস্থায় মসজিদ হতে বের হওয়া জায়েয নয়। এ'তিকাফাবস্থায় স্ত্রীকে স্পর্শ করা নিষিদ্ধ। সহবাসের কারণে ই'তিকাফ নষ্ট হয়ে যায়। [আলমগীরী ও রদ্দুল মোহতার ইত্যাদি]

মাসআলাঃ ই'তিকাফকারী যেন একেবারে চুপ-চাপ না থাকে এবং দুনিয়াবী কথা-বার্তাও না বলে; বরং এ'তিকাফাবস্থায় ক্বোরআন তিলাওয়াত, যিক্র-আযকার, অধিক পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠ, হাদীস, তাফসীর, ফিক্বাহ্ ও ধর্মীয় কিতাবসমূহ এবং নবী-ওলীগণের জীবনী পাঠ করবে। বস্তুতঃ সময়টি ইবাদতে অতিবাহিত করার চেষ্টা করবে। [কানূনে শরীয়ত ইত্যাদি]

মুস্তাহাব বা নফল ই'তিকাফ সম্পর্কে আরো কিছু আলোচনা

ওয়াজিব ও সুন্নাতে মোআক্কাদাহ্ 'আলাল্ কেফায়া পর্যায়ের ই'তিকাফ ব্যতীত যে কোন ই'তিকাফ এবং অল্পক্ষণের জন্যও ই'তিকাফের নিয়্যতে মসজিদে অবস্থান করাকে মুস্তাহাব বা নফল ই'তিকাফ বলা হয়। এটার জন্য রোযা পূর্বশর্ত নয়। যখনই মুসল্লী মসজিদে প্রবেশ করে, তখনই উক্ত ই'তিকাফের নিয়্যত করবে। অতঃপর যখন মসজিদ হতে বের হয়ে যাবে, তখন উক্ত ই'তিকাফ শেষ হয়ে যাবে। নফল বা মুস্তাহাব ই'তিকাফের নিয়্যত এইভাবে করবে যে, আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নফল ই'তিকাফের নিয়্যত করলাম। [আলমগীরী ইত্যাদি]

ই'তিকাফ ভঙ্গ করলে ক্বাযা দেওয়ার কিছু মাসাইল

নফল বা মুস্তাহাব ই'তিকাফের কোন ক্বাযা নাই। তবে রমযানের শেষ দশদিন সুন্নাতে মোআক্কাদা পর্যায়ের ই'তিকাফ ভঙ্গ করলে বা শরীয়ত সমর্থিত প্রয়োজন ছাড়া ই'তিকাফকারী মসজিদ হতে বের হলে অথবা ভুলবশত মসজিদ হতে বের হলে মাহে রমযানের শেষে মসজিদে অন্য মাসে রোযা সহ সেই দিনের ই'তিকাফের ক্বাযা করবে, একইভাবে যতদিন রমযানের সুন্নাত ই'তিকাফ ভঙ্গ করবে, ততদিন রমযানের পরে রোযা সহ ই'তিকাফের ক্বাযা করবে। পুরো দশ দিনের ক্বাযা ওয়াজিব নয় এবং পরের রমযানেই ক্বাযা করা জরুরী নয়। যে কোন মাসে ক্বাযা করা যায়। ই'তিকাফাবস্থায় অসুস্থ হয়ে পড়লে, বা অনেকক্ষণ পর্যন্ত অজ্ঞান ও বেঁহুশ হয়ে থাকলে এবং মহিলাদের হায়য ও নেফাস হয়ে গেলে ই'তিকাফ ক্বাযা করতে হবে। তদ্রূপ মান্নতের বা ওয়াজিব ই'তিকাফের বেলায়ও ভঙ্গ করলে তার ই'তিকাফ ক্বাযা করবে। [রদ্দুল মোহতার ইত্যাদি]

মাসআলাঃ কেউ ই'তিকাফের মান্নত করার পর যদি মারা যায় অথবা ওয়াজিব ই'তিকাফ আদায় করতে অক্ষম হয়ে যায় তবে যতদিনের মান্নত ছিলো, প্রত্যেক দিনের বদলে উক্ত ব্যক্তি কিংবা তার ওয়ারিশ সদক্বায়ে ফিতর পরিমাণ অর্থাৎ দুই সের তিন ছটাক আধা তোলা অথবা ২ কেজি ৫০ গ্রাম গম বা আটা বা সমপরিমাণ মূল্য গরীব মিসকীনকে প্রদান করবে। [আলমগীরী ও বাহারে শরীয়তঃ ৫ম খণ্ড ইত্যাদি]

ঈদুল ফিতরের নামায

শাওয়াল চাঁদের প্রথম তারিখে ঈদুল ফিতরের নামায পড়তে হয়। বিশেষ কারণ বশতঃ ওই দিন পড়তে না পারলে পরের দিনও পড়া যায়। সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণ পর হতে দুপুরের পূর্ব পর্যন্ত এ নামায পড়া যায়।

ঈদুল ফিতরের দিন সকালে কিছু মিষ্টি জাতীয় খাদ্য আহার করবেন। তারপর ফিত্‌রা আদায় করবেন। তারপর মিস্‌ওয়াক, গোসল ও ওযূ করে ভাল কাপড় পরিধান করে খুশ্‌বু লাগিয়ে নিম্নস্বরে তাক্‌বীর বলতে বলতে নামায পড়তে যাবেন।

(তাকবীর)

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

উচ্চারণঃ আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর আল্লাহু আক্‌বর ওয়া লিল্লাহিল হাম্‌দ।

নামাযের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّیَ لِلّٰهِ تَعَالٰی رَكْعَتَیْ صَلٰوةِ عِيْدِ الْفِطْرِ مَعَ سِتِّ تَكْبِيْرَاتٍ وَاجِبِ اللّٰهِ تَعَالٰی اِقْتَدَيْتُ بِهٰذَا الْاِمَامِ مُتَوَجِّهًا اِلٰی جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ .

উচ্চারণঃ নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাক্'আতাই সালাতে ঈ-দিল ফিতরে মা'আ সিত্তে তাকবী-রাতিন। ওয়াজিবিল্লহি তা'আলা, ইক্বতাদাইতু বিহা-যাল ইমামে, মুতাওয়াজ্জিহান ইলা- জিহাতিল কা'বাতিশ শারী-ফাতি আল্লা-হু আকবর।

ঈদুল ফিতরের নামায পড়ার নিয়ম

এ নামায ছয় তাক্‌বীরের সাথে ইমামের পেছনে পড়তে হয়। নিয়্যত করে আল্লাহ আকবর বলে হাত বাঁধার পর সানা পড়বেন। তারপর ইমাম উচ্চস্বরে তিনবার 'আল্লাহু আকবর' বলে তাকবীর বলবেন। প্রথম দু' তাকবীর বলার সাথে সাথে ইমাম ও মোক্তাদী সকলেই হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে ছেড়ে দেবেন এবং তৃতীয় তকবীরেও হাত কান পর্যন্ত উঠানোর পর নামাযের নিয়্যতের মত হাত বেঁধে নেবেন। ইমাম উচ্চস্বরে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা বা আয়াত পড়বেন। তারপর তাক্‌বীর বলে রুকূ'তে গিয়ে প্রথম রাক'আতের নামায শেষ করবেন। তারপর দাঁড়িয়ে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য একটি সূরা বা আয়াত পড়ার পর ইমাম উচ্চস্বরে তিনবার তাক্‌বীর বলবেন এবার তাকবীর বলার সময় হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে ছেড়ে দেবেন এবং চতুর্থ তাক্‌বীর বলার সাথে সাথে রুকূ'তে যাবেন। অতঃপর যথানিয়মে বাকী নামায সমাপ্ত করবেন। অতঃপর ইমাম দুটি খুত্‌বা পাঠ করে সকলকে নিয়ে মীলাদ শরীফ পড়ার পর মুনাজাত করবেন।

ঈদুল আযহার নামায

জিলহজ্ব মাসের দশ তারিখে ঈদুল আযহার নামায পড়তে হয়। দশ তারিখে অপারগ হলে এগার তারিখ এবং বার তারিখেও এ নামায পড়া যায়। সূর্য কিছুটা উঠার পর হতে দুপুরের পূর্ব পর্যন্ত ওই নামাযের সময় থাকে। এ দিন মিস্‌ওয়াক ও গোসল করবেন। তারপর ভাল কাপড় পরিধান করে, খুশ্‌বু লাগিয়ে উচ্চস্বরে তাক্‌বীর বলতে বলতে নিম্নলিখিত নামায পড়তে যাবেন।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

উচ্চারণঃ আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর আল্লাহু আক্‌বর ওয়া লিল্লাহিল হাম্‌দ।

নামাযের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّیَ لِلّٰهِ تَعَالٰی رَكْعَتَیْ صَلٰوةِ عِيْدِ الْاَضْحٰی مَعَ سِتِّ تَكْبِيْرَاتٍ وَاجِبِ اللّٰهِ تَعَالٰی اِقْتَدَيْتُ بِهٰذَا الْاِمَامِ مُتَوَجِّهًا اِلٰی جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ .

উচ্চারণঃ নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লা-হে তা'আলা রাক্'আতাই সালাতে ঈ-দিল

আয্হা। মা'আ সিত্তে তাকবী-রাতিন। ওয়াজিবিল্লা-হি তা'আলা, ইক্বতাদাইতু বি-হাযাল্ ইমামে, মুতাওয়াজ্জিহান ইলা- জিহাতিল কা'বাতিশ শারী-ফাতে আল্লা-হু আকবর।

এ নামায পড়ার নিয়মাবলী হুবহু ঈদুল ফিতরের নামাযের মত।

তাকবীর-ই তাশ্রীক্বঃ যিলহজ্ব মাসের ৯ম তারিখের ফজর থেকে ২৩ তারিখের আসর পর্যন্ত প্রত্যেক ফরয নামাযের পর উপরোক্ত তাকবীর-ই তাশরীক্ব পড়তে হয় ।

সদক্বা-ই ফিতরের বর্ণনা

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, বান্দার রোযা আসমান ও যমীনের মাঝখানে ঝুলন্ত থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত সদক্বা-ই ফিতর আদায় না করে। [দায়লমী, খতীব, ইবনে আসাকির]

মাস্আলাঃ সদক্বা-ই ফিত্র ওয়াজিব। এর সময় সারা জীবন। অর্থাৎ যদি যথাসময়ে আদায় না করে থাকে, তাহলে যে কোন সময় আদায় করা যায়। আর আদায় না করলে বাতিল হয়ে যাবে না এবং যখনই আদায় করা হোক, ক্বাযা হিসেবেও গণ্য হবে না, বরং 'আদা' হিসেবেই গণ্য হবে। তবে ঈদের নামাযের আগে আদায় করাটা সুন্নাত। [দুর্রুল মুখতার]

মাস্আলাঃ ঈদের দিনে সুবহে সাদিক্ব হওয়ার সাথে সাথে সদক্বা-ই ফিত্র ওয়াজিব হয়ে যায় সুতরাং যে ব্যক্তি সুবহে সাদিক্বের আগে মারা গেলো কিংবা বা গরীব হয়ে গেলো, ওই ব্যক্তির উপর সাদক্বা-ই ফিত্র ওয়াজিব হলো না। [আলমগীরী]

মাস্আলাঃ সুবহে সাদিক্ব শুরু হবার আগে কাফির মুসলমান হলো বা শিশুর জন্ম হলো বা যে গরীব ছিলো, সে সম্পদশালী হয়ে গেলো, তাহলে তার উপর সদক্বা-ই ফিত্র ওয়াজিব। [আলমগীরী]

মাস্আলাঃ সদক্বা-ই ফিতর প্রত্যেক মুসলমান আযাদ ও নেসাবের অধিকারীর উপর (মূল ব্যবহারিক সামগ্রী ব্যতীত যার পূর্ণ নেসাব থাকে) ওয়াজিব। এতে বিবেকবান, বালেগ এবং এক বছর অতিবাহিত হওয়া, সম্পদের মালিক হওয়া পূর্বশর্ত নয়। [দুর্রুল মুখতার]

মাস্আলাঃ নেসাবের অধিকারী পুরুষের উপর নিজের পক্ষ থেকে এবং নিজের ছোট ছেলে মেয়েদের পক্ষ থেকে সদক্বা-ই ফিত্র ওয়াজিব। যদি শিশু নিজেই নিসাবের মালিক হয় তাহলে তার সদক্বা-ই ফিত্র তার সম্পদ থেকে দেয়া যাবে। পাগল সন্তান বালেগ হলেও যদি সম্পদশালী না হয়, তাহলে তার সদক্বা-ই ফিতর তার পিতার উপর ওয়াজিব। আর যদি সম্পদশালী হয়ে থাকে, তাহলে তার সম্পদ থেকে দেয়া যাবে। [দুর্রুল মুখতার ও রদ্দুল মুহতার]

মাস্আলাঃ সাদক্বাহ্-ই ফিতর ওয়াজিব হওয়ার জন্য রোযা রাখা পূর্বশর্ত নয়। যদি কোন ওযর, যেমন সফর, রোগ ও বার্ধক্যের কারণে বা খোদা না করুক কোন ওজর ছাড়া এমনিতে রোযা রাখলো না, তবুও সদক্বাহ্-ই ফিত্র আদায় করা ওয়াজিব। [রদ্দুল মুহতার ও বাহার]

মাস্আলাঃ পিতা না থাকলে দাদা পিতার স্থলাভিসিক্ত হবেন। অর্থাৎ স্বীয় এতীম গরীব নাতি-নাতনীর পক্ষ থেকে সদক্বাহ্-ই ফিতর পরিশোধ করা তার উপর ওয়াজিব।

মাস্আলাঃ নিজের স্ত্রী এবং বিবেকবান বালেগ সন্তানের সদক্বা-ই ফিতর তার যিম্মায় নয়, যদিওবা পঙ্গু হয়ে থাকে এবং তাদের ভরণপোষণের জিম্মা তার উপর থাকে। [দুর্রুল মুখতার ও বাহার]

সদক্বা-ই ফিতরের পরিমাণ

সদক্বা-ই ফিতরের পরিমাণ হচ্ছে গম বা এর আটা বা ছাতু অর্ধ সা' এবং খেজুর, মুনাক্কা যব বা এর আটা বা ছাতু এক সা'। [হিদায়া, দুর্রুল মুখতার, আলমগীরী]

মাস্আলাঃ গম বা যব দেয়ার চেয়ে ওইগুলোর আটা দেয়া উত্তম। তবে আরো উত্তম হচ্ছে মূল্য দিয়ে দেয়া, তা গমের হোক বা যবের বা খেজুরের হোক। কিন্তু দুর্ভিক্ষ দুর্গত এলাকায় মূল্য দেয়ার চেয়ে খাদ্য সামগ্রী দেয়া উত্তম আর যদি নিকৃষ্ট গম বা যবের মূল্য দেয়া হয়, তাহলে ভাল গম বা যবের মুল্য থেকে যা কম হবে, তা যেন পূর্ণ করে দেয়। [রদ্দুল মুহতার]

সা'র পরিমাণ

চূড়ান্ত যাচাই করার পর এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে, এক সা'র ওজন হচ্ছে তিনশ একান্ন রূপার টাকার ওজনের সম পরিমাণ এবং অর্ধ সা' ওজন হচ্ছে একশ পাঁচাত্তর টাকা আট আনা ওজনের বরাবর। [ফত্ওয়ায়ে রেযভীয়া]

আজকালকার প্রচলিত কেজির ওজন হিসেবে এক সা' সমান প্রায় চার কেজি একশ গ্রাম এবং অর্ধ সা' দু'কেজি পঞ্চাশ গ্রাম হয়ে থাকে।

মাস্আলাঃ সদক্বা-ই ফিত্রের হক্বদার তারাই, যারা যাকাতের হক্বদার। অর্থাৎ যাদেরকে যাকাত দেয়া যায়, তাদেরকে ফিতরাও দেয়া যায়; তবে যাকাত উসূলকারক ব্যতীত। কারণ, ওকে সদক্বা-ই ফিতর দেয়া যাবে না। [দুর্রুল মুখতার ও রদ্দুল মুহতার]

সাদক্বাতুল ফিত্র কি ও কেন?

সাদক্বাতুল ফিতর' একটি উত্তম সাদক্বাহ। যেহেতু রোযা পালনের সাথে এ সাদক্বাহ্ সম্পৃক্ত, সেহেতু রোযার বর্ণনায় প্রসাঙ্গিকভাবে এ সাদক্বার ফযীলত ও মাসা-আলা

মাসাইলও বর্ণনা করা হয়েছে। এখানেও এ প্রসঙ্গে কিছুটা আলোচনা করা হচ্ছে- পরমকরুণাময় আল্লাহ তা'আলার অনন্ত-অপার রকতের যেই ফল্গুধারা সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসূলের উম্মতের প্রতি রয়েছে তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মহা বরকতমণ্ডিত 'রমযান মাস'। প্রিয়তম রাসূল এ মাসকে বলেছেন ধৈর্যের মাস, সহমর্তিতার মাস। আল্লাহ তা'আলা এ মাসে সিয়াম সাধনার জন্য মু'মিনদের প্রতি নির্দেশ দান করেছেন-

مَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

অর্থাৎ- তোমাদের মধ্যে যে এ মাসকে পাবে, সে যেন সেটার রোযা পালন করে।

রোযা পালন কেবল সোবহে সাদিক্ব থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার আর স্বামী-স্ত্রী মিলন বর্জন এবং রাতের দীর্ঘক্ষণ জাগ্রত থাকার নাম নয়; এর সাথে রসনা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং চিন্তা-চেতনাকেও সকল প্রকার মিথ্যাচার ও অন্যায়-অনাচার থেকে হেফাযত করতে হয়। রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাচ্ছেন-

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهٖ فَلَيْسَ لِلّٰهِ فِيْهِمْ حَاجَةٌ فِىْ اَنْ يَدَعَ شَرَابَهٗ وَطَعَامَهٗ

অর্থাৎ- "যে ব্যক্তি (রোযা অবস্থায়) মিথ্যা কথা বলা এবং অনুরূপ কার্যকলাপ ত্যাগ করতে পারে নি, তার পানাহার ত্যাগ করায় আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।"

বান্দা এ কঠিন সাধনায় রমযান মাস অতিবাহিত করতে পারলে আল্লাহ পাক বলেন- لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ তোমরা নিশ্চয় মুত্তাক্বী হতে পারবে। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এরশাদ ফরমান, এ মাসে তাক্বওয়া অর্জনকারীদের জন্য রাব্বুল আলামীন-এর দরবার থেকে যে মহা পুরস্কার রয়েছে তা হচ্ছে 'রহমত' অর্থাৎ অবারিত দয়া, 'মাগফিরাত' অর্থাৎ পাপের মার্জনা এবং 'ইতক্বুম মিনান্নার' অর্থাৎ জাহান্নাম থেকে মুক্তি।

পবিত্র ক্বোরআনে বলছে- لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُوْنَ অর্থাৎ-মহান আল্লাহর দরবার থেকে দয়া ও ক্ষমা প্রাপ্তি, যা জীবনের সমস্ত সঞ্চয় থেকে অনেক উত্তম।

فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ

অর্থাৎ- "যাকে আগুন (জাহান্নাম) থেকে রক্ষা করে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে সেই সফলকাম হয়েছে।"

এ কঠোর সাধনায় যারা উত্তীর্ণ হয়ে এ নি'মাতগুলো লাভ করে ধন্য হয়েছে নিশ্চয় তারা আনন্দের বন্যায় ভাসবে, খুশী হবে, ঈদ করবে। অবশ্য এ ধরনের আনন্দঘন মূহূর্তে মানুষ আচার-আচরণে নিজের করণীয় সম্পর্কে ভুল করে বসে, কিছুটা সীমালঙ্ঘন করে বসে। তাই আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ করেন, দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ

থাকতে সবাই মিলে আনন্দ শুরু করার আগে দু'রাক'আত নামায পড়ে নাও। অন্যদিকে এ শুভ ও সুন্দরতম দিনে হুযূর রাহমাতুল্লিল আলামীন শফী'উল মুযনিবীন, পাপী উম্মতের কাণ্ডারী রাসূল আপন উম্মতকে নির্দেশ করলেন, দেখ, মুত্তাক্বীদের আমলের ভুলত্রুটি সংশোধন করে দেবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন আল্লাহ তা'আলা। তাই আজকের দিনে ঈদগাহে যাওয়ার আগেই তোমাদের এ শারিরীক এবাদত 'রোযা'র যাবতীয় দোষ-ত্রুটি মোচনার্থে এবং এ আনন্দের মিছিলে সকল এতিম, আত্মীয়-স্বজন আর এলাকার গরীব-মিসকীনদেরও শামিল করতে কিছু মা-লী সাদক্বাহ করো। পরিবারে তোমাদের অধীনস্থ সকলের পক্ষ হতে এ সাদক্বাহ আদায় করো, যা গরীব ও এতিম এবং মিসকীনদের দু'বেলা অন্নের ব্যবস্থা হবে এবং এর দ্বারা মহা উপকারী এবাদত রোযাগুলো ও সামগ্রিক ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে পবিত্রতা অর্জনের ওসীলা হবে।

শরীয়তের পরিভাষায় রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর পক্ষ থেকে নিদের্শিত ঈদুল ফিতর উপলক্ষে প্রত্যেক সামর্থ্যবান ধনী তথা মালিকের নিসাবের জন্যে অবশ্য পরিশোধযোগ্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সাদক্বাহ আদায় করাকে সাদক্বাতুল ফিতর বলে। হানাফী মাযহাব মতে এ সাদক্বাহ আদায় করা ওয়াজিব। পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছোট-বড় এমনকি নিজের মালিকানাধীন সকল ক্রীত দাস-দাসীর পক্ষ থেকেও পরিবারের কর্তাকে এ সাদক্বাহ আদায় করতে হয়। সাদক্বাতুল ফিতরের জন্য নিসাব শর্ত হলেও তা এক বৎসর যাবৎ থাকতে হবে এমন বিধান নেই। শাওয়ালের ১ম তারিখ অর্থাৎ ঈদের দিন সোবহে সাদিক্বের পরক্ষণেও কেউ নিসাব পরিমাণ সম্পদের অধিকারী হলেই তার উপর সাদক্বাতুল ফিতর ওয়াজিব। এটা ঈদের নামাযের পূর্বে আদায় করা সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। এটা আদায় না করা পর্যন্ত দায়মুক্ত হবে না; তাই নামাযের পরে আদায় করলে কিংবা জীবনের যে কোন সময় আদায় করলেও আদায় হয়ে যাবে, তবে বিলম্বের জন্য গুনাহগার হবে। উল্লেখ্য যে, ফিত্‌রার উপযুক্ত গরীব আত্মীয়-স্বজন দূরে অবস্থান করলেও তাদের জন্য ফিৎরা আলাদা করে রেখে দিলে অসুবিধা নেই। সাদক্বাতুল ফিতর শুকনো খেজুর, কিসমিস, ভুট্টা, যব, চাউল এবং গম-বা আটার সুনির্দিষ্ট পরিমাণে পরিশোধ করতে হয়। গম বা আটা ছাড়া অন্যান্য বস্তু দিয়ে এক সা' এবং গম-আটা দ্বারা হলে অর্ধ সা' পরিশোধ করতে হয়। বর্তমানে মুসলিম দুনিয়ায় সাধরণতঃ গমের পরিমাণ বা তার স্থানীয় মূল্য হিসেব করেই সাদক্বাতুল ফিতর আদায় করা হচ্ছে। বিশুদ্ধ তাহক্বীক মতে অর্ধ সা'-এর পরিমাণ হচ্ছে আমাদের দেশীয় ওজনে দুই সের তিন ছটাক আধা তোলা যার পরিমাণ প্রচলিত মাপে দু'কে.জি ৫০ গ্রাম হয়।

সাদক্বাতুল ফিতর এবং যাকাতের খাত একই ধরনের। অর্থাৎ যাদের যাকাত দেয়া

যায় তাদের ফিতরাও দেয়া যাবে। এভাবে যাকাত যাকে দেয়া জায়েয নেই তাকে ফিতরাও দেয়া যাবে না। একটি ফিত্‌রা একজন মিসকীনকে যেমন দেয়া যায় তেমনি কয়েকজনের ফিতরাও একই মিসকীনকে দিতে বাধা নেই। আবার প্রয়োজনে একজনের ফিত্‌রা কয়েকজন মিসকীনকেও ভাগ করে দেয়া জায়েয।

নফল সাদক্বাসমূহ

"মানুষ মানুষের জন্যে।" আল্লাহ তা'আলা বলেন, "সৃষ্টির সেরা ও প্রকৃত মানুষ তো মু'মিন সৎকর্মশীল লোকেরা"। যেমন এরশাদ হচ্ছে-

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ

অর্থাৎ-নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্মসমূহ করেছে তারাই হচ্ছে সৃষ্টির সেরা। পক্ষান্তরে, যারা ঈমান হারা বিপথগামী তারা চতুষ্পদ জানোয়ারের চেয়েও অধম; বরং সৃষ্টিতে সবচেয়ে নিকৃষ্ট। যেমন এরশাদ হচ্ছে-

اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ اُولٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ

অর্থাৎ-তারা হচ্ছে চতুষ্পদ পশুর ন্যায় বরং তারা অধিকতর পথভ্রষ্ট। তারাই সৃষ্টির মধ্যে নিকৃষ্টতর।

আল্লাহ পাক বলেন, সৃষ্টির সেরা মু'মিনদের কল্যাণকর প্রচেষ্টা কেবল মু'মিনের জন্যে নয়; বরং সমগ্র মানব জাতির জন্যে। যেমন এরশাদ হচ্ছে-

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

অর্থাৎ-তোমরা হলে শ্রেষ্ঠতম উম্মত, যারা মানুষের জন্য বের হয়েছে।

বাস্তব সত্য হচ্ছে যাদের দ্বারা সৃষ্টির সেরা মানব জাতির কল্যাণ সাধন হয়। সৃষ্টির মধ্যে মু'মিন হিসেবে তোমরাইতো আল্লাহর প্রিয়ভাজন। যদি আল্লাহ্‌র সর্বাধিক প্রিয়ভাজন হতে চাও তাহলে তাঁর সমগ্র সৃষ্টির কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাচ্ছেন-

اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللّٰهِ فَاَحَبُّ الْخَلْقِ اِلَيَّ مَنْ اَحْسَنَ اِلٰى عِيَالِهٖ ۔

অর্থাৎ-সমগ্রই সৃষ্টি আল্লাহর মুখাপেক্ষী । অতএব সৃষ্টিজগতে আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাধিক প্রিয় সে-ই, যে আল্লাহর সৃষ্টির সর্বাধিক কল্যাণ করে।

বিশ্ববিখ্যাত আধ্যাত্মিক সাধক হযরত শেখ সা'দী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, "সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যেময় জীবনের জন্যেই সম্পদ, সম্পদ উপার্জনের জন্যে জীবন নয়।" নেকবখ্‌ত সেই, যে খেয়েছে এবং (আল্লাহর পথে) খরচ করে গেছে, আর পাপিষ্ট বদবখ্‌ত সে-ই যে মরে গেছে আর না খেয়ে পরের জন্য ছেড়ে গেছে। প্রিয় নবী এরশাদ ফরমান- 'কৃপণ, সে তো আল্লাহর দুশমন। সে আল্লাহর নৈকট্য পাবে না, জান্নাতের গন্ধও পাবে না, মানুষের হৃদয়ে তার স্থান নেই। পক্ষান্তরে দানশীল

ব্যক্তি, সে তো আল্লাহর বন্ধু, তাঁর অতি নৈকট্যপ্রাপ্ত, সে জান্নাতী, মানুষের হৃদয়-সিংহাসনে তার অবস্থান।

পবিত্র ক্বোরআন ও হাদীসে সাখাওয়াত বা দানশীলতার ব্যাপারে যে ব্যাপক বর্ণনা এসেছে তার কিয়দংশ তুলে ধরা হচ্ছে-

১. সূরা আল-ই ইমরান শরীফের ১৭নং ও ১৩৪নং আয়াতে আল্লাহর পথে ব্যয় করাকে মুত্তাক্বী এবং জান্নাতী হবার পরিচয় বলে বর্ণনা করেছেন। ১৭নং আয়াতে وَالْمُنْفِقِيْنَ এবং ১৩৪ নং আয়াতে বলেছেন- الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ । এভাবে সূরা তাওবা শরীফের ১২১ নং আয়াতে বলা হচ্ছে 'ঈমানদার নবীর গোলামীতে, আল্লাহর পথে ইসলামের জন্যে, অল্প-বিস্তর সামর্থ্যমত যে যা ব্যয় করে সর্বোত্তম প্রতিদানের জন্যে তা লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়।

২. সূরা বাক্বারা শরীফের ২১৫ নং ও ২১৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে- 'যা কিছু ব্যয় করবে তা উত্তম খাত থেকে অর্থাৎ হালাল উপার্জন থেকে করো। একই সূরার ২৬৭ নং আয়াতে এ নির্দেশটি আরো স্পষ্টভাবে দেয়া হয়েছে- اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ অর্থাৎ তোমরা যা উপার্জন করো, তার পবিত্র বস্তুগুলো থেকে আল্লাহর পথে ব্যয় করো।

৩. সূরা বাক্বারা শরীফের ২৭৪ নং আয়াতে এরশাদ হয়েছে- যারা রাত দিন সর্বদা প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে আল্লাহর পথে ব্যয় করতে থাকে আল্লাহর নিকট তাদের জন্য পুণ্যফল রয়েছে।

৪. আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার ইহকালীন পুণ্যফলকে সূরা বাক্বারা শরীফের ২৬১ নং আয়াতে একটি সুন্দর উপমা দিয়ে এভাবে বুঝানো হয়েছে যে, "একটি শস্যবীজ যমীনে বপন করা হলো, যা সাতটা শীষ উৎপাদন করল। প্রত্যেক শীষে একশ' শস্য কণা, অবশ্য আল্লাহ কাউকে এর চেয়েও অধিক বৃদ্ধি করে দিতে পারেন। অর্থাৎ সাতশ' কিংবা তার চেয়ে অনেক বেশী দান করবেন।

৫. এ সাদক্বাহর পরকালীন পুণ্যের কথা বর্ণনা করেছেন সূরা মুযযাম্মিল শরীফের ২০ নং আয়াতের শেষাংশে । এরশাদ হচ্ছে-

وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا ۔ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ
عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّاَعْظَمَ اَجْرًا ۔

অর্থাৎ- "এবং আল্লাহকে উত্তম কর্জ দাও ইখলাস ও সন্তুষ্টচিত্তে। আল্লাহর পথে ব্যয় করতে থাক। আর নিজ কল্যাণে যে সব পুণ্যময় কাজ ও দানশীলতা আল্লাহর দরবারে প্রেরণ করবে সেটাকে আল্লাহর নিকট অধিকতর উত্তম ও মহা পুরস্কারের উপযুক্ত পাবে।"

সাদক্বাহ ঃ হাদীসের আলোকে

১. সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- হুযূর রাসূলে মাক্ববূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাচ্ছেন, মানুষ 'আমার সম্পদ' 'আমার সম্পদ' বলে চিৎকার করে; অথচ তার নিজের সম্পদ বলতে সেগুলোই বুঝায় যেগুলো থেকে সে তিন প্রকারে উপকৃত হয়ঃ

এক. খেয়ে-দেয়ে যা শেষ করে, **দুই.** পরিধান করে যা পুরোনো করে এবং **তিন.** আল্লাহর পথে দান করে যা সঞ্চয় করে। বাকী যা ছেড়ে সে মৃত্যুবরণ করে তাতো অন্যের হয়ে যায়।

২. বুখারী ও নাসায়ী শরীফে হযরত ইবনে মাস'ঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বর্ণনা, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান- তোমাদের মাঝে নিজের মালের চাইতেও ওয়ারিশদের মাল বেশী পছন্দ করে এমন কে আছো? সবাই আরয করলেন, এয়া রাসূলাল্লাহ! সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়কা ওয়াসাল্লাম, এমন বোকা কে হবে, যে নিজের মাল পছন্দ করবে না? রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, "দেখ- নিজের মালতো ওটাই, যেগুলো আল্লাহর পথে ব্যয় করেছো। আর যা রয়ে গেছে তাতো ওয়ারিশদের সম্পদ।"

৩. প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ পেলেও আমি চাইনা তা তিনটি রজনী পর্যন্তও আমার কাছে থাকুক। কর্জ শোধ করার ব্যবস্থা ছাড়া কোন সম্পদই আমার কাছে পছন্দনীয় নয়।

৪. রোজই প্রত্যুষে দু'জন ফিরিশ্তা দানবীরের পক্ষে আর কৃপণের বিপক্ষে দো'আ করতে অবতীর্ণ হয়। একজন বলে, "হে আল্লাহ! তোমার দানশীল বান্দাকে প্রতিদান দাও।" আর অন্যজন বলে, "কৃপণের মাল ধ্বংস করে দাও।"

৫. হযরত আসমা বিনতে আবী বকরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "সাধ্যমত হিসেব না করেই আল্লাহর পথে ব্যয় করে "যাও! ফলে আল্লাহ পাকও তোমাকে বে-হিসাব দান করতে থাকবেন।"

৬. হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, হে আদম সন্তানরা! তোমরা আমার পথে সাদক্বাহ করে যাও, আমি তোমাদের জন্য খরচ করে যাব।" সাদক্বাহর বদৌলতে আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে

কীভাবে সাহায্য করে থাকবেন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিম্নলিখিত হাদীস শরীফ থেকে এর একটি সুন্দর উপমা প্রত্যক্ষ করুন-

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ফরমাচ্ছেন- একদা এক ব্যক্তি জঙ্গলে ঘুরছিল। হঠাৎ করে আকাশে এক টুকরো কালো মেঘ দেখতে পেলো। আর কে যেন ওই মেঘের টুকরোকে মেঘের মধ্যে থেকেই বলছিল, যাও ওদিকে অমুক ব্যক্তির বাগানটি সিক্ত করে দাও।" মেঘটি ওদিকে পরিচালিত হলো। দেখতে দেখতে এক পাথুরে উঁচু ভূমিতে গিয়ে বৃষ্টি বর্ষণ করলো। সেখানকার ছোট ছোট নালা দিয়ে পানিগুলো একটি বড় নালায় এসে জমা হয়ে এক দিকে নামতে লাগলো এবং একটি ফসলের বাগনের দিকে ধাবিত হলো। দেখতে পেলেন একজন শ্মশ্রুমণ্ডিত মানুষ ওই পানি কোদাল দিয়ে ক্ষেতের মধ্যে এদিক ওদিক ফিরিয়ে দিচ্ছেন। লোকটি গিয়ে তাঁর কাছে নাম জানতে চাইলেন। লোকটির নাম শুনে তিনি আর্শ্চাযন্বিত হলেন । কারণ মেঘে উচ্চারিত সে নামের লোকটিই ইনি! বাগানের মালিক নাম জিজ্ঞেস করার কারণ জানতে চাইলেন। লোকটি সব কথা খুলে বললেন এবং জানতে চাইলেন, ভাই এমন কী কাজ আপনি করেন যার বদৌলতে আল্লাহর এভাবে গায়বী সাহায্য পান। বাগানের মালিক বললেন, "তাহলে শুনুন! আমি এ বাগানে উৎপাদিত ফসলের এক তৃতীয়াংশ প্রথমে সাদক্বাহ করে দেই। বাকীটুকু থেকে অর্ধেক খাওয়ার জন্যে এবং অর্ধেক বীজ হিসেবে পুনরায় যমীনে বপন করি।" প্রতীয়মান হলো সাদক্বাহ দ্বারা গায়বী সাহায্য পাওয়া যায়।

৭. হযরত আবূ যর গিফারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, একদিন আল্লাহর প্রিয়তম রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কা'বা-ই মু'আযযামার ছায়ায় বসে এরশাদ করলেন, "এ পবিত্র কা'বার রবের ক্বসম, ওরা বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত!" আমি বিনীতভাবে আরয করলাম, "হে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়কা ওয়াসাল্লাম! আমার মা-বাবা আপনার পদতলে উৎসর্গীত। দয়া করে বলুন এ ক্ষতিগ্রস্ত লোক কারা?" প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, "ওরা ধনাঢ্য শ্রেণীর লোক। অবশ্য যদি এভাবে-সেভাবে, অর্থাৎ ডানে-বামে, সামনে-পেছনে,এতিম-মিসকীন,আত্মীয়-স্বজন যখন যেখানে থাকে প্রয়োজনে দান-সদক্বা করে যায়, তাহলে ক্ষতির হাত থেকে তারাই বাঁচবে। তবে এ ধনীর সংখ্যা খুবই নগণ্য।"

আসুন, প্রিয়তম রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর অমীয়

নূরানী বাণী থেকে কয়েকজন ধনাঢ্য ব্যক্তি সম্পর্কে অতি আকর্ষণীয় কাহিনী আলোচনা করি। যেখানে বখীল তথা কৃপণ লোকের করুণ পরিণতি এবং দানশীল ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ পাকের মহা পুরস্কারের বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

৮. বোখারী ও মুসলিম শরীফে প্রখ্যাত সাহাবী হযরত সাইয়্যেদুনা আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত আছে, হুযূরে আকরাম নূরে মুজাস্সাম গায়বের সংবাদদাতা নবীয়ে মু'আয্যম এরশাদ ফরমাচ্ছেন-

বনী ইসরাঈলের তিনজন লোক ছিলো। একজন কুষ্ঠ রোগী, অপরজন টেকো মাথা এবং অন্যজন অন্ধ। আল্লাহ পাক চাইলেন তাদের পরীক্ষা নিতে। একজন ফিরিশতা পাঠিয়ে দিলেন। ফিরিশতা সর্বপ্রথম কুষ্ঠ রোগীর নিকট আসলেন। জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা বলতো তুমি কোন জিনিসটা বেশী পছন্দ করো? সে বললো, ''দেখুন, একে তো আমি গরীব। তদুপরি আমার কুষ্ঠরোগ। এ খসখসে চামড়া আর অসুন্দর রূপটির জন্যে কেউই আমাকে ভালবাসে না, সবাই ঘৃণা করে। তাই একটা সুন্দর চামড়া আর সুস্থ দেহই আমার কাম্য।'' ফিরিশতাটি তাকে হাত বুলিয়ে দিলেন। সাথে সাথে তার কুষ্ঠ রোগ চলে গেলো। সে পেল এক আকর্ষণীয় চামড়া বিশিষ্ট সুস্থ শরীর। অতঃপর ফিরিশতা জানতে চাইলেন, ''তুমি কোন ধরনের সম্পদ চাও?'' সে বললো, ''আমি উটের মালিক হতে চাই।'' ফিরিশতা তাকে একটা দশ মাসের পূর্ণ গর্ভবর্তী উষ্ট্রী দান করলেন এবং দো'আ করলেন- ''আল্লাহ পাক তোমার এ সম্পদে বরকত দান করুন!''

এরপর আল্লাহর হুকুমে ফিরিশতাটি টেকো মাথার নিকট গেলেন। তাকে জিজ্ঞেস করলেন- বলতো তোমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় বস্তু কি? সে বললো, ''কী আর চাইবো? গরীবতো আছিই, তদুপরি মাথায় টাক্। সবাই ঘৃণা করে। লোকলজ্জায় কারো সামনে যেতে পারি না। তাই মাথাভরা সুন্দর চুল হোক-এটাই চাই।'' ফিরিশতা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। আকর্ষণীয় চুলে তার মাথা ভরে গেল। ফিরিশতা জিজ্ঞেস করলেন, ''কোন ধরনের সম্পদ তোমার বেশী ভাল লাগে?'' সে বললো, ''আমার কাছে গাভী খুবই পছন্দনীয়।'' ফিরিশতা তাকে একটা পূর্ণ গর্ভবতী গাভী দিয়ে দো'আ করলেন, ''আল্লাহ তোমার সম্পদে অনেক বরকত দিন।'' এই বলে ফিরিশতা চলে গেলেন।

প্রিয় নবী বলেন, ফিরিশতাটি এবার আল্লাহর হুকুমে গেলেন অন্ধ লোকটির কাছে। জিজ্ঞেস করলেন- বলতো, তোমার কাছে জীবনে সবচেয়ে পছন্দের জিনিষ কোনটি? সে বললো, কী আর পছন্দের হবে? দু'টি চোখ না থাকায় এ

সুন্দর পৃথিবীতে আল্লাহর সৃষ্টির কিছুইতো দেখতে পাই না। তাই, এ দুটো নয়ন ছাড়া আর কিছুই কাম্য নয়।'' ফিরিশতাটি তার চোখে হাত বুলিয়ে দিতেই চোখ সুস্থ হয়ে গেলো। সে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলো। ফিরিশতা বললেন, ''তোমার কাছে কোন ধরনের সম্পদ ভাল লাগে?'' সে বললো, ''ছাগল।'' ফিরিশতা তাকে খুব অল্প সময়ে বাচ্চা দেবে এমনটি একটি গর্ভবর্তী ছাগী দিলেন এবং দো'আ করলেন, ''আল্লাহ তোমার সম্পদে বরকত দিন।''

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, ফিরিশতা চলে গেলেন, আর এদিকে ওদের উষ্ট্রী, গাভী আর ছাগী বাচ্চা দিলো। আল্লাহ তা'আলা এদের এ সমস্ত সম্পদে এমন প্রাচুর্য এবং বরকত দান করলেন যে, মাত্র কয়েক বছরে তাদের প্রত্যেকের নিকট যথাক্রমে উট, গরুত এবং ছাগলে বিরাট বিরাট মাঠ ভর্তি হয়ে গেলো।

অনেক দিন পর আল্লাহর হুকুমে ফিরিশতাটি নিজেই ওই কুষ্ঠরোগীর দুয়ারে এসে দাঁড়ালেন। হাঁক মারলেন- ভাই একজন মিসকীন, মুসাফির, সফরে এসেছি রিক্ত হস্তে। দেশে ফিরে যাওয়ারও উপায় নেই। এখন তোমার সাহায্য ছাড়া কোন রাস্তা দেখছি না। আমি তোমার কাছে ওই সত্তার দোহাই দিয়ে চাচ্ছি, যিনি তোমাকে কুষ্ঠরোগ থেকে মুক্তি দিয়ে এ সুন্দর রং, উত্তম চামড়া আর অঢেল সম্পদের মালিক করেছেন। আমাকে একটি উট দাও, যেটার উপর সাওয়ার হয়ে আমি আমার গন্তব্যে পৌঁছে যেতে পারি।'' সে জবাবে বললো, ''দিতে পারবো না।'' ফিরিশতা বললেন, ''তোমাকে তো চেনা চেনা মনে হচ্ছে। তুমি তো কুষ্ঠরোগী ছিলে? মানুষ তোমায় ঘৃণা করতো আল্লাহ তোমায় সুস্থতা দিয়েছেন। তুমি নিঃস্ব দরিদ্র ছিলে, আল্লাহ তোমাকে সম্পদ দিয়েছেন।'' সে বলল, ''এ সব কী বলছো? আমি তেমনটি কখনও ছিলাম না। আমি বংশ পরম্পরায় মালদার হয়েছি।'' মানব আকৃতিতে আসা ফিরিশতাটি বললেন, ''দেখ! তুমি যদি মিথ্যে বলে থাকো তাহলে আল্লাহ তোমাকে তোমার পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দিন।'' এরপর ফিরিশতাটি টাক্ ওয়ালার কাছে আসলেন এবং কুষ্ঠরোগীর কাছে যেভাবে সাওয়াল করেছিলেন সেভাবে তার কাছেও সাওয়াল পেশ করলেন। সেও একই জবাব দিলো। ফলে ফিরিশতা তাকেও বদদো'আ দিয়ে চলে গেলেন।

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, অতঃপর ফিরিশতাটি শেষোক্ত অন্ধ ব্যক্তিটির নিকট তাশরীফ আনলেন। দরজায় দাঁড়িয়ে হাঁক মেরে বললেন, ''ভাই, একজন মিসকীন, মুসাফির। সর্বহারা হয়ে আপনার দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছি। সাহায্যের প্রার্থনা করছি ওই

সত্তার ওসীলায়, যিনি আপনাকে দু'টি চোখে আলো দান করেছেন, আপনাকে অসংখ্য ছাগল দিয়ে সম্পদশালী করেছেন। আপনার সাহায্য ছাড়া উপায় দেখছি না। আপনি আমাকে একটা ছাগল দান করুন, যেন আমার গন্তব্যে পৌঁছার সহায় হয়।'' লোকটি বলল, ''হ্যাঁ ভাই, সত্যি আমি অন্ধ ছিলাম। আল্লাহ তা'আলা আমাকে চোখের জ্যোতি আর সম্পদ দিয়ে ধন্য করেছেন। আপনি ওই আল্লাহর নামে যত চান নিয়ে যান। আমি আপনাকে বাধা দেবো না।'' ফিরিশতা বললেন, 'হ্যাঁ ভাই, আল্লাহ তা'আলারই সকল প্রশংসা। আমি ফিরিশতা। আল্লাহর হুকুমে এসেছিলাম। তোমরা তিনজনকেই পরীক্ষা করা হয়েছে। তোমার দু'সঙ্গী কুষ্ঠরোগী এবং টাক্ ওয়ালা নিজেদের আসল কথা ভুলে গিয়ে কৃপণতা করে পরীক্ষায় হেরে গেছে। পক্ষান্তরে, তুমি তোমার পূর্বের কথা ও প্রকৃত ঘটনা এবং আল্লাহর করুণা মনে রেখেছো। সাথে সাথে এ দান করে কামিয়াব হয়েছো এবং নিজের জান-মালকে হেফাযত করেছো। আল্লাহ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাদের উপর নারায হয়েছেন।''

৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, তোমরা নিরলসভাবে সাদক্বাহ করে যাও। কারণ সাদক্বাহকে অতিক্রম করে কোন বালা-মুসিবত আসতে পারে না।

১০. সহীহ তিরমীযি শরীফে সাইয়েদুনা হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত আছে, হুযূর নবী-ই দোজাহাঁ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাচ্ছেন, আল্লাহ তা'আলা এ যমীন সৃষ্টি করার পর সেটা হেলতে-দুলতে লাগলো। তখন বিরাট-বিশাল পর্বতমালা সৃষ্টি করে এতে প্রতিস্থাপন করলে যমীন স্থির হয়ে যায়। ফিরিশতারা আশ্চর্যান্বিত হয়ে আরয করল, ''হে আল্লাহ! মনে হয় তোমার সৃষ্টিকুলে পাহাড়ই সর্বাধিক শক্তিমান। খোদা! তুমি কি পাহাড়ের চেয়েও শক্তিশালী কিছু সৃষ্টি করেছো?'' আল্লাহ তা'আলা বললেন, ''হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। পাহাড়ের চাইতেও শক্তিশালী করেছি লোহাকে।'' ফিরিশতারা বললো, ''লোহার চেয়ে অধিক শক্তিমান সৃষ্টিও কি আছে?'' আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, ''হ্যাঁ আছে- তা হচ্ছে আগুন।'' ফিরিশতারা বললো, ''আগুনের চাইতেও শক্তিমান কিছু আছে কি?'' আল্লাহ পাক বললেন, ''অবশ্যই আমার সৃষ্টিতে আগুনের চাইতেও শক্তিশালী হচ্ছে পানি।'' তখন ফিরিশতারা বললো, ''তা হলে কি পানিই সর্বাধিক শক্তিধর? আল্লাহ বললেন, ''অবশ্যই নয়। পানির চাইতে অধিক শক্তিমান করে সৃষ্টি করেছি বাতাসকে।'' তারা বললো, ''নিশ্চয় বাতাসই কি সৃষ্টি জগতে সবচেয়ে অধিক শক্তিশালী সৃষ্টি?'' আল্লাহ পাক বললেন, ''দেখো! বাতাসের চাইতেও

শক্তিধর একটি বস্তু রয়েছে আমার জগতে।'' ফিরিশতারা তা'আজ্জব হয়ে জানতে চাইলো, ''হে আল্লাহ! ওটা কোন্ বস্তু? যা পাহাড়, লোহা, আগুন, পানি ও বাতাসকে অতিক্রম করেছে শক্তি ও সামর্থ্যে?'' আল্লাহ তা'আলা বললেন, ''হ্যাঁ সে মহাশক্তিধর বস্তুটি হচ্ছে ঈমানদারের রিয়ামুক্ত গোপন সদক্বাহ।''

১১. পবিত্র ক্বোরআনে হাকীমে রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ''তোমাদের নিকট যা আছে সেটা নিঃশেষ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যা আল্লাহর নিকট রাখবে তা-ই হবে চিরস্থায়ী।'' এ আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রিয় নবীর একটি জীবন্ত শিক্ষা প্রত্যক্ষ করুন- উম্মুল মু'মেনীন হযরত সাইয়্যেদাতুনা আয়েশা সিদ্দীক্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলেন, ''একদা আহলে বায়তে রাসূল একটা ছাগল যবেহ করে। সবাই ভাগ-বাটোয়ারা করে নেয়ার পূর্বে সেখানে ফক্বীর-মিসকীনরা এসে জড়ো হলো। কাউকে 'না' বলার দস্তুর আহলে বায়তে পাকের তো পূর্ব থেকেই ছিল না। ফক্বীর-মিসকীন-এতিমদের তা থেকে তাঁরা যথা নিয়মে দান করছিলেন। ইত্যবসরে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনলেন। জিজ্ঞেস করলেন, ছাগলের কিছু বাকী আছে? আরয করা হলো, ''এয়া রাসুলাল্লাহ! কেবল কাঁধের একটি টুকরো বাকী আছে, এটা ছাড়া সব শেষ হয়ে গেছে।'' প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন- ''বরং বলো- এ একটি টুকরো ছাড়া সব বাকী আছে।'' (কারণ সেগুলোতো আল্লাহর নিকটেই জমা দেয়া হয়েছে)।

১২. যাকাত-ফিতরায় ধন বা নিসাবের মালিক হতে হয়; কিন্তু সাদক্বাহ্র জন্যে 'মনের' মালিক হলেই চলে। প্রিয় নবী বলেন, প্রত্যেক মুসলমানই সাদক্বাহ করতে পারে। হযরত আবূ মূসা আশ'আরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, সাহাবীরা আরয করলেন, ''এয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়কা ওয়াসাল্লাম! যদি সাদক্বাহ করার মতো কিছু না পায়?'' রাসূলে পাক বললেন, ''কেন? গতর খেটে মযদূরী করে উপার্জন করবে। এতে নিজেরও আয় হবে, সাদক্বাহও করতে পারবে।'' আরয করা হলো, ''যদি কাজের সামর্থ্য না থাকে?'' এরশাদ করলেন, ''একটা ভাল কাজ বাতিলয়ে দেবে।'' বলা হলো, ''এয়া রাসুলাল্লাহ, সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম, এটাও করলো না বা সুযোগ হলো না, তখন?'' প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, ''অন্ততঃ নিজে অন্যায় থেকে বিরত থাকবে। এতে তার জন্য পাপ থেকে বাঁচার সাওয়াবও হবে, সাদক্বাহর পুণ্যও পেয়ে যাবে।''

[বুখারী, মুসলিম ও মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা- ১৬৭]

১৩. এক মহিলা সাহাবী হযরত উম্মে বুজায়দ আরয করলেন, ''এয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়কা ওয়াসাল্লাম)! ঘরের দরজায় ফক্বীর-মিসকীন দাঁড়িয়ে হাঁক মারে। লজ্জা লাগে। কারণ উপযুক্ত কিছু পাই না বলে দিতে পারি না।'' রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, ''লজ্জা কিসের? কিছু নিশ্চয়ই দাও। বেশী কিছু না পারলে ছাগলের ক্ষুর-পায়ার মত ক্ষুদ্র জিনিস হলেও দান করে সাদক্বাহর সাওয়াব অর্জনে সচেষ্ট হও।'' [আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত শরীফ-বাবুল ইনফাক্ব, পৃষ্ঠা- ১৬৬]

১৪. বুখারী ও মুসলিম শরীফে রয়েছে, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ফরমাচ্ছেন, ''দু'জন মানুষের মাঝে ন্যায় বিচার করে দেয়া সাদ্ক্বাহ, কোন দূর্বল মানুষকে বাহন বা গাড়ীতে উঠিয়ে দেয়া, তার মাল-সামগ্রী উঠিয়ে দেয়া সাদক্বাহ, একটু হাসিমুখে ভাল একটি কথা বলাও সাদক্বাহ, নামাযের দিকে যেতে প্রতিটি ক্বদমে একেকটি সাদক্বাহ এবং চলার পথ থেকে কষ্টদায়ক কাঁটা, পাথর ইত্যাদি সরিয়ে রাস্তাকে নিরাপদ করাও সাদক্বাহ।'' [বুখারী, মুসলিম, মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা-১৬৭]

১৫. তিরমীযী শরীফে হযরত আবূ যার গিফারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, ''ভাইয়ের সামনে হাসি মুখে যাওয়া, ভাল কাজের আদেশ করা, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা, পথহারা মানুষকে পথ বাতলিয়ে দেয়া, চোখে কম দেখে এমন লোককে সাহায্য করা, চলার পথ থেকে কাঁটা সরিয়ে ফেলা, যার কাছে পানি নেই তাকে পানি দেয়া-এগুলো সবই সাদক্বাহ।''[মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা- ১৬৯]

১৬. প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান- ''ঈমানদার কোন গাছ লাগিয়েছে কিংবা ক্ষেত করেছে আর সে গাছের ছায়ায় বসে কেউ আরাম করলো বা তার ফলমূল মানুষ, পশু-পাখীরা খেলো, এভাবে তার ক্ষেতের ফসল থেকে পশু-পাখীরা বা ক্ষুধার্ত মানুষ যা কিছু খেলো সবই সাদক্বাহ হিসেবে গণ্য হবে এবং সাওয়াবের ভাগী হবে।''
[বুখারী, মুসলিম, মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা-১৬৮]

১৭. হাদীস শরীফে এসেছে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, ''কোন বস্ত্রহীন মানুষকে কাপড় দাও। তাহলে আল্লাহ তোমাকে বেহেশতে সবুজ পোশাক দান করবেন। যতক্ষণ তোমার দেয়া কাপড় তার শরীরে থাকবে তুমি আল্লাহর হেফাযতে থাকবে। তুমি ক্ষুধার্তকে অন্ন দাও, তৃষ্ণার্তকে পানি দাও, আল্লাহ তোমাকে জান্নাতের পানাহার দান করবেন।''
[মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা-১৬৯]

১৮. রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান- সাদক্বাহ আল্লাহর গযবকে ঠাণ্ডা করে এবং অপমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচায়।
[মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা-১৬৮]

১৯. হুযূর পুরনূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাচ্ছেন- ''সাদক্বায় ইহকালীন-পরকালীন ছয়টি উপকারিতা রয়েছেঃ ইহকালীন বা পার্থিব ৩টি হচ্ছে- ১. তার আয় ও রিযক্ব বৃদ্ধি পাবে, ২. সম্পদ বাড়বে, ৩. দেশ ও জনপদ আবাদ থাকবে। অন্যদিকে আখিরাতে ৩টি উপকার হচ্ছেঃ ১. সাদক্বাহ্‌র বদৌলতে তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা হবে, ২. ক্বিয়ামতের দিন তার মাথায় ছায়া হবে এবং ৩. জাহান্নামের আযাব থেকে তাকে রক্ষা করবে।''

প্রখ্যাত তাবে'ঈ হযরত ইমাম মাকহূল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, ''ঈমানদার যখন সাদক্বাহ করে, তখন জাহান্নাম সাজদায় পড়ে আল্লাহর কাছে এ বলে শোকর আদায় করে, ''হে আল্লাহ তুমি তোমার হাবীবের একজন উম্মতকে আমার থেকে মুক্তি দান করলে।'' [নুযহাতুল মাজালিস, পৃষ্ঠা- ১৮৯]

২০. আল্লামা ইবনুল জাওযী তাঁর প্রণীত 'আলমা-জেরিয়্যাত ফিল আস্ইলাতি ওয়াল জাওয়াবাত' কিতাবে লিখেছেন- একবার উম্মুল মু'মেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা একজন দাসী ক্রয় করলেন। হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস্ সালাম এসে প্রিয় নবীকে বললেন, ''এয়া রাসুলাল্লাহু (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়কা ওয়াসাল্লাম)! এ দাসীকে আপনার ঘর থেকে বের করে দিন, কারণ সে জাহান্নামী।'' উম্মুল মু'মেনীন তাকে বের করে দিলেন। যাওয়ার সময় তাকে কিছু খেজুর দিলেন। দাসীটি যাওয়ার সময় রাস্তায় এক ফক্বীর দেখে তাকে অর্ধেক খেজুর সাদক্বাহ করে দিলো। এ দিকে হযরত জিব্রাইল আলায়হিস্ সালাম এসে রাসূলে পাককে বললেন, ''হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়কা ওয়াসাল্লাম)! আল্লাহ তা'আলা দাসীটি ফিরিয়ে আনতে বলেছেন। যেহেতু সে সাদক্বাহ করার দরুণ আল্লাহ তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন।'' [নুযহাতুল মাজালিস, পৃষ্ঠা- ১৮৯]

২১. 'শরফুল মোস্তফা' নামক কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে আল্লামা আবদুর রহমান সফূরী রহমাতুল্লাহি আলায়হি 'নুযহাতুল মাজালিস'-এ লিখেছেন, একদিন আল্লাহ্‌র প্রিয়নবী আটটি দিরহাম নিয়ে জামা কিনতে বাজারের দিকে তাশরীফ নিয়ে যাচ্ছিলেন। পথে দেখতে পেলেন এক মহিলা বসে বসে কাঁদছে। এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। সে বললো, ''পরিবারের জন্যে কিছু সওদা কিনতে দু'টি দিরহাম নিয়ে এসেছিলাম। দিরহাম দু'টি হারিয়ে গেছে।'' নবী করীম তাকে দু'টি দিরহাম দান করে দিলেন। অতঃপর বাজারে গিয়ে চার দিরহামে একটি

জামা নিয়ে ফিরছিলেন, পথে দেখতে পেলেন একজন লোক হাঁক মারছে, "কেউ আছেন আমাকে কাপড় দান করবেন? আল্লাহ আপনাকে জান্নাতী পোশাকে ভূষিত করবেন।" প্রিয় নবী তাকে জামাটা দিয়ে দিলেন। এবার বাজারে গিয়ে মাত্র দু'দিরহাম দিয়ে একটি ক্বামীস ক্রয় করলেন। আসার পথে দেখতে পেলেন একজন মহিলা (ক্রীতদাসী) রাস্তার ধারে বসে কাঁদছে। জানতে চাইলেন-কেন কাঁদছো? আরয করলো, "হুযূর, বিলম্বের কারণে মুনিব পক্ষ শাস্তি দিতে পারে- এই ভয়ে কাঁদছি।" নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, "ঠিক আছে আমাকে নিয়ে চলো।" দাসীটি নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পেছনে পেছনে চললো। মালিকের বাড়ী গিয়ে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বাইরে থেকে সালাম জানিয়ে দরজায় কড়া নাড়লেন। একবার দু'বার । কোন জবাব এলো না। তৃতীয় বারে দরজা খোলা হলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন দরজা খুলতে দেরী করলে কেন? তারা বিনীতভাবে বললো, "এয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়কা ওয়াসাল্লাম), আপনার নূরানী বরকতমণ্ডিত চেহরা-ই পাকের দিদার পেয়ে নিজেদের ধন্য মনে করছিলাম।" নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম দাসীকে ক্ষমা করে দিতে বললেন। তারা আরয করলো, "এয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়কা ওয়াসাল্লাম, আপনারই জন্যে আমরা এ দাসীকে আযাদ করে দিলাম। প্রিয় নবী এ কথাটি বলতে বলতে ফিরে আসলেন, "এ আটটি দিরহাম কত বরকতময়! এর দ্বারা একজন দাসীকে আযাদ করলাম, একজনকে পরিবারের মন্দ কথা শোনা থেকে মুক্তি দিলাম এবং একজন বস্ত্রহীনকে কাপড় দিতে পারলাম । [নুযহাতুল মাজালিস, পৃষ্ঠা- ১৯০]

২২. হযরত মানসূর ইবনে আম্মার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু একদিন সাদক্বাহ্র ফযীলতের উপর ওয়ায করছিলেন। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, "হুযূর আমাকে চারটি দিরহাম সদক্বাহ দিন।" তিনি বললেন, "কেউ আছে, একে চার দিরহাম সদক্বাহ করবে, আমি তার জন্য চারটি দো'আ করব।"

এক ইহুদীর একজন মুসলিম ক্রীতদাস হযরত মানসূর ইবনে আম্মারের মাহফিলে ছিলেন। বললেন, হুযূর আমি চার দিরহাম সদক্বাহ করছি। আমার জন্য চারটি দো'আ করুনঃ ১. আমি ক্রীতদাস, আমার মুক্তির জন্য দো'আ করুন। ২. আমি ফক্বীর, দো'আ করুন যেন আল্লাহ আমাকে সম্পদশালী করেন। ৩. আমি পাপী, আল্লাহ পাক আমায় যেন ক্ষমা করে দেন এবং ৪. দো'আ করুন যেন আমার মুনিব মুসলমান হয়ে যান। অতঃপর ঘরে আসলে

মালিক জিজ্ঞেস করলেন, দেরী করলে কেন? তিনি বললেন, হুযূর, আমি হযরত মানসূর বিন আম্মার-এর মাহফিলে বসেছিলাম। চারটি দিরহাম সদক্বাহ করে তাঁকে দিয়ে চারটি দো'আ করিয়েছি। প্রথম দো'আ করেছেন- আল্লাহ যেন আমাকে আযাদ করে দেন। মালিক বললেন, যাও আমি তোমাকে আল্লাহর নামে আযাদ করে দিলাম। হুযূর, দ্বিতীয় দো'আ করেছেন আল্লাহ তা'আলা যেন আমাকে ধনী বানিয়ে দেন। মুনিব বললেন, নাও, আল্লাহর ওয়াস্তে আমি চারহাজার দিরহাম তোমাকে দান করলাম। লোকটি বললেন, হুযূর তৃতীয় দো'আ করিয়েছি আল্লাহ যেন আপনাকে ইসলাম দান করেন। ইহুদী মুনিব বললেন, তুমি সাক্ষী থাকো, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সাচ্চা রাসূল। অর্থাৎ আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম।" লোকটি বললেন, হুযূর চতুর্থত আমার গুনাহ মাফের জন্য দো'আ করিয়েছি। মুনিব বললেন, "দেখ এটা তো আমার ক্ষমতাধীন নয়।" সে রাতেই ওই মুনিব স্বপ্নে দেখলেন, আল্লাহ পাক বললেন, "হে আমার বান্দা! তুমি তোমার ক্ষমতায় যা আছে করেছো। বিনিময়ে আমি আমার দয়া ও ক্বুদরতে যা আছে তাই করছি। আমি তোমাকে, তোমার গোলামকে, ওই ওয়ায়েয এবং ওই মাহফিলে উপস্থিত সবাইকে ক্ষমা করে দিলাম।"

[নুযহাতুল মজালিস, পৃষ্ঠা- ১৯১]

২৩. হাকিম ও ত্বাবরানী আওসাত্ব গ্রন্থে হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাচ্ছেন, এক লোক্বমা রুটি কিংবা এক মুষ্ঠি খেজুর অথবা এমন কোন বস্তু, যাদ্বারা একজন মিসকীনের উপকার হয়, এর ওসীলায় আল্লাহ তা'আলা তিনজনকে জান্নাত দান করেন। একজন গৃহকর্তা, যার নির্দেশে দেওয়া হয়, দ্বিতীয়জন স্ত্রী, যে এগুলো প্রস্তুত করে এবং তৃতীয়জন খাদিম, যে মিসকীনের হাতে দিয়ে আসে। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, "শোকর ও প্রশংসা আল্লাহর জন্যে, যিনি আমাদের খাদিমদেরও বাদ দেন নি।"

২৪. আল্লামা আবদুর রহমান সফূরী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি 'নুযহাতুল মাজালিস' গ্রন্থে লিখছেন- এক ব্যক্তি খোরাসান থেকে বসরায় এসে হযরত হাবীবে আজমী রাহমাতুল্লাহি আলায়হিকে দশ হাজার দিরহাম দিয়ে বললেন, "হুযূর, আমি হজ্বে যাচ্ছি। আপনি বসরা শহরে আমার জন্য একটি বাড়ী কিনে রাখবেন। যেন আমি ফিরে এসে ওই বাড়ীতে বসবাস করতে পারি।" এ দিকে

বসরা ও খোরাসান এলাকায় মারাত্মক দূর্ভিক্ষ দেখা দিলো। হযরত হাবীবে আজমী ওই দশ হাজার দিরহামের আটা কিনে গরীব মিসকীনদের মধ্যে সদক্বাহ করে দিলেন। লোকেরা জানতে চাইলেন, হুযূর, উনি তো বাড়ী কিনতে বলেছিলেন, আর আপনি সদক্বাহ করে দিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি তার জন্যে বেহেস্তে বাড়ী কিনেছি। সে রাজী হলে ভাল; নয়তো টাকা ফিরিয়ে দেবো। লোকটি ফিরে এসে জিজ্ঞেস করলেন- হুযূর বাড়ী কিনেছেন? হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার জন্যে সুদৃশ্য বাগান আর স্রোতস্বিনীসহ বিশাল বাড়ী কিনেছি। লোকটি শুনে খুশী হলেন এবং বলেলেন হুযূর আমরা বাড়ীতে উঠতে চাই। তিনি বললেন, হ্যাঁ আমি বাড়ীটা আল্লাহর নিকট থেকে জান্নাতে ক্রয় করেছি। এতদ্বশ্রবণে তারা অত্যোধিক আনন্দিত হলো। ওই ব্যক্তির স্ত্রী বললো, হুযূরকে যিম্মাদার হয়ে বেহেস্তের ওই বাড়ীটির একটি আঙ্গিকারনামা লিখে দিতে বলুন। সাথে সাথে তিনি লিখে দিলেন, "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম, আমি এ অঙ্গিকারনামা দিচ্ছি যে, হাবীবে আজমী মহান আল্লাহর নিকট থেকে অমুকের ছেলে অমুকের জন্যে অসংখ্য নহর ও বাগান সহ বেহেশতের একটি বাড়ী কিনে রেখেছে, যা যথা সময়ে আল্লাহ তা'আলা হাবীবের পক্ষ থেকে পূরণ করবেন।"

লোকটি সবাইকে ওসীয়ত করলেন, আমার ইনতিকালের পর হাবীবে আজমীর লিখাটি আমার কাফনের ভেতরে দিও। কিছুদিন পর লোকটির ওফাত হলো। দাফনের সময় কাফনের ভেতর যথারীতি কাগজখানা দেয়া হলো। পরদিন ভোরে তার কবরের উপর একখানা লিখিত কাগজ পাওয়া গেলো। ওখানে স্বর্ণাক্ষরে লিখা ছিলো- "হাবীব যে ঘর অমুকের জন্য আল্লাহর নিকট থেকে নিয়েছিলেন, জান্নাতের সে ঘরটি আল্লাহ তা'আলা তাকে দান করেছেন এবং হাবীবকে দায়মুক্ত করেছেন।" এ মাকতূব শরীফটি পেয়ে হযরত হাবীব আজমী এ বলে আনন্দে কেঁদে ফেললেন, আল্লাহ আমাকে দায়মুক্ত করেছেন এবং নিজ ওয়াদা পূরণ করেছেন। [নুযহাতুল মজালিস, পৃষ্ঠা-১৯১]

২৫. ত্বাবরানী ও বায়হাক্বী শরীফে হযরত হাসান বসরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, প্রিয় নবী এরশাদ ফরমাচ্ছেন! আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে আদম সন্তান! তোমার সঞ্চয় থেকে আমার কাছে কিছু জমা রাখো, ওটা পুড়ে যাবে না, ডুবে যাবে না এবং চুরিও হবে না। আমি তোমাকে এর পরিপূর্ণ প্রতিদান দেবো তখনই যখন এটা তোমার বড়ই প্রয়োজন হবে।"

২৬. হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম-এর যুগে এক ধোপা ছিলো। প্রায়শ সে মানুষের কাপড়-চোপড়গুলো ওলট-পালট করে ফেলতো। অনেক

চেষ্টা-তদবীর করেও এর কোন প্রতিকার করা গেলো না। সবাই মিলে সায়্যেদুনা হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম-এর দরবারে অভিযোগ করলো। তিনি বললেন, "ঠিক আছে তোমরা চিন্তা করো না, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করে দেবেন।" ধোপা প্রতি দিনকার ন্যায় কাপড়-চোপড় নিয়ে পুকুর ঘাটের দিকে বের হলো। তার সাথে তিনটা রুটি ছিল, পথে এক ভিখারী তার কাছে ভিক্ষা চাইলে সে একটি রুটি তার হাতে দিয়ে দিলো। ফক্বীর হাত তুলে দো'আ করল, "আল্লাহ তোমাকে এমন সব বালা-মুসীবত থেকে রক্ষা করুন, যেগুলো আসমান থেকে নাযিল হয়।" দো'আটি তার পছন্দ হলো তাই আরো একটি রুটি তাকে দিয়ে দিলো। ফক্বীর দো'আ করলো, "আল্লাহ তোমাকে সব ধরনের বিপদ থেকে হিফাযত করুন।" সে তৃতীয় রুটিটাও ফক্বীরকে দিয়ে দিলো। এবার ফক্বীর দো'আ করল, "আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান নসীব করুন।" এ দিকে তার কাপড়গুলোর ভেতরে একটি বিরাট সাপ ঢুকে পড়েছিলো। সে কাপড়গুলো খুললো। সাপটি তাকে দংশন করতে উদ্যত হলো। ঠিক তখন দেখা গেলো, সাপটির মুখে লোহার লাগাম পরানো। সে কাপড়গুলো ধুয়ে যথারীতি নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করলো। লোকেরা আর্শ্চযান্বিত হয়ে হযরত ঈসা রূহুল্লাহ্‌র দরবারে-এর কারণ জানতে চাইলো। হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা তুমি আজ পথে যেতে যেতে কোন্ নেক কাজ করেছো? সে বললো হুযূর! সাথে তিনটা রুটি ছিলো, ফক্বীরকে সাদক্বাহ করে দিয়েছিলাম! অতঃপর হযরত রূহুল্লাহ সাপকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি একে দংশন করোনি কেন? সাপ আরয করল, হুযূর আপনার বাণী মতো আমাকে ওই লোকটাকে দংশন করার জন্যেই পাঠানো হয়েছিলো। কিন্তু সে সাদক্বাহ করায় এক ফিরিশতা এসে আমার মুখে লাগাম এঁটে দিলেন। ফলে আমি আর তাকে দংশন করতে পারিনি। এতে সমস্ত লোক তা'আজ্জব বনে গেলো এবং ওই ধোপা খালেসভাবে তাওবা করলো। [নুযহাতুল মজালিস, পৃষ্ঠা-১৯২]

২৭. হযরত আবূ যার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, "(অভাবের সময়) যখন কোন ব্যঞ্জন তৈরী করো তখন পানি বাড়িয়ে দিও। যাতে প্রতিবেশীর খেদমত করা যায়।" [মিশকাত শরীফ, আয়াত-১৭১]

২৮. সদক্বাহ-খয়রাতে নিকটতম আত্মীয়রাই অগ্রাধিকার পাবে। সায়্যেদুনা হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র সূত্রে মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, সরকারে দো-আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

ফরমাচ্ছেন- তুমি একটা দীনার আল্লাহর পথে, অর্থাৎ জিহাদ ইত্যাদিতে, একটা গোলাম আযাদ করার জন্যে এবং কোন একটা মিসকীনকে সদক্বাহ করলে, এভাবে নিজের পরিবারভুক্ত কারো জন্যে একটা দীনার খরচ করলে। ফলে, এর মধ্যে নিকটতম ব্যক্তির জন্যে যা খরচ করেছো ওটারই সর্বাধিক সাওয়াব পাবে।

প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাস'ঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র স্ত্রী হযরত যয়নাব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা অপর একজন মহিলা সাহাবীসহ রাসূলে পাকের দরবারে মাসআলা জানতে চাইলেন যে, স্ত্রী নিজ মালিকানাধীন অর্থ দরিদ্র স্বামী এবং তার পূর্বস্বামীর সন্তানকে সাদক্বাহ হিসেবে প্রদান করলে সাওয়াব পাওয়া যাবে কিনা? প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, তখনতো তোমরা দ্বিগুণ সাওয়াব পাবে। একতো আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার এবং অপরটি সাদক্বাহর। তাই, রাসূলে পাক প্রায় সময় বলতেন, ''তোমরা সাদক্বাহ প্রদানের সময় নিজ দায়িত্বভুক্ত নিকটতম ব্যক্তিদের দিয়েই শুরু করো, কারণ এদেরকে দিলো দু'দিকে দায়িত্ব পালন করা হয় এবং সাওয়াবও দ্বিগুণ পাওয়া যায়। [মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা-১৭১]

২৯. দরিদ্র ব্যক্তির অভাবের ভেতরেও সাদক্বাহ করাকে রাসূল-ই করীম উত্তম সাদক্বাহ হিসেবে অভিহিত করেছেন। বর্ণিত আছে, হযরত শেরে খোদা আলী মুর্তাদ্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হযরত খাতূনে জান্নাত ফাতেমাতুয্যাহরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার একটি কাপড় নিয়ে বিক্রি করে কিছু খাদ্য সামগ্রী কেনার উদ্দেশ্যে বের হলেন। তিনি ওটা ছয় দিরহামে বিক্রি করে খাদ্য সামগ্রী কেনার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন। পথে এক ভিখারী হাত পাতলে তার হাতে ওই ছয় দিরহাম পুরোটাই তিনি দিয়ে দিলেন। একটু পর এক উষ্ট্রীসহ একজন লোক এসে বললো, হুযূর আমার উষ্ট্রীটা কিনবেন? তিনি বললেন, ভাই আমার হাতে তো টাকা নেই। লোকটি বললো, ঠিক আছে, বাকীতে নিন। পরে দিয়ে দেবেন। হযরত, শেরে খোদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ১০০ দিরহামে বাকীকে উষ্ট্রীটি নিয়ে সামনে কিছুদূর যেতেই অপর একজন ব্যক্তি এসে বললেন, হযরত, আপনার উষ্ট্রীটা বিক্রি করবেন? তিনি বললেন। হ্যাঁ, আমি তো এটা ১০০ দিরহামে কিনেছি। লোকটি বললো, ঠিক আছে আমি আপনাকে ৬০ দিরহাম লাভ দিচ্ছি। ১৬০ দিরহামে উষ্ট্রীটি বিক্রি করে তিনি সামনের দিকে আসছিলেন। প্রথম ব্যক্তিটি হাজির। বললো, হুযূর! আমার টাকাগুলো দেবেন? তিনি তাকে ১০০ দিরহাম পরিশোধ করে বাকী ষাট

দিরহাম নিয়ে ঘরে ফিরে আসলেন। হযরত খাতূনে জান্নাত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা এ বাড়তি টাকাগুলো সম্পর্কে জানতে চাইলেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি আল্লাহ পাকের সাথে ছয় দিরহমের সওদা করেছি, বিনিময়ে তিনি আমাকে ষাট দিরহাম দিয়েছেন। পরে রাসূলে পাকের দরবারে ঘটনার কথা বললে প্রিয় নবী এরশাদ করলেন- প্রথম উট বিক্রেতা হযরত জিব্রাঈল এবং দ্বিতীয় উট ক্রেতা হচ্ছেন মীকাইল আলাইহিস সালাম। আর এ উষ্ট্রীটি ফাতেমার জন্যে সংরক্ষিত আছে। ওটা ক্বিয়ামতের দিন তাঁর বাহন হবে। [নুযহাতুল মজালিশ, পৃষ্ঠা- ১৯৫]

৩০. উম্মুল মু'মেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা প্রিয় নবীর কাছে জানতে চাইলেন, এয়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়কা ওয়াসাল্লাম)! এমন কোন বস্তু আছে, যা মানুষ চাইলে না দেওয়া উচিত নয়? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, লবণ, পানি এবং আগুন। হযরত সিদ্দীক্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা আরয করলেন, হুযূর! পানির গুরুত্ব বুঝলাম; কিন্তু লবণ এবং আগুনের মাহাত্ম্য কি? নবী করীম এরশাদ করলেন, লবণ দ্বারা খাদ্য সুস্বাদু হয় আর আগুন দ্বারা পাক (রান্না) হয়। তাই যত পরিমাণ খাবার ওই লবণ দ্বারা স্বাদ হয়েছে এবং ওই আগুন দ্বারা রান্না হয়েছে, ওই পরিমাণ খাদ্য সাদক্বাহ করার সাওয়াব পাওয়া যায়। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ফরমাচ্ছেন- যেখানে পানি সহজে পাওয়া যায় সেখানে কোন তৃষ্ণার্ত ব্যক্তিকে পানি পান করালে একজন গোলাম আযাদ করার সওয়াব পাওয়া যায় এবং পানি যেখানে সহজলভ্য নয় সেখানে কোন পিপাসু ব্যক্তিকে পানি পান করালে জীবন রক্ষার সাওয়াব পাওয়া যাবে। কেউ সাধারণের চলার পথে তৃষ্ণার্তদের জন্যে খাবার পানির ব্যবস্থা করলে আল্লাহ পাক তার প্রতি প্রত্যেহ দু'বার রহমতের দৃষ্টি দেন। [নুযহাতুল মজালিস, পৃষ্ঠা- ১৯৩]

বাস্তবিকই যাকাত-ফিত্‌রা ও সাদক্বাহ তথা সাখাওয়াত-বদন্যতা আর দানশীলতার গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য লিখে বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। প্রিয়তম রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাচ্ছেন- তোমার সঞ্চিত সম্পদকে যদি চোর-ডাকাত আর ঘুণ-পোকার আক্রমন থেকে রক্ষা করতে চাও, তাহলে আল্লাহ্‌র পথে সদক্বাহ করে যাও।

শেখ সাদী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন-সদক্বাহ করে যাও, তবে খোঁটা দিয়ে তা বরবাদ করো না। কারণ এর সুফলতো অচিরেই তুমিই পাবে। তিনি বলেন- সাখাওয়াত অর্থাৎ দান-বৃক্ষ যেখানেই রোপন করো সেটার সুফল এবং

সফলতার ডাল-পালায় আরশকেও ছাড়িয়ে যাবে। তবে তুমি এর সুফল ভোগ করতে চাইলে খোঁটা দিয়ে এর গোড়ায় কুড়াল এবং করাত চালিয়ে দিওনা। এখানে হযরত শেখ সাদী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র আরো একটি বাণী বড় গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, ''দু'ধরনের মানুষ সবচেয়ে বেশী আফসোস এবং অনুশোচনা নিয়েই মৃত্যুবরণ করেঃ **এক.** ওই কৃপণ ব্যক্তি, যে সারা জীবন শুধু উপার্জন করেছে কিন্তু না খেয়ে, নিজের কল্যাণে ব্যয় না করে পরের জন্য ছেড়ে গেছে এবং **দুই.** যে অনেক অনেক জ্ঞান অর্জন করেছে, কিন্তু তা অনুযায়ী আমল করেনি।

সবশেষে, সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর একটি বাণী দিয়ে এ বিষয়টির ইতি টানছি। হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাচ্ছেন-

''যতদিন তোমাদের উত্তম লোকেরা সমাজে নেতৃত্ব দেবে, ধনীরা হবে দানশীল এবং তোমরা পরস্পর সুন্দর পরামর্শের মাধ্যমে কার্য সমাধা করবে, ততদিন সমাজ হবে সুন্দর, মৃত্যুর চেয়ে জীবন অনেক দামী হবে। পক্ষান্তরে, যখন দুষ্টলোকদের হাতে সমাজ পরিচালিত হবে, ধনীরা কৃপণ হয়ে যাবে আর পুরুষেরা নারীদের পরামর্শ অনুসারে কার্য সমাধা করবে তখন যমীনের উপরিভাগের চাইতে নিচের অংশ উত্তম হবে। (অর্থাৎ জীবনের চাইতে।) তথা এ কলুষময় সমাজ ও পরিবেশ থেকে মৃত্যুই শ্রেয় হবে।)

----<>---

ক্বোরবানীর বর্ণনা

ক্বোরবানী একটি আর্থিক এবাদত। এটা সম্পদশালীর উপর ওয়াজিব। নির্দিষ্ট পশু নির্দিষ্ট দিনে আল্লাহর ওয়াস্তে সাওয়াবের নিয়্যতে যবেহ্ করাই হচ্ছে ক্বোরবানী। মুসলমান, মুক্বীম, নেসাবের অধিকারী, আযাদের উপর এটা ওয়াজিব।

মাস্আলাঃ যেমন পুরুষের উপর ক্বোরবানী ওয়াজিব, তেমনি মহিলার উপরও ওয়াজিব। [দুররুল মুখতার ও অন্যান্য কিতাব]

মাস্আলাঃ মুসাফিরের উপর ক্বোরবানী ওয়াজিব নয়; কিন্তু নফল হিসেবে করতে চাইলে করতে পারে, সাওয়াব পাবে। [দুররুল মুখতার ও অন্যান্য কিতাব]

মাস্আলাঃ নেসাবের অধিকারী হওয়া বলতে ততটুকু সম্পদ হওয়া বুঝায়, যতটুকু সম্পদ হলে সাদক্বা-ই ফিতর ওয়াজিব হয়। অর্থাৎ মূল ব্যবহারিক সামগ্রী ব্যতীত দু'শত দিরহামের (সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য কিংবা সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ) মালিক হওয়া। [দুররুল মুখতার, আলমগীরী ও অন্যান্য কিতাব]

মাস্আলাঃ যে ব্যক্তি দু'শ' দিরহাম বা বিশ দিনারের মালিক বা মূল ব্যবহারিক সামগ্রী ব্যতীত এমন কোন জিনিসের মালিক হয় যার মূল্য দু'শত দিরহাম, তাহলে সে ধনী হিসেবে বিবেচিত হবে তার উপর ক্বোরবানী ওয়াজিব। [আলমগীরী]

তবে এ নেসাবের উপর এক বছর অতিবাহিত করার প্রয়োজন নেই। ক্বোরবানীর দিনে এ নেসাবের মালিক হওয়া যথেষ্ট।

ক্বোরবানীর সময়

১০ যিলহজ্বের সুবহে সাদিক্ব থেকে ১২ তারিখের সূর্যাস্ত পর্যন্ত অর্থাৎ তিন দিন দু'রাত ক্বোরবানীর সময়। তবে দশ তারিখ সবচেয়ে উত্তম। অপরাগতায় এর পর এগার তারিখ, তারপর বার তারিখেও ক্বোরবানী করা যাবে।

মাস্আলাঃ শহরের ঈদের নামাযের পর ক্বোরবানী করা পূর্বশর্ত আর অজগ্রামে যেহেতু ঈদের নামায নেই, সেহেতু সুবহে সাদিক্ব থেকে ক্বোরবানী করতে পারে।

মাস্আলাঃ ক্বোরবানীর নির্দিষ্ট সময়ে ক্বোরবানী করা আবশ্যক। তখন পরে ওই পরিমাণ মূল্য বা সেই পরিমাণ মূল্যের পশু সাদক্বা করে দিলে ওয়াজিব আদায় হবে না। [আলমগীরী]

মাস্আলাঃ ক্বোরবানীর দিনগুলো অতিবাহিত হওয়ার পর ক্বোরবানী বাদ পড়ে গেল। এখন আর ক্বোরবানী হবে না। যদি কোন পশু ক্বোরবানীর জন্য ক্রয় হয়ে থাকে, তাহলে সেটা সাদক্বা করে দেবে। অন্যথায় একটি ছাগলের মূল্য সদকা করে দিবে। [রদ্দুল মুহতার, আলমগীরী]

মাস্আলাঃ যদি ক্বোরবানীর শর্তসমূহ পাওয়া যায় (যা উপরে বর্ণিত হয়েছে) তাহলে প্রত্যেকের উপর ক্বোরবানী করা ওয়াজিব। একটি ছাগল বা ভেঁড়া ক্বোরবানী একজনের জন্য যথেষ্ট আর একটি উট, গরু বা মহিষের মধ্যে সাতজন শরীক হতে পারে। এক সপ্তমাংশের চেয়ে কম হতে পারে না। সাতজন থেকে যদি কম অংশীদার হয় তবে ক্ষতি নেই; কিন্তু কারো অংশ এক সপ্তামাংশ থেকে কম হলে ক্বোরবানী হবে না।

মাস্আলাঃ ক্বোরবানীতে সকল অংশীদারের নিয়্যত সাওয়াব অর্জনের হওয়া চাই। কেবল মাংস খাওয়ার নিয়্যত যেন না হয়। সুতরাং আক্বীক্বাকারীও অংশীদার হতে পারে। কারণ আক্বীকাতেও সাওয়াব অর্জনের নিয়্যত থাকে। [রদ্দুল মুহতার]

ক্বোরবানীর নিয়ম

ক্বোরবানীর পশু যবেহ্ করার আগে পশুকে পানি পান করাবেন। আগে থেকেই ছুরি ধারালো করে নেবেন, তবে পশুর সামনে নয়। পশুকে বাম পাশ করে শোয়াবেন যেন ক্বেবলার দিকে মুখ হয় এবং যবেহকারী স্বীয় ডান পা সেটার রানের উপর রেখে ধারালো ছুরি দ্বারা তাড়াতাড়ি যবেহ্ করে দেবেন এবং যবেহের আগে দো'আ পড়ে নেবেনঃ

اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّ مَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ . لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ . اَللّٰهُمَّ لَكَ وَمِنْكَ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ .

উচ্চারণঃ ইন্নী ওয়াজ্জাহ্তু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী-ফাত্বারাস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্বা হানী-ফাঁও ওয়ামা-আনা মিনাল মুশ্রিকীন। ইন্না সালা-তী ওয়া নুসুক্বী ওয়া মাহ্ইয়া-য়া ওয়া মামা-তী লিল্লা-হি রাব্বিল আলামী-ন। লা-শরীকা লাহু ওয়া বিযা-লিকা উমিরতু ওয়া আনা মিনাল মুসলিমী-ন। আল্লাহুম্মা লাকা ওয়া মিন্কা বিস্মিল্লা-হি আল্লা-হু আকবার।

দো'আ শেষ হবার সাথে ছুরি চালিয়ে দেবেন। ক্বোরবানী নিজের পক্ষ থেকে হলে যবেহ্ করার সময় এ দো'আটি পড়বেন-

اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّىْ كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ خَلِيْلِكَ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَحَبِيْبِكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা তাক্বব্বাল মিন্নী-কামা-তাক্বাব্বালতা মিন খালী-লিকা ইবরা-হী-মা আলায় হিস্ সালা-মু ওয়া হাবী-বিকা মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

যবেহের সময় রগ চারটি কেটে দিবেন, যার কমপক্ষে তিনটি কাটা জরুরী। এর থেকে অধিক কাটবেন না যেন ছুরি হাড় পর্যন্ত পৌঁছে না যায়, কারণ এটা অনর্থক কষ্ট দেয়া। ঠাণ্ডা হওয়ার পর পা কাটবেন এবং চামড়া ছাড়াবেন। যদি অন্যের পক্ষ থেকে যবেহ করা হয়, তাহলে مِنِّىْ-এর স্থলে مِنْ فُلَانٍ (অমুকের পক্ষে থেকে) বলবেন। আর যদি অংশীদারী পশু হয়, যেমন গরু, মহিষ ইত্যাদি, তবে নাম বলে তাদের পক্ষ থেকে অর্থাৎ (তখন 'অমুকের' জায়গায়) সকল অংশীদারের নাম বলবেন । তারপর যথানিয়মে আল্লাহর নামে যবেহ্ করবেন ।

মাস্আলাঃ যদি অন্যের দ্বারা জবেহ্ করানো হয়, তাহলে নিজেও উপস্থিত থাকা উত্তম।

ক্বোরবানীর গোশ্ত ও চামড়া

যদি অংশদারী পশু হয়, তাহলে মাংস যেন ওজন করে ভাগ করা হয়। আন্দাজ করে যেন বন্টন করা না হয়। কারণ যদি কারো কাছে বেশী যায়, তাহলে সে মাফ করে দিলেও জায়েয হবে না। কারণ সেটা শরীয়তের হক্ব। [রদ্দুল মুহতার ও বাহার]

অতঃপর নিজের ভাগকে পুনরায় তিন ভাগ করে এক ভাগ ফক্বীরদেরকে, একভাগ বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনকে দেবে এবং একভাগ নিজের জন্য রাখবে। যদি পরিবারের লোক সংখ্যা বেশী হয়, তাহলে সম্পূর্ণটুকু ঘরের জন্য রেখে দেয়া যায়, আবার সম্পূর্ণটুকু সদক্বা করে দিতে চাইলেও দেয়া যায়; যদিওবা একভাগ নিজের জন্য রাখা উত্তম।

মাস্আলাঃ মৃত ব্যক্তির নামে ক্বোরবানী দেয়া হলে, সেটার মাংসেরও একই হুকুম। অবশ্য মৃত ব্যক্তি যদি ওসীয়ত করে যায় যে, তার পক্ষ থেকে যেন ক্বোরবানী দেয়া হয়, তাহলে ওই অবস্থায় যেন তার অংশের সম্পূর্ণ মাংস সদক্বা করে দেয়া হয়।

মাস্আলাঃ ঈদুল আযহার দিন ক্বোরবানী দাতা যেন সর্বপ্রথম ক্বোরবানীর মাংসই খায়। এটা মুস্তাহাব। [বাহারুর রায়েক্ব]

মাস্আলাঃ ক্বোরবানীর মাংস যেন কাফিরকে দেয়া না হয়।

মাস্আলাঃ চামড়া, ভুঁড়ি, রশি, হাড় ইত্যাদি যেন সাদক্বা করে দেয়া হয়, চামড়া ইচ্ছে করলে নিজের কাজেও লাগানো যায়। যেমন মশক, জায়নামায ও বিছানা ইত্যাদি বানানো যায়; কিন্তু বিক্রি করলে এর মূল্য নিজের কাজে লাগানো যাবে না। তখন এর মূল্য সাদক্বা করে দেয়া ওয়াজিব। [দুর্রুল মুখতার ও রদ্দুল মুহতার]

মাস্আলাঃ আজকাল প্রায়শঃ চামড়া মাদ্রাসায় দিয়ে দেয়। এটা জায়েয। যদি মাদরাসায় দেয়ার নিয়্যতে চামড়া বিক্রি করে এর মূল্য দিয়ে দেয়, তাও জায়েয আছে। [আলমগীরী ও বাহার]

মাস্আলাঃ ক্বোরবানীর মাংস বা চামড়া কসাই বা যবেহকারীকে পারিশ্রমিক

হিসেবে দেয়া যাবে না। অবশ্য আত্মীয়-স্বজনের মত হাদিয়া হিসেবে মাংস দিতে চাইলে দেয়া যাবে। তবে যেন পারিশ্রমিকের অন্তর্ভুক্ত মনে করা না হয়। [হিদায়া ও অন্যান্য কিতাব]

মাস্আলাঃ কোন কোন জায়গায় ক্বোরবানীর চামড়া মসজিদের ইমামকে দিয়ে দেয়া হয়। যদি বেতন হিসেবে দেয়া না হয় বরং সাহায্য হিসেবে দেয়া হয়, তাহলে কোন ক্ষতি নেই। [বাহারে শরীয়ত]

ক্বোরবানীর পশু

উট, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেঁড়া (নর হোক কিংবা মাদী কিংবা খাসী হোক) সব ক'টি দ্বারা ক্বোরবানী হতে পারে। [আলমগীরী]

মাস্আলাঃ দুম্বা ভেঁড়ার অন্তর্ভুক্ত।

মাস্আলাঃ উট, পাঁচ বছর, গরু ও মহিষ দু'বছর, ভেড়া-ছাগল এক বছর বয়স বা এর অধিক হতে হবে। এর থেকে কম বয়সের না-জায়েয। তবে দুম্বা বা ভেঁড়ার ছয় মাস বয়সের বাচ্চা যদি এতটুকু বড় হয় যে, এক বছর বয়সের মনে হয়, তাহলে সেটার ক্বোরবানী জায়েয।

মাস্আলাঃ ক্বোরবানীর পশু মোটা তাজা এবং ভাল হওয়া চাই। দোষত্রুটি মুক্ত হওয়া চাই। যৎসামান্য দোষত্রুটি থাকলে ক্বোরবানী হয়ে যাবে, তবে মাকরূহ হবে। আর যদি দোষত্রুটি বড় আকারের হয়, তাহলে ক্বোরবানী হবেই না। [দুর্রুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার, আলমগীরী]

মাস্আলাঃ জন্মগত শিংবিহীন পশু দ্বারা ক্বোরবানী জায়েয। অবশ্য যদি শিং ছিল কিন্তু ভেঙ্গে গেছে, তাহলে মজ্জাসহ ভেঙ্গে গেলে না-জায়েয আর এর থেকে কম ভাঙ্গলে জায়েয। [আলমগীরী ও অন্যান্য কিতাব]

মাস্আলাঃ অন্ধ, কানা, খোঁড়া, কানকাটা, লেজ কাটা, দাঁতহীন, ঠোঁট কাটা, নাক কাটা, জন্মগত কান বিহীন, রোগা, হিজড়া জাতীয়, আবর্জনা ভোজী ইত্যাদি দোষযুক্ত পশুর দ্বারা ক্বোরবানী জায়েয নেই। [দুর্রুল মুখতার, বাহার]

মাস্আলাঃ রোগ যদি মা'মুলী হয় বা খোঁড়াপনা যদি সামান্য হয়, ক্বোরবানীর জায়গা পর্যন্ত যেতে পারে, বা নাক, কান, লেজ এক তৃতীয়াংশ থেকে কম কাটা হয়, তাহলে ক্বোরবানী জায়েয। [দুর্রুল মুখতার, হেদায়া, আলমগীরী]

মাস্আলাঃ ক্বোরবানী করার সময় পশু লাফালাফি করলে এবং এর ফলে আহত হলে অর্থাৎ দোষযুক্ত হলে কোন ক্ষতি নেই। [দুর্রুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার]

মাস্আলাঃ ক্বোরবানী করার পর পেটে জীবিত বাচ্চা দেখা গেলে, সেটাকেও জবেহ করে দেবে এবং কাজে লাগাতে পারবে। আর যদি মৃত হয় তাহলে ফেলে দেবে। [বাহারে শরীয়ত]

মাস্আলাঃ ক্রয় করার পর ক্বোরবানীর আগে পশু বাচ্চা প্রসব করলো, তাহলে সেটাও জবেহ করে দেবে আর যদি বিক্রি করে ফেলা হয়, তাহলে এর মূল্য যেন সাদক্বা করে দেয়া হয়। আর যদি ক্বোরবানীর সময়ের মধ্যে জবেহ করা না হয়, তাহলে জীবিত সাদক্বা করে দেবে। [আলমগীরী, বাহার]

ফায়দা

আমাদের প্রিয় আক্বা ও মাওলা হযরত আহমদ মুজতাবা মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সার্বজনীন মেহেরবানী দেখুন। তিনি স্বয়ং তাঁর উম্মতের পক্ষে থেকে ক্বোরবানী করেছেন এবং ওই সময়ও উম্মতের কথা স্মরণ রেখেছেন। তাই এটা বড় সৌভাগ্যের বিষয় হবে, যার পক্ষে সম্ভব, সে যেন হুযূর-ই আক্রামের জন্য ক্বোরবানী করে। [বাহারে শরীয়ত]

গরু, উট দ্বারা ক্বোরবানী করলে নফল হিসাবে এবং এক ভাগ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে ক্বোরবানী দেয়া অতি উত্তম। শরীকদারী ক্বোরবানীতে শরীকগণ সবাই মিলে এক বা একাধিক অংশ হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র পক্ষ থেকে ক্বোরবানী দিতে পারবে।

-----<>-----

ইসলামে তাক্বওয়াপূর্ণ ত্যাগের গুরুত্ব

পৃথিবীতে মানবকল্যাণে যে সকল আসমানী ধর্ম কিংবা ধর্মপ্রবর্তকের আবির্ভাব হয়েছে তন্মধ্যে ইসলামই সবার সেরা এবং হুযূর পুরনূর হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ। মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু, ব্যক্তি জীবন থেকে রাষ্ট্রীয় জীবন, ইহকালীন ও পরকালীন জীবন যাহির-বাতিনের এমন কোন শাখা নেই, এমন কোন বিষয় নেই যার সুন্দরতম ও শ্রেষ্ঠতম বর্ণনা আর সমাধান ইসলাম দেয়নি। এটা পরীক্ষিত সত্য যে, ইসলামের দেয়া সমাধানই চূড়ান্ত ও চিরস্থায়ী। মানবজাতির প্রতি ইসলামের মূল উপদেশ হচ্ছে তাক্বওয়া অবলম্বন করা, খোদাভীতি অর্জন করা অর্থাৎ এটাকে পুঁজি করে মানুষ জীবনের যে কোন কঠিন থেকে কঠিনতর স্তর অতিক্রম করতে পারে।

মানবজীবনে অর্থের গুরুত্ব অপরিসীম। এ অর্থ আবার সকল অনর্থেরও মূল হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, অর্থের চাহিদা পুরণ আর অর্থ ও বিত্তশালী হওয়ার পর মানুষ তার স্বেচ্ছাচারী আচরণ করতে গিয়ে আবার সবধরনের সীমা লঙ্ঘনও করে ফেলে।

ইসলাম এ সংকটাপন্ন মুহূর্তে মানুষকে সাহায্য করে। ইসলাম বুঝিয়ে দিয়েছে অর্থ অনর্থের নয় বরং সর্বপ্রকার কল্যাণ আর পুণ্যার্জনের যথার্থ মাধ্যম। অর্থ উপার্জনের পন্থা আর ব্যয়ের নিয়মও তাকে জানিয়ে দিয়েছে। তাকে বলে দিয়েছে তোমার সকল প্রকার এবাদত-বন্দেগীর পূর্বে তোমাকে দেখতে হবে তুমি যে রোজগার করছো তা বৈধ পথের কিনা? তুমি যে পথে ব্যয় করে আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়ার চেষ্টা করছো তা পবিত্র এবং যথাস্থানে ব্যয় করেছো কিনা? পবিত্র ক্বোরআনে হাকীমে এরশাদ হচ্ছে-

كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا

পবিত্র বস্তু আহার করো এবং সৎকর্ম করো। [সূরা মু'মিনূন, আয়াত-৫১]

كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ

'হে মুমিনগণ! আমার প্রদত্ত পবিত্র বস্তুগুলো খাও এবং আল্লাহর শোকর করো। [সূরা বাক্বারা, আয়াত-১৭২]

اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ

'হে ঈমানদারগণ! নিজেদের পবিত্র উপার্জনগুলো থেকে দান করো। [সূরা বাক্বারা, আয়াত-২৬৭]

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ

তোমরা কখনো পুণ্য লাভ করবে না যতক্ষণ না, আল্লাহর পথে আপন প্রিয় বস্তু ব্যয় করবে। [সূরা আল-ই ইমরান, আয়াত-৯২]

বুঝা গেল, ঈমানদার কেবল ভোগে নয় ত্যাগেই তার মহিমা প্রকাশ করে। এরই মাধ্যমে সে দুনিয়া-আখিরাতে মর্যাদাবান হয়। মনে রাখতে হবে 'তাক্বওয়া' অর্থাৎ খোদাভীতিই এ পথে তার একমাত্র সহায়ক। আল্লাহপাক এরশাদ ফরমান-

اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ

'আল্লাহ তা'আলা তাদের থেকেই ক্ববূল করেন, যাদের মধ্যে আল্লাহ্র ভয় আছে। [সূরা মা-ইদাহ, আয়াত-২৭]

তাক্বওয়া ঈমানদারের অন্তরকে কীভাবে ত্যাগে উদ্বুদ্ধ করে এবং হৃদয় মনে স্পন্দন জাগায় তার নমুনা সাহাবা-ই কেরামের নিম্নোক্ত ঘটনা থেকে সহজেই অনুমান করা যায়-

স্থান মদীন মুনাওয়ারা। মসজিদে নববী শরীফ। অসংখ্য সাহাবা-ই কেরাম চেহারা মলিন ও মাথা নিচু করে বসে আছেন। অনেকের চোখে অশ্রু টলমল করছে। কারণ একটু আগেই সূরা তাওবা শরীফের ৩৪ ও ৩৫ নং আয়াত দু'টি নাযিল হয়েছে। এতে বলা হয়েছে- যারা আল্লাহর পথে ব্যয় না করে স্বর্ণ-রৌপ্য সঞ্চিত করে রাখে তাদেরকে জাহান্নামের এমন বেদনাদায়ক শাস্তি ভোগ করতে হবে যে, সে স্বর্ণ-রৌপ্যগুলো পাত আকারে পরিণত করে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করে তাদের কপালে, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে দাগানো হবে।

সাইয়্যেদুনা হযরত ওমর ফারূক্বে আয'ম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তখন সেখানে ছিলেন না। এখন এসে তিনি দেখতে পেলেন সাহাবা-ই কেরামের অবস্থা। সবাই কান্নাজড়িত কণ্ঠে জানালেন প্রকৃত ঘটনা। তিনি বললেন, চিন্তা নেই আমি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবার থেকেই সমাধান নিয়ে আসছি। রাসূলে আকরাম নূরে মুজাস্সাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝিয়ে দিলেন যে, সম্পদ সঞ্চয় করা না-জায়েয নয়। কারণ আল্লাহ তা'আলা সাহেবে নিসাব মু'মিনদেরকেই যাকাত প্রদানের নির্দেশ এবং সকলের বেলায় মীরাস অর্থাৎ উত্তরাধিকার আইন প্রবর্তন করেছেন, যার প্রথমটি এক বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পর এবং দ্বিতীয়টি যে কারো মৃত্যুর পর সাব্যস্ত হয়। এ সুসংবাদ হযরত ফারূক্বে আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সাহাবা-ই কেরামকে জানালে সবাই শান্ত ও আশ্বস্ত হন। এটা তাঁদের খোদাভীরুতারই পরিচায়ক।[আবু দাউদ ও মিশকাত শরীফ, কিতাবুয্ যাকাত]

আমরা বলেছিলাম ইসলাম মানুষের উপার্জন তথা আয়-রোযগারের যেমন বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে, তেমনি অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রেও তাকে কঠোর নিয়ন্ত্রণে রেখেছে। স্থান-কাল-পাত্র তথা অবস্থা ও ব্যক্তির শ্রেণী অনুসারে আল্লাহ্র রাস্তায় মু'মিনের অর্থব্যয়কে ইসলাম প্রধানতঃ তিনটি নাম ও বিধানে বিভক্ত করে দিয়েছেঃ 'যাকাত', 'সাদক্বাহ্', ও 'ফিত্র'। এখন এগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপ আলোচনা করা হচ্ছে-

যাকাতের বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ ফরমান, ''তারাই কল্যাণ লাভ করে, যারা যাকাত আদায় করে।'' আরও এরশাদ ফরমান, ''তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে, আল্লাহ তা'আলা এর বিনিময়ে আরও দেবেন এবং আল্লাহ তা'আলা উত্তম রুজি প্রদানকারী।'' আরও ফরমান, যে সব লোক কৃপণতা করে তাতে, যা আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মেহেরবাণীতে তাদেরকে দিয়েছেন, তারা যেন এটা মনে না করে যে, তা তাদের জন্য ভাল; বরং এটা তাদের জন্য অকল্যাণকর, ক্বিয়ামতের দিন ওই জিনিষের শৃঙ্খল তাদের গলায় পরানো হবে, যেটার সাথে কৃপণতা করেছিলো।'' আরও ফরমান, ''যেসব লোক সোনারূপা সঞ্চয় করে এবং ওইগুলো আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে ভয়ানক আযাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দাও। যে দিন জাহান্নামের আগুনে জ্বালানো হবে এবং এগুলো দ্বারা তাদের কপালে, দুপার্শ্বদেশে এবং পিঠে দাগানো হবে, তাদের বলা হবে, ''এটা ওটাই, যা তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চয় করে রেখেছিলে। তাই এখন সঞ্চয় করার স্বাদ গ্রহণ কর।'' রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন, ''যে সম্পদ বিনষ্ট হয়, তা যাকাত না দেয়ার কারণেই নষ্ট হয়ে থাকে।'' আরও ফরমান, ''যাকাত প্রদান করে নিজেদের সম্পদসমূহকে মজবুত কিল্লাসমূহের অন্তর্ভুক্ত করে নাও। নিজেদের রোগসমূহের চিকিৎসা সাদক্বা দ্বারা করো এবং বালা-মূসীবত নাযিল হলে প্রার্থনা ও কান্নাকাটি করে সাহায্য কামনা করো।'' আরও ফরমায়েছেন, ''আল্লাহ তা'আলা চারটি জিনিস ফরয করেছেন। সেগুলো হচ্ছে- নামায, যাকাত, রোযা ও হজ্ব।'' আরও ফরমায়েছেন, ''যে যাকাত দেয় না, তার নামায কবূল হয় না।''

[তাবরানী- আওসাত, আবূ দাউদ, ইমাম আহমদ, কবীর]

মাস্আলাঃ যাকাতের পরিমাণ হচ্ছে যাকাতের উপযোগী সম্পদের এক চল্লিশাংশ।

মাস্আলাঃ যাকাত ফরয। এর অস্বীকারকারী কাফির এবং যে তা ফরয জেনেও আদায় করে না সে ফাসিক্ব। আর আদায় করার বেলায় বিলম্বকারী গুনাহগার ও সাক্ষ্য প্রদানের অনুপযোগী। [আলমগীরী ও বাহার]

শরীয়তের পরিভাষায় যাকাত বলা হয়- আল্লাহর ওয়াস্তে কোন মুসলমান ফক্বীরকে সম্পদের শরীয়ত নির্ধারিত একটি অংশের মালিক বানিয়ে দেয়াকে।

মাস্আলাঃ নিছক ভোগ করার অনুমতি দিলে যাকাত আদায় হবে না। যেমন ফক্বীরকে যাকাতের নিয়্যতে খাবার খাওয়ানো হলো। যাকাত আদায় হবে না। কারণ এর দ্বারা মালিক বানিয়ে দেয়া হলো না। তবে যদি খাবার দিয়ে দেয়া হয় এবং তার ইচ্ছে হলে খাবে বা নিয়ে যাবে, তাহলে আদায় হয়ে যাবে। [দুর্রুল মুখতার]

মাস্আলাঃ মালিক করার জন্য এটাও প্রয়োজন যে, এমন লোককে যাকাত দেবে,

যে গ্রহণ করতে জানে। অর্থাৎ এমন কাউকে যেন দেয়া না হয়, যে ফেলে দেবে বা ধোঁকা খাবে। এমনটি হলে যাকাত আদায় হবে না। যেমন ছোট শিশু বা পাগলকে যাকাত দিলে আদায় হবে না। যে শিশুর গ্রহণ করার মত জ্ঞান হয় নি, তার পক্ষে তার গরীব পিতা গ্রহণ করতে পারে বা ওই শিশুর যিম্মাদার বা ওই শিশুর লালন পালনকারী গ্রহণ করতে পারে। [দুর্রুল মুখতার]

মাস্আলাঃ যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছেঃ ১. মুসলমান হওয়া, ২. বালেগ হওয়া, ৩. বিবেকবান হওয়া, ৪. পূর্ণভাবে মালিক হওয়া, ৫. নেসাব ঋণমুক্ত হওয়া, ৬. নেসাব ব্যবহারিক সামগ্রীর অতিরিক্ত হওয়া। সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য অথবা সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ অথবা এর সমপরিমাণ টাকা, ৭. সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়া ও ৮. এক বছর অতিবাহিত হওয়া।

'যাকাত' শাব্দিকভাবে 'বৃদ্ধি পাওয়া', 'পবিত্রতা লাভ করা', 'প্রাচুর্য বা বরকতমণ্ডিত হওয়া' ইত্যাদিকে বুঝায়। যাকাত দ্বারা যাকাতদাতার সম্পদে যেমন পবিত্রতা ও বৃদ্ধি আসে তেমনি আত্মারও পরিশুদ্ধতা লাভ হয় বিধায় যাকাতকে যাকাত বলা হয়। এ প্রসঙ্গে পবিত্র ক্বোরআন বলছে-

خُذۡ مِنۡ اَمۡوَالِهِمۡ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيۡهِمۡ بِهَا

'হে মাহবূব! তাদের সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ করুন, যা দ্বারা আপনি তাদেরকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করবেন।'' [সূরা তাওবা, আয়াত-১০৩]

يَمۡحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرۡبِى الصَّدَقٰتِ

আল্লাহ তা'আলা ধ্বংস করেন সুদকে আর (উভয় জগতে) বর্ধিত করেন (সাদক্বা-যাকাত ইত্যাদি) দানকে। [সূরা বাক্বারা, আয়াত-২৭৬]

وَمَاۤ اَنۡفَقۡتُمۡ مِّنۡ شَیۡءٍ فَهُوَ يُخۡلِفُهٗ

'আর যা কিছু তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করো, তিনি তার পরিবর্তে আরো অধিক দেবেন।' [সূরা সাবা, আয়াত-৩৯]

পরিভাষায়-মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত সম্পদের একাংশ মুসলিম দরিদ্র ব্যক্তিকে বিনা স্বার্থে প্রদান করে মালিক বানিয়ে দেয়ার নাম 'যাকাত'। হিজরতের পর দ্বিতীয় সালে যাকাত ফরয ও সবিস্তারে প্রবর্তিত হয়।

কিছু জরুরী মাসায়েল

মাসআলাঃ যাকাত ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভের একটি। যাকাত ফরয। যাকাত অস্বীকারকারী কাফির। স্বেচ্ছায় আদায় না করা ফাসেক্বী, এটা ক্বতলযোগ্য অপরাধ। সময়মত আদায় না করাও গুনাহ্। শরীয়তে এমন ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

[বাহারে শরীয়ত, যাকাত অধ্যায় থেকে]

মাস্আলাঃ বছর শেষে এ নিয়্যতে মূল সম্পদ থেকে কিছু মাল আলাদা করে রাখলেই যাকাত আদায় হবে না, যতক্ষণ ফক্বীর-মিস্কীনকে মালিক বানানো হবে না। এভাবে ফক্বীরকে যাকাতের নিয়্যতে আহার করালে বা কোন ঘরে বসবাস করতে দিলেও যাকাত আদায় হবে না। যেহেতু প্রদত্ত সম্পদের মালিক বানানো হয়নি। হ্যাঁ, যদি খাদ্যবস্তু দিয়ে দেয়, যা সে ইচ্ছে হলে খাবে কিংবা নিয়ে যাবে, এভাবে পরিধানের কাপড় দিলেও যাকাত আদায় হবে। [বাহারে শরীয়ত, যাকাত অধ্যায় থেকে]

মাস্আলাঃ যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্যে কিছু পূর্বশর্ত রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে-

১. মুসলমান হওয়া। সুতরাং অমুসলিমের উপর যাকাত ফরয নয়। তেমনি কোন কাফির ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে কাফির থাকাকালীন সময়ের যাকাত দিতে হবে না।

২. বালেগ হওয়া। অতএব, না-বালেগের সম্পদের যাকাত নেই।

৩. আক্বল বা জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া। অতএব, সারা বছর পাগল অবস্থায় থাকা ব্যক্তির উপর ওই বছরের যাকাত ওয়াজিব নয়।

৪. আযাদী বা স্বাধীনতা। তাই দাস-দাসী, মা'যূন কিংবা মুকাতাব-কারো সম্পদে যাকাত ওয়াজিব নয়।

৫. সম্পদ নিসাব পরিমাণ হওয়া।

৬. নিসাব পরিমাণ সম্পদ পূর্ণ মালিকানা এবং আয়ত্বে থাকা।

৭. এ নিসাব পরিমাণ অর্থ কর্জের অতিরিক্ত হওয়া।

৮. জীবন ধারণে নিত্যপ্রয়োজনীয় সম্পদেরও অতিরিক্ত হওয়া।

৯. সম্পদ প্রবৃদ্ধিমূলক হওয়া। যেমন স্বর্ণ-চাঁদি, ব্যবসার মাল এবং সা-ইমাহ্ অর্থাৎ এমন সব গৃহপালিত জন্তু, যেগুলো স্বাধীনভাবে চারণভূমিতে বিচরণ করে ঘাস খেয়ে বেড়ায় এবং মালিকের পক্ষ থেকে কোন ব্যয় নির্বাহ করতে হয় না। মালিক সেগুলো দিয়ে চাষাবাদও করেনা।

১০.নিসাব পরিমাণ সম্পদে পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হওয়া। বছরের প্রারম্ভে ও শেষে নিসাব পরিপূর্ণ হয়েছে; কিন্তু মাঝখানে ঘাটতি হলে তা ধর্তব্য নয়।

মাস্আলাঃ যাকাত আদায়কালীন কিংবা যাকাতের মাল পৃথক করার সময় নিয়্যত করা পূর্বশর্ত। কেউ সারা বৎসর নিয়্যতবিহীন দান-খয়রাত করতে থাকলে আর বৎসরান্তে যাকাতের নিয়্যত করলে যাকাত আদায় হবে না।

নেসাব ও তদনুযায়ী যাকাতের পরিমাণ

১. স্বর্ণ ও রৌপ্যের যাকাতের নেসাব

স্বর্ণ ও রৌপ্য ব্যবসায়িক হোক কিংবা ব্যবহারিক হোক, নেসাব পরিমাণ হলে সর্বাবস্থায় যাকাত ওয়াজিব। সর্বসম্মতিক্রমে স্বর্ণের যাকাতের নেসাব ২০ মিসক্বাল বা ৭½ (সাড়ে সাত তোলা) তথা ৮৭.৪৫ গ্রাম। এর কম পরিমাণ স্বর্ণে (যদি যাকাত

যোগ্য অন্য কোন মাল না থাকে) যাকাত নেই। নিসাব পরিমাণ স্বর্ণ পূর্ণ এক বছর কারো মালিকানায় থাকলে অর্ধ মিসক্বাল অর্থাৎ চল্লিশ ভাগের এক ভাগ স্বর্ণ অথবা তৎপরিমাণ সম্পদ বা অর্থ যাকাত হিসেবে ওয়াজিব হবে। এটাই স্বর্ণের একক হিসাব।

রৌপ্যঃ সকল ওলামা ও ফোক্বাহার ঐকমত্যে রূপার নেসাব হচ্ছে পাঁচ আওক্বিয়া বা দু'শ দিরহাম অর্থাৎ সাড়ে ৫২ তোলা তথা ৬১২.২৫ গ্রাম। এর কম পরিমাণে রৌপ্যের যাকাত নেই। এ পরিমাণ চাঁদিতে ৫ দিরহাম এবং এর চেয়ে বর্ধিত হলে প্রতি চল্লিশ দিরহামে এক দিরহাম করে বৃদ্ধি হবে। স্বর্ণ ও রৌপ্য কোনটা নেসাব পরিমাণ না থাকলে এবং যাকাত যোগ্য কোন প্রকার নগদ অর্থও না থাকলে উভয়ের সংমিশ্রণে অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণ অর্থাৎ সাড়ে ৫২ তোলা রৌপ্যের সমান মূল্যমান দাঁড়ালে সেটাই নেসাব হিসেবে সাব্যস্ত হবে। এ ছাড়া সকল নগদ টাকা-পয়সা রৌপ্যের নেসাবের সমমূল্য হলে তার চল্লিশভাগের একাংশ যাকাত আদায় করতে হবে।

২. গরু ও ছাগলের বিধান

যে সব গরুর খাদ্য আর পানীয়ের ব্যয়ভার মালিক বহন করে এবং গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহৃত হয়, এমন গরুতে যাকাত নেই। যদিও এর সংখ্যা অনেক হয়।

পক্ষান্তরে, যে সব গরু স্বাধীনভাবে চারণভূমিতে বিচরণ করে ঘাস খেয়ে বেড়ায়, মালিকের পক্ষ থেকে ব্যয় নির্বাহ করতে হয় না, সেগুলো দিয়ে চাষাবাদও করে না। এমন গরুর সংখ্যা ৩০টি হলে যাকাত দিতে হয়। প্রতি ৩০ টি গরুর জন্যে একটি ১ বছর বয়সের এবং ৪০টির জন্যে ২ বছর বয়সের মাদী বাছুর যাকাত দিতে হয়।

ছাগলঃ ছাগল ৪০টির কম হলে যাকাত নেই। ৪০ থেকে ১২০টি পর্যন্ত ছাগল থাকলে ১ বছরের একটি ছাগী, এর উপরে ২০০ পর্যন্ত সংখ্যার জন্য দু'টি ছাগল এবং ২০১ থেকে ৩৯৯ পর্যন্ত সংখ্যা হলে তিনটি আর ৪০০টি পূর্ণ হলে ৪টি এরপর প্রতি শতানুযায়ী একটি করে ছাগল যাকাত দিতে হবে।

উটঃ কমপক্ষে পাঁচ (৫)টি উট কারো মালিকানায় এক বৎসর যাবৎ থাকলে একটি ছাগল যাকাত হিসেবে দিতে হয়। গরু, ছাগল, উট, ঘোড়া, গাধা ইত্যাদি ব্যবসার মাল হলে যে কোন সংখ্যার জন্য বছরান্তে রৌপ্যের নেসাব অনুযায়ী মূল্যমান হিসেব করে চল্লিশ ভাগের এক অংশ যাকাত আদায় করবে।

৩. ফসল-শস্য ইত্যাদি

জমিকে সাধারণতঃ দু'ভাগে বিভক্ত করে এর বিধান দেয়া হয়েছে।

১. জমি যদি প্রাকৃতিকভাবেই সিক্ত ও উর্বর হয়, তবে তাতে উৎপাদিত ফসলের ১০

ভাগের ১ অংশ অর্থাৎ 'ওশর' ওয়াজিব হয়।

২. যদি চাষীকে নিজেই সেচ দিয়ে সিক্ত করে এবং কৃত্রিম উপায়ে উর্বর বানিয়ে ফসল ফলাতে হয়, তখন উৎপাদিত ফসলের ২০ ভাগের ১ অংশ দিতে হয়। শস্যদানা সাধারণতঃ ব্যবসার পণ্য হলে বৎসর শেষে পাঁচ ওয়াসাক্ব (যা দেশীয় ওজনে প্রায় ৩৩ মণ এবং প্রচলিত ওজনে ১২৩০ কে.জি) বিদ্যমান থাকলে রৌপ্যের নেসাব অনুযায়ী মূল্য নির্ধারণ করে ৪০ ভাগের ১ অংশ যাকাত হিসেবে আদায় করবে।

যাকাতের খাতসমূহ

এ বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। প্রিয়তম রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে কতটা কঠোরতা অবলম্বন করতেন তা নিম্নলিখিত একটি হাদীসে পাকের বর্ণনা থেকে সহজেই অনুমান করা যায়ঃ

"হযরত যিয়াদ ইবনুল হারেস আস্‌সুদা'ঈ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন, জনৈক সাহাবী রাসূলে পাকের দরবারে এসে যাকাতের জন্য প্রার্থনা করলেন। রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে (সুস্থ সবল দেহবিশিষ্ট দেখে) বললেন, দেখ যাকাতের খাত নির্ধারণ আল্লাহ তা'আলা কোন নবী কিংবা অন্য কারো হাতে না রেখে নিজেই আটটি ভাগে ভাগ করে দিয়েছেন। তুমি সে আট প্রকারের অন্তর্ভুক্ত থাকলে আমি তোমাকে যাকাতের অংশ দিতে পারি; অন্যথায় নয়।" [আবূ দাউদ ও মিশকাত শরীফ- কিতাবুয্ যাকাত]

যাকাতের ব্যয়ের খাতসমূহ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র ক্বোরআনে এরশাদ ফরমাচ্ছেন-

اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَاكِيْنَ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِىْ الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِنَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

তরজমাঃ "যাকাততো এ সব লোকেরই জন্যে, যারা অভাবগ্রস্ত, নিতান্ত নিঃস্ব, যারা তা সংগ্রহ করে আনে, যাদের অন্তরসমূহকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করা হয়, ক্রীতদাস মুক্তির ক্ষেত্রে, ঋণগ্রস্তদের জন্যে, আল্লাহর পথে এবং মুসাফিরদের জন্যে। এটা আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। আর আল্লাহপাক সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

[সূরা তাওবা, আয়াত-৬০]

উদ্ধৃত আয়াতের আলোকে যাকাত বন্টনের আটটি খাত নিম্নরূপ-

১. ফক্বীরঃ অর্থাৎ যার সামান্য সম্পদ আছে কিন্তু তা দ্বারা সারা বৎসরের ব্যয় নির্বাহ্ হয় না। এক কথায় নেসাব পরিমাণের চেয়ে নিতান্ত কম সম্পদের মালিক যাকাত পাওয়ার উপযুক্ত।

২. মিসকীনঃ যার কিছুই নেই, একেবারে নিঃস্ব, তাকে মিসকীন বলে। এদেরকে যাকাত দেয়া যাবে।

৩. আমিলঃ অর্থাৎ যাকাত সংগ্রহের কার্যে নিয়োজিত ব্যক্তি। যাকাত থেকে তাঁদের বেতন-ভাতা প্রদান করা যাবে।

৪. মন আকৃষ্টকরণঃ ইসলামের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কোন অমুসলিমকে অথবা দ্বীন ও ইসলামের উপর অটল থাকার জন্যে নও মুসলিমকে যাকাতের অর্থ প্রদান করা যাবে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এ খাতটি পরিপূর্ণভাবে প্রচলিত থাকলেও পরবর্তীতে ইসলামের ব্যাপকতার ফলে কেবল নও মুসলিমদের ক্ষেত্রটি চালু রয়েছে, যদি তারা অভাবগ্রস্থ হয়; কিন্তু প্রথমোক্তটি রহিত হয়ে গেছে।

৫. দাস মুক্তিঃ মালিকের সাথে নির্দিষ্ট অংকের টাকার বিনিময়ে নিজেকে মুক্ত করে নেয়ার শর্তে চুক্তিবদ্ধ (পরিভাষায় 'মুকাতাব') দাসকে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে।

৬. ঋণ মুক্তিঃ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে কর্জমুক্ত করতে যাকাতের অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করা যাবে।

৭. আল্লাহর পথেঃ যুদ্ধ-সামগ্রী শূন্য যোদ্ধা, যারা সাজ-সরঞ্জাম ও প্রয়োজনীয় বাহনের অভাবে জিহাদে অংশ নিতে পারছে না। যাকাত থেকে তাদেরকে সাহায্য করা যাবে।

৮. মুসাফিরঃ নিজ বাসস্থানে ধনী, কিন্তু সফরে এসে রিক্তহস্ত হয়ে গেছে। এ ধরনের মুসাফিরকেও যাকাতের অর্থ দেয়া যাবে।

পবিত্র ক্বোরআন ও হাদীসের আলোকে যাকাত প্রবর্তনের হিকমত ও ফযীলত

মানবতার কল্যাণের ধর্ম ইসলাম। এর প্রতিটি বিধান প্রবর্তনের ক্ষেত্রে রয়েছে অপরিসীম গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য। যাকাতও ইসলামের অন্যতম বিধান। এর গুরুত্ব ও মহিমাগুলো দেখলে সত্যিই অভিভূত হতে হয়। এ প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করা হচ্ছে-

১. পবিত্র ক্বোরআনে মুত্তাক্বীদেরকে বেহেশতের উত্তরাধিকারী বলা হয়েছে, আর যাকাত দান করাকে মুত্তাক্বী হওয়ার আলামত বলা হয়েছে, যেমন-

١ . تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِىْ نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ

তরজমাঃ ওই জান্নাত, যার আমি আমার বান্দাদের থেকে তাকেই ওয়ারিস (মালিক) করি, যে মুত্তাক্বী এবং যারা আমার প্রদত্ত সম্পদ থেকে (আমার পথে) ব্যয় করে।

২. যাকাত প্রদানের মাধ্যমে বান্দা সম্পদে এবং আত্মিকভাবে তথা যাহির ও বাতিনে পবিত্রতা অর্জন করতে পারে। যেমন ক্বোরআনের বাণী-

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا

তরজমাঃ হে হাবীব! আপনি তাদের থেকে যাকাত ক্বূল করুন, যা দ্বারা তাদেরকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করবেন। [৯:১০৩]

৩. যাকাত দ্বারা সম্পদ বৃদ্ধি পায়। আল্লাহপাক ইরশাদ ফরমাচ্ছেন-

وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ

তরজমাঃ এবং তিনি সাদক্বাহ্গুলোকে বর্দ্ধিত করেন।

وَمَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ

তরজমাঃ তোমরা যা কিছু ব্যয় করো, তাকে তিনি বর্দ্ধিত করে অবশিষ্ট রাখেন।

৪. হাদীসে পাকে রয়েছে-

مَانَقَصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ

অর্থাৎ যাকাতের কারণে সম্পদ কমে না।

৫. যাকাতের বিধান চালু থাকলে ধনীদের পাশাপাশি গরীবরাও সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করতে পারে। কারণ যাকাত আদায়ের ফলে কারো সম্পদ কুক্ষিগত থাকে না। পবিত্র ক্বোরআন বলছে-

كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ

তরজমাঃ যাতে তা তোমাদের ধনীদের সম্পদ না হয়ে যায়। [৫৯:৭]

৬. রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান-

تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَآئِهِمْ فَتُرَدُّ عَلٰى فُقَرَآئِهِمْ

অর্থাৎ তাদের মধ্যে ধনীদের নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে অতঃপর তোমাদের গরীবদের মধ্যে ফেরানো হবে।

৭. হাদীসে পাকে আরো এসেছে-

اَلزَّكٰوةُ قَنْطَرَةُ الْاِسْلَامِ

অর্থাৎ যাকাত ইসলামের সেতু।

৮. যাকাত জনকল্যাণমূলক কাজের সহায়ক। এতে মানুষের লোভ-লালসা নিবারিত হয়। যাকাত চরিত্র সংশোধনে সাহায্য করে। এ বিষয়ে পবিত্র হাদীস থেকে একটি আকর্ষণীয় ঘটনা দেখুন-

বুযর্গ সাহাবী হযরত সাইয়েদুনা আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু প্রিয়তম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, পূর্ববর্তী উম্মতের জনৈক খোদাভীরু ব্যক্তি একদিন মনে মনে সংকল্প করলেন রাতের অন্ধকারে অতি

সংগোপনে আল্লাহর পথে দান করবেন। তিনি গভীর নিশিতে যাকাতের অর্থ নিয়ে কোন উপযুক্ত পাত্রের খোঁজে বের হয়ে পড়লেন। অনেক ঘোরাঘুরির পর আঁধারে বসে থাকা এক ব্যক্তিকে দেখতে পেয়ে সঠিক পাত্র মনে করে টাকাগুলো তাকে দিয়ে দ্রুত সরে পড়লেন। ভাগ্যের পরিহাস! লোকটা ছিলো একজন চোর। চুরির আশায় সে ওখানে ওঁৎপেতে বসেছিলো। বিনাশ্রমে এতগুলো টাকা পেয়ে সে সত্যিই আশ্চর্যান্বিত হলো। খুশীতে সে চুরি না করেই চলে গেলো। পরদিন যে কোন ভাবে এটা লোক মুখে রটে গেলো যে, গত রাতে এক ব্যক্তি এক চোরের হাতে প্রচুর যাকাতের টাকা দিয়ে চলে গেছে। এ রটনা ওই দানশীল ব্যক্তির কানে গেলে তিনি এ ভেবে বড়ই অনুতপ্ত হলেন যে, 'আমার দানগুলো চোরের হাতেই গেলো!'

পরদিন আবার সংকল্প করে, রাতের অন্ধকারে বের হয়ে পড়লেন। অনেক দূর হাঁটতে হাঁটতে, খদ্দেরের আশায় অপেক্ষমান এক ব্যভিচারিণী পতিতাকে উপযুক্ত মনে করেই মালগুলো দিয়ে চলে এলেন। পরদিন বলাবলি শুরু হয়ে গেল এক ব্যক্তি এক বেশ্যা রমণীর হাতে যাকাতের টাকা দিয়ে গেছে! লোকটা আজও এ ভেবে বড়ই মর্মাহত হলেন যে, টাকাগুলো দিলাম তো একজন নষ্টা মেয়েকেই দিলাম!

আল্লাহর উপর ভরসা করে গোপনে দান করার আশায় তৃতীয় রজনীতে তিনি আবার বের হয়ে পড়লেন। আজ বহু যাচাই বাছাই করছেন। শেষ পর্যন্ত রাতের শেষ ভাগে এক ব্যক্তিকে যথাযথ পাত্র হিসেবে চিহ্নিত করলেন। অতি সন্তর্পণে তার হাতে টাকাগুলো দিয়ে ফিরে এলেন। লোকটা ছিল এলাকার কৃপণ শ্রেণীর এক ধনাঢ্য ব্যক্তি। পরদিন চতুর্দিকে রটে গেলো, এক ধনীর হাতে (অর্থাৎ অনুপযুক্ত লোকের হাতেই) যাকাতের টাকা দেয়া হয়েছে।

লোকটা ক্ষোভে-দুঃখে অনুশোচনা করে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করলেন, "হে আল্লাহ তোমারই শোকর। তোমার হিকমত বুঝতে পারছিনা। এত যাচাই করার পরও চোর, যেনাকারিণী আর একজন ধনীর হাতেই আমার যাকাতগুলো দিলাম।" তিনি 'এলহাম' (স্বর্গীয় প্রেরণা) প্রাপ্ত হলেন, "তোমার চিন্তার কোন কারণ নেই। যেহেতু তোমার এ বদান্যতা ও গোপন দান তারা তিনজনেরই জীবন-চাকা ঘুরিয়ে দিয়েছে। চোর তার চৌর্যকর্ম, এবং ব্যাভিচারীনী পতিতাবৃত্তি ছেড়ে সারা জীবনের জন্যে সৎ বনে গেছে আর কৃপণ ধনী ব্যক্তিটি বুঝতে পেরেছে দানশীলতার মাহাত্ম্য। [মিশকাত শরীফ, বাবুল ইনফাক্ব]

৯. মহান আল্লাহর বাণী-

وَفِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ لِلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ

অর্থাৎ 'ধনীদের সম্পদে দরিদ্র ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে।' একমাত্র বাধ্যতামূলক এ যাকাতের বিধান দ্বারাই এটা প্রতিষ্ঠিত হয়।

১০. যাকাত ব্যবস্থার কার্যকর বাস্তবায়নে সমাজ ও রাষ্ট্রে সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থনীতি গড়ে ওঠার ফলে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, ছিনতাই, খুনখারাবী বন্ধ হয়ে যায়। সমাজে যাকাতদাতার একটি সম্মানজনক অবস্থান সৃষ্টি হয়। এক কথায় সুষম অর্থনৈতিক বন্টন, সামাজিক উন্নয়ন, রাষ্ট্রে পারস্পরিক ভারসাম্য ও স্থিতিশীলতা রক্ষার ক্ষেত্রে যাকাতের সুদূর প্রসারী ভূমিকার কথা কে অস্বীকার করতে পারে?

যাকাত না দেয়ার কুফল

যাকাত না দেয়ার ফলে বৈষয়িকভাবে সমাজে যেসব বিপর্যয়ের সৃষ্টি হতে পারে তাতো দিবাকরের ন্যায় সুস্পষ্ট। যেমন- ধনীদের সম্পদে গরীবের নির্ধারিত যে হক্ব রয়েছে, তা প্রতিষ্ঠিত হয় না। ফলে সম্পদ একটা বিশেষ শ্রেণীর হাতেই কুক্ষিগত হয়ে যায় এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থনীতি থাকে না বিধায় একটি নিয়ন্ত্রণহীন অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। যাতে করে একদিকে ধনাঢ্য সবল শ্রেণীর লোকেরা দরিদ্র দুর্বল শ্রেণীর মানুষের প্রতি স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে। অন্যদিকে গরীব জনগোষ্ঠি দারিদ্রের নিষ্পেষণে অতীষ্ঠ হয়ে বেপরোয়া হয়ে ওঠে এবং চুরি-ডাকাতি রাহাজানি, ছিনতাই, খুনখারাবীসহ অবর্ণনীয় চারিত্রিক পদস্খলনের শিকার হয়ে নানা ধরনের পাপাচারের দিকে ধাবিত হয়। এভাবে গোটা সমাজটা চর্তুমুখী অন্যায় ও অনাচারের আখড়ায় পরিণত হয়ে ধ্বংসের মুখে পতিত হয়।

এছাড়াও পবিত্র ক্বোরআন ও হাদীসে যাকাত না দেয়ার ফলে ইহকালীন ও পরকালীন যে সব অকল্যাণ ও দুর্বিসহ যন্ত্রণার সুবিস্তৃত বর্ণনা এসেছে তার কিঞ্চিত তুলে ধরা হচ্ছে-

১. যাকাত না দেয়ার ফলে আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট হন এবং পরকালে তার ঠিকানা হবে জাহান্নামে। এরশাদ হচ্ছে-

اَلَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ

তরজমাঃ "যারা (যাকাত ও ওয়াজিব সাদাক্বাদি আল্লাহর রাস্তায় পরিশোধ না করে অবৈধভাবে) স্বর্ণ ও রৌপ্য সঞ্চিত করে রাখে, তাদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তির সুসংসবাদ শুনিয়ে দিন। [সূরা তাওবা, আয়াত-৩৪]

এ বেদনাদায়ক শাস্তির বর্ণনা সত্যিই ভয়ঙ্কর! নিম্নোল্লিখিত আয়াত এবং হাদীসগুলো গভীর মনযোগ দিয়ে পড়ুন-

يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ ـ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ

তরজমাঃ "যেদিন তা উত্তপ্ত করা হবে জাহান্নামের আগুনে, অতঃপর তা দ্বারা দাগ দেওয়া হবে তাদের ললাটগুলোতে এবং পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশগুলোতে, (বলা হবে) এটা হচ্ছে তাই, যা তোমরা নিজেদের জন্যে পুঞ্জীভুত করে রেখেছিলে। এখন এ পুঞ্জীভূত করার স্বাদ গ্রহণ করো। [সূরা তাওবা, আয়াত-৩৫]

সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী প্রখ্যাত সাহাবী সাইয়েদুনা হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, প্রিয়তম রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা যাকে ধনসম্পদ দান করেছেন, কিন্তু সে তার যাকাত আদায় করে নি; ক্বিয়ামত দিবসে তার সম্পদকে এমন এক বিষধর সাপে রূপান্তর করা হবে, যা অত্যধিক বিষাক্ত হওয়ার কারণে তার মাথার পশম থাকবেনা এবং চোখের উপর দুটি কালো তিলক থাকবে।

ক্বিয়ামতের দিন ওই সাপ তার গলায় হারের ন্যায় পরিয়ে দেয়া হবে। সাপটি তার মুখের উভয় চোয়ালে কামড় দিয়ে ধরবে এবং বলবে,'আমিই তোমার ধনসম্পদ, আমিই তোমার সঞ্চিত ধন ভান্ডার।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সমর্থনে পবিত্র ক্বোরআনের এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন-

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ ـ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ـ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

অর্থাৎ "আর যারা কার্পণ্য করে (আল্লাহ ও বান্দার হক্ব নিয়ে) ওই জিনিসের মধ্যে, যা আল্লাহ তাদেরকে আপন করুণা থেকে (ধন সম্পদ বা জ্ঞানাকারে) দান করেছেন, তারা কখনো যেন ওই কৃপণতাকে নিজেদের জন্য মঙ্গলজনক মনে না করে; বরং সেটা তাদের জন্য অকল্যাণকর। তারা যে সব সম্পদের মধ্যে কার্পণ্য করেছিলো অচিরেই ক্বিয়ামতের দিন সেগুলো তাদের গলার শৃঙ্খল হবে এবং আল্লাহ তা'আলাই নভোমন্ডল ও ভুমন্ডলের স্বত্ত্বাধিকারী। আর আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবগত। [সূরা আল-ই ইমরান, আয়াত-১৮০]

হযরত ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম আলায়হিমার রাহমাহ্ মশহুর সাহাবী হযরত আবূ যার গিফারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সূত্রে বর্ণনা করছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে কোন উট, গরু কিংবা ছাগল ও ভেড়ার মালিকের নেসাব হওয়া সত্বেও যাকাত আদায় করবে না, ক্বিয়ামতের দিন ওইগুলোকে পূর্বের চেয়েও অধিক বিরাট ও মোটা তাজা অবস্থায় উপস্থিত করা হবে। তারা ক্বিয়ামত দিবসের শেষ অবধি একের পর এক দলে দলে মালিককে

পায়ের ক্ষুর দ্বারা দলিত-মথিত আর শিং এর আঘাতে জর্জরিত করতে থাকবে।

২. সম্পদের যাকাত আদায় না করলে হারাম ও হালালে মিশ্রণ ঘটে যায়। ফলে এ অবৈধ মালের মিশ্রণ বৈধ মালকেও ধ্বংস করে দেয়। যেমন-

উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করতে শুনেছি, তিনি প্রায়শ বলতেন, যাকাতের মাল যে সম্পদের সাথে মিশ্রিত হয় (ফরয যাকাত আদায় না করার কিংবা সামর্থ্যবান ব্যক্তি লোভের বশীভূত হয়ে অহেতুক যাকাত গ্রহণ করার মাধ্যমে) সেটা ওই সম্পদকে ধ্বংস করে দেয়। অর্থাৎ হারামের মিশ্রণ হালালকেও ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়।

৩. সর্বোপরি অস্বীকারবশতঃ স্বেচ্ছায় যাকাত না দেওয়া কৃতলযোগ্য অপরাধ এবং কুফরীর শামিল। ইসলামের প্রথম খলীফা মানবকুলে আম্বিয়ায়ে কেরামের পরে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সাইয়্যেদুনা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্বে আকবর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু প্রিয়তম রাসূলের ওফাত শরীফের পর যখন খিলাফতের দায়িত্ব নিলেন তখন খাঁটি ও নির্ভেজাল মু'মিনদের থেকে পৃথক হয়ে তিনটি দল স্বস্ব চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করলো। এক দল সরাসরি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে মুর্তাদ্দ্ হয়ে গেলো। দ্বিতীয় দল মুর্তাদ্দ হল ভণ্ড নবী হয়ে, যেমন- আসওয়াদ আনাসী, মুসাইলামা কায্যাব প্রমুখ এবং তাদের অনুসারী হয়ে আর তৃতীয় দল মুর্তাদ্দ্ হল নিজেদেরকে মুসলমান পরিচয় দেয়ার আড়ালে ইসলামের একটি জরুরী বিষয় 'যাকাত' অস্বীকার করার মাধ্যমে। খলীফাতুর রাসূল এদের সকলের বিরুদ্ধে সফল জিহাদ করেছেন; কিন্তু সবার আগে জিহাদ ঘোষণা করেছেন শোষোক্ত অর্থাৎ যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে। যেহেতু এরা ছিলো 'ঘরের শত্রু বিভীষণ'। তাই ইসলাম ও মুসলিম মিল্লাতকে মুক্ত ও সাবধান করা সত্যিই জরুরী ছিলো। প্রথম প্রথম বাহ্যিকভাবে যাঁরা খলীফার সাথে দ্বিমত পোষণ করেছিলেন তাঁরাও-শেষ পর্যন্ত খলীফার অটল ও নির্ভুল সিদ্ধান্তের দিকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং তাঁর প্রশংসা করেছেন। খলীফাতুর রাসূল ঘোষণা করলেন-বিশাল অংকের যাকাত নয় বরং একটি ছাগলের ছোট বাচ্চাও যদি যাকাতের হিসেবে আসে, আর তা পরিশোধ করতে কেউ অস্বীকার করে, তার বিরুদ্ধেও আমি জিহাদ ঘোষণা করলাম। কারণ, 'যাকাত'ও ইসলামের হক্ব। ওই হক্ব কাউকেও ধ্বংস করতে দেয়া হবে না।

----<>----

হজ্জে বায়তুল্লাহ্

হজ্জ ইসলামের অন্যতম বুনিয়াদী ইবাদত। আল্লাহ-প্রেমের পরম নিদর্শন এবং এক ব্যতিক্রমধর্মী ইবাদত এ হজ্জ্। ইসলামের সকল ইবাদত-নামায, রোযা, যাকাত, জিহাদ, সাদক্বাহ্-খয়রাত, যিক্র-আয্কার এবং তরীক্বতের সবক্ব পালন ইত্যাদি সর্বত্র আদায়যোগ্য। কিন্তু হজ্জ ব্যতিক্রম। এটা একমাত্র নির্দিষ্ট মওসুমে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মেহমানরূপে মর্যাদাবান হয়ে খানায়ে কা'বা বায়তুল্লাহ শরীফে উপস্থিত হয়েই শুধু আদায় করা যায়।

কোন কোন ইবাদত দৈহিক; যেমন, নামায, রোযা, যিক্র-আয্কার; আর কোন কোন ইবাদত মালী বা আর্থিক; যেমন, যাকাত-ফিতরা, সাদক্বাহ-খায়রাত ইত্যাদি। কিন্তু হজ্জ এমন একটি ইবাদত, যা শারীরিক শ্রম এবং আর্থিক ক্বোরবানী উভয়ের সমন্বয়ে আদায় করতে হয়। অন্যান্য সকল ইবাদত-রিয়াযতে আনুগত্যের প্রাধান্যই পরিদৃষ্ট হয়, আর হজ্জে বায়তুল্লাহ্র বিধি-বিধান পালনকালে আল্লাহর প্রেমের প্রাধান্যই পরিলক্ষিত হয়। তাই হজ্জে মাক্ববূলের প্রতিদান হলো জান্নাত।

হজ্জ্ এমন একটি আমল, যার বদৌলতে আন্তর্জাতিক ইসলামী ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব এবং সংহতিও সূচিত হয় বিশ্ব মুসলিমের মধ্যে। কেননা, প্রতি বছর নির্দিষ্ট তারিখে নির্দিষ্ট সময়ে লক্ষ-লক্ষ মু'মিন নর-নারী আরাফাত, মিনা-মুয্দালিফায় সমবেত হয়ে এক আল্লাহ্র মহত্ব, বড়ত্ব ও গুণগানে মত্ত হয়ে উঠে। ভাষা-বর্ণ-বাসভূমি ইত্যাদি কারণে বিক্ষিপ্ত মুসলিম মিল্লাত হজ্জের বরকতে ও বদৌলতে আরাফাতের ময়দানে একক মুসলিম জাতি-সত্তায় পরিণত হয়। এভাবেই বিশ্ব মুসলিম-ঐক্যের ভিত্ সুদৃঢ় ও সুসংহত হয়। হজ্জ্ এমন একটি গুরুত্ববহ রিয়াযত, যার বরকতে মানব হৃদয়ে বিনয়, নম্রতা ও কোমলতা আর চরিত্রে পবিত্রতা-পরিশুদ্ধি অর্জিত হয়, যা হজ্জে মাকবূলেরই নমুনা ও নিদর্শন। এহেন অপরিসীম পার্থিব ও পারলৌকক কল্যাণ-মঙ্গল ও উপকার নিহিত রয়েছে পবিত্র হজ্জে বায়তুল্লাহর মধ্যে। এজন্য ক্বোরআনে করীমের অনেক আয়াতে এবং হাদীসে নবভী শরীফের অনেক রেওয়ায়তে বারংবার তাগিদ দেয়া হয়েছে সামর্থ্যবান মু'মিন নর-নারীর প্রতি হজ্জ সম্পন্ন করার বিষয়ে।

হজ্জের সংজ্ঞা

পবিত্র ক্বোরআনে করীম এবং হাদীসে নবভী শরীফে 'হজ্জ্' (حــج) শব্দটি 'হা' তে যবর ও যের সহকারে, অর্থাৎ- حَج এবং حِج উভয়রূপে উল্লিখিত হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, হজ্জ শব্দটি যবর যোগে 'মাসদার' (ক্রিয়ামূল) আর যের সহকারে ইসম বা বিশেষ্য। আবার কোন কোন মুহাক্বক্বিক্ব্ বলেন, যবর সহকারে হজ্জ শব্দটি

‘ইস্ম’ বা বিশেষ্য এবং যের সহকারে হজ্ব শব্দটি ‘মাসদার’ বা ক্রিয়ামূল। হজ্জ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো قَصْدُ الشَّيْءِ الْعَظِيْمِ الْفَخِيْمِ অর্থাৎ- আযীমুশ্বান কোন বিষয় বা বস্তু অর্জনের সংকল্প করা, ইচ্ছা করা। আর ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় হজ্জের মাসসমূহে ইহরাম পরিধান করে ৯ জিলহজ্জ আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা এবং বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করার সংকল্প করাকে হজ্জ বলা হয়।

হজ্জ কখন ফরয হয়েছে

হজ্জ্ কখন ফরয হয় এ বিষয়ে মুহাদ্দিসীন, মুফাস্সিরীন এবং ফক্বীহ্গণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। মুহাক্বক্বিক্ব ওলামা-ই কেরামের মধ্যে কেউ কেউ বলেন- হজ্জ্ হিজরী তৃতীয় সালে ফরয হয়, যে বছর উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। [তাফসীরে ইবনে কাসীর]
আবার কোন কোন মুহাক্বক্বিক্ব বলেন, হজ্জ্ হিজরী ষষ্ঠ সালে ফরয হয়। তবে অধিকাংশ মুহাদ্দিসীন এবং ফক্বীহ্র মতে হজ্জ্ হিজরী নবম সনে ফরয হয়েছে।
[আলমগীরী ও দুররে মুখতার]

দলে দলে লোকজনের ইসলাম গ্রহণ এবং বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি দলের আগমনের কারণে আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু তা’আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ব্যস্ত থাকায় ওই বছর হজ্জে যাননি; বরং সাইয়্যেদুনা আবূ বকর সিদ্দিক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা’আলা আনহুকে ‘আমীরুল হুজ্জাজ’ মনোনীত করে মক্কা শরীফে প্রেরণ করেন হজ্জ আদায়ের লক্ষ্যে। হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা’আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পরবর্তী বছর ১০ম হিজরীতে হজ্জ্ সম্পন্ন করেন, যা ঐতিহাসিক ‘বিদায় হজ্জ্’ হিসেবে প্রসিদ্ধ।

হজ্জের ফযা-ইল

পবিত্র ক্বোরআনে করীম এবং হাদীসে নবভী শরীফে বায়তুল্লাহর গুরুত্ব-তাৎপর্য, ফযীলত-বরকত, মরতবা-মহিমা অপরিসীম। নিম্নে তার কিছুটা বিবৃত হলো-
ক্বোরআন করীমে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন- وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ
অর্থাৎ- (হে মুমিনগণ!) আর তোমরা একমাত্র আল্লাহর জন্য হজ্জ ও ওমরাহ্ পরিপূর্ণ করো। [সূরা বাক্বারা]
অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে- وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا অর্থাৎ- মানুষের জন্য একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে ওই ঘরের হজ্জ্ করা তার জন্য ফরয যার সেখানে পৌঁছার সামর্থ্য আছে।। [সূরা আল-ই ইমরান]
উপরোক্ত আয়াতাংশের আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, ঈমানদারের জন্য আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের নিশ্চিত মাধ্যম হলো আল্লাহর ঘরের হজ্জ্।

হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ اُمُّهٗ [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]

অর্থাৎ (সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী) সাইয়্যেদুনা হযরত আবূ হুরায়রাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম রঊফুর রহীম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কোনরূপ অশ্লীল কর্মকান্ড কিংবা পাপাচারে লিপ্ত হওয়া ব্যতিরেকে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে হজ্জ্ পালন করবে সে মাতৃগর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিনের ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে প্রত্যাবর্তন করবে।

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْعُمْرَةُ اِلَى الْعُمْرَةِ
كَفَّارَةٌ لِّمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهٗ جَزَآءٌ اِلَّا الْجَنَّةُ [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]

অর্থাৎ (নবী প্রেমে নিবেদিত প্রাণ সাহাবী) সাইয়্যেদুনা হযরত আবূ হুরায়রাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলে পাক সাহেবে লাওলাক সাল্লাল্লাহু তা’আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, একটি ওমরাহ্ কাফ্ফারা হয়ে যায় (অর্থাৎ-আমলনামা থেকে গুনাহসমূহ মোচন করে দেয়) আরেকটি ওমরাহ্ পালন করা পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ে সংঘটিত গুনাহ্সমূহের। আর হজ্জে মাবরূরের প্রতিদান জান্নাতই।
উল্লেখ্য যে, হজ্জে মাবরূর বলা হয় ওই হজ্জকে যার সাথে কোন রূপ পাপাচার, লৌকিকতা, লোকদেখানো ইত্যাদি যুক্ত হয় নি।

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهٗ قَالَ
اَلْحُجَّاجُ وَالْعُمَّارُ وَفْدُ اللّٰهِ اِنْ دَعَوْهُ اَجَابَهُمْ وَاِنِ اسْتَغْفَرُوْهُ غَفَرَلَهُمْ [رواه ابن ماجة]

অর্থাৎ (প্রসিদ্ধ হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী সাইয়্যেদুনা) হযরত আবূ হুরায়রাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে আকরাম নূরে মুজাস্সাম সাল্লাল্লাহু তা’আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-আল্লাহ্র ঘরের হজ্জ এবং ওমরা পালনকারীরা আল্লাহ্র প্রতিনিধি স্বরূপ। তারা যদি আল্লাহ্র নিকট দো’আ-ফরিয়াদ করে আল্লাহ পাক তা কবূল করেন এবং তারা আল্লাহ্র নিকট মাগফিরাত চাইলে আল্লাহ পাক তাদের (গুনাহসমূহ) মার্জনা করেন।
[ইবনে মাজাহ শরীফ]

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَقُوْلُ وَفْدُ اللّٰهِ ثَلٰثَةٌ اَلْغَازِىْ وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ [رواه النسائى والبيهقى فى شعب الايمان]

অর্থাৎ-সাইয়্যেদুনা হযরত আবূ হুরায়রাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলে খোদা হাবীবে কিব্‌রিয়া সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করতে শুনেছি, আল্লাহর প্রতিনিধি তিনজন যথা- ১. আল্লাহর পথে জিহাদকারী, ২.আল্লাহর ঘরের হজ্জ্ আদায়কারী এবং ৩. ওমরাহ পালনকারী। [নাসাঈ শরীফ ও বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান]

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا لَقِيْتَ الْحَاجَّ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَصَافِحْهُ وَمُرْهُ اَنْ يَّسْتَغْفِرَلَكَ قَبْلَ اَنْ يَّدْخُلَ بَيْتَهٗ فَاِنَّهٗ مَغْفُوْرٌ [رواه احمد]

অর্থাৎ প্রখ্যাত সাহাবী-ই রাসূল সাইয়্যেদুনা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে আকরাম হাবীবে রহমান সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যখন তুমি কোন হাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, তখন তাকে সালাম করবে, তার সঙ্গে করমর্দন করবে এবং তাকে বলবে যেন তার ঘরে প্রবেশ করার পূর্বেই তোমার জন্য মাগফিরাত কামনা করে। কেননা, হাজীর মাগফিরাত হয়ে গেছে। [মুসনাদে আহমদ]

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ حَاجًّا اَوْ مُعْتَمِرًا اَوْ غَازِيًا ثُمَّ مَاتَ فِىْ طَرِيْقِهٖ كَتَبَ اللّٰهُ لَهٗ اَجْرَ الْحَاجِّ اَوِ الْغَازِىِّ اَوِالْمُعْتَمِرِ [رواه البيهقى فى شعب الايمان]

অর্থাৎ সাইয়্যেদুনা হযরত আবূ হুরায়রাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে খোদা হাবীবে কিবরিয়া সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর ঘরের হজ্জ্ কিংবা ওমরাহ্ পালন করার উদ্দেশ্যে অথবা আল্লাহর পথে জেহাদ করার সংকল্প নিয়ে ঘর হতে বের হয়ে পথিমধ্যে ইন্তেকাল করলো, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার আমলনামায় আল্লাহর ঘরের হজ্জ্ কিংবা ওমরাহ্ আদায়কারীর অথবা জেহাদকারীর সাওয়াব লিপিবদ্ধ করে দেবেন।[বায়হাক্বী-শু'আবুল ঈমান]

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ [رواه ابوداؤد والدارمى]

অর্থাৎ মুফাস্‌সিরকুল সরদার, সাহাবী-ই রাসূল সাইয়্যেদুনা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে আকরাম

রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি হজ্জ্ করার ইচ্ছে করে সে যেন তাড়াতাড়ি আদায় করে নেয়। [আবূ দাঊদ শরীফ ও দারেমী শরীফ]

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجُّوْا فَاِنَّ الْحَجَّ يَغْسِلُ الذُّنُوْبَ كَمَا يَغْسِلُ الْمَاءُ الدَّرَنَ

অর্থাৎ রাসূলে খোদা আশরাফে আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমরা হজ্জ্ পালন করো। কেননা, হজ্জ্ গুনাহসমূহকে এমনভাবে ধৌত করে ফেলে যেভাবে পানি ময়লা ধৌত করে (পরিচ্ছন্ন করে)।

উপরোক্ত রেওয়ায়তসমূহের আলোকে প্রমাণিত হয় যে, হজ্জ্ ও ওমরাহ্ এমন তাৎপর্যবহ ও মহিমান্বিত ইবাদত, যার বদৌলতে বান্দা আল্লাহর প্রতিনিধি হওয়ার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়, হজ্জ্ ও ওমরাহ্ আদায়কারীর সমুদয় গুনাহ মাফ হয়ে যায়, ইহকালীন জীবন পূতঃপবিত্র ও পরিশুদ্ধ হয়ে যায় এবং পরকালীন জীবনে বেহেশতী ও দীদারে ইলাহীর উপযোগী হয়।

হজ্জ্ আদায় না করা কিংবা হজ্জ্ আদায়ে গাফলতি করার ভয়ঙ্কর পরিণাম

وَعَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَلَكَ زَادًا وَّرَاحِلَةً تُبَلِّغُهٗ اِلٰى بَيْتِ اللّٰهِ وَلَمْ يَحُجَّ فَلَا عَلَيْهِ اَنْ يَّمُوْتَ يَهُوْدِيًّا اَوْ نَصْرَانِيًّا وَذٰلِكَ اَنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَقُوْلُ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا [رواه الترمذى]

অর্থাৎ আমীরুল মু'মিনীন সাইয়্যেদুনা মাওলা আলী শেরে খোদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে পাক সাহেবে লাওলাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি (হজ্জ আদায় করার) সম্বল এবং এমন আরোহীর মালিক হবে, যা বায়তুল্লাহ শরীফ পর্যন্ত পৌঁছাতে সক্ষম অথচ হজ্জ আদায় করলো না সে ইহুদী হয়ে মৃত্যুবরণ করল অথবা নাসারা হয়ে মৃত্যুবরণ করল তাতে কোন তারতম্য নেই। কেননা, আল্লাহ পাক বলেন- সামর্থ্যবান মানুষের উপর আল্লাহর ঘরের হজ্জ্ আদায় করা অপরিহার্য। [তিরমিযী শরীফ]

وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَّمْ يَمْنَعْهُ مِنَ الْحَجِّ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ اَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ اَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ فَمَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ اِنْ شَاءَ يَهُوْدِيًّا وَّاِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا [رواه الدارمى]

অর্থাৎ (প্রখ্যাত সাহাবী-ই রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

সাইয়্যেদুনা) হযরত আবূ উমামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম রঊফুর রহীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, প্রকাশ্য অভাব-অনটন কিংবা যালিম বাদশাহ অথবা দুরারোগ্য ব্যাধি যাকে হজ্জ পালনে বাধা প্রদান করলো না আর সে হজ্জ আদায় না করে মৃত্যু বরণ করলো-চাই সে ইহুদী হয়ে মৃত্যুবরণ করুক অথবা নাসারা হয়ে মৃত্যুবরণ করুক (তাতে কোন ব্যবধান নেই।) [দারেমী শরীফ]

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَيْسَرَ وَلَمْ يَحُجَّ وَمَاتَ عَلٰى ذٰلِكَ فَهُوَفِى النَّارِ ذَاتِ الْوَحُشَةِ وَالظَّلَامِ ـ

অর্থাৎ রাসূলে খোদা আশরাফে আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, সামর্থ্যবান হওয়া সত্ত্বেও যে ব্যক্তি হজ্জ্ আদায় না করে মৃত্যুবরণ করলো সে যেন ভয়ানক অন্ধকারাচ্ছন্ন জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হলো।

উপরোক্ত বর্ণনাসমূহের আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, সামর্থ্যবান হওয়া সত্ত্বেও হজ্জ আদায় না করে মৃত্যুবরণকারীর মৃত্যু ঈমানের সাথে হলো কিনা তাতে সমূহ সন্দেহ রয়েছে। (না'ঊযুবিল্লাহ) কেননা, হজ্জ আদায় না করার কারণ হয়তো সে হজ্জ ফরয হওয়াকে অস্বীকার করেছে। তা যদি হয় তবে তো মৃত্যুর পর সে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে।

وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَابِعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَاِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَوَالذُّنُوْبَ كَمَا يَنْفِى الْكِيْرُ خُبُثَ الْحَدِيْدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُوْرَةِ ثَوَابٌ اِلَّا الْجَنَّةُ [رواه الترمذى والنسائى]

অর্থাৎ (প্রখ্যাত সাহাবী সাইয়্যেদুনা) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে পাক সাহেবে লাওলাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমরা হজ্জ্ ও ওমরা একসঙ্গে আদায় করো। কেননা, এ দু'টি অভাব-অনটন এবং পাপসমূহকে তেমনভাবে দূরীভূত করে, যেভাবে ভাট্টি স্বর্ণ-রৌপ্য ও লোহার মরিচাকে দূরীভূত করে দেয়। আর হজ্জে মাবরূরের প্রতিদান একমাত্র জানান্নতই। [তিরমিযী ও নাসায়ী শরীফ]

প্রখ্যাত সাহাবী-ই রাসূল সাইয়্যেদুনা হযরত আবূ মুসা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আল্লাহর ঘরের হজ্ব আদায়কারী হাজী স্বীয় পরিবারের চারশত ব্যক্তির (নাজাতের) জন্য (আল্লাহর নিকট) শাফা'আত করবেন এবং তারা গুনাহসমূহ থেকে মাতৃগর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিনের ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে যাবে। [মুসনাদে বাযযার]

প্রসিদ্ধ সাহাবী-ই রাসূল সাইয়্যেদুনা হযরত জাবের রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে পাক সাহেবে লাওলাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, এ ঘর (অর্থাৎ বায়তুল্লাহ শরীফ) ইসলামের স্তম্ভসমূহের অন্যতম একটি স্তম্ভ। অতঃপর যারা এ ঘরের হজ্জ্ কিংবা ওমরাহ্ করবে সে আল্লাহ পাকের যিম্মায় আশ্রয়প্রাপ্ত হবে। যদি মৃত্যুবরণ করে আল্লাহ পাক তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। আর যদি ঘরে ফিরে যায়, তবে সাওয়াব এবং গণীমত সহকারে আল্লাহ পাক তাকে ঘরে পৌঁছাবেন। [তাবরানী শরীফ]

এছাড়াও অনেক রেওয়ায়ত রয়েছে, যেগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হজ্জের ফযীলত, বরকত, মরতবা ও মহিমা অপরিসীম, হজ্জের বরকতে মু'মিনের দৈহিক ও আত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জিত হয়, যা ইহকালীন ও পরকালীন চূড়ান্ত সাফল্যের নিশ্চিত সহায়ক হয়।

হজ্জে্র মসায়েল

হজ্জে্র শর্তাবলী

হজ্জের শর্তসমূহ চার ভাগে বিভক্তঃ

১. شرائط وجوب বা হজ্জ্ ওয়াজিব বা ফরয হওয়ার শর্তাবলী।
২. হজ্জ্ আদায় করা ওয়াজিব বা ফরয হওয়ার শর্তসমূহ।
৩. হজ্জ্ পালন বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলী।
৪. হজ্জ্ আদায়ের পর দায়িত্বমুক্ত হওয়ার শর্তাবলী।

১. হজ্জ্ ওয়াজিব বা ফরয হওয়ার শর্তসমূহ

যে সকল শর্ত বিদ্যমান থাকলে মানুষের উপর হজ্জ্ সম্পাদন ফরয হয়, এর একটি অনুপস্থিত হলেও হজ্জ্ ফরয হয় না, এ প্রকারের সাতটি শর্ত রয়েছে-

ক. মুসলমান হওয়া।
খ. হজ্জ্ ফরয হওয়া সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া।
গ. বালেগ হওয়া।
ঘ. বিবেকসম্পন্ন হওয়া।
ঙ. স্বাধীন হওয়া।
চ. হজ্জ্ সম্পাদনের সামর্থ্য থাকা।
ছ. হজ্জে্র সময় হওয়া।

অতএব, কাফির-যতবড় ধনবানই হোক না কেন তার উপর হজ্জ্ ফরয নয়। এমনকি কোন ধনাঢ্য কাফির দরিদ্র হয়ে যাওয়ার পর ঈমান আনলো, তার জন্যও হজ্জ্ ফরয হবে না। কেউ কাফির অবস্থায় নিজে হজ্জ্ করলো কিংবা অন্য কোন মুসলমান দ্বারা হজ্ব করালো, পরে মুসলমান হলো তার পূর্বের হজ্জ্ দ্বারা ফরয আদায় হবে না।

২. হজ্জ্ আদায় করা ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলী

অর্থাৎ-এমন কিছু শর্ত, যেগুলোর উপর হজ্জ্ ওয়াজিব বা ফরয হওয়া নির্ভরশীল নয়, তবে এগুলো বিদ্যমান থাকলে হজ্জ্ সম্পাদন করা ওয়াজিব বা ফরয হয়ে যায়। যদি ১নং ও ২নং শর্ত কারো মধ্যে একত্রে পাওয়া যায়, তখন নিজে হজ্জ্ সম্পাদন করতে হয়। আর কেবল ১নং শর্ত কারো মধ্যে বিদ্যমান থাকলেও যদি ২নং শর্ত অনুপস্থিত হয়, তখন নিজে হজ্জ্ সম্পাদন করতে হয় না এবং তাৎক্ষণিকভাবে অথবা পরবর্তী সময়ে অন্য কারো দ্বারা হজ্জ্ করার ব্যবস্থা করতে হবে। এ প্রকারের পাঁচটি শর্ত রয়েছে-

১. সুস্থ বা রোগ মুক্ত হওয়া।
২. বন্দী বা সরকারী আইনে বাধাগ্রস্ত না হওয়া।
৩. রাস্তা নিরাপদ হওয়া।
৪. মহিলা হলে তার সাথে মুহরিম থাকা।
৫. স্ত্রী লোকের হায়য-নিফাস ইত্যাদি ইদ্দত থেকে মুক্ত থাকা। (অবশ্য হায়য সম্পন্না নারী হায়য চলাকালে মসজিদে হারামে প্রবেশ করা ব্যতীত অন্যান্য বিধান পালন করতে পারবে। তারপর সুস্থ হলে তাওয়াফ ইত্যাদি করে নেবে।)

প্রথমোক্ত তিনটি শর্ত নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য প্রযোজ্য আর শেষোক্ত দুটি শর্ত কেবল মহিলাদের জন্য। কেউ সুস্থাবস্থায় হজ্জ্ ফরয হওয়ার সত্ত্বেও হজ্জ্ আদায় করেনি পরে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে তার ওযর গ্রহণযোগ্য হবে না। সে অন্য কারো দ্বারা হজ্জ্ করাবে, অথবা হজ্জের ওসীয়ত করে যাবে, হজ্জের উপর সামর্থ্যবান এক ব্যক্তি কারো পাওনা আদায়ের ব্যাপারে গ্রেফতার হয়ে পড়লো এবং তার কাছে এই পাওনা পরিশোধের ক্ষমতাও আছে, তবে ওই বন্দি অবস্থা অপরাগতা বলে গণ্য হবে না। তাকে হজ্জে বদলের আদেশ অথবা ওসীয়ত করে যেতে হবে।

৩. হজ্জ্ আদায় বিশুদ্ধ হবার শর্তাবলী

অর্থাৎ- এমন কিছু শর্ত, যেগুলো ব্যতীত হজ্জ্ পালন শুদ্ধ হবে না-

১. মুসলমান হওয়া।
২. ইহরাম পরিধান করা। ইহরাম ব্যতীত কেউ হজ্জ সমাধা করলেও তা শুদ্ধ হবে না।
৩. হজ্জের নির্ধারিত সময়ে হজ্জ্ সম্পাদন করা।
৪. প্রত্যেকটা কাজ সংশ্লিষ্ট স্থানে যথা নিয়মে আদায় করা।
৫. বিবেকবান ও চেতনা সম্পন্ন হওয়া।
৬. হজ্জের কার্যাবলী নিজেই আদায় করা।
৭. বালেগ হওয়া।
৮. ইহরাম অবস্থায় স্ত্রী-সহবাসসহ যাবতীয় নিষিদ্ধ কার্য থেকে বিরত থাকা।
৯. যে বৎসর ইহরাম পরিধান করেছে ওই বৎসরই হজ্জ্ পালন করা।

৪. হজ্জ্ আদায়ের পর দায়িত্বমুক্ত হওয়ার শর্তাবলী

শরা-ইত্বে রুকন- ফরয বা ওই সমস্ত শর্তাবলী যেগুলো পূরণ হলে হজ্জ্ আদায় করে দায়িত্বমুক্ত হওয়া যায়, এমন শর্তাবলী নিম্নরূপ-

১. হজ্বের সময় মুসলমান হওয়া।
২. মুসলমান হিসাবে জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত অবিচল থাকা। আল্লাহ না করুন, কোন মুসলমান যদি হজ্জ্ আদায় করার পর কাফির হয়ে যায়, তবে তার হজ্জ্ বাতিল হয়ে যাবে। পরবর্তীতে সে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করলে এবং সামর্থ্যবান হলে পুনরায় তার উপর হজ্জ্ ফরয হবে।
৩. স্বাধীন হওয়া।
৪. বালেগ হওয়া। নাবালেগ অবস্থায় হজ্জ্ করলে তা নফল হিসেবে গণ্য হবে। বালেগ হওয়ার পর সামর্থ্যবান হলে তাকে অবশ্যই পুনরায় হজ্জ্ পালন করতে হবে।
৫. বিবেকবান হওয়া।
৬. শারীরিকভাবে সামর্থ্যবান ব্যক্তি নিজেই হজ্বের কার্যাদি সম্পাদন করা।
৭. স্ত্রী সহবাস বা নিষিদ্ধ কার্য দ্বারা হজ্বকে নষ্ট না করা।
৮. অন্য কারো পক্ষ থেকে হজ্বের নিয়্যত না করা।
৯. নফলের নিয়্যত না করা।

হজ্জের ফরযসমূহ

হজ্জের ফরয তিনটি

১. (নিষ্ঠার সাথে নিয়্যত করে) ইহরাম পরিধান করা।
২. আরফাতে অবস্থান করা
অর্থাৎ- ৯ই জিলহজ্জ্ সূর্য পশ্চিম দিকে হেলার পর থেকে ১০ জিলহজ্জের সুব্হে সাদিক্বের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত কিছুক্ষণের জন্য আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা।
৩. (আরফাতে অবস্থানের পর) 'তাওয়াফে যিয়ারত' করা।
এটা ১০ জিলহজ্জ্ থেকে ১২ জিলহজ্জ্ সূর্যাস্তের পর্ব পর্যন্ত করা যায়। তবে ১০ জিলহজ্জ্ এ ফরয তাওয়াফ করে নেয়া উত্তম। এ তিনটা তারতীব অনুযায়ী যথাস্থানে আদায় করা কর্তব্য। এর একটিও বাদ পড়লে হজ্জ্ আদায় হবে না এবং দম বা ক্বোরবানীও এ জন্য যথেষ্ট হবে না।

হজ্জের ওয়াজিবসমূহ

১. আরাফাত থেকে ফেরার পথে মুয্দালিফায় অবস্থান করা এবং সেখানে মাগরিব ও এশার নামায একসাথে আদায় করা।
২. সাফা ও মারওয়ার মধ্যখানে সা'ঈ করা।

৩. 'রামীয়ে জেমার' বা জামরাহগুলোতে কংকর নিক্ষেপ করা।

৪. ক্বিরান ও তামাত্তু'কারী হাজীদের ক্বোরবানী করা। এর অপর নাম দমে শোকরিয়া, দমে মাতাত্তু' ও দমে ক্বিরান।

৫. মাথা মুণ্ডানো কিংবা চুল ছাঁটানো।

৬. আ-ফাক্বী অর্থাৎ মীক্বাতের বাইরে থেকে আগত হাজীদের জন্য 'তাওয়াফে বিদা' (বিদায়ী তাওয়াফ) করা।

'ওয়াজিবাত'-এর ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম হচ্ছে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কোন ওয়াজিব বাদ পড়লে হজ্জ তো হবে; কিন্তু দম দিতে হবে, অবশ্যই কোন গ্রহণযোগ্য ওযর বশতঃ হজ্বের ওয়াজিব বাদ পড়ে থাকলে দম দিতে হবে না।

হজ্বের সুন্নাতসমূহ

১. ক্বিরান ও ইফরাদকারী এবং আ-ফাক্বী হাজীদের জন্য তাওয়াফে কুদূম করা।

২. তাওয়াফে কুদূমে রামাল করা। যদি এতে রামাল করা না হয়, তবে অন্ততঃ তাওয়াফে যিয়ারত বা তাওয়াফে বিদায়ে তা করে নেবে।

৩. তিনটি স্থানে অর্থাৎ- ৭ জিলহজ্জ্ মক্কা-মুকাররমায়, ৯ জিলহজ্জ্ মসজিদে নামরায় নামাযের পূর্বে ও ১১ জিলহজ্জ্ মিনায় ইমাম কর্তৃক খুত্বা প্রদান করা ও হাজীদের তা শ্রবণ করা।

৪. ৮ জিলহজ্জ্ দিবাগত রাতে মিনায় অবস্থান করা।

৫. ৯ জিলহজ্জ্ সূর্য উদয়ের পরই আরফাতের দিকে রওনা হওয়া।

৬. ইমামের পরে আরফাতের ময়দান থেকে প্রত্যাবর্তন করা।

৭. আরাফাত থেকে পত্যাবর্তনের পর রাতে ফজর হওয়া পর্যন্ত মুয্দালিফায় অবস্থান করা।

৮. আরাফাতে গোসল করা।

৯. মিনায় অবস্থানকালে সেখানে রাত্রিযাপন করা।

হেরেম এলাকায় নিষিদ্ধ কার্যাবলী

শরীয়তের পরিভাষায় এ নিষিদ্ধ কার্যাবলীকে 'জিনায়ত' বলা হয়। অর্থাৎ- যে সকল কাজ ইহরাম এবং হেরেমের কারণে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। ইহরামের কারণে ৮ প্রকারের কর্ম নিষিদ্ধ।

১. সুগন্ধি ব্যবহার করা।

২. সেলাই কৃত কাপড় পরিধান করা।

৩. মাথা এবং মুখমণ্ডল ঢেকে ফেলা।

৪. চুলের উকুন মারা।

৫. নখ কাটা।

৬. স্ত্রী সহবাস করা।

৭. হজ্জের কোন ওয়াজিব বাদ দেয়া।

৮. স্থলভাগের কোন পশু শিকার করা।

হেরেমের কারণে নিষিদ্ধ কাজ দু'টি

১. হেরম এলাকায় পশু শিকার করা বা সেগুলোকে কষ্ট দেয়া।

২. হেরম এলাকায় ঘাস,বৃক্ষ, লতাগুল্ম কর্তন করা।

মীক্বাতের বর্ণনা

মীক্বাত মূলতঃ নির্ধারিত সময় বা নির্ধারিত স্থানকে বলা হয়। এ কারণে মীক্বাতকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

১. মীক্বাতে যামানীঃ যা শাওয়াল, জিলক্বদ এবং জিলহজ্ব মাসের প্রথম ১০ দিন পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। হজ্বের জন্য এ সময়সীমা নির্ধারণ মুসলিম উম্মাহ্র জন্য এক মহান নি'মাত। এটা দ্বারা জীবনের সামগ্রিক ক্ষেত্রে যে কোন শুভ ও পবিত্র অনুষ্ঠানাদি তথা বিয়ে-শাদী, ফাতেহা, উরস, জলসা ইত্যাদি সুষ্ঠুভাবে সমাধানার্থে দিন ও সময় নির্ধারণের বৈধতা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়।

২. মীক্বাতে মাকানীঃ ওই সমস্ত স্থান যেখান থেকে ইহরাম পরিধান করা ওয়াজিব। এটা তিন প্রকার।

ক. মীক্বাত-ই আহলে আফাক্ব, যা নির্ধারিত মিক্বাতের সীমানার বাইরের হাজ্বীদের জন্য নির্ধারিত স্থান।

খ. মীক্বাত-ই আহলে হিল্। যারা হেরমের বাইরে কিন্তু মীকাতের অভ্যন্তরে বসবাস করে সেসমস্ত হজ্জ যাত্রীদের মীক্বাত হচ্ছে পুরো হিল্। তাঁরা এ হিলের যে কোন স্থান থেকে ইহরাম বেঁধে হেরমে প্রবেশ করতে পারে।

গ. মীক্বাত-ই আহলে হেরম। অর্থাৎ- ওই সকল লোকের জন্য নির্ধারিত মীক্বাত, যারা মক্কা মুকাররমার হেরেম এলাকায় বসবাস করে। তারা হেরমের অভ্যন্তরে যে কোন স্থান থেকে হজ্জের ইহরাম বাঁধবে।

মীকাতে আ-ফাক্বী বা বহিরাগত হাজীদের মীকাতের বর্ণনা

ক. মদীনা মুনাওয়ারার অধিবাসীদের জন্য মীক্বাত 'যুল হুলাইফা', যা মদীনা শরীফ থেকে দক্ষিনে ছয় মাইল দূরত্বে অবস্থিত। বর্তমানে তা বী'র আলী নামে পরিচিত।

খ. ইরাকের দিক থেকে হজ্ব যাত্রীদের জন্য নির্ধারিত মীক্বাত 'যাতে ইরক্ব'।

গ. সিরিয়া ও মিসরের দিক থেকে আগমনকারী হাজীদের জন্য 'জুহফাহ' এবং

ঘ. বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারত ও পূর্বাঞ্চলীয়-দেশ সমূহ থেকে হজ্জ গমনেচ্ছু হাজীদের জন্য মীক্বাত হচ্ছে 'ইয়ালামলাম'।

স্থলপথে বা এতদঞ্চল থেকে নৌপথে হজ্ যাত্রীদের জন্য এখান থেকে অবশ্যই ইহরাম পরিধান করতে হবে। তবে আকাশ পথে হজ্জ-যাত্রীরা বর্তমানে সাধারণতঃ বিমানে আরোহনের পূর্বে ইহরাম পরিধান করে নেয়। এটাই নিরাপদ। অবশ্য নৌযান ও বিমানে মীক্বাত পার হবার পূর্বক্ষণে সংকেত দেওয়া হয়। তখন যারা আরোহণের পূর্বে ইহরাম করেন না, তাঁরা এখানেও ইহরাম করতে পারেন।

হজ্জের প্রকারভেদ ও নিয়মাবলী

হজ্জ পালনের বিভিন্ন নিয়ম রয়েছে

১. **হজ্জে আসগরঃ** 'ওমরাহ'কে হজ্জে আসগর বা ছোটতর হজ্জ বলা হয়। বছরে যতবার যখনই ইচ্ছা ওমরাহ্ পালন করা যায়।

২. **হজ্জে ইফরাদঃ** শুধু হজ্জের নিয়্যতে ইহরাম বাঁধা। এ হজ্জে ওমরাহ নেই।

৩. **হজ্জে তামাত্তু'ঃ** পৃথক পৃথক ইহরাম দ্বারা হজ্জের মাসে ওমরাহ ও হজ্জ সম্পন্ন করা। এ হজ্জ আফাক্বী অর্থাৎ- মীক্বাতের বাইরে অবস্থানকারীদের জন্য।

৪. **হজ্জে ক্বিরানঃ** অর্থাৎ-হজ্জের মাসে ওমরাহ ও হজ্জ একই ইহরামে একত্রিত করা। এটাও কেবল আফাক্বীদের জন্য।

বিস্তারিত নিয়মাবলী

ওমরাহ ঃ ওমরাহ্কে 'হজ্জে আসগর' বলে। হজ্জ নির্দিষ্ট দিনগুলোতেই করতে হয় কিন্তু ওমরাহ বছরের যে কোন সময়ই করা যায়।

ওমরার পূর্বশর্তঃ ইহরাম করা ।

ওমরার রুকন বা ফরয, রামাল ও ইদ্বতিবা' সহকারে তাওয়াফ করা ।

সা'ঈ করা ও মাথা মুন্ডানো অথবা মাথার চুল ছাঁটানো। অপরাপর নিয়মাবলী হজ্জের মতই।

হজ্জ ও ওমরার মধ্যে পার্থক্য

১. আফাক্বী কিংবা হেরমবাসী সকলের জন্য ওমরার ইহরাম হিল্ (হেরমের বাইরে) থেকে বাঁধতে হয়। কিন্তু মক্কাবাসী হজ্জের ইহরাম হেরম থেকে পরিধান করবে। অবশ্যই আফাক্বীদের সংশ্লিষ্ট মীক্বাত থেকে ইহরাম পরিধান করতে হয়।

২. হজ্ ফরয। ওমরাহ্ ফরয নয়।

৩. হজ্ এক নির্দিষ্ট সময়ে করতে হয় কিন্তু ওমরাহ্ বৎসরে যে কোন সময়ই করা যায়। তবে ৯ জিলহজ্জ থেকে ১৩ জিলহজ্জ পর্যন্ত ওমরাহ করা মাকরূহ।

৪. ওমরার মধ্যে আরাফাত ও মুয্দালিফায় অবস্থান, দু'নামায এক সাথে আদায় করা ও খুতবার বিধান নেই। তাওয়াফে কুদূম এবং তাওয়াফে বিদা'ও নেই; কিন্তু ওই সব কাজ হজ্জের মধ্যে রয়েছে।

৫. ওমরার মধ্যে তাওয়াফ আরম্ভ করার সময় তাল্বিয়াহ পড়া মওকূফ করা হয়। আর হজ্জের মধ্যে 'জামরাতুল আক্বাবাহ'তে রামী (কংকর নিক্ষেপ) করার সময় মওকূফ করা হয়।

৬. ওমরাহ নষ্ট হলে বা জানাবত (ওই নাপাকী, যা দ্বারা গোসল ফরয হয়) অবস্থায় তাওয়াফ করলে (দম হিসেবে) একটা ছাগল বা মেষ জবেহ করা যথেষ্ট, কিন্তু হজ্জে যথেষ্ট নয়; বরং পরবর্তী বছর পুনরায় সম্পন্ন করতে হয়।

ওমরাহ করার নিয়ম

মীক্বাত থেকে হজ্জের ইহরামের মতই ওমরার নিয়্যতে ইহরাম বেঁধে নেবে। অতঃপর তালবিয়্যাহ পড়তে পড়তে হজ্জের নিয়মানুযায়ী মক্কা শরীফের দিকে অগ্রসর হবে। 'বাবুস সালাম' গিয়ে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে। এরপর রামাল ও ইদ্বতিবা (এর নিয়ম তাওয়াফের বর্ণনায় আসছে) সহকারে তাওয়াফ করবে। তাওয়াফের পর মক্বামে ইব্রাহীমে দু'রাকাত নামায পড়বে। অতঃপর 'হাজরে আসওয়াদ'-এ চুম্বন বা ইস্তিলাম করে 'বাবুস সাফা' অতিক্রম করে সাফা ও মারওয়ার সা'ঈ করবে। এরপর দু'রাক'আত নামায আদায় করবে। অতঃপর মাথা মুণ্ডাবে কিংবা ছাঁটাবে। এভাবে ওমরার কাজ সুসম্পন্ন হবে।

ইহরাম

ইহরামের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে 'হারাম করা।' যেহেতু হাজী যখন মীক্বাত থেকে হজ্জের নিয়্যত করে ইহরাম করে তালবিয়াহ পড়ে নেয় তখন তার উপর কতগুলো হালাল ও বৈধ বস্তু হারাম হয়ে যায়। তাই একে 'ইহরাম' বলা হয়।

'ইহরাম' হচ্ছে-দু'টি সেলাই বিহীন কাপড় (চাদর) পরিধান করা, যার একটা নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত লুঙ্গির পরিবর্তে, অপরটা কাঁধের উপর লটকানো হয়। মাথা খোলা রাখতে হয়।

ইহরামের প্রকারভেদ

'হজ্জ'-এর প্রকারভেদে ইহরামের পার্থক্য হয়। যেমনঃ

১. শুধু ওমরার জন্য ইহরাম করা।

২. ইফরাদ অর্থাৎ- শুধু হজ্জের জন্য ইহরাম পরিধান করা।

৩. ক্বিরান অর্থাৎ হজ্জ ও ওমরার জন্য সম্মিলিত ইহরাম।

৪. তামাত্তু' অর্থাৎ- প্রথমে ওমরার ইহরাম করা এবং হজ্জের মৌসুমে ওমরা সম্পন্ন করার পর দ্বিতীয়বার হজ্জের ইহরাম করা। হানাফী মাযহাব মতে সর্বোত্তম হজ্জ 'ক্বিরান'। এর পর তামাত্তু' এরপর এফরাদ। মীক্বাতের বাইরে থেকে আগতদের জন্য যে কোন একটা করা জায়েয; কিন্তু মক্কার অধিবাসীদের জন্য ক্বিরান এবং তামাত্তু' নিষিদ্ধ।

ইহরাম শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলী

১. মুসলমান হওয়া।
২. ইহরামের নিয়্যত করা এবং সাথে সাথে তালবিয়াহ্ পড়া। কেবল মনে মনে নিয়্যত করা যথেষ্ট নয় বরং নিয়্যতের সাথে তালবিয়্যাহ কিংবা কোন দো'আ ও যিক্র করা আবশ্যকীয়।

ইহরামের ওয়াজিবসমূহ

১. মীক্বাত থেকে ইহরাম বাঁধা।
২. ইহরামের নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ থেকে বেঁচে থাকা।

ইহরামের সুন্নাতসমূহ

১. হজ্জের মাসসমূহে ইহরাম বাঁধা।
২. নিজ দেশের মীক্বাত থেকে ইহরাম পরা, যদি সে ওই পথ দিয়ে অতিক্রম করে।
৩. গোসল অথবা ওযূ করা।
৪. চাদর বা সেলাই বিহীন কাপড় পরিধান করা।
৫. দু'রাক'আত নফল নামায আদায় করা।
৬. উচ্চ স্বরে তিনবার তালবিয়াহ্ পড়া।

ইহরাম করার জন্য মুস্তাহাবসমূহ

১. শরীরের অপবিত্রতা দূর করা।
২. নখ কাটা।
৩. বগল পরিস্কার করা।
৪. নাভীতল পরিস্কার করা।
৫. ইহরামের নিয়্যতে গোসল করা।
৬. নতুন বা ধোলাই করা সাদা চাদর ব্যবহার করা।
৭. জুতার পরিবর্তে খোলা সেন্ডেল পরিধান করা।
৮. মৌখিক নিয়্যত করা।
৯. নিয়্যত নফল নামাযের পরে বসে বসে করা।

ইহরামের মুবাহসমূহ

ইহরাম অবস্থায় নিম্মলিখিত কাজগুলো বৈধঃ

গোসল করা, বাসস্থানে প্রবেশ করা, ছায়ায় বসা, ছাতা মাথায় দেয়া, ভাঙ্গা নখ কেটে ফেলা, আয়না দেখা, কাপড় পবিত্র করা, ডুব দেয়া, গরম বা ঠাণ্ডা পানি দিয়ে শরীর মালিশ ব্যতীত গোসল করা, লুঙ্গির উপরে বা নিচে টাকার থলে বাঁধা, নিম্নভাগের চাদরে পকেট রাখা, অনিষ্টকারী প্রাণী, যেমন- ছারপোকা, সাপ ও বিচ্ছু ইত্যাদি মেরে ফেলা।

ইহরামের মাকরূহসমূহ

ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধি স্পর্শ করা বা স্বেচ্ছায় সুগন্ধি নেয়া, চাদরে গিরা দিয়ে গর্দানের উপর বাঁধা, নিচের চাদরে গিরা দেয়া বা সুঁইসূতা দিয়ে সংযুক্ত করা, নাক ও থুতনীকে কাপড় দিয়ে ঢেকে ফেলা, মাথার চুল ও দাড়ি চিরুনী দিয়ে আঁচড়ানো। মাথার চুল ও দাড়িকে এমনভাবে চুলকানো যাতে চুল বা উকুন খসে পড়ার সম্ভাবনা থাকে এবং মাথা, দাড়ি ও শরীর সাবান দিয়ে ধৌত করা।

ইহরামের নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ

সেলাই করা কাপড় পরিধান করা, এমন জুতা পরিধান করা যাতে পায়ের মধ্যবর্তী হাড় ঢেকে যায়, মাথা ও চেহারার উপর পাট্টি বাঁধা, খুশবু লাগানো বা সুগন্ধিযুক্ত কাপড় পরা, চুল কাটা, নখ কাটা, ঝগড়া বিবাদ করা, স্ত্রী-সঙ্গম, চুম্বন ও আলিঙ্গন করা, স্থলভাগে শিকার করা বা পশুগুলোকে উত্যক্ত করা, অন্যকে শিকারে উৎসাহিত বা সহযোগিতা করা, স্থলবাসী পশু-পাখীর বাচ্চা বা ডিম ধ্বংস করা এবং উকুন মারা ইত্যাদি।

মহিলা ও শিশুর ইহরাম

মহিলাদের ইহরাম পুরুষদের মতই, তবে পার্থক্য এতটুকু যে, মহিলারা চেহারা খোলা রেখে মাথা ঢেকে থাকবে, মহিলাদের জন্য সেলাই করা কাপড় পরা বৈধ। রঙ্গীন হলেও অসুবিধা নেই। হজ্জ যাত্রী নাবালেগ হলে যদি সক্ষম হয় তবে নিজের ইহরাম নিজেই পরবে, অন্যান্য কাজও নিজেই সম্পন্ন করবে। অবুঝ শিশু হলে অভিভাবক তার পক্ষ থেকে ইহরাম করে নেবেন। তাওয়াফের নামায ছাড়া সকল কার্যক্রম নাবালেগের পক্ষ থেকে অভিভাবক সম্পন্ন করবে।

ইহরামের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

হজ্জ ও ওমরার ইহরাম নামাযের তাকবীরে তাহরীমার মতই। এটা দ্বারা বান্দা নিয়্যতের দৃঢ়তা ও অকৃত্রিমতা প্রকাশ করে এবং সর্ব প্রকার ভোগ-বিলাস পরিহার করে বন্দেগীর বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে। পরকালের যাত্রীর ন্যায় দু'টি সেলাই বিহীন চাদর জড়িয়ে সাদা-কালো, ধনী-দরিদ্র সকল ভেদাভেদ পরিহার করে এক বেশে, এক সুরে মা'বূদে হাক্বীক্বীর দরবারে হাজিরা দেয়ার সুযোগ পায়।

তাওয়াফ

খানা-ই কা'বার চতুর্দিকে সাতবার প্রদক্ষিণ করার নাম 'তাওয়াফ'। প্রতিটি চক্করকে 'শাওত্ব' বলা হয়। 'তাওয়াফ' হাজরে আসওয়াদ থেকে আরম্ভ করতে হয়। তাই হাজী তাওয়াফের প্রারম্ভে হাজরে আসওয়াদের সামনে এমনভাবে দাঁড়াবেন যেন তাঁর ডান কাঁধ হাজরে আসওয়াদের বাম পার্শ্ব বরাবর থাকে এবং হাজরে আওসয়াদ তাঁর ডান দিকে থাকে।

তাওয়াফের কিছু জরুরী মাসা-ইল

তাওয়াফ চার প্রকার

১. 'তাওয়াফে ক্বদুম', বা আগমনী তাওয়াফ। এটা ওইসব আফাক্বী তথা বহিরাগত হাজীদের জন্য সুন্নাত, যারা ইফরাদ কিংবা ক্বিরান হজ্বের জন্য মক্কা মুকার্‌রমায় প্রবেশ করবেন। তাওয়াফে কুদুম যথাসময়ে সম্পন্ন করা সুন্নাত।

২. 'তাওয়াফে যিয়ারত', যা হজ্জের একটি রুকন (মৌলিক ফরয)। একে তাওয়াফে ফরয, তাওয়াফে হজ্জ, তাওয়াফে ইফা-দ্বাহ এবং তাওয়াফে রুক্‌নও বলে। এ তাওয়াফ ১০ জিলহজ্ব রামী ও মাথা মুণ্ডানোর পর সম্পন্ন করে নেয়া অধিক উত্তম। তবে ১২ যিলহজ্ব সূর্যাস্তের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত এ তাওয়াফ করা যায়।

৩. 'তাওয়াফে বিদা', যাকে 'তাওয়াফে সদর'ও বলা হয়। বিদায়কালীন সময়ে এ তাওয়াফ আদায় করা আফাক্বীদের জন্য ওয়াজিব।

৪. 'তাওয়াফে ওমরাহ্'। এটা ওমরার জন্য ফরয, যা রামাল ও ইদ্বতিবা' সহকারে করতে হয় এবং পরে সা'ঈ করতে হয়।

এতদ্ব্যতীত আরো কয়েক প্রকারের তাওয়াফ রয়েছে। যেমন নযর বা মান্নতের তাওয়াফ, বায়তুল্লাহর সম্মানার্থে তাওয়াফ ও নফল তাওয়াফ ইত্যাদি। মান্নতকারীর জন্য 'তাওয়াফে নযর' ওয়াজিব। মসজিদুল হারামে প্রবেশের জন্য তাওয়াফে তাহিয়্যাহ মুস্তাহাব আর 'তাওয়াফে নফল'-এর জন্য নির্দিষ্ট কোন সময় নেই। অতএব এটা সব সময় করা যায়।

তাওয়াফের শর্তাবলী

তাওয়াফের নিয়্যত করা, মসজিদুল হারামের ভেতরে তাওয়াফ করা, (যা প্রত্যেক প্রকার তাওয়াফের জন্য পুর্বশর্ত।) উল্লেখ্য, হজ্জের তাওয়াফের জন্য নির্ধারিত সময় হওয়া এবং আরাফাতে অবস্থান করা জরুরী।

তাওয়াফের ওয়াজিবসমূহ

১. পবিত্র হওয়া।
২. সতর ঢাকা।
৩. ডান দিক থেকে তাওয়াফ আরম্ভ করা।
৪. ওযর না থাকা অবস্থায় পদব্রজে তাওয়াফ করা।
৫. হাতিমকেও তাওয়াফের অন্তর্ভুক্ত করা।
৬. তাওয়াফকে পরিপূর্ণ করা এবং
৭. তাওয়াফের পর মক্বামে ইব্রাহীমের নিকট দু রাকাত নামাজ পড়া। এর মধ্যে একটি ওয়াজিব বাদ পড়লেও তাওয়াফ পুনরায় করা ওয়াজিব।

তাওয়াফের মুস্তাহাবসমূহ

হাজরে আসওয়াদ থেকে 'তাওয়াফ' আরম্ভ করা, হাজরে আসওয়াদে তিনবার চুমু খাওয়া, মুবাহ কথাবার্তা পরিহার করা, ক্বোরআন ও হাদীস থেকে বর্ণিত দো'আসমূহ পাঠ করা, পুরুষ বায়তুল্লাহর নিকটে তাওয়াফ করা, অবশ্যই এমনিভাবে, যাতে ভিড়ের চাপে কারো কষ্ট না হয়, মহিলারা রাতে তাওয়াফ করা, বিনয়ের ক্ষতি হয় এমন কাজ কর্ম থেকে বিরত থাকা, মাঝখানে তাওয়াফ ছেড়ে দিয়ে থাকলে কিংবা মকরূহ পন্থায় তাওয়াফ করে থাকলে পুনরায় প্রথম থেকে তাওয়াফ করা, দো'আগুলো অনুচ্চস্বরে পড়া, যেকোন আকর্ষণীয় দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখা, রুক্‌নে ইয়ামানীকে চুম্বন করা।

তাওয়াফে নিষিদ্ধ কাজসমূহ

জানাবত, হায়য ও নিফাস ইত্যাকার অপবিত্র অবস্থায় 'তাওয়াফ' করা, বে-ওযূ তাওয়াফ করা, অকারণে কারো কাঁধে চড়ে বা যানবাহনে তাওয়াফ করা, এভাবে বিনা কারণে হাঁটুর উপর ভর করে কিংবা উল্টো দিকে তাওয়াফ করা, তাওয়াফ কালে হাতিমের মধ্য দিয়ে যাওয়া, তাওয়াফের কোন চক্কর বা অংশ বিশেষ বাদ দেয়া, হাজরে আসওয়াদ ছাড়া অন্য কোন স্থান থেকে তাওয়াফ শুরু করা, তাওয়াফের ওয়াজিবসমূহের কোন একটি ছেড়ে দেয়া।

রামাল (رمل)

কাছাকাছি পা রেখে লাফিয়ে লাফিয়ে তাড়াতাড়ি এবং কাঁধ দু'টোকে হেলিয়ে দুলিয়ে চলার নাম রামাল। যে তাওয়াফের পর সা'ঈ করা হয় না ওই তাওয়াফে রামাল নেই। হ্যাঁ, যে তাওয়াফের পরে সা'ঈ করবে সে তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে রামাল করতে হয়। তিন চক্করের পর রামাল নেই। কোন কারণে রামাল করতে না পারলে কোন অসুবিধা নেই।

ইদ্বতিবা' (اضطباع)

ইহরামের দু'টি চাদরের উপরের চাদরের একাংশকে ডান বগলের নিচ থেকে বের করে বাম কাঁধের উপর ঝুলানোর নাম ইদ্বতিবা'। যখনই রামাল করা হয় তখন তো ইদ্‌তিবা' করা হয়, এরপর সাত চক্কর পর্যন্ত ইদ্বতিবা' করতে হয় ।

সা'ঈ

সা'ঈ অর্থ দৌড়ানো, হজ্জ্ ও ওমরার করণীয় কাজ হিসেবে সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে শরীয়ত নির্দেশিত নিয়মে সাতবার চক্কর (বা আসা-যাওয়া)-এর নামই

সা'ঈ। সাফা-মারওয়া হচ্ছে দু'টি পাহাড়, এ দু'টি মসজিদুল হারামের সাথে লাগানো। 'ইফরাদ' হজ্জ পালনকারীর জন্য তাওয়াফে যিয়ারতের পরে সা'ঈ করা উত্তম এবং ক্বিরান পালনকারীর জন্য তাওয়াফে কুদুমের সাথে সা'ঈ আদায় করে নেয়া উত্তম। তাওয়াফে কুদুমের পরে সা'ঈ সম্পন্ন করা হলে তাওয়াফে যিয়ারতের পর সা'ঈ করার প্রয়োজন হয় না।

সা'ঈ সম্পর্কে জরুরী মাসা-ইল

সা'ঈ-এর শর্তাবলী

১. সা'ঈ করার পূর্বে হজ্ব্ অথবা ওমরার ইহরাম পরা।
২. সা'ঈ নিজে করা। সা'ঈতে প্রতিনিধিত্ব জায়েজ নেই।
৩. সা'ঈ তাওয়াফের পরে হওয়া। অর্থাৎ- তাওয়াফের পরে সা'ঈ করবে, আগে নয়; তাওয়াফ ওয়াজিব হোক কিংবা নফলী হোক।
৪. সা'ঈ যথাসময়ে করা। তবে এ শর্ত কেবল হজ্জের সা'ঈর জন্য, ওমরার সা'ঈর জন্য নয়। অবশ্য ক্বিরান বা তামাত্তু' পালনকারীর জন্য তাদের ওমরার সা'ঈ সঠিক সময়ে অবশ্যই আদায় করবে।
৫. সা'ঈ সাফা থেকে শুরু করে মারওয়াতে শেষ করা। মারওয়া থেকে সাফার দিকে করলে সা'ঈ হবে না।

সা'ঈর ওয়াজিবসমূহ

১. এমন তাওয়াফের পর সা'ঈ করা, যা হায়য-নিফাস ও জানাবত ইত্যাদি থেকে পবিত্র অবস্থায় সম্পন্ন করা হয়েছে।
২. পদব্রজে সা'ঈ করা। বিনা কারণে কোন বাহন দ্বারা সা'ঈ করলে 'দম' দিতে হবে।
৩. সাত চক্কর পূর্ণ করা।
৪. সাফা-মারওয়ার মধ্যখানে পূর্ণ দূরত্ব অতিক্রম করা। অর্থাৎ- সাফার সাথে পায়ের মুড়ি স্পর্শ করা অথবা সাফার উপর আরোহণ করতে থাকা এবং মারওয়ার সাথে পায়ের আঙ্গুলসমূহ স্পর্শ করা।
৫. ওমরার সা'ঈতে শেষ পর্যন্ত ইহরাম বিদ্যমান রাখা।

সা'ঈর সুন্নাতসমূহ

১. হাজরে আসওয়াদে চুম্বন কিংবা ইস্তিলাম করে সা'ঈর জন্য মসজিদ থেকে বের হওয়া।
২. তাওয়াফের পর পরই সা'ঈ করা।
৩. সাফা-মারওয়ায় আরোহন করে ক্বেবলামুখী হওয়া।

৪. সা'ঈর চক্করগুলো বিরতি ছাড়াই সম্পন্ন করা।
৫. জানাবত ও হায়য থেকে পবিত্র হওয়া।
৬. পবিত্র অবস্থায় কৃত তাওয়াফের পরে সা'ঈ করা।
৭. সবুজ স্তম্ভ দু'টির (মাইলাঈনে আখ্দ্বারাঈন) মাঝখানে দ্রুত অতিক্রম করা।
৮. সতর ঢেকে রাখার প্রতি অধিক যত্নবান হওয়া।

সা'ঈর মুস্তাহাবসমূহ

১. সা'ঈর নিয়্যত করা।
২. সাফা-মারওয়াতে যথেষ্ট সময় পর্যন্ত অবস্থান করা।
৩. বিনম্র চিত্তে যিক্র ও দো'আগুলো পাঠ করা।
৪. সা'ঈ শেষে মসজিদুল হারামে এসে দু'রাকাত নফল নামায সম্পন্ন করা।
৫. বিনা কারণে কোন চক্কর বেশিক্ষণ বিলম্বিত হলে পুনরায় প্রথম থেকে সা'ঈ করা । অবশ্যই বেশির ভাগ চক্কর আদায় করার পর এমনটি ঘটলে নতুন করে আরম্ভ করার প্রয়োজন নেই।

কিছু জরুরী জ্ঞাতব্য বিষয়

মহিলাদের হজ্ব্

হজ্জের বিধানাবলীর মধ্যে সবচেয়ে বড় রুকন (ফরয) হচ্ছে আরফাতে অবস্থান করা। এতে হায়য-সম্পন্না, জুনুবী ও নিফাস সম্পন্না মহিলা সবার জন্য শামিল হওয়ার অনুমতি রয়েছে। ২য় ফরয হচ্ছে তাওয়াফে যিয়ারত। কোন মহিলা তাওয়াফে যিয়ারত পর্যন্ত হায়য-নিফাস সম্পন্না থাকলে তার অপেক্ষা করা উচিত। যেহেতু তাওয়াফ মসজিদেই হয়। আর এ ধরনের অপবিত্রাবস্থায় মসজিদে প্রবেশের অনুমতি নেই। অপেক্ষা করতে করতে তাওয়াফের সময়সীমা অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও ক্ষতি নেই। পরেও তাওয়াফ করা যাবে এবং এ বিলম্বের জন্য দম দিতে হবে না। হ্যাঁ কোন পুরুষ যদি এ সময়ের অভ্যন্তরে তাওয়াফ না করে তবে তাকে দম দিতে হবে।

কোন মহিলা ইহরাম কিংবা ওয়াকূফে আরাফার সময় হায়য সম্পন্না হয়ে গেলে সে পুনরায় গোসল করে ইহরাম পড়বে আর তাওয়াফ ছাড়া হজ্জের সকল কাজ রীতিমত সম্পন্ন করবে।

তাওয়াফে যিয়ারত করা অবস্থায় কোন মহিলা হায়য সম্পন্ন বা অসুস্থ হয়ে গেলে এবং এ অবস্থায় যদি তাওয়াফের নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হয়ে যায়, তাহলে এর পরে তাওয়াফ করবে। এর জন্য কোন দম দিতে হবে না। তাওয়াফে বিদা'র সময় হায়য প্রকাশ পেলে বা অসুস্থ হয়ে গেলে এবং ঘরে ফিরে যেতে বাধ্য হয়ে পড়লে

তাওয়াফে বিদা' পুনরায় করার প্রয়োজন নেই। অবশ্য পুরুষদের জন্য ওয়াজিব। উল্লেখ্য, যে সকল কারণে পুরুষের হজ্জ্ ভঙ্গ হয়ে যায়, সেসব কারণে মহিলাদের হজ্জ্ ভেঙ্গে যায়।

ইহরাম অবস্থায় মহিলাদের জন্য সেলাই করা পোশাক, রঙ্গিন কাপড়, রেশমি কাপড়, হাত-পায়ের মোজা, কামিজ, ওড়না, অলঙ্কার ইত্যাদি পড়া জায়েয। তবে খুশবু ব্যবহার করা বৈধ নয়।

মহিলাগণ ইহরামে মাথা ঢাকবেন, চেহারা নয়। তালবিয়্যাহ এত নিম্নস্বরে বলবে যাতে নিজে শুনতে পায়, অপর কেউ শুনতে না পায়। মহিলাগণ তাওয়াফে রামাল ও ইদ্বতিবা' করবে না। হাজরে আসওয়াদকে ভিড় ঠেলে চুম্বনের প্রয়োজন নেই। তাদের জন্য ইস্তিলাম বা দূর থেকে হাতে ইঙ্গিত করা যথেষ্ট। মক্কামে ইব্রাহীমের নামাযও সুযোগ পেলে পড়বে, অন্যথায় মসজিদুল হারামের যে কোন জায়গায় পড়ে নিতে পারবে। সা'ঈ করার সময় মহিলাগণ দু' সবুজ স্তম্ভের মধ্যখানে দৌঁড়াবে না। সাফা-মারওয়ার উপরেও লোকের ভিড় ঠেলে আরোহন করার প্রয়োজন নেই। ইহরাম থেকে হালাল হওয়ার সময় মহিলাগণ এক আঙ্গুলের অগ্রভাগ পরিমাণ চুল কাটবেন। মাথা মুন্ডানো মহিলাদের জন্য বৈধ নয়। উল্লেখ্য যে, মহিলাদের জন্য নিজ স্বামী কিংবা মুহরিম (যার সাথে বিবাহ হারাম) ব্যতীত হজ্জ করা হারাম।

ওজর সম্পন্ন ব্যক্তির হজ্জ্

শরীয়ত অসুস্থ ও বিবেকভ্রষ্ট ব্যক্তির উপর হজ্জ্ ফরয করেনি। অবশ্য কেউ তার পক্ষ হয়ে হজ্জের কার্যাদি সম্পন্ন করবে। যেহেতু হজ্জের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রুকন আরাফাতে অবস্থান করা, সেহেতু অসুস্থ ব্যক্তিকে অবশ্যই ওয়াকূফ স্থলে নিয়ে যাবে এবং সে ইহরাম অবস্থায় থাকলে তার সাথী তার পক্ষ হয়ে তালবিয়্যাহ্ পড়বে, অন্যথায় সহকারী ব্যক্তি প্রথমে ইহরাম পড়বে এবং পরে তালবিয়্যাহ্ পড়বে।

নাবালেগ শিশুর হজ্জ্

এদের উপর হজ্জ ফরয নয়। অবশ্য কেউ যদি ছোট শিশুসহ পরিবার-পরিজন নিয়ে হজ্জে যেতে চান, তাহলে শিশুদের হজ্জ নফল হবে। এমতাবস্থায় ছোট ছেলেকেও সেলাই বিহীন কাপড় পরাবেন আর নিজের ইহরামের সাথে শিশুর ইহরামে নিয়্যতও করবেন। শিশু নিজে হজ্জের আরকানগুলো পালনে সক্ষম হলে তো নিজেই করবে, অন্যথায় অভিভাবক তালবিয়াহ্সহ সমস্ত কাজ সম্পন্ন করবেন। শিশুর পক্ষ থেকে সমাধা করার সময় কোন কাজ বাদ পড়ে গেলে বা কোন নিষিদ্ধ কাজ করা গেলে তার কোন দম (দন্ড) দিতে হবে না।

জিনায়াত বা ভুলত্রুটি

এমন কোন অপরাধ বা কাজ করা, যা হেরেম এলাকায় কিংবা ইহরাম অবস্থায় করা নিষিদ্ধ তা হচ্ছে জিনায়ত। যেমন হেরেম এলাকায় ঘাস, লতাপাতা, গাছ-পালা কাটা এবং এলাকার পশু শিকার করা, এদের কষ্ট দেয়া বা উত্যক্ত করা ইত্যাদি হেরেমের ত্রুটি-বিচ্যুতি হিসাবে বিবেচিত। আর সেলাই করা কাপড় পরিধান করা, মাথা-চেহারা ঢেকে নেওয়া, নখ কাটা, চুল পরিস্কার করা, সুগন্ধি ব্যবহার করা, স্ত্রী সহবাস করা ও স্থলভাগের পশু শিকার করা এবং হজ্জের ওয়াজিবসমূহ থেকে কোন একটা বর্জন করা ইত্যাদি ইহরামের নিষিদ্ধ কার্যাবলী বলে চিহ্নিত। এ উভয় প্রকারের ত্রুটি-বিচুতির কোন একটা করে থাকলে তজ্জন্য দম বা 'বদলা' দেয়া ওয়াজিব।

কাফ্ফারা

হজ্জে ত্রুটি-বিচ্যুতি তথা কোন অপরাধ হয়ে গেলে এর কাফ্ফারা স্বরূপ তিনটা জিনিস অবস্থা ভেদে ওয়াজিব হয়- ১. দম, ২. সদক্বাহ্, ও ৩. রোযা। এ সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলঃ

ভুলত্রুটি ও অপরাধ কোন ওযর ছাড়াও সংঘটিত হতে পারে; আবার ওযরের কারণেও প্রকাশ পেতে পারে। ওযরবিহীন সংঘটিত ভুল যদি পরিপূর্ণভাবে সম্পাদিত হয়, তাহলে কাফ্ফারা হিসাবে নিশ্চিতভাবে দম দিতে হবে। আর বিনা ওযরে সংঘটিত হলে এবং কাজটি অসম্পূর্ণরূপে করা হলে, নিশ্চিতরূপে সদক্বাহ্ ওয়াজিব হয়। ওযরের কারণে সংঘটিত অপরাধ যদি পূর্ণরূপে সম্পাদিত হয়, তাহলে দম, সাদক্বাহ এবং রোযা এই তিনটা থেকে কোন একটা দ্বারা কাফ্ফারা দেয়া যায়। উপরে উল্লেখিত হেরম এলাকার ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য এবং স্থলভাগের পশু শিকারের বেলায় সম্ভব হলে তদনুযায়ী পশু যবেহ করা বা সমপরিমাণ মূল্য সাদক্বাহ কিংবা একটি রোযা আদায় করা যায়। ইহরামের ত্রুটি-বিচ্যুতির বেলায় 'ক্বারিন' (ক্বিরান আদায়কারী) যদি ওমরাহ্ পালন করার পূর্বে ত্রুটি প্রকাশ পায়, তাকে দ্বিগুণ কাফ্ফারা আদায় করতে হবে; যেহেতু তার ওমরা ও হজ্ব দুটোরই ইহরাম রয়েছে। আর ইফরাদকারীকে ইহরামের পরে সংঘটিত ত্রুটির জন্য একটা কাফ্ফারা দিতে হবে।

উল্লেখ্য যে, ইহরামের নিষিদ্ধ কাজগুলো ওযরের কারণে প্রকাশ পেলেও কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়। ওযরের কারণে হজ্জের কোন ওয়াজিব বাদ পড়ে গেলে কাফ্ফারা দিতে হয় না।

হজ্জের কাফ্ফারায় সাদক্বাহ বলতে সাধারণতঃ এক ফিতরা পরিমাণ অর্থাৎ অর্ধ সা' ২ কেজি ৫০ গ্রাম গম বা খাদ্য দ্রব্য বুঝায়। সময়ভেদে পূর্ণ এক সা' অর্থাৎ- সাড়ে

৪ কেজি ১০০ গ্রাম সাদক্বাহ দিতে হয়। দম বলতে বিশেষ করে হজ্বের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য পশু যবেহকে বুঝায়। ক্বোরবানীর মত এখানে মেষ ছাগল ইত্যাদির একটি কিংবা গরু-উট ইত্যাদির এক সপ্তমাংশ যথেষ্ট; কিন্তু হায়য-নিফাস অবস্থায় তাওয়াফে যিয়ারত করলে অথবা আরাফাতে অবস্থানের পর এবং মাথা মুণ্ডানোর পূর্বে স্ত্রী সহবাস করলে পূর্ণ উট বা পূর্ণ গাভী দম হিসেবে যবেহ করতে হয়।

হজ্জের ক্বাযা ওয়াজিব হওয়ার কারণ

নিম্নলিখিত কারণে হজ্জ্ ক্বাযা করা ওয়াজিব

১. ওকূফে আরাফাহ বাদ পড়লে।
২. ইহসার বা শরীয়ত সমর্থিত কোন বাধার কারণে ওয়াক্বূফে আরফাহ থেকে বাধাপ্রাপ্ত হলে।
৩. স্ত্রী সহবাস দ্বারা হজ্জ ভঙ্গ করে ফেললে।
৪. হজ্জের নিয়্যতে ইহরাম করার পর ইহরাম ছেড়ে দিলে।

হজ্জে বদল

ইবাদতসমূহ শরীয়তের আলোকে তিন প্রকার

১. ইবাদতে মালী যেমন যাকাত, সাদক্বা, ফিতরা ইত্যাদি। এগুলো আদায় করার জন্য প্রয়োজন হোক কিংবা না-ই হোক প্রতিনিধি নিযুক্ত করা যায়।
২. ইবাদতে বদনী বা শারীরিক ইবাদত। যেমন- নামায, রোযা ইত্যাদি । এসব ইবাদত অন্য কারো দ্বারা সম্পন্ন করার নিয়ম নেই।
৩. ইবাদতে মালী ও বদনীর সমন্বয়ে; যেমন- হজ্জ। এটা প্রতিনিধি দ্বারা তখনই কেবল সম্পন্ন করানো যায়, যখন কারো উপর হজ্জ ফরয হয়; কিন্তু সে হজ্জ আদায় করতে সমর্থ হয় না। যেমন- এক ব্যক্তির উপর হজ্জ ফরয হলো এবং সে হজ্জ আদায় করার সময়ও পেলো; কিন্তু সে তখন আদায় করেনি। পরে বিভিন্ন কারণে আদায় করার সামর্থ্য হারিয়ে ফেললো। যেমন- মৃত্যুবরণ করলো, বা কোন কারণে বন্দী হয়ে পড়লো কিংবা এমন রোগে আক্রান্ত হলো যা আ-মৃত্যু আরোগ্য হবার নয়; যেমন- অর্দ্ধাঙ্গ রোগে আক্রান্ত, অন্ধ কিংবা খোঁড়া হয়ে গেলো অথবা এতবেশী বৃদ্ধ হয়ে গেলো যে, যানবাহনে আরোহণ করতে অক্ষম হয়ে পড়লো। মহিলার জন্য মুহরিম না থাকা এবং যাতায়তের পথ নিরাপদ না থাকা ইত্যাদি অবস্থায় অন্য কারো দ্বারা হজ্জ্ করাবে অথবা ওসীয়ত করে যাবে। নফল হজ্জ্ এবং নফল ওমরার বেলায় যে কোন অবস্থাতেই, সামর্থ্য থাকুক বা না থাকুক প্রতিনিধি দ্বারা আদায় করানো যায়। এর জন্য প্রতিনিধি

মুসলমান হওয়া, বালেগ হওয়া এবং বিবেক সম্পন্ন হওয়া যথেষ্ট; কিন্তু ফরয হজ্জের প্রতিনিধিত্বের জন্য কিছু বাড়তি শর্ত রয়েছে; যা নিম্নরূপ-

১. যার পক্ষে হজ্জ্ করবে তার উপর হজ্জ্ ফরয হওয়া।
২. হজ্জ্ ফরয হওয়ার পর আদায়ে সামর্থ্যহীন হয়ে পড়া।
৩. এর অক্ষমতা আমৃত্যু বহাল থাকা।
৪. অন্য জনকে হজ্জ্ আদায় করার জন্য নিজে নির্দেশ প্রদান করা; তার অবর্তমানে ওয়ারিশ নির্দেশ দেয়া।
৫. হজ্জের যাবতীয় খরচ নিয়্যতকারীর পক্ষ থেকে হওয়া।
৬. নিয়োগকারীর নামে (পক্ষ) ইহরাম বাঁধা।
৭. কেবল একজন ব্যক্তির পক্ষে ইহরাম বাঁধা।
৮. কেবল একটি হজ্জের ইহরাম বাঁধা।
৯. নিয়োগকৃত ব্যক্তি নিজেই হজ্ব সম্পাদন করা। (অবশ্য, এটা উত্তম।)
১০. নিয়োগকৃত ব্যক্তি সুনির্দিষ্ট হওয়া।
১১. সম্ভাব্য ক্ষেত্রে নিয়োগকারীর এলাকা থেকেই হজ্জে রওয়ানা হওয়া।
১২. যানবাহনে করে হজ্জে যাওয়া; অর্থাৎ- টাকা বাঁচানোর মানসে পদব্রজে না যাওয়া।
১৩. হজ্জ্ বা ওমরা যার জন্য নির্দেশ করবে সেটাই পালন করা।
১৪. নিয়োগকারীর ইচ্ছা মাফিক ইফরাদ, তামাত্তো' কিংবা ক্বিরান যেটার জন্য নিয়োগ করবে সেটাই পালন করা।
১৫. নিয়োগকারীর মীক্বাত থেকেই ইহরাম বাঁধা।
১৬. হজ্জে বদল সম্পন্নকারী কোন কাজ দ্বারা হজ্জ্ নষ্ট না করা। অন্যথায় নিজ খরচে তাকেই তার ক্বাযা দিতে হবে।
১৭. দায়িত্ব নেওয়ার পর হজ্জ্ যথারীতি আদায় করা; অর্থাৎ- কোন কারণে হজ্জ্ বাদ না দেয়া।
১৮. নিয়োগদাতা ও নিয়োগকৃত উভয়ে মুসলমান হওয়া।
১৯. উভয়ে বিবেকবান হওয়া এবং
২০. নিয়োগকৃত ব্যক্তি হজ্জের মাসআলা সম্পর্কে জ্ঞাত ও ওয়াকিবহাল হওয়া।

যে ব্যক্তি এখনো নিজে হজ্জ্ আদায় করেনি সে অন্যের পক্ষ থেকে হজ্জ্ আদায় করলে আদায় হবে; কিন্তু মাকরূহ হবে। তাই সতর্কতা স্বরূপ এ ধরনের লোক দ্বারা 'হজ্জে বদল' না করানোই উচিত।

এমন ব্যক্তি দ্বারা হজ্জ করানো উত্তম, যিনি নিজে হজ্জ আদায় করেছেন, স্বয়ং আলিমে বা-আমল এবং হজ্জের মাসায়েল সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান রাখেন।

----<>----

মদীনা মুনাওয়ারায়

রওযা-ই আক্বদাসের যিয়ারত

অত্যন্ত আদব ও ভক্তিসহকারে মদীনা মুনাওয়ারায় প্রবেশ করবেন এবং নিম্নলিখিত দুরূদ শরীফ অধিক পরিমাণে পাঠ করবেন।

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

উচ্চারণঃ আস্‌সালা-তু ওয়াস সালা-মু আলায়কা ইয়া- রাসূ-লাল্লা-হ্‌।

শহরে প্রবেশ করার পূর্বে গোসল করা উত্তম। নতুবা শুধু ওযূ করে পরিস্কার, পরিচ্ছন্ন কাপড় পরবেন, খুশবু লাগাবেন এবং আদব সহকারে শহরে প্রবেশ করবেন। আর এ দো‘আ পাঠ করবেন-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَاِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَاَدْخِلْنَا دَارَكَ دَارَ السَّلَامِ وَتَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ - رَبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّ اجْعَلْ لِّىْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيْرًا - وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا - وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَاهُوَ شِفَآءٌ وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا-

উচ্চারণঃ বিস্‌মিল্লা-হির রাহমা-নির রাহী-ম। আল্লা-হুম্মা আন্‌তাস্‌ সালা-ম ওয়া মিনকাস্‌ সালা-ম ওয়া ইলায়কা ইয়ারজি‘উস্‌সালাম ফাহাইয়্যেনা-রাব্বানা-বিস্‌সালা-ম ওয়া আদ্‌খিলনা-দা-রাকা দা-রাস্‌ সালা-ম। তাবা-রাক্‌তা রাব্বানা-ওয়া তা‘আ-লায়তা এয়া-যাল জালা-লি ওয়াল ইকরা-ম। রাব্বি আদ্‌খিলনী-মুদ্‌খালা সিদ্‌ক্বিওঁ ওয়া আখ্‌রিজনী-মুখ্‌রাজা সিদ্‌ক্বিওঁ ওয়াজ্‌‘আল্‌লী মিল্লাদুনকা সুলত্বা-নান্নাসী-রা। ওয়াক্বুল জা----আল হাক্বক্বু ওয়া যাহাক্বাল বা-ত্বিলু ইন্নাল বা-ত্বিলা কা-না যাহু-ক্বা-। ওয়া নুনাযযিলু মিনাল ক্বোরআ-নি মা-হুয়া শিফা----উঁ ওয়া রাহ্‌মাতুল্লিল মু‘মিনী-না। ওয়ালা-ইয়াযী-দুয্‌ যোয়া-লেমী-ন ইল্লা-খাসা-রা-।

হেরম-ই নববী

এখন মসজিদ-ই নববী শরীফে প্রবেশ করবেন। প্রবেশ করার পূর্বে কিছু সাদক্বাহ্‌ করবেন। আর প্রবেশ করার সময় এ দো‘আ পাঠ করবেন-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ - اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ الْيَوْمَ مِنْ اَوْجَهِ مَنْ تَوَجَّهَ اِلَيْكَ وَاَقْرَبِ مَنْ تَقَرَّبَ اِلَيْكَ وَاَنْجَحِ مَنْ دَعَاكَ وَابْتَغٰى مَرْضَاتِكَ -

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা সল্লি ‘আলা- সাইয়্যিদিনা- মুহাম্মাদিওঁ ওয়া ‘আলা-আ-লি সায়্যিদিনা-মুহাম্মাদিন। আল্লা-হুম্মাগ্‌ফিরলী-যূনূবী-ওয়াফ্‌তহ্‌লী-আব্‌ওয়া-বা রাহ্‌মাতিকা। আল্লা-হুম্মাজ্‌ ‘আলনিল ইয়াউমা মিন্‌ আউজাহি মান তাওয়াজ্জাহা ইলায়কা ওয়া আক্বরাবি মান তাক্বাররাবা ইলায়কা ওয়া আন্‌জাহি মান্‌ দা‘আ-কা ওয়া আব্‌তাগা-মারদ্বা-তিকা।

এরপর মিম্বর ও রওযা শরীফের মধ্যভাগে ‘তাহিয়্যাতুল মসজিদ’-এর নামায আদায় করবেন। এ পবিত্র স্থানটুকু সম্পর্কে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে-

مَابَيْنَ بَيْتِىْ وَمِنْبَرِىْ رَوْضَةٌ مِّنْ رِّيَاضِ الْجَنَّةِ

অর্থাৎ আমার ঘর ও মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানটা জান্নাতের বাগানসমূহের একটা বাগান।

যদি এখানে স্থান পাওয়া না যায় তবে মসজিদ শরীফের যেখানেই ইচ্ছা হয় পড়ে নেবেন। ‘তাহিয়্যাতুল মসজিদ’-এর নিয়্যত করবেন। প্রথম রাক্‌‘আতে ‘সূরা ফাতিহা’র পর ‘সূরা কাফিরূন’ এবং ২য় রাক‘আতে ‘সূরা ফাতিহা’র পর ‘সূরা ইখ্‌লাস’ পড়বেন। নামায সম্পন্ন করার পর এ সৌভাগ্য লাভ করার জন্য আল্লাহর দরবারে শোকরিয়ার সাজদা করবেন। অতঃপর পড়বেন-

রওযা-ই আক্বদাসের দো‘আ

اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذِهٖ رَوْضَةٌ مِّنْ رِّيَاضِ الْجَنَّةِ شَرَّفْتَهَا وَكَرَّمْتَهَا وَمَجَّدْتَّهَا وَعَظَّمْتَهَا وَنَوَّرْتَهَا بِنُوْرِ نَبِيِّكَ وَحَبِيْبِكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ - اَللّٰهُمَّ كَمَا بَلَّغْتَنَا فِى الدُّنْيَا زِيَارَتَهٗ وَمَاٰثِرَهُ الشَّرِيْفَةَ فَلَا تَحْرِمْنَا يَآ اَللّٰهُ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ فَضْلِ شَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحْشُرْنَا فِىْ زُمْرَتِهٖ وَتَحْتَ لِوَائِهٖ وَاَمِتْنَا عَلٰى مَحَبَّتِهٖ وَسُنَّتِهٖ وَاسْقِنَا مِنْ حَوْضِهِ الْمَوْرُوْدِ مِنْ يَّدِهِ الشَّرِيْفَةِ شَرْبَةً هَنِيْئَةً لَّا نَظْمَأُ بَعْدَهَا اَبَدًا اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ-

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্না হা-যিহী- রওদ্বাতুম্‌ মিন রিয়া-দ্বিল জান্নাতি শাররাফ্‌তাহা-ওয়া কাররামতাহা-ওয়ামাজ্জাত্তাহা-ওয়া ‘আয্‌যামতাহা-ওয়া নাওভারতাহা-

বিনূ-রি নাবিয়্যিকা ওয়াহাবী-বিকা মুহাম্মাদিন্ সাল্লাল্লা-হু তা'আ-লা আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম। আল্লা-হুম্মা কামা-বাল্লাগ্তানা-ফিদ্দুনিয়া-যিয়া-রাতাহূ-ওয়া মা'আ-সিরাহুশ শরীফ-ফাতা, ফালা-তুহ্রিমনা-এয়া-আল্লা-হু-ফিল আ-খিরাতি মিন ফাদ্বলি শাফা-'আতি মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লা-হু তা'আ-লা- আলায়হি ওয়া আ-লিহী- ওয়াসাল্লাম। ওয়াহ্শুরনা-ফী-যুম্রাতিহী-ওয়া তাহ্তা লিওয়া-ইহী-ওয়া আমিত্না-'আলা-মাহাব্বাতিহী-ওয়া সুন্নাতিহী-ওয়াস্ক্বিনা-মিন হাউদ্বিহিল মাওরূ-দি মিন ইয়াদিহিশ্ শারী-ফাতি শারবাতান হানী-আতাল লা-নায্মাউ বা'দাহা-আবাদা-। ইন্নাকা 'আলা-কুল্লি শায়ইন ক্বাদী-র।

নূরানী মাযার শরীফে উপস্থিত হওয়া ও যিয়ারত করার নিয়মাবলী

'তাহিয়্যাতুল মসজিদ'-এর নামায আদায় করার পর উপরোক্ত দো'আটি পাঠ করে 'রওযা-ই আক্বদাস'-এর নিকট হাযির হবেন এবং অতীব আদব সহকারে হাত বেঁধে এমনভাবে দাঁড়াবেন যেন হুযূরে আকরামের বরকতময় জীবদ্দশায় হুযূরের সামনে দাঁড়িয়েছেন। আপন চেহারা হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারা মুবারকের দিকে ক্বেবলার দিকে পিঠ করে দণ্ডায়মান হবেন। আর আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক সূরতকে স্বীয় খেয়ালে ধ্যান করবেন। আর মনে মনে এ ধারণা পোষণ করবেন যে, হুযূর রওযা শরীফে হায়াত মুবারকেই রয়েছেন আর আমার উপস্থিতি সম্পর্কে অবগত আছেন এবং আমার আরযসমূহ শুনছেন।

নূরানী গড়ন মুবারক

হুযূরের নূরানী গড়ন মুবারক মধ্যম; কিন্তু লোক সমাগমে হুযূরকে সবার উপরে দেখা যেতো। চেহারা মুবারকের রং গমবর্ণ, যাতে পূর্ণ লাবণ্য ও মসৃণতা সমুজ্জ্বল। হুযূরের শির মুবারক বড় ও সুন্দর। চুল মুবারক কালো। আর শির মুবারকের মধ্যভাগে শিঁথি সুস্পষ্টরূপে দৃষ্ট হতো। মুবারক কর্ণদ্বয় না ছিল অধিক বড়, না ছিল খুব ছোট, দেখতে খুব সুদৃশ্য। হুযূরের ভ্রু মুবারক মিলিত; কিন্তু একটা সুক্ষ্ম শিরা উভয়ের মধ্যে পৃথককারী পর্যায়ের ছিলো। চক্ষুদ্বয় বড় ও অত্যন্ত সুবর্ণ ছিলো। সাদার উপর লাল বর্ণের রেখা দৃষ্টিগোচর হতো, চোখের মণিদ্বয় কালো। চেহারা মুবারক নরম ও মাংসে পূর্ণ। হুযূরের দাঁত মুবারক সাদা ও চমকদার; কথা বলার সময় সেগুলোর চমক বিজলীর ন্যায় আলো বিকিরণ করতো। উভয় স্কন্ধের মধ্যভাগে 'মোহর-ই নবূয়ত' খচিত।

এটা কল্পনা করতে করতে পরিপূর্ণ আদবসহকারে অশ্রুসজল হয়ে নিম্নলিখিত দো'আ পাঠ করবেন-

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ السَّيِّدُ الْكَرِيْمُ وَالرَّسُوْلُ الْعَظِيْمُ الرَّؤُفُ الرَّحِيْمُ ـ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ ـ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاسَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَحَبِيْبَنَا وَقُرَّةَ اَعْيُنِنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ـ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰهِ ـ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا جَمَالَ مُلْكِ اللّٰهِ ـ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نُوْرَ عَرْشِ اللّٰهِ ـ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ خَلْقِ اللّٰهِ ـ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَفِيْعَ الْمُذْنِبِيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ ـ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ اَرْسَلَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ ـ وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِىْ حَقِّكَ الْعَظِيْمِ ﴿وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْآ اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَلَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوْا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا﴾

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ يَاطٰهٰ يَايٰسٓ يَا بَشِيْرُ يَا سِرَاجُ يَامُنِيْرُ يَا مُقَدَّمَ جَيْشِ الْاَنْبِيَآءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَهَآ أَنَا يَاسَيِّدِىْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ـ قَدْ جِئْتُكَ هَارِبًا مِّنْ ذَنْبِىْ مِنْ عَمَلِىْ وَمُسْتَشْفِعًا وَّ مُسْتَجِيْرًا بِكَ اِلٰى رَبِّىْ فَاشْفَعْ لِىْ يَاشَفِيْعَ الْاُمَّةِ يَا كَاشِفَ الْغُمَّةِ يَاسِرَاجَ الظُّلْمَةِ اَجِرْنِىْ بِهٖ يَآاَللّٰهُ مِنَ النَّارِ يَانَبِىَّ الرَّحْمَةِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ـ اَتَيْنَاكَ زَآئِرِيْنَ وَقَصَدْنَاكَ رَاغِبِيْنَ ـ وَعَلٰى بَابِكَ الْعَالِىْ وَاقِفِيْنَ وَبِحَقِّكَ عَارِفِيْنَ فَلَا تَرُدَّنَا خَآئِبِيْنَ وَلَا عَنْ بَابِ شَفَاعَتِكَ مَحْرُوْمِيْنَ يَاسَيِّدِىْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ـ اَسْأَلُكَ الشَّفَاعَةَ وَأَسْأَلُ اللّٰهَ تَعَالٰى لَكَ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَالْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ وَالْحَوْضَ الْمَوْرُوْدَ وَالشَّفَاعَةَ الْعُظْمٰى فِى الْيَوْمِ الْمَشْهُوْدِ ـ شعر

يَاخَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ فِى التُّرْبِ اَعْظُمُهٗ
فَطَابَ مِنْ طِيْبِهِنَّ الْقَاعُ وَالْاَكَمُ
نَفْسِىْ الْفِدَاءُ لِقَبْرٍ اَنْتَ سَاكِنُهٗ
فِيْهِ الْعَفَافُ وَفِيْهِ الْجُوْدُ وَالْكَرَمُ

اَنْتَ الْحَبِيْبُ يَا حَبِيْبَ اللّٰهِ اَنْتَ الشَّفِيْعُ يَاشَفِيْعَ اللّٰهِ اَنْتَ الْمُشَفَّعُ اَنْتَ الَّذِىْ تُرْجٰى شَفَاعَتُكَ عِنْدَ الصِّرَاطِ اِذَا مَازَلَّتِ الْقَدَمُ اَشْهَدُ اَنَّكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ وَاَدَّيْتَ الْاَمَانَةَ وَنَصَحْتَ الْاُمَّةَ وَكَشَفْتَ الْغُمَّةَ وَجَلَيْتَ الظُّلْمَةَ وَجٰهَدْتَّ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ وَعَبَدْتَّ رَبَّكَ حَتّٰى اَتَاكَ الْيَقِيْنُ جَزَاكَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنَّا وَعَنْ وَالِدَيْنَا وَعَنِ الْاِسْلَامِ خَيْرَ الْجَزَآءِ وَنَسْئَلُكَ الشَّفَاعَةَ اَنْ تَشْفَعَ لَنَا عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْعَرْضِ يَوْمَ الْفَزَعِ الْاَكْبَرِ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُوْنٌ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ اِشْفَعْ لَنَا وَلِوَالِدَيْنَا وَلِجِيْرَانِنَا وَلِمَشَآئِخِنَا وَلِاُسْتَاذِنَا وَلِمَنْ اَوْصٰنَا وَقَلَّدَنَا عِنْدَكَ بِدُعَآءِ الْخَيْرِ عِنْدَ الزِّيَارَةِ ـ اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سُلْطَانَ الْاَنْبِيَآءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ ـ

উচ্চারণঃ আস্‌সালা-মু আলায়কা ইয়া-আইয়ূ্যহান্নাবিয়্যু, আস্‌ সাইয়্যেদুল করী-মু ওয়ার রসূ-লুল ‘আযী-মু, আর্‌ রাঊ-ফুর রহী-ম। ওয়া রাহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু। আস্‌সালা-তু ওয়াস্‌সালা-মু আলায়কা এয়া-সাইয়্যেদানা- ওয়া নাবিয়্যানা-ওয়া হাবী-বানা-ওয়া ক্বোর্‌রাতা আ’য়ুনিনা-এয়া-রাসূলাল্লা-হ। আস্‌সালা-তু ওয়াস্‌ সালা-মু ‘আলায়কা এয়া নবীয়্যাল্লাহ্‌! আস্‌সালা-তু ওয়াস্‌ সালামু আলায়কা এয়া- হাবী-বাল্লা-হ্‌। আস্‌সালা-তু ওয়াস্‌সালা-মু ‘আলায়কা এয়া-জামা-লা মুল্‌কিল্লাহ্‌। আস্‌সালা-তু ওয়াস্‌সালা-মু আলায়কা এয়া-নূ-রা ‘আরশিল্লাহ্‌! আস্‌সালা-তু ওয়াস্‌সালা-মু আলায়কা এয়া-খায়রা খালক্বিল্লা-হ্‌! আস্‌সালা-তু ওয়াস্‌সালা-মু আলায়কা এয়া-শাফী‘আল মুয্‌নিবী-না ‘ইন্দাল্লা-হ্‌। আস্‌সালা-তু ওয়াস্‌সালা-মু আলায়কা এয়া মান্‌ আরসালাহুল্লা-হু তা‘আলা রাহমাতাল্লিল ‘আ-লামী-ন। ওয়া ক্বাদ ক্বা-লাল্লা-হু তা‘আলা- ফি-হাক্বক্বিকাল আ‘যী-মঃ “ওয়ালাউ আন্নাহুম ইয্‌ যোয়ালামূ---আন্‌ফুসাহুম্‌ জা----ঊ-কা ফাস্‌তাগফারুল্লা-হা ওয়াস্‌তাগফারা লাহুমুর রসূ-লু লাওয়াজাদুল্লা-হা তাওয়া-বার্‌ রহী-মা-।”

আস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালা-মু আলায়কা এয়া-মুহাম্মাদুব্‌না‘আবদিল্লাহিব্‌নি ‘আবদিল মুত্তালিবিব্‌নি হা-শিমিন্‌। এয়া ত্বোয়-হা, এয়া-এয়া-সী-ন, এয়া বশী-রু, এয়া সিরা-জু, এয়া মুনী-রু, এয়া-মুক্বাদ্দামা জায়শিল আম্বিয়া-ই ওয়াল মুরসালী-ন। ওয়া হা-আনা এয়া-সাইয়্যিদী-এয়া-রাসূ-লাল্লা-হ্‌, ক্বাদ জি’তুকা হা-রিবাম্‌ মিন যাম্বী-

মিন ‘আমালী-, ওয়া মুসতাশফি‘আওঁ ওয়া মুস্তাজী-রাম্‌ বিকা ইলা-রাব্বী-। ফাশ্‌ফা’লী-এয়া-শাফী-‘আল উম্মাতি, এয়া- কা-শিফাল গুম্মাহ্‌, এয়া-সিরা-জায্‌ যুলমাহ্‌, আজিরনী-বিহী-এয়া-আল্লা-হু মিনান্না-র। এয়া-নাবিয়্যার রাহমাতি, এয়া-রাসূ-লাল্লাহ-হ্‌! আতায়না-কা যা-ইরী-না ওয়া ক্বাসাদ্‌না-কা রা-গিবী-না ওয়া ‘আলা-বা-বিকাল ‘আ-লী ওয়া-ক্বিফী-না ওয়া বিহাক্বক্বিকা ‘আ-রিফী-না, ফালা-তারুদ্দানা-খা-ইবী-না ওয়ালা-‘আন বা-বি শাফা-‘আতিকা মাহ্‌রূমী-না। এয়া-সাইয়্যেদী- ইয়া-রাসূ-লাল্লা-হ! আস্‌আলুকাশ্‌ শাফা-‘আতা ওয়া আস্‌আলুল্লা-হা তা‘আ-লা- লাকাল ওয়াসী-লাতা ওয়াল ফাদ্বী-লাতা ওয়াদ্‌ দারাজাতার রাফী-‘আতা ওয়াল মাক্বা-মাল মাহমু-দা ওয়াল হাউদ্বাল মাওরূ-দা ওয়াশ্‌ শাফা-‘আতাল ‘ওয্‌মা- ফিল এয়াউমিল মাশহু-দ।

“এয়া-খায়রা মান্‌ দুফিনাত ফিত্‌তুরবি আ’যুমুহু-
ফাত্বোয়া-বা মিন ত্বী-বিহিন্নাল্‌ ক্বা-‘উ ওয়াল আকুমু।।
নাফ্‌সিল ফিদা-উ লিক্বাবরিন আনতা সা-কিনুহু-।
ফী-হিল ‘আফা-ফু ওয়া ফী-হিল জূ-দু ওয়া কারামু।।

আন্‌তাল হাবী-বু এয়া হাবী-বাল্লাহ্‌! আন্‌তাশ্‌শাফী-‘উ এয়া শাফী-‘আল্লা-হি, আন্তাল মুশাফ্‌ফা‘উ, আন্‌তাল্লাযী-তুরজা- শাফা-‘আতুকা‘ ইনদাস্‌ সিরা-ত্বি ইযা-মা-যাল্লাতিল ক্বাদামু, আশ্‌হাদু আন্নাকা এয়া-রাসূ-লাল্লা-হ্‌! ক্বাদ বাল্লাগতার্‌ রিসা-লাতা, ওয়া আদ্দায়তাল আমা-নাতা, ওয়া নাসাহ্‌তাল উম্মাতা, ওয়া কাশাফ্‌তাল গুম্মাতা ওয়া জালায়তায্‌ যুলমাতা ওয়া জা-হাত্তা ফী-সাবী-লিল্লা-হি হাক্বক্বা জিহা-দিহী- ওয়া ‘আবাত্তা রাব্বাকা হাত্তা-আতা-কাল ইয়াক্বী-নু। জাযা-কাল্লা-হু তা‘আ-লা ‘আন্না-ওয়া ‘আনওয়ালিদায়না-ওয়া ‘আনিল ইসলা-মি খাইরাল জাযা-ই। ওয়া নাস্‌আলুকাশ্‌ শাফা-‘আতা আন তাশফা‘আ লানা-ইন্‌দাল্লা-হি ইয়াউমাল ‘আরদ্বি ইয়াউমাল ফাযা‘ইল আক্‌বাবি ইয়াউমা লা-ইয়ানফা‘উ মা-লূঁ ওয়ালা-বানূ-নু ইল্লা মান্‌ আতাল্লা-হা বিক্বালবিন সালী-ম। ইশ্‌ফা’লানা-ওয়া লিওয়ালিদায়না-ওয়া লিজী-রা-নিনা ওয়ালিমাশা-ইখিনা-ওয়ালি উস্‌তাযিনা-ওয়া লিমান আওসা-না ওয়াক্বাল্লাদানা-‘ইন্‌দাকা বিদু‘আ-ইল খায়রি ‘ইনদায্‌যিয়া-রাতি। আস্‌সালা-তু ওয়াস্‌সালা-মু আলায়কা এয়া-সুলত্বা-নাল আম্বিয়া-ই ওয়াল মুরসালী-না ওয়া রাহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব

[রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু]'র

যিয়ারত

এখন একটু ডানদিকে সরে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর মাযার যিয়ারত করবেন এবং এটা পাঠ করবেন-

اَلسَّلَامُ عَلَيۡكَ يَا سَيِّدَنَا اَبَابَكۡرِ نِ الصِّدِّيۡقُ۔ اَلسَّلَامُ عَلَيۡكَ يَا خَلِيۡفَةَ رَسُوۡلِ اللّٰهِ عَلَى التَّحۡقِيۡقِ۔ اَلسَّلَامُ عَلَيۡكَ يَا صَاحِبَ رَسُوۡلِ اللّٰهِ ثَانِىَ اثۡنَيۡنِ اِذۡهُمَا فِى الۡغَارِ۔ اَلسَّلَامُ عَلَيۡكَ يَا مَنۡ اَنۡفَقَ مَالَهٗ كُلَّهٗ فِىۡ حُبِّ اللّٰهِ وَحُبِّ رَسُوۡلِهٖ حَتّٰى تَخَلَّلَ بِالۡعَبَا رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنۡكَ وَاَرۡضَاكَ اَحۡسَنَ الرِّضَا وَ جَعَلَ الۡجَنَّةَ مَنۡزِلَكَ وَمَسۡكَنَكَ وَمَحَلَّكَ وَمَأۡوَاكَ۔ اَلسَّلَامُ عَلَيۡكَ يَا اَوَّلَ الۡخُلَفَاءِ وَتَاجَ الۡعُلَمَآءِ وَصِهۡرَ النَّبِىِّ الۡمُصۡطَفٰى وَرَحۡمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ

উচ্চারণঃ ''আস্‌সালা-মু আলায়কা এয়া সাইয়্যেদানা আবা-বাকরিনিস্‌ সিদ্দী-ক্ব। আস্‌সালা-মু আলায়কা এয়া-খালী-ফাতা রসূ-লিল্লা-হি 'আলাত্তাহক্বী-ক্ব। আস্‌সালা-মু আলায়কা এয়া-সা-হিবা রসূ-লিল্লা-হি সা-নিয়াস্‌নায়নি ইয্‌ হুমা-ফিল গা-র। আস্‌সালা-মু আলায়কা এয়া-মান আন্‌ফাক্বা মা-লাহু কুল্লাহু-ফী-হুব্বিল্লা-হি ওয়া হুব্বি রসূ-লিহী- হাত্তা-তাখাল্লাল্লা বিল 'আবা- রাদ্বিয়াল্লা-হু তা'আ-লা-'আন্‌কা ওয়া আরদ্বা-কা আহ্‌সানার রিদ্বা ওয়া জা'আলাল্‌ জান্নাতা মান্‌যিলাকা ওয়া মাস্‌কানাকা ওয়া মাহাল্লাকা ওয়া মা'ওয়া-কা। আস্‌সালা-মু আলায়কা এয়া-আউয়ালাল খোলাফা-ই ওয়া তা-জাল ওলামা-ই, ওয়া সিহ্‌রান্নাবিয়্যিল মোস্তফা- ওয়া রাহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু।

হযরত ওমর

[রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু]'র

যিয়ারত

এরপর ডান দিকে আরো একহাত সরে দাঁড়াবেন ও হযরত ওমর ফারূক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর যিয়ারত করবেন। আর এভাবে আরয করবেন-

اَلسَّلَامُ عَلَيۡكَ يَا عُمَرُ بۡنَ الۡخَطَّابِ ـــ اَلسَّلَامُ عَلَيۡكَ يَا نَاطِقًا بِالۡعَدۡلِ وَالصَّوَابِ۔ اَلسَّلَامُ عَلَيۡكَ يَا حَنۡفِىَّ الۡمِحۡرَابِ۔ اَلسَّلَامُ عَلَيۡكَ يَا مُظۡهِرَ دِيۡنِ

الۡاِسۡلَامِ ـ اَلسَّلَامُ عَلَيۡكَ يَا مُكَسِّرَ الۡاَصۡنَامِ۔ اَلسَّلَامُ عَلَيۡكَ يَآ اَبَا الۡفُقَرَآءِ وَالضُّعَفَآءِ وَالۡاَرَامِلِ وَالۡاَيۡتَامِ۔ اَنۡتَ الَّذِىۡ قَالَ فِىۡ حَقِّكَ سَيِّدُ الۡبَشَرِ ((لَوۡ كَانَ نَبِىٌّ مِّنۡ بَعۡدِىۡ لَكَانَ عُمَرَ بۡنَ الۡخَطَّابِ)) رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنۡكَ وَاَرۡضَاكَ اَحۡسَنَ الرِّضَا وَجَعَلَ الۡجَنَّةَ مَنۡزِلَكَ وَمَسۡكَنَكَ وَمَحَلَّكَ وَمَأۡوَاكَ ـــ اَلسَّلَامُ عَلَيۡكَ يَا ثَانِىَ الۡخُلَفَآءِ وَتَاجَ الۡعُلَمَآءِ وَصِهۡرَ النَّبِىِّ الۡمُصۡطَفٰى وَرَحۡمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ۔

উচ্চারণঃ ''আস্‌সালা-মু আলায়কা এয়া ওমারুব্‌নাল্‌ খাত্তা-ব! আস্‌সালা-মু আলায়কা এয়া-না-তিক্বাম্‌ বিল 'আদলি ওয়াস্‌ সাওয়া-ব! আস্‌ সালা-মু আলায়কা এয়া-হানাফিয়্যাল মিহ্‌রা-ব! আস্‌সালা-মু আলায়কা এয়া-মুয্‌হিরা দ্বী-নিল ইসলা-ম। আস্‌সালা-মু আলায়কা এয়া-মুকাস্‌সিরাল আস্‌না-ম। আস্‌সালা-মু আলায়কা এয়া-আবাল ফুক্বারা-ই ওয়াদ্দো'আফা-ই ওয়াল আরা-মিলি ওয়াল আয়তা-ম! আনতাল্লাযী-ক্বা-লা ফী- হাক্বক্বিকা সাইয়্যেদুল বশরঃ 'লাউ কা-না নাবিয়্যুম্‌ মিম্‌বা'দী-লাকা-না ওয়ামারাবনাল খাত্তা-ব।' রাদ্বিয়াল্লা-হু তা'আ-লা-'আনকা ওয়া আরদ্বা-কা আহ্‌সানার রিদ্বা-ওয়া জা'আলাল্‌ জান্নাতা মান্‌যিলাকা ওয়া মাসকানাকা ওয়া মাহাল্লাকা ওয়া মা'ওয়া-কা। আস্‌সালা-মু আলায়কা এয়া সানিয়াল খোলাফা-ই ওয়া তা-জাল ওলামা-ই ওয়া সিহ্‌রান্নাবিয়্যিল মোস্তফা- ওয়া রাহমাতুল্লা-হি তা'আলা ওয়া বারাকা-তুহূ।''

মুয়াজাহ্‌ শরীফ ও মাক্বসূরাহ্‌ শরীফ

এখানে পিতলের জালিসমূহ ও অন্যান্য দিকগুলোকে লোহার জালিদার দরজাসমূহ দ্বারা বন্ধ রাখা হয়েছে। মুয়াজাহ্‌ শরীফের দিকে তিনটা বরকতময় মাযারের প্রত্যেকটার সামনে প্রায় ছয়/সাত ইঞ্চি পরিধির গোল গোল ছিদ্র আছে। একটা জানালাও আছে, যা অন্যান্য দরজার ন্যায় সর্বদা বন্ধ থাকে। এই ইমারতকে 'মাক্বসূরা শরীফ' বলা হয়।

এই বরকতময় স্থানে হযরত সিদ্দীক্ব-ই আকবর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র মাথা মুবারক হুযূর আলায়হিস্‌ সালাতু ওয়াস্‌সালাম-এর বক্ষ মুবারকের বরাবর এবং হযরত ওমর ফারূক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র মাথা মুবারক হযরত সিদ্দীক্ব-ই আকবর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র বক্ষ বরাবর রয়েছে। এতদ্ব্যতীত, আরো একটা মাত্র কবরের স্থান হযরত ঈসা আলায়হিস্‌ সালামের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে।

এখানে দাঁড়িয়ে নিম্নলিখিত দো'আ পাঠ করবেন-

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمَا يَا وَزِيْرَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ـ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمَا يَا مُعِيْنَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ـ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمَا يَا ضَجِيْعَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ـ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمَا يَا رَفِيْقَىْ وَ مُشِيْرَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُعَاوِنَيْنِ لَهٗ عَلَى الْقِيَامِ فِى الدُّنْيَا وَالْقَآئِمَيْنَ بَعْدَهٗ بِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِيْنَ جَزَاكُمَا اللّٰهُ اَحْسَنَ جَزَآءٍ ـ جِئْنَاكُمَا نَتَوَسَّلُ بِكُمَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ لِيَشْفَعَ لَنَا وَيَسْئَلَ رَبَّنَا اَنْ يَتَقَبَّلَ سَعْيَنَا وَيُحْيِيَنَا عَلٰى مِلَّتِهٖ وَيُمِيْتَنَاعَلَيْهَا وَيَحْشُرَنَا فِىْ زُمْرَتِهٖ ـ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمَا وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ ـ

উচ্চারণঃ "আস্সালা-মু আলায়কুমা-এয়া ওয়াযী-রায় রসূ-লিল্লা-হি! আস্সালা-মু আলায়কুমা-এয়া-মু'ঈনায় রসূ-লিল্লা-হি! আস্সালা-মু আলায়কুমা-এয়া-দ্বাজী-'আয় রসূ-লিল্লা-হি! আস্সালা-মু আলায়কুমা-এয়া রাফী-ক্বায় ওয়া মুশী-রায় রাসূ-লিল্লা-হি সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম! ওয়াল মু'আ-ভিনায়নি লাহু 'আলাল ক্বিয়া-মি ফিদ্দী-নি, ওয়াল ক্বা-ইমায়নি বা'দাহু- বিমাসা-লিহিল মুস্লিমী-না জাযা-কুমাল্লা-হু আহসানা জাযা-ইন। জি'না-কুমা- নাতাওয়াস্সালু বিকুমা-ইলা-রসূ-লিল্লা-হি লিয়াশ্ফা'আ লানা- ওয়া ইয়াস্আলা রাব্বানা- আইঁ ইয়াতাক্বাব্বালা সা'ইয়ানা-ওয়া ইউহ্য়িয়া-না-'আলা-মিল্লাতিহী- ওয়া ইউমী-তানা-আলায়হা-ওয়া ইয়াহ্শুরানা-ফী-যুমরাতিহী-। আস্সালা-মু আলায়কুমা-ওয়া রাহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু।

অতঃপর পুনরায় প্রথম স্থানে অর্থাৎ আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের চেহারা মুবারকের সামনে আসবেন এবং বলবেন-

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْآ اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوْا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَلَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ـ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ـ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِىَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ـ وَقَدْ جِئْنَاكَ سَامِعِيْنَ قَوْلَكَ طَآئِعِيْنَ اَمْرَكَ مُسْتَشْفِعِيْنَ نَبِيَّكَ اِلَيْكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِىْ

قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ـ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِىِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ـ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِحُرْمَةِ هٰذَا النَّبِىِّ الْكَرِيْمِ اَنْ تَرْزُقَنِىْ اِيْمَانًا كَامِلًا ثَابِتًا يُّبَاشِرُبِهٖ قَلْبِىْ وَيَقِيْنًا صَادِقًا حَتّٰى اَعْلَمَ اَنَّهٗ لَا يُصِيْبُنِىْ اِلَّا مَا كَتَبْتَ لِىْ وَعِلْمًا نَافِعًا وَّ قَلْبًا خَاشِعًا وَّ لِسَانًا ذَاكِرً وَّ وَلَدًا صَالِحًا وَّ رِزْقًا وَّاسِعًا وَّ حَلَالًا طَيِّبًا وَتَوْبَةً نَصُوْحًا وَصَبْرًا جَمِيْلًا وَاَجْرًا عَظِيْمًا وَّ عَمَلًا صَالِحًا مَّقْبُوْلًا وَتِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ ـ يَانُوْرَ النُّوْرِ يَاعَالِمَ مَافِى الصُّدُوْرِ اَخْرِجْنِىْ وَجَمِيْعَ الْمُسْلِمِيْنَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَتَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِىْ بِالصَّالِحِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَآاَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ يَارَبَّ الْعَالَمِيْنَ ـ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ

উচ্চারণঃ "আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা ক্বুলতা ওয়া ক্বাওলুকাল হাক্বক্বু ওয়া লাউ আন্নাহুম ইয্ যালামু---আনফুসাহুম জা----উ-কা ফাস্তাগফারুল্লা-হা ওয়াস্তাগফারা লাহুমুর রসূলু লাওয়াজাদুল্লা-হা তাওয়া-বার রহী-মা-।" "লাক্বাদ জা----আকুম রসূ-লুম্ মিন্ আনফুসিকুম 'আযী-যুন্ 'আলায়হি মা-'আনিত্তুম হারী-সুন্ 'আলায়কুম বিল্ মু'মিনী-না রাঊ-ফুর রাহী-ম। ফাইন তাওয়াল্লাউ ফাক্বুল হাস্বিয়াল্লা-হু লা-ইলা-হা ইল্লা-হুয়া আলায়হি তাওয়াক্কালতু ওয়া হুয়া রাব্বুল 'আরশিল 'আযী-ম।"

ওয়াক্বাদ জি'না-কা সামি'ঈ-না ক্বাওলাকা ত্বোয়া-ই'ঈ-না আমরাকা মুস্তাশফি'ঈ-না নাবিয়্যাকা ইলায়কা, আল্লা-হুম্মা রাব্বানাগ্ফির লানা-ওয়া লিইখ্ওয়া-নিনাল্লাযী-না সাবাক্বূ-না-বিল ঈমা-নি ওয়ালা- তাজ'আল ফী-ক্বুলূ-বিনা গিল্লাল্লিল্লাযী-না আ-মা-নু-। রাব্বানা-ইন্নাকা রঊফুর রহী-ম। ইন্নাল্লা-হা ওয়া মালা----ইয়াকাতাহু-ইউসাল্লূ-না আলান্নাবিয়্যি। ইয়া-আইয়্যুহাল্লাযী-না আ-মানূ-সাল্লূ-আলায়হি ওয়া সাল্লিমূ-তাস্লী-মা-। আল্লা-হুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলায়হি। আল্লা-হুম্মা ইন্নী-আস্আলুকা বিহুরমাতি হাযান্নাবিয়্যিল করী-মি আন তারযুক্বানী-ঈমা-নান কা-মিলান সা-বিতাইঁ ইয়ুবা-শিরু বিহী-ক্বালবী-ওয়া

ইয়াক্বী-নান্ সা-দিক্বান হাত্তা আ'লামা আন্নাহু- লা- ইয়ুসী-বুনী-ইল্লা-মা-কাতাব্তা লী-ওয়া ইলমান না-ফি'আওঁ ওয়া ক্বালবান খাঁ-শি'আওঁ ওয়া লিসা-নান যা-কিরাওঁ ওয়া ওয়ালাদান্ সোয়া-লিহাওঁ ওয়া রিযক্বাওঁ ওয়া-সি'আন্ হালা-লান্ তাইয়্যেবাওঁ ওয়া তাওবাতান নাসূ-হাওঁ ওয়া সোয়াব্‌রান জামী-লাওঁ ওয়া আজরান্ 'আযী-মাওঁ ওয়া 'আমালান্ সোয়া-লিহাম্মাক্বূ-লাওঁ ওয়া তিজা-রাতাল্ লান্ তাবূ-র।

এয়া-নু-রান্ নূ-রি, এয়া-'আ-লিমা মা-ফিস্‌সুদূ-র। আখ্‌রিজ্‌নী-ওয়া জামী-'আল মুসলিমী-না মিনায্ যুলুমা-তি ইল্লান্নূ-রি ফিদ্দুন্‌ইয়া-ওয়াল আ-খিরাতি ওয়া তাওয়াফ্‌ফানী-মুস্‌লিমাওঁ ওয়া আল্‌হিক্বনী-বিস্‌সোয়া-লিহী-ন। বিরাহ্‌মাতিকা এয়া-আরহামার রা-হিমী-না এয়া-রাব্বাল 'আ-লামী-ন।

রাব্বানা-আ-তিনা ফিদ্দুন্‌ইয়া-হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল আ-খিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়া ক্বিনা-'আযা-বান্না-র। সুব্‌হা-না রাব্বিকা রাব্বিল 'ইয্‌যাতি 'আম্মা-ইয়াসিফূ-না। ওয়া সালা-মুন্ আলাল্ মুরসালী-ন। ওয়াল হামদু লিল্লা-হি রাব্বিল 'আ-লামী-ন।

অতঃপর এ দো'আ পাঠ করবেন

اَللّٰهُمَّ لاَ تَدَعْ لَنَا فِىْ مَقَامِنَا هٰذَا الشَّرِيْفِ بَيْنَ يَدَىْ سَيِّدِنَا رَسُوْلِ اللّٰهِ ذَنْبًا اِلاَّ غَفَرْتَهٗ ـ وَلاَ هَمًّا يَآاَللّٰهُ اِلاَّ فَرَّجْتَهٗ وَلاَ عَيْبًا يَآ اَللّٰهُ اِلاَّ سَتَرْتَهٗ وَلاَ مَرِيْضًا يَآاَللّٰهُ اِلاَّ شَفَيْتَهٗ وَعَافَيْتَهٗ وَلاَ مُسَافِرًا يَآاَللّٰهُ اِلاَّ نَجَيْتَهٗ وَلاَ غَآئِبًا يَآاَللّٰهُ اِلاَّ رَدَدْتَّهٗ وَلاَ عَدُوًّا يَآاَللّٰهُ اِلاَّ خَذَلْتَهٗ وَدَمَّرْتَهٗ وَلاَ فَقِيْرًا يَآاَللّٰهُ اِلاَّ اَغْنَيْتَهٗ ـ وَلاَ حَاجَةً يَآاَللّٰهُ مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ لَنَا فِيْهَا صَلاَحٌ اِلاَّ قَضَيْتَهَا وَيَسَّرْتَهَا ـ اَللّٰهُمَّ اقْضِ حَوَآئِجَنَا وَيَسِّرْ اُمُوْرَنَا وَاشْرَحْ صُدُوْرَنَا وَتَقَبَّلْ زِيَارَتَنَا وَاٰمِنْ خَوْفَنَا وَاسْتُرْ عُيُوْبَنَا وَاغْفِرْ ذُنُوْبَنَا وَاكْشِفْ كُرُوْبَنَا وَاخْتِمْ بِالصَّالِحَاتِ اَعْمَالَنَا وَرُدَّ غُرْبَتَنَا اِلٰى اَهْلِنَا وَاَوْلاَدِنَا سَالِمِيْنَ غَانِمِيْنَ مَسْتُوْرِيْنَ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ ـ مِنَ الَّذِيْنَ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُوْنَ ـ بِرَحْمَتِكَ يَآاَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ يَارَبَّ الْعَالَمِيْنَ ـ

উচ্চারণঃ ''আল্লা-হুম্মা-লা-তাদা'লানা-ফী-মক্বা-মিনা-হা-যাশ্ শরী-ফি বায়না ইয়াদায় সাইয়্যিদিনা-রসূ-লিল্লা-হি, যাম্‌বান্ ইল্লা-গাফারতাহু, ওয়ালা-হাম্মান্ এয়া-আল্লা-হু ইল্লা-ফাররাজ্‌তাহু-, ওয়ালা 'আইবান এয়া-আল্লা-হু ইল্লা-সাতারতাহু-ওয়ালা-মারীদ্বান এয়া-আল্লা-হু ইল্লা-শাফায়তাহু-ওয়া 'আ-ফায়তাহু-ওয়ালা-মুসা-ফিরান্ এয়া-আল্লা-হু ইল্লা-নাজায়তাহু-ওয়ালা-গা-ইবান্

এয়া-আল্লা-হু ইল্লা-রাদাদ্‌তাহু-ওয়ালা-'আদুওভান এয়া-আল্লা-হু ইল্লা-খাযালতাহু-ওয়া দাম্মারতাহু-,ওয়ালা-ফাক্বী-রান্ এয়া-আল্লা-হু-ইল্লা-আগনায়তাহু-ওয়ালা-হা-জাতান এয়া-আল্লা-হু মিন হাওয়া-ইজিদ্দুন্‌ইয়া-ওয়াল আ-খিরাতি লানা-ফী-হা-সালাহুন্ ইল্লা-ক্বাদায়তাহা-ওয়া ইয়াসসারতাহা-। আল্লা-হুম্মাক্বদি হাওয়া-ইজানা-ওয়া ইয়াস্‌সির উমূ-রানা-ওয়াশরাহ্ সুদূ-রানা-ওয়া তাক্বাব্বাল যিয়া-রাতানা-ওয়া আ-মিন্ খাওফানা ওয়াস্‌তুর 'উয়ূ-বানা-ওয়াগ্‌ফির যুনূ-বানা-ওয়াক্‌শিফ্ কুরূ-বানা-ওয়াখ্‌তিম বিস্ সোয়া-লিহা-তি আ'মা-লানা- ওয়ারুদ্দা গুরাবাতানা-ইলা-আহলিনা ওয়া আওলা-দিনা-সা-লিমী-না গা-নিমী-না মাস্‌তূরী-না মিন ইবা-দিকাস সোয়া-লিহী-না। মিনাল্লাযী-না লা- খাউফুন আলায়হিম ওয়ালা-হুম ইয়াহ্‌যানূ-ন। বিরাহ্‌মাতিকা এয়া-আরহামার রা-হিমী-ন। এয়া-রাব্বাল 'আ-লামী-ন।

অতঃপর ওহী নাযিল হবার স্থানে দাঁড়িয়ে নৈকট্যার্জিত ফিরিশ্‌তাদের প্রতি এভাবে সালাম প্রেরণ করবেন-

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَاسَيِّدَنَا جِبْرَآئِيْلُ ط اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَنَا مِيْكَآئِيْلُ ط اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَاسَيِّدَنَا اِسْرَافِيْلَ ـ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَنَا عِزْرَآئِيْلُ ط اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَامَلآئِكَةَ اللّٰهِ الْمُقَرَّبِيْنَ مِنْ اَهْلِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِيْنَ كَآفَّةً عَامَّةً اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ ط

উচ্চারণঃ ''আস্‌সালা-মু আলায়কা এয়া-সাইয়্যেদানা-জিব্রা-ঈ-লু! আস্‌সালা-মু আলায়কা এয়া-সাইয়্যেদানা-মী-কা-ঈ-লু! আস্‌সালা-মু আলায়কা এয়া-সাইয়্যেদানা-ইস্রা-ফী-লু, আস্‌সালা-মু আলায়কা এয়া-সাইয়্যেদানা-আয্রা-ঈ-ল! আস্‌সালা-মু আলায়কুম এয়া-মালা-ইকাতাল্লা-হিল মুক্বাররাবী-না মিন্ আহলিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্বী-না কা-ফফাতান্ 'আ-ম্মাতান আস্‌সালা-মু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকাতুহু!

হযরত ফাতিমা

[রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা]'র

যিয়ারত

হযরত ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে হুজুরা শরীফের দিকে ফিরবেন আর নিম্নলিখিত দো'আ পড়বেন। উল্লেখ্য যে, হযরত ফাতিমা যাহ্‌রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার মাযার সম্পর্কে তিন ধরনের বর্ণনা আছে। যেমন-১.

তাঁর কবর মুবারক মসজিদ-ই নববী শরীফের ভিতরে, ২. তাঁর কবর শরীফ হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু-এর নিকটে এবং ৩. জান্নাতুল বক্বী’র দরজার পার্শ্বে ‘বায়তুল হুযন’-এ। হাজীদের উচিত এ তিন জায়গায় গিয়ে নিম্নলিখিত দো‘আ পাঠ করা-

اَلسَّلَامُ عَلَيْكِ يَاسَيِّدَتَنَا فَاطِمَةُ الزَّهْرَاءُ يَابِنْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ـ اَلسَّلَامُ عَلَيْكِ يَابِنْتَ نَبِيِّ اللّٰهِ ـ اَلسَّلَامُ عَلَيْكِ يَا بِنْتَ حَبِيْبِ اللّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكِ يَا بِنْتَ الْمُصْطَفٰى ـ اَلسَّلَامُ عَلَيْكِ يَاخَامِسَةَ اَهْلِ الْكِسَآءِ ـ اَلسَّلَامُ عَلَيْكِ يَازَوْجَةَ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ سَيِّدِنَا عَلِيِّ نِ الْمُرْتَضٰى كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهٗ ـ اَلسَّلَامُ عَلَيْكِ يَآ اُمَّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ السَّيِّدَيْنِ الشَّهِيْدَيْنِ الْكَوْكَبَيْنِ الْقَمَرَيْنِ النَّيِّرَيْنِ سَيِّدَا شَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ اَبِىْ مُحَمَّدِ نِ الْحَسَنِ وَاَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ الْحُسَيْنِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا وَعَنْكِ وَاَرْضَاكِ اَحْسَنَ الرِّضَا وَجَعَلَ الْجَنَّةَ مَنْزِلَكِ مَسْكَنَكِ وَمَحَلَّكِ وَمَأْوَاكِ ـ اَلسَّلَامُ عَلَيْكِ وَعَلٰى اَبِيْكِ الْمُصْطَفٰى وَبَعْلِكِ عَلِيِّ نِ الْمُرْتَضٰى وَابْنَيْكِ الْحَسَنَيْنِ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ ـ

উচ্চারণঃ ‘‘আস্‌সালা-মু আলায়াকি এয়া-সাইয়্যেদাতানা-ফা-তিমাতুয্ যাহ্‌রা-উ এয়া-বিন্‌তা রসূলিল্লা-হি! আস্‌সালামু আলায়কি এয়া-বিন্‌তা নাবিয়্যিল্লা-হি, আস্‌সলা-মু ‘আলায়কি এয়া-বিন্‌তা হাবী-বিল্লা-হি আস্‌সালা-মু আলায়কি এয়া-বিনতাল মোস্তফা-! আস্‌সালা-মু আলায়াকি এয়া-যাউজাতা আমী-রিল মু’মিনী-না সাইয়্যেদিনা- আলিয়্যিনিল মুরতাদ্বা-কার্‌রামাল্লা-হু তা‘আ-লা-ওয়াজহাহু! আস্‌সালা-মু আলায়কি এয়া-উম্মাল হাসানি ওয়াল হোসাঈনিস্ সাইয়্যেদাঈনিশ্ শাহী-দাঈনিল কাউকাবাঈনিল্ ক্বামারাঈনিন্ নাইয়্যেরাঈনি সাইয়্যেদা-শাবা-বি আহ্‌লিল্ জান্নাতি ফিল জান্নাতি, আবী-মুহাম্মাদিনিল হাসানি ওয়া আবী-‘আবদিল্লা-হিল হোসাঈনি রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহুমা-ওয়া ‘আনকি ওয়া আরদ্বা-কি আহ্‌সানার রিদ্বা- ওয়া জা‘আলাল্ জান্নাতা মান্‌যিলাকি ওয়া মাস্‌কানাকি ওয়া মাহাল্লাকি ওয়া মা’ওয়া-কি। আস্‌সালা-মু আলায়কি ওয়া ‘আলা-আবী-কিল মোস্তফা-ওয়া বা’লিকি আলিয়্যিনিল মুরতাদ্বা-ওয়া ইবনায়কিল হাসানাঈনি ওয়া রাহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহূ।

জান্নাতুল বক্বী’তে গিয়ে এ দো‘আ পাঠ করবেন-

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْبَقِيْعِ يَآ اَهْلَ الْجَنَابِ الرَّفِيْعِ ـ اَنْتُمُ السَّابِقُوْنَ وَنَحْنُ اِنْ

شَآءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ ـ اَبْشِرُوْا بِاَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ ـ اَنَسَكُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَشَرَّفَكُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى بِقَوْلِ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ

উচ্চারণঃ ‘‘আস্‌সালা-মু আলায়কুম এয়া-আহ্‌লাল্ বক্বী-‘ই, এয়া-আহ্‌লাল্ জানা-বির রফী-‘ই, আনতুমুস্ সা-বিক্বুনা, ওয়া নাহনু ইন্‌শা-আল্লা-হু বিকুম লা-হিক্বু-না, আব্‌শিরূ- বি-আন্নাস্ সা-‘আতা আ-তিয়াতুন, লা-বায়বা ফী-হা, ওয়া আন্নাল্লা-হা ইয়াব‘আসু মান্ ফিল ক্বুবূ-রি। আ-নাসাকুমুল্লা-হু তা‘আলা ওয়া শাররাফাকুমুল্লা-হু তা‘আ-লা-বিক্বাউলি আশ্‌হাদু আন্ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্‌দাহু-লা-শরী-কা লাহু- ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান্ ’আবদুহু-ওয়া রাসূ-লুহ্-।

অতঃপর জান্নাতুর বক্বী ও মদীনা মুনাওয়ারার অন্যান্য বরকতময় স্থানগুলোর যিয়ারত করবেন। মদীনা মুনাওয়ারাহ্ ও এর যিয়ারত বরকতময়।

وہ زمیں ہے تو مگر ہے خوابگاہ
دید ہے کعبہ کو تیری حجّ‌ِاکبر سے ہوا
تجھ میں راحت اس شہنشاہ معظم کو ملی
جسکے دامن میں امان اقوام عالم کو ملی (اقبال)

অর্থাৎ হে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর আরাম ও শয্যাস্থল মদিনা মুনাওয়ারা! তুমি বিশাল ধরিত্রীর একটি ভূখন্ড হলেও তোমার দর্শন স্বয়ং খানা-ই কা’বা বায়তুল্লাহর জন্যে হজ্জে আকবর এর চেয়েও শ্রেয়।

কারণ তোমার মাঝে সৃষ্টিকুল শ্রেষ্ঠ, সেই মহান শাহানশাহ আরাম করছেন যাঁর পূতঃ পবিত্র দামানে বিশ্বের তাবত মানব গোষ্ঠী আশ্রয় পেয়েছে।

মদীনা মুনাওয়ারাহ্ মক্কা মুকার্‌রমার দুইশত মাইল উত্তরে অবস্থিত। জাহেলিয়া যুগে ইয়াস্‌রিব নামে পরিচিত ছিল। বিশুদ্ধ রেওয়ায়ত মতে, এ নাম এখন নিষিদ্ধ। ‘ওয়াফা-উল ওয়াফা ফী আখবারে দিয়ারিল মুস্তফা’ নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে মদীনা মুনাওয়ারার ৯৪টিরও অধিক নাম বর্ণিত হয়েছে, যা এর মহা সম্মানিত হওয়ারই প্রমাণ। এ পূণ্যভূমির মহা মর্যাদা ও মহত্বের শত বর্ণনা সত্ত্বেও প্রেমিককুলের নিকট এটাই সর্বাধিক প্রনিধানযোগ্য যে, নবীকুল সরদার, স্রষ্টা ও সৃষ্টির অকৃত্রিম বন্ধু, হুযূর রহমতে, আলম নূরে মুজাস্‌সাম সাল্লাল্লাহু তা’আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র আবাসস্থল ও রওযা মুবারক ধন্য নগরী।

বস্তুতঃ হুযূর সরওয়ারে কায়েনাত ফখরে মওজূদাত তাজেদারে মদীনা সুরূরে ক্বলব ও সীনা সাইয়্যেদুনা মুহাম্মদুর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র রওযা শরীফের যিয়ারত ও হুযূর করীমের চরণধন্য পুণ্যভূমি মদীনা মুনাওয়ারার যিয়ারত সর্বসম্মত মতে সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত ও মহান আল্লাহর নৈকট্য এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সুখ-শান্তি লাভের এক মহান উপায়; বরং এটা সামর্থ্যবানদের জন্য ওয়াজিব বলে বর্ণিত। এক্ষেত্রে প্রিয় নবীর সুপ্রসিদ্ধ হাদীস-ই পাকের যথার্থ বিশ্লেষণ অত্যন্ত প্রয়োজন, যাতে সরলমনা মুসলমানগণ বিভ্রান্তির বেড়াজাল ছিন্ন করে সঠিক পথ অবলম্বন করতে পারেন। লক্ষ্যণীয় যে, বাতিল মতবাদীগণ বিশ্বের তাবৎ আউলিয়া-ই কেরাম ও বুযুর্গানে দ্বীন, এমনকি স্বয়ং হুযূর রহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে যিয়ারতের উদ্দেশ্যে হাযির হবার জন্য সফর করাকে শরীয়ত গর্হিত ও নিষিদ্ধ বলে ফাত্ওয়াবাজি করে, তারা 'সহীহ বুখারী' শরীফের পঞ্চম পারার ১৮৫ পৃষ্ঠায়-بَـابُ فَـضْـلِ الـصَّـلٰوةِ فِىْ مَسْجِدِ مَكَّةَ وَ مَدِيْنَةَ শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীসে পাককে তাদের প্রমাণ হিসেবে পেশ করে বেড়ায়। হাদসিটি নিম্নরূপ-

عَـنِ الـنَّـبِـيِّ صَـلَّـى الـلّٰـهُ عَـلَـيْـهِ وَسَـلَّـمَ لا تَـشُـدُّوا الرِّ حَالَ اِلَّا اِلٰى ثَلٰثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُوْلِ وَالْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى

তারা এর ব্যাখ্যা এভাবে করে থাকে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সফর করা যাবেনা, তবে তিনটি মসজিদের দিকেঃ মসজিদুল হারাম, মসজিদুল রসূল ও মসজিদুল আক্বসা। অতএব, এ তিন মসজিদ ছাড়া অন্য যে কোন স্থানে সফর করা এ হাদীস শরীফ দ্বারা নাকি নিষিদ্ধ প্রমাণিত হয়। তাই হযরত গাউসুল আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর যিয়ারতের উদ্দেশ্য বাগদাদের সফর, সুলতানুল হিন্দ্ গরীব-নওয়াযের যিয়ারতের জন্য আজমীর-এর সফর, সুলতানুল মশা-ইখ হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া মাহবুবে ইলাহীর যিয়ারতের নিয়্যতে দিল্লীর সফর, হযরত মাখদুম আলাউদ্দীন-এর যিয়ারতের জন্য কালিয়র শরীফ, হযরত দাতা গঞ্জে বখশের দরবারে হাজিরার জন্য লাহোর ও ফাতেহে হিন্দ হযরত সৈয়দ সালার-ই মাস'উদ রাহমাতুল্লাহি আলায়হির যিয়ারতের জন্য বাহরাইন ইত্যাদির সফর হাদীস শরীফে উল্লেখিত তিন স্থানের বাইরে বিধায় নিষিদ্ধ ও নাজায়েয প্রমাণিত হয়। (নাউযু বিল্লাহ্!)

এর খণ্ডনে আমাদের কথা হচ্ছে- আলোচ্য হাদীসের উক্ত ব্যাখ্যা যদি সঠিক হয়ে থাকে, তাহলে হাদীস সংগ্রহের মানসে স্বয়ং ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি যে বলখ, মিশর, বসরা, হেজায, হামাস, দামেস্ক, আসক্বালান, খোরাসান, ইরাক ও

বাগদাদসহ অসংখ্য এলাকা সফর করেছেন, সবই তো হারাম ছিলো! যেহেতু এগুলো হাদীসে বর্ণিত তিন জায়গার বাইরে। শুধু তা নয়; বরং জ্ঞানাহরণের জন্য বিরুদ্ধবাদীদের ছাত্রদের দেওবন্দ, সাহারানপুরসহ বিভিন্ন মাদরাসার সফর কিভাবে জায়েয হয়? তাদের তাবলীগের জন্য সফরও তো হারাম। তাছাড়া বনিক-ব্যবসায়ী মহলের অবস্থাও শোচনীয় হয়ে পড়বে। কারণ এসব উদ্দেশ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম, দিল্লি, কোলকাতা, বোম্বে, আমেরিকা, লণ্ডন, জাপান ও সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশের সফর হাদীসে উল্লেখিত তিন জায়গার বাইরেই তো বটে। অথচ জ্ঞানার্জনের জন্য, দ্বীন প্রচারের জন্য ও ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সফর করা নিঃসন্দেহে শরীয়ত সম্মত। কেবল বুযুর্গানে দ্বীনের পবিত্র আস্তানাগুলোই কি তাদের রোষানলের শিকার হয়েছে? যে আউলিয়া কেরামের দরবারের হাজিরা শুধু হাদিসে উল্লেখিত তিন জায়গার বাইরে বলে না-জায়েয হলো আর ওই সফর উক্ত তিন স্থানের বাইরে হওয়া সত্ত্বেও বৈধ হয়ে গেল? এ এক উল্টো দর্শনই বটে। প্রকৃত পক্ষে এ উল্টা দর্শন বশীভূত অন্তর হাদীসে রসূলের মর্মবাণী অনুধাবন করতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা সায়্যিদুনা হযরত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি-এর মাযার শরীফের উপর অজস্র নূরানী রহমত বর্ষণ করতে থাকুন। তিনি আলোচ্য হাদিসটি بَـــابُ فَـضْـلِ الـصَّـلٰوةِ অধ্যায়ে বর্ণনা করে এক সুদীর্ঘ বিতর্কের অবসান ঘটিয়েছেন। তিনি এক সামান্য ইশারায় বুঝাতে চেয়েছেন যে, বর্ণিত হাদিসখানা সাধারণ সফরের জন্য প্রযোজ্য নয়, বরং এটা দ্বারা ওই সফরই উদ্দেশ্য, যা নামাযের ফযীলত অর্জনের উদ্দেশ্যেই করা হয়। প্রমাণিত হল, অস্বীকারকারীদের উল্লিখিত ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত; বরং একটি অকাট্য ও প্রমাণিত বৈধ কাজকেই অবৈধ বলার শামিল।

হাদীস বিশারদগণের মতে আলোচ্য হাদীসে পাকের ব্যাখ্যা দেখুনঃ

প্রথমতঃ হয় তো এর উহ্য مستثنىٰ منه সাধারণ (عام) হবে। তখন অর্থ হবে হাদীসে উল্লেখিত তিন স্থান ব্যতীত কোন জায়গাতেই অতিরিক্ত সাওয়াব পাওয়ার মানসে ও নামাযের উদ্দেশ্য সফর করা যাবে না। এটা মেনে নেয়া যায় না, কারণ তখন ব্যবসা-বাণিজ্য, আত্মীয়তা রক্ষা ও শিক্ষার্জনের জন্য সফর সবই নিষিদ্ধ হয়ে যায়। [ফাত্হুল বারী : শরহে বোখারী]

দ্বিতীয়তঃ অথবা উহ্য مستثنىٰ منه একটি নির্দিষ্ট শব্দ مَسْجِدِ নির্ধারিত। মূলতঃ এটাই গ্রহণযোগ্য। এতে হাদীসে পাকের অর্থ দাঁড়ায়-বেশী সাওয়াব পাওয়ার উদ্দেশ্য (নিজ এলাকার মসিজদ ছেড়ে) হাদীসে উল্লেখিত তিন মসজিদ ছাড়া অন্য কোন মসজিদের দিকেই সফর করা যাবে না। বলা বাহুল্য, এ ব্যাখ্যাতেও বুযুর্গানে দ্বীনের যিয়ারতের উদ্দেশ্যে তাঁদের দরবারে সফর করা, আলোচ্য হাদীসে পাকের আলোকে, নিষিদ্ধ প্রমাণিত হয় না। দ্বিতীয় ব্যাখ্যার বলিষ্ঠ সমর্থন অন্য এক হাদীসে পাকে পাওয়া যায়, যা সর্বজনমান্য ইমাম হযরত ইমাম আহমদ রাহমাতুল্লাহি

আলায়হি তার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ মুসনাদে আহমদে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْبَغِىْ لِلْمُصَلِّىْ اَنْ يَشُدَّ رِحَالَهٗ اِلٰى مَسْجِدٍ تَبْتَغِىْ فِيْهِ الصَّلٰوةَ عِنْدَ غَيْرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى وَمَسْجِدِىْ

অর্থাৎ- নামাযীর জন্য উচিত নয় মসজিদুল হারাম, মসজিদে আক্বসা ও আমার মসজিদ (মসজিদে নবভী) ব্যতিত অন্য মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা। বস্তুতঃ **مستثنٰى منه** সাধারণত **مستثنٰى**-এর নিকটবর্তী হওয়াই সমীচীন। সুপ্রসিদ্ধ উসূল গ্রন্থ 'মুসাল্লামুস্ সুবূত' (**مسلم الثبوت**)-এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'ফাওয়া-তিহুর রাহমূত' (**فواتح الرحموت**) -এর ২৭৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে-

فَعُلِمَ اَنَّ الْمُسْتَثْنٰى مِنْهُ مَا يَكُوْنُ اَقْرَبَ اِلَى الْمُسْتَثْنٰى وَلَعَلَّ هٰذَا ظَاهِرٌ لِمَنْ لَّهٗ اَدْنٰى اِسْتِقْرَاءٍ

অর্থাৎ : একজন সাধারণ জ্ঞান পিপাসুর কাছেও এটা স্পষ্ট যে, **مستثنى منه** সাধারণতঃ **مستثنى** এর নিকটবর্তী বস্তুই হয়ে থাকে।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য হাদীসে পাকের অপব্যাখ্যা করে সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি বুযুর্গানে দ্বীনের আস্তানা, এমনকি রসূল পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর রওযা আক্বদাসে যিয়ারতের নিয়্যতে সফর করা হারাম ও নিষিদ্ধ বলে ফাত্ওয়াবাজি করেছিলো, ইতিহাসের সেই চিহ্নিত ব্যক্তিটির নাম ইবনে তাইমিয়া, যার উত্তরসূরী হয়ে এদেশীয় গায়রে মুক্বাল্লিদগণ তার প্রতিনিধিত্ব করছে। বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা ক্বাস্তলানী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি উল্লেখিত দ্বিতীয় পদ্ধতির সমর্থনে ও ইবনে তাইমিয়ার বাতিল মতের খণ্ডনে তাঁর সুপ্রসিদ্ধ বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'ইরশাদুস্ সারী ফী শরহে সাহীহীল বুখারী'র ৩২৯ ও ৩৩০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-

وَقَدْ بَطَلَ بِمَامَرَّ مِنَ التَّقْدِيْرِ بِلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ اِلَّا اِلٰى ثَلٰثَةِ مَسٰجِدَ لِلصَّلٰوةِ فِيْهِ الْمُعْتَضَدُ بِحَدِيْثِ اَبِىْ سَعِيْدِ ن الْمَرْوِىِّ فِىْ مُسْنَدِ اَحْمَدَ بِاِسْنَادٍ حَسَنٍ مَرْفُوْعًا لَا يَنْبَغِىْ لِلْمُصَلِّىْ اَنْ يَشُدَّ رِحَالَهٗ اِلٰى مَسْجِدٍ يُبْتَغِىْ فِيْهِ الصَّلٰوةَ عِنْدَ غَيْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْاَ قْصٰى وَمَسْجِدِىْ هٰذَا ـ قَوْلُ اِبْنُ تَيْمِيَةَ حَيْثُ مَنَعَ مِنْ زِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مِنْ اَشْنَعِ الْمَسَائِلِ الْمَنْقُوْلَةِ عَنْهُ ـ

অর্থাৎ হাদীসে পাকে **لاتشد الرحال الا الى ثلثةمسجد** এর অন্তর্নিহিত **مستثنى منه** নির্ধারণে আমাদের গৃহীত পদ্ধতি **لاتشد الرحال الى ثلاثة مساجد** (যার

বলিষ্ঠ সমর্থন মুসনদে ইমাম আহমদে বর্ণিত হাদীসে হযরত আবূ সা'ঈদ থেকে পাওয়া যায়), ইবনে তাইমিয়ার বাতিল ধারণাকে যথার্থভাবেই খণ্ডন করে, যা তিনি হাদীসের প্রেক্ষিতে হুযূর রাহমাতুল্লিল আলামিন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর রওযা আক্বদাসের যিয়ারতের উদ্দেশ্য সফর করাকে নিষেধ বলে মত প্রকাশ করেছেন। এটা তার ঘৃণ্য ও নিকৃষ্টতম আক্বীদাগুলোর অন্যতম।

সুপ্রসিদ্ধ হাদিস বিশারদ আল্লামা ইবনে হাজর আসক্বালানী তার বিশ্ব বিখ্যাত ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'ফতহুল বারী শরহে বুখারী' ৩য় খণ্ড, ৫৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-

قَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِيْنَ قَوْلُهٗ اِلَّا اِلٰى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمُسْتَثْنٰى مِنْهُ مَحْذُوْفٌ فَاَمَّا اَنْ يُقَدَّرَ عَامًا فَيَصِيْرُ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ اِلٰى مَكَانٍ فِىْ اَىِّ اَمْرٍ كَانَ اِلَّا اِلٰى ثَلَاثَةٍ اَوْ اَخَصَّ مِنْ ذَالِكَ لَاسَبِيْلَ اِلَى الْاَوَّلِ لِاِفْضَائِهٖ اِلٰى سَدِّ بَابِ السَّفَرِ لِلتِّجَارَةِ وَصِلَةِ الرَّحْمِ وَطَلَبِ الْعِلْمِ وَغَيْرِهَا فَيُعَيَّنُ الثَّانِىُّ وَالْاُوْلٰى اَنَّهٗ يُقَدَّرُ مَا هُوَ اَكْثَرُ مَنَاسِبَةً وَهُوَ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ اِلٰى مَسْجِدٍ لِلصَّلٰوةِ فِيْهِ اِلَّا اِلَى الثَّلَاثَةِ يُبْطَلُ بِذٰلِكَ قَوْلُ مَنْ مَنَعَ شَدَّ الرِّحَالِ اِلٰى زِيَارَةِ الْقَبْرِ الشَّرِيْفِ وَغَيْرِهٖ مِنْ قُبُوْرِ الصَّالِحِيْنَ (وَاللّٰهُ اَعْلَمُ)

অর্থাৎ- সুক্ষ্ম জ্ঞান সম্পন্ন আলিমদের মতে হাদীসে পাকে **الا الى ثلاثة مساجد** এর **مستثنٰى منه** উহ্য রয়েছে। এ **مستثنى منه** সাধারণও হতে পারে, সুনির্দিষ্টও হতে পারে। তবে **عام** (সাধারণ) মেনে নেয়ার কোন উপায় নেই। কারণ এতে ব্যবসা বাণিজ্য, আত্মীয়তার সম্পর্ক সংরক্ষণ ও জ্ঞানার্জনের জন্য শরীয়ত সমর্থিত বৈধ সফরগুলোও অবৈধ হয়ে যায়। অতএব **مستثنى منه** একটি **خاص** শব্দে (**مسجد**) -এ নির্ধারিত। আর এতে ওইসব ব্যক্তির দাবীর বাতুলতা প্রমাণিত হয়, যারা আলোচ্য হাদীসের প্রেক্ষিতে আউলিয়ায়ে কেরামের মাযারে এমন কি রসূলে পাকের রওযা-ই আক্বদাসের যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফরকেও নিষিদ্ধ বলে আখ্যায়িত করে।

অতঃপর আল্লামা আসক্বালানী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি একটি যথার্থ ব্যাখ্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন-

قَالَ السُّبْكِىُّ الْكَبِيْرُ لَيْسَ فِى الْاَرْضِ بَقِيَّةٌ لَّهَا فَضْلٌ لِذَاتِهَا حَتّٰى تُشَدَّ الرِّحَالُ اِلَيْهَا غَيْرَ الْبِلَادِ الثَّلَاثَةِ وَمُرَادِىْ بِالْفَضْلِ مَا شَهِدَ الشَّرْعُ بِاِعْتَبَارِهٖ وَرَتَّبَ عَلَيْهِ حُكْمًا شَرْعِيًّا وَاَمَّا غَيْرُهَا مِنَ الْبِلَادِ فَلَا تُشَدُّ اِلَيْهَا لِذَاتِهٖ بَلْ لِزِيَارَةٍ اَوْ جِهَادٍ اَوْ

(طلب) عِلْمٍ وَ نَحْوِ ذٰلِكَ مِنَ الْمَنْدُوْبَاتِ وَالْمُبَاحَاتِ قَالَ وَقَدْ اُلْتُبِسَ ذٰلِكَ عَلٰى بَعْضِهِمْ فَزَعَمَ اَنَّ شَدَّ الرِّحَالِ اِلَى الزِّيَارَةِ لِمَنْ فِىْ غَيْرِ الثَّلاثَةِ دَاخِلٌ فِىْ مَنْعٍ وَهُوَ خَطَأٌ لِاَنَّ الْاِسْتِثْنَآءَ اِنَّمَا يَكُوْنُ مِنْ جِنْسِ الْمُسْتَثْنٰى مِنْهُ فَمَعْنَى الْحَدِيْثِ لَاتُشَدُّ الرِّحَالُ اِلٰى مَسْجِدٍ مِنَ الْمَسَاجِدِ اَوْ اِلٰى مَكَانٍ مِّنَ الْاَمْكِنَةِ لِاَجَلِ ذٰلِكَ الْمَكَانِ اِلَّا اِلَى الثَّلٰثَةِ الْمَذْكُوْرَةِ وَشَدُّ الرِّحَالِ اِلٰى زِيَارَةٍ اَوْطَلَبِ عِلْمٍ لَيْسَ اِلَى الْمَكَانِ بَلِ الَّذِىْ فِىْ ذٰلِكَ الْمَكَانِ ـ و اللّٰه اعلم

অর্থাৎ- ইমাম সুবকী কবীর রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেছেন, পৃথিবীর বুকে হাদীসে উল্লেখিত তিনটি স্থান ব্যতীত এমন কোন স্থান নেই, যা শরীয়তের আলোকে সৃষ্টিগতভাবেই সম্মানের অধিকারী বলে বিবেচিত। তাই উল্লিখিত তিন জায়গা ছাড়া কেবল জায়গার সম্মানার্থে কোন স্থানের দিকে সফর করা হয়না; বরং যিয়ারত, জ্ঞানার্জন বা জিহাদ ইত্যাদি বৈধ ও জায়েজ উদ্দেশ্যেই সফর করা হয়। যথাসম্ভব **مستثنى**-এর জন্য **مستثنى منه** সমশ্রেণীর হওয়াই অত্যাবশ্যক। অতএব হাদীসে পাকের মূল ইবারত দাঁড়ায় **لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ اِلٰى مَسْجِدٍ اِلَّا اِلٰى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ** অর্থাৎ- তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদের দিকেই তার নিজস্ব সম্মানের খাতিরে সফর করা যাবে না; কারণ লক্ষগুণ, পঞ্চাশ হাজার গুণ এবং পঁচিশ হাজার গুণ সওয়াবের বিশেষ হুকুম কেবল তিন মসজিদের সাথে সংশ্লিষ্ট। আর যিয়ারত, শিক্ষা সফরে মকান বা জায়গার উদ্দেশ্য হয় না; বরং মকীন অর্থাৎ ওই স্থানের বিশেষ কোন অবস্থানকারীর উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। এখন একথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, বাগদাদ, আজমীর, কালীয়র, লাহোর, সিরিকোট, দিল্লি, কচওয়াচাহ্, বাহরাইন ইত্যাদির সফর আল্লাহ পাকের মাহবুব বান্দাদের যিয়ারতের উদ্দেশ্যেই হয়, যা হাদীসে পাকের আলোকে নিষিদ্ধ হওয়াতো দূরের কথা, বরং হাদীসে পাকের নিষেধাজ্ঞার সাথে এর কল্পনার সম্পর্কও নেই। আর ওই ব্যক্তি কত বড় হতভাগা, যে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও এ মহান নি'মাত থেকে বঞ্চিত হয় এবং অন্যজনকে বঞ্চিত রাখার অপচেষ্টা চালায়। এ ক্ষেত্রে স্বয়ং রসূলে মাক্ববূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র বাণীগুলো সবিশেষ উল্লেখযোগ্য-

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ زَارَنِىْ كَانَ فِىْ جَوَارِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

[رواه البيهقى فى شعب الايمان ـ مشكوة]

অর্থাৎ হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার যিয়ারত করবে সে ক্বিয়ামত-দিবসে আমার প্রতিবেশে থাকবে।

مَنْ حَجَّ فَزَارَنِىْ بَعْدَ مَوْتِىْ كَانَ كَمَنْ زَارَنِىْ فِىْ حَيَاتِىْ

অর্থাৎ-যে ব্যক্তি আমার ওফাতের পর আমার যিয়ারত করলো সে যেন আমার জীবদ্দশায় আমার সাক্ষাৎ করলো।

مَنْ زَارَ قَبْرِىْ وَجَبَتْ لَهٗ شَفَاعَتِىْ رواه الدار قطنى (فتح القدير)

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি আমার কবর শরীফের যিয়ারত করবে তার জন্য আমার শাফা'আত অবধারিত।

مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ وَلَمْ يَزُرْنِىْ فَقَدْ جَفَانِىْ رواه ابن عدى بسند حسن (شرح لباب) وفى رواية **مَنْ وَّجَدَ سَعَةً وَلَمْ يَزُرْنِىْ فَقَدْ جَفَانِىْ**

অর্থাৎ-যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ শরীফের হজ্জ্ করলো আর আমার যিয়ারত করলো না, অন্য বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি মদীনা মুনাওয়ারা পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য রাখে আর সে আমার যেয়ারত করেনি (অর্থাৎ- শুধু হজ্জ্ করে চলে গেলো) সে আমার প্রতি অবিচার করলো।

হাদীস শাস্ত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশারদ হযরত শেখ আবদুল হক্ব মুহাদ্দিস দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি একজন সুপ্রসিদ্ধ বুযুর্গ হযরত সৈয়দ সদরুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, দুনিয়ার বুকে এমন দু'টো নি'মাত রয়েছে, যে দুটোর সমতুল্য কোন নি'মাত নেই। কিন্তু আফসোস! অধিকাংশ মানুষ তা থেকে উদাসীন। একটি হচ্ছে, হুযূর পুরনূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম -এর পবিত্র সত্ত্বা, দ্বিতীয়টি হলো বিশ্ব মুসলিম এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, ওই স্থানটুকু, যা হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র শরীর মুবারকের স্পর্শ পেয়েছে তা আরশ-কুরছি অপেক্ষাও উত্তম। তাই হাজীর জন্য উচিত- অতীব বিনয় ও নম্রতা সহকারে মদীনা তায়্যেবায় প্রবেশ করা আর সর্বাধিক আগ্রহ ও মুহাব্বত সহকারে রওযায়ে আক্বদাসের যিয়ারতের উদ্দেশ্য অগ্রসর হওয়া। সর্বোচ্চ ধৈর্য ও শান্তি সহকারে অবস্থানের চেষ্টা করবে। কারণ দুনিয়া আখিরাতের স্থায়ী শান্তি প্রাপ্তির এটাই প্রধান উপায়। প্রিয় নবী ইরশাদ করেছেন-

مَنْ زَارَنِىْ مُتَعَمِّدًا كَانَ فِىْ جَوَارِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَكَنَ الْمَدِيْنَةَ وَصَبَرَ عَلٰى بَلَآئِهَا كُنْتُ لَهٗ شَهِيْدًا اَوْ شَفِيْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ مَّاتَ فِىْ اَحَدِ الْحَرَمَيْنِ بَعَثَهُ اللّٰهُ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

অর্থাৎ-যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় আমার যিয়ারত করলো সে ক্বিয়ামত-দিবসে আমার প্রতিবেশী হয়ে থাকবে, আর যে মদিনা শরীফে অবস্থান করে এবং সেখানকার বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণ করে, ক্বিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সাক্ষ্য দেবো এবং তার জন্য শাফা'আত করবো। আর যে ব্যক্তি মক্কা মুকাররামাহ্ অথবা মদীনা মুনাওয়ারায় মৃত্যুবরণ করবে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক তাকে নিরাপদে উঠাবেন।

ইসলামী অনুষ্ঠানমালা

বারো মাসের আলোচনা

পবিত্র ক্বোরআনে ইরশাদ হয়েছে- আল্লাহর কাছে গণনার মাস হলো বারটি। আর সেই বারটি মাসেরই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তদুপরি আল্লাহ্ তা'আলা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকার বড় ধরনের ঘটনার অবতারণা করে কিংবা বিশেষ নি'মাতদান করে কোন কোন মাসের বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদাকে আরো সমুন্নত করেছেন। সৃষ্টির শুরু হতে নবী-রাসূলগণের স্মৃতি বিজড়িত এসব ঘটনা ও নি'মাত-প্রাপ্তির এসব দিবস ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে ফযীলতপূর্ণ দিবস হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। যেমন পবিত্র মুহাররম মাসের ১ম তারিখ এবং আশুরা। এভাবে পরবর্তীতে আখেরী চাহার শম্বাহ, ঈদে মিলাদুন্নবী, ফাতেহা-ই ইয়াযদাহম, গেয়ারভী শরীফ, মি'রাজুন্নবী, লাইলাতুল বরাত, লাইলাতুল ক্বদর, রমযান ইত্যাদির জন্য অনুষ্ঠানও ইবাদত। তাছাড়া ব্যক্তিগত জীবনেও কিছু কিছু অনুষ্ঠান পালন করা হয়, যার মধ্যে কোনটা ওয়াজিব, কোনটা সুন্নাত, কোনটা মুস্তাহাব। যেমন আক্বীকা, খৎনা, বিবাহ, ওয়ালিমা আর কারো মৃত্যুর পর তার জন্য ফাতেহা, কুলখানী, চেহ্লাম ইত্যাদি। বুযুর্গানে দ্বীনের ইনতিক্বাল-দিবসকে উপলক্ষ করে ওরস-ঈসালে সাওয়াব ইত্যাদি পালন করা হয়। নিম্নে সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে-

হিজরী নববর্ষ

হিজরী সনের ইতিকথা ও তাৎপর্য

আন্তর্জাতিক কিংবা আঞ্চলিক পরিমণ্ডলে যত বর্ষপঞ্জি অদ্যাবধি চালু রয়েছে তন্মধ্যে হিজরি সাল আপন মহিমায় এক অত্যুজ্জ্বল বর্ষপঞ্জি। হিজরি বর্ষপঞ্জিকা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পৃথিবীতে মানব বসতির কাল থেকেই পঞ্জিকার সৃষ্টি বলা চলে। কারণ, মানুষের শত-সহস্র ধর্মীয় ও পার্থিব কার্যাদি বর্ষপঞ্জিকার সাথে সম্পর্কযুক্ত। আর চাঁদ হল প্রাথমিক পঞ্জিকাসমূহের প্রধান ভিত্তি। কারণ, রাতের আকাশে গ্রহ-তারা ছাড়া চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধির মত এত স্পষ্ট একটা ঘটনা মানুষের দৃষ্টি এড়াতে পারে না। তা'ছাড়া ঋতু পরিবর্তনের তুলনায় চাঁদের পরিবর্তন ও পূর্বাবস্থায় পুনরাবর্তনের সময় অপেক্ষাকৃত কম। তাই মানব সভ্যতার ঊষালগ্ন হতেই আজকের আধুনিক বিশ্বের পঞ্জিকা তথা দিনের হিসাব করতে চাঁদের ভূমিকা সমান গুরুত্বপূর্ণ। তদুপরি হিজরি সাল যেহেতু চন্দ্রকে কেন্দ্র করে গণনা করা হয়, সেহেতু হিজরি সাল গণনায় চাঁদের ভূমিকা অত্যন্ত মুখ্য। পবিত্র কোরআনে হিজরি সাল গণনায় চন্দ্রের ভূমিকা প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন-

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّة ط قُلْ هِىَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاس وَالحَجّ

"(হে হাবীব!) আপনাকে নতুন চাঁদ সম্পর্কে তারা জিজ্ঞেস করছে। আপনি বলে দিন, সেটা সময়ের কতগুলো প্রতীক, মানবজাতি এবং হজ্জের জন্য।"

[সূরা বাক্বারাহ্, আয়াত ১৮৯]

পবিত্র কোরআনের উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় মাওলানা নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'তাফসীর-ই খাযাইনুল ইরফান'-এ লিখেছেন যে, "কৃষি, ব্যবসা- বাণিজ্য, রোযা ও ঈদের সময়, স্ত্রীলোকের ইদ্দতসমূহ, ঋতুস্রাবের দিনসমূহ, গর্ভধারণ, শিশুর স্তন্যপানের সময়সীমা ও হজ্জের বিভিন্ন সময় ইত্যাদি চন্দ্রের বিবর্তনের মাধ্যমে জানা যায়।" [খাযাইনুল ইরফান (বাংলা), পৃ.৭০]

সুতরাং, বলা যায় মানবজীবনের ওই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি চন্দ্রকে কেন্দ্র করে চলে। আর 'হিজরি সাল' যেহেতু চন্দ্রের সাথে সম্পৃক্ত, সেহেতু হিজরি সালের গুরুত্বও সকল জাতির কাছে গুরুত্বপূর্ণ।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, চাঁদ বর্ষপঞ্জিকাসমূহের প্রথম ও প্রধান ভিত্তি। পৃথিবী সৃষ্টির প্রারম্ভকাল থেকেই এ চন্দ্রবর্ষের আলোকে দিন-মাস-বছর-শতাব্দী গণনা করা হয়ে আসছে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে এরশাদ হচ্ছে-

اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اِثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ

"নিশ্চয় মাসগুলোর সংখ্যা আল্লাহর নিকট বার মাস, আল্লাহর কিতাবের মধ্যে, যখন থেকে তিনি আসমান ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন।" [সূরা তাওবা, আয়াত ৩৬]

সুতরাং মানব সভ্যতার উষালগ্ন থেকেই যে বর্ষ গণনার সূত্রপাত হয়, ওই বর্ষপঞ্জিকা চন্দ্রবর্ষপঞ্জিকা বা 'চান্দ্রসাল' নামে নামকরণ না করে কেন এটাকে 'হিজরি সাল' বলে মুসলমানারা নামকরণ করলেন তা আজ ভেবে দেখা দরকার। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত মুসলিম সমাজবিজ্ঞানী আল-বেরুনী লিখেছেন, "সাধারণতঃ প্রত্যেক জাতির রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন, রাজা বা ধর্মীয় নেতার জন্ম-মৃত্যু, সম্রাটের অভিষেক, দেশবিজয় ও প্রাকৃতিক কোন বড় ঘটনা ইত্যাদির উপার ভিত্তি করে পূর্বের লোকেরা সাল বা বর্ষ গণনা করতো। রোমীয়, ব্যাবেলনীয়, খ্রিস্টীয়, ইরানী ও ভারতীয় ইত্যাদি প্রচলিত প্রাচীন সাল গণনার প্রতিটির সূচনাতে রয়েছে কোন না কোন ঐতিহাসিক ঘটনা।" কিন্তু মুসলিম জাতির ইতিহাসে বিশ্বের ত্রাণকর্তা মহানবী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র শুভজন্ম (মীলাদ), বদরযুদ্ধ, মক্কাবিজয় ও ক্বোরআন নাযিল ইত্যাদির মত হাজারো গৌরবময় ঐতিহাসিক ঘটনা থাকা সত্ত্বেও পবিত্র মক্কা থেকে পবিত্র মদীনা শরীফে প্রিয় নবী ও তাঁর প্রিয় সাহাবীদের হিজরতের নামে এ বর্ষপঞ্জিকার নাম 'হিজরিবর্ষ' বা 'হিজরিসাল' নামকরণের মধ্য দিয়ে সাহাবা-ই কেরাম রদ্বিয়াল্লাহু আনহুম দূদর্শিতার

পরিচয় দিয়েছেন নিঃসন্দেহে। কারণ, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবাদের মদীনা শরীফে হিজরতের ঐতিহাসিক ঘটনা সেই দিন থেকে অনাগত ভবিষ্যত পর্যন্ত ইসলাম ও মুসলমানদের জীবনে এমনভাবে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত যেমনিভাবে বর্ষপঞ্জি জড়িত মানুষের মুহূর্ত, দিন, সপ্তাহ, মাস ও বৎসর।

অনুরূপ, 'হিজরত'ও একজন মুসলমানদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে এক অত্যাবশ্যকীয় গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। কারণ, 'হিজরত' শব্দের অর্থ হল 'ত্যাগ'। আল্লাহ্ ও তাঁর প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছু নিষেধ করেছেন তা 'ত্যাগ' করাই 'হিজরত'। অন্য কথায়, আল্লাহর একমাত্র পছন্দনীয় দ্বীন 'আল-ইসলাম'কে মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ করার নামই 'হিজরত'। তাই 'হিজরত' থেকেই ইসলামী বর্ষগণনা শুরু করার মাধ্যমে 'ত্যাগের' মহান শিক্ষাকেই প্রতিনিয়ত আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আর মদীনা শরীফে মুসলমানদের হিজরতের মধ্য দিয়েই মূলতঃ ইসলামের পূর্ণতার সূত্রপাত এবং ইসলামের প্রত্যয়ের প্রতিষ্ঠা। মক্কার সুনির্দিষ্ট গণ্ডি থেকে ইসলামের দাওয়াত সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ার পথ উন্মুক্ত করে 'হিজরত'। হিজরতের মাধ্যমে মুসলমানগণ একটি আলাদা জাতিসত্ত্বা হিসেবে বিশ্বের মাঝে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন। হিজরতের পর পরই মদীনায় ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান এবং সর্বপ্রকার দিক-নির্দেশনা প্রণীত হয়। সুতরাং, বলা চলে- 'হিজরত' ইসলাম ও মুসলমানদের জীবনে এক বিরাট মাইলফলক। এ কারণে 'হিজরত'কে কেন্দ্র করেই চন্দবর্ষকে 'হিজরিবর্ষ' নামে নামকরণ এবং 'হিজরত' থেকে এ বর্ষ গণনা আরম্ভ করা হয়।

এ প্রসঙ্গে মাওলানা আবুল কালাম আযাদ তার 'রসূলে রহমত' গ্রন্থে লিখেছেন যে, তখনকার জাতি-গোষ্ঠীর ইতিহাস ও সন-তারিখ পর্যালোচনার পর সাহাবা-ই কেরামের সামনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্রতম জন্ম ও নুবুয়্যত প্রকাশের দিনগুলো সাল নির্ধারণে বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। তাঁরা প্রসিদ্ধ ঘটনা বেছে নেন । ফলে হিজরতের ঘটনাই সকলের নিকট এমনভাবে প্রসিদ্ধ হয়ে উঠল, যা ছিল অন্য সব জাতি-গোষ্ঠী থেকে বিপরীত ও ব্যতিক্রমধর্মী একটি পদক্ষেপ। পৃথিবীর প্রত্যেক জাতি নিজেদের বিজয়-সফলতার কীর্তি দিয়ে তাঁদের ইতিহাস ও সন-তারিখ নির্ধারণ করেন, কিন্তু সাহাবা-ই কেরাম মজলূম, অসহায় ও সর্বহারাদের শেত্যাগের (হিজরত) ঘটনাকে কেন্দ্র করে সূচনা করেছিলেন মিল্লাতের ইতিহাস। জগতের মানুষ বীরত্বগাঁথার কীর্তিসমূহ জাগ্রত রাখে। আর সাহাবা-ই কেরাম তাঁদের করুণ চিত্রগুলো জীবন্ত করে রেখেছেন। প্রত্যেক জাতি চায় তাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির জন্ম ও বিজয় দিয়ে ইতিহাস রচনা করতে কিন্তু সাহাবীরা তাঁদের শ্রেষ্ঠ কর্ম 'হিজরত' দিয়ে শুরু করলেন জাতির ইতিহাস। যুদ্ধের ময়দানে শুধু বিজয় নয়, কঠিন নির্যাতন-নিপীড়ন, বিশাল শক্তির মোকাবেলায় ধৈর্য-সহিঞ্চুতা ও দৃঢ়তার বিজয় দিয়ে আমাদের ইতিহাস আরম্ভ হোক। অন্যান্য জাতির বিশ্বাস হল, রাষ্ট্র ও

ক্ষমতার প্রসার দ্বারা নিজেদের শক্তি ও খ্যাতির ভিত্ রচিত হয়। আর সাহাবা-ই কেরামের বিশ্বাস ছিল, স্বদেশ মাতৃভূমি ত্যাগ করার পর তাঁদের শক্তি, খ্যাতি ও ভাগ্যের দুয়ার খুলেছিল। নিঃসন্দেহে সাহাবীদের এ উপলব্ধি অত্যন্ত চমৎকার, ব্যতিক্রম এবং নিজস্ব সংস্কৃতির অঙ্গনে নবসৃষ্টি শৈলীর বহিঃপ্রকাশ। সাহাবা-ই কেরাম উন্নত ইসলামী চিন্তা-চেতনা ও কর্ম দ্বারা গড়েছিলেন মিল্লাতের ভিত্।''

এক কথায় হিজরি সন গণনার মাধ্যমে যেমন ইসলামের ইতিহাসকে প্রত্যক্ষ করা হয়, তেমনি ইসলামের পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠারও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। হিজরতের পূর্বকালে মুসলমানদের জীবনে সঙ্কট ছিল, হিজরতের পর থেকে সঙ্কট দূর হয় এবং মুসলমানগণ একটি বিস্ময়কর গ্রহণযোগ্যতায় পৃথিবীর সামনে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বস্তুতঃ হিজরি সনের প্রতিটি মাস ও দিন এসব শিক্ষা নিয়েই প্রতিদিন আমাদের দুয়ারে হাজির হয়।

তাই ইসলামী বর্ষপঞ্জিকা 'হিজরি' সন ও তারিখের প্রচলন ও ব্যবহারের মাধ্যমে ইসলামী ঐতিহ্য, চেতনা জাগ্রত হবার পাশাপাশি বিশ্বের সকল মুসলমান এক ও অভিন্ন ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হওয়ারও প্রেক্ষাপট তৈরি করে প্রতিটি দিনে। সুতরাং, ইসলামী ইতিহাস-ঐতিহ্য চর্চা ও অনুশীলনে আমাদের প্রতিটি কর্মকাণ্ডে হিজরি সন ও তারিখ ব্যবহার করা ঈমানী ও জাতীয় কর্তব্য বলে মনে করি। এ ব্যাপারে সকলের সচেতনতা একান্ত প্রয়োজন। ইসলামী শরীয়তের নিয়মানুষারে, হিজরী সন উদ্‌যাপন করে হিজরত ও হিজরতের গুরুত্ব তুলে ধরা মুসলমানদের দ্বীনী কর্তব্য ।

পবিত্র মুহররম ও আশূরা

মাহে মুহররম সম্মানিত মাস। এ মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ কলহ-বিবাদ বিশেষভাবে নিষিদ্ধ। বিশেষতঃ এ মাসের দশম তারিখটি বিভিন্ন কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এ দিনটিকে মুসলিম বিশ্বে 'আশূরা' নামে অত্যন্ত মর্যাদার সাথে স্মরণ করা হয়ে থাকে। ইতিহাসে দেখা যায়, মানবজাতির সৃষ্টির প্রারম্ভ হতে বহু ঘটনা এ দিনেই সংঘটিত হয়েছে। হযরত আদম, হযরত হাওয়া, হযরত ইব্রাহীম ও হযরত ঈসা আলায়হিমুস্ সালাম-এর আবির্ভাব, হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম-এর পৃথিবীতে আসা, তাঁর আল্লাহ্‌র কাছে নিবেদিত ফরিয়াদ কবূল হওয়া, হযরত ইয়াকূব আলায়হিস্ সালাম-এর সাথে তাঁর প্রিয়তম পুত্র হযরত ইয়ূসুফ আলায়হিস্ সালাম-এর সাক্ষাৎ, ফিরআউন ও তার সৈন্যদের বাহরে কুল্যমে নিক্ষিপ্ত হওয়া, হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম ও তার অনুসারীদের পরিত্রাণ লাভ, হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম আল্লাহর সাথে কথোপকথনের সৌভাগ্য ও তাওরাত কিতাব লাভ, হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম'র স্বীয় অনুসারীগণসহ মহাপ্লাবনের পর নৌকা হতে অবতরণ, হযরত ইদ্‌রীস আলায়হিস্ সালাম ও হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম-এর আসমানে আরোহণ, হুযূর

সাইয়্যেদুল কাওনাঈন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজাতুল কুবরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা'র সাথে শাদী মোবারক এবং হযরত ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সপরিবারে কারবালা প্রান্তরে এযিদ বাহিনীর হাতে নৃশংসভাবে শাহাদাত বরণ -সবই মুহররম মাসের দশ তারিখেই সংঘটিত হয়েছে। শুধু তা নয়, পৃথিবীর সৃষ্টি এবং ধ্বংসও এ আশূরাতে সংঘটিত হয়েছে ও হবে।

পবিত্র আশূরা দিবসের আমল

এ দিবসে ইবাদতের নিয়তে গোসল করলে সারা জীবন কুষ্ঠ রোগ হতে নিরাপদ থাকবে। এ দিনে ভাল আহার্য তৈরি করে নিজ পরিবার, গরীব, ইয়াতীম ও ফক্বীর-মিসকীনদের মাঝে বিতরণ করা উত্তম। এদিন যারা সদয় আচরণ করবে এবং সহানুভূতি প্রদর্শন করবে তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার অপরিসীম পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। এদিন সাত প্রকার দানার সংমিশ্রণে আহার্য তৈরী করে গরীব, পাড়া-প্রতিবেশী ও পরিবার পরিজনসহ সকলকে খাওয়ানো অত্যন্ত বরকতময় কাজ। হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম যখন মহা প্লাবনের পর যমীনে অবতরণ করেন, তখন তিনি এ ধরনের মিশ্রিত দ্রব্যের খাদ্য প্রস্তুত করেছিলেন এবং এরই স্মরণে এ আহার্য প্রস্তুত করা হয়। এ দিন হালিম বা খিচুরী জাতীয় খাদ্য রান্না করে শোহাদা-ই কারবালার উদ্দেশ্যে ফাতিহার ব্যবস্থা করাও বরকত লাভের উপায়। আশূরা দিবসে চোখে সুরমা লাগালে সারা বৎসর চক্ষু পীড়া হতে ইনশা-আল্লাহ মুক্ত থাকবে।

আশূরা উপলক্ষে ৯ম ও ১০ তারিখে রোযা রাখা অত্যন্ত সাওয়াবদায়ক। আশূরার রোযা অন্যান্য যে কোন নফল রোযার তুলনায় অধিতর সওয়াবজনক। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে -এ দিনে দশটি আয়াত তিলাওয়াতকারী সম্পূর্ণ ক্বোরআন শরীফ তিলাওয়াতের সাওয়াব পাবে। এ পবিত্র দিনে যে ব্যক্তি ১০০০ বার সূরা ইখলাস পাঠ করবে আল্লাহ পাক তার প্রতি বিশেষ রহমত নাযিল করবেন। বর্ণিত আছে যে, আশুরার দিন যে ব্যক্তি ৭০ বার 'হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকী-ল নি'মাল মাওলা ওয়া নি'মান্নাসীর' পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তার সমুদয় গুনাহ মার্জনা করবেন এবং তার প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হবেন। যে ব্যক্তি আশূরার দিন চার রাক'আত নফল নামায পড়বে, প্রতি রাক'আতে সুরা ফাতিহার সাথে ১৫ বার সূরা ইখলাস পড়বে এবং এ নামাযের সাওয়াব হযরত হাসান ও হযরত হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার পবিত্র রূহে বখশিস করবে তার জন্য ক্বিয়ামত দিবসে তাঁরা সুপারিশ করবেন। আশূরার দিন দুই রাক'আত করে চার রাক'আত নামায পড়বেন। প্রতি রাক'আতে সূরা ফাতিহার পর একবার সূরা কাফিরূন ও

একবার সূরা ইখলাস পাঠ করবেন। অন্য এক বর্ণনায় আরো চার রাক'আত নামাযের নিয়ম পাওয়া যায়; যাতে প্রতি রাক'আতে সূরা ফাতিহার সাথে পঞ্চাশবার সূরা ইখলাস পাঠ করবেন। নামাযান্তে কমপক্ষে ১০০ বার দুরূদ শরীফ পড়বেন ও মুনাজাত করবেন।

হাফ্তদানা

চান্দ্রবর্ষ পরিক্রমায় 'আশূরা' (১০ মুহাররম) এক অতি গুরুত্ববহ দিন। আল্লাহ্ পাকের কুদরতের মহিমা যে, এ দিনে বিশ্ব ইতিহাসের বহু তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নেক বান্দাদের উপর করেছেন মহা অনুগ্রহরাজি; পক্ষান্তরে বহু বিশ্বধিক্কৃত পাপী-যালিমকে দিয়েছেন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। বলাবাহুল্য, নেক বান্দাদের উপর আল্লাহ্র অনুগ্রহ যেমন আনন্দময়, পাপী-যালিমদের ধ্বংসও তেমনি ভূ-পৃষ্ঠ ও দুনিয়াবাসীর জন্য কল্যাণকর। সর্বোপরি, এ দিনটি আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর নিকট অতি বরকতময়। তাই এ দিনটিকে শরীয়তসম্মত উপায়ে উদ্যাপন করলে অভাবনীয় কল্যাণ, সাওয়াব, সর্বোপরি আল্লাহ্ ও তাঁর হাবীবের নৈকট্য লাভ করা যায়। এ দিনটি শরীয়তের নিয়মানুসারে উদ্যাপন করা যায়- রোযা পালন (দু'টি রোযা ৯-১০ অথবা ১০-১১ মুহাররম), বিশেষভাবে গোসল করা, (ইসমাদ) সুরমা লাগানো, রোগীর পরিচর্যা, শরবৎ পান করানো, নফল নামায (বিশেষ নিয়মে চার রাক'আত) ও দান-খায়রাত ইত্যাদি দ্বারা। এ দিনে নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য উন্নত (হালাল) খাদ্য-পানীয়ের ব্যবস্থা করাও অতি ফযীলতমণ্ডিত কাজ। এ দিনের অন্যতম বিশেষ নেক কাজ হচ্ছে- 'হাফ্তদানা' (সাতদানা)'র ফাতিহাও। আমাদের দেশে আশূরার দিনে পরিবার-পরিজনের জন্য উন্নতমানের হালাল খাদ্য-পানীয়ের ব্যবস্থার সাথে সাথে 'হাফ্তদানা'র ফাতিহারও আয়োজন করা হয়। যুগ যুগ ধরে মুসলিম সমাজে প্রচলিত এ নিয়মটির পক্ষেও রয়েছে শরীয়তের বহু অকাট্য দলীল। এ নিবন্ধে আশূরার অন্যান্য নেককার্যাদির সাথে 'হাফ্তদানা' ও উন্নতমানের খাদ্য-পানীয়ের ব্যবস্থাপনার প্রসঙ্গে সপ্রমাণ আলোচনা করার প্রয়াস পাচ্ছি।

বিশ্ববরেণ্য ইমাম আবুল ফারাজ আবদুর রহমান ইবনে আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনুল জাওযী আল্ ক্বোরাশী আত-তামীমী আল্ বাকারী আল্ হাম্বলী (ওফাত ৫৯৭ হিজরি) রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি তাঁর প্রসিদ্ধ 'বুস্তানুল ওয়া-'ইযীন' ও 'রিয়াযুস্ সা-মি'ঈন'-এ মজলিস নম্বর ১৫, আশূরার দিনের ফযীলত প্রসঙ্গে বর্ণনায় লিখেছেন-

হুযূর সাইয়্যেদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মতকে আল্লাহ্ তা'আলা অন্যান্য নবীর উম্মতদের তুলনায় দীর্ঘজীবন দান না করলেও তাদেরকে অনেক বৈশিষ্ট্যে বিশেষিত করেছেন। তাদেরকে অতি কম সময়ে,

সহজতর উপায়ে স্বল্পতর সৎকার্যাদির মাধ্যমে বহু উন্নত মর্যাদাদি লাভ করার সুযোগ দান করেছেন। বিশেষতঃ তাদেরকে এমন কিছু দিন ও রাত দিয়েছেন, যেগুলোতে নির্দিষ্ট কিছু নেক কাজ করলেই তারা আখিরাতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি, নৈকট্য ও অগণিত সাওয়াব এবং দুনিয়ায় অগণিত কল্যাণ লাভ করতে সমর্থ হয়ে যায়। যেমন- 'আইয়্যামে বীয্' (প্রতি চান্দমাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ), আরাফাহ্ দিবস, ১লা রজব, ২৭ শে রজব, অর্দ্ধ শা'বানের রাত (শবে বরাত), শবে ক্বদর, ঈদুল ফিত্র ও এর পরবর্তী শাওয়ালের ছয় দিন, যিলহজ্জের প্রথম দশ দিন ইত্যাদি। উল্লেখ্য, মুহাররম মাসের ১০ম দিন (আশূরা-দিবস) ওই সব বরকতময় দিনের মধ্যে অন্যতম। এ দিনে বান্দাদের পাপরাশি ক্ষমা করা হয়, দান-সাদক্বাহ্ দ্বারা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ হয়, রোযা পালন করলে অকল্পনীয় সাওয়াব পাওয়া যায়। হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত করলে মদীনা মুনাওয়ারার ইহুদীদেরকে রোযা পালন করতে দেখলেন। এর কারণও সবার জানা আছে। অতঃপর হুযূর নিজেও রোযা রেখেছেন এবং মুসলমানদেরকেও রোযা পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। অবশ্য, ইহুদীরা শুধু আশূরার দিনের রোযা পালন করে। তাদের বিরোধিতায় আমাদেরকে দু'টি রোযা পালন করার বিধান দেওয়া হয়েছে।

আল্লামা ইবনুল জাওযী হুযূর-ই পাকের হাদীস শরীফের বরাতে আরো লিখেছেন- "যে ব্যক্তি আশূরার দিন (বিশেষ) গোসল করবে, মৃত্যু ব্যতীত তাকে অন্য কোন রোগ স্পর্শ করবে না, যে ব্যক্তি এ দিনে সুরমা (ইসমাদ) লাগাবে, গোটা বছর তার চোখে ছানি পড়বে না, যে ব্যক্তি আশূরার দিনে রোগীর পরিচর্যা করে, সে যেন সমস্ত বনী আদমের পরিচর্যা করে, যে ব্যক্তি এ দিনে মু'মিন বান্দাকে শরবৎ পান করায় সে যেন সমস্ত বনী-আদমকে পিপাসার্ত অবস্থায় তৃপ্তি সহকারে পানি পান করায়। আর যে ব্যক্তি এ দিনে এভাবে চার রাক্'আত নফল নামায পড়ে, আল্লাহ্ ওই ব্যক্তির পঞ্চাশ বছর আগের ও পঞ্চাশ বছর পরের গুনাহ্ ক্ষমা করে দেন- প্রত্যেক রাক্'আতে সে সূরা ফাতিহার পর ১৫ (পনের) বার সূরা ইখলাস শরীফ পড়বে। তদুপরি, তাঁর জন্য আল্লাহ্ তা'আলা হাজার নূরী মিম্বর তৈরী করাবেন। আরো একটি রেওয়ায়েতের সূত্রে আল্লামা ইবনুল জাওযী লিখেছেন যে, হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম বলেছেন- তাওরীতে লিপিবদ্ধ আছে যে, যে ব্যক্তি আশূরার দিন রোযা রাখল, সে যেন গোটা যামানা রোযা রাখল...।

আল্লামা ইবনুল জাওযী লিখেছেন- আশূরার রাত ও দিনে আল্লাহ্র রাহে ব্যয় করা মুস্তাহাব। কারণ, বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি এ দিনে এক দিরহাম ব্যয় করবে, আল্লাহ্ তাকে সেটার বিনিময়ে সাত দিরহামের সাওয়াব ও বরকত দান করবেন...। হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলতেন, তোমরা আশূরার রাত ও দিনের মধ্যে তোমাদের ঘরগুলোর কল্যাণ বৃদ্ধি করো। আর তোমাদের

পরিবার- পরিজনের জন্য উন্নতমানের হালাল পানাহারের ব্যবস্থা করো...।

আমাদের দেশেও অন্যান্য মুসলিম দেশের মতো আশূরার দিবস পালনার্থে প্রত্যেক সুন্নী মুসলমান অন্যান্য নেক কার্যাদির সাথে সাথে উন্নতমানের খাবার ও হাফ্তদানার ফাতিহার আয়োজন করে থাকেন। এ প্রসঙ্গে ইমামে আহ্লে সুন্নাত আল্লামা গাযী আযীযুল হক শেরেবাংলা আলক্বাদেরী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি তাঁর 'দীওয়ান-ই আযীয' -এর ১৭৭ পৃষ্ঠায় ফার্সী কাব্যে লিখেছেন-

در طعام وسعت نمودن ای فتا ÷ بر عیال واہل خود آمد روا

یوم عاشورہ بہ بیں قول رسول ÷ منکران بیگماں گردد جہول

ہفت دانہ ہم روا شد اندراں ÷ کن نظر در مختار اے جواں

فتوی شامی نظر کن بعد ازاں ÷ سرخروئی از برائے سنیاں

অর্থাৎ: ১. (আশূরার দিন) নিজ পরিবার-পরিজনের জন্য খাদ্যকে প্রশস্ত করা (এ উপলক্ষে উন্নতমানের খাদ্য তৈরী করা) ওহে যুবক! জায়েয বলে বর্ণিত হয়েছে।

২. আশূরার দিন সম্পর্কে হাদীস শরীফে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যা এরশাদ করেছেন তা দেখে নাও। এতদ্সত্ত্বেও যারা এটা অস্বীকার করবে তারা তো মূর্খের দল হবেই।

৩. ওই দিনে 'হাফ্তদানা' (সাতদানার ফাতিহা)ও জায়েয বলে সাব্যস্ত হয়েছে। ওহে যুবক! এ কথা 'দুররে মুখতার'-এ দেখতে পারো।

৪. এর পর ফাত্ওয়া-ই শামীও দেখো! (এগুলোর পক্ষে অকাট্য দলীলাদি দেখে) সুন্নী মুসলমানদের মুখ আরো উজ্জ্বল হবে।

আল্লামা গাযী শেরে বাংলা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আনহু এ প্রসঙ্গে তাঁর মাজমূ'আহ্-ই- ফাতাওয়া-ই আযীযিয়া'য় লিখেছেন-

'মাযাহির-ই-হক্ব' : ২য় খণ্ড কিতাবুয্ যাকাত, সাদক্বাহর ফযীলত শীর্ষক অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে- হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

مَنْ وَسَّعَ عَلٰى عَيَالِهٖ فِى النَّفُقَةِ يَوْمَ عَاشُوْرَآءَ وَسَّعَ اللّٰهُ عَلَيْهِ سَآئِرَ سَنَةٍ

অর্থাৎ : "যে ব্যক্তি আপন পরিবার-পরিজনের জন্য খরচের বেলায় আশুরার দিন প্রশস্থতা অবলম্বন করে, আল্লাহ তা'আলা গোটা বছর-ই তার জন্য প্রাচুর্য দান করেন।" হযরত সুফিয়ান সওরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন,

اِنَّا قَدْ جَرَّبْنَاهُ فَوَجَدْنَاهُ كَذٰلِکَ اهـ

অর্থাৎ আমরা এর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি এবং এর অনুরূপই পেয়েছি। হযরত

মুহাদ্দিস আবদুল হক্ব দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর মা-সাবাতা বিস্‌সুন্নাহয়, আল্লামা ইসমাঈল হক্কী হানাফী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি তাঁর 'তাফসীর-ই রূহুল বয়ান' **১ম** খণ্ডে প্রায় কাছাকাছি বিষয়বস্তুর বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।

'ফাতাওয়া-ই শামী'তে আশূরার দিনে উন্নত খাবারের সাথে সাথে সুরমা লাগানোর কথাও বর্ধিত করা হয়েছে। হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন- আমি চল্লিশ বছর যাবৎ এর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। আর হাদীসে পাকের ব্যতিক্রম ঘটেনি। 'ফাতাওয়া-ই- শামী'তে (৫মখণ্ড : কিতাবুল হাযর ওয়াল ইবাহত) প্রচলিত নিয়মে 'হাফ্‌ত দানা'র কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। 'দুররে মুখতার' এ এভাবে লেখা হয়েছে- **لَابَأْسَ بِالْمُعْتَادِ خَلْطًا وَ يُؤْجَرُ** অর্থাৎ : প্রচলিত নিয়মে দানাগুলোর মিশ্রণে যে বিশেষ খাদ্য ও সেটার উপর ফাতিহার ব্যবস্থা করা হয় তাতে কোন ক্ষতি নেই। অর্থাৎ তা অবৈধ নয়, বরং মুস্তাহাব ও ইবাদতের সামিল।

তাছাড়া, 'নুয্‌হাতুল মাজালিস' **১ম** খণ্ডেও উপরোক্ত হাদীস শরীফ উল্লেখ করা হয়েছে। 'শরহে শির'আতুল ইসলাম'-এ আশূরার দিনের সুন্নাতসমূহের বিবরণ শীর্ষক পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে- ''ফকীর-মিস্‌কীনদেরকে কাপড় ইত্যাদি দান করা, যিকর (আলোচনা) মাহফিলে হাযির হওয়া, শরবৎ পান করানো, নিজ পরিবার-পরিজন ও অন্যান্যকে খাদ্যাহার করানো, ইয়াতীমদের মাথায় হাত বুলানো ও গোসল করা এ পবিত্র দিনের সুন্নাত সম্মত কার্যাদি। ''

ওহাবীদের হাকীমুল উম্মত মৌং আশ্‌রাফ আলী থানভী সাহেবের 'বেহেশতী জেওর'; ৬ষ্ঠ খন্ড, ৯৩ পৃষ্ঠায়ও আশুরা পালনের সমর্থন রয়েছে। তাছাড়া 'জাওয়াহিরে গায়বী' : কান্‌যে পাঞ্জুম : পৃষ্ঠা ৬১৪-৬১৬ -এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি মুহার্‌রম মাসের প্রথম দশ দিনে প্রতিদিন দু'রাক্'আত নফল নামায পড়বে, সালাম ফেরানোর পর হাজার বার দুরূদ শরীফ পড়বে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নেয়ায করবে, সে বড় সাওয়াবের অধিকারী হবে। এতে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, জেনে রেখো, 'আশূরা' আল্লাহ তা'আলার নিকট বড়ই বরকতমণ্ডিত দিন। হুযূর এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সুন্নাতসম্মত উপায়ে এ দিন উদ্‌যাপন করলো, সে যেন হাজার বছর আল্লাহর ইবাদত করলো। এ দিনে দশটি সুন্নাত রয়েছে- **১.** রোযা রাখা **২.** নফল নামায পড়া **৩.** ইয়াতীমের মাথায় স্নেহের হাত বুলিয়ে দেওয়া **৪.** গোসল করা **৫.** বিরোধ মিটিয়ে পরস্পর সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হওয়া **৬.** রোগীর পরিচর্যা করা **৭.** পরিবার -পরিজনের জন্য এবং মিসকীন ও গরীবদের উন্নত মানের খাদ্যাহারের ব্যবস্থা করা **৮.** আলিমে দ্বীনের যিয়ারতের জন্য গমন করা **৯.** সুরমা লাগানো এবং **১০.** আল্লাহর মহান দরবারে বিশেষ দো'আ মুনাজাত করা।

ওহাবীদের বরেণ্য পুস্তক 'বেহেশ্‌তী জেওর' ৬ষ্ঠ খন্ড : ৯৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন,

যে ব্যক্তি এ দিনে আপন পরিবার-পরিজনের জন্য খাদ্য-পানীয়ের প্রচুর ব্যবস্থা করে গোটা বছরই তার জীবিকার বরকত হবে। হযরত শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভীর 'মালফূযাত'ও প্রকারান্তরে এসব সুন্নাত কাজের মাধ্যমে আশূরা পালনের সমর্থন পাওয়া যায়।

পরিশেষে, আশূরার দিনটি যেহেতু আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অগণিত কল্যাণ পাবারই দিন, তাই এ দিনে বিভিন্ন সুন্নাত সম্মত পন্থায় আল্লাহ্ পাকের শুক্‌রিয়া জ্ঞাপন করা চাই। তবেই আল্লাহ্‌র রহমত পাওয়া যাবে, অন্যথায় নয়। কোন গুরুত্বপূর্ণ দিবস উদ্‌যাপন করতে গিয়ে শরীয়ত ও নৈতিকতা- বিরোধী কাজে লিপ্ত হবার মাধ্যমে আনন্দ প্রকাশ করা আসলে ওই দিবসকে বরণ কিংবা উদ্‌যাপন করা হতে পারে না। যেমন 'খ্রিস্টমাস ডে' ও 'থার্টি ফার্স্ট নাইট'-এ ইংরেজী নববর্ষ বরণ উপলক্ষে কিছু লোককে দেখা যায়।

অনুরূপ, মুসলমান নামধারী শিয়া সম্প্রদায় ও তাদের দোসররাও আশূরা দিবসে অনৈসলামিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়। ইমাম হুসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর ঘোড়ার মূর্তি ইত্যাদি তৈরী করে সেটাসহ নারী-পুরুষ একত্রে মিছিল করা, কোন কোন দেশে এ-ই শিয়াদের এ মিছিলে রশিতে ছুরি বেঁধে নিজেদের গায়ে আঘাত করা, মুখ ও বুক চাপড়িয়ে মাতম করা, এমনকি তাদের তথাকথিত 'ইমামবাড়াগুলো'তে আশূরার রাতে 'নিকাহে মাত্'আহ্' (সাময়িক বিবাহ)'র নামে জঘন্য অবৈধ কাজে লিপ্ত হওয়া ইত্যাদি আশূরা পালন নয়। এসব কাজের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র গযবের শিকার হওয়া অনিবার্য। আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে এ দিনের প্রতি যথাযথভাবে শরীয়তসম্মত পন্থায় সম্মান দেখানোর তাওফীক্ব দিন। আমীন।।

নবীবংশের পবিত্রতা

পবিত্র মুহাররম মাসের অগণিত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ইসলামের জন্য নবী বংশের ত্যাগ অত্যন্ত স্মরণীয় । তাই আহলে বায়ত অর্থাৎ নবী বংশের কিছু ফযীলতও এখানে আলোচনা করা হলো-

সর্বশ্রেষ্ঠ শহর রসূলের শহর এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বংশ সায়্যিদুল মুর্‌সালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশ।

اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا

''হে নবীপরিবারের সদস্যবর্গ! আল্লাহ্‌তো কেবল চান আপনাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং আপনাদেরকে পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র রাখতে।'' [আহ্‌যাব-৩৩]

প্রিয়তম রসূলের আহ্‌লে বায়ত, তাঁর পুণ্যবতী স্ত্রীগণ বা তাঁর পবিত্র নূরানী বংশধরগণ সর্বতোভাবে পবিত্র এবং আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয়। কারণ, তাঁরা রসূলে পাকের কাছের মানুষ, আর রসূলে পাকের চক্ষু শীতল ও অন্তর জয় করতেই তো আল্লাহ্ চান।

তাছাড়া, নবীগণ আলায়হিমুস্ সালাম তথা নেক্কার বান্দাদের ঈমানদার বংশধর হওয়াও অতি সৌভাগ্যের ব্যাপার। যেমন-

কোরআনের আলোকে

وَالَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَاتَّبَعَتۡهُمۡ ذُرِّيَّتُهُمۡ بِاِيۡمَانٍ اَلۡحَقۡنَا بِهِمۡ ذُرِّيَّتَهُمۡ وَمَآ اَلَتۡنٰهُمۡ مِّنۡ عَمَلِهِمۡ مِّنۡ شَيۡءٍ ؕ

অর্থাৎ, ''যারা ঈমানদার এবং তাদের সন্তানগণও (যারা) ঈমানে তাঁদের অনুগামী, আমি তাদের সন্তানদেরকে জান্নাতে তাদের সাথে মিলিত করে দেব এবং তাদের আমল বিন্দুমাত্রও হ্রাস করব না।'' [সূরা তূর, আয়াত ২১]

তাফসীর-ই মাযহারী শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্‌র রসূল এরশাদ ফরমায়েছেন-

''আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিন সৎকর্মপরায়ণদের সন্তান- সন্ততিদেরকেও তাঁদের বুযর্গ পিতৃপুরুষদের মর্তবায় পৌঁছিয়ে দেবেন, যদিও তাঁরা কর্মের দিক দিয়ে সেই মর্তবার যোগ্য না হয়, যাতে বুযর্গদের চক্ষু শীতল হয়।''

জীবন চলার পথে পরিপূর্ণভাবে রসূলের অনুসরণ করলেই সৎকর্মপরায়ণ মু'মিন হওয়া যায়। লক্ষ্য করুন, গোলামানে রসূলদের চক্ষু শীতল করতেই যদি তাদের অপেক্ষাকৃত কম আমল মু'মিন সন্তানদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেওয়া হয়; স্বয়ং রসূল-ই মাক্ববূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বংশধরদের অবস্থা কী হবে! আল্লাহ্ কি তাঁর প্রিয়তমের চক্ষু শীতল করতে চান্না?

সূরা কাহাফের ৮২নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ বলেন-

وَاَمَّا الۡجِدَارُ فَكَانَ لِغُلٰمَيۡنِ يَتِيۡمَيۡنِ فِى الۡمَدِيۡنَةِ وَكَانَ تَحۡتَهٗ كَنۡزٌ لَّهُمَا وَكَانَ اَبُوۡهُمَا صَالِحًا ۚ فَاَرَادَ رَبُّكَ اَنۡ يَّبۡلُغَاۤ اَشُدَّهُمَا وَيَسۡتَخۡرِجَا كَنۡزَهُمَا ۖ رَحۡمَةً مِّنۡ رَّبِّكَ ۚ

অর্থাৎ, ''বাকী রইলো ঐ প্রাচীর, তা ছিল নগরের দু'জন এতিম বালকের এবং সেটার নীচে তাদের জন্য সংরক্ষিত গুপ্ত ধনভাণ্ডার ছিল এবং তাদের পিতা সৎপরায়ণ ছিলেন; সুতরাং তাদের প্রতিপালক ইচ্ছা করলেন যে, তারা উভয়ে তাদের যৌবনে পদার্পণ করুক এবং তারা আপন ধনভাণ্ডার উদ্ধার করুক আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহে।''

[সূরা কাহাফ, আয়াত ৮২]

প্রতীয়মান হল পিতামাতার সৎকর্মের উপকার সন্তান- সন্ততিরা দুনিয়ার জীবনেও পায়। অতএব, মহাপ্রাণ নবী- রসূলদের সৌভাগ্যবান সন্তানরাও পার্থিব জীবনে মর্যাদাপ্রাপ্ত হবেন তাতে সন্দেহ কিসের? তাঁদের প্রতি খোদাপ্রদত্ত মর্যাদাসমূহের বর্ণনা একের পর এক পড়ুন:

رَبَّنَا وَاجۡعَلۡنَا مُسۡلِمَيۡنِ لَكَ
وَمِنۡ ذُرِّيَّتِنَاۤ اُمَّةً مُّسۡلِمَةً لَّكَ

অর্থাৎ, ''হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আমাদের উভয়কে তোমার আজ্ঞাবহ কর এবং আমাদের বংশধর থেকেও একটি অনুগতদল সৃষ্টি কর।'' [সূরা বাক্বারা, আয়াত ১২৮]

সায়্যিদুনা হযরত খলীলুল্লাহ্ আলাইহিস্ সালাম নিজের পরবর্তী বংশের হেদায়াতের জন্য দু'আ করেছেন। আর নবীদের প্রার্থনা আল্লাহর দরবারে অবশ্যই মাক্ববূল। এতটুকু প্রতীয়মান হল যে, অন্যান্য বংশ সমূলে গোমরাহী ও অনাদর্শের শিকার হলেও নবী-রসূলদের পরবর্তী উত্তরপুরুষদের সবাই গোমরাহ্ হতে পারেন্ না। বরং হেদায়েত ও দ্বীনের বাগিচা তো তাঁদের দ্বারাই সজীব থাকবে।

وَجَعَلۡنَا فِىۡ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالۡكِتَابَ

আমি তাঁর বংশধরদের মধ্যেই নুবূয়্যত ও

কিতাব দান করলাম।'' [সূরা আনকাবূত, আয়াত ২৭]

হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালাম এর পর সকল নবী-রসূল তাঁরই পবিত্র বংশেই প্রেরিত হয়েছেন। এটা তাঁরই প্রার্থনার সুফল। আমাদের রসূল সর্বশেষ রসূল ও আখেরী নবী, তাই আখেরী নবীর বংশে কেউ নবী হন্নি এবং হতেও পারেন্ না। তবে, দ্বীন ও ঈমানের হেফাযত ও রক্ষণাবেক্ষণে নবীবংশের খেদমতই যে অগ্রগণ্য তা খিলাফত-ই রাশেদা পরবর্তী ইমাম হুসাইন রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর কারবালা থেকে শুরু করে সর্বশেষ ইমাম মাহ্দী আলাইহিস্ সালাম পর্যন্ত যুগ যুগান্তরে গাউসুল আ'যম, গরীব-ই নাওয়ায তথা সর্বকালে-সর্বস্থানে সকল বাস্তবতা এবং পূর্বাপরের যাবতীয় বর্ণনা অকাট্যভাবেই প্রমাণ করে।

وَاذۡكُرُوۡا نِعۡمَةَ اللّٰهِ عَلَيۡكُمۡ اِذۡ جَعَلَ فِيۡكُمۡ
اَنۡبِيَآءَ وَجَعَلَكُمۡ مُّلُوۡكًا....

অর্থাৎ, ''হে বনী ইসরাঈল! তোমাদের প্রতি আল্লাহর নে'মাত স্মরণ কর যে, তিনি তোমাদের মাঝেই পয়গম্বর সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকেই রাজ্যাধিপতি করেছেন।'' [সূরা মায়েদাহ্, আয়াত ২০]

يٰبَنِىۡۤ اِسۡرَآئِيۡلَ اذۡكُرُوۡا نِعۡمَتِىَ الَّتِىۡۤ اَنۡعَمۡتُ
عَلَيۡكُمۡ وَاَنِّىۡ فَضَّلۡتُكُمۡ عَلَى الۡعٰلَمِيۡنَ

অর্থাৎ, ''হে বনী ইসরাঈলগণ, স্মরণ কর আমার অনুগ্রহের কথা যা আমি তোমাদের উপর করেছি এবং আমি তোমাদেরকে সমগ্র বিশ্বের উপর উচ্চ মর্যাদা দান করেছি। [সূরা বাক্বারা, আয়াত ৪৭]

প্রতীয়মান হল, যে বংশে নবীদের শুভাগমন হয়, কিম্বা যারা নবীবংশে জন্মগ্রহণ করেন তাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা ও মহান আল্লাহর পক্ষ হতে অনুপম অনুগ্রহ প্রাপ্ত হন। এ ক্ষেত্রে

সৃষ্টির সেরা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূলের খোশ কিসমত বংশধরকে আল্লাহ্ তা'আলা সুমহান মর্যাদা আর শ্রেষ্ঠতম নে'মাতের মালিক করেছেন।

وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنَ السَّبِيْلِ ○

অর্থাৎ, ‘‘জেনে রাখ, যা কিছু মাল-সম্পদ তোমরা (সর্বযুগে) গণীমত হিসেবে লাভ করবে, তার এক পঞ্চমাংশের অধিকারী আল্লাহ্, রসূল, রসূলের নিকটাত্মীয় -স্বজন এবং এতীম-অসহায় ও মুসাফিরদের জন্য। [সূরা আনফাল, আয়াত ৪১]

বুঝাগেল, যুদ্ধলব্ধ তথা গণীমতের সম্পদে অন্যান্যদের প্রাপ্তি শর্তসাপেক্ষে, কিন্তু সা'দাতে কেরাম নিঃশর্তভাবেই তাঁদের ন্যায্য হিস্সা পাবেন। বলা বাহুল্য, এ মর্যাদা কেবল নবীজীর বংশ হওয়ার কারণেই।

يٰنِسَآءَ النَّبِىِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ

(হে নবীপত্নীগণ, আপনারা অন্য রমণীদের মত নন)

[সূরা আহ্যাব, ৩২]

মহান আল্লাহ্ প্রিয়তম রসূলের পুণ্যবতী স্ত্রীগণকে জানিয়ে দিচ্ছেন- দেখুন, আপনারা বিশ্বের সমস্ত নারীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এর একমাত্র কারণ, আপনারা সর্বশ্রেষ্ঠ রসূলের স্ত্রী। মানে মর্যাদার মাপকাঠিই নবীজীর সম্পৃক্ততা।

لَا اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ وَاَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ

অর্থাৎ, ‘‘আমি এ নগরীর শপথ করছি, যেহেতু (হে মাহবুব!) আপনি এতে অবস্থান করছেন, এবং (শপথ করছি) জনকের ও সন্তানদের।’’[সূরা বালাদ, পারা-৩০, আয়াত ১-৩]

এখানে ‘জনক’ এবং ‘সন্তান’ বলতে ‘রসূল’ এবং ‘আওলাদে রসূল’ হওয়াটাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। যেহেতু শুরুতেই মক্কা নগরীর নামে শপথ করার কারণ দর্শাতে ‘রসূল’র সম্পৃক্ততাই দেখানো হয়েছে। অবশ্য সন্তান মানে রসূল এবং জনক অর্থে নবীজীর পিতা-মাতা হযরত আবদুল্লাহ্ ও হযরত আমিনাহ্ রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমাও হতে পারেন। যা প্রমাণিত হয়, তা হচ্ছে- মর্যাদাবান হওয়ার সোপান রসূলের সম্পর্ক।

‘‘কা'বাকে ক্বেবলা বানানোর পেছনেও রসূলকে সন্তুষ্ট করানোই উদ্দেশ্য।’’ এ কথা কি আল্লাহ্ বলেন্ নি?

فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا

অর্থাৎ, ‘‘অবশ্যই আমি আপনাকে ফিরিয়ে দেবো সেই ক্বিবলার দিকে, যাতেই আপনার সন্তুষ্টি রয়েছে।’’ [২ : ১৪৪]

আর ভবিষ্যতের জন্যও আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রিয়তম হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সন্তুষ্ট রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এরশাদ করেন,

وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى

অর্থাৎ, ‘‘এবং নিশ্চয় অচিরেই আপনার প্রতিপালক আপনাকে এত প্রাচুর্য দেবেন যে, আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।’’ [সূরা দ্বোহা, ৫]

বান্দা কিসে সন্তুষ্ট হয় তা অন্তর্যামী আল্লাহ্ ছাড়া আর কে ভাল জানবে? তাই তিনি হাবীবে পাকের প্রিয় জবানেই এ'লান করিয়ে দিয়েছেন-

قُلْ لَّا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى

‘‘বলুন, ‘‘আমি তোমাদের কাছে আমার দাওয়াতের জন্য (আমার) ‘আত্মীয়-স্বজনের সৌহার্দ্য’ ব্যতীত কোন কিছুই চাই না।’’ [সূরা শুরা-২৩]

আন্তরিকতাপূর্ণ নিষ্কলুষ ভালবাসার এ দাবি মুমিনদের উপর কেবল মাহবূবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটাত্মীয়ের জন্যই রাখা হয়েছে। স্বীয় স্বার্থেই মুমিনদের ঈমানী জীবনে এ এক অপরিহার্য কর্তব্য। বর্ণনায় এসেছে, হযরত ফারুকে আ'যম রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর যামানায় সৈনিকদের জন্য নিরূপিত সরকারী ভাতায় হযরত আবদুল্লাহ্ বিন ওমর রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ভাতা ছিল তিন হাজার, অন্যদিকে হযরত উসামা রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ভাতা ছিল সাড়ে তিন হাজার। হযরত আবদুল্লাহ্ রদ্বিয়াল্লাহু আনহু আপত্তি জানালেন। আমীরুল মুমিনীন জবাব দিলেন, দেখ আবদুল্লাহ্! আমি তো তোমায় ভালবাসি, আর রসূলে পাক ভালবাসতেন উসামাকে। তাই আমি আমার ভালবাসার পাত্রের উপর রসূলে খোদার ভালবাসার পাত্রকে অগ্রাধিকার দিয়েছি। আর এটাই আমার ঈমানী দায়িত্ব।

নবীবংশের পবিত্রতা হাদীসে রসূলের আলোকে

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রিয়তম রসূলের অসংখ্য বাণী তথা হাদীসে পাক রয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি হাদীস শরীফের উদ্ধৃতি পেশ করছি।

اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى كِنَانَةَ مِنْ وُّلْدِ اِسْمَاعِيْلَ وَاصْطَفٰى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ، وَاصْطَفٰى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِىْ هَاشِمٍ وَاصْطَفٰى نِىْ مِنْ بَنِىْ هَاشِمٍ -

অর্থাৎ, ‘‘মহান আল্লাহ্ হযরত ইসমাঈল আলাইহিস্ সালামের বংশ হতে ‘কেনানাহ্’কে এবং বনু কেনানাহ্ থেকে কোরাইশকে, কোরাইশ থেকে হাশেমকে আর বনু হাশেম থেকে আমাকে বেছে নিয়েছেন।’’ [মিশকাত]

প্রতীয়মান হল, হাদীসে পাকে উদ্ধৃত বংশগুলো (বনু ইসমাঈল, বনু কেনানাহ্, বনু কোরাইশ এবং বনু হাশেম) দুনিয়ার সকল বংশ থেকে উত্তম ও মর্যাদাবান। কারণ, এঁরা শ্রেষ্ঠতম রসূলেরই পূর্বপুরুষ।

২.

اَنَا تَارِكٌ فِيْكُمُ الثَّقَلَيْنِ اَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللّٰهِ فِيْهِ الْهُدٰى وَالنُّوْرُ فَخُذُوْا بِكِتَابِ اللّٰهِ

وَاسْتَمْسِكُوْا بِهٖ...وَاهْلُ بَيْتِىْ اُذَكِّرُكُمُ اللّٰهَ فِىْ اَهْلِ بَيْتِىْ اُذَكِّرُكُمُ اللّٰهَ فِىْ اَهْلِ بَيْتِىْ -

অর্থাৎ, ‘‘আমি তোমাদের মাঝে অতি উত্তম ও গুরুত্বপূর্ণ দু’টো বস্তু রেখে যাচ্ছি, এর একটি হচ্ছে আল্লাহর কিতাব, যাতে রয়েছে সঠিক পথনির্দেশনা ও আলোকবর্তিকা। তোমরা একে মেনে চল এবং মজবুতভাবে ধারণ কর। আর দ্বিতীয় বস্তুটি হচ্ছে আমার আহ্‌লে বায়ত্। (প্রিয়তম রসূল বার বার করে বললেন) আমার আহ্‌লে বায়তের ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।’’

এ হাদীসে বলা হয়েছে, আহ্‌লে বায়তে রসূলের শান ও মর্যাদা পবিত্র কোরআনে আজীমের মতই। যেহেতু কোরআনের হেফাযত আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁদের দ্বারাই করেছেন। তাই একজন মুমিনকে যেমনিভাবে কোরআনকে বিশ্বাস করতে হয় তেমনি আহ্‌লে বায়তে রসূলকেও মেনে চলতে হয়। অন্যথায় মাঝপথেই ভরাডুবি এবং সেটাই বাস্তব সত্য। হ্যাঁ, এ বাস্তব সত্যটাই রসূলে মাক্ববূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীতে ফুটে ওঠেছে।

৩.

اَلَا اِنَّ مِثْلَ اَهْلَ بَيْتِىْ فِيْكُمْ مِثْلُ سَفِيْنَةَ نُوْحٍ مَنْ رَكِبَهَا نَجَا وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا هَلَكَ -

অর্থাৎ, ‘‘তোমাদের মাঝে আমার আহ্‌লে বায়ত্ (পবিত্র বংশধরগণ) নূহ আলাইহিস্ সালামের কিস্তির মতই। যারা তাতে আরোহণ করেছিল তারা বাঁচতে পেরেছে আর যারা পৃথক ছিল তারা ধ্বংস হয়েছে।’’

তদ্রূপ যারা ঈমান নিয়ে আহ্‌লে বায়তে রসূলের সৌহার্দ্যপূর্ণ আনুগত্যের কিস্তিতে আরোহন করে ভবসিন্ধু পাড়ি দেবে নাজাত তাদের জন্য অবধারিত। বিরোধীতাকারী কিম্বা শত্রুতা পোষণকারী এজিদের প্রেতাত্মাদের জন্য ধ্বংস ও সর্বনাশ অনিবার্য।

পবিত্র কোরআনে হাকিমকে মানার দাবিদার হয়েও আহ্‌লে বায়তে রসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীরা কেন ধ্বংস হয়, তার কারণ খুঁজতে পরবর্তী হাদীস শরীফটি লক্ষ্য করুন। ইমাম তিরমীযি হযরত যায়দ বিন আরক্বাম রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন-

৪.

اِنِّىْ تَارِكٌ فِيْكُمْ مَا اِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهٖ لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدِىْ اَحَدُهُمَا اَعْظَمُ مِنَ الْاٰخِرِ
كِتَابُ اللّٰهِ حَبْلٌ مَمْدُوْدٌ مِنَ السَّمَآءِ اِلَى الْاَرْضِ وَعِتْرَتِىْ اَهْلُ بَيْتِىْ وَلَمْ يَتَفَرَّقَا
حَتّٰى تَرِدَ عَلَىَّ الْحَوْضُ فَانْظُرُوْا كَيْفَ تُخْلِفُوْنِّىْ فِيْهَا

অর্থাৎ, ‘‘আমি তোমাদের মাঝে এমন গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান বস্তু রেখে যাচ্ছি, যা সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকলে তোমরা আমার জাহেরি হায়াত থেকে বিদায় নেওয়ার পরে কখনও পথভ্রষ্ট হবে না। এদের একটি অন্যটির চেয়ে মহান (মানে গুরুত্ব ও মর্যাদায়

কোনটা কোনটার চেয়ে কম নয়, এর একটি হচ্ছে-)মহান ‘আল্লাহর কিতাব’ যা আসমান ও যমীনে বিস্তৃত রজ্জুর ন্যায় (আল্লাহ্ ও বান্দার মাঝে সেতুবন্ধন; অন্যটি হচ্ছে-) আমার ‘আহ্‌লে বায়ত’ তথা বংশধরগণ । এরা বাহ্যিক দৃষ্টিতে দুটো হলেও বাস্তবে এক। কারণ একটিকে বাদ দিয়ে আরেকটি কল্পনা করা যায়না। যেহেতু এরা কোন অবস্থাতেই পরস্পর তথা একে অপরের থেকে পৃথক হবে না। অতএব সতর্কতার সাথে লক্ষ্য রেখ তোমরা এদের সাথে আমার পক্ষ থেকে কীভাবে আচরণ ও প্রতিনিধিত্ব করছ।’’

আহ্‌লে বায়তে রসূলকে পবিত্র রাখার অঙ্গীকার সমৃদ্ধ মহান আল্লাহর অমীয় বাণী ইতোপূর্বে পড়েছেন। এবার প্রিয়তম রসূলের বরকতময় ঘোষণা শুনুন। মহান রসূল এরশাদ ফরমাচ্ছেন-

৫.

اِنَّ هٰذِهِ الصَّدَقَاتِ اِنَّمَا هِىَ اَوْسَاخُ النَّاسِ وَاِنَّهَا لَاتَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَالِاٰلِ مُحَمَّدٍ

অর্থাৎ, ‘‘সাদক্বাহ্-যাকাত মানুষের (সম্পদের) ময়লা। তাই এ সাদক্বাহ্-যাকাত রসূল ও আলে রসূলের জন্য হালাল নয়।’’

এসব মর্যাদা মহিমান্বিত ‘সৈয়্যদ’দের এজন্যই প্রাপ্য যে, তাঁরা মুহাম্মাদুর্ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লামের পূত-পবিত্র বংশধর। অন্য বংশের লোক যতই মুত্তাক্বী-পরহেয্গার হোক এ মহামর্যাদার অধিকারী নন। প্রতীয়মান হল নবীবংশই সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ।

৬.

اَلنَّاسُ تِبْعٌ لِلْقُرَيْشِ مُسْلِمُهُمْ تَبْعٌ لِمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرُهُمْ تَبْعٌ لِكُفْرِهِمْ

অর্থাৎ, ‘‘সকল মানুষ ‘কোরাইশ’ এর অনুগামী। সাধারণ মুসলমান কোরাইশী মুসলমানের এবং সাধারণ কাফির কোরাইশী কাফিরদের আজ্ঞাবহ।’’

৭.

لَايَزَالُ هٰذَا الْاَمْرُ فِىْ قُرَيْشٍ مَابَقِىَ مِنْهُمْ اِثْنَانِ

অর্থাৎ, ‘‘খেলাফত কোরাইশদের মাঝেই থাকবে যতক্ষণ তাদের দু’জন ব্যক্তিও বিদ্যমান থাকে।’’

প্রকৃত অর্থে এ মর্যাদা রসূলে পাকের সম্পর্কের কারণেই। আশিক্ব-ই রসূলগণের কাছে নবীজীর ভালবাসার চেয়ে প্রিয় আর কিছুই নেই। হ্যাঁ, প্রেম-মুহাব্বতের সে অকৃত্রিম প্রত্যাশীদের নবীজী এরশাদ করেছেন-

৮.

اَحِبُّوْنِىْ لِحُبِّ اللّٰهِ وَاَحِبُّوْا اَهْلَ بَيْتِىْ لِحُبِّىْ

অর্থাৎ, ‘‘আল্লাহর ভালবাসা পেতে হলে আমায় ভালবাস, আর আমাকে প্রেমের ডোরে বাঁধতে চাইলে আমার আহ্‌লে বায়ত্‌কে ভালবাস।’’

কারণ, ক্বেয়ামতের ভয়াল মুহূর্তে কোরআনে হাকীমের ঘোষণানুযায়ী যখন সকল বন্ধন অকার্যকর প্রমাণিত হবে ঠিক সে মুহূর্তের ব্যাপারে নবীকুল সম্রাট ঘোষণা ফরমান,

৯.

كُلُّ نَسَبٍ وَسَبَبٍ مُتَقَطِّعٌ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِلَّا نَسَبِىْ وَسَبَبِىْ

"ক্বেয়ামত দিবসে সকল বন্ধন ছিন্ন হলেও আমি রসূলের রক্তের ও বৈবাহিক বন্ধন ছিন্ন হবে না (سَبَبِىْ অর্থ- ঈমান ও গোলামীর বন্ধনও হতে পারে)।

অর্থাৎ রসূলের সাথে আদর্শিক সম্পর্ক কেটে যাবার পারিপার্শ্বিক সকল ব্যবস্থার মাঝেও নিরবচ্ছিন্নভাবে নবীজীর সাথে গোলামীর রজ্জু অটুট রেখে যেতে পারলে পরকালের কঠিন মুহূর্তেও কাজে আসবে। পাপী মানবগোষ্ঠীর নাজাতের কাণ্ডারী যেখানে রসূল-এ আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেক্ষেত্রে স্বয়ং আপনজনের জন্য তাঁর ভূমিকা সহজেই অনুমেয়। মোদ্দাকথা, রসূলের সাথে বংশগত সম্পর্কই সা-দাতে কেরামকে ইহ-পরকালে সম্মান ও মর্যাদায় সর্বোচ্চ সীমানায় আসীন করেছে।

মাহে সফর ও আখেরী চাহার শম্বাহ

'সফর' আরবি চান্দ্রবর্ষের দ্বিতীয় মাস, যা পবিত্র মুহাররম ও রবিউল আউয়াল শরীফের মধ্যবর্তী মাস। বিভিন্ন দিক দিয়ে এ মাসের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। ঐতিহাসিক ঘটনাবলী এবং বহু ওলীর ইন্তিকাল ইত্যাদির কারণে এ মাসও বিশেষ তাৎপর্যবহ। অবশ্য, এ মাসে বহু বালা-মুসিবত নাযিল হবার কথা মুসলিম সমাজেও শোনা যায়; অথচ সফর মাসে বালা- মুসিবত নাযিল হবার কথা ইসলামী শরীয়ত প্রত্যাখ্যান করেছে; কারণ শরীয়তে এ কথার কোন ভিত্তি নেই। অবশ্য অন্যান্য মাসের ন্যায় এ মাসেও যদি কোন বালা-মুসিবত আসে তজ্জন্য মহান রবের দরবারে দো'আ-প্রার্থনা করার বিধান রয়েছে। নির্ধারিত নিয়মে নফল নামায ও নফল রোযা ইত্যাদির মাধ্যমে এ মাস অতিবাহিত করলে আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত ও নিরাপত্তা লাভ করা যায়। এ মাসের শেষ বুধবার (আখেরী চাহার শম্বাহ্) একটি বিশেষ নিয়মে গোসল করার ও দো'আসমূহ লিখে সেগুলো ভিজিয়ে পানি পান করার আমাদের দেশে প্রচলন রয়েছে; এর ঐতিহাসিক বা ধর্মীয় ভিত্তি বা প্রমাণ নিয়ে মতবিরোধ থাকলেও এ গোসল ও পানি পান করার উপকারিতা অনস্বীকার্য। এ বিষয়েও সংক্ষেপে সপ্রমাণ আলোচনা করা হলো-

'সফর' (صفر) শব্দের বিশ্লেষণ

হযরত আবদুল হক্ব মুহাদ্দিস-ই দেহলভী তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব 'মা- সাবাতা বিস্ সুন্নাহ্'য় লিখেছেন, হাদীস শরীফেও এ মাসের নাম 'সফর' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ শব্দটির অর্থ ও নামকরণের তাৎপর্য পর্যালোচনা করতে গিয়ে তিনি নিম্নলিখিত কতিপয় উদ্ধৃতিরও অবতারণা করেছেন-

এক. ইবনে কাসীর তাঁর কিতাব 'নিহায়াহ্'য় লিখেছেন, আরববাসীদের মতে 'সফর' মানে পেটের ভিতরকার স্বর্পতুল্য কীট, যেগুলো মানুষের ক্ষুধা লাগলে

দংশন করে ও উৎপাত করে। তাদের মতে সংক্রামক ব্যাধিকেও 'সফর' বলা হয়। কিন্তু ইসলাম এ অর্থকে প্রত্যাখ্যান করে অর্থাৎ ইসলামের দৃষ্টিতে এ অর্থ প্রযোজ্য নয়।

দুই. আল্লামা কিরমানী বোখারী শরীফের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, صَـفَـر (সফর) ص (সোয়া-দ) ও ف (ফা) উভয় বর্ণে যবর সহকারে হলে তার অর্থ হয় পেটের ভিতরের স্বর্পরূপী কীট। সাধারণ মানুষের ধারণা হচ্ছে পেটের ভিতরে এমন কীট জন্মানো একটি ব্যাধি; আর তাও এমন ব্যাধি, যা খোস-পাঁচড়া অপেক্ষাও ভয়ানক এবং সংক্রামক।

তিন. আল্লামা তীবী মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, সাধারণের ধারণা হচ্ছে صَـفَـر (সফর) ওই সাপকে বলে, যা মানুষের ক্ষুধা লাগলে তার পেটের ভিতর দংশন করতে থাকে। আর ক্ষুধার্ত অবস্থায় যে কষ্ট অনুভূত হয়, তাও ওই সাপের দংশনের কারণেই হয়। উল্লেখ্য, ইসলামের দৃষ্টিতে এ অর্থ 'সফর' মাসের সাথে মোটেই সম্পর্কযুক্ত নয় বলে একটু আগে বলা হয়েছে।

চার. কারো কারো ধারণা যে, 'সফর' আরবি চান্দ্র মাসগুলোর মধ্যে ওই মাস, যা পবিত্র মুহাররম ও রবিউল আউয়াল শরীফের মধ্যবর্তীতে আসে। তবে, এ মাসে অনেক বালা- মুসিবত নাযিল হয় বলে তাদের ধারণা। বাস্তবিক পক্ষে, ইসলামী শরীয়ত এ মাসে বালা-মুসিবত নাযিল হবার বিষয়টি বাতিল করে দেয়।

পাঁচ. 'হিদায়াহ্' নামক কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে- কারো কারো মতে 'সফর' শব্দের অর্থ 'নাসী' অর্থাৎ মুহাররম মাসের দিনগুলোর সংখ্যা বর্ধিত করে 'সফর' মাসকেও ওই (মুহাররম) মাসের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া। আর সফর মাসকে মুহাররম সাব্যস্ত করে সেটাকেও ওই একটি মাত্র সম্মানিত মাসে গণ্য করা।

ছয়. ইমাম নাওয়াভী মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থে লিখেছেন- 'সফর' (صفر) মানে পেটের ওইসব কীট, যেগুলো আকারে কদুর দানা ইত্যাদির মতো; তবে ক্ষুধার্ত অবস্থায় পেটের ভিতর লাফালাফি করে। কখনো কখনো এসব কীট মৃত্যুরও কারণ হয়ে যায়।

সাত. 'নিহায়াহ্' নামক কিতাবে এটাও লিপিবদ্ধ রয়েছে, আল্লাহ্র পথে বের হবার কারণে মুসাফির কখনো কখনো হলদে রঙের হয়ে যায়। এমন হয়ে যাওয়া লাল রঙের উট অর্জন করা অপেক্ষাও উত্তম। আর 'সফর'ও ওই কীটকে বলা হয়, যেগুলো কলিজা ও পাঁজরের হাঁড়গুলোর মাথায় সৃষ্টি হয়; তখন ওই মানুষের রঙ একেবারে হলদে রঙের হয়ে যায়। এটা একটা মারাত্মক ব্যাধিও বটে। এ ব্যাধির কারণে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হয়ে যায়। চিকিৎসা বিজ্ঞানে এটাকে 'পাণ্ডুরোগ' বলে।

আট. ক্বাযী আয়ায রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি তাঁর কিতাব 'মাশারিক্বুল আন্ওয়ার'-এ লিখেছেন, 'সফর' মানে ওই প্রসিদ্ধ মাস, যাকে জাহেলী যুগের

লোকেরা এতই দীর্ঘায়িত করতো যে, মুহাররম মাসকেও সেটার অন্তর্ভুক্ত করে নিতো। আর মুহার্‌রমের মতো সেটাকেও সম্মান করতো।

নয়. ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি লিখেছেন, কারো কারো মতে, 'সফর' (صفر) মানে পেটের ওই কীট, যেগুলো আকার সাপের মতো, ক্ষুধার সময় মানুষের পেটের ভিতর কামড়াতে থাকে। তারা এ ক্ষেত্রে সব মিলিয়ে সীমাতিক্রম করে বসে। এ সীমাতিক্রমকে ইসলাম বাতিল বলে সাব্যস্ত করেছে।

দশ. ইমাম আবূ দাঊদ তাঁর কিতাব 'জামে'উল উসূল'-এ বাক্বিয়্যার ভাষ্য উদ্ধৃত করেছেন, "আমি মুহাম্মদ ইবনে রাশেদকে 'হামাহ্' (هامه) শব্দের অর্থ ও মাহাত্ম্য জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, অন্ধকার যুগে লোকেরা বলতো, মৃতকে ক্বব্‌রে দাফন করার পর তা থেকে 'হামাহ্' বের হয়। আর এ অন্ধকার যুগের লোকেরা 'সফর' মাসকে 'বরকতশূণ্য' (منحوس) বলে বিশ্বাস করতো, আর সেটাকে 'অমঙ্গলময়' বলে গণ্য করতো। অতঃপর রসূলে আকরম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আন্‌লেন। তিনি এ মাস সম্পর্কে মানুষের ভুলধারণা দূরীভূত করলেন। তিনি এরশাদ করলেন, "তোমরা সফর মাসকে অমঙ্গলের মাস বলে গণ্য করো না।" যদিও আমি এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলাম, 'সফর' মানে পেটের ওই ব্যাথা, যা কারো কারো মতে সংক্রামক ব্যাধি।

এগার. ইমাম মালিকের বক্তব্য হচ্ছে- অন্ধকার যুগের লোকেরা মাহে সফরকে এক বছর হালাল এবং এক বছর হারাম সাব্যস্ত করতো। এটার মূলোৎপাটন করে হুযূর রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ...لَاصَفَرَ অর্থাৎ সফরকে অমঙ্গলের মাস বলে সাব্যস্ত করো না। তাছাড়া আরবের মূর্খ লোকেরাই মনে করতো যে, 'সফর' মাসের নামকরণ 'সফর' (صفر) শব্দের একটি আভিধানিক অর্থের কারণেই; অর্থাৎ সফর পেটের ভিতরকার ওই স্বর্পরূপী কীটের নাম যা পেটে ক্ষুধা অনুভূত হলে দংশন করে এবং সীমা ছাড়িয়ে যায়। প্রকৃত পক্ষে ইসলাম এসে তাদের ওই ধারনাকে ভুল বলে সাব্যস্ত করেছে।

হযরত শায়খ মুহাক্বক্বিক্ব আবদুল হক্ব মুহাদ্দিসে দেহ্‌লভী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি অতঃপর বলেন, উপরিউক্ত বর্ণনা থেকে 'সফর' শব্দের আভিধানিক ও এ শব্দটি সম্পর্কে অন্ধকার যুগের মানুষের ধারণা এবং পরিশেষে এ সম্পর্কে 'ইসলাম'র দৃষ্টিভঙ্গী সুস্পষ্ট হয়েছে। এ কথাও স্পষ্ট হয়েছে, صَفَرَ (সফার)-এর আভিধানিক অর্থ পেটের ভিতরের কীট ও পেটের ব্যাথা ইত্যাদি এবং صِفَر (সিফার)-এর আভিধানিক অর্থ হলদে রঙ ও পাণ্ডুরোগ আর صَفِرٌ (সাফির) মানে 'খালি' ও 'পাকস্থলী খালী হওয়া' ইত্যাদি হলেও এর ইসলাম সমর্থিত পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে চান্দ্রবর্ষের দ্বিতীয় মাস। এ কথাও স্পষ্ট হল যে, 'সফর' শব্দের ওই

আভিধানিক অর্থ যা-ই হোক না কেন, পারিভাষিক অর্থে 'সফর' মাসের সাথে উপরিউক্ত অর্থগুলো এমনকি অন্ধকারযুগের ওই সব ভ্রান্ত ধারণার কোন সম্পর্ক নেই। এটাও বছরের অন্য মাসগুলোর মত একটি মাস। (সংক্ষেপিত) সুতরাং এ মাসেও যেমন আল্লাহ্‌র রহমত লাভ করা যায়, তেমনি এ মাসেও মানুষের উপর রোগ-শোক, বিপদ-আপদ নেমে আসতে পারে। তাই আল্লাহ্‌র রহমত ও নিরাপত্তা লাভের জন্য আল্লাহ্‌র ইবাদত-বন্দেগী ও মুনাজাত- প্রার্থনা ইত্যাদি করা চাই।

এ নিবন্ধের শেষ প্রান্তে কিছু বরকতময় আমলের উল্লেখ করার প্রয়াস পাবো। ইতোপূর্বে আরেকটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা দরকার। তা হচ্ছে- আখেরী চাহার শম্বাহ্ অর্থাৎ সফর মাসের শেষ বুধবারের গোসল।

আমাদের মধ্যে এ কথা অনেকটা প্রসিদ্ধ হয়ে আসছে যে, রবিউল আউয়াল মাসে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের ওফাত শরীফ হলেও হুযূর 'সফর' মাসে অসুস্থতা বোধ করতে থাকেন। এ ক্ষেত্রেও এ কথা বলতে ও পত্র-পত্রিকায় লিখতে দেখা যায় যে, সফর মাসের শেষের দিকে হুযূর করীম একটু সুস্থতা বোধ করেছিলেন এবং এ মাসের শেষ বুধবারে তিনি গোসল করেছিলেন। এ গোসলই মুসলিম সমাজ উদ্‌যাপন করে থাকে।

উল্লেখ্য, এ আখেরী বুধবারের বিশেষ গোসলের তাৎপর্য ও ফযীলত তো অনস্বীকার্য, কারণ তা এক বরকতময় পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হয়। অবশ্য, এর ঐতিহাসিক পটভূমি সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করার অবকাশ থেকে যায়।

'সিয়র' ও ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সফর মাসের শেষভাগে হুযূরের সুস্থতাবোধ ও শেষ বুধবার গোসল করার পক্ষে সুস্পষ্ট ও নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। বরং প্রসিদ্ধ সিয়র গ্রন্থ 'আসাহ্‌হুস্ সিয়র' ইত্যাদি যে তথ্য পাওয়া যায়, তা নিম্নরূপ:

"আল্লামা ক্বাস্তলানী হাফেয ইবনে রজব হাম্বলী থেকে বর্ণনা করেছেন- হুযূর সফর মাসের শেষের দিক থেকে অসুস্থতা বোধ করতে থাকেন। আর এটাই প্রসিদ্ধ কথা যে, তিনি তের দিন অসুস্থতা বোধ করতে থাকেন। এটাই বেশির ভাগ ইতিহাসবিদের অভিমত।"

আল্লামা খাত্তাবী থেকে বর্ণিত, সোমবার থেকে হুযূরের অসুস্থতা বোধ আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু হাকিম আবূ আহমাদ, যিনি হাকিম আবূ আবদুল্লাহ্‌র ওস্তাদ, তিনি বলেন- বুধবার থেকে হুযূর অসুস্থতা বোধ করতে থাকেন। কেউ কেউ শনিবারের কথা উল্লেখ করেছেন। অবশ্য কতদিন এ অসুস্থতা বোধ করার পর তিনি হৃদয় বিদারক ওফাত শরীফ বরণ করেছেন, সে সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে। অধিকাংশের মতে তাঁর অসুস্থতা তের দিন স্থায়ী হয়। এটাই প্রসিদ্ধ অভিমত (যা একটু আগে বলা হয়েছে)। অবশ্য আল্লামা ক্বাস্তলানী 'রাওযা' (গ্রন্থ) থেকে আরো দু'টি অভিমত উদ্ধৃত করেছেন- বারদিন ও চৌদ্দ দিন। তদুপরি,

সুলায়মান তায়মী জোর দিয়ে বলেছেন যে, হুযূরের অসুস্থতা দশদিন স্থায়ী ছিল। ইমাম বায়হাক্বী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি সহীহ সনদ সহকারে একথা উল্লেখ করেছেন।'' -আসাহ্হুস্ সিয়ার : ৫১১ পৃষ্ঠা

ইমামে আহলে সুন্নাত আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হিকে 'আখেরী চাহার শম্বাহ্' সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনিও ওই ঐতিহাসিক সত্য কথাটাই বলেছেন। তাঁকে এভাবে ইস্তফ্তা (ইসলামের বিধান জিজ্ঞাসা করা হলো:

''ওলামা-ই দ্বীনের এ প্রসঙ্গে অভিমত কি যে, সফরের শেষ বুধবার সম্পর্কে সাধারণ লোকদের মধ্যে প্রসিদ্ধি আছে যে, ওই দিন হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম অসুস্থতা থেকে আরোগ্য লাভ করেছিলেন। এতদ্‌ভিত্তিতে তারা খাদ্য ও মিষ্টি বিতরণ করে, মরুভূমি বা জঙ্গলে ভ্রমণ করতে যায় ইত্যাদি। এভাবে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন প্রথা প্রচলিত রয়েছে। কোথাও কোথাও ওইদিনকে মঙ্গলশূণ্য মনে করে ঘরের পূরোনো জিনিসপত্র ভেঙ্গে ফেলে দেয়া হয়। অসুস্থ কেউ থাকলে, ওই দিন হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সুস্থতা লাভ করেছিলেন বলে বিশ্বাসের ভিত্তিতে তাবীজ ইত্যাদি ওই রোগীকে ব্যবহার করায়। এসব কাজ তারা হুযূর করীম ওই দিন সুস্থতা বোধ করেছিলেন বলে বিশ্বাসের ভিত্তিতেই করে থাকে। সুতরাং এর ভিত্তি (মৌলিক কোন প্রমাণ) শরীয়তে আছে কি না? আর যারা এমনসব কাজ করে তারা এর পক্ষে কোন প্রামাণ্য দলীল না থাকাবস্থায় গুনাহ্গার কিংবা সংশোধনযোগ্য হবে কিনা? ''

আ'লা হযরত এরই জবাবে বলেছিলেন- ''আখেরী চাহার শম্বাহ্'র পক্ষে কোন প্রমাণ নেই, ওই দিন হুযূর সুস্থতা বোধ করেছিলেন মর্মেও কোন প্রমাণ নেই; বরং পবিত্রতম অসুস্থতা (যাতে হুযূরের ওফাত শরীফ হয়েছিলো)-এর সূচনা হয়েছিল বলে ইতিহাস ও সিয়ারবেত্তারা বলে থাকেন। আর একটি মারফূ' (হুযূরের সূত্রে বর্ণিত) হাদীস শরীফে এরশাদ করা হয়েছে- اٰخِرُ اَرْبِعَاءٍ مِّنَ الصَّفَرِ يَوْمُ نَحِسٌ مُّسْتَمِرٌّ (অর্থাৎ এ মাসের শেষ বুধবার হচ্ছে একটি অব্যাহত অকল্যাণের দিন।) বস্তুতঃ ওই দিন হযরত আইয়্যূব আলায়হিস্ সালাম-এর পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছিল। সুতরাং ওইদিনকে কল্যাণশূন্য মনে করে থালাবাটি ভেঙ্গে ফেলা গুনাহ্ ও সম্পদ বিনষ্ট করার শামিল। মোটকথা, প্রশ্নে উল্লিখিত প্রথাগুলো প্রমাণশূন্য ও অর্থহীন।''

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আ'লা হযরত রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হিও আখেরী চাহার শম্বাহ্ সম্পর্কে জন সাধারণের মধ্যে ভুল ধারাণা ও কুপ্রথাদির সংশোধন করেছেন; তাও প্রামাণ্য ঐতিহাসিক ও সিয়রভিত্তিক দলীলাদির আলোকে। তাঁর বক্তব্যে প্রচলিত নিয়মে বরকতময় গোসল সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিরূপ মন্তব্য পাওয়া যায় না।

এ মাসের বরকতময় আমল

সফর মাসের প্রথম রাতে এশার নামাযের পর প্রত্যেক মুসলমানের উচিত চার রাক্'আত (নফল) নামায পড়া। তাও এভাবে- প্রথম রাক্'আতে সূরা ফাতিহার পর সূরা কাফিরূন পনর বার, দ্বিতীয় রাক্'আতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস পনর বার, তৃতীয় রাক্'আতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ফালাক্ব পনর বার এবং চতুর্থ রাক্'আতে সূরা ফাতিহার পর সূরা নাস পনর বার পড়বেন। সালাম ফেরানোর পর কয়েকবার ''ইয়্যা-কা না'বুদু ওয়া ইয়্যা-কা নাস্তা'ঈন'' পড়বেন। অতঃপর সত্তর বার দুরূদ শরীফ পড়বেন। তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে মহা সাওয়াব দান করবেন, তাকে প্রত্যেক বালা-মুসীবত থেকে নিরাপদে রাখবেন।-রাহাতুল ক্বুলূব

রোযা: অন্য মাসগুলোর ন্যায় এ মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রোযা রাখা সুন্নাত।

আখেরী চাহার শম্বাহ্ (শেষ বুধবার)

নামায

সফরের শেষ বুধবার ফজরের নামাযের পর গোসল করবেন, তারপর চাশ্তের সময় দু'রাক্'আত নফল নামায পড়বেন। প্রত্যেক রাক্'আতে আলহামদু শরীফের পর এগার বার সূরা ইখলাস পড়বেন। সালাম ফেরানোর পর সত্তর বার দুরূদ শরীফ পড়বেন। তারপর নিম্নলিখিত দো'আ পড়বেন:

اَللّٰهُمَّ صَرِّفْ عَنِّىْ سُوْٓءَ هٰذَا الْيَوْمِ وَاعْصِمْنِىْ سُوْٓءَهٗ وَنَجِّنِىْ عَمَّا اَخَافُ فِيْهِ مِنْ نُحُوْسَاتِهٖ وَكُرُبَاتِهٖ بِفَضْلِكَ يَا دَافِعَ الشُّرُوْرِ وَ مَالِكَ النُّشُوْرِ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهِ الْاَمْجَادِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা সার্‌রিফ্ 'আন্নী- সূ----আ হা-যাল ইয়াওমি ওয়া'সিম্‌নী- সূ----আহূ- ওয়া নাজ্জিনী- 'আম্মা- আখা-ফু ফী-হি মিন্ নুহূ-সা-তিহী- ওয়া কুরুবা-তিহী- বিফাদ্বলিকা ইয়া- দা-ফি'আশ্ শুরু-রি ওয়া মা-লিকান্ নুশূ-রি ইয়া- আরহামার্ রা-হিমী-না ওয়া সল্লাল্লা-হু তা'আ-লা- 'আলা- সাইয়্যিদিনা- মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আ-লিহিল্ আমজা-দি ওয়া বা-রাকা ওয়া সাল্লাম।

-রাহাতুল ক্বুলূব ও জাওয়াহিরে গায়বী

তাছাড়া, আরো দু'রাক্'আত নফল নামায রয়েছে- প্রতি রাক্'আতে সূরা ফাতিহার পর ৩ বার সূরা ইখলাস পড়বেন। সালাম ফেরানোর সূরা ইন্‌শিরাহ্, সূরা ত্বীন, সূরা নস্‌র ও সূরা ইখলাস পড়বেন- প্রত্যেকটি ৮০বার করে। এর বরকতে আল্লাহ্ তা'আলা তার হৃদয়কে ধনী করে দেবেন।-জাওয়াহিরে গায়বী

চাহার শম্বাহ্‌র গোসল

সফর মাসের 'আখেরী চাহার শম্বাহ্' বা শেষ বুধবার বিশেষত আমাদের দেশের

মুসলমানগণ বিশেষ দো'আ চুবানো পানি দ্বারা গোসল করেন এবং 'আ-য়া-তে শিফা-' লিখে সেগুলো পানীয় জলে চুবিয়ে পান করে থাকেন। এ আমলটি আমাদের দেশে যুগ যুগ ধরে চলে আসছে।

এ প্রসঙ্গে বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এ আমলটির উৎস হিসেবে ওই দিন আমাদের আক্বা ও মাওলা হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম -এর সুস্থতা অনুভব করা ও এরপর হুযূরের গোসল করার যেই তথ্য উল্লেখ করা হয় সে সম্পর্কে মতবিরোধ থাকলেও বরকতময় দো'আ ও আল্লাহ্র কালামের আয়াতসমূহ চুবানো পানি দ্বারা গোসল করা ও পান করার ফযীলত ও উপকারিতা সম্পর্কে কারো দ্বিমত নেই। বরং এর পক্ষে প্রসিদ্ধ কিতাব 'জাওয়াহিরে কান্য্-ই পাঞ্জম : ৬১৭ পৃষ্টায় উল্লেখ করা হয়েছে।

بدانکہ درآخرین چہارشنبہ ماہ صفرایں ہفت سلام بنویسد و بآب بشوید و بخورد: سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَبِّ رَّحِيْم. سَلَامٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعٰلَمِيْن. سَلَامٌ عَلٰى اِبْرَاهِيْم. سَلَامٌ عَلٰى مُوْسٰى وَهَارُوْن. سَلَامٌ عَلٰى اِلْيَاسِيْن. سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خَالِدِيْن وَسَلَامٌ هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

অর্থাৎ জেনে রেখো, সফর মাসের শেষ বুধবার নিম্নলিখিত সাত সালাম লিখবে ও তা পানিতে চুবিয়ে নেবে। তারপর পান করবে: সালা-মুন্ ক্বাওলাম্ মির রাব্বির রাহী-ম, সালা-মুন 'আলা- নূ-হিন ফিল 'আ-লামী-ন, সালা-মুন্ 'আলা-ইবরা-হী-ম, সালা-মুন 'আলা- মূ-সা- ওয়া হা-রূ-ন, সালা-মুন 'আলা-ইল্ইয়া-সী-ন, সালা-মুন 'আলায়কুম্ ত্বিবতুম ফাদ্খুলূ-হা- খা-লিদী-ন্, সালা-মুন হিয়া হাত্তা- মাত্বলা'ইল ফাজ্র্।

উক্ত কিতাবের ৫ম খণ্ডের ৬১৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে-

درآخرین چہارشنبہ ماہ صفر قبل طلوع آفتاب غسل کند و بعد غسل و بعد طلوع دو رکعت گذارد در اوّل رکعت قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ الخ دو رکعت ثانی قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ تا آخر سورہ بخواند و بعد درود بخواند و بعد از سلام و درود خواندہ بعد ازاں ایں دعا بخواند اَللّٰهُمَّ اصْرِفْ عَنِّىْ الخ

অর্থাৎ সফর মাসের শেষ বুধবার সূর্যোদয়ের পূর্বে গোসল করবেন। গোসল ও সূর্যোদয়ের পর দু'রাক্'আত নফল নামায এভাবে পড়বেন প্রথম রাক্'আতে (সূরা ফাতিহার পর) পড়বে ক্বুলিল্লাহুম্মা মালিকাল মুল্কি...আয়াতের শেষ পর্যন্ত। আর দ্বিতীয় রাক্'আতে সূরা ফাতিহার পর পড়বে ক্বুলিদ্'উল্লা-হা... সূরার শেষ পর্যন্ত। তারপর 'আল্লাহুম্মা সার্রিফ্ 'আন্নী-...' দো'আটি পড়বেন। -[সূত্র: মাজমূ'আহ্-ই ফাতাওয়া-ই আযীযিয়্যাহ্, কৃত গাযী শেরে বাংলা আল্লামা আযীযুল হক্ব আলক্বাদেরী

তাছাড়া মাওলানা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভীর মাজমূ'আহ্-ই ফাতাওয়া, তাযকিরাতুল ওয়া'ইযীন ও নাফি'উল মুসলিমীন ইত্যাদি কিতাবের ভাষ্যানুসারে এ দিনটিতে কোন অমঙ্গল থাকলে তা থেকেও উক্ত গোসল ও পানি পান করার বরকতে রক্ষা পাবার দৃঢ় আশা করা যায়।

পরিশেষে, মাহে সফরও চান্দ্র বছরের অন্যান্য মাসগুলোর ন্যায় একটি স্বাভাবিক মাস। এ মাসের আভিধানিক অর্থ যা-ই হোক না কেন, এর পারিভাষিক অর্থই বিবেচ্য। আভিধানিক অর্থ ও অন্ধকার যুগের বিরূপ ধারণাগুলো, বরকতশূন্যতা ও অসংখ্য বালা মুসিবত নাযিল হবার নানা ভয়-ভীতির কোন ভিত্তি ইসলামের দৃষ্টিতে নেই। এ মাসে বিয়ে-শাদী ভাল নয় এ রকম ধারনা রাখাও ভুল। শরীয়তের অকাট্য প্রমাণাদিই অনুসরণযোগ্য, কোন অমূলক প্রথা ও ভিত্তিহীন কথার অনুসরণ করা মোটেই উচিত নয়।

গোসলের দো'আ

সফর মাসের শেষ বুধবার নিম্নলিখিত দো'আ ও নক্বশা পরিস্কার কলা পাতায় লিখে পরিস্কার পাত্রের পানিতে ধুয়ে ওই পানি, গোসল করার পর এক কোমর পানিতে নেমে মাথার উপর ঢেলে দেবেন। দো'আ:

اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا ○ وَ لَئِنْ زَالَتَا اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهٖ ط اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ○

নক্বশা

۴	۹	۲
۳	۵	۷
۸	۱	۶

পান করার দো'আ

নিম্নলিখিত আয়াতগুলো বিস্মিল্লাহ্ সহকারে লিখে ধুয়ে পান করবেন:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سَلَامٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعٰلَمِيْنَ ○ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ○ سَلَامٌ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ ○ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ○ سَلَامٌ عَلٰى مُوْسٰى وَهَارُوْنَ ○ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ○ سَلَامٌ عَلٰى اِلْيَاسِيْنَ ○ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ○ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ○ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خَالِدِيْنَ ○ سَلَامٌ هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ○

মাহে রবিউল আউয়াল শরীফ

ঈদে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

আক্ষরিক অর্থে 'ঈদে মীলাদুন্নবী' মানে নবীর পবিত্র জন্ম উপলক্ষে খুশি হওয়া, আনন্দ উদ্‌যাপন করা। আর পারিভাষিক অর্থে নবী করীমের শুভ আগমন (জন্ম) মুবারক উপলক্ষে পবিত্র রবিউল আউয়াল মাসে অথবা অন্য যে কোন মাসে বিশেষ ইবাদত-বন্দেগী, যিকর-আযকার, দান-সদক্বা, সভা, মিছিল সেমিনার ইত্যাদি শরীয়ত সম্মত উপায়ে আল্লাহর দরবারে নি'মাতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার নাম 'ঈদে মীলাদুন্নবী' সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম। আনুষ্ঠানিকতার আঙ্গিক ও কাঠামো ভিন্ন হলেও যুগে যুগে নবী করীমের শুভাগমনের আলোচনার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। এমনকি পবিত্র ক্বোরআনের অনেক আয়াতেও নবী পাকের শুভাগমনের সুসংবাদ এসেছে, যেমন-

قَدْ جَآءَ كُمْ مِنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّ كِتَابٌ مُّبِيْنٌ

তরজমা ঃ আল্লাহর পক্ষ হতে তোমাদের কাছে এসেছে এক মহান নূর এবং স্পষ্ট কিতাব। [সূরা মা-ই-দাহ, আয়াত- ১৫]

لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُفٌ رَّحِيْمٌ

তরজমা ঃ নিশ্চয় তোমাদের কাছে এসেছেন তোমাদের মধ্য হতে এমন রসূল, যিনি তোমাদের বিপদগ্রস্ত হওয়ায় ব্যথিত, আর তোমাদের মঙ্গল কামনাকারী এবং ঈমানদারদের প্রতি দয়ার্দ্র, দয়ালু। [সূরা তাওবা, আয়াত- ১২৮]

قَدْ جَآءَ كُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَبِّكُمْ

তরজমা ঃ তোমাদের রবের পক্ষ হতে তোমাদের কাছে এসেছে স্পষ্ট দলিল । [সূরা নিসা, আয়াত- ১৭৫]

এ পৃথিবীতে যত নি'মাত রয়েছে বা এসেছে ও আসবে তন্মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ নি'মাত হচ্ছে রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহর এ রহমত ও অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, আনন্দ ও খুশি উদ্‌যাপন করার নির্দেশ স্বয়ং রাব্বুল আলামীন দিয়েছেন। যেমন ইরশাদ হচ্ছে-

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوْا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ

তরজমা ঃ হে হাবীব! আপনি বলুন, আল্লাহর দয়া এবং রহমতকে উপলক্ষ করে তারা যেন আনন্দ উদ্‌যাপন করে এবং তা হবে তাদের সমস্ত ধন-দৌলত অপেক্ষা শ্রেয়। [সূরা ইউনুস, আয়াত- ৫৮]

উল্লেখ্য, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শুভাগমনের চাইতে উত্তম নি'মাত এবং দয়া বিশ্ববাসীর জন্য আর কী হতে পারে? সুতরাং তাঁর শুভাগমনের দিন তথা মীলাদুন্নবীকে উপলক্ষ করে ঈদ উদ্‌যাপন করা প্রত্যেক মুসলমানের নৈতিক ও দ্বীনী কর্তব্য।

হাদীস শরীফের আলোকে ঈদে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

পবিত্র হাদীসেও ঈদে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম উদ্‌যাপনের বৈধতার প্রমাণ পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি হাদীস শরীফ উপস্থাপন করার প্রয়াস পাচ্ছি-

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ ذَاتَ يَوْمٍ فِى بَيْتِهٖ وَقَائِعَ وِلَادَتِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذْ جَآءَ النَّبِىُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامَ وَقَالَ حَلَّتْ لَكُمْ شَفَاعَتِىْ

অর্থাৎঃ একদিন হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু (কিছু লোক নিয়ে) নিজ গৃহে নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর জন্মকালীন অলৌকিক ঘটনাবলী বর্ণনা করেছিলেন। ইত্যবসরে প্রিয়নবী তাশরীফ আনলেন এবং বললেন, ''তোমাদের জন্য আমার শাফা'আত হালাল (আবশ্যক) হয়ে গেলো।'' অপর হাদীসে রয়েছে-

عَنْ اَبِى الدَّرْدَآءِ قَالَ مَرَرْتُ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى بَيْتِ عَامِرِ نِ الْاَنْصَارِىِّ وَكَانَ يُعَلِّمُ وَقَائِعَ وِلَادَتِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِاَبْنَآئِهٖ وَعَشِيْرَتِهٖ وَيَقُوْلُ هٰذَا الْيَوْمَ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اِنَّ اللّٰهَ فَتَحَ لَكَ اَبْوَابَ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَتُهٗ كُلُّهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ لَكَ وَمَنْ فَعَلَ فِعْلَكَ نَجٰى نَجَاتَكَ ـ

অর্থাৎ: হযরত আবু দারদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদিন নবী করীমের সাথে সাহাবী আবূ 'আমের আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র ঘরে গমন করে দেখতে পেলাম, তিনি তাঁর সন্তানাদি ও আত্মীয়-স্বজনকে একত্রিত করে রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র পবিত্র জন্মকালীন সময়ের ঘটনাবলী বর্ণনা করে তা শিক্ষা দিচ্ছিলেন এবং বলছিলেন আজই সেই পবিত্র মীলাদের দিন। এ মাহফিল দেখে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম খুশি হয়ে তাঁকে সুসংবাদ দিলেন যে, আল্লাহ পাক তোমার জন্য রহমতের অসংখ্য দরজা খুলে দিয়েছেন এবং ফেরেশতাগণও তোমাদের সকলের জন্য মাগফিরাত কামনা করছেন। আর যে ব্যক্তি তোমার এ কাজ করবে, সে তোমার মতো নাজাত পাবে ।

[আততানভীর, আনওয়ার-ই আফতাব-ই সদাক্বত]

আরো মজার ব্যাপার হল, আবূ লাহাব একজন কাফির হওয়ার পরও নবী পাকের পবিত্র জন্মের দিন খুশি হয়ে সে তার সুসংবাদদাত্রী দাসী সুয়াইবাকে আযাদ করে দেওয়ার কারণে পরকালে কঠিন আযাবের ভিতরেও প্রতি সোমবার তার আযাব হালকা করে দেয়া হয়। হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র বর্ণিত হাদীস শরীফ থেকে বুঝা যায় যে, তা নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মীলাদ শরীফ পালনের বরকতেই হয়েছে। উল্লেখ্য যে, আবূ লাহাবের ঘটনা সম্বলিত হাদীসটি আল্লামা ক্বাস্তলানী, আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী, আল্লামা আলী ক্বারী, আল্লামা 'আইনী রহমাতুল্লাহি আলায়হিমুর রাহমাহ্সহ বিশ্ববিখ্যাত প্রায় সব মুহাদ্দিসীনে কেরাম বর্ণনা করেছেন।

সুতরাং এ সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, পবিত্র ক্বোরআন ও হাদীসের আলোকে ঈদে মীলাদুন্নবী পালন করা বৈধ এবং অশেষ ফযীলতমণ্ডিত কাজ।

সাহাবা-ই কেরাম ও বরেণ্য ওলামা-ই কেরামের অভিমত

ক্বোরআন-হাদীসের অসংখ্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত যে, ঈদে মীলাদুন্নবী পালন করা, সাহাবা-ই কেরামের যুগেও ছিলো। অশেষ ফযীলতপূর্ণ মীলাদুন্নবী অনুষ্ঠান তাঁরা কেবল নিজেরাই পালন করেন নি বরং পরবর্তী প্রজন্মকেও উৎসাহিত করেছেন।

এভাবে পরবর্তী তাবে'ঈন, ও তব'ই তাবে'ঈনের যুগগুলোতে ঈদে মীলাদুন্নবী পালিত হয়ে এসেছে। যেমন বিশিষ্ট তাবে'ঈ হযরত হাসান বসরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ঈদে মীলাদুন্নবী প্রসঙ্গে বলেন-

وَدِدْتُّ لَوْ كَانَ مِثْلُ جَبَلِ اُحُدٍ ذَهَبًا فَاَنْفَقْتُهُ عَلٰى مَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থাৎ আমার মন চায়, যদি আমার কাছে উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ থাকত, তাহলে আমি সবগুলো মীলাদুন্নবী পালনে খরচ করতাম।

হযরত জুনায়দ বাগদাদী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন-

مَنْ حَضَرَ مَوْلِدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَظَّمَ قَدْرَهٗ فَقَدْ فَازَ بِالْاِيْمَانِ ـ

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি মিলাদুন্নবী মাহফিলে উপস্থিত হয়েছে এবং তার যথাযথ সম্মান করেছে তার ঈমান সফল হয়েছে।" ইমাম শাফে'ঈ রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, মীলাদুন্নবী উপলক্ষে কেউ যদি মানুষকে একত্রিত করে পৃথকভাবে বসার ব্যবস্থা করে, ইবাদত-বন্দেগীর আয়োজন করে এবং তাদের জন্য আপ্যায়নের ব্যবস্থা করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্বিয়ামতের দিনে সিদ্দীক্বীন, শোহাদা এবং আউলিয়া কেরামের সাথেই ওঠাবেন। তাদের মিলনকেন্দ্র হবে জান্নাতুন না'ঈম'র মধ্যে।

এভাবে প্রত্যেক যুগেই ঈদে মিলাদুন্নবীর প্রচলনের প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন হিজরী ১ম ও ২য় শতাব্দির কথা বর্ণিত হলো। তৃতীয় শতাব্দিতে হযরত সারী-উস্-সাক্বতী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এবং হযরত জুনায়াদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলায়হিমা, চতুর্থ শতাব্দীতে ইমাম গাযালী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, ৫ম শতাব্দীতে গাউসুল আ'যম হযরত শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদের জীলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি, ৬ষ্ঠ শতাব্দিতে ইমাম আবূ শামা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আনহু,৭ম শতাব্দিতে ইমাম ইবনে জাম'আ ইবনে রাব, আল্লামা ইবনে কাসীর এবং আল্লামা শামসুদ্দীন জযরী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হিম, ৮ম শতাব্দীতে আল্লামা ইবনে হাজার আসক্বালানী, ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী, ইমাম ইবনে হাজর হায়তামী মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলায়হিম, দশম শতাব্দিতে আল্লামা আলী ক্বারী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি, একাদশ শতাব্দিতে শায়খ আবদুল হক্ব মুহাদ্দিস দেহ্লভী ও মুজাদ্দিদ-ই আলফে সানী, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আল্লামা ইউসুফ ইবনে ইসমাঈল নাবহানী, আ'লা হযরত ইমাম শাহ আহমদ রেযা ফাযেলে বেরলভী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হিম এবং হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী প্রমুখ আপন আপন যুগের বরেণ্যও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ও স্বীকৃত ইমাম কিংবা প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন, ঈদে মীলাদুন্নবী জাঁকজমক সহকারে পালন করেছেন এবং অনেকে এর ফযীলতের উপর বিভিন্ন গ্রন্থও রচনা করেছেন।

ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম উদ্‌যাপনের আরো কিছু প্রমাণ

জশনে জুলূসে ঈদে মিলাদুন্নবীর আয়োজনও শরীয়ত সম্মত পন্থায় ঈদে মিলাদুন্নবী উদ্‌যাপনের শামিল ।

এক. আল্লাহর সৃষ্টি জগতে আল্লাহর সর্বাপেক্ষা বড় নি'মাত, অনুগ্রহ ও রহমত হলেন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম । সুতরাং তাঁর শুভ জন্মে খুশী উদ্‌যাপন করার নির্দেশ খোদ্ মহান রবই দিয়েছেন । যেমন- সূরা ইয়ূনুসের আয়াত নং ৫৮ এ আয়াতের তাফসীর বা ব্যাখ্যায় তাফসীর-ই দুররে মানসূর, তাফসীর-ই রূহুল মা'আনী, তাফসীর-ই আবুস্ সা'ঊদ, তাফসীর-ই কবীর ও তাফসীর-ই ফাত্হুল ক্বাদীর ইত্যাদিতে একথা বলা হয়েছে । তাছাড়া, সূরা আল-ই ইমরান, আয়াত ১৬৪, সূরা আম্বিয়াঃ আয়াত ১০৭, সূরা তাওবাঃ আয়াত ১২৮, সূরা নিসা, আয়াত ১৭৫, সূরা মা-ইদাহ্ঃ আয়াত ১৫ ও ১১৪, সূরা আল-ই ইমরানঃ আয়াত ১০৩, সূরা ইব্রাহীমঃ আয়াত ৫, সূরা আল-ই ইমরানঃ আয়াত ৮১-৮২, সূরা তাওবাঃ আয়াত ৩৩, সূরা সফঃ আয়াত ৬, সূরা জুমু'আহঃ আয়াত ২ এবং সূরা মরিয়ামঃ আয়াত ৩৩ ইত্যাদিতেও মীলাদ শরীফ

উদ্‌যাপনের অকাট্য প্রমাণ মিলে। [বিস্তারিত দেখুন- 'ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম উদযাপন' নামক কিতাবে। প্রকাশক- 'জাতীয় ঈদে মিলাদুন্নবী উদ্‌যাপন কমিটি।

দুই. বহু সহীহ্ হাদীস শরীফেও মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লা-এর বর্ণনা এসেছে। ইমাম মুসলিম তাঁর কিতাব 'মুসলিম শরীফ'-এ 'মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম' নামে একটি অধ্যায় নির্ণয় করেছেন এবং তাতে রসূল-ই পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর 'মীলাদ' শরীফের বর্ণনা সম্বলিত বিশুদ্ধ হাদীস উল্লেখ করেছেন। এখানেও একটি বিশুদ্ধ হাদীস শরীফ এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করার প্রয়াস পাচ্ছি, যা মিশকাত শরীফ: ৫১৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হয়েছে। খোদ্ হুযূর এরশাদ ফরমায়েছেন-

وَ سَأُخْبِرُكُمْ عَنْ اَوَّلِ اَمْرِىْ دَعْوَةِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَشَارَةِ عِيْسٰى وَرُؤْيَا اُمِّىَ الَّتِىْ
رَأَتْ حِيْنَ وَضَعَتْنِىْ وَقَدْ خَرَجَ بِهَا نُوْرٌ اَضَآءَ لَهَا مِنْهُ قُصُوْرُ الشَّامِ

অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে আমার প্রাথমিক অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছি- আমি হযরত ইব্রাহীমের দো'আ, হযরত ঈসার সুসংবাদ এবং আমার মায়ের ওই চোখ দেখা দৃশ্য, যা তিনি আমার জন্মের সময় দেখেছেন- (তা হচ্ছে) তাঁর শরীর থেকে এমনি এক নূর বের হয়েছে, যার আলোয় তিনি (সুদূর) সিরিয়ার মহলগুলো দেখতে পান।

লক্ষ্য করুন! হুযূর নিজের মীলাদ শরীফ নিজে বর্ণনা করেছেন আর সাহাবা-ই কেরামের জমা'আত তা শুনেছেন।

তিন. এখন সরাসরি এক সাহাবীর আমল দেখুন- হযরত মাখ্‌রামাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু একটি জমায়েতের উদ্দেশ্যে বললেন-

وُلِدْتُّ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفِيْلِ

অর্থাৎ আমি ও রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হস্তি-বর্ষে জন্মগ্রহণ করেছি। [তিরমিযী শরীফ, মীলাদুন্নবী শীর্ষক অধ্যায়]

চার. 'তাফসীর-ই রূহুল বয়ান'-এ মীলাদ শরীফ উদ্‌যাপন করা হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর প্রতি সম্মান জ্ঞাপনেরই নামান্তর- যদি তা'তে শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ না থাকে। ইমাম সুয়ূত্বী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেছেন, "নবী পাকের মীলাদ শরীফের উপর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা মুস্তাহাব।" আল্লামা ইবনে জাওযী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেছেন, "মীলাদ শরীফের প্রভাব এ যে, গোটা বছরই এর বরকতে নিরাপত্তা ও শান্তিতে থাকা যায়। এতে শীঘ্র মনোবাঞ্ছা পূরণ হবার সুসংবাদ রয়েছে।" [তাফসীর-ই রূহুল বয়ানঃ সূরা ফাতহ্]

পাঁচ. আল্লামা ইমাম শিহাব উদ্দীন আহমদ ক্বাস্তলানী আলাইহির রাহমাহ্ 'মাওয়াহিব-ই লাদুন্নিয়াহ্' কিতাবে 'হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-

এর দুগ্ধপান' শীর্ষক অধ্যায়ে বলেন- অর্থাৎ আবূ লাহাবের আযাদকৃত দাসী সুয়াইবাহ্ তাঁকে (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) দুগ্ধপান করিয়েছেন, যাকে আবূ লাহাব তখনই আযাদ করেছিলো যখন তিনি তাকে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বেলাদত শরীফের শুভ সংবাদ শুনিয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে, একদা আবূ লাহাবকে তার মৃত্যুর পর স্বপ্নে দেখা গিয়েছিলো। তখন তাকে বলা হলো, "তোমার কি অবস্থা?" সে বললো, "দোযখেই আছি। তবে প্রতি সোমবার রাতে আমার শাস্তি কিছুটা শিথিল করা হয়; আর আমি আমার এ আঙ্গুল দু'টির মাঝখানে চুষে পানি পানের সুযোগ পাই।" আর তখন সে তার আঙ্গুলের মাথা দিয়ে ইঙ্গিত করলো। আর বললো, "আমার শাস্তির এ শিথিলতাও এ জন্য যে, সুইয়াইবাহ্ যখন আমাকে নবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর বেলাদতের সুসংবাদ দিয়েছিলো, তখন আমি তাকে আযাদ করে দিয়েছিলাম এবং সে হুযূরকে দুগ্ধ পান করিয়েছে।"

এতদ্‌ভিত্তিতে আল্লামা মুহাদ্দিস ইবনে জযরী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, "যখন ওই আবূ লাহাব কাফির, যার তিরস্কারে ক্বোরআন নাযিল হয়েছে, মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এ আনন্দ প্রকাশের কারণে জাহান্নামে পুরস্কৃত হয়েছে, তখন উম্মতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ওই একত্ববাদী মুসলমানের কী অবস্থা, যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বেলাদতে খুশী হয় এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ভালবাসায় তার সাধ্যানুসারে খরচ করে? আমার জীবনের শপথ! নিশ্চয় পরম করুণাময় আল্লাহ্ তাকে আপন ব্যাপক করুণায় নি'মাতপূর্ণ জান্নাতগুলোতে প্রবেশ করাবেন।"

প্রতিটি যুগে মুসলমানগণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বেলাদত শরীফের মাসে মাহফিলের আয়োজন করে আসছেন, তারা উন্নত মানের খাবারের আয়োজন করেন, এর রাতগুলোতে বিভিন্ন ধরনের সাদক্বাহ্-খায়রাত করেন, আনন্দ প্রকাশ করতে থাকেন, পুণ্যময় কাজ বেশী পরিমাণে করেন এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বেলাদত শরীফের আলোচনার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে আসছেন। ফলে, আল্লাহর অসংখ্য বরকত ও ব্যাপক অনুগ্রহ প্রকাশ পায়। এর বিশেষত্বের মধ্যে এটাও পরীক্ষিত যে, নিঃসন্দেহে গোটা বছরই তারা নিরাপদে থাকেন এবং তাঁদের উদ্দেশ্য দ্রুত সফল হয়ে থাকে।

(ইমাম ক্বাস্তলানী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি দো'আ করে বলেন) অতএব, ওই ব্যক্তিকে আল্লাহ দয়া করুন, যে মীলাদুন্নবীর মুবারক মাসের রাতগুলোকে ঈদ হিসেবে উদ্‌যাপন করে- এ লক্ষ্যে যেন কাফির-মুনাফিক্বদের অন্তরে অসহনীয় জ্বালা সৃষ্টি হয়।

[মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়াহ, ১ম খণ্ডঃ পৃ. ৭৮। তাছাড়া, শায়খ আবদুল হক্ব মুহাদ্দিস দেহলভীর 'মা-সাবাতা বিস্ সুন্নাহ'য় এবং 'হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন'ঃ ১৭৪ পৃষ্ঠায়ও এমন বর্ণনা এসেছে।]

ছয়. ইমামে আহলে সুন্নাত আল্লামা গাজী সৈয়দ আযীযুল হক আল-ক্বাদেরী (শেরে বাংলা) আলাইহির রাহমাহ্ তাঁর 'মজমু'আহ্-ই ফাতাওয়া-ই আযীযিয়াহ্' ৪র্থ পৃষ্ঠায়ে লিখেছেন-

لاَ زَالَ اَهْلُ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيْفَيْنِ وَمِصْرَ وَالْيَمَنِ وَالشَّامِ وَسَآئِرِ بِلاَدِ الْعَرَبِ مِنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ يَحْتَفِلُوْنَ بِمَجْلِسِ مَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَفْرَحُوْنَ بِقُدُوْمِ هِلاَلِ رَبِيْعِ الْاَوَّلِ وَيَلْبَسُوْنَ بِالثِّيَابِ الْفَاخِرَةِ وَيَتَزَيَّنُوْنَ بِاَنْوَاعِ الزِّيْنَةِ وَيَتَطَيَّبُوْنَ وَيَكْتَحِلُوْنَ وَيَأْتُوْنَ بِالسُّرُوْرِ فِىْ هٰذِهِ الْاِيَّامِ وَيَبْذُلُوْنَ عَلَى النَّاسِ بِمَا كَانَ عِنْدَهُمْ وَيَهْتَمُّوْنَ اِهْتِمَامًا بَلِيْغًا عَلٰى سِمَاعِ قِرْأَةِ مَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَنَالُوْنَ بِذٰلِكَ أَجْرًا جَزِيْلاً وَفَوْزًا عَظِيْمًا وَمِمَّا جُرِّبَ عَنْ ذٰلِكَ اَنَّهٗ وُجِدَ فِىْ تِلْكَ الْاَيَّامِ كَثْرَةُ الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ مَعَ السَّلاَمَةِ وَالْعَافِيَةِ وَسَعَةُ الرِّزْقِ وَاِزْدِيَادُ الْمَالِ وَالْاَوْلاَدِ وَدَوَامُ الْاَمْنِ وَالْاَمَانِ فِى الْبِلاَدِ وَالْاَمْصَارِ وَالسُّكُوْنُ وَالْقَرَارُ فِى الْبُيُوْتِ وَالدَّارِ بِبَرَكَةِ مَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থাৎ হেরমাঈন শরীফাঈন, মিশর, ইয়ামন, সিরিয়া, সমস্ত আরবীয় এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দেশগুলো মীলাদ মাহফিলের আয়োজন করে আসছে। আর রবিউল আউয়ালের চাঁদ দেখা গেলে তাঁরা খুশী উদ্‌যাপন করতেন, উন্নত মানের পোষাক পরিধান করতেন, বিভিন্ন সাজসজ্জা করতেন, খুশবু ও সুরমা লাগাতেন, এ দিনগুলোতে খুশী হতেন, লোকজনের জন্য অর্থ ব্যয় করতেন এবং মাওলেদুন্নবীর উপর অতি গুরুত্বসহকারে আলোচনা করতেন। আর এর বিনিময়ে তার পরিপূর্ণ সাওয়াব ও মহাসাফল্য লাভ করতেন। এর উপর পরীক্ষা চালালে দেখা যায় যে, এ কারণে ওই দিনগুলোতে পাওয়া গেছে একাধারে- কল্যাণ ও বরকতের প্রাচুর্য, নিরাপত্তা ও সুস্থতা, জীবিকার প্রশস্ততা, অর্থের প্রাচুর্য, শহর ও নগরগুলোতে নিরাপত্তা, বাড়ী-ঘরে শান্তি ও স্থিরতা। বলা বাহুল্য, এসবই পাওয়া যায়- মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এরই বরকতে।

[ফাতাওয়া-ই আযীযিয়াহ্, পৃ. ৯]

সাত. আল্লামা গাজী শেরে বাংলা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি আরো লিখেছেন-

نُقِلَ فِىْ اِسْنَادِ الْاَخْبَارِ عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَآءِ اَنَّهٗ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَقُوْلُ فِىْ هٰذِهِ الْمَوَالِيْدِ الَّتِىْ يَضَعُهَا النَّاسُ وَيَجْتَمِعُوْنَ لَهَا وَيَفْرَحُوْنَ بِهَا وَيُنْفِقُوْنَ فِيْهَا الْاَمْوَالَ وَيَرَوْنَهَا مِنْ مَّصَالِحِ الْاَعْمَالِ - فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَرِحَ بِنَا فَرِحْنَا بِهٖ وَالْمُحِبُّ مَعَ مُحِبِّهٖ

[كذا فِى هدية الحرمين و كذا فى الفتاوى العزيزية : ص ٧]

অর্থাৎ কোন বিজ্ঞ আলিম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখে আরয করলেন, "হে আল্লাহর রসূল! ওই সমস্ত মীলাদ মাহফিল সম্পর্কে আপনার অভিমত কি, যেগুলো লোকেরা আয়োজন করে, সেগুলোতে লোকজন সমবেত হয়, খুশী উদ্‌যাপন করে এবং অর্থ ব্যয় করে আর লোকেরাও সেগুলোকে ভালো মনে করে?" তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমালেন, "যে ব্যক্তি আমাকে নিয়ে খুশী হয়, আমিও তাকে নিয়ে খুশী হই। বস্তুতঃ আশেক্ব তো তার মা'শূক্বেরই সাথে থাকে।"

[হাদিয়াতুল হেরমাঈনের বরাতে 'ফাতাওয়া-ই আযীযিয়াহঃ পৃ.৭]

মাহে রবিউল আউয়ালের ইবাদত

ষোল রাকআত নফল নামাযঃ **كتاب الاوراد** (কিতাবুল আওরাদ) নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, যখনই রবিউল আউয়াল মাসের চাঁদ দৃষ্টিগোচর হয়, তখন থেকে ওই রাতে পড়বে তা এভাবে যে, ষোল রাকআত নফল নামায আদায় করবে দু' রাক'আতের নিয়্যত সহকারে, প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ফাতিহা পাঠান্তে সূরা ইখলাস তিনবার করে পড়বে। নামায থেকে অবসর হয়ে নিম্মোক্ত দুরূদ শরীফটি এক হাজার বার পাঠ করবে। --

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ نِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

উচচারণ: আল্লাহুম্মা ছল্লি আলা মুহাম্মদিনিন্নবিয়্যিল উম্মিয়্যি ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম। এ নামাযের খুবই ফযিলত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা চাইলে ওই নামায আদায় কারী ও দুরুদ শরীফ পাঠককে রাসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সাক্ষাৎ দ্বারা সৌভগ্য মণ্ডিত করবেন। তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন ওযূ সহকারে শয়ন করে।

বিশ রাকাআত নফল নামায

جواہر غیبی (জাওয়াহিরে গায়বী) নামক গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে-এ মাসের বার দিন পর্যন্ত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র রূহে আক্বদাসে এ নামাযের হাদিয়া প্রেরণ করতে থাকবেন। কেননা হযরাতে সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম, তাবি'ঈন, তব'ঈ তাবি'ঈন এ হাদিয়া পেশ করতেন। এ নামাযের নিয়ম হলো- প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ফাতিহার পর

একুশবার সুরা ইখলাস পাঠ করবেন। বার দিনের মধ্যে কোনদিন সম্ভব না হলে অন্য দিন আদায় করবেন। তবে বার দিনের মধ্যে উল্লেখিত নিয়মে অত্যন্ত ফলদায়ক। এর হাদিয়া অবশ্যই রূহে আকদাসের প্রতি পাঠাতে যেন ভুল না হয়। এ নামায আদায়কারীকে হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নযোগে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে থাকেন। বলা বাহুল্য, হুযূর আকদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দেখা ও জান্নাতের শুভসংবাদ পাওয়া নিঃসন্দেহে বাস্তব সত্য।

দুরূদ শরীফের ওযীফা

মাহে রবিউল আউয়াল শরীফের সবচেয়ে বড় ওযীফা হচেছ দৈনিক নিয়মিত দুরূদ শরীফ পাঠ করা। সুতরাং এ মাসে যত বেশী দুরূদ শরীফ পাঠের চেষ্টা করা। كتاب المشائخ (কিতাবুল মাশাইখ) নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, যখনই রবিউল আউয়াল শরীফের নব চন্দ্র দৃষ্টিগোচর হবে, সে রাত থেকে গোটা মাস নিম্মোক্ত দরুদ শরীফ এশা নামাযের পর একহাজার পঁচিশ বার পাঠ করবেন। এতে করে ওই ব্যক্তি হুযূর সরওয়ারে কাইনাত সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সাক্ষাৎ স্বপ্ন যোগে নসীব হবে। দরুদ শরীফটি হলো

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মদিওঁ ওয়া আলা আ-লি মুহাম্মদিন কামা সাল্লায়তা 'আলা ইব্‌রাহীমা ওয়া 'আলা আ-লি ইব্‌রাহীমা ইন্নাকা হামী-দুম্ মাজীদ।

এক বুযুর্গব্যক্তি বলেছেন যে ব্যক্তি একনিষ্ঠতার সঙ্গে রবিউল আউয়াল মাসে এক লক্ষ পঁচিশহাজার বার নিম্মের দুরূদ শরীফ পাঠ করলে ওই ব্যক্তি হুযূর কারীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র যিয়ারতে ধন্য হবেন এবং আখিরাতে সে ব্যক্তি তাঁর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সুপারিশ লাভে ধন্য হবেন। দরুদ শরীফটি হলো-

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحَابِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰهِ

উচ্চারণ: আসসালাতু ওয়াস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ ওয়াআলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া হাবীবাল্লাহ্।

মাহে রবিউল আখির

চান্দ্র সালের চতুর্থ মাস মাহে রবিউল আখির। এটা হুযূর শাহানশাহে বাগদাদ বড়পীর হযরত গাউসুল আ'যম মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদের জীলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু স্মৃতিবিজড়িত মাস। ফাতেহা-ই ইয়াযদাহুম বা গিয়ারভী শরীফ এ

মাসের একটি ফযীলতমণ্ডিত অনুষ্ঠান। এর অসংখ্য ফযীলত রয়েছে। নিম্নে প্রথমে হুযূর শাহানশাহে বাগদাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী, এরপর এ প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো-

শাহানশাহে বাগদাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী

ইসলাম ও মুসলমানদের ক্রান্তিকালে আল্লাহ্ ও রসূলের যেসব প্রিয়পাত্র তাঁদের অসাধারণ বেলায়তী শক্তি ও সময়োচিত যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত আদর্শকে ক্বায়েম করে পৃথিবীর ইতিহাসে চির অম্লান ও আল্লাহর সৃষ্টির অন্তরে পরম ভক্তি শ্রদ্ধার স্থান করে নিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে হুযূর গাউসে আ'যম দস্তগীর শায়খ আবদুল ক্বাদের জীলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র নাম মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল। ৪৭০ হিজরীর ১ রমযানুল মোবারকে শাহানশাহে বাগদাদ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হযরত আবূ সালেহ মূসা জঙ্গী দোস্ত এবং মহিয়সী মায়ের নাম সাইয়্যেদাহ্ উম্মূল খায়র ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা। তাঁর বংশীয় ধারা তাঁর সম্মানিত পিতা ও মহিয়সী মাতা- এ দু'ধারায় যথাক্রমে হযরত হাসান ও হযরত হোসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার মাধ্যমে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও হযরত ফাতিমা যাহরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা হয়ে হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছে যায়। বাংলাভাষীগণ তাঁকে একান্ত ভক্তি ভরে (নামের পরিবর্তে) 'বড়পীর' বলে স্মরণ করে। ইসলামের ইতিহাসের ক্রান্তিকালে দ্বীনকে পুনরায় জীবিত করার কারণে তিনি 'মুহিউদ্দীন' (ইসলামকে পুনরর্জীবিতকারী) এবং আল্লাহর সৃষ্টিকে যথাসময়ে সাহায্যকারী হিসেবে তিনি 'গাউসুল আ'যম'।

হুযূর গাউসে পাকের 'মহিউদ্দীন' নামের তাৎপর্য

৫১১ হিজরীর এক জুমু'আহ্‌বার। হযরত গাউসে পাক বাগদাদ শরীফের দিকে আসছিলেন। এমন সময় তিনি পথের ধারে এক রুগ্ন ও শীর্ণকায় বৃদ্ধকে শায়িত অবস্থায় দেখতে পান। ওই বৃদ্ধ সালাম আরয করে হযরত গাউসে পাককে বললো, "আমাকে ধরে তুলুন! আমি শক্তিহীন হয়ে পড়েছি।" হুযূর গাউসে পাক তাকে তুলে বসালেন। তখন উক্ত দুর্বল ও শীর্ণকায় বৃদ্ধটি ধীরে ধীরে সবল, সুস্থ ও সুঠাম হয়ে উঠলো। আর আরয করলো, "আমি হলাম দ্বীন-ইসলাম। মানুষের ধর্মহীনতা, উদাসীনতা, নানা অপকর্ম ও সামাজিক নানা কুসংস্কার ইত্যাদির কারণে আমি দুর্বল হয়ে পড়েছি। আপনার বরকতময় হাতের স্পর্শে ও সাহায্যে আমি নবজীবন লাভ করলাম।" এ ঘটনার পর হযরত গাউসে পাক বাগদাদ শরীফে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং মসজিদে জুমু'আহ্ পড়ার উদ্দেশ্যে প্রবেশ করতেই লোকেরাই তাঁকে 'মুহিউদ্দীন' (দ্বীন-ইসলামকে পুনর্জীবিতকারী) নামে সম্বোধন করতে লাগলো। বাস্তবিকপক্ষে তিনি একদিকে সংস্কারমূলক কার্যাদি সম্পন্ন করে দ্বীনকে পুনর্জীবন

দান করেছেন, অন্যদিকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মানুষের মনে ওই নামটি দ্বারা তাঁকে সম্বোধন করার প্রেরণা দান করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত: হুযূর গাউসে পাকের জন্মসাল এবং তাঁর আদর্শ জীবদ্দশা ও সংস্কারমূলক কর্ম ইত্যাদি এ কথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে, তিনি সত্যিকার অর্থে একজন মুজাদ্দিদও ছিলেন। তিনি হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দির মুজাদ্দিদ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান-

اِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ لِهٰذِهِ الْاُمَّةِ عَلٰى رَأسِ كُلِّ مِآئَةِ سَنَةِ مَنْ يُّجَدِّدُ لَهَا دِيْنَهَا

অর্থাৎ: আল্লাহ্ তা'আলা এ উম্মতের জন্য প্রতিটি শতকের শুরুতে এমন কাউকে প্রেরণ করেন, যিনি দ্বীনের সংস্কারকার্য সম্পন্ন করেন।-[আবূ দাঊদ শরীফ ও মিশকাত শরীফ]

তৃতীয়ত: হুযূর গাউসে পাকের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা অসংখ্য অসাধারণ গুণের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। তাঁর পবিত্র জন্মের পূর্ব থেকেই তাঁর কারামাত প্রকাশ পেতে থাকে। তাঁর আদর্শ জীবনে এতসংখ্যক কারামাত প্রকাশ পেয়েছে যে, সেগুলোর আলোচনা করতে গিয়ে বৃহৎ পরিসরের অগণিত নির্ভরযোগ্য কিতাব প্রণীত হয়েছে। শিক্ষাগত দিক দিয়েও তিনি ছিলেন অসাধারণ জ্ঞানী। অগণিত বিজ্ঞ ওলামার ওই যুগেও তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। পবিত্র ক্বোরআনের এককেটি আয়াতের এত সংখ্যক তাফসীর বা ব্যাখ্যা বর্ণনা করতেন যে, যুগবরেণ্য আলিমগণও হতভম্ব হয়ে যেতেন। একবার তিনি একটি আয়াতের সনদ সহকারে হাদীস শরীফের আলোকে ৪০টিরও বেশি তাফসীর বর্ণনা করেছিলেন। ৫২১ থেকে ৫৬১ হিজরি পর্যন্ত দীর্ঘ ৪০ বছর যাবৎ তিনি নিয়মিতভাবে সপ্তাহে তিনদিন ওয়াজ করতেন। তখন চারশ' আলিম তাঁর মূল্যবান ভাষণগুলো লিপিবদ্ধ করতেন। তাই তাঁর বাণীগুলো একাধিক নির্ভরযোগ্য সূত্রে নিখুঁতভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। ওই সমস্ত সূত্র থেকে ৮৭ বছর পর ইমাম নূরুদ্দীন আবুল হাসান শাতনূবী (মিসর) গাউসে পাকের বাণী ও কারামতসমূহ সংগ্রহ করে 'বাহ্‌জাতুল আসরার' নামক গ্রন্থ রচনা করেছেন। হুযূর গাউসে পাকের জীবনী গ্রন্থের মধ্যে 'নুযহাতুল খাত্বির'ও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর লিখিত 'গুনিয়াতুত্ ত্বালিবীন', 'ফুতূহুল গায়ব', 'সির্‌রুল আসরার' ও 'ক্বসীদাহ্-ই গাউসিয়া' আজ বিশ্বে অতি নন্দিত। তাঁর 'সির্‌রুল আসরার' তো মা'রিফাতের খনিই।

চতুর্থত: হুযূর গাউসে পাক দ্বীন-ইসলামকে পুনর্জীবিত করার বিষয়টি হযরত খাজা গরীব-নাওয়ায রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এভাবে মূল্যায়ন করেছেন-

کردار مسیح بمردہ رواں داوی تو بدین محمد جاں-ہمہ عالم محی الدین گویاں ہر حسن و جمالت گشتہ فدا

অর্থাৎ: যদি হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম মৃতকে জীবিত করে থাকেন, তবে (হে গাউসে আ'যম জীলানী) আপনি হুযূর মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দ্বীনে প্রাণের সঞ্চার করেছেন। সমগ্র বিশ্ব আপনাকে 'মুহিউদ্দীন' (দ্বীন-ইসলামকে পুনর্জীবিতকারী) বলে স্মরণ করে। ওহে গাউসে আ'যম! আপনার সৌন্দর্যের প্রতি তারা প্রাণোৎসর্গকারী!

পঞ্চমত: হুযূর গাউসে পাকের সংস্কারগুলোর যথাযথ মূল্যায়ন করা যাবে যদি তাঁর সমসাময়িক অবস্থাদির পর্যালোচনা করা যায়। আর ওই সংস্কারগুলোও ছিল বিশ্বব্যাপী অতিমাত্রায় সুদূর প্রসারী। সর্বোপরি, এর কার্যকারিতাও ছিলো একেবারে অব্যর্থ ও ফলপ্রসূ। বিশ্বনবী যেই ইসলাম দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, ওই ইসলামের প্রকৃত রূপরেখাই তাঁর মাধ্যমে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র বংশধর ও প্রকৃত প্রতিনিধিত্বের জ্বলন্ত স্বাক্ষরই তিনি রেখেছেন।

হিজরি পঞ্চম শতাব্দির শেষভাগে, অর্থাৎ হুযূর গাউসে পাকের পবিত্র জন্মের সময় গোটা বিশ্বে নাজুক অবস্থা বিরাজ করছিলো। বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ শিবলী নো'মানী ও সাইয়্যেদ সুলায়মান নদভী তাঁদের ইতিহাসগ্রন্থে এবং আল্লামা ইবনে জাওযী তাঁর 'মুনায্‌যাম'-এ ওই সময়কার খোদ ইসলামী রাষ্ট্রের অবস্থা তুলে ধরেছেন। তা থেকে বুঝা যায় যে, অপকর্ম, ব্যভিচার, পাপাচার, রাজনৈতিক বিপর্যয় ও চারিত্রিক অধঃপতন চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছিলো। স্পেন ও বায়তুল মুক্বাদ্দাসে মুসলমানরা শুধু চারিত্রিক ও ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যই হারায়নি বরং রাজনৈতিকভাবেও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলো। খ্রিষ্টানদের হাতে এ দু'টি মুসলিম রাষ্ট্র চলে যাওয়া শুধু সময়ের ব্যাপার ছিলো। মধ্যপ্রাচ্যে আব্বাসীয় শাসন নামে মাত্র চলছিলো। আফগানিস্তান ও ভারতে গজনীর সুলতানের উত্তরসূরীরা পতনের একেবারে মুখোমুখী হয়ে গিয়েছিলো। হিন্দু রাজাগণ তাদের পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য শলা-পরামর্শ করছিলো। মিসরে আল্লামা সুয়ূতী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি'র ভাষায় 'দৌলতে খবীসাহ্' (নাপাক শাসকগোষ্ঠী) ইলহাদ ও বেদ্বীনী চিন্তাধারার প্রসার ঘটাচ্ছিলো। সর্বোপরি, তারা করছিলো ইসলামের অবর্ণনীয় ক্ষতি।

অন্যদিকে মুসলমানদের চারিত্রিক অধঃপতন তো চরমেই ছিলো। আমীর-উমারাগণ ছিলেন বিলাসিতায় মগ্ন। মধ্যপ্রাচ্যের এক মধ্যম পর্যায়ের নেতার অন্দরমহলে গায়িকা ও নর্তকীর সংখ্যা ছিলো পাঁচশ'। স্পেনের (কার্ডোবা) আমীর মু'তামাদের অন্দর মহলে ৮০০ নর্তকী ও গায়িকা ছিলো। পুরুষরা পরতো ঘোমটারূপী রুমাল আর নারীরা হলো পর্দাহীনা। মদ্যপান ও ব্যভিচার হলো ব্যাপকতর।

ধর্মীয় অঙ্গনের অবস্থা ছিলো আরো শোচনীয়। ক্বারামাতাহ্, বাত্বেনিয়া, শিয়া মতবাদ, মু'তাযিলা এবং মন্দ আলিম ও ভণ্ড লোকদের ফিৎনা এক অসহনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলো। এমনকি এসব বাতিল ও ভণ্ডলোকদের দৌরাত্ম্য এতো বেশি বৃদ্ধি পেয়েছিলো যে, সত্যভাষী সুন্নী ওলামা-মাশাইখ ও শাসকগণ তাদের হত্যাযজ্ঞের শিকার হতে লাগলেন। যুগশ্রেষ্ঠ ন্যায়পরায়ণ ও সত্যপন্থী সালজূক্বী উজির নিযামুল মুল্ক, তূসী এবং সালজূক্বী শাসক মালিক শাহ্‌কে তারা শহীদ

করেছিলো। কিছু সংখ্যক সুবিধাবাদী-সুযোগসন্ধানী মৌলভীও তাদের ক্রীড়নক হয়ে দ্বীনের ক্ষতি সাধন করছিলো। মোটকথা, এসব কারণে ওই সময়টাকে মি. গ্যাবন ও অন্যান্য ইউরোপীয় ইতিহাসবিদগণ 'ইসলামী দুনিয়ার অন্ধকার যুগ' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। ইমাম গায্যালী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি তাঁর সমসাময়িক যুগ সম্পর্কে লিখেছেন- শিয়াগণ সুন্নীদের সাথে মুনাযারা (তর্কযুদ্ধ) করে পরাজিত হয়ে সুন্নী আলিম ও সাধারণের উপর হামলা ও তাঁদেরকে হত্যা করার পথ পর্যন্ত বেছে নিয়েছিলো। আর হাম্বলী মাযহাব ও আশা'ইরাহ্ আক্বাইদের অনুসারীদের মধ্যেও সুকৌশলে হিংসা-বিদ্বেষের আগুন ছড়ানো হচ্ছিলো। অথচ 'হাম্বলী' যেমন একটি বিশুদ্ধ মাযহাব, আশা'ইরাহ্ও তেমনি আহলে সুন্নাতের একটি মূলধারার অন্যতম। মোটকথা এসব অধঃপতন ও পশ্চাদপদতা মুসলমানদের জন্য অতি বিপজ্জনক বলে আমাদের আক্বা ও মাওলা অদৃশ্যজ্ঞাতা হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পূর্বেই সতর্ক করে দিয়েছেন।

অতঃপর মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ্ পাকের খাস রহমত হলো। এহেন নাজুক পরিপস্থিতিতে গোটা দুনিয়ার মুসলমানদের আত্মশুদ্ধি ও পুনর্জাগরণের মাধ্যমে তাদের সাফল্য ও হৃত-গৌরব ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি হুযূর গাউসে আ'যম দস্তগীর শায়খ আবদুল ক্বাদেরী জীলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর শুভ আবির্ভাব ঘটালেন। তাঁকে দিলেন এজন্য সার্বিক যোগ্যতা ও অসাধারণ (বেলায়তের) অলৌকিক ক্ষমতা। প্রভূত দ্বীনী শিক্ষার্জনের পর দীর্ঘ পঁচিশ' বছর যাবৎ নির্দিষ্ট নিয়মে তিনি অক্লান্ত আধ্যাত্মিক সাধনা করতে করতে 'গাউসিয়াতে কুবরা' (গাউসে আ'যম)-এর সুউচ্চ আসনে আসীন হন। ইত্যবসরে তিনি আত্মনিয়োগ করলেন, মুসলিম সমাজের সংস্কারে। বস্তুত সমাজ সংস্কার আরম্ভ হয়েছিলো তাঁর শৈশব থেকেই। শৈশবে শিক্ষার্জনের জন্য যাত্রাপথে আক্রমণকারী ডাকাতদল তাঁর সততায় মুগ্ধ হয়ে তাওবা করে সাচ্চা মুসলমান, 'বাহ্জাতুল আসরার'-এর বর্ণনামতে ওলী হয়েছিলো। তাঁর ওয়ায-নসীহতে ছিলো অসাধারণ আকর্ষণ। তাঁর একেক মজলিসে ৬০-৭০ হাজার মানুষের সমাগম হতো। আর ওয়ায শুনে তারা সাথে সাথে হিদায়তের পথ অবলম্বন করে নিতো। এক পর্যায়ে কমবেশী চার হাজার বিজ্ঞ আলিম-উলামা তাঁর ওয়ায-নসীহত লিপিবদ্ধ করতেন। তাঁর প্রবর্তিত ক্বাদেরিয়া তরীক্বা, পরবর্তীতে তাঁরই নির্দেশে ও ফায়যপ্রাপ্ত হয়ে চিশতিয়া, সোহ্রাওয়ার্দিয়া, মুজাদ্দেদিয়া ইত্যাদি ত্বরীক্বাও গোটা মুসলিম বিশ্বে হিদায়তের পথকে সুগম করেছিলো। এমনকি বেলুচিস্তান ও সিন্ধের অজপাড়াগাঁয়ে এবং আফ্রিকার গহীন অরণ্যেও হুজূর গাউসে আ'যম জীলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর চর্চা চলতে থাকে। ফলে বিশ্বের মুসলমানদের মধ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলো ইসলামের প্রকৃত আদর্শ। এর প্রভাবে গাউসে পাকের ওফাত শরীফের পর মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে মুসলিম দেশগুলো তাদের গৌরব ফিরে পেয়েছিলো। মুসলমানগণ ফিরে পেলো

রাজনৈতিক হৃত গৌরবও। মিসর ও বায়তুল মুক্বাদ্দাসে যথাক্রমে সন্ত্রাসী ফির্কা বাত্বেনিয়া ও খ্রিষ্টানদের পতন ঘটলো। সুলতান নূরুদ্দীন জঙ্গী ও সুলতান সালাহ উদ্দীন আইয়ূবী রাজনেতিক অঙ্গনে আত্মপ্রকাশ করলেন। মুসলমানদের হাতে ক্রুসেড যোদ্ধারা পরাজিত হলো। বায়তুল মুক্বাদ্দাস আযাদ হলো।

গযনী সালতানাতের স্থলে ঘুরী বংশের অভ্যুদয় হলো। তাঁরা পাক-ভারতে এক নতুন ও প্রশস্ততর ইসলামী হুকূমত প্রতিষ্ঠা করলেন। ইতোমধ্যে গাউসে পাকের প্রিয়ভাজন হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি এবং তাঁর খলীফা ও শিষ্যগণ, মাশাইখে চিশতিয়া, সোহরাওয়ার্দিয়াসহ অসংখ্য আউলিয়া-ই কেরাম উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ও এলাকায় গিয়ে কঠোর পরিশ্রম করে অগণিত লোককে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেছেন। আরো কিছুকাল পরে পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে নায়েবে গাউসুল ওয়ারা হযরত খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী ক্বাদেরী, তাঁরই খলীফা হযরত সাইয়্যেদ আহমদ শাহ সিরিকোটী, তাঁরই সুযোগ্য খলীফা ও উত্তরসূরী ক্বুত্বে যামান হযরত সাইয়্যেদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হিম নিজ অঞ্চল ছাড়াও সুদূর আফ্রিকা, বার্মা, বাংলাদেশ, ভারত, মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপে ইসলামের অকল্পনীয় খিদমত আঞ্জাম দেন। বর্তমানে তাঁরই সুযোগ্য উত্তরসূরী হযরত সাইয়্যেদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ মুদ্দাযিল্লুহুল আলী এবং হুযূর গাউসে আ'যমের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফায়যপ্রাপ্তদের প্রচেষ্টায় মুসলমানদের মধ্যে নতুন জীবনের সঞ্চার হয়েছে। এভাবে সপ্তম হিজরীতে মাত্র ২৫ বছর (৬৫৬-৬৮০ হিজরী) সময়সীমার অভ্যন্তরে ইতোপূর্বে যেসব লুটেরা (যেমন চেঙ্গিস খাঁর বংশধররা) ইসলাম ও মুসলমানদের প্রভূত ক্ষতিসাধন করেছিল তারা ও তাদের উত্তরসূরিরা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষে অপরাজেয় যোদ্ধা হিসেবে ঐতিহাসিক অবদান রাখেন। এতে সন্দেহাতীতভাবে হুযূর গাউসে পাকের রূহানী ক্ষমতারই প্রয়োগ ছিলো। আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি এ চিত্রটি এভাবে প্রদর্শন করেছেন-

بحر و بر شہر قری سہل وحزن دشت وچمن- کون سے چک پہ پہنچا نہیں دعویٰ تیرا

অর্থাৎ জল-স্থল, নগর-বন্দর-গ্রাম, নরমভূমি-পর্বতমালা, মরুভূমি-মরুদ্যানে এমন কোন স্থান নেই, যেখানে (হে গাউসে আ'যম দস্তগীর) আপনার বেলায়তী ক্ষমতার ছোঁয়া লাগেনি।

তা লাগবেওনা কেন? তিনি ছিলেন 'গাউসে আ'যম'। আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে 'গাউস'-এর বেলায়তী ক্ষমতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তরে বলেন- ''মোরাক্বাবা ছাড়াই প্রতিটি অবস্থা এমনিতেই তাঁর সামনে আয়নার মতো উদ্ভাসিত থাকে।'' এর পর তিনি বলেন- ''প্রত্যেক 'গাউস'-এর দু'জন উজির থাকেন। 'গাউস'-এর উপাধি হয় 'আবদুল্লাহ্', তাঁর ডান পাশের উজিরের উপাধি হয় 'আবদুর রব'। আর বাম পাশের উজির

'আবদুল মালিক'। উল্লেখ্য, এ বেলায়ত সাম্রাজ্যে বাম পাশের উজির ডান পাশের উজির অপেক্ষা উত্তম হন। কিন্তু পার্থিব সাম্রাজ্যে হয় এর বিপরীত। কারণ বেলায়তের সাম্রাজ্য হচ্ছে 'ক্বল্ব' (হৃদয়)। ক্বল্ব থাকে দেহের অভ্যন্তরে বাম পাশে। এখানে আরো উল্লেখ্য যে, 'গাউসে আকবর' অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের ডাকে সাড়া দিয়ে সর্বাধিক সাহায্যকারী এবং সব গাউসের উপর 'গাউস' হলেন সাইয়্যিদুল মুরসালীন হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া সাল্লাম।

এতদভিত্তিতে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বাম পাশের উজির ছিলেন সিদ্দীক্ব-ই আকবর হযরত আবূ বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। আর ফারূক্ব-ই আ'যম হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ছিলেন হুযূরের ডান পাশের উজির। তাঁর পর উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম গাউসিয়াতের মর্যাদায় আসীন হন খলীফাতুর রসূল আমীরুল মু'মিনীন হযরত আবূ বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। আর তাঁর দু'উজির হন হযরত আমীরুল মু'মিনীন ফারূক্ব-ই আ'যম ও হযরত ওসমান গনী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা। তাঁরপর আমীরুল মু'মিনীন ফারূক্ব-ই আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে 'গাউসিয়াত' দান করা হলো। আর তাঁর উজিরদ্বয় হলেন হযরত ওসমান গনী ও হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা। তাঁরপর 'গাউসিয়াত' দান করা হলো হযরত ওসমান গনী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে। আর তাঁর উজিরদ্বয় হলেন হযরত আলী ও হযরত হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা। তাঁরপর 'গাউসিয়াত' দান করা হলো হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে এবং তাঁর দু'উজির হলেন হযরত হাসান ও হযরত হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা। তাঁরপর ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে, এভাবে ক্রমান্বয়ে ইমাম হাসান আসকারী পর্যন্ত গাউসিয়াত দান করা হয়। এ হযরতগণের মধ্যে প্রত্যেকে স্বতন্ত্র 'গাউস' ছিলেন। ইমাম হাসান আসকারীর পর হযরত গাউসে আ'যম দস্তগীর শায়খ সুলতান আবদুল ক্বাদের জীলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু পর্যন্ত যতজন 'গাউস' হন প্রত্যেকে তাঁর (হযরত হাসান আসকারীর) 'নায়েব' বা প্রতিনিধি ছিলেন। তাঁদের পর সাইয়্যেদুনা গাউসে আ'যম পীরানে পীর দস্তগীর শায়খ আবদুল ক্বাদের জীলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু স্বতন্ত্র গাউসের মর্যাদায় সমাসীন হন। তিনি একাই 'গাউসিয়াতে কুবরা' (গাউসে আ'যম)-এর মর্যাদায় আসীন হন। তিনি 'গাউসুল আ'যম'ও 'সাইয়্যেদুল আফরাদ' (বিশেষ ও শীর্ষস্থানীয় ওলীকুল শিরমণি)ও। হুযূর গাউসে পাকের পর এ পর্যন্ত যতজন 'গাউস' ও 'ওলী' হয়েছেন ও ভবিষ্যতে হবেন, হযরত ইমাম মাহদী (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম)-এর শুভাগমন পর্যন্ত, সবাই হুযূর গাউসে আ'যম শায়খ আবদুল ক্বাদের জীলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র নায়েব হবেন। তারপর ইমাম মাহদী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে 'গাউসিয়াতে কুবরা' (গাউসুল আ'যম)-এর পদ দান করা হবে।'' -[মালফূযাত : ১ম খণ্ড-১৪৩ পৃষ্ঠা]

'যুবদাতুল আসার' গ্রন্থে শায়খুল মুহাক্বক্বিক্ব হযরত আবদুল হক্ব মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি লিখেছেন- ''হযরত গাউসুল আ'যম শায়খ আবদুল ক্বাদের জীলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে গোটা দুনিয়ার সমস্ত ওলী, আবদাল ও কুতুবের অবস্থাদি ও রহস্যসমূহ অর্পণ করা হয়েছে। তাঁর মহত্বের দৃষ্টি যখন পার্থিব সৃষ্টির কোন অংশে পড়ে তখন পৃথিবীবাসী যমীনের উপরিভাগ থেকে আরম্ভ করে এর সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত ভয়ে কাঁপতে থাকে; তবে তারা এতেও আশাবাদী থাকে যে, তাঁর কৃপাদৃষ্টি হলে বরকত বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু এ ভয় সর্বদা থাকে যে, তাঁর মহত্বপূর্ণ দৃষ্টির প্রভাবে বিশেষ অবস্থাদি (বেলায়ত) প্রত্যাহার করে নেওয়া হচ্ছে কিনা।'' শায়খ আবুল বারাকাত ইবনে সাখর উমূভী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেছেন, ''হযরত সাইয়্যেদ আবদুল ক্বাদির জীলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আল্লাহ প্রত্যেক ওলীর যাহেরী ও বাত্বেনী অবস্থাদির প্রতি দৃষ্টি রাখেন। আল্লাহর কোন ওলী তাঁর যাহেরী কিংবা বাত্বেনী অবস্থাদিতে তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে (আপন বেলায়তী) ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন না। আল্লাহর এমন কোন ওলীও, যিনি আল্লাহর মহান দরবারে কথোপকথনের উচ্চ মর্যাদায় আসীন হয়েছেন, হযরত গাউসে আ'যমের অনুমতি ব্যতীত মুখ খুলতে পারেন না। যুগের এ ওলীগণের উপর ইন্তিকালের পূর্বে ও পরে তাঁরই ক্ষমতা চলতে থাকে। শায়খ আবূ মুহাম্মদ ক্বাসেম ইবনে ওবায়দ বসরী বলেছেন, ''আমি হযরত খাদ্বির্ আলায়হিস্ সালামকে হযরত সাইয়্যেদুনা আবদুল ক্বাদির জীলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম।'' তিনি তদুত্তরে বলেছেন, ''তিনি এ সময়েও 'ফরদে আহবাব' (বেলায়তের এমন উচ্চ মর্যাদায় আসীন যে), আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কোন ওলীকে উচ্চ মর্যাদা দান করেন না যতক্ষণ না গাউসে পাক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র দরবারে তা মঞ্জুর হয়। কোন নৈকট্য ধন্য ওলীয়্যুল্লাহকে ততক্ষণ পর্যন্ত বুযুর্গী দেওয়া যেতে পারে না, যতক্ষণ না তিনি গাউসে আ'যমের বুযুর্গীকে মেনে নেন। আল্লাহ্ তা'আলা কাউকেও ততক্ষণ পর্যন্ত আপন ওলী বানান না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর বুকে (হৃদয়ে) হযরত গাউসে পাকের প্রতি পূর্ণাঙ্গভাবে শ্রদ্ধা অবস্থান গ্রহণ করে না।'' -['যুবদাতুল আসার' পৃষ্ঠা ৩৯-৪০ : কৃত শায়খ আবদুল হক্ব মুহাদ্দিসে দেহলভী]

সমস্ত ওলীর গর্দানের উপর হুযূর গাউসে পাকের ক্বদম শরীফ

হুযূর গাউসে আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ৫৫৯ হিজরীতে অর্থাৎ ইন্তিক্বালের তিন বছর পূর্বে এক রাতে বাগদাদ শরীফে ওয়ায করছিলেন। ওই মজলিসে হযরত শায়খ আলী ইবনে হায়তী, শায়খ বাক্বা ইবনে বতূ, শায়খ আবূ সা'ঈদ ক্বলবী, শায়খ নজীব সোহরাওয়ার্দী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হিম প্রমুখ প্রসিদ্ধ ওলীগণ উপস্থিত ছিলেন। ওয়াযের এক পর্যায়ের গাউসে পাক ঘোষণা করলেন-

قَدَمِىْ هٰذِهٖ عَلٰى رَقَبَةِ كُلِّ وَلِيِّ اللّٰهِ

(আমার এ ক্বদম আল্লাহ্র প্রত্যেক ওলীর গর্দানের উপর।)

এ মহান ঘোষণা উচ্চারিত হবার সাথে সাথে উপস্থিত- অনুপস্থিত পৃথিবীর সমস্ত ওলীয়্যুল্লাহ্ নিজ নিজ গর্দান নত করে দিয়েছিলেন। সবাই গাউসে পাকের ওই ঘোষণার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে নিলেন। দারা শিকোর 'সাফীনাতুল আউলিয়া'য় হযরত আবূ সা'ঈদ ক্বয়লূবীর বরাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ''তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হুযূর গাউসুল আ'যমকে একটি নূরানী পোশাক পরিয়ে দিয়েছিলেন।'' হযরত ক্বুত্বব লূ'লূ' আরমীনী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেছেন, ''হুযূর গাউসে পাক যখন এ ঘোষণা দিলেন তখন পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে পৃথিবীর কার্যাদি নিয়ন্ত্রণকারী ৩১৩ জন ওলী ছিলেন। তাঁরা সবাই আপন আপন অবস্থান থেকে স্বীয় গর্দান মুবারক ঝুঁকিয়ে দিয়ে আনুগত্য ঘোষণা করেছিলেন। -[বাহ্জাতুল আসরার]

তখন খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশ্‌তী গরীব-নাওয়ায রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ছিলেন হিন্দুস্তানের পথে খোরাসান (সীস্তান)'র এক পর্বতগুহায় রিয়াযতরত। তিনিও বাগদাদ শরীফের ওই ঘোষণা শুনতে পান এবং সাথে সাথে অবনত মস্তকে ঘোষণা দিলেন بَـلْ قَـدَمُکَ عَـلٰـى عَيْـنَـىَّ وَرَأْسِـىْ (বরং আপনার ক্বদম শরীফ আমার দু'চোখের উপর ও আমার মাথার উপর)।

পক্ষান্তরে, শায়খ সানা'আনীও ঘোষণাটি শুনতে পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি বললেন, ''আমার গর্দানের উপর আপনার কদমযুগল নয়।'' (যেমন আজকাল কিছুসংখ্যক মূর্খলোক বলে থাকে, তাদের 'গাউসুল আ'যম' স্বতন্ত্র; কারো মুখাপেক্ষী নন, কোন ধরাবাঁধা নিয়মের অধীনে নন, তাই তিনি নাকি আরো বড় ইত্যাদি)। উল্লেখ্য, হুযূর গাউসে পাকও শায়খ সানা'আনীর ওই কথাটা শুনতে পান এবং শায়খ সানা'আনীকে চিনতে পান। সুতরাং তিনিও বলে দিলেন-

عَلٰى رَقَبَتِهٖ رِجْلِ الْخِنْزِيْرِ

(তাহলে তার গর্দানের উপর শূকরের পা।)

অতঃপর শায়খ সানা'আনী এক খ্রিষ্টান নারীর উপর আশিক্ব হয়ে তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলেন। বিয়ের শর্তানুসারে তিনি তাদের শূকরের পাল চরালেন। তখন তাঁকে শূকর ছানাকে কাঁধে তুলে নিয়ে পথ চলতে হয়েছিলো। শেষ পর্যন্ত তিনি গীর্জায় গিয়ে শূকরের মাংস ভক্ষণ ও মদ্যপান ইত্যাদির মাধ্যমে ঈমান হারানোর দিকে এগিয়ে যেতে উদ্যত হলে হুযূর গাউসে পাক, শায়খ সানা'আনীর দু'জন মুরীদের আবেদনক্রমে, তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন এবং গাউসিয়াতের কৃপাদৃষ্টি দ্বারা তাঁকে ফিরিয়ে আনেন এবং পুনরায় বেলায়ত দান করেছিলেন।

হযরত মুজাদ্দিদ্ আল্ফে সানী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি তাঁর মাকতূবাত শরীফের ১২৩ নম্বর মাকতূবে (৩য় খন্ড) লিখেছেন- হযরত শায়খ আবদুল ক্বাদির জীলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর যামানা থেকে আরম্ভ করে ক্বিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত যত আউলিয়া, আবদাল, আক্বত্বাব, আওতাদ, নুজাবা, নুক্বাবা, গাউস অথবা

মুজাদ্দিদের আবির্ভাব হবে। তাঁরা সকলেই ত্বরীক্বতের ফায়য, বরকত ও বেলায়ত অর্জনের বেলায় গাউসুল আ'যমের মুখাপেক্ষী। তাঁর মাধ্যম বা ওসীলা ছাড়া ক্বিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত কেউ ওলী হতে পারবে না। -[পত্রিকা তবলীগ : মে-১৯৭০ সংখ্যা, শর্ষিনা থেকে প্রকাশিত]

[উল্লেখ্য, তাব্'ই তাবে'ঈন, তাবে'ঈন, সাহাবা-ই কেরাম, আহলে বায়ত ও ইমাম মাহ্দী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম ওই ক্বদম শরীফের ঘোষণা বহির্ভূত। এখানে 'আউলিয়া- আল্লাহ্' বলতে পরবর্তী ওলীগণকে বুঝায়। -[মালফূযাত ইত্যাদি]]

ইমামে আহ্লে সুন্নাত আল্লামা গাযী আযীযুল হক্ব শেরেবাংলা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি তাঁর 'দীওয়ান-ই আযীয' শরীফে হুযূর গাউসে পাক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর প্রশংসায় লিখেছেন-

وصف آں شاہ ولایت ایں قدر کافی بود- پائے پاکش بر رقاب ہر ولی اللہ بود

অর্থাৎ ওই শাহে বেলায়তের প্রশংসা এতটুকুই যথেষ্ট যে, প্রত্যেক ওলীয়্যুল্লাহ্র গর্দানের উপর তাঁর ক্বদম শরীফ রয়েছে।

وقت مشکل گر ندا ہر کس دہد با اسم او- حل مشکل بہر او آندم کند آں قول او

অর্থাৎ: বিপদের সময় যে কেউ তাঁর নাম নিয়ে (সাহায্য প্রার্থনা করবে) তাৎক্ষণিকভাবে ওই মুহূর্তেই তিনি সমস্যার সমাধান করে দেবেন; এটা তাঁরই ঘোষণা। -[দীওয়ান-ই আযীয, পৃষ্ঠা ৭-৮]

'দীওয়ান-ই আযীয' শরীফের পৃষ্ঠা নম্বর ৪০-এ আল্লামা গাযী শেরে বাংলা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি লিখেছেন, হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হুযূর গাউসে পাকের শির মুবারকে এমন এক তাজও পরিয়েছেন, যার বদৌলতে তাঁর ক্বদম শরীফ সমস্ত ওলীর গর্দানের উপর রয়েছে। এরপর তিনি লিখেছেন-

درشب معراج محبوب خدا بر گردنش- پا نہادہ رفت بر عرش بریں آں رفرش

অর্থাৎ শবে মি'রাজে হযরত মাহবূবে খোদা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর (হুযূর গাউসে আ'যম) গর্দান শরীফের উপর ক্বদম মুবারক রেখে আরশে মু'আল্লায় তাশরীফ নিয়ে গিয়েছিলেন। এটাই ছিলো হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর 'রফরফ' শরীফ।

এ সব কারণে হুযূর গাউসে পাকের পবিত্র সত্তা থেকে এত বেশি কারামাত প্রকাশ পেয়েছে যে, সেগুলো লিখে শেষ করা মুশকিল। তা ছাড়া, তাঁর বেলায়তী ক্ষমতা, অসাধারণ, কর্মতৎপরতা (সংস্কার সাধন), সর্বোপরি দুনিয়ার বুকে পুনরায় ইসলামের প্রকৃত রূপরেখা ও মহিমাকে সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠায় অকল্পনীয় সাফল্য ইত্যাদি কারণে তিনি হলেন- বাস্তবিকপক্ষে 'গাউসে আ'যম' (গাউসুল আ'যম)। বিশ্ববরেণ্য ওলামা-মাশাইখ ও মুহাক্বক্বিক্বর্গ এ কথা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন

যে, ক্বিয়ামতের পূর্বে ইমাম মাহ্দী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু পর্যন্ত তিনিই 'বিশ্বব্যাপী গাউসুল আ'যম।' তাঁর মর্যাদায় এ সময়সীমার মধ্যে কেউ পৌছতে পারবে না। সুতরাং প্রতিটি যুগে যত ওলী ও গাউসে যামান আসবেন তাঁরা সবাই হুযূর গাউসে পাকেরই অধীন ও প্রতিনিধি।

লেখনী

অসাধারণ বরকতমণ্ডিত তরীক্বতের শিক্ষা ও দীক্ষা, অভূতপূর্ব হৃদয়গ্রাহী ওয়ায-নসীহত ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের আত্মশুদ্ধি ও সার্বিক কল্যাণ সাধনের সাথে সাথে হুযূর গাউসে পাক অসাধারণ জ্ঞান সঞ্জাত লেখনীও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি কতগুলো অতি অমূল্য গ্রন্থ-পুস্তকও রচনা করে মুসলিম উম্মাহর জন্য রেখে গেছেন। তাঁর ইরশাদ, খোৎবা ও তাক্বরীরগুলোও তাঁর বিজ্ঞ শাগরিদ-মুরীদদের দ্বারা লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষিত হয়েছে। তাঁর লিখিত কিতাবগুলোর সংখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। হযরত শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর প্রসিদ্ধ 'আখবারুল আখইয়ার'-এ লিখেছেন 'হযরত গাউসে আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর ওয়া'যের মজলিসে চারশ' বিজ্ঞ লোক কলম-দোয়াত নিয়ে বসতেন। আর যাকিছু তাঁর নিকট শুনতেন, অর্থাৎ তাঁর এরশাদগুলো লিপিবদ্ধ করতেন। ইমাম ইবনে কাসীর হুযূর গাউসে পাকের লিখিত 'ফুতূহুল গায়ব' ও 'গুনিয়াতুত্ব ত্বালেবীন'-এর কথাও উল্লেখ করেছেন। হযরত শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ্ সাহেব মুহাদ্দিসে দেহলভী তাঁর 'আল-ইন্তিবাহ্ ফী সালা-সিলি আউলিয়া-ইল্লাহ'য় এ দু'টি কিতাবের সাথে 'মাজালিসে সিত্তীন' (ষাট মজলিস)-এর কথাও উল্লেখ করেছেন। 'কাশ্ফুয্ যুনূন' ও 'জালা-উল খাত্বির'-এও এ 'মাজালিস-ই সিত্তীন'-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সাইয়্যেদ আলাউদ্দীন তাহের জীলী বাগদাদী, যিনি খান্দানে ক্বাদেরিয়ার এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, তাঁর 'তাযকিরাহ্-ই ক্বাদেরিয়াহ'য় হুযূর গাউসে পাকের আরো সাতটি কিতাবের কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হলো- ১. আল্-ফাত্হুর রাব্বানী, ২. হিয্বু নাশাইল খায়রাত' ৩. আল ওয়াহবাতুর রাহমানিয়াহ্ ওয়াল ফুতূহাতুর রাব্বানিয়্যাহ্, ৪. সিররুল আসরার, ৫. রদ্দুর রাফাযাহ্, ৬. তাফসীরুল ক্বোরআনিল আযীম (২য় খণ্ড) ও ৭. ইল্মুর রিয়াযী সম্পর্কি একটি অসমাপ্ত কিতাব। তিনি আরো বলেছেন যে, নির্ভরযোগ্য বর্ণনাদি থেকে জানা যায় যে, হযরত গাউসে আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সর্বমোট ৬৯টি কিতাব লিখেছেন। ফাত্ওয়া প্রণয়নেও হুযূর গাউসে পাক দক্ষহস্ত। তিনি হাম্বলী মাযহাব অনুসরণ করলেও অন্যান্য মাযহাবগুলো অনুসারেও তিনি তাৎক্ষণিকভাবে সঠিক ফাত্ওয়া প্রণয়ন ও আরোপ করতেন। তাছাড়া, হুযূর গাউসে পাক ছিলেন কাব্যচর্চা ও রচনায় অত্যন্ত পারদর্শী। তাঁর 'ক্বসীদাহ্-ই লা-ইয়্যাহ্' বা 'ক্বসী-দাহ্-ই গাউসিয়াহ্' নামে প্রসিদ্ধ

দুনিয়ার সর্বত্র গ্রহণযোগ্য। 'ক্বসীদা-ই বা-ইয়্যাহ্ নামে তাঁর আরো একটি ক্বসীদাহ্ও রয়েছে বলে ইমাম ইয়াফি'ঈ তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন।

মোটকথা, তাঁর লিখিত কিতাবগুলো, ক্বসীদা এবং ইরশাদ ও ওয়ায-নসীহতগুলো জ্ঞান ও হিদায়তের উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা হিসেবে প্রমাণিত।

ওফাত শরীফ

ইমাম হাফেয ইবনে কাসীর 'আল- বিদায়াহ্ ওয়ান্ নিহায়াহ্'য় এবং ইমাম ইয়াফি'ঈ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি 'মিরআতুল জিনান-'এ হুযূর গাউসে পাকের ওফাত শরীফের সাল উল্লেখ করেছে ৫৬১ হিজরী। হযরত মাওলানা আবদুর রহমান জামী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি 'নাফহাতুল উন্স'-এও তাঁর ওফাতের সাল ৫৬১হিজরী লিখেছেন। হুযূর গাউসে পাকের শাহযাদা হযরত শায়খ আবদুল ওয়াহ্হাব রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হির উক্তি উক্ত কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বলেছেন, রবিউল আখির মাসে হুযূর গাউসে পাকের ওফাত হয়েছিলো। হযরত আবুল মা'আলী খায়রুদ্দীন (ওফাত ১০২৪হি.) তাঁর কিতাব 'তোহ্ফা-ই ক্বাদেরিয়া'য় লিখেছেন, ১৭ রবিউল আখির ৫৬১হিজরী হুযূর গাউসে পাক ওফাতবরণ করেছেন। এ অভিমতই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। আল্লাহ্ পাক চিরদিন তাঁর উপর রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করুন।

মাযার শরীফ

হুযূর গাউসে পাক আপন বরকতময় জীবদ্দশায় বেশীরভাগ সময় বাগদাদ শরীফেই অতিবাহিত করেন। সুতরাং বাগদাদ শরীফেই তাঁর মাযার শরীফ অবস্থিত। শুধু সাধারণ মানুষ নয়; বরং বড় বড় মাশাইখ, আক্বতাব ও মহামর্যাদাবান ব্যক্তিবর্গ মাযার শরীফের যিয়ারত করে থাকেন এবং অবর্ণনীয়ভাবে ফয়েযপ্রাপ্ত হচ্ছেন। আল্লাহ্ পাক প্রত্যেক মুসলমানকে হুযূর গাউসে আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর ফুয়ূয ও বরকাত এবং মাযার শরীফের যিয়ারত নসীব করুন। আ-মী-ন।

পরিশেষে, এ নাজুক পরিস্থিতিতে হুযূর গাউসে পাকের প্রতি পূর্ণ ভক্তি ও ভালবাসা বুকে ধারণ করে তাঁর আদর্শ গ্রহণ ও বাস্তবায়নই হবে সবার জন্য উভয় জাহানে মঙ্গলজনক। আল্লাহ্! তাওফীক্ব দিন, আমীন।।

গেয়ারভী শরীফের উৎপত্তি

এ প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত কতিপয় অভিমত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য-

এক. উপমহাদেশের সর্বজন বরণীয় মুহাদ্দিস হযরত শায়খ আবদুল হক্ব মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন-

فِىْ دِيَارِنَا هٰذَا الْيَوْمُ الْحَادِىْ عَشَرَ وَهُوَ الْمُتَعَارِفُ عِنْدَ مَشَآئِخِنَا مِنْ اَهْلِ الْهِنْدِ وَقَدِ اشْتَهَرَ فِىْ اَوْلَادِهٖ - (ماثبت بالسنة عربى : ص ٢٨)

অর্থাৎ নিশ্চয় আমাদের এ পাক-ভারত উপমহাদেশে আমাদের মাশা-ইখের মধ্যে গেয়ারভী শরীফ প্রচলিত। আর তা হুযূর গাউসে পাকের বংশধরদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে। [মা- সাবাতা বিস্‌সুন্নাহঃ পৃ. ৬৮]

দুই. শায়খ আমান উল্লাহ্ পানিপথী (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি)-এর জীবনী লিখতে গিয়ে শায়খ মুহাক্বক্বিক্ব দেহলভী বর্ণনা করেন-

یازدہم ماہ ربیع الاخر عرس غوث الثقلین کرد-(اخبار الاخیار:ص۲۵۲)

অর্থাৎ ১১ রবিউস সানী তিনি গাউসে পাক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর ওরস শরীফ পালন করেছেন।

তিন. আল্লামা বরখোরদার, মুহাশ্‌শী-ই নিব্‌রাস তাঁর রচিত কিতাব 'সীরাতে গাউসে আ'যম'-এর ২৭৬ নং পৃষ্ঠায় গেয়ারভী শরীফের উৎপত্তি সম্পর্কে বর্ণনা করে বলেন, পীর আব্দুর রহমানও গেয়ারভী শরীফ সম্পর্কে লিখেছেন, হুযূর গাউসে পাক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু প্রত্যেক মাসের ১১ তারিখ হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ওরস শরীফ পালন করতেন। এ কারণে তিনি অর্থাৎ পীর আব্দুর রহমান প্রত্যেক মাসের ১১তারিখে গাউসে পাকের অনুসরণে গেয়ারভী শরীফ পালন করতেন। যেহেতু এ গেয়ারভী শরীফ গাউসে পাকের দিকে সম্পৃক্ত হয়েছে সেহেতু তাসবীহে ফাতেমীর মতো এটাও গাউসে পাকের গেয়ারভী হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়েছে।

চার. পাক-ভারত উপমহাদেশে হাদীসের ওস্তাদ আল্লামা শায়খ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি তাঁর 'মালফূযাতে আযীযিয়া'র ৬২ নং পৃষ্ঠায় হুযূর গাউসে পাকের এ গেয়ারভী শরীফ সম্পর্কে বলেন, হুযূর গাউসে পাকের রওযা মুবারকে প্রতি মাসের এগার তারিখে রাষ্ট্র প্রধান হতে শুরু করে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ উপস্থিত হয়ে আসরের নামাযের পর হতে মাগরিব পর্যন্ত কালামুল্লাহ্ শরীফ তেলাওয়াত করতেন। এরপর হুযূর গাউসে পাকের শানে গযল এবং মানক্বাবাত (জীবনী) পাঠ করতেন। মাগরিবের পর দরবারে পাকের সাজ্জাদানশীন তাশরীফ আনতেন এবং তাঁর আশেপাশে ভক্ত ও মুরীদরা সারিবদ্ধ হয়ে বসে উচ্চস্বরে যিকরে মশগুল হতেন। যিকরের এক পর্যায়ে তাদের কারো কারো মধ্যে 'হাল' (অস্বাভাবিক মুর্চ্ছনাময় অবস্থা) সৃষ্টি হতো। পরিশেষে, মুনাজাত ও দো'আর পর শিরনী ও তাবার্‌রুক বণ্টন করা হতো এবং এশার নামাযের পর সবাই বিদায় গ্রহণ করতেন।

পাঁচ. এভাবে বাদশা আলমগীরের ওস্তাদ শায়খ আহমদ মোল্লা জীবন 'তাফসীরাতে আহমদিয়া'য়, তাঁর ছেলে 'ওয়াজীযুস্ সীরাত'-এ, আল্লামা গোলাম সারওয়ার লাহোরী, 'খাযীনাতুল আসফিয়া'য়, দারশিকো 'সফীনাতুল আউলিয়া'য়, শায়খ আব্দুল হক্ব মুহাদ্দিস দেহলভী 'আখবারুল আখইয়ার'-এ, শাহ্ আব্দুল

মু'আলী 'তুহ্‌ফায়ে ক্বাদেরীয়া'য়, চতুর্দশ শতাব্দির মুজাদ্দিদ এবং শেষ যুগের আবূ হানীফা আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত শাহ্ মাওলানা আহমদ রেযা খান বেরলভী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ফাতাওয়া-ই রেযভিয়া'য় এবং তাঁর খলীফা হযরত যোফর উদ্দীন বিহারী 'ওরস কী শর'ঈ হায়সিয়াত'-এ গেয়ারভী শরীফের গুরুত্ব ও বৈধতার পক্ষে বহু প্রমাণ সহকারে আলোচনা করেছেন।

ছয়. দেওবন্দী আলিমদের পীর-মুর্শিদ হাজী এমদাদুল্লাহ্ মুহাজিরে মক্কী বর্ণনা করেন, "বর্তমানে প্রচলিত ঈসালে সাওয়াবের প্রথা কোন গোত্রের জন্য নির্দিষ্ট নয়, হুযূর গাউসে পাকের গেয়ারভী শরীফ চান্দ্রমাসের দশম তারিখে, অনুরূপ ২০তম, ৪০তম, ষান্মাসিক ও বার্ষিক ওরস ইত্যাদি হযরত শায়খ আহমদ আবদুল হক্ব রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র তোশাহ্, হযরত শাহ্ বূ-আলী ক্বলন্দর রাহমাতুল্লাহি আলায়হির ছেমনী, শবে বরাতের শিরনী এবং ঈসালে সওয়াবের অন্যান্য পদ্ধতির ভিত্তি হচ্ছে- এ নিয়মই- "মুসলমানরা যা ভাল মনে করবে তা আল্লাহর দৃষ্টিতেও ভাল।" [ফায়সালা-ই হাফ্ত মাস্‌আলা , পৃ. ৮]

সাত. হযরত শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বর্ণনা করেন, আর্থিক ইবাদত দ্বারা মৃত ব্যক্তিদের উপকার এবং সাওয়াব হাসিল হয়। [জামে'উল বরকাত]

আট. ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলসহ সকল বুযুর্গের অভিমত হচ্ছে- মৃতব্যক্তির রূহে সাওয়াব পৌঁছে। [শরহে ফিক্বহে আকবর, কৃত. মোল্লা আলী ক্বারী]

নয়. আল্লামা কাযী সানাউল্লাহ্ পানিপথী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেন, সমস্ত ফিক্বহ্ বিশারদের মতে, ইবাদতের সাওয়াব মৃত ব্যক্তিদের নিকট পৌঁছে। [তাযকিরাতুল মাউতা ওয়াল কুবূর]

দশ. শায়খ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী তাঁর 'ফাতাওয়া-ই আযীযিয়া'য় ফাতেহা পড়ে মৃত ব্যক্তিদের রূহের উপর বখশিশ করা মৌলিকভাবে বৈধ বলে মত প্রকাশ করেন। শুধু তা নয়- ওহাবীদের গুরু মৌং ইসমাঈল দেহলভী তার 'সেরাতে মুস্তাক্বীম' ঃ পৃষ্ঠা ৬৪, আশরাফ আলী থানভী 'আত্-তাযকীর'ঃ ৩য় খণ্ডঃ পৃষ্ঠা ৫৫ এবং রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী তাযকিরাতুর রশীদঃ পৃষ্ঠা ২৬-এ ঈসালে সাওয়াব বৈধ হওয়াকে সমস্ত সাহাবী এবং ইমামের মাযহাব বলে স্বীকার করেছেন।

এগার. হুযূর গাউসে পাক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর গেয়ারভী শরীফসহ অন্যান্য বুযুর্গানে দ্বীনের যে ওরস শরীফ বিশ্বের মুসলমানরা পালন করে থাকে, তা প্রথমতঃ নেক আমল, দ্বিতীয়তঃ ইসলামের উপর তাদের অনস্বীকার্য অবদানের স্মরণ, যা ফাতিহা- নেয়াযের মাধ্যমে করা হয়।

কিন্তু ওহাবী মতবাদীরা গেয়ারভী শরীফকে বিদ'আত বলে বেড়ায়। তারা শুধু উপরোল্লেখিত সকল ইমাম, মুহাদ্দিস ফোক্বাহা এবং বুযুর্গানে দ্বীনকে বিদ'আতী বলেছেন তা নয়, তারা তাদের মুরব্বীদেরকেও বিদ'আতী বানিয়ে ছাড়লেন।

কারণ, তাদের দেওবন্দী মুরব্বীদের মধ্যে মৌলভী হুসাইন আহমদ মাদানীও গেয়ারভী শরীফ সম্পর্কে লিখেছেন-

گیارھویں شریف کے کھانے میں اگر نیت ہے کہ اس میں ایک حصہ ایصال ثواب کیلئے ہے
دوسرا اہل خانہ واحباب کیلئے ہے تو یہ کھانا غیر فقراء کو بھی جائز ہوگا -(مکتوبات شیخ الاسلام)

অর্থাৎ গেয়ারভী শরীফের খাবারের বেলায় যদি এ নিয়ত থাকে যে, তার একাংশ ঈসালে সাওয়াবের জন্য এবং বাকী অংশ পরিবার-পরিজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের জন্য হবে, তাহলে তা গরীব-মিসকীন ছাড়া অন্যান্যদের জন্যও খাওয়া জায়েয হবে। (মাকতুবাতে শায়খুল ইসলামঃ ১ম খণ্ড পৃ. ২৮১) তাছাড়া, ১৭ ফেব্রুয়ারী ও ৯ জুন, ১৯৬১ইং দেওবন্দীদের সাপ্তাহিক পত্রিকা 'খোদ্দামুদ্দীন', লাহোর সংখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে-

ہم میں سے ہر شخص جمعرات کو ذکر جہر سے پہلے گیارہ مرتبہ قل هو الله احد شریف پڑھ کر
حضور غوث الاعظمؓ کی روح کو اسکا ثواب پہنچاتا ہے یہ ہماری گیارھویں ہے

অর্থাৎ আমাদের সবাই প্রতি বৃহস্পতিবার উচ্চস্বরে যিক্‌র করার পূর্বে এগারবার করে সূরা ইখলাস পড়ে হুযূর গাউসুল আ'যম রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র রূহ মুবারকে তার সওয়াব পৌঁছিয়ে দিই। এটাই আমাদের গেয়ারভী শরীফ।

গেয়ারভী শরীফের ফজিলত

হুযূর গাউসে আ'যম যেমন অনন্য, তাঁর গেয়ারভী শরীফের ফযীলতও বর্ণনাতীত। গাউসে পাকের গেয়ারভী শরীফ পাঠ করা বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলার রহমত, সম্মানিত নবীগণ ও ওলীগণের ফুয়ূযাত, বরকাত ও তাঁদের শুভদৃষ্টি লাভের একটি ওসীলা। [মানাক্বিবে গাউসিয়া, ক্বালাইদুল জাওয়াহির]

প্রথম ফযীলত

শাহ্ ওলী উল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলভী মুযহেরে জানে জাঁনা'র মকতূবাত থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি স্বপ্নে একটা উঁচু জায়গা দেখলাম, যেখানে অনেক ওলী বৃত্তাকারে বসে মোরাক্বাবা করছেন। তাঁদের মধ্যে হযরত বাহাউদ্দীন নক্বশবন্দ এবং হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হিকে হেলান দিয়ে বসা অবস্থায় দেখলাম। তাঁরা আল্লাহর ধ্যানে বিমুগ্ধ অবস্থায় রয়েছেন। আমি তাঁদেরকে বললাম, "আপনাদের একি ঘটনা?" তাঁদের মধ্যে একজন বললেন, "হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে এস্তেক্ববাল করার জন্য যাচ্ছি।" হযরত আলীর সাথে এক ব্যক্তি রয়েছেন, যিনি চাঁদর মুড়ি দিয়ে আছেন। আমি বললাম, "ইনি কে?" উত্তর আসলো, "তিনি হযরত ওয়াইস্ ক্বরনী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি।" এরপর একটি হুজুরা শরীফের মধ্যে সব ওলী প্রবেশ করলেন,

যেখানে আল্লাহর নূর বিচ্ছুরিত হচ্ছে। তন্মধ্যে একজন বুযুর্গ বললেন, "আজকে গাউসে পাকের গেয়ারভী শরীফ পালিত হচ্ছে। সেখানে উপস্থিত হবার জন্য এসব ওলী উপস্থিত হচ্ছেন।" [কালেমা তাইয়্যেবাহ্, কৃত. শাহ ওলী উল্লাহ্ দেহলভী]

দ্বিতীয় ফযীলত

হযরত মাওলানা ওয়াহিদ ক্বাদেরী 'মীলাদে শায়খ' কিতাবে বর্ণনা করেন, গেয়ারভী শরীফের ফযাইল ও কামালাত বে-শুমার। আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি নিয়মিতভাবে গেয়ারভী শরীফ নিশ্চিতভাবে পালন করে তার কোন অভাব থাকে না। সাথে সাথে আধ্যাত্মিকতায়ও উন্নতি লাভ করে।

তৃতীয় ফযীলত

এক ব্যক্তি গেয়ারভী শরীফের বরকতে দোযখ থেকে রক্ষা পেয়ে বেহেশতী হয়ে গেল; এমনকি চিতার আগুনও তাকে জ্বালাতে পারেনি। মাওলানা ক্বারী এমাত আলভী ক্বাদেরী বর্ণনা করেন, হিন্দুস্তানের বোরহানপুরে, আমাদের বাড়ীর নিকট এক হিন্দু গাউসে পাকের ভক্ত ছিলো। সে প্রত্যেক মাসের ১১ তারিখে খাবার তৈরি করে গাউসে পাকের গেয়ারভী শরীফে পেশ করতো এবং গরীব-মিসকীনদের মধ্যে তা বন্টন করতো। যখন ওই ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলো, তখন হিন্দুরা তাদের প্রথা অনুযায়ী তাকে জ্বালানোর জন্য শ্মশানে নিয়ে গেলো। তারা তাকে আগুন দিয়ে জ্বালানোর জন্য খুব চেষ্টা করলো। কিন্তু আগুন তাকে জ্বালায়নি। অনন্যোপায় হয়ে হিন্দুরা তাকে এক নদীতে ভাসিয়ে দিলো। ইতোমধ্যে এক দরবেশকে হুযূর গাউসে পাক স্বপ্নে নির্দেশ দিলেন- 'অমুক জায়গায় এক হিন্দু আমার আওলাদের হাতে গোপনে মুসলমান হয়েছিলো, মনেপ্রাণে ইসলামের প্রতি আশেক্ব ছিলো সে অতি গোপনে আমার ক্বাদেরিয়া তরীক্বার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলো। এখন সে মৃত্যুবরণ করেছে। তুমি গিয়ে তার কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করো।' ওই দরবেশ হিন্দুস্তানের বোরহানপুরে এসে ওই লাশ সংগ্রহ করে ইসলামী তরীক্বায় তা দাফন করলেন। [মানাক্বিবে গাউসিয়া ইত্যাদি]

চতুর্থ ফযীলত

গেয়ারভী শরীফের মধ্যে গাউসে পাকের ওই ওয়াদার প্রতিফলন রয়েছে, যা তাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা দিয়েছেন- 'তোমার মুরীদদের মধ্যে কাউকেও আমি দুনিয়া ও আখেরাতের কোন আগুনে বন্দী করব না।'

[তাফরীহুল খাত্বির, ফুয়ূযাতে রাব্বানিয়া, মাযহারে জামালে মোস্তফাঈ]

পঞ্চম ফযীলত

যারা গেয়ারভী শরীফ পালন করবে তাদের রক্ষার জন্য গাউসে পাক যামিন। 'হাক্বীক্বতে যিন্দেগী' নামক পুস্তিকায়, যার শামসুল হক দেওবন্দী আফ্‌গানী

সত্যায়ন করেছেন, উল্লেখ করা হয়েছে- হুযূর গাউসে পাক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু হাসানী এবং হোসাইনী। এ নূরানী দু' ধারার ফযীলতে তিনি অনন্য আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী হয়েছেন। এ প্রভাবে তিনি কয়েক বছরের ডুবন্ত বরযাত্রীসহ নব দুলহা ও দুলহানকে পুনরায় জীবিতাবস্থায় দাজলা নদী হতে বের করে এনেছিলেন, যাদের শরীর পানিতে টুকরা টুকরা হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিলো। এসব কিছু করতে গাউসে পাক সক্ষম হয়েছেন এজন্য যে, তিনি ফয়যে মুহাম্মদী ও আলে মুহাম্মদীর বরকতের অধিকারী ছিলেন। উক্ত ঘটনাটি প্রসিদ্ধ ও প্রামাণ্য কিতাবের মধ্যে রয়েছে।

ওই নব দুলহার নাম কবীর উদ্দীন, প্রকাশ 'শাহ্ দুলহা'। পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের গুজরাটে তাঁর মাযার অবস্থিত। হুযূর গাউসে পাকের দো'আর বরকতে সে ছয়শ' বছর হায়াত পেয়েছে।

ষষ্ঠ ফযীলত

মাসিক 'আস্তানা-ই দেহলী'র এক সংখ্যায় (১৯৫৪ইং) উল্লেখ করা হয়েছে যে, লাহোরে শিখদের রাজত্বকালে রনজিৎ সিং এক ক্ষমতাবান শাসক ছিলেন। এক হিন্দু পরিবার গাউসে পাক ও গেয়ারভী শরীফের ভক্ত ছিলো। প্রতিবেশী এক বদ-আক্বীদা সম্পন্ন খারেজী ওই হিন্দুর স্ত্রীর উপর কুদৃষ্টি দিল এবং সে সুযোগের সন্ধানে ছিলো। একদা ওই হিন্দু তার স্ত্রীকে নিয়ে তার শ্বশুর বাড়ি যাচ্ছিলো। ওই খারেজী সংবাদ পেয়ে তাদের পিছনে ঘোড়া নিয়ে ছুটলো। জঙ্গলে গিয়ে তাদের সাক্ষাৎ পেলো। ওই হিন্দু ও তার স্ত্রী পায়ে হেঁটে যাচ্ছিল। তখন ওই বদ-আক্বীদা সম্পন্ন লোকটি হিন্দুকে বলল, ''তোমার স্ত্রীকে আমার ঘোড়ার উপর উঠিয়ে দাও।'' এতে হিন্দু লোকটি রাজী হলো না। খারেজী চাপ সৃষ্টি করতে লাগলো এবং ওই মহিলাকে বলল, ''শুধু শুধু এত কষ্ট করে পায়ে হেঁটে যাওয়ার দরকার কি? আমার ঘোড়ার উপর আরোহণ করো।'' কিন্তু মহিলাটিও রাজী হয়নি। ওই খারেজী বারবার চাপ সৃষ্টি করতে থাকলে হিন্দু লোকটি বললো, ''তোমার নিশ্চয়তা কি? যদি তুমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে অন্য কোথাও চলে যাও। এ জন্য কাউকে যামিন পেশ করো।'' তখন ওই বদ-আক্বীদা সম্পন্ন লোকটি বললো, ''আমি এ জঙ্গলের মধ্যে যামিন কোথায় পাবো?'' তখন মহিলাটি বললো, ''গেয়ারভী শরীফওয়ালা বড়পীরই তোমার যামিন হবেন।'' এ কথায় খারেজী রাজী হয়ে গেলো। মহিলাটি ঘোড়ায় আরোহণ করে ওই খারেজীর পেছনে বসলো। অতঃপর খারেজী তরবারি বের করে হিন্দুকে হত্যা করে তার স্ত্রীকে নিয়ে পালিয়ে যেতো লাগলো। তখন মহিলা পেছনের দিকে বারংবার তাকাচ্ছিলো। তখন ওই খারেজী বলতে লাগল, ''পেছনে কি দেখছো? তোমার স্বামীতো নিহত হয়েছে।'' তখন হিন্দু মহিলাটি বললো, ''আমি বড়পীরের দিকে দেখছি। তিনি আসছেন কি-না?''

ওই খারেজী বিদ্রূপ করে বললো, বড়পীর তো মৃত্যুবরণ করেছেন কয়েকশ' বছর আগে। ওই বড়পীর কি তোমাকে সাহায্য করতে পারবেন?'' কিছুক্ষণ পর দেখা গেলো দু'জন নেকাব পরিহিত ব্যক্তি উপস্থিত হলেন। তন্মধ্যে একজন ওই খারেজীকে হত্যা করলো। এরপর ওই মহিলা ঘোড়ার পাশে বসে রইলেন এবং মুখোশ পরিহিত ওই ব্যক্তি মহিলাকে নিয়ে ওই স্থানে আসলেন, যেখানে ওই হিন্দুর লাশ পড়ে রয়েছে। আর এ হিন্দুর মাথা নিয়ে তার মৃতদেহের সাথে একত্রিত করে বললেন, 'ক্বুম্ বিইয্নিল্লাহ্' (আল্লাহর হুকুমে ওঠ)।' এতে ওই হিন্দু জীবিত হয়ে গেলো। এরপর ওই দুই ব্যক্তি অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

হিন্দু তার স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ি ফিরলো। ওই ঘোড়াটি খারেজীর ওয়ারিশরা খালি দেখে ওই হিন্দু পরিবারের বিরুদ্ধে রনজিৎ সিং-এর আদালতে খুনের মামলা দায়ের করলো। তার প্রমাণ হিসেবে বললো যে, তাদের নিকট ওই ব্যক্তির ঘোড়া আছে। এ দুইজন আদালতে হাযির হয়ে পুরো ঘটনার বিবরণ দিলেন এবং ওই দু' নেকাব পরিহিত ব্যক্তির মধ্যে এক ব্যক্তিকে চিনেন বলে স্বীকারোক্তি দিলো। তিনি হলেন গুল মুহাম্মদ নামের একজন মজযূব দরবেশ, যিনি লাহোরে অবস্থান করেন। তখন আদালতে গুল মুহাম্মদ শাহ্ সাহেবকে তলব করা হলো। হযরত গুল মুহাম্মদ শাহ্ আদালতে এসে বললেন, ''অপরজন ছিলেন হুযূর গাউসুল আ'যম দস্তগীর, যাঁর যিম্মায় ওই মহিলা ওই খারেজীর ঘোড়ার উপর সাওয়ার হয়েছিলো এবং পেছনে তাকাচ্ছিলো- গাউসুল আ'যম কখন আসছেন সাহায্যের জন্য। তখন আমি ও গাউসে পাক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তার সাহায্যের জন্য উপস্থিত হয়ে ওই ভণ্ডকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়েছি। এটাই ছিলো ওই বদ-আক্বীদার উপযুক্ত শাস্তি। আর দম্পত্তি নিরপরাধ।'' তখন রনজিৎ সিং ওই দরবেশকে এবং এ হিন্দু স্বামী-স্ত্রীকে মামলা থেকে বেকসুর খালাস দিলেন এবং পুরস্কৃত করলেন।

সপ্তম ফযীলত

এক ব্যবসায়ীর কাজ-কারবার জাহাজের মাধ্যমে চলছিলো। কয়েকটি জাহাজে ভর্তি করে ব্যবসায়ী তার মাল সমুদ্র পথে পাঠালো। হঠাৎ করে ওই জাহাজ তার মালসহ সমুদ্রে ডুবে গেলো। কর্মচারীরা ব্যবসায়ীকে পত্র মারফত দুর্ঘটনার কথা জানালো। ব্যবসায়ী চিঠির উত্তরে লিখলো, ''তোমরা চিন্তা করো না। আমার পূর্ণ বিশ্বাস যে, আমার মাল নষ্ট হবে না। কেননা, আমি হুযূর গাউসে পাকের গেয়ারভী শরীফ পালন করি।'' এ চিঠি পাওয়া মাত্র ওই কর্মচারীরা পানিতে নিমজ্জিত জাহাজটির খোঁজ নিতে লাগলো। কিছুক্ষণ পর জাহাজটি মালামালসহ অক্ষত অবস্থায় সমুদ্র তীরে ভেসে উঠলো। তারা জাহাজের সামগ্রী বিক্রয় করে অনেক লাভবান হল। তখন ওই ব্যবসায়ী খুশী হয়ে হুযূর গাউসে পাকের জন্য গেয়ারভী শরীফের মাধ্যমে ফাতেহা-নেয়াযের ব্যবস্থা করলো। [মিলাদে শায়খঃ পৃ. ১১৭৯]

সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, গেয়ারভী শরীফও উম্মত-ই মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বরকত লাভের একটি বড় ওসীলা।

এ মাসের কিছু নফল এবাদত

২৫ ও ২৯ তারিখ এশার নামাযের পর দুই রাকাত বিশিষ্ট চার রাকাত নামায আদায় করার জন্য অনেক বুজুর্গানে দ্বীন উৎসাহিত করেছেন, যাতে অনেক কল্যাণ নিহিত।
এর প্রতি রাকাতে সূরা ফাতেহার সাথে পাঁচবার সূরা ইখলাছ দ্বারা এ নামায আদায় করবেন। অন্যান্য রাতেও অধিকহারে দরূদ শরীফ, তিলাওয়াত ও নফল নামায আদায়ান্তে গুনাহ্র ক্ষমা প্রার্থনা এবং বিশ্ব মুসলিমের ঐক্য ও সংহতির দোয়া করবেন।
বিশেষতঃ ১১তারিখ খতমে গাউসিয়া, গাউসে পাকের জীবনী আলোচনা, ওয়াজ মাহফিল এবং গরীব মিসকীনগণকে আহার করানোর ব্যবস্থা করে তার সাওয়াব গাউসে পাকের প্রতি প্রেরণের দোয়া করা অতঃপর নিজের জন্য, দেশ ও জাতির জন্য বিশেষ মুনাজাত করবেন।

মাহে জুমাদাল উলা

হিজরী বর্ষের এক তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হয়ে পঞ্চম মাস জুমাদাল উলা আসে। অন্যান্য মাসের মতো এ মাসেও বিভিন্ন ইবাদত-বন্দেগির মাধ্যমে আল্লাহর রহমত লাভ করা যায়।
এ মাসের নফল এবাদত ঃ এ মাসের চাঁদ উদিত হওয়ার পর রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন সাহাবীগণকে নিয়ে বাদে মাগরিব বিশ রাক'আত নফল নামায আদায় করেছেন বলে বর্ণিত রয়েছে।
দশবারে দুই রাক'আত বিশিষ্ট বিশ রাক'আত নামাযের প্রত্যেক রাক'আত সূরা ফাতেহার সাথে সূরা ইখলাস পাঠ করা উত্তম। নামায শেষ করে ১০০বার নিম্ন বর্ণিত দুরূদ শরীফ পাঠ করবেন-আল্লা-হুম্মা সাল্লি আ'লা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আ'লা আ-লি মুহাম্মাদিন কামা- সাল্লায়তা আ'লা ইব্‌রাহী-মা ওয়া আ'লা-আ-লি ইব্‌রাহীমা ইন্নাকা হামী-দুম্ মাজীদ। অতঃপর বিনয়ের সাথে আল্লাহর দরবারে দোয়া করবেন।
এছাড়া, এ মাসে অধিক হারে তেলাওয়াতে কোরআন, দরূদ শরীফ পাঠ, তাহাজ্জুদ এবং অন্যান্য সুন্নাত ও নফল এবাদতের মাধ্যমে খোদার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা ও তাওবা করবেন। বিশেষ করে এ মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ রোযা পালনের চেষ্টা করবেন।

মাহে জুমাদাল আ-খিরাহ্

হিজরি সনের ৬ষ্ঠ মাস 'জুমাদাল উখ্‌রা'। এ মাসে দার্শনিক ইমাম গাযালী, ফারসী কবি আল্লামা জালাল উদ্দীন রুমী, মুজাদ্দিদে আলফে সানির পীর ও মুরশিদ হযরত খাজা বাক্বী বিল্লাহ্ এবং বিখ্যাত সুফি হযরত আবু আহমদ আবদাল চিশতীসহ্ অনেক জ্ঞানী-গুণী এবং আল্লাহর বহু ওলীর ওফাত হয়েছে। বিশেষতঃ ইসলামের ইতিহাসে যে কারণে এ মাসটি বিশেষভাবে আলোচিত তা হল মুসলিম বিশ্বের প্রথম খলিফা, রাসূলুল্লাহর সুযোগ্য উত্তরসুরি নবীগণের পর সমগ্র মানব জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এ মাসের ২২ তারিখে (১৩ হিজরি সালে) ইন্তেকাল করেন। আরবের বিখ্যাত ক্বোরাইশ বংশের শাখা তাঈম গোত্রে ৫৭৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর আসল নাম আবদুল্লাহ্, পিতার নাম ওসমান বিন আমের, মাতার নাম সালমাহ্ বিনতে সখর ইবনে আমের। পিতা ওসমানের উপনাম আবূ কোহাফা। মাতা সালমার উপনাম উম্মুল খায়র। যুব বয়সে তাঁর বিয়ে হয় কৃতীলাহ্ বিনতে আবদুল ওয্যার সাথে। তাঁদের থেকে জন্ম লাভ করেন এক ছেলে আবদুল্লাহ্, এক মেয়ে আসমা। হিজরতের সংকটময় মুহূর্তে গারে সওর রাতের অন্ধকারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর জন্য খাবার পৌঁছানোর দুঃসাহসিক কাজে তিনি নিয়োজিত ছিলেন। তিন রাত অবস্থানের পর গারে ছওর হতে এয়াসরিব (মদিনা মুনাওয়ারাহ্) যাত্রাকালে হযরত আসমা বিনতে আবী বকরের অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও সহযোগিতার পুরস্কার স্বরূপ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ''যা'তুন নিত্বাক্বাইন'' খেতাবে ভূষিত করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্র ফুফাত ভাই আশরাহ-ই মোবাশ্‌শারার অন্যতম সদস্য হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র সহধর্মিনী ছিলেন। পরবর্তীতে হযরত আবূ বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু উম্মে রূমান বিনতে আ'মের ইবনে ওয়াইমার এর সাথে বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁদের ঘরে এক ছেলে আবদুর রহমান এবং এক মেয়ে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা জন্ম লাভ করেন। হযরত আয়েশা বিনতে আবী বকরের সাথে রাসূলুল্লাহর শাদী মোবারকের মাধ্যমে তিনি উম্মুল মু'মিনীন হওয়ার অনন্য গৌরব লাভ করেন। রাসূলুল্লাহ্র ওফাত শরীফ তাঁর কোলে এবং মাযার শরীফ তাঁর ঘরে হয়েছে। হিজরতের পরে মদীনায় এসে প্রথমে হাবীবা বিনতে খারেজা আল আনসারীকে হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বিয়ে করেন। এর পর হযরত আসমা বিনতে ওমায়সের সাথে তাঁর বিয়ে হয়। এ ঘরে শুধু মাত্র একটি ছেলে মুহাম্মদ ইবনে আবী বকরের জন্ম হয়।

নিম্নে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হলো

শতশত বছরের জাহেলিয়া বা ঘন অন্ধকার যুগের অবসান ঘটিয়ে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরবের ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের ক্ষেত্রে এক অপূর্ব বিপ্লব ও পরিবর্তন ঘটিয়ে বিশ্ববাসীর জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ দ্বীন ও সর্বোৎকৃষ্ট সমাজ ব্যবস্থা দিয়েছিলেন। তাঁরই যোগ্যতম উত্তরসূরী হিসেবে, উদ্ভূত সমস্ত প্রতিকূলতার সাথে কল্পনাতীতভাবে সফল মোকাবেলা করে ইসলামের মহান ত্রাণকর্তার আসনে আসীন হয়েছেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। হুযূর-ই আক্রামের ওফাত শরীফের সাথে সাথে যেসব জটিল সমস্যা দেখা দিয়েছিলো, সেগুলোর সফল মোকাবেলার জন্য হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্বের মত যোগ্য ব্যক্তিরই প্রয়োজন ছিলো। অসাধারণ যোগ্যতা বিশ্বনবীর দীর্ঘ সাহচর্যে প্রাপ্ত নির্ভুল শিক্ষা-দীক্ষা এবং সময়োচিত যথাযথ নির্ভীক পদক্ষেপের ফলে ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্র সম্ভাব্য চরম বিপর্যয় থেকে তখন রক্ষা পেয়েছিলো।

বস্তুত বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শে একদিকে যেমন ধর্মীয় দিকের চূড়ান্ত শিক্ষা বা দিক-নিদের্শনা রয়েছে, অন্যদিকে, তেমনি রাজনৈতিক দিকটির স্থায়ী ও কার্যকর শোভাও প্রস্ফূটিত হয়েছে। হুযূর-ই আক্রামের উত্তরসূরীদের মধ্যে এ উভয় দিকের যোগ্যতা ও দক্ষতা পরিলক্ষিত হয়। হযরত সিদ্দীক্ব-ই আক্বার এর উজ্জ্বল উদাহরণ।

বংশগত আভিজাত্য, নিষ্কলুষ উন্নত চরিত্র ও স্বভাবজাত অসাধারণ জ্ঞান ও দূরদর্শিতার ধারক ছিলেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। তাঁর নাম ও উপাধিগুলোতেও এসব বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠে। তাঁর নাম 'আবদুল্লাহ', উপনাম 'আবূ বকর', উপাধি 'সিদ্দীক্ব' ও 'আতীক্ব'। আরবের সর্বোৎকৃষ্ট বংশ ক্বোরাঈশের অন্যতম শাখা 'বনী তাঈম'-এ তাঁর জন্ম। পিতার ডাক নাম ক্বোহাফাহ্। আসল নাম ওসমান ও মাতার নাম উম্মুল খায়র সালমাহ্। হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দু'বছর পর ৫৭৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়। শৈশবকাল থেকে হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিলো। তাই বাল্যকাল থেকেই তিনি বিশ্বনবী আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের সাথী ও বন্ধু ছিলেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি হুযূর-ই আক্রামের সাথেই ছিলেন। এমনকি ইনতিক্বালের পরও রওযা-ই আক্বদাসে হুযূর-ই আক্বদাসের সাথেই রয়েছেন। বাল্যকাল থেকে তিনি উন্নত বিবেকসম্পন্ন ছিলেন। তাঁর মধুর ব্যবহার, আতিথেয়তা, পরোপকার, দয়ার্দ্রচিত্ততা ও জ্ঞান-বিচক্ষণতা ইত্যাদির সাথে সাথে নবী করীমের বরকতময় সান্নিধ্য তাঁর ভাগ্যে সোনায় সোহাগা হয়েছিলো।

তাঁর চরিত্রের স্বভাবগত পবিত্রতা এতেই প্রমাণিত হয় যে, ওই জাহেলী যুগেও তিনি কখনো মদ পান করেননি এবং ওই যুগের কোন মন্দ দিকই তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। ওই যুগে যে অল্পসংখ্যক লোকই লেখাপড়া জানতেন, হযরত আবূ বকর তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। বংশ পঞ্জী সম্পর্কে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিলো। তিনি কাপড়ের ব্যবসা করতেন। ক্বোরাইশ বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী ছিলেন। তাঁর ধন, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার জন্য তিনি আরব সমাজে অত্যন্ত প্রভাবশালী ও মর্যাদাবান ছিলেন। বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলামের খিদমত তথা বিশ্বনবীর ভালবাসায় তাঁর সর্বস্ব দান করেছিলেন। সব দিক বিবেচনায় তিনি সর্বসম্মতভাবে, নবীগণ আলায়হিমুস্ সালাম-এর পর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। বস্তুত নবী করীমের বরকতময় সান্নিধ্য, নবী করীমের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালবাসা ও আকর্ষণ তাঁকে সার্বিক যোগ্যতার শীর্ষে পৌঁছিয়েছিলো। এ কারণে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর ওফাত শরীফের পর তাঁরই যোগ্যতম খলীফা (প্রতিনিধি) হিসেবে তাঁকেই নির্বাচনের জন্য হিকমতপূর্ব ইঙ্গিত ও ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন। যেমন- হুযূর-ই আক্রাম তাঁর ওফাত শরীফের পূর্ববর্তী দিনগুলোতে নামাযের ইমামতির জন্য তাঁকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন। এটা তাঁর খিলাফতের দিকে স্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে যখন তাঁর খিলাফত নির্বাচন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো, তখন তিনি বলেছিলেন- যিনি হুযূর-ই আক্রামের নূরানী জীবদ্দশায় নামাযের মতো দ্বীনী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ইমামতের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন, রাজনীতির মত পার্থিব বিষয়ে তিনিই খলীফা হিসেবে নির্বাচিত হবেন। তাছাড়া, হুযূর-ই আক্রামের পর হযরত আবূ বকর ও হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা খলীফা হবেন মর্মে হুযূর আক্রামের ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট বর্ণনাও পাওয়া যায়। মোটকথা, তাঁর 'খিলাফত' ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য অত্যন্ত উপকারী, বরং একান্ত প্রয়োজনীয় বলে প্রমাণিত হয়েছে। প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যথার্থই বলেছিলেন, ("হুযূর-ই করীমের ওফাতোত্তর কালে) ওইরূপ মুসীবতের সময় হযরত আবূ বকরের মতো খলীফা না থাকলে ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্র কোনটাই রক্ষা পেতো না। অনিবার্য ধ্বংসের কবলে পড়ে যেতো ইসলাম ও মুসলিম সমাজ।" সুতরাং তিনি খলীফা হবার পূর্বে ও পরে ইসলামের খিদমতের জন্য যা কিছু করে গেছেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে ন্যায় সঙ্গতভাবে ইসলামের পরিত্রাণকর্তা বলা হয়।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু শুধু তাঁর নবীপ্রেমের সর্বোৎকৃষ্ট ও অপরিহার্য দৃষ্টান্তগুলোই কার্যক্ষেত্রে প্রদর্শন করেন নি, বরং ইসলামী রাজনীতি তথা ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্রকে অনিবার্য ধবংস ও বিপর্যয় থেকে রক্ষা

করেছিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাত শরীফের খবর প্রকাশ পাবার সাথে সাথে ইসলামী বিশ্বে যেসব প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিলো সেগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করলেও এ সত্য সামনে এসে যায়। যেমন-
১. সাহাবীগণ নিজের প্রাণের চেয়ে বেশী ভালবাসতেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে। সুতরাং তাঁর ওফাত শরীফের খবরটি শুনামাত্র সাহাবা-ই কেরাম শোকের সেই অসহনীয় অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন তা থেকে শান্ত্বনা দিয়ে তাঁদের মোটামুটি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনাও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিলো। ২. খলীফা নির্বাচন, ৩. ভণ্ড নবীদের আত্মপ্রকাশ, ৪. ধর্ম ত্যাগীদের বিদ্রোহ, ৫. যাকাত অস্বীকার কারীদের তৎপরতা, ৬. অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহসমূহ, ৭. হযরত উসামা ইবনে যায়দকে অভিযানে প্রেরণ, ৮. বহিঃশত্রুদের চক্রান্ত প্রতিহত করা, ৯. পবিত্র ক্বোরআনের সংরক্ষণ এবং ১০. ইসলামী রাষ্ট্রকে একটি স্থিতিশীল অবস্থার একটি মজবুত কল্যাণকর কাঠামোর উপর দাঁড় করানো ইত্যাদি। আল্লাহ্ তা'আলার অপার দয়ায় ও নবী করীমের কৃপাদৃষ্টিতে হযরত সিদ্দীক্বে আকবর অসাধারণ নবীপ্রেম, অদম্য সাহসিকতা ও অব্যর্থ দূরদর্শিতার মাধ্যমে সব ক'টি প্রতিকূলতার সাথে সফল মোকাবেলা করেছেন। তাঁর খিলাফতের প্রথম বছরেই তিনি এসব প্রতিকূলতা দূরীভূত করেছেন। তারপর তিনি অতি স্বল্পসময়ের মধ্যে ইসলামী রাষ্ট্রকে আরো সম্প্রসারিত করে, দশটি প্রদেশ ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক সুরক্ষিত সেনা ছাউনী স্থাপন করে দুর্ভেদ্য প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করে যান। যার ফলে দেশের ভিতরে ও বাইরে সকলের নিকট একযোগে একথা সুপ্রতিষ্ঠিত হয় যে, ইসলাম ধর্ম স্থায়ী হবার জন্যই এসেছে আর ইসলামী রাষ্ট্রও একটি অদৃশ্য শক্তি। এর উপর ভিত্তি করে ইসলামের বিজয় অব্যাহত থাকে ও গোটা বিশ্বে ইসলামের সৌন্দর্য ও কল্যাণ উদ্ভাসিত হয়েছে।

এখন তাঁর এসব অবদানের প্রকৃতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। এখানে সর্বাগ্রে লক্ষ্যণীয় যে, সিদ্দীক্ব-ই আক্বর প্রতিটি সমস্যার সমাধান দিয়েছেন নিরেট ইসলামী আদর্শের আলোকে। অর্থাৎ রাজনৈতিক সমস্যার মোকাবেলা নিছক রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে করেন নি; বরং প্রতিটি ক্ষেত্রে ধর্মীয় গুরুত্ব ও ধর্মীয় অনুশাসনকে সর্বাগ্রে সামনে রেখেই তিনি দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, ধর্মীয় দিককে গুরুত্ব দিতে গেলে যখন পার্থিব ক্ষতি, এমনকি নিজেদের অস্তিত্বও হুমকির সম্মুখীন হবার আশঙ্কা ছিলো, তখন তিনি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস রেখে ধর্মীয় দিকটিকেই প্রধান্য দিয়েছেন। এর ফলে বাস্তবেও তিনি সব ক'টি বিষয়ে অকল্পনীয়ভাবে সফলও হয়েছেন; যা পরবর্তীতে ঐসব উপদেষ্টা সাহাবীও স্বীকার করেছেন, যাঁরা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর সিদ্ধান্তের বিপরীত পরামর্শও দিয়েছিলেন।

ক্বোরআন মজীদ সংকলন

হযরত সিদ্দীক্ব-ই আকবারের এসব অবদানের কারণে তিনি ছিলেন ইসলামের পরিত্রাণকর্তা (Saviour of Islam)। তাঁর আরেকটি ঐতিহাসিক ও যুগান্তকারী অবদান হলো ক্বোরআন মজীদকে এক জায়গায় সংকলিত করে একটি গ্রন্থাকারে রূপদান করা। তাঁর খিলাফত লাভ পর্যন্ত পবিত্র ক্বোরআনের অগণিত হাফেয ছিলেন। তদুপরি, বিভিন্ন স্থানে এবং অনেক সাহাবীর নিকট পৃথক পৃথকভাবে পূর্ণাঙ্গ ক্বোরআনের বিভিন্ন অংশ বিভিন্নভাবে সংরক্ষিতও ছিলো। কিন্তু সিদ্দীক্ব-ই আকবারের খিলাফতকালে বিভিন্ন যুদ্ধে অনেক হাফেয-ই ক্বোরআন শহীদ হয়ে যাওয়ায় তিনি চিন্তিত হয়ে পড়লেন, এ কথা ভেবে যে, কখনো ক্বোরআন-ই করীমের কোন অংশ বিলুপ্ত হয়ে যাবে কিনা। এদিকে হযরত ওমর ফারূক্বও এ ব্যাপারে গভীরভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করে খলীফাতুর রসূলকে ক্বোরআন সংকলনের পরামর্শ দিলেন। সুতরাং তিনি সরকারীভাবে হযরত যায়দ ইবনে সাবিত (ওহী লেখক ও হাফিযে ক্বোরআন) রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুকে এ গুরু দায়িত্ব অর্পণ করেন। তিনিও অতি সতর্কতা ও দক্ষতার সাথে কাজটা সম্পন্ন করলেন। তিনি পূর্ণাঙ্গ ক্বোরআন মজীদকে সিপারা সিপারা করে, কাগজে লিখে সর্বপ্রথম একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থকারে তৈরী করলেন। খলীফা আজীবন সেটা নিজ দায়িত্বে সংরক্ষণ করেন, তারপর হযরত ওমর ফারূক্ব সেটা সংরক্ষণ করলেন। তিনি তাঁর ওফাতের পূর্বে উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার হাতে কপিটা অর্পণ করে যান। তারপর হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খলীফা হয়ে একান্ত প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে হযরত হাফসাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার নিকট থেকে কপিটা নিয়ে সেটা থেকে একটি নির্ভরযোগ্য কমিটির তত্ত্বাবধানে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক কপি করিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশে পাঠিয়ে দিলেন এবং সেটারই অনুসরণ করার নির্দেশ জারী করলেন আর বিভিন্ন জায়গায় তখনো রক্ষিত বিক্ষিপ্ত অংশগুলো সংগ্রহ করে জ্বালিয়ে ফেললেন এবং চিরদিনের জন্য ক্বোরআন পাককে একটি মাত্র গৃহীত নিয়মের উপর সংরক্ষিত করে দিয়ে যান। সর্বোপরি, কোনরূপ বিকৃতি কিংবা বিরোধ থেকে পবিত্র ক্বোরআন রক্ষা পেলো।

মোটকথা, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব সারাজীবন হুযূর-ই আক্রামের সঙ্গী হিসেবে রয়ে ইসলামের খিদমতে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর অবদানের স্বীকৃতি খোদ্ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম দিয়েছিলেন। তিনি এরশাদ করেন, ''আমি প্রত্যেকের ইহসানের বদলা (বিনিময়) দিয়ে দিয়েছি, কিন্তু আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)'র ইহসানগুলো আমার উপর রয়ে গেছে। তার প্রতিদান (বদলা) ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা দেবেন।'' তাঁর সার্বিক যোগ্যতা, চরিত্র সৌন্দর্য, জ্ঞান, রাষ্ট্র পরিচালনায় দক্ষতা, দূরদর্শিতা, নিষ্ঠা,

অকৃত্রিম নবীপ্রেম এবং অদম্য ও অতুলনীয় ঈমানী শক্তি ইত্যাদির কারণে তিনি সর্বসম্মতভাবে, নবীগণের পর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। তাই, পরবর্তী উম্মতের জন্য তাঁর আদর্শ একান্ত অনুকরণীয়। তিনি উম্মতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম -এর জন্য এ বাস্তব সত্যটা প্রতিষ্ঠা করে গেছেন যে, অদম্য ঈমানী শক্তি ও অকৃত্রিম রসূলপ্রেম নিয়ে সময়োচিত নিষ্ঠাপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করলে উভয় জাহানের সাফল্য অর্জন অনিবার্য। জাতির পুনর্গঠন ও ইসলামের প্রকৃত আদর্শকে অক্ষুণ্ন রেখে সবসময় এক অজেয় ইসলামী শক্তিকে অটুট রাখতে সিদ্দীক্ব-ই আকবারের আদর্শ অনুকরণে সফলতা একেবারে নিশ্চিত।

এ মাসের নফল এবাদত

প্রথম তারিখ প্রথম সন্ধ্যায় ১২ রাকাত নফল নামায আদায় করবেন। বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এ নামায আদায় করতেন। এ নামাযের দ্বারা পরম সৌভাগ্য ও পুণ্য অর্জন করার আশা করা যায়।

নামাযের নিয়ম ঃ প্রত্যেক বার দুই রাকাত বিশিষ্ট নিয়ত করবে এবং প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার সাথে তিনবার আয়াতুল কুরসী ও এগার বার সূরা এখলাস পাঠ করবেন।

চাঁদের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের সন্ধ্যায় দুই রাকাত করে বার রাকাত নামায আদায় করা যায়। প্রতি রাকাতে সূরা ফাতেহার সাথে পনের বার সূরা এখলাস পড়বেন। নামায আদায়কারীর সকল সগীরা গুনাহ মাফ করা হবে এবং আর্থিক সচ্ছলতা অর্জিত হবে বলে বর্ণিত।

মাসের ২০ তারিখের পর থেকে অবশিষ্ট দিনগুলো নফল রোযা রেখে রাতে বিশ রাকাত করে নফল নামায আদায় করা সাহাবা কেরামের আমলের অন্তর্ভূক্ত। নামাযের পর ১০০বার দরূদ শরীফ পড়ে মুনাজাত করবেন।

এ মাসের প্রত্যেক দিন ফজর ও মাগরীব নামাযের পর ১০০বার নিম্ন বর্ণিত দোয়াটি পড়লে পারিবারিক জীবনের সকল অশান্তি হতে খোদার রহমতে শান্তি অর্জিত হবে ইন্‌শাআল্লাহ।

হুওয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুমু ওয়া হুওয়াল গানিয়্যুল মাতীন।

হে আল্লাহ তোমার হাবীবের ওসীলায় আমাদের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ দান কর এবং উভয় জগতের সাফল্য নসীব কর। আ-মী-ন ॥

মাহে রজব

সম্মানিত মাসসমূহের অন্যতম মাহে রজব - আল্লাহর মাস বলে আখ্যায়িত। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ব থেকেই এ মাসটি সম্মানিত মাস হিসেবে চিহ্নিত। এ মাসে চরম কলহপ্রিয় আরবগণও তাদের যুদ্ধ-বিগ্রহ ঝগড়া-বিবাদ বন্ধ রাখতো। ইসলামে এ মাসকে আল্লাহর রহমতের মাসরূপে গণ্য করে এবং যুদ্ধ বিগ্রহ হারাম ঘোষণা করে। এ মাসে আমাদের আক্বা ও মাওলা হুযূরে আক্রাম সাল্লাল্লাহু

তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের মি'রাজ শরীফ অনুষ্ঠিত হয়। মি'রাজ শরীফ বিশ্বনবীর অনন্য মু'জিযা, যা এ মাসে সংগঠিত হয়েছিলো।

রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রজব মাসের অনেক ফজীলত সম্পর্কে এরশাদ করেন, এ মাসের প্রথম রাত্রি বৎসরের পাঁচটি পবিত্র রাত্রির অন্যতম। এই রাত্রিতে নফল নামায এবং নফল ইবাদত করা অতি উত্তম আমল। এ রাতে আল্লাহর দরবারে যা দু'আ করা হয় তা-ই কবুল হয়।

প্রথমে পবিত্র ক্বোরআনে খোদ্ মহান রব তাঁর হাবীবকে মি'রাজ শরীফ করানোর যে হিকমতপূর্ণ বর্ণনা দিয়েছেন তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাক। আল্লাহ্ জাল্লা শানুহূ এরশাদ ফরমায়েছেন-

سُبْحٰنَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى
الَّذِىْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ

উচ্চারণঃ সুবহা-নাল্লাযী- আসরা- বি'আবদিহী লায়্লাম মিনাল্ মাসজিদিল হারা-মি ইলাল মাসজিদিল আক্বসাল্লাযী- বা-রাক্না- হাওলাহূ- লিনু-রিয়াহূ- মিন্ আ-য়া-তিনা-, ইন্নাহূ হুয়াস্ সামী-'উল্ বাসী-র। [সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত-১]

তরজমা: পবিত্রতা তাঁরই জন্য, যিনি আপন বান্দাকে রাতারাতি নিয়ে গেছেন মসজিদ-ই হারাম থেকে মসজিদ-ই আক্বসা পর্যন্ত; যার আশে-পাশে আমি বরকত রেখেছি, যাতে আমি তাঁকে আপন মহান নিদর্শনসমূহ দেখাই; নিশ্চয় তিনি জানেন ও দেখেন। [তরজমা: কান্যুল ঈমান, বাংলা সংস্করণ]

বস্তুত এ আয়াত শরীফে আল্লাহ্ তা'আলা হুযূর করীমের মি'রাজের প্রতিটি স্তর ও ধরন এবং হিকমত বা রহস্যের কথা এরশাদ করেছেন। আয়াতের প্রতিটি অংশের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণেও তা ফুটে ওঠে।

তদুপরি, হুযূরের পবিত্র সত্তায়ও তিনটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান: বাশারী, মালাকী ও হাক্বক্বী (যথাক্রমে মানবীয়, ফিরিশতাসুলভ ও অনন্য বা প্রকৃত)। সুতরাং, মসজিদে হারাম থেকে বায়তুল মুক্বাদ্দাস পর্যন্ত বাশারিয়াতের মি'রাজ, এখান থেকে সিদ্‌রাতুল মুন্তাহা পর্যন্ত মালাকিয়াতের এবং এখান থেকে 'লা-মকান' পর্যন্ত হাক্বক্বী সূরতের মি'রাজ হয়েছে। যেখানে শুধু আল্লাহ্ তা'আলা ও হুযূরই ছিলেন। সূরা নাজম'সহ অন্যত্রও এ পবিত্র মি'রাজের কথা এরশাদ হয়েছে। বিশুদ্ধ হাদীসসমূহেও এ মহান ভ্রমণের বিস্তারিত বিবরণ এসেছে।

পরিশেষে, মি'রাজ শরীফ থেকে এ কথা সুস্পষ্ট হল যে, রসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র মি'রাজ শরীফ হচ্ছে একটি অসাধারণ মু'জিযা। এটা একদিকে আল্লাহ্ পাকের অসীম ক্ষমতার প্রমাণ বহন করে। অপরদিকে সৃষ্টিকুল সরদার মহানবীর মহান মর্যাদা প্রকাশ পায় এ অলৌকিক ঘটনায়। হুযূর যে সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ্'র সর্বাধিক প্রিয়, সর্বাধিক জ্ঞানী, সর্বাধিক ক্ষমতার

অধিকারী, আল্লাহ্‌'র প্রধানতম প্রতিনিধি এবং সশরীর অসাধারণ নূর, সর্বোপরি উম্মতের প্রতি অসাধারণ দয়া পরবশ ইত্যাদি তা বিশেষভাবে প্রমাণিত হয় মি'রাজ শরীফের অলৌকিক ঘটনায়। আল্লাহ্‌ পাকের বিশেষ ব্যবস্থাপনায় এ মি'রাজ বা অলৌকিক ভ্রমণ করানোর মধ্যে অগণিত হিকমত বা রহস্য নিহিত রয়েছে।

আসুন, আমরা হুযূরের মি'রাজ শরীফের ঘটনার প্রতিটি দিক নিয়ে সম্যক জ্ঞান অর্জন করে গভীরভাবে চিন্তা করি প্রতিটি বিষয় নিয়ে, কাজে লাগাই আমাদের মধ্যে খোদাপ্রদত্ত বিবেককে। তখন বুঝতে পারব আমরা কতই ধন্য এ মহান রসূলের উম্মত হতে পেরে। নবীর মহামর্যাদা ও অতুলনীয়তা অনুধাবনে আমরা আরো বেশি ধন্য হব। এ জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি তাদেরকেও যারা নবী পাককে তাদের মত মানুষ মনে করে, যারা হুযূরের নূরানিয়্যাতকে অস্বীকার করে, যারা নিজেদের মুসলমান দাবী করে কাফিরদের সূরে কথা বলে নবীর শানে বেআদবী করে। আল্লাহ্‌ পাক সবাইকে সত্য অনুধাবন করার শক্তি দিন, আমাদেরকেও ধন্য করুন ওই সব নি'মাত থেকে কিছু দান করে, যা' তাঁর হাবীবের মাধ্যমে ওই রাতে উম্মতের জন্য দান করেছেন। আ-মী-ন্।

রজব মাসের কতিপয় আমল

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর বর্ণনা মতে, রজব মাসের চাঁদ দর্শন করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'হাত মোবারক তুলে দোয়া করতেন- আল্লাহুম্মা বারিক ফী রজবাওঁ ওয়া শা'বানা ওয়া বাল্লিগনা ইলা রমদ্বান। এমাসের সর্বপ্রথম শুক্রবার (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) ইবাদত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ রাতকে লাইলাতুর রাগা-ইব বলা হয়। দু' রাক'আাত করে ১২ রাকাত নফল নামায আদায় করবেন এরাতে। প্রতি রাকাতের সূরা ফাতিহার সাথে ৩ বার সূরা ক্বদর (ইন্না আনযালনাহু ফী...) ও ১২বার সূরা ইখলাস পাঠ করবেন। অতঃপর নামায সমাপ্ত করে ৭০ বার পড়বেন-

আল্লা-হুম্মা সাল্লি 'আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিনিন্ নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি ওয়া আলা আ-লিহী ওয়াসাল্লাম। অতঃপর সাজদায় গিয়ে ৭০ বার পাঠ করবেন- সুব্বূহুন ক্বুদ্দুসুন রাব্বুনা ওয়া রাব্বুল মালা-ইকাতি ওয়ার্রূহ; অতঃপর মাথা তুলে বসে, আরো ৭০ বার উক্ত দো'আ পাঠ করবেন এবং আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করবেন।

এ মাসের ১৫ তারিখের রজনীকে 'লাইলাতুল ইস্তিফতাহ' বলা হয়। বর্ণিত আছে যে, এ রাত যেন স্রষ্টার করুণা প্রত্যাশীরা বিশেষভাবে নফল ইবাদতে অতিবাহিত করে। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি এ রাতে সূরা ফাতিহার সাথে ৩ বার সূরা ইখলাস দ্বারা ২রাকাত বিশিষ্ট ৭০ রাক'আত নামায আদায় করে তার জন্য অপরিসীম সাওয়াব প্রদানের আশ্বাস দেয়া হয়েছে।

লাইলাতুল মেরাজ তথা রজবের ২৬ তারিখ দিনগত ২৭ তম রজনীর গুরুত্ব ও

তাৎপর্য অশেষ। এ রাতে আঁ- হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহান রাব্বুল আলামীন স্বীয় দিদার দানের উদ্দেশ্যে ঊর্ধ্বলোকে নিয়ে গিয়েছিলেন। এ রাতে ইবাদতের অপরিসীম ফযীলত রয়েছে। বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে- যে ব্যক্তি এ রাতে ১২ রাকাত নফল নামায আদায় পূর্বক ১০০ বার করে দো'আয়ে ইস্তিগফার (আস্তাগ্‌ফিরুল্লাহ) কালিমায়ে তামজীদ ও দরূদ শরীফ পাঠ করে নিঃসন্দেহে আল্লাহ তার সমস্ত প্রার্থনা কবূল করবেন। আঁ- হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এ রাতে ইবাদত করে পরদিন রোযা রাখে তার আমলনামায় ১০০ বৎসর ইবাদতের সওয়াব লিপিবদ্ধ করা হবে।

রজব মাসের ঐতিহাসিক গুরুত্ব

হযরত মূসা আলাইহিস সালাম-এর সাথে আল্লাহ তা'আলা কালাম পূর্বক তাঁকে ধন্য করেন এ মাসের ১৫ তারিখ এবং হযরত ইদ্রিছ আলাইহিস সালামকে বেহেশ্‌তে উঠিয়ে নেয়ার তারিখও ১৫ই রজব। ২৮ রজব আঁ- হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নুবূয়ত প্রকাশ হয়। ১লা রজব হযরত নূহ আলাইহিস সালাম খোদার নির্দেশে কিশ্‌তীতে আরোহন করেছিলেন। ৬ রজব হযরত খাজা গরীব নাওয়ায রাহমাতুল্লাহি আলায়হি ওফাত বরণ করেন। ১২ রজব ইমামে আহলে সুন্নাত আল্লামা গাযী আযীযুল হক শেরে বাংলা আলায়হির রাহমাহ্‌'র ওফাত দিবস।

মি'রাজুন্নবীঃ বিশ্বনবী

সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম -এর

অতুলনীয় মু'জিযা

আমাদের আক্বা ও মাওলা নবীকুল শিরমনি, রসূলকুল শ্রেষ্ঠ রহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হলেন আপাদমস্তক শরীফ মু'জিযা। আল্লাহ্‌ পাক জাল্লা শানুহূ তাঁর হাবীবকে সবদিক দিয়ে অতুলনীয় করে সৃষ্টি করেছেন। মি'রাজ শরীফ অর্থাৎ তাঁর ঊর্ধ্বলোকে গমন ও আল্লাহ্‌ পাকের সাথে আলম-ই লা-মকানে সশরীরে সাক্ষাৎ করে রাতের একটি অতি ক্ষুদ্রাংশে পুনরায় ফিরে আসা এবং তাতে অগণিত হিকমত বা রহস্যের সমাবেশ ঘটা ছিল তাঁরই একটি অনন্য মু'জিযা। এ মু'জিযার বাস্তব অবস্থা ও হিকমত কি- তা তো পূর্ণাঙ্গভাবে জানেন যে মহান রব আপন হাবীবকে মি'রাজ করিয়েছেন, আর তাঁর একান্ত অনুগ্রহক্রমে জানেন যাঁকে এ মু'জিযার ধারক করা হয়েছে, অর্থাৎ খোদ্ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম। তবুও পবিত্র ক্বোরআন মজীদ ও সহীহ হাদীস শরীফ ইত্যাদির আলোকে যতটুকু কিতাবাদিতে বিধৃত হয়েছে তা থেকে কিছুটা সংক্ষেপে আলোচনা করার প্রয়াস পেলাম।

প্রথমে পবিত্র ক্বোরআনে খোদ্ মহান রব তাঁর হাবীবকে মি'রাজ করানোর যে

হিকমতপূর্ণ বর্ণনা দিয়েছেন তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাক। আল্লাহ্ জাল্লা শানুহূ এরশাদ ফরমায়েছেন-

سُبۡحٰنَ الَّذِیۡ اَسۡرٰی بِعَبۡدِهٖ لَیۡلًا مِّنَ الۡمَسۡجِدِ الۡحَرَامِ اِلَی الۡمَسۡجِدِ الۡاَقۡصٰی
الَّذِیۡ بَارَکۡنَا حَوۡلَهٗ مِنۡ اٰیَاتِنَا اِنَّهٗ هُوَ السَّمِیۡعُ الۡبَصِیۡرُ

উচ্চারণঃ সুবহা-নাল্লাযী- আসরা- বি'আবদিহী লায়লাম মিনাল্ মাসজিদিল হারা-মি ইলাল মাসজিদিল আক্বসাল্লাযী- বা-রাক্না- হাওলাহূ- লিনু-রিয়াহূ- মিন্ আ-য়া-তিনা-, ইন্নাহূ হুয়াস্ সামী-'উল্ বাসী-র। [সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত-১]

তরজমা: পবিত্রতা তাঁরই জন্য, যিনি আপন বান্দাকে রাতারাতি নিয়ে গেছেন মসজিদ-ই হারাম থেকে মসজিদ-ই আক্বসা পর্যন্ত; যার আশে-পাশে আমি বরকত রেখেছি, যাতে আমি তাঁকে আপন মহান নিদর্শনসমূহ দেখাই; নিশ্চয় তিনি জানেন ও দেখেন। [তরজমা: কান্যুল ঈমান, বাংলা সংস্করণ]

বস্তুত এ আয়াত শরীফে আল্লাহ্ তা'আলা হুযূর করীমের মি'রাজের প্রতিটি স্তর ও ধরন এবং হিকমত বা রহস্যের কথা এরশাদ করেছেন। আয়াতের প্রতিটি অংশের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণেও তা ফুটে ওঠে। সুতরাং দেখুন-

আয়াতের প্রথমাংশে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন- **'সুবহা-না ল্লাযী'** (পবিত্রতা ওই সত্তার) এ মহান ঘটনাকে আল্লাহ্ তা'আলা আপন 'পবিত্রতা'র ঘোষণা দিয়ে বর্ণনা করেছেন। আর এ কথা সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন যে, তিনি আপন মাহবূবকে রাতের একটি ক্ষুদ্রাংশে ঊর্ধ্বলোকে নিয়ে যেতে এবং মি'রাজ করিয়ে ফিরিয়ে আনতে অক্ষম নন। সব ধরনের অক্ষমতা থেকে তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র। অতঃপর এরশাদ করেছেন-

'আসরা- বি'আবদিহী-' (যিনি নিয়ে গেছেন আপন বান্দাকে)ঃ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা 'আসরা' বলেছেন। কেননা, এ শব্দ থেকে আনন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। আর 'বি'আবদিহী'র 'বা' (অব্যয়) পদটি একথা প্রকাশ করছে যে, এ ভ্রমণ করানোর সময় যিনি ভ্রমণ করাচ্ছেন (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা) যাকে সফর করাচ্ছেন (অর্থাৎ হুযূর-ই আক্রাম)-এর সাথে সাথে ছিলেন। 'বা' অব্যয়টি 'মুসাহাবাহ্' বা সঙ্গ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত। অবশ্য এ 'সঙ্গে থাকা' এমন কোন প্রকার-আকার আকৃতি থেকে পবিত্র ছিল, যাকে ইন্দ্রিয়শক্তি অনুধাবন করতে পারে। (অর্থাৎ যেভাবে শোভা পায়)। 'আব্দ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে সম্বন্ধ পদ হিসেবে, যা **'ہ'** (সর্বনাম)'র সাথে সম্পৃক্ত। এতে এ কথা সুস্পষ্ট হয় যে, তখন 'আব্দ' আপন মা'বূদের দিকে পুরোপুরি মনোনিবেশ করেছিলেন, আর মা'বূদও তাঁর এ খাস 'আব্দ বা বন্ধুর দিকে তাঁর পুরস্কার ও সম্মানদান সহকারে মনোনিবেশ করেছিলেন। 'আবদিহী' (তাঁর বান্দা) মানে 'কামিল বান্দা'। আর

কামিল বান্দা হলেন হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম। 'আবদ' শব্দকে 'হু' সর্বনাম অর্থাৎ আল্লাহ্'র দিকে সম্পৃক্ত করায় এই 'আবদ'র মধ্যে অতুলনীয় বিশেষত্ব এসেছে।

আল্লামা ইক্ববাল শুধু 'আবদ' এবং আল্লাহ্'র দিকে সম্বন্ধযুক্ত 'আবদ'র মধ্যে বিরাট পার্থক্যের কথা উল্লেখ করে বলেছেন-

عبد دیگر عبدہٗ چیزے دگر - ما سراپا انتظار او منتظر

অর্থাৎ 'বান্দা' এক জিনিস, 'আল্লাহ্'র বান্দা' (আবদুহূ) অন্য কিছু। আমরা হলাম 'বান্দা', আপাদমস্তক অপেক্ষমান, আর যিনি 'আবদুহূ' (আল্লাহ্'র বিশেষ বান্দা বা মাহবূব বান্দা) তিনি হলেন এমন সত্তা, যাঁর জন্য অপেক্ষা করা হয়।

তাছাড়া, 'আবদ' শব্দ দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ ভ্রমণ ঘুমে, স্বপ্নে বা রূহানীভাবে করানো হয়নি, বরং সশরীরে করানো হয়েছে। কারণ, 'আবদ' বলা হয়, 'দেহ ও রূহ'র সমন্বিত বান্দাকে। শুধু রূহ যেমন 'আবদ' নয় রূহবিহীন দেহও তেমনি 'আবদ' নয়।

তদুপরি, 'আব্দ্'র সাথে 'নূর' এর সমন্বয়ও ঘটতে পারে। সুতরাং হুযূর আলায়হিস সালাতু ওয়াস্ সালাম এমন 'আবদ' যে, তাঁর মধ্যে নূরানিয়াতের বৈশিষ্ট্যও বিদ্যমান। এটা অসম্ভবও নয়; কারণ, পবিত্র কোরআনেই আল্লাহ্ পাক নূরের তৈরি ফিরিশতাদেরকে 'ইবাদ' (عَبۡدٌ, عِبَادٌ'র বহুবচন) বলেছেন। যেমন এরশাদ হচ্ছে قُلۡ عِبَادٌ مُّكۡرَمُوۡنَ (বরং ফিরিশতাগণ হচ্ছে সম্মানিত বান্দা)।

এরশাদ হয়েছে- **'লায়লান'** (রাতের একটি ক্ষুদ্রাংশ)ঃ এখানে লক্ষণীয় যে, এ ঊর্ধ্বলোকে ভ্রমণ রাতের বেলায় করানো হয়েছে। আর এ ভ্রমণও করানো হয়েছে আল্লাহ্'র বিশেষ বিশেষ নিদর্শনাবলী দেখানোর জন্য। রাতও বেছে নিলেন ২৭ তারিখের রাত, যে সময়ে চাঁদের আলোও নেই; অথচ কোন কিছু ভালভাবে দেখা যায় দিনের বেলায়। সুতরাং ঘোর অন্ধকার রাতে এ ভ্রমণ করানো থেকে এ কথা সুস্পষ্ট হল যে, হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম চাঁদ ও সূর্যের আলোর মুখাপেক্ষী নন; বরং সমগ্র সৃষ্টি হুযূরের নূরের মুখাপেক্ষী, বরং সৃষ্টি জগতের সমস্ত উজালা ও আলো হুযূরের নূরেরই প্রতিচ্ছবি।

মহান আল্লাহ্ এরশাদ ফরমান- **মিনাল মাসজিদিল হারা-মি ইলাল মাসজিদিল আক্বসা-** (মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আক্বসা পর্যন্ত)ঃ কোন কোন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- মি'রাজের প্রারম্ভ হয়েছে, হাতীম-ই কা'বা থেকে, আর কিছু সংখ্যক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- হুযূর আপন চাচাতো বোন হযরত উম্মে হানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা'র ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। সেখান থেকে কা'বার হাতীমে এসেছিলেন। 'হাতীম' মসজিদুল হারামেরই অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং মি'রাজ শরীফের প্রারম্ভ মসজিদুল হারাম থেকেই হয়েছে। মি'রাজের প্রথম সোপান মসজিদ-ই

আক্বসা পর্যন্ত (ইলাল মাসজিদিল আক্বসা) তারপর মসজিদে আক্বসা থেকে 'মালা-ই আ'লা (উর্ধ্বজগত) পর্যন্ত। আর মি'রাজের পরবর্তী সোপানে এর স্পষ্ট বিবরণ এসেছে পবিত্র ক্বোরআনের -সাতাশতম পারার 'সূরা নাজ্ম'-এ। মসজিদ-ই আক্বসার বৈশিষ্ট্য এরশাদ হয়েছে এ আয়াতাংশে- **"আল্লাযী-বা-রাকনা- হাওলাহূ-** (ওই মসজিদ-ই আক্বসা, যার চতুর্পাশে আমি বরকত রেখেছি)"। এ মসজিদ সব নবীর কেন্দ্রস্থল। এর চতুর্পাশে আল্লাহ্ পাক সব ধরনের বরকত রেখেছেন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বরকত ছিল- বাগানগুলো, শাক-সবজি, গাছপালার সজীবতা, পানির ফোয়ারা, ফসলাদি ও বড় বড় ক্ষেতের মাঠ ইত্যাদি। আর রূহানী বরকতরাজি হচ্ছে- ওখানে অবস্থিত অগণিত সম্মানিত নবীগণের নিদর্শনাদি ও মাযার শরীফসমূহ।

মি'রাজের দ্বিতীয় সোপানের ইঙ্গিত রয়েছে এ আয়াতাংশে- **"লিনুরিয়াহূ- মিন আ-য়া-তিনা-** (তাঁকে আপন নিদর্শনাদি দেখানোর জন্য।)" অর্থাৎ এ উর্ধ্বলোকে ভ্রমণ করানোর অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা। আল্লাহ্'র ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে সশরীরে সাক্ষাতের বর্ণনা এসেছে আয়াতের শেষাংশে- **"ইন্নাহূ- হুয়াস্ সামী-'উল বাসীর** (নিঃসন্দেহে তিনি শোনেন, দেখেন)"ঃ এখানে 'তিনি' দ্বারা 'আল্লাহ্' ও 'রসূল' উভয়ের কথা বুঝানো যেতে পারে। তখন অর্থ দাঁড়াবে- আল্লাহ্ তো হুযূরের কথা শুনেন ও তাঁকে দেখেন, হুযূরও এ বিশেষ ভ্রমণে বিশেষভাবে আল্লাহ্'র কথা শুনেন, ও সরাসরি তাঁকে দেখেন। অন্য ভাষায়- আল্লাহ্ তো সত্তাগতভাবে সামী' ও বাসীর, আর আল্লাহ্'র অনুগ্রহক্রমে হুযূরও সামী' ও বাসীর (শ্রোতা ও দ্রষ্টা)। মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে হুযূরের মি'রাজের সব ক'টি স্তরের বর্ণনা এসেছে।

তদুপরি, হুযূরের পবিত্র সত্তায়ও তিনটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান: বাশারী, মালাকী ও হাক্বক্বী (যথাক্রমে মানবীয়, ফিরিশতাসুলভ ও অনন্য বা প্রকৃত)। সুতরাং, মসজিদে হারাম থেকে বায়তুল মুক্বাদ্দাস পর্যন্ত বাশারিয়াতের মি'রাজ, এখান থেকে সিদ্রাতুল মুন্তাহা পর্যন্ত মালাকিয়াতের এবং এখান থেকে 'লা-মকান' পর্যন্ত হাক্বক্বী সূরতের মি'রাজ হয়েছে। যেখানে শুধু আল্লাহ্ তা'আলা ও হুযূরই ছিলেন। সূরা নাজম'সহ অন্যত্রও এ পবিত্র মি'রাজের কথা এরশাদ হয়েছে। বিশুদ্ধ হাদীসসমূহেও এ মহান ভ্রমণের বিস্তারিত বিবরণ এসেছে। সুতরাং এ সবের আলোকে মি'রাজের ধারাবাহিক সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করার প্রয়াস পেলাম-

মি'রাজ শরীফের ঘটনা

হিজরতের প্রায় ৫ বছর পূর্বে রজব শরীফের ২৭তম রাতে মি'রাজের দুলহা হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপন চাচাতো বোন হযরত উম্মে হানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা'র ঘরে বিশ্রামরত ছিলেন। হযরত

জিব্রাঈল পঞ্চাশ হাজার ফিরিশতার জমা'আত ও জান্নাতী বোরাক্ব নিয়ে হাযির হলেন। হুযূরের বরকতময় চক্ষুদয়ে তখন ঘুম ছিল। হযরত জিব্রাঈল অতি আদবসহকারে হাত বেঁধে দাঁড়ালেন। চিন্তা করছিলেন- যদি আওয়াজ দিয়ে ঘুম ভাঙ্গাই, তবে বে-আদবী হবে। কারণ

ادب گاہیست زیرآسماں ازعرش نازک تر- نفس گم کردہ می آید جنیدوبایزید ایں جا

(আসমানের নিচে আরশ অপেক্ষাও বেশি নাজুক ও স্পর্শকাতর একটি আদবের স্থান রয়েছে। হযরত জুনায়্দ ও বায়েযীদের মত মহান বুযর্গ ব্যক্তিরাও নিঃশ্বাস বন্ধ করেই এ মহান দরবারে হাযির হয়।) সুতরাং মহান রবের নির্দেশ হল **يَاجِبْرَآئِيْلُ قَبِّلْ قَدَمَيْهِ** (হে জিব্রাঈল তাঁর পদযুগলে চুম্বন কর।) হযরত জিব্রাঈল তৎক্ষণাৎ নিজের চক্ষুযুগল ও ওষ্ঠদু'টি হুযূরের বরকতময় পদযুগলে রাখলেন। হুযূরের বরকতময় চক্ষুযুগল খুলল। হযরত জিব্রাঈল আরয করলেন **اِنَّ اللّٰهَ اِشْتَاقَ اِلٰى لِقَآءِكَ** (নিশ্চয় আল্লাহ্ আপনার সাক্ষাতের জন্য আগ্রহ করেছেন)। দেখুন, যাঁর পদচুম্বন করছেন ফিরিশতাকুল সরদার হযরত জিব্রাঈল আমীন, আর সাক্ষাতের আগ্রহী হলেন কুল কা-ইনাতের মহান স্রষ্টা ও মালিক, এমন রসূলের মর্যাদা যে কত উঁচু তা একটু ভেবে দেখুন।

অতঃপর হুযূরের সামনে হযরত জিব্রাঈল বোরাক্ব পেশ করলেন। বেহেশতের অগণিত বোরাক্বের মধ্যে এ বোরাক্বটি হুযূরের সর্বাপেক্ষা বেশি আশিক্ব এবং নিজের পিঠে আরোহন করিয়ে আল্লাহ্'র হাবীবকে এ ভ্রমণ করানোর প্রতি দারুন আগ্রহী ও অপেক্ষমান ছিল। রাতদিন কান্না করত আল্লাহ্ পাক যেন তাঁকে এ সৌভাগ্য দান করেন। অকৃত্রিম ভালবাসা, নিষ্ঠাপূর্ণ আগ্রহ ও আদবের কারণেই বোরাক্বটির মনোবাঞ্ছা পূরণ হল।

হুযূর বোরাক্বের পিঠে আরোহন করলেন। বোরাক্বটি একটু নেচে ওঠল। হযরত জিব্রাঈল ধমক দিয়ে বললেন, "হে বোরাক্ব! তুমি জানো কি তোমার পিঠে কে আরোহন করছেন?" বোরাক্ব আতঙ্কিত মনে আরয করল, "আমি বাবুয়ানা করে এমন আচরণ করিনি, বরং আমার সৌভাগ্যের অবস্থা দেখে আমি নিজেকে সামলাতে পারিনি।"

এখানে উল্লেখ্য, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বোরাক্বে আরোহনের পূর্বক্ষণে একটু থেমে যান এবং কি যেন চিন্তা করছিলেন। হযরত জিব্রাঈল এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "আজ তো আমার উপর আল্লাহ্'র মহা অনুগ্রহ হচ্ছে। রহমত ও নূরের বৃষ্টি হচ্ছে। উর্ধ্বলোকে ভ্রমণের জন্য বোরাক্ব পাঠানো হয়েছে। কিন্তু ক্বিয়ামতের সঙ্কটময় সময়ে, পুলসিরাত্ব পাড়ি দেওয়ার সময় আমার উম্মতের কি অবস্থা হবে- তা ভাবছি।" তখন আল্লাহ্'র পক্ষ থেকে সুসংবাদ এল, "হে মাহবূব! আপনি চিন্তা

করবেন না, আমি তাদের জন্য পুলসিরাত্ব পার হবার জন্য এমন ব্যবস্থা করব যে, তারা পার হয়ে যাবে অথচ টেরও পাবে না।" আ'লা হযরত এ সুসংবাদকে ছন্দে বলেছেন-

پل سے گذارو راہ گزر کو خبر نہ ہو- جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو

অর্থাৎ: পুল সেরাত্ব এমনিভাবে পার করিয়ে দিন, যেন পুল অতিক্রমকারীও টের না পায়। জিব্রাঈল পাখা বিছালে পাখাও যেন খবর না পায়।

সুসংবাদ শুনে হুযূর আনন্দিত হলেন। বোরাক্বে আরোহন করলেন। জিব্রাঈল বোরাক্বের 'রিকাব' ধরলেন। মীকাঈল ধরলেন লাগাম। ইস্রাফীল যীন স্থির রাখলেন। পঞ্চাশ হাজার ফিরিশতার জুলূসে সালাত ও সালামের রব ধ্বনিত হচ্ছিল। এভাবে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আক্বসার দিকে নূরানী জুলূস রওনা হল। দৃশ্যটি একটু কল্পনা করুন সেটা কেমন ছিল! আমন্ত্রণকারী নূর, আমন্ত্রিত আরোহীও নূর, আরোহনের বাহনটিও নূর, অভ্যর্থনাকারীরাও নূর! মোটকথা, দুলহাও নূর, বরযাত্রীও নূর। চতুর্দিকে নূরেরই ছড়াছড়ি ছিল।

বোরাক্বও চলল দ্রুতগতিতে। দৃষ্টির দিগন্তে পড়ত সেটার প্রতিটি পরবর্তী কদম। মুহূর্তের মধ্যে এ নূরানী জুলূস বায়তুল মুক্বাদ্দাসে গিয়ে পৌঁছুল। বোরাক্বের গতি রাশিয়া-আমেরিকার তৈরি মিসাইল ও রকেটের চেয়েও দ্রুতগামী ছিল। কারণ, এ গতি ছিল নূরেরই। তাক্বভিয়াতুল ঈমানের লেখক ইসমাঈল দেহলভী ও তার অনুসারীদের, নবীগণ সম্পর্কে ভুল ধারণা আশা করি এ থেকে ভাঙ্গবে। তারা সম্মানিত নবীগণকে, এমনকি আমাদের নবী, রসূলকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামও তাদের মতো মানুষ মনে করে থাকে। এটা ঈমান বিধবংসী আক্বীদা।

মি'রাজের প্রথম সোপানে, এ নূরানী কাফেলা বায়তুল মুক্বাদ্দাস যাবার সময় পথিমধ্যে মদীনা মুনাওয়ারায় উপনীত হলে হযরত জিব্রাঈল আরয করলেন, এখানে অবতরণ করুন এবং দু'রাক্'আত নফল নামায পড়ুন। এটাই আপনার হিজরতগাহ্ মদীনা তাইয়্যেবাহ।

তারপর যাত্রাপথে 'ওয়াদী-ই আয়মান'-এ পৌঁছলেও হযরত জিব্রাঈল সেটার পরিচয় করালেন- এটা ওই উপত্যাকা, যেখানে হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামকে আল্লাহ্ পাক তাঁর সাথে সরাসরি কথা বলার সৌভাগ্য দান করেছেন। পথিমধ্যে একটি লাল রঙের টিলা অতিক্রম করার সময় দেখা গেল- হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম তাঁর মাযার শরীফে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছেন।

এ থেকে নবীগণের ওফাতোত্তর হায়াত বা জীবিত থাকার মাসআলাও সুস্পষ্ট হয়।

বায়তুল মুক্বাদ্দাসে হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম থেকে আরম্ভ করে হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম পর্যন্ত সমস্ত নবী ও রসূল কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

সবাই অপেক্ষমান। জায়নামায তখনো খালি ছিল। অতঃপর নবীকুল সর্দার সেটার উপর তাশরীফ নিয়ে গেলেন। হযরত জিব্রাঈল 'সাখরা'য় আযান বললেন। সুবহানাল্লাহ্, যে নামাযের মুআয্যিন ফিরিশতাদের সরদার আর ইমাম হলেন সমস্ত নবী ও রসূলদের সরদার, মুক্তাদী হলেন- হযরত আদম, হযরত নূহ, হযরত ইব্রাহীম, হযরত মূসা ও হযরত ঈসা আলায়হিমুস্ সালামসহ সমস্ত নবী, ওই নামাযের শান কিরূপ হতে পারে! হুযূর-ই আক্রাম সবাইকে নামায পড়ালেন।

এর মাধ্যমে প্রমাণিত হল- আমাদের আক্বা ও মাওলা সমস্ত নবী ও রসূলের পরে দুনিয়ায় তাশরীফ আনলেও তাঁর মর্যাদা সবার চেয়ে বেশি, সৃষ্টির মধ্যে মর্যাদায় তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ।

মসজিদ-ই আক্বসা থেকে এবার উর্ধ্বলোকের দিকে সফর আরম্ভ হল। হুযূর এরশাদ ফরমান ثُمَّ عُرِجَ بِىْ (অতঃপর আমাকে উপরের দিকে নিয়ে যাওয়া হল।) বোরাক্ব ও ফিরিশতাদের ওই জুলূস তখন আসমানের দিকে, রওনা হল। সালাত ও সালাম জারি ছিল। চোখের পলকে তাঁরা প্রথম আসমানে এসে পৌঁছলেন। হযরত জিব্রাঈল আসমানের দরজায় সঙ্কেত দিলেন। দারোয়ান আরয করল, "কে?" বললেন, "জিব্রাঈল।" দারওয়ান বলল, "আপনার সাথে কে?" জিব্রাঈল বললেন, "মুহাম্মদ।"(সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)। দারোয়ান বলল, "স্বাগতম! তাঁর জন্যই এ দরজা খোলা হবে।" প্রথম আসমানে হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম হুযূরকে স্বাগত জানালেন। একইভাবে দ্বিতীয় আসমানে আরোহন করলেন। এখানে হযরত ইয়াহ্য়া ও হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম স্বাগত জানালেন। তৃতীয় আসমানে আসলে সেখানে হযরত ইয়ূসুফ আলায়হিস্ সালাম-এর সাথে সাক্ষাৎ হল। চুতর্থ আসমানে পৌঁছলে সেখানে হযরত ইদ্রীস আলায়হিস্ সালাম স্বাগত জানালেন। পঞ্চম আসমানে হযরত হারূন আলায়হিস সালাম, ষষ্ঠ আসমানে হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম এবং সপ্তম আসমানে হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম'র সাথে সাক্ষাৎ হল। তাঁরা সবাই হুযূরকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। এভাবে তাঁরা 'সিদরাতুল মুন্তাহা' পর্যন্ত পৌঁছুলেন। এখানে ফিরিশতাকুল সরদার হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম আরয করলেন,

اگر یک سرِ موئے برتر پرم- فروغِ تجلّی بسوزد پرم

অর্থাৎ: এখান থেকে এক চুল পরিমাণও যদি সামনে অগ্রসর হই, তবে আল্লাহ্ তা'আলার নূররাশি ও জ্যোতিরাশি আমার পাখাগুলো জ্বালিয়ে ছাই করে ছাড়বে। এ পর্যন্তই আমার ক্ষমতা। কিন্তু হুযূর আরো সামনে যাচ্ছেন।

বিদায়ের প্রাক্কালে হুযূর হযরত জিব্রাঈলের উদ্দেশে বললেন, "জিব্রাঈল! তুমি আমার প্রপিতা হযরত খলীলুল্লাহ্ (আলায়হিস্ সালাম)কে বলেছিলে, 'আমাকে বলুন, আমি কি সাহায্য করতে পারি! আমি ওখানে যেতে পারি, যেখানে কেউ

যেতে পারে না।' জিব্রাঈল, আজ দেখ! আমি ওখানে যাচ্ছি যেখানে তুমিও যেতে পারছ না। তোমার কোন পয়গাম থাকলে বলতে পার; আমি তা আল্লাহ্'র দরবারে আরয করে মঞ্জুর করিয়ে আনব।" হযরত জিব্রাঈল আরয করলেন, "আমি চাই আপনার উম্মতকে আমার পাখায় আরোহন করিয়ে পুলসেরাত্ব পার করাবো।" সুতরাং তা মঞ্জুর হল। ক্বিয়ামতে মু'মিনদের পুলসেরাত্ব পার হবার দৃশ্যও হবে বিরল ধরনের। হযরত জিব্রাঈল পাখা বিছাবেন আর হুযূর বলতে থাকবেন رَبِّ سَلِّمْ اُمَّتِىْ رَبِّ سَلِّمْ اُمَّتِىْ (হে আল্লাহ্! আমার উম্মতকে নিরাপদে পার করে দাও, হে আল্লাহ্ আমার উম্মতকে নিরাপদে পার করে দাও)

এরপর হুযূর সিদরাতুল মুন্তাহা অতিক্রম করে যাচ্ছেন। হযরত জিব্রাঈল ও বোরাক্ব এখানেই রয়ে গেল। 'মা'আরিজুন্ নুবূয়াত'-এ এর পরবর্তী (মি'রাজের তৃতীয় সোপান) ভ্রমণের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এভাবেই-

অতঃপর হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- আমি একাকী রওনা হলাম। ৭০ হাজার নূরানী পর্দা অতিক্রম করলাম। প্রত্যেক পর্দার পুরুত্ব ছিল পাঁচশ বছরের রাস্তা। আর প্রতি দু'টি পর্দার মধ্যভাগের দূরত্বও ছিল পাঁচশ' বছরের রাস্তা।

এক বর্ণনায় আছে, হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম'র যানবাহন বোরাক্ব এখানে এসে থেমে গেল। তখন সবুজ রঙের রফরফ প্রকাশ পেয়েছিল, যার আলো সূর্যের আলোর মত ছিল। তিনি ওই রফরফে আরোহন করে এগুচ্ছিলেন। এভাবে আরশের নিকট গিয়ে পৌঁছুলেন।

'মাওয়া-হিবে লাদুন্নিয়া'র ৩৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে- হুযূর যখন আরশের নিকটে পৌঁছলেন, তখন আরশ তাঁর দামান ধরল, আর হুযূরও আরশের উপর আরোহন করলেন। আ'লা হযরত এর বর্ণনা ছন্দে দিয়েছেন-

وہی لامکان کامکیں ہوئے - سرعرش تخت نشین ہوئے
وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکاں - وہ خدا ہے جس کا مکاں نہیں

অর্থাৎ: তিনি লা-মকানে গিয়ে অবস্থান করেছেন, আরশের উপর তখ্‌ত-নশীন হয়েছেন। ইনি হলেন এমন নবী, যাঁর এই শান! উনি হলেন ওই খোদা, যিনি স্থান থেকে পবিত্র।

সামনে পর্দার পর পর্দা-ই দেখতে পান। সমস্ত পর্দা তুলে নেওয়া হল। শেষ পর্যন্ত একটা স্থান আসল যেখানে-

سراغ اَیْنَ ومتیٰ کہاں تھانشان کیف واِلٰی کہاں تھا- نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے

অর্থাৎ: 'কোথায়' ও 'কখন'-এর অস্তিত্ব ছিল না, 'কেমন' ও 'কোন দিকে'-এর চিহ্নও ছিল না। না ছিল কোন পথিক, না ছিল কোন সাথী। না ছিল গন্তব্যের পাথর (চিহ্ন), না ছিল মাইল ফলক।

তারপর সাক্ষাতের জন্য সাদর আহ্বান আসল-

ثُمَّ دَنٰى فَتَدَلّٰى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى

(তারপর ওই জ্যোতি নিকটবর্তী হল। অতঃপর খুব নেমে আসল। অতঃপর ওই জ্যোতি ও এ মাহবূবের মধ্যে দু'হাতের ব্যবধান রইল; বরং তদপেক্ষাও কম। [৫৩: ৮-৯]

তখন অতি মুহাব্বতপূর্ণ আহ্বান আসল اُدْنُ مِنِّىْ (নিকটে আসুন)। হুযূর دَنٰى (নিকটবর্তী হলেন)'র মক্বাম থেকে অগ্রসর হলেন। فَتَدَلّٰى-এর মক্বামে পৌঁছলেন। সেখান থেকে অগ্রসর হয়ে قَابَ قَوْسَيْنِ-এর স্তরে উপনীত হলেন। তারপর اَوْاَدْنٰى (আরো নিকটে)'র মর্যাদায় উন্নীত হলেন। সাক্ষাৎ হল।

মিশকাত শরীফের ৬৮ পৃষ্ঠায় আছে। হযরত আবদুর রাহমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন-

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاَيْتُ رَبِّىْ فِىْ اَحْسَنِ صُوْرَةٍ فَوَضَعَ كَفَّهٗ بَيْنَ كَتِفَىَّ فَوَجَدْتُّ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدِيَىَّ فَعَلِمْتُ مَا فِى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ - (ملحضًا)

অর্থাৎ: রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, আমি আমার রবকে (অতুলনীয়) সুন্দর আকৃতিতে দেখেছি। অতঃপর তিনি আমার উভয় স্কন্ধের মধ্যভাগে আপন কুদরতের হাত রাখলেন। এর ফলে আমি আমার বক্ষে ঠাণ্ডা অনুভব করেছি এবং যমীন ও আসমানের প্রত্যেক কিছু (সম্পর্কে) জানতে পেরেছি।

উল্লেখ্য, হুযূর-ই পাক মি'রাজের রাতে আল্লাহকে তাঁর যাহেরী চোখেই দেখেছেন। এ যাহেরী দীদারের বিষয়টি প্রায় সব ইমামের নিকট স্বীকৃত। 'মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া'র ৩৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইব্রাহীমকে 'খুল্লাৎ' (খলীল হবার মর্যাদা), হযরত মূসাকে 'সরাসরি কথা বলা'র এবং হুযূর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হিস্ সালাম'কে 'দীদার' (সাক্ষাৎ) দ্বারা ধন্য করেছেন।

আল্লামা ইসমাঈল হাক্বক্বী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর তাফসীর-ই রূহুল বয়ান'র ১ম খণ্ডের ৫৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "এটা কীভাবে সম্ভব হতে পারে যে, এক সম্মানিত সত্তা আরেক সম্মানিতকে নিজের নিকট দাওয়াত দিয়ে আনবেন, বন্ধু বন্ধুকে দাওয়াত দেবেন আর নিজে গোপন করবেন! চেহারাটুকুও দেখাবেন্ না?" শায়খ আবদুল হক্ব মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হিও একই ধরনের যুক্তি-প্রমাণ পেশ করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ পাকের সাথে দীদার সাক্ষাৎ করেছেন। কেমন ছিল এ দীদার?

موسیٰ زہوش رفت بیک جلوۂ صفات- تو عین ذات می نگری در تبسمی

অর্থাৎ আল্লাহ্'র সিফাতের নূরের একটি মাত্র ঝলক দেখে হযরত মূসা আলায়হিস্

সালাম হুঁশ হারিয়ে ফেলেন। আর হে হাবীব! সাল্লাল্লাহু আলায়কা ওয়াসাল্লাম আপনি আল্লাহ্'র সত্তা মুবারকই দেখেছেন হাসিমুখে।
আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেন-

اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا - جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود

অর্থাৎ: হে আল্লাহ্'র হাবীব! যখন খোদ্ খোদা তা'আলা আপনার নিকট গোপন থাকেননি, তখন এমন কোন্ জিনিস আছে, যা আপনার নিকট থেকে অদৃশ্য থাকতে পারে?

আমরা উম্মতের জন্য আনন্দের বিষয় হচ্ছে আল্লাহ্ পাকের সাক্ষাতের এমন সময় আমাদের আক্বা ও মাওলা আপন উম্মতের কথা স্মরণ করেছেন। আল্লাহ্ পাকও আপন হাবীবকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, রোজ ক্বিয়ামতে হুযূরের সুপারিশ কবূল করবেন এবং তাঁর উম্মতকে ক্ষমা করবেন।

আরো লক্ষ্যণীয় যে, এ মহান রাতে এ ঘনিষ্ট সাক্ষাতে মহান দাতা রব্বুল আলামীন যা চেয়েছিলেন তা দিয়েছেন। আর মহান গ্রহীতা তাঁর হাবীবও ওই অনুগ্রহ গ্রহণ করেছেন। কি দিয়েছেন, আর কি নিয়েছেন তা মহান দাতা ও গ্রহীতাই জানেন।

এর চেয়ে বড় নি'মাত আর কি হতে পারে যে, মহান রব তাঁর হাবীবকে আপন দীদার দিয়ে ধন্য করেছেন। এখানে আমাদের আরো খুশীর ব্যাপার যে, আমাদের জন্যও মি'রাজ দিয়েছেন। তা' হচ্ছে পাঁচ ওয়াক্বত নামাযের তোহ্ফা। হুযূর এরশাদ ফরমাচ্ছেন, اَلصَّلٰوةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِيْنَ (নামায মু'মিনদের জন্য মি'রাজ)।

শায়খ আবদুল হক্ব মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর 'মাদারিজুন্ নুবূয়াত'-এ লিখেছেন- আল্লাহ্ তা'আলা শবে মি'রাজে হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামকে তিন ধরনের জ্ঞান দান করেছেন- ১. ওই জ্ঞান, যার সম্পর্কে এরশাদ করেছেন, "এটা আপনার জন্য খাস। আপনি ব্যতীত আর কেউ ওই জ্ঞানের ভার সহ্য করতে পারবে না।" ২. ওই জ্ঞান, যে সম্পর্কে হুযূরকে ইখতিয়ার দিয়েছেন। তিনি যাকে উপযুক্ত মনে করেন, যতটুকু চাইবেন দান করতে পারবেন এবং ৩. ওই জ্ঞান, যা সমস্ত সৃষ্টির জন্য ব্যাপক করেছেন। এ তৃতীয় ধরনের জ্ঞানের অবস্থা এ হল যে, -জীবনের এমন কোন শাখা নেই, যে সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানগত সমাধান হুযূর দেননি। এতে অর্থনীতি, সমাজনীতি এবং ইবাদাত, আক্বাইদ বা বিশ্বাস সম্পর্কিত প্রতিটি বিষয়ে হুযূরের সুস্পষ্ট বাণী ও নির্ভুল দিকনির্দেশনা মওজূদ রয়েছে।

এ পবিত্র মি'রাজ রজনীতে তিনটি তোহফারও বিনিময় হয়েছে। মি'রাজে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া সাল্লাম ৩টি তোহফা পেশ করেন। ওইগুলো হচ্ছে-

১. اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ ২. وَالصَّلَوَاتُ, ৩. وَالطَّيِّبَاتُ (যথাক্রমে সমস্ত মৌখিক প্রশংসা, সমস্ত দৈহিক ইবাদত এবং সমস্ত আর্থিক ইবাদত)। তারপর আল্লাহ্ পাকও তিনটি তোহফা দিলেন-
১. اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ ২. وَرَحْمَةُ اللّٰهِ, ৩. وَبَرَكَاتُهٗ (যথাক্রমে, হে নবী! আপনার উপর সালাম, আল্লাহ্'র রহমত এবং তাঁর বরকতসমূহ)। হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম ও এ সালাম, রহমত ও বরকত (যথাক্রমে শান্তি, দয়া ও কল্যাণ)-এ আপন উম্মতদেরও শামিল করে আরয করলেন-

اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ

(বরং শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের উপর এবং আল্লাহ্'র নেক্কার বান্দাদের উপর) তারপর উর্ধ্ব জগতের ফিরিশতাগণ না'রা লাগালো-

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

উল্লেখ্য, এটাকে নামাযের তাশাহ্হুদ বানিয়ে আল্লাহ্ ও তাঁর হাবীব আমাদেরকে এর বরকত লাভের ব্যবস্থা করেছেন।

উল্লেখ্য, প্রিয় মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্'র দীদার ছাড়াও সিদ্রাতুল মুন্তাহা, আর্‌শ, কুর্‌সী, লাওহ, ক্বালাম, জান্নাত ও দোযখ ইত্যাদি আশ্চর্যজনক বিষয়াদি পরিদর্শন করেছেন, যে গুলো হচ্ছে 'আল্ আয়াতুল কুবরা' বা বড় বড় নিদর্শন। তিনি জান্নাতের দারোগা হযরত রিদ্বওয়ান এবং দোযখের দারোগা হযরত মালিকের সাথেও সাক্ষাৎ করেছেন। জান্নাতের নি'মাতরাজি ও জাহান্নামের শাস্তির দৃশ্যাবলীও দেখেছেন।

জাহান্নামে দেখেছেন নারীদের সংখ্যা পুরুষদের চেয়ে বেশি। অন্যান্য জঘন্য অপরাধীদেরকেও আযাবে লিপ্ত দেখেছেন। যেমন- একটি জনগোষ্ঠীকে দেখেছেন, ফিরিশতাগণ বড় বড় পাথর দিয়ে তাদের মাথায় আঘাত করে সেগুলো ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলছেন। তারপর তাদের মাথাগুলো আবার ঠিক হয়ে যাচ্ছে। হযরত জিব্রাঈল আমীন বর্ণনা করছেন- এরা ওই সব লোক, যাদের মাথায় ফরয নামায ভারী মনে হচ্ছিল। তাই তারা নামায পড়ত না।

একটি দল কাঁটা বিশিষ্ট ঘাস ও যাক্কুম ফল খাচ্ছিল। ওইগুলো তাদের কণ্ঠে আটকে পড়ছিল। এরা ছিল ওই সব লোক, যারা যাকাত দিত না।

আরেকটি দলকে দেখেছেন, কাঁচি দিয়ে ফিরিশতাগণ তাদের জিহ্বা ও ওষ্ঠগুলো বারবার কাটছিলেন। হযরত জিব্রাঈল বললেন, এরা হচ্ছে خُطَبَآءُ الْفِتْنَةِ (অর্থাৎ ওই সব মুফাসসির-বক্তা, যাদের ওয়ায-বক্তৃতায় মানুষ পথভ্রষ্ট হত, ফিৎনা-ফ্যাসাদে লিপ্ত হত)।

আরেকটা দলকে দেখলেন, যাদের পেটগুলো বড় বড় গম্বুজের মত, ওইগুলো বিষাক্ত সাপে ভর্তি ছিল। তারা যখন ওঠে দাঁড়াতে চাইত, তখন পতিত হত। হযরত জিব্রাঈল বললেন, এরা হচ্ছে اَكَلَةُ الرِّبَا (সুদখোর)।

[যারক্বানী: ৬ষ্ঠ খণ্ড: ৪২ পৃষ্ঠা ও সিহাহ্ সিত্তাহ্]

অনুরূপ, হুযূর যখন জান্নাত পরিদর্শন করলেন, তখন আপন কিছু বিশেষ গোলামকে জান্নাতে দেখতে পেলেন। তিনি আপন কোন কোন উম্মতের জান্নাতী মহলগুলোও প্রত্যক্ষ করেছেন। হযরত বিলাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'কে হুযূরের আগে আগে দূতের ন্যায় চলতে দেখেছেন, হযরত আবূ ত্বাল্‌হা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র স্ত্রী হযরত রুমায়্‌সাকে তাঁর মহলে জান্নাতের নি'মাতরাজি উপভোগ করতে দেখেছেন। তা'ছাড়া হুযূর তাঁর অন্যান্য গোলামদের জান্নাতী মহলগুলোর সাথে সাথে হযরত ওমর ফারূক্ব-ই আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র বিশেষ মহলও দেখতে পান। মোটকথা, এ সব বড় বড় নিদর্শন দেখানোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে পবিত্র ক্বোরআনে- لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا অর্থাৎ তাঁকে বড় বড় নিদর্শনসমূহ দেখানোর জন্যই এ মি'রাজ তথা ঊর্ধ্বলোক ভ্রমণের আয়োজন।

বিশুদ্ধ বর্ণনায় এসেছে যে, মি'রাজে আল্লাহ্'র সাথে হুযূরের সাক্ষাতে সালাম ও জবাবের পর-

تَكَلَّمَ مَعَهٗ تسعِينَ اَلف حِكَايَةٍ اَسْرَارًا وَاخبَارا وَّاَحْكَامًا

অর্থাৎ: আল্লাহ্ পাক মি'রাজের দুলহা (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া 'আলা-আ-লিহী ওয়া আসহাবিহী ওয়া বারাকা ওয়া সালাম)-এর সাথে নব্বই হাজার ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ওই গুলোর মধ্যে ছিল রহস্যাদি, কিছু সংবাদ আর কিছু আহকাম বা বিধানাবলী। [তাফসীর-ই আহমদী, ৩৩০পৃষ্ঠা]

সূরা 'নাজম'-এ আল্লাহ্ তা'আলা এ দিকে ইঙ্গিত করে এরশাদ করেছেন- فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَآ اَوْحٰى (অতঃপর তিনি আপন বান্দাকে ওহী করেছেন, যা ওহী করার ছিল) অর্থাৎ একান্ত সাক্ষাতে কথা বলেছেন, যা বলার ছিল। এ ইঙ্গিতকে কিছুটা খোলাসা করে 'তাফসীর-ই আহমদী'র ২২৯পৃষ্ঠায় একটি বর্ণনার অবতারণা করা হয়েছে-

قَدْ اَوْحَى اللّٰهُ يَامُحَمَّدًا اَنَاوَاَنْتَ وَمَاسِوٰى ذٰلِكَ خَلَقْتُهٗ لِاَجْلِكَ

অর্থাৎ: "নিশ্চয় মহান আল্লাহ্ ওহী করেছেন- হে আমার অতি প্রশংসিত বন্ধু! আমি ও আপনি। আর এতদ্ব্যতীত যা কিছু আমি সৃষ্টি করেছি সবই আপনার জন্য।" এর জবাবে আরশের মেহমান আরয করলেন-

يَارَبِّ اَنَا وَاَنْتَ وَمَا سِوٰى ذٰلِكَ تَرَكْتُهٗ لِاَجْلِكَ

(হে আমার রব! আমি ও আপনি। আর এতদ্ব্যতীত যতকিছু আছে আমি আপনার জন্য ত্যাগ করেছি।) এভাবে হুযূরের বক্ষ মুবারক এ রাতে জ্ঞানের ভাণ্ডার এবং আল্লাহ্'র মা'রিফাতের মহাসমুদ্র হয়ে গেছে। মহান আল্লাহ্ সমগ্র সৃষ্টির জ্ঞান হুযূরকে দান করে সৃষ্টির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি জ্ঞানী (اَعْلَمُ الْخَلْقِ) করে দিয়েছেন।

মি'রাজ শরীফ থেকে ওই রাতের একটি ক্ষুদ্রাংশেই পুণরায় ফিরে আসলেন আল্লাহ্'র হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম। আল্লামা আলূসী তাঁর

তাফসীর-ই রূহুল মা'আনীর ১৫শ খণ্ডের ১২ পৃষ্ঠায়, আল্লামা ইসমাঈল হক্বক্বী হানাফী তাঁর তাফসীর-ই রূহুল বয়ানের ২য় খণ্ডের ৪০৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন- যখন সাইয়্যিদে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ফিরে আসলেন, তখনো ঘরের দরজার শিকল নড়ছিল, বিছানাও গরম ছিল এবং যাওয়ার সময় যে ওযূ করেছিলেন সেটার পানিও গড়াচ্ছিল। এক উর্দু কবি এ চিত্রটি তাঁর ছন্দে এভাবে বিধৃত করেছেন-

زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم - سر عرش گئے اور آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم

(তিনি যখন ফিরে আসলেন, তখন দরজার শিকলটিও নড়ছিল, বিছানাও গরম ছিল, এত স্বল্প সময়ে হুযূর মুহাম্মদ আলায়হিস্ সালাম আর্‌শের উপরে গিয়েছেন আর ফিরেও এসেছেন।)

হুযূরের ঊর্ধ্বজগতে যাওয়াতো স্বাভাবিক। হুযূর নূর, আল্লাহ্'র সর্বাধিক প্রিয় হাবীব। তাঁকে আর্‌শের উপর নিয়ে গিয়ে সমগ্র সৃষ্টিকে তাঁর কদম শরীফের নিচে রেখে দুনিয়াবাসীকে এটাই দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে যে,

بعد از خدا بزرگ توئی قصّہ مختصر

(আল্লাহ্'র পর হে আল্লাহ্'র হাবীব! আপনারই মর্যাদা, এটাই সংক্ষিপ্ত তথা চূড়ান্ত কথা) ইত্যাদি তাঁরই জন্য শোভা পায়। কিন্তু ওই নূরুন্নবী আল্লাহ্'র পক্ষ থেকে উম্মতের জন্য অগণিত তোহফা নিয়ে আসাই হচ্ছে আশ্চর্যজনক ও আমাদের জন্য বড়ই সৌভাগ্যের।

হুযূর ফিরে এসে ওই ঘটনার কথা জানালেন। তারপর সত্যায়নের পালা। হুযূর সর্বপ্রথম হযরত উম্মে হানীকে বললেন। তিনি বললেন, "আপনি এ ঘটনা ব্যাপকভাবে প্রকাশ করবেন্ না, লোকেরা অস্বীকার করবে।" কিন্তু হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "আমি সত্য কথা প্রকাশ করতে কখনো কুণ্ঠাবোধ করতে পারি না। কেউ তা সত্য বলে মেনে নিক, কিংবা মেনে না নিক।" আবূ জাহ্ল এ ঘটনা শুনা মাত্র হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র নিকট ছুটে গেল। বলল, "তুমি কি শুনেছ- মুহাম্মদ কি বলছে? এ কথাকি কখনো মেনে নেওয়া যেতে পারে যে, এত স্বল্প সময়ে বায়তুল মুক্বাদ্দাস ও আসমানগুলো পরিভ্রমণ করে এসেছেন।" হযরত আবূ বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "لَئِنْ قَالَ لَصَدَقَ (যদি তিনি বলে থাকেন তবে তিনি অবশ্যই সত্য বলেছেন।) তাঁর পবিত্র মুখে কখনো মিথ্যা আসতে পারে না।" এ সত্যায়নের জন্য তিনি 'সিদ্দীক্ব' হয়ে গেলেন।

কবি বলেন-

عقل قربان کن بہ پیش مصطفٰے

(নিজের বিবেক-বুদ্ধিকে মুস্তফা'র সামনে উৎসর্গ কর।) সমস্ত সাহাবীও এ ঘটনা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে নিয়েছেন। কিন্তু কাফিরগণ তা নিয়ে হৈ চৈ শুরু করে দিল। এখন তাদের যাচাই-বাছাই'র পালা।

সুতরাং আবূ জাহ্‌ল হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম'কে বলল, "আপনি কি এ কথা সমগ্র সম্প্রদায়ের সামনে বলতে প্রস্তুত আছেন?" হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "নিশ্চয়।" আবূ জাহল কাফিরদের ডেকে একত্রিত করল। হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পূর্ণ ঘটনা শুনালেন। তারা তালি বাজালো, উপহাস করল। এক কাফির বলল, "আজ পর্যন্ত আপনি তো বায়তুল মুক্বাদ্দাস যাননি। বলুন তো সেটার স্তম্ভ ও দরজা ক'টি?" তাৎক্ষনিকভাবে হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস সালাম বায়তুল মুক্বাদ্দাসকে হুযূরের সামনে হাযির করলেন, আর হুযূর স্তম্ভ ও দরজার সংখ্যা ইত্যাদি দেখে দেখে বলে দিলেন। কাফিরগণ বলল, "হয়তো কারো থেকে শুনে মুখস্থ করে নিয়েছেন। কোন নতুন প্রমাণ উপস্থাপন করুন।"

এক কাফির বলল, "আমাদের ব্যবসায়িক কাফেলাগুলো আসছে। আপনি কি তাদের কাউকে পথিমধ্যে দেখতে পেয়েছেন?"

হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "হ্যাঁ, তিনটি কাফেলা দেখেছি। প্রথম কাফেলাকে দেখেছি 'রাওহা' নামক স্থানে। এ কাফেলা আগামী বুধবার সূর্যাস্ত নাগাদ এখানে পৌঁছে যাবে। আমি দেখেছি তাদের একটি উট হারিয়ে গিয়েছিল। আর তারা তা তালাশ করছিল। তারা খুব বিমর্ষ ছিল। আমি তাদেরকে আওয়ায দিলাম। বললাম, অমুক জায়গায় উটটি আছে। "তারা আশ্চর্যান্বিত হয়েছে, এখানে 'মুহাম্মদ'র (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আওয়াজ কোত্থেকে?

দ্বিতীয় কাফেলাকে দেখেছি 'যী-মারওয়া'য়। ওই কাফেলা আগামী বুধবার নাগাদ এখানে পৌঁছে যাবে। তাদের দু'জন লোক উটের উপর আরোহনরত ছিল। যখন তাদের পাশ দিয়ে আমার বোরাক্ব সবেগে যাচ্ছিল তখন উটটি ভয় পেয়ে গিয়েছিল এবং উভয় আরোহীকে নিচে ফেলে দিয়েছিল।

তৃতীয় কাফেলাকে 'তান'ঈম'-এ দেখেছি। ও কাফেলার অগ্রভাগে সারি সারি উট চলছিল। এক উষ্ট্রারোহীর ঠাণ্ডা অনুভূত হচ্ছিল। তখন সে আপন ক্রীতদাসের নিকট কম্বল চাচ্ছিল। এ কাফেলা নিকটে এসে গেছে। সূর্য উদয়ের সাথে সাথে এখানে পৌঁছে যাবে।"

সুতরাং সৃষ্টিকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া সাল্লাম যেমনি বলেছেন তেমনি হয়েছে। হুযূরের বর্ণনানুযায়ী যথাসময়ে কাফেলাগুলো এসে পৌঁছেছে। কাফিরগণ কাফেলাগুলোকে ওইসব নিদর্শন জিজ্ঞেস করেছে। হুযূর যা যা বলেছেন সবই তারা সত্য বলে স্বীকারোক্তি দিয়েছে। এরপর অনেক কাফির ইসলাম গ্রহণ করেছে।

পরিশেষে, এ কথা সুস্পষ্ট হল যে, রসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র মি'রাজ শরীফ হচ্ছে একটি অসাধারণ মু'জিযা। এটা একদিকে আল্লাহ্ পাকের অসীম ক্ষমতার প্রমাণ বহন করে। অপরদিকে সৃষ্টিকুল সরদার

মহানবীর মহান মর্যাদা প্রকাশ পায় এ অলৌকিক ঘটনায়। হুযূর যে সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ্'র সর্বাধিক প্রিয়, সর্বাধিক জ্ঞানী, সর্বাধিক ক্ষমতার অধিকারী, আল্লাহ্'র প্রধানতম প্রতিনিধি এবং সশরীর অসাধারণ নূর, সর্বোপরি উম্মতের প্রতি অসাধারণ দয়া পরবশ ইত্যাদি তা বিশেষভাবে প্রমাণিত হয় মি'রাজ শরীফের অলৌকিক ঘটনায়। আল্লাহ্ পাকের বিশেষ ব্যবস্থাপনায় এ মি'রাজ বা অলৌকিক ভ্রমণ করানোর মধ্যে অগণিত হিকমত বা রহস্য নিহিত রয়েছে।

আসুন, আমরা হুযূরের মি'রাজ শরীফের ঘটনার প্রতিটি দিক নিয়ে সম্যক জ্ঞান অর্জন করে গভীরভাবে চিন্তা করি প্রতিটি বিষয় নিয়ে, কাজে লাগাই আমাদের মধ্যে খোদাপ্রদত্ত বিবেককে। তখন বুঝতে পারব আমরা কতই ধন্য এ মহান রসূলের উম্মত হতে পেরে। নবীর মহামর্যাদা ও অতুলনীয়তা অনুধাবনে আমরা আরো বেশি ধন্য হব। এ জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি তাদেরকেও

যারা নবী পাককে তাদের মত মানুষ মনে করে, যারা হুযূরের নূরানিয়্যাতকে অস্বীকার করে, যারা নিজেদের মুসলমান দাবী করে কাফিরদের সূরে কথা বলে নবীর শানে বেআদবী করে। আল্লাহ্ পাক সবাইকে সত্য অনুধাবন করার শক্তি দিন, আমাদেরকেও ধন্য করুন ওই সব নি'মাত থেকে কিছু দান করে, যা' তাঁর হাবীবের মাধ্যমে ওই রাতে উম্মতের জন্য দান করেছেন। আ-মী-ন্।

মাহে শা'বান

হিজরী বর্ষের ৮ম মাস মাহে শা'বান। আল্লাহ্‌র প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ মাসকে স্বীয় মাস হিসেবে আখ্যায়িত করে এরশাদ করেন,শাবান আমারই মাস, এ মাসের শ্রেষ্ঠত্ব অপরাপর মাসগুলির উপর সেরূপ, যেমন আমার শ্রেষ্ঠত্ব সমস্ত মখলুকের উপর। শাবান (شعبان) আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হওয়া। এ মাসে আল্লাহর অপরিমেয় রহমত ও করুণার দ্বার উম্মুক্ত করে দেয়া হয়; যাতে বান্দাগণ স্বীয় গুনাহ ক্ষমা করিয়ে নিতে পারে এবং সমস্ত নেক মাকসুদ হাসিল করতে সক্ষম হয়।

মহান রমযানকে যথাযথভাবে বরণ করে নেয়ার প্রস্তুতি গ্রহণের মাস হিসেবে শা'বান মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে আলোড়ন সৃষ্টি করে। বিশেষত এ মাসের ১৪ তারিখের দিন গত রাতই শবে বরাত হিসেবে পরিচিত। মুসলিম দেশসমূহে অতি গুরুত্বের সাথে উদযাপিত হয়ে থাকে এ রাতটি। এ রাতের বহু ফযিলত রয়েছে।

পবিত্র শবে বরাতের ফযীলত

অর্ধব শা'বান বা শবে বরাত সম্পর্কে হুযূরে পুরনুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যখন শা'বানের পনর তারিখের রাত (বরাতের রাত) আসে, তখন তোমরা উক্ত রাতে (নফল ইবাদত সহকারে) জাগ্রত থাকো এবং তার

পরের দিন রোযা পালন করো। কারণ পরম করুণাময় ওই রাতে সূর্য ডুবার পর থেকে সকল সৃষ্টির প্রতি বিশেষ তাজাল্লী ও করুণা দান করে থাকেন এবং অসংখ্য পাপীকে ক্ষমা করে দেন। [ইবনে হাববান ও মিশকাত শরীফ]

রসূল-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, শা'বান-ই মু'আয্যমের ১৫শ রাতের ইবাদত অতি উত্তম। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, এ রাতে আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদের জন্য আপন রহমতের অগণিত দরজা খুলে দেন। আরো ইরশাদ করেন, ''তোমাদের মধ্যে আজকের এ রাতে কে আমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছো? আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো।'' হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেন, এ রাতে বিনিদ্র ইবাদতকারীর উপর দোযখের আগুনকে আল্লাহ পাক হারাম করে দেবেন। পবিত্র ক্বোরআনে ইরশাদ হয়েছে-

حٰمٓ ۚ۝ وَالْكِتَابِ الْمُبِيْنِ ۝ۙ اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ ۝ فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ ۝ۙ

তরজমা: হা-মীম। সুস্পষ্ট কিতাবের শপথ। নিশ্চয় আমি পবিত্র ক্বোরআনকে বরকতময় রাতে অবতীর্ণ করেছি। নিশ্চয় আমি সতর্ককারী। ওই রাত্রিতে ফয়সালাকৃত বিষয়সমূহ বন্টন করা হয়। [সূরা দোখান, আয়াত, ১-৪]

হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত,

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُوْمُوْا لَيْلَهَا وَصُوْمُوْا نَهَارَهَا ـ فَاِنَّ اللّٰهَ يَنْزِلُ فِيْهَا لِغُرُوْبِ الشَّمْسِ اِلٰى سَمَآءِ الدُّنْيَا فَيَقُوْلُ اَلَا مِنْ مُّسْتَغْفِرٍ فَاَغْفِرُلَهٗ اَلَا مِنْ مُسْتَرْزِقٍ فَاَرْزُقُهٗ اَلَا مِنْ مُبْتَلًى فَاُعَافِيْهِ اَلَا كَذَا اَلَا كَذَا حَتّٰى يَطْلُعَ الْفَجْرُ ـ

অর্থাৎ- রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- যখন শা'বান মাসের পনের তারিখের রাত আসে, তখন ওই রাতে তোমরা (ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে) রাত্রিজাগরণ করো এবং দিনে রোযা রাখো। কেননা আল্লাহ তা'আলা সূর্যাস্তের পর এ রাতে প্রথম আসমানে তার নূরানী তাজাল্লী বিচ্ছুরিত করেন এবং ডেকে বলেন- কে আছো আমার কাছে স্বীয় গুনাহর ক্ষমাপ্রার্থী? আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো, কে আছো রিয্ক্ব চাওয়ার? আমি তাকে রিয্ক্ব দান করবো। কে আছো রোগাক্রান্ত? আমি তাকে রোগমুক্ত করবো। কে আছো অমুক প্রার্থী, কে আছো অমুক প্রার্থী। এভাবে সুবহে সাদিক্ব পর্যন্ত (ডাকতে থাকেন)।

শাবানের ১৫শ রাতে (১৪ তারিখ দিবাগত রাতে) গোসল করবেন। যদি কোন অসুবিধার কারণে গোসল করতে সক্ষম না হন, তবে শুধু ওযূ সহকারে দু' রাক'আত 'তাহিয়্যাতুল ওযূ' পড়বেন। প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ফাতিহার পর আয়াতুল কুরসী একবার, সূরা ইখলাস তিনবার পড়বেন। এ নামাযও অতি উত্তম।

এ রাতে বিশেষভাবে দু রাক'আত নামায পড়া যায়। প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ফাতিহার পর আয়াতুল কুরসী একবার, সূরা-ই ইখলাস পনেরবার করে পড়বেন। সালাম ফেরানোর পর দুরূদ শরীফ একশ' বার পড়ে রিযক্ব (জীবিকা) বৃদ্ধির জন্য দো'আ করবেন। ইনশা-আল্লাহ্, এ নামাযের কারণে রিযক্ব (জীবিকা) বৃদ্ধি পাবে।

শা'বানের ১৫শ রাতে (শবে বারাআত) ৮ রাক'আত নামায ৪ সালামে পড়বেন। প্রত্যেক রাক'আতে সূরা-ই ফাতিহার পর সূরা-ই ক্বদর একবার করে পড়বেন। আর সূরা-ই ইখলাস পড়বেন ২৫ বার করে। গুনাহর ক্ষমার জন্য এ নামায অতি উত্তম। ইনশা-আল্লাহ এ নামায সম্পন্নকারীকে আল্লাহ পাক ক্ষমা করে দেবেন।

শা'বানের ১৫শ রাতে আরো ৮ রাক'আত নফল নামায রয়েছে। দু'সালামে এ নামায পড়তে হয়। প্রত্যেক রাক'আতে সূরা-ই ফাতিহার পর সুরা-ই ইখলাস দশবার করে পড়বেন। আল্লাহ তা'আলা এ নামায সম্পন্নকারীর জন্য অগণিত ফিরিশতা নিয়োগ করবেন যাঁরা কবরের আযাব থেকে নাজাত ও বেহেশতে প্রবেশের সু-সংবাদ দেন।

শা'বানের ১৫শ রাতে সাত সালাম সহকারে (অর্থাৎ প্রতি নিয়্যতে দু' রাক'আত করে) ১৪ রাক'আত নফল নামায পার্থিব ও ধর্মীয় উদ্দেশ্যাদি হাসিলের জন্য অতি উত্তম। তা পড়ার নিয়ম হচ্ছে প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ফাতিহার পর সূরা কাফিরূন একবার, সূরা ইখলাস একবার পড়বেন। তার সাথে সূরা ফালাক্ব ও না-স্ একবার পড়বেন। সালাম ফেরানোর পর আয়াতুল কুরসী একবার পড়বেন। তারপর সূরা তাওবার শেষ আয়াতগুলো ''লাক্বদ জা-আকুম রসূ-লুম্' থেকে 'আযী-ম' পর্যন্ত একবার পড়বেন।

১৫শ রাতে ৮ রাক'আত নফল নামায দু' সালাম সহকারে পড়া যায়। প্রথম দু' রাক'আতে সূরা ফাতিহার পর সূরা 'আলাম নাশরাহ' দশবার, তৃতীয় রাক'আতে সূরা ফাতিহার পর সূরা-ই ক্বদর দশবার এবং চতুর্থ রাক'আতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস দশবার পড়বেন। পরবর্তী ৪ রাক'আতও এভাবে পড়বেন। সালাম ফেরানোর পর সত্তর বার ইস্তিগফার ও সত্তরবার দুরূদ শরীফ পড়বেন। ইনশা-আল্লাহ এ নামায সম্পন্নকারীর সগীরাহ ও কবীরাহ গুনাহ আল্লাহ পাক ক্ষমা করে তাকে পাপমুক্ত করবেন।

তাছাড়া, শবে বরাতে ছয় নিয়্যতে বার রাক্'আত নফল নামায পড়লেও প্রচুর সাওয়াব পাওয়া যায়। প্রথম রাক'আতে সূরা ফাতিহার পর সূরা 'ক্বদর' ও দ্বিতীয়

রাক্‌'আতে সূরা ফাতিহার পর তিনবার সূরা ইখ্‌লাস পড়বেন। সূরা ক্বদর মুখস্থ না থাকলে উভয় রাক্‌'আতে সূরা ফাতিহার পর তিনবার করে সূরা ইখ্‌লাস (কুল হুয়ালআহু আহাদ) পড়া যাবে।

ওযীফা

শা'বানের পঞ্চদশ রাতে সূরা বাক্বারার শেষ দু'আয়াত اٰمَـنَ الـــرَّسُـــوْلُ থেকে كَـــــافِــرِيْـــنَ পর্যন্ত ২১ বার তিলাওয়াত করা নিরাপত্তা, শান্তি ও জান-মালের হিফাযতের জন্য উপকারী।

শবে বরাতে সূরা ইয়াসীন তিনবার পড়লে এ উপকারাদি রয়েছে- রিযক্ব বা জীবিকা বৃদ্ধি, দীর্ঘায়ু এবং আকস্মিক বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকা যায় ইত্যাদি।

শবে বরাতে সূরা দুখান সাতবার তিলাওয়াত করা অতি উত্তম। ইনশা-আল্লাহু তা'আলা বিশ্ব প্রতিপালক তিলাওয়াতকারীর সত্তরটি দুনিয়ার প্রয়োজন এবং সত্তরটি আখিরাতের প্রয়োজন এর বরকতে পূরণ করবেন।

১৫ শা'বানের নফল নামায

শা'বানের ১৫ তারিখ (অর্থাৎ রাত অতিবাহিত হবার পরবর্তী দিনে) যোহরের নামাযের পর চার রাক'আত নফল নামায দু'সালামে পড়বেন। প্রথম রাক'আতে সূরা ফাতিহার পর 'সূরা যিল্‌যাল' একবার ও 'সূরা ইখলাস' দশবার, দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা ফাতিহার পর সূরা তাকাসুর একবার ও সূরা ইখলাস দশবার, তৃতীয় রাক'আতে সূরা ফাতিহার পর সূরা কাফিরূন তিনবার ও সূরা ইখলাস দশবার। চতুর্থ রাক'আতে সূরা ফাতিহার পর আয়াতুল কুরসী তিনবার ও সূরা ইখলাস পঁচিশ বার পড়বেন।

এ নামাযের ফযীলত অসীম। আল্লাহ্ পাক এ নামায সম্পাদনকারীর উপর ক্বিয়ামত দিবসে বিশেষ কৃপাদৃষ্টি দান করবেন।

শা'বান মাসের প্রতিদিন নামাযের পর এ দোআ পাঠ করা গুনাহ মাফের জন্য অতি উত্তমঃ

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ اِلَيْهِ تَوْبَةُ عَبْدٍ ظَالِمٍ لَّا يَمْلِكُ نَفْسَهٗ ضَرًّا وَلَا نَفْعًاوَّ وَلَا مَوْتًا وَلَا حَيٰوةً وَّلَا نُشُوْرًا

উচ্চারণ ঃ আস্তাগ্‌ফিরুল্লা-হাল আযী-মাল্লাযী লা-ইলা-হা ইল্লা-হুয়াল্‌ হাইয়্যুল ক্বাইয়্যুম ইলায়হি তাওবাতু আবদিন যা-লিমিল্‌ লা-ইয়ামলিকু নাফ্‌সাহূ দ্বররাওঁ ওয়ালা- নাফ'আওঁ ওয়ালা মাওতাওঁ ওয়ালা হায়া-তাঁও ওয়া-নুশূ-রা।

রসূল-ই করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, শা'বান মাসে কেউ তিন হাজার বার দরূদ শরীফ পড়ে আমার নিকট পেশ করলে হাশরের দিনে তার জন্য সুপারিশ করা আমার জন্য অবধারিত হয়ে যায়।

নফল রোযা

শা'বান মাসের ১৫ তারিখের রোযার অনেক ফযীলত রয়েছে। যে কেউ এ রোযা রাখবে মহান রব তার পঞ্চাশ বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন।

মাহে রমযান

মাহে রমযান হিজরী সনের নবম মাস। মাসটির প্রতিটি মুহূর্ত বরকতমণ্ডিত। এ মাসের ফযীলত খোদ্ ক্বোরআনে করীম ও সহীহ্ হাদীসসমূহে বর্ণিত হয়েছে। মুসলমানদের উপর পূর্ণ মাস রোজা রাখা ফরয। এ মাসে ক্বোরআন-ই করীম নাযিল হয়েছে। এ মাসে এমন একটি রাত রয়েছে যা হাযার মাস থেকেও উত্তম। অর্থাৎ শবে ক্বদর। এ মাসের ফযীলত, রোযা, সাদক্বাতুল ফিতর, ঈদ ও অন্যান্য বিধানের বিস্তারিত বিবরণ এ কিতাবের নামায অধ্যায়ে রয়েছে। তাই সেগুলো এখানে আলোচনা করা হলো না। নিম্নে শবে ক্বদর সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলোঃ

শবে ক্বদর

যে কয়েকটি রাত তাৎপর্যবহ ও ইবাদতের রাত হিসাবে ইসলামী সমাজে অতি প্রসিদ্ধ হয়ে আসছে, শবে ক্বদর তন্মধ্যে অন্যতম। শবে ক্বদরকে ক্বোরআন মাজীদে ''খায়রুম মিন আলফি শাহর'' অর্থাৎ হাজার মাস হতেও শ্রেষ্ঠ রাত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ রাতের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে এটুকু যথেষ্ট যে, রাব্বুল আলামীন এ রাতকে কল্যাণময় মহিমান্বিত রজনী হিসেবে অভিহিত করেছেন। অনেক মুসলিম মনীষীও এ রাতকে 'সম্মানিত রাত' এবং 'ভাগ্য নিরুপণ' বা 'নিয়ন্ত্রণের রজনী' হিসেবেও উল্লেখ করেছেন।

এ রজনী মানবজাতির জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং অধিক সম্মানিত। আসলে এ রাত আল্লাহর এক অপূর্ব নি'মাত। কেননা, এ রজনীতে মানব জাতির মুক্তির সনদ তথা মহাগ্রন্থ ক্বোরআন মজীদের অবতরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়, যার মধ্যে নিহিত রয়েছে মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ ও শান্তির নিশ্চয়তা। এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন, ''রমযান মাস, যার মধ্যে ক্বোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। এটি মানুষের দিশারী এবং সৎ পথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী।'' এ মহান রাত রমযান মাসের মধ্যে নিহিত থাকলেও কোন্ তারিখে, ক্বোরআন ও হাদীসে তার সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা নেই; তবে শবে ক্বদর যে রমযান মাসের শেষ দশ দিনের কোন এক বিজোড় তারিখে, তা বিভিন্ন বর্ণনায় বলা হয়েছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, ''আল্লাহ তা'আলা রাতগুলোকে শবে ক্বদর দ্বারাই সৌন্দর্যমন্ডিত করেছেন। তোমরা ক্বদরের রাতে বেশি করে ইবাদত-বন্দেগী করো, যেহেতু এটা সর্বশ্রেষ্ঠ রাত।'' হুযূর

আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, ''আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির সম্মুখে এ রাত্রিকে নির্দিষ্ট করে দেননি, যেন বান্দারা কেবল একটি নির্দিষ্ট রাতের ইবাদতকেই যথেষ্ট মনে না করে এবং এই রাতে সকলেই যেন আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী বেশি করে এবং প্রতিদান স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা তার আমলনামায় হাজার মাসের অধিক ইবাদতের সাওয়াব প্রদান করেন।''

বস্তুতঃ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রমযানের শেষ দশকে অনেক ফযীলত রেখেছেন। রমযানের শেষ দশককে দোযখ থেকে নাজাতের অংশ হিসেবে ঘোষণা করেছেন। রোযাদার যেন এই দশ দিনে বেশি করে ইবাদত করে দোযখের ভয়াবহ শাস্তি থেকে মুক্তির সন্ধান লাভ করতে পারে এবং আল্লাহর সান্নিধ্য লাভসহ বেহেশতে প্রবেশের আশা রাখতে পারে।

এ দশ দিন রাব্বুল আলামীন ই'তিকাফের যে বিধান দিয়েছেন তা এ মুবারক রাত অর্জনের জন্য এক উত্তম পন্থা। মূলতঃ শেষ দশদিন মসজিদে নিজেকে আবদ্ধ রেখে শবে ক্বদর অন্বেষণ করাই হলো ই'তিকাফের অন্যতম উদ্দেশ্য, আল্লাহ ছাড়া দুনিয়াবী সকল সংশ্রব থেকে বিরত থেকে নিজের দেহমনকে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন রাখা সম্ভব হয় এ দশ দিনের ইবাদতের মাধ্যমে। আসলে একজন মুসলমান যখন ই'তিকাফের মাধ্যমে সব কিছু থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহর ধ্যানে নিজেকে মশগুল রাখে, তখন তার জন্য এ মুবারক রাত অন্বেষণ করা সম্ভব হয়।

মহান আল্লাহ তা'আলা দয়াপরবশ হয়ে তাঁর বান্দাদের নাজাতের লক্ষ্যে বিশেষ অনুগ্রহ স্বরূপ এ মর্যাদামন্ডিত ও অধিক সাওয়াবপূর্ণ রাত এ শ্রেষ্ঠ নবীর উম্মতকেই দান করেছেন। আর এ রাতকে গোপন রেখেছেন যেন মানুষ সৌভাগ্য অর্জনের লক্ষ্যে অধিকভাবে আল্লাহমুখী হয়। আল্লাহ তা'আলা এ রাতে তাঁর বান্দাদেরকে বিশেষ অনুগ্রহ করতে চান। তিনি চান তাঁর প্রতিটি বান্দা ওই সুযোগ গ্রহণ করুক। অর্থাৎ বান্দা তার অতীত গুনাহর কথা স্মরণ করে দু'ফোটা চোখের পানি ফেলুক। অনুশোচনা করে তাওবা করুক এবং অতীত জীবনে কৃত অপকর্ম-কুকর্মগুলো ঝেড়ে-মুছে নবজাত শিশুর মত পূতঃপবিত্র হয়ে একমাত্র আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের নির্দেশিত পথে এগিয়ে চলুক।

তবুও ২৬ রমযান দিবাগত রাত অর্থাৎ ২৭ রমযানের রাতে শবে ক্বদর হবার বেশী সম্ভাবনা রয়েছে বলে আমাদের ইমামগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এর পক্ষে কয়েকটি কারণও উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন- ليلة القدر বাক্যাংশটি তিনবার এরশাদ হয়েছে। ليلة القدر এর বর্ণ রয়েছে যাকে তিন দিয়ে গুণ করলে গুণফল সাতাশ হয়। দ্বিতীয়ত সূরা ক্বদরের শব্দগুলোর মধ্যে 'শবে ক্বদর' নির্দেশক هى সর্বনাম (শব্দ)টি ক্রমিক সংখ্যানুসারে ২৭তম শব্দে দাঁড়ায়। তৃতীয়ত বুযুর্গানে

দ্বীনের কিছু কিছু অভিজ্ঞতা থেকেও অনুমান করা যায় যে, শবে ক্বদর ২৭ রাতে হবার সম্ভাবনা বেশী।

তাই, আমাদের দেশে অধিকাংশ মুসলমান ২৭ রমযানকে বেশি গুরুত্ব দেন। অন্যান্য বিজোড় রাতগুলোকে ততখানি গুরুত্ব দেন না। বস্তুতঃ ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিতে শবে ক্বদরের ফযীলত পেতে হলে রমযানের শেষ দশকের প্রতিটি রাতকে সমপরিমাণে গুরুত্ব দেওয়াই শ্রেয়।

ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ অর্জনে পরীক্ষিত এ রাত। কাজেই প্রত্যেকেরই এ সৌভাগ্য অর্জনে সচেষ্ট থাকা একান্ত অপরিহার্য। আসুন আমরা প্রত্যেকেই মাহে রমযানের শেষ দশদিন ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে এ রাতকে তালাশ করি। কেউ যেন এ রাত থেকে বঞ্চিত না হই। আল্লাহ পাক আমাদের প্রত্যেককেই শবে ক্বদরের তাৎপর্য বুঝার ও আমল করার তাওফীক্ব দান করুন! আমীন।

মাহে শাওয়াল

মাহে শাওয়াল ঈদুল ফিতরের মাস। বিশ্ব মুসলিমের অপার আনন্দের মাস শাওয়াল। এক মাস সিয়াম সাধনার পর মুসলিম উম্মাহর দ্বারে সিয়াম সাধনার সমাপনী আনন্দ ও শুকরিয়া এবং খোদাভীরু জীবনের প্রতিফলনের দাবী নিয়ে মাহে শাওয়াল সমাগত হয়।

হিজরী সনের দশম এবং হজ্জের প্রস্তুতির মাস হিসেবেও মাহে শাওয়াল সবিশেষ তাৎপর্যবহ। আল্লাহর প্রেমে উজ্জীবিত হবার সত্যিকার মানসিক শক্তি যেহেতু পবিত্র রমযানের পূর্ণ একমাস সিয়াম সাধনায় অর্জিত হয়েছে। তাই আসন্ন হজ্ব ও উমরাহ পালনের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য শাওয়াল উপযুক্ত সময়। যখন মাহে শাওয়ালের চাঁদ পশ্চিম আকাশে উদিত হয় তখন থেকে শুরু হয় পরের দিবসের আনন্দের ঈদের আমেজ। কিন্তু এরই মাঝে আল্লাহর আবেদ বান্দাগণের নিদ্রাহীন রাত অতিবাহিত হয় নফল নামায, তিলাওয়াত, জিকির ও দরূদ শরীফ এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে।

ঈদুল ফিতরের এ রাত স্বীয় বান্দাদের জন্য আল্লাহর বিশেষ দান বা অনুগ্রহের প্রতীক পঞ্চরাত্রির অন্যতম। আল্লাহর অনুগ্রহ প্রত্যাশীরা এ রাতে তাই এবাদতে রত থাকেন।

এ রাতের জন্য বিশেষভাবে চার রাক'আত (দুই রাক'আত বিশিষ্ট) নফল নামাযের নিয়ম নির্দেশ করা হয়েছে যে, প্রতি রাক'আতে ২১বার সূরা ইখলাস দ্বারা দু' নিয়্যতে এ চার রাকাত নামায আদায়কারীর জন্য আল্লাহ তা'আলা বেহেশ্‌তের আটটি ফটক উম্মুক্ত করবেন এবং দোযখ হতে পরিত্রাণ দেবেন।

ঈদের দিনে করণীয়

এ দিন দুই রাকাত ঈদুল ফিতরের নামায আদায় করা প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের জন্য ওয়াজিব। বিনা কারণে এ নামায পরিত্যাগ করা গোমরাহী ও বিদ'আত।

তবে মুসাফির, অসুস্থ ব্যক্তি, ক্রীতদাস, অন্ধ, নারী ও নাবালেগ প্রমুখের জন্য এ নামায বাধ্যতামূলক নয়। এ সম্পর্কে নামায অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

শাওয়ালের ছয় নফল রোযা

ঈদের দিন ব্যতীত শাওয়ালের সারা মাসের মধ্যে ছয়টি নফল রোযা রাখার জন্য হাদীস শরীফে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে। ন্যূনতম একটি রোযাও যদি কেউ পালন করে তবে তার আমলনামায় এক হাজার রোযার সাওয়াব প্রদান করা হবে বলে হাদীস শরীফে জানানো হয়েছে। এ মাস থেকে শুরু হবে হজ্ব যাত্রীদের প্রস্তুতি। অনেকে রওনা হবেন পবিত্র ভূমির উদ্দেশ্যে। এ সৌভাগ্যবানদের প্রতি আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল।

মাহে যিলক্বদ

শাহরুল হারাম বা যুদ্ধ বিগ্রহ নিষিদ্ধ এমন বিশেষ সম্মানিত মাস চতুষ্টয়ের মধ্যে অন্যতম এবং মহান হজ্বের প্রস্তুতি পূর্ণ করার মাস হলো জিলক্বদ। মুসলমানদের কাছে এ মাসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। আল্লাহর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- যিলক্বদ মাসকে সম্মান কর, কেননা এটি সম্মানিত মাসগুলির মধ্যে প্রথম। এ মাসকে সম্মান করা অপরিহার্য হেতু কলহ-বিবাদ, মামলা-মোকাদ্দমা, হিংসা হানাহানি, ঝগড়া-ফ্যাসাদ, চোগলখুরী ও গীবত সহ সব প্রকার হিংসাত্মক কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার জন্য মুসলমান মাত্রেরই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। দেশ, সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল পর্যায়ে এ ব্যাপারে সচেতন অনুশীলন একটি সুন্দর, সুখী ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যতই নিশ্চিত করবে নিঃসন্দেহে।

এ মাসে অধিকহারে নফল নামায পড়ার জন্য বিশেষ তাগিদ রয়েছে। হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে যে, প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- তোমরা এমাসকে গণীমতরূপে বরণ কর। কারণ এ মাসের এবাদতে অন্যান্য দিনের চাইতে অধিক সওয়াব পাওয়া যায়।

বিশেষ করে হাদীস শরীফে বর্ণিত, এ মাসের চাঁদ উদিত হওয়ার পর যে ব্যক্তি দুই রাক'আত বিশিষ্ট চার রাক'আত নামায আদায় করবেন, যার প্রতি রাক'আতে সূরা ফাতিহার সাথে সূরা ইখলাস ২৩বার করে পড়ে আদায় করবে তাঁর জন্য জান্নাতে ইয়াকুত পাথর দ্বারা ইমারত নির্মাণ করা হবে।

এ মাসের প্রতি রাতে দুই রাক'আত নামায আদায় করা অত্যন্ত সাওয়াবদায়ক।

প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার সাথে তিনবার সূরা ইখলাস পাঠ করতে হবে।

এমনিভাবে প্রতি শুক্রবার সূরা ফাতিহার সাথে সূরা ইখলাস ২১বার করে চার রাক'আত নামায আদায় করার জন্যও বলা হয়েছে।

এ মাসে নফল রোযাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। হাদীস শরীফে এ মাসের একটি রোযার জন্য তার আমলনামায় প্রতি ঘন্টায় একেকটি হজ্বের, প্রতি নিঃশ্বাসে একটি করে গোলাম আজাদ করার সওয়াব প্রদান করা হবে বলে বর্ণিত রয়েছে।

এ মাসের প্রতি সোমবার একটি করে রোযা রাখলে তার জন্য এক হাজার বছর নফল এবাদতের অধিক সাওয়াবের কথা বর্ণণা করা হয়েছে।

সকলের উচিত এ মাসের নফল এবাদত দ্বারা আল্লাহর করুণা ও অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা করা। সাথে সাথে পার্থিব মোহ ও কুরিপুগুলোকে পদদলিত করে একজন খাঁটি মুসলমানরূপে আল্লাহর প্রিয় ভাজনহওয়ার জন্য সকলে সচেষ্ট হওয়া চাই।

মাহে জিলহজ্ব

এ মাসও 'আশহুরুল হুরুম-এর অন্তর্ভুক্ত। হজ্ব, কোরবানী ও ঈদুল আযহার এ মহান মাসে অধিক হারে নফল এবাদতে মশগুল থাকার চেষ্টা করা অপরিহার্য।

এ মাসের চাঁদ উদিত হওয়ার পর যে ব্যক্তি দু' রাক'আত করে চার রাক'আত নফল নামায আদায় করবে প্রতি রাক'আতে সূরা ফাতিহার সাথে সূরা ইখলাস ২৫বার করে পড়লে বেশুমার সওয়াবের কথা হাদীস শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে।

অপর বর্ণনায় রয়েছে- এ মাসের ১০ম রজনীতে বিত্র নামাযের পর দুই রাকাত নফল নামায আদায় করবেন। এর প্রতি রাক'আতে সূরা ফাতিহার সাথে সূরা কাউসার তিনবার ও সূরা ইখলাস তিনবার করে পাঠ করবেন।

এ মাসের যে কোন রাতের শেষ অধ্যায়ে প্রতি রাক'আতে সূরা ফাতিহার সাথে তিনবার আয়াতুল কুরসী, একবার সূরা ফালাক্ব ও একবার সূরা নাস দ্বারা চার রাক'আত নামায আদায় করবেন। অতঃপর দু'হাত তুলে নিম্নের দোয়াটি পড়বেন -

সুবহা-না যিল ইয্যাতি ওয়াল জাবারূত, সুবহা-না যিল কুদরাতি ওয়াল মালাকুত, সুবহা-না যিল হাইয়্যিল লাযী লা-ইয়ামুতু, লা- ইলা-হা ইল্লা- হুয়া ইউহ্য়ী- ওয়া ইয়ুমী-তু ওয়াহুয়া হাইয়্যুল্ লা- ইয়ামূতু, সুবহা-না রাব্বিল 'এবাদি ওয়াল বিলাদি, আলহামদু লিল্লা-হি কাসী-রান তায়্যিবাম মুবা-রাকান 'আলা- কুল্লি হা-ল। আল্লাহু আকবার কাবী-রান, রাব্বানা- ওয়া জাল্লা জালা-লুহূ ওয়া কুদরাতাহূ বিকুল্লি মকান।

এরপর আল্লাহর কাছে স্বীয় প্রার্থনা নিবেদন করলে, ইন-শাআল্লাহ কবুল হবে। এ নামায ও দোয়ার আমল একবার আদায় করলে হজ্ব ও মদীনা তাইয়্যিবায় যিয়ারতের সাওয়াব নসীব হবে।

আর এ মাসের প্রথম দশ রাতে নিয়মিত আদায় করলে জান্নাতুল ফিরদাউস অবধারিত এবং এক হাজার গুনাহ্ মার্জনা করা হবে।

তাকবীর-ই তাশরীক্ব পাঠ

এ মাসের নবম তারিখ ফজর হতে প্রতি ফরয নামাযের পর তের তারিখ আসর পর্যন্ত নিম্ন লিখিত তাকবীর পাঠ করতে হবে-

"আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা- ইলাহা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবর, আল্লা-হু আকবার ওয়া লিল্লা-হিল হাম্দ।"

ঈদুল আযহার রজনীটি আল্লাহর করুণা লাভের নিশ্চিত পঞ্চরাত্রির অন্যতম। এ রাতে বিনিদ্র থেকে নফল এবাদতে অতিবাহিত করার মধ্যে অশেষ কল্যাণ ও সাওয়াব নিহিত। আল্লাহ আমাদের সৎকর্ম করার তাওফীক্ব দান করুন।

এ মাসে সামর্থ্যবান ব্যক্তির উপর ক্বোরবানির বিধান রয়েছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ ২৭০ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

পবিত্র ঈদুল আযহা

ঈদুল আযহা ইসলামের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ক্বোরবানীর শিক্ষা সমৃদ্ধ এ ঈদ। ক্বোরবানী হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর সুন্নাত। এ সুন্নাত ইসলামে অতি গুরুত্ব সহকারে স্বীকৃত। এর মাধ্যমে যে 'তাক্বওয়া' ও আল্লাহর প্রতি ঐকান্তিক প্রেমের বহিঃপ্রকাশ ঘটে, তা দিয়েই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভ করা যায়। এ বিষয়ে মহান আল্লাহর পবিত্র ক্বোরআনে ঘোষিত হয়েছে, "কোরবানীর পশুর গোশত বা রক্ত আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না; বরং এর মাধ্যমে যে তাক্বওয়া অর্জিত হয়, তাই শুধু আল্লাহর কাছে পৌছায়।" [২২: ৩৭]

বস্তুত ঈদুল আযহার মধ্যে মুসলিম উম্মাহ্ তথা মানব জাতির জন্য যে শিক্ষা রয়েছে, তা হল মহান আল্লাহর প্রেমে সর্বোচ্চ ত্যাগের শিক্ষা। আর তাই পবিত্র ক্বোরআনে বলা হয়েছে, "তোমরা ততক্ষণ পুণ্য পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের সর্বাধিক প্রিয়বস্তু তাঁর পথে ব্যয় করতে না পারো।" [৩:৯২]

আর এ ত্যাগের জন্য মন বা আত্মার পবিত্রতা ও নিষ্ঠা অপরিহার্য। আল্লাহ তা'আলা হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন, "বলুন, আমার সালাত, আমার ক্বোরবানী, আমার জীবন ও মৃত্যু আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জন্য।" [৬:১৬২]

এ পবিত্র উপলক্ষ আমাদের প্রতিবছর স্মরণ করিয়ে দেয়- ত্যাগের মহিমায় ধন্য হয়ে প্রকৃত মানবিক গুনাবলী অর্জন করার মাধ্যমে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সাফল্য অর্জন করার সুযোগ হয়তো কারো কারো জীবনে আর নাও আসতে পারে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে এ পৃথিবীতে নির্ধারিত সময়ের জন্যই পাঠিয়েছেন। এ সময়ের যেদিন পরিসমাপ্তি ঘটবে, সেদিন কাউকে সময় বৃদ্ধির সুযোগ দেয়া হবে না। সুতরাং নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করতে হবে। অন্যথায় জীবন অবসানের সময়ে কান্নাকাটি বা অনুশোচনা কোন কাজে আসবে না।

এ সম্পর্কেও আল্লাহ তা'আলা পবিত্র ক্বোরআনে হুঁশিয়ার করে দিয়ে এরশাদ করেছেন, জীবনের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ ব্যক্তি সেদিন ফরিয়াদ করে বলবে, "হে রব, পৃথিবীতে থাকার আর একটু যদি সুযোগ দিতে, তাহলে তোমার নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করে ও সর্বস্ব উৎসর্গ করে সৎমানুষ হয়ে ফিরতাম।" কিন্তু এতে কোন লাভ হবে না। কেননা জীবনের নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে গেলে এক মুহূর্তও বাড়ানো-কমানো যাবে না। নির্ধারিত সময়েই প্রতিটি মানুষকে এ পৃথিবী ত্যাগ করতে হবে। এ মাসে সামর্থ্যবান মুসলমানদের উপর হজ্ব সম্পন্ন করা ফরয। হাজীগণ এ সফরে মদিনা মুনাওয়ারাহ্‌র যিয়ারতও সম্পন্ন করে থাকেন। হজ্ব ও যিয়ারতের বিস্তারিত বিবরণ ২৮৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

ফাতিহা, কুলখানি, চেহলাম ইত্যাদির বর্ণনা

দৈহিক ও আর্থিক এবং আর্থিক ও দৈহিক সমন্বিত ইবাদতের সওয়াব অন্য মুসলমানকে দান করা জায়েয এবং এটা ফলপ্রসূও হয়। ক্বোরআন, হাদীস ও ফক্বীহগণের উক্তি থেকে এর প্রমাণ মিলে। ক্বোরআনুল করীম মুসলমানদেরকে একে অপরের জন্য দো'আ করার নির্দেশ দিয়েছে। জানাযার নামায এজন্যই আদায় করা হয়। মিশকাত শরীফের فضل الصدقة (সাদক্বাহর ফযীলত) শীর্ষক অধ্যায়ে আছে, হযরত সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু একটি কূপ খনন করে বলেছিলেন, هٰذِهٖ لِاُمِّ سَعْدٍ এটা সা'দের মায়ের নামে উৎসর্গিত হলো। ফক্বীহগণও ঈসালে সাওয়াবের নির্দেশ দিয়েছেন। তবে 'ফয়য-ই 'আইন'-এর ক্ষেত্রে পরনির্ভরশীলতা না জায়েয। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি অপরের বদলে নামায পড়লে, নামায আদায় হবে না। অবশ্য নামাযের সওয়াব দান করা যেতে পারে। মিশকাত শরীফে 'বাবুল ফিতান ওয়াল মালাহিম' (باب الفتن والملاحم) -এর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে হযরত আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কাউকে বলেছিলেন-

مَنْ يَضْمَنُ فِيَّ مِنكُمْ اَنْ يُصَلِّيَ فِيْ مَسْجِدِ الْعِشَآءِ رَكْعَتَيْنِ وَيَقُوْلُ هٰذِهٖ لِاَبِيْ هُرَيْرَةَ

অর্থাৎ"আমার পক্ষ হয়ে মসজিদে এশার দু'রাক'আত নামায পড়ার দায়িত্ব আপনাদের মধ্যে কে নেবেন? এবং কে বলবেন, এর সাওয়াব আবূ হুরায়রার নামে উৎসর্গকৃত?" এ থেকে তিনটি মাস্আলা জানা গেলো-

এক. দৈহিক ইবাদত অর্থাৎ নামাযও কারো ঈসালে সাওয়াবের নিয়্যতে আদায় করা জায়েয।

দুই. মুখে উচ্চারণ করে ঈসালে সাওয়াব করা, অর্থাৎ হে খোদা, এর সাওয়াব অমুককে দান করুন, খুবই উত্তম এবং

তিন. বরকতের উদ্দেশ্যে বুযুর্গানে দ্বীনের মসজিদসমূহে নামায আদায়ে বিশেষ সাওয়াব রয়েছে। আর্থিক ইবাদত বা আর্থিক ও দৈহিক সমন্বিত ইবাদত, যেমন যথাক্রমে, যাকাত ও হজ্বের ক্ষেত্রে যদি কাউকে বলে, তুমি আমার পক্ষে যাকাত

দিয়ে দাও, তাহলে সে দিতে পারে আর যদি আর্থিক সামার্থ্যবান ব্যক্তির কাছে হজ্জের কার্যাদি সমাধা করার শক্তি না থাকে, তাহলে অন্য কারো দ্বারা 'বদলী হজ্জ্' করানো যায়। প্রত্যেক ইবাদতের সাওয়াব নিশ্চয় পৌঁছে থাকে। আমি কাউকে স্বীয় সম্পদ দিয়ে দিলে এতে নিজের কোন স্বত্ত্ব বাকী থাকে না, আর কয়েকজনকে দিলে তা তাদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে যায়; কিন্তু সাওয়াব যদি সবাইকে বখশিশ করা হয়, তাহলে সবাই পরিপূর্ণরূপে পায় এবং প্রদানকারী নিজেও বঞ্চিত হয় না। যেমন অন্যদের ক্বোরআন পড়ানো হলো; এরপর তারা সবাই ক্বোরআন পড়তে শিখলো এতে শিক্ষাদাতার জ্ঞান খর্ব হয় না বা হ্রাস পায়না। এ প্রসঙ্গে 'ফাতাওয়া-ই শামী' প্রথম খণ্ড **دفن الميت** (মৃত্যুকে দাফন করা) শীর্ষক আলোচনাটুকু দেখুন। শিশুদের থেকে উপহার গ্রহণ করা নিষেধ; কিন্তু সাওয়াব গ্রহণ করা জায়েয। কেননা ক্বোরআনুল করীমে উল্লেখিত আছে- **لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ** (তার জন্য ওই কল্যাণ ভালই যা সে উপার্জন করেছে, আর তার জন্য ক্ষতি, যেই মন্দ সে উপার্জন করেছে। [২:২৮৬] ক্বোরআনুল কারীমে আরও আছে-**لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعٰى** মানুষের জন্য নেই, কিন্তু যার সে প্রচেষ্টা চালিয়েছে।

এখানে **لـلانسـان** এর **لام** অব্যয়টি মূলধন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ মানুষের জন্য নির্ভরযোগ্য বিষয় ও মূলধন হচ্ছে নিজেরই আমলসমূহ। কেউ ঈসালে সাওয়াব করুক বা না-ই করুক, এ আশায় যেন কেউ স্বীয় আমল থেকে উদাসীন না থাকে। (তাফসীরে খাযা-ইনুল ইরফান ইত্যাদি দ্রষ্টব্য) অথবা এ হুকুমটা হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম ও হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামকে প্রদত্ত সাহীফাসমূহের ছিলো, ইসলামের নয়। এখানে সেটা উদ্ধৃত করা হয়েছে মাত্র। অথবা উপরোক্ত আয়াতটা এ আয়াতে দ্বারা মনসুখ বা রহিত হয়েছে- **وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيْمَانٍ** (ঈমানের ক্ষেত্রে তাদের সন্তান-সন্ততিরা তাদের অনুসরণ করে)। এটা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের অভিমত। এজন্য মুসলমানদের শিশুরা তাদের মাতা-পিতার বদৌলতে বেহেশতে যাবে এবং আমল ছাড়া পদমর্যাদা লাভ করবে। অথবা এ আয়াত দ্বারা দৈহিক আমলসমূহের ব্যাপারে অন্যের উপর ভারার্পণকে নাকচ করা হয়েছে। এ কারণেই ওই আয়াত দু'টির **سعى** ও **كسب**-এর উল্লেখ আছে কিন্তু ঈসালে সাওয়াবের উল্লেখ নেই, এ আয়াতে ন্যায় বিচার ও ফযীলতের কথা বলা হয়েছে। মোট কথা এর অনেক বিশ্লেষণ আছে। ফাতিহা, কুলখানি, গিয়ারভী ও চেহলাম ইত্যাদি ঈসালে সাওয়াবের আংশিক আয়োজন মাত্র। অন্যথায় এগুলোতে ক্বোরআন তিলাওয়াত, দৈহিক ইবাদত ও আর্থিক সাদক্বাহ্ একত্রিত করে সাওয়াব পৌঁছানো হয়।

---<>---

বিবাহ

বিবাহ মানে পুরুষ ও নারী বৈধভাবে দাম্পত্য জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে পরস্পর বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হওয়া।

হযরত আদম আলায়হিস্ সালামের শরীয়ত হতে আমাদের নবীর সর্বশেষ শরীয়ত পর্যন্ত অবৈধভাবে স্ত্রী-পুরুষ পরস্পর মেলা মেশা করার বিধান কোথাও নেই। বিবাহ প্রথা যে ন্যায়সঙ্গত, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে ফলপ্রদ, এতে কোন সন্দেহ নেই। আসমানী কিতাবগুলোতে এর উপকারিতা বিশদভাবে বর্ণিত আছে।

আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হচ্ছে সমস্ত জীবকে বিশেষতঃ মানবকে সুনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত বংশ বিস্তারের মাধ্যমে জীবিত ও স্থায়ী রাখা। এ জন্য অন্যান্য জীবজন্তু কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করে বংশ বৃদ্ধি করে, কিন্তু জীবশ্রেষ্ঠ মানবের একটা বৈশিষ্ট্য আছে।

যেনতেনভাবে কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা মানব প্রকৃতিতে মোটেই শোভা পায় না। কিন্তু আল্লাহ পাক মানবের অন্তরে যে কামভাব সৃষ্টি করেছেন, তা অন্যান্য জীব হতে এক প্রকার স্বতন্ত্র; তা পূর্ণ করার পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া তিনি নির্দ্ধারণ করে দিয়েছেন।

অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে সম্মত ও সন্তুষ্ট হয়ে কতগুলি নিয়মের অধীনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হতে পারবে। এরূপ আবদ্ধ হওয়াকে বিবাহ বন্ধন বলে। এরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ না হয়ে পশুর মত কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করলে সেটাকে পাশবিক অত্যাচার, ব্যভিচার ও যৌন-অনাচার (যিনা) বলে, যা প্রত্যেক ধর্মেই নিন্দনীয়।

বিবাহ কেন?

বংশ রক্ষা করা বিবাহের অন্যতম প্রধান কারণ। কিন্তু বিবাহ না করে ব্যভিচার করলে কুলভ্রষ্ট হয়, বংশ রক্ষা হয় না। কিন্তু স্ত্রী-পুরুষ বৈধভাবে প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হলে উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতি, ভালবাসা জন্মে, উভয়ে মিলে সন্তান-সন্ততিদের লালন-পালন ভালভাবে করতে পারে। এতে সুষ্ঠুভাবে বংশ রক্ষা হয়। বংশ রক্ষারও প্রয়োজন আছে; নচেৎ বংশ বিলুপ্ত হলে তাদের নাম পৃথিবী হতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

বিবাহের মাধ্যমে যেমন নিয়মিত বংশ রক্ষা করা হয়, ঠিক সেভাবে বংশ বিস্তারও হয়। বংশ পরম্পরায় স্নেহ, ভালবাসা ও ভক্তি-শ্রদ্ধা বিনিময় হয়। স্ত্রীর উপযুক্ত অধিকার, মর্যাদা ও সম্মান সহকারে সুবিচারও তাদের প্রতি স্বীয় কর্তব্য পালন করার অনুভূতি আপনা হতেই জন্মায়। এ ছাড়া নর-নারীর সহজাত আকর্ষণে মিলনাকাঙ্ক্ষা বৈধ সম্ভোগের মাধ্যমে পরিতৃপ্ত হয়ে মানবাত্মা স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞ হতে পারে। মোট কথা বিবাহের মাধ্যমে বহু উপকার সাধিত হয়। সেই জন্য বিবাহ করা ও না করা সম্বন্ধে চার প্রকার বিধান আছে। যথাঃ

১. **বিবাহ করা ফরযঃ** কাম প্রবৃত্তি প্রবল হলে, এমনকি ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা হলে, ভরণ-পোষণেও সম্পূর্ণ সক্ষম হলে বিবাহ করা ফরয বা অবশ্যই

কর্তব্য; না করলে গুনাহগার হতে হবে।
২. কাম-প্রবৃত্তি প্রবল নয়; বরং মধ্যবর্তী অবস্থায় থাকে। এমতাবস্থায় বিবাহ করা সুন্নাতে মোআক্কাদাহ্।
৩. বিবাহ করা মুস্তাহাব, যদি পুরুষ কোন মতে সংসার যাত্রা নির্বাহ করে।
৪. বিবাহ করা হারাম, যদি পুরুষ শারীরিক যোগ্যতা না রাখে ও স্ত্রীর ভরণ পোষণে সম্পূর্ণ অক্ষম হয়।

বিবাহে কি দেখতে হবে?

সংসার সুখের হয় রমনীর গুণে। তাই পাত্রীর নিম্নলিখিত বিষয়গুলো দেখতে হবেঃ পাত্রী যেন সতী, সুলক্ষণা, উচ্চ বংশীয়া, কোমল হৃদয় ও প্রশস্তমনা, দানশীলা, পাত্র অপেক্ষা বয়সে কণিষ্ঠা, অর্থ ও সামর্থ্যবতী ও সন্তান প্রসবিণী হয়। বদ মেজাজী ও জেদী না হওয়া চাই।

আর পাত্রের মধ্যে নিম্মোক্ত চরিত্রগুলোও লক্ষণীয়-

সমগোত্রীয় কি না। বয়সে অতিরিক্ত ব্যবধান না হওয়া চাই । পাত্র সুপুরুষ, স্বাস্থ্যবান, অন্ন-বস্ত্রদানে সামর্থ্যবান, সদয়, সুহৃদয় এবং কোমলমনা হওয়া চাই। অনেক সময় সঠিক বিচার করা যায় না, সে ক্ষেত্রে এস্তেখারার নামায পড়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, যা মুস্তাহাব। এতে আল্লাহর সাহায্য পাওয়া যায়।

বিবাহ কীভাবে সম্পন্ন করতে হয়?

বিবাহের ঈজাব-কবূল অর্থাৎ প্রস্তাব ও গ্রহণ প্রকাশ্য সভায় হওয়া উচিত। শুক্রবারে মসজিদে বসে বিবাহের ঈজাব- কবূল সম্পন্ন করা মুস্তাহাব। কনেপক্ষের অভিভাবক দ্বারা বিবাহের খোৎবা পাঠ করা সুন্নাত। উপস্থিত শ্রোতাগণ তা মনযোগসহকারে শুনবেন।

বিবাহের রুকন ও শর্তাবলী

ক. বিবাহের রুকন হচ্ছে- ঈজাব-কবূল

১. ঈজাব-কবূলের জন্য অতীত কালের শব্দ ব্যবহার করতে হয়। যথা- বিবাহ দিলাম, কবূল করলাম।
২. ঈজাব-কবূলের শব্দ স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হতে হবে। ঈজাবের শব্দ সমাপ্ত হলে তারপর কবূলের শব্দ বলতে হবে।
৩. ঈজাব-কবূলের ভাবার্থ যেন এক হয়।
৪. ঈজাব- কবূলের সময় স্ত্রীর নাম ও পিতার নাম ইত্যাদি যেন উল্লেখ করা হয়।
৫. ঈজাব- কবূলের শব্দ যেন উভয় পক্ষ শ্রবণ করে।
৬. ঈজাব- কবুলে ‘বিবাহ’, ‘নিকাহ’ ইত্যাদি শব্দ যেন ব্যবহার করা হয়।

খ. বিবাহের পূর্বশর্ত হচ্ছে সাক্ষী

১. দু’জন পুরুষ কিংবা একজন পুরুষ ও দুই জন নারী বিবাহে সাক্ষী হবেন।
২. সাক্ষী স্বাধীন, প্রাপ্ত বয়স্ক, বোধশক্তি সম্পন্ন ও মুসলমান হওয়া চাই।

যাদের সাথে বিবাহ হারাম

সূরা নিসার ২৩ ও ২৪ নং আয়াতের এরশাদ অনুসারে নিম্নলিখিত নারীদের সাথে বিবাহ করা হারাম-

১. মাতাগণ, এতে ওইসব নারীও অন্তর্ভুক্ত, যাদের পিতা কিংবা মাতার মধ্যস্থায় বংশ প্রত্যাবর্তন করে অর্থাৎ দাদী ও নানীগণ, চাই নিকটের হোক কিংবা দূরের; সবই মায়ের বিধানের অন্তর্ভুক্ত। (অর্থাৎ তাদের সাথে বিবাহ হারাম।)
২. কন্যাগণ। পৌত্রীগণ ও নাত্নীগণ-যে কোন স্তরের হোক না কেন, কন্যাদের বিধানভুক্ত, ৩. বোনগণ, ৪.ফুফুগণ, ৫.খালাগণ, ৬. ভ্রাতুস্পুত্রীগণ,৭.ভাগ্নীগণ।

উল্লেখ্য, এর সবাই সহোদরা হোক কিংবা বৈমাত্রেয়া।

দ্বিতীয়ত এর পর ওইসব নারীর কথা উল্লেখ করা হচ্ছে, যারা অন্য কোন কারণে হারাম হচ্ছে। যেমন-

৮. তোমাদের ওইসব মাতা, যারা দুধ পান করিয়েছে। উল্লেখ্য, দুধের জ্ঞাতিবন্ধনে, স্তন্যপানের নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে, অল্প পরিমাণ দুধ পান করা হোক কিংবা বেশী, তার সাথে হারামের বিধান সম্পৃক্ত হয়। স্তন্য পানের সময়সীমা হযরত ইমাম আ'যম আবূ হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর মতে, ত্রিশমাস এবং সাহিবাঈন (ইমাম আবূ ইয়ূসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ রাহিমাল্লাহ্)-এর মতে, দু ’বছর। এ সময়সীমার পর দুধ পান করা হলে তার সাথে হারামের বিধান সম্পৃক্ত হয় না। দুধ পানের সম্পর্ক বংশীয় সম্পর্কের মতোই। হাদীস শরীফে হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, ‘‘স্তন্য পান করার কারণে ওইসব আত্মীয়তা হারাম হয়ে যায়, যেগুলো বংশের কারণে হারাম হয়।’’ বিস্তারিত জানতে হলে- তরজুমা ও তাফসীর-ই ক্বোরআন ‘কানযুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান’-এ ২৩নং আয়াতের তাফসীর দেখুন।
৯. দুগ্ধবোন।
১০.স্ত্রীদের মাতাগণ। [উল্লেখ্য, এখান থেকে ওইসব নারীর বর্ণনা রয়েছে, যারা বৈবাহিক সূত্রে সম্পর্কের কারণে হারাম হয়। তারা হলো তিনজনঃ স্ত্রীদের মাতাগণ, স্ত্রীদের কন্যাগণ ও পুত্রদের স্ত্রীগণ। স্ত্রীদের মাতাগণ শুধু বিবাহের আক্বদের কারণেই হারাম হয়ে যায়। চাই ওইসব নারী সহবাসকৃত হোক, কিংবা সহবাসকৃত না-ই হোক]
১১.স্ত্রীদের ওইসব কন্যা, যারা তোমাদের কোলে (লালন-পালনাধীন) রয়েছে। ওইসব স্ত্রীদের থেকে যাদের সাথে তোমরা সহবাস করেছো; অন্যথায় নয়। (উল্লেখ্য, কোলে থাকা, অধিকাংশ অবস্থার বিবরণ মাত্র, হারাম হবার জন্য পূর্বশর্ত নয়।)
১২.তোমাদের ঔরশজাত পুত্রদের স্ত্রীগণ। [সুতরাং পোষ্য পুত্রের স্ত্রীর সাথে যথা নিয়মে বিবাহ হারাম নয়; বৈধ। কিন্তু দুগ্ধ পুত্রদের স্ত্রীগণ হারাম। কারণ, তারাতো ঔরশজাত পুত্রদের বিধানভুক্ত। আর পৌত্র ও পৌত্রীগণ পুত্রদের অন্তর্ভুক্ত।

১৩. দু' বোনকে একত্রিত করা। [এটাও হারাম, চাই উভয় বোনকে বিবাহ দ্বারা একত্রিত করা হোক, কিংবা দু' (সহোদরা) দাসীকে মালিকানা সূত্রে সহবাসের মাধ্যমে করা হোক, আর হাদীস শরীফে ফুফু-ভাতিজী ও খালা-ভাগ্নীকে বিবাহে একত্রিত করা হারাম সাব্যস্ত হয়েছে। এর নিয়ম হচ্ছে বিবাহে এমন দু'জন স্ত্রীকে একত্রিত করা হারাম, যাদের মধ্যকার কোন একজনকে পুরুষ কল্পনা করলে অপরজন (তার কল্পিত পুরুষ)'র জন্য হালাল হয় না। যেমন ফুফু ও ভাতিজী। অর্থাৎ যদি ফুফুকে পুরুষ কল্পনা করা হয়, তবে সে চাচা হলো, সুতরাং ভাতিজী তার জন্য হারাম। আর যদি ভাতিজীকে পুরুষ কল্পনা করা হয়, তবে সে ভাতিজা হলো। কাজেই ফুফু তার জন্য হারাম হলো। এ হারাম হওয়া উভয় দিক থেকেই। আর যদি এক দিক থেকে হয় তবে একত্রিত করা হারাম হবে না।

[**সূত্র :** খাযাইনুল ইরফান : আয়াত ২৩ এর তাফসীর দেখুন]

১৪. সধ্বা নারীরা (অর্থাৎ বিবাহিতা স্বামীসম্পন্ন নারীদের বিবাহ্ করা হারাম। এ চৌদ্দ প্রকারের নারীগণ ব্যতীত অন্যসব নারীর সাথে বিবাহ করা হালাল বা বৈধ। যেমন-আল্লাহ তা'আলা এরশাদ ফরমান-

وَاُحِلَّ لَكُمْ مَاوَرَآءَ ذٰلِكُمْ الاية ..

(এবং এসব ছাড়া যারা অবশিষ্ট আছে তারা তোমাদের জন্য হালাল ।) [৪:২৪]

বিবাহ্ পড়ানোর নিয়ম

'ঈজাব' ও 'কবূল'-এ দু' মৌলিক কথা দ্বারাই বিবাহ্ সম্পন্ন হয়। দু'জন সাক্ষী থাকা পূর্বশর্ত। 'ঈজাব' হলো প্রস্তাব আর 'কবূল' হলো সম্মতি। স্ত্রী আত্মদানের বিনিময়ে স্বামী থেকে যে অর্থ বা ধনপ্রাপ্ত হয়, তা হলো 'মহর'। মহর স্বামীকে অবশ্যই পরিশোধ করতে হয়। পরিশোধ না করলে স্বামী গুনাহ্গার হয়। অবশ্য স্ত্রী স্বেচ্ছায় ক্ষমা করে দিলে স্বামী দায়মুক্ত হবে।

এখন দেখুন বিবাহ্ কিভাবে সম্পন্ন করতে হয়। পাত্রী 'বালেগা' (সাবালিকা) হলে পাত্রীর ওলী কিংবা উকিল দু'জন বালেগ মুসলমান সাক্ষীকে সাথে নিয়ে পাত্রীর নিকট গিয়ে প্রস্তাব পেশ করবেন- "অমুক জায়গার (গ্রাম/থানা ইত্যাদি) অমুকের পুত্র এত টাকা মহর দিয়ে আমাদের ইসলামী শরীয়ত অনুসারে কাবিনের শর্তাবলী মেনে নিয়ে তোমাকে শাদী করতে এসেছে কিংবা চায়। তার সাথে তোমার বিবাহ্ দেওয়ার জন্য আমাকে উকিল নিয়োগ করতে তুমি রাজি আছ কি?" পাত্রী এতে রাজি আছে বলে মত প্রকাশ করলে, একই কথা দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার বলে পাত্রীর সম্মতি নেবেন। এটাকে 'ইয্ন'ও বলা হয়। এখন ঈজাব বা ইয্ন গ্রহণ সম্পন্ন হলো।

তারপর এ ওলী অথবা উকিল ওই দু'জন সাক্ষীসহ বিবাহ্ মজলিসে এসে উপস্থিত হবেন। তারপর পাত্রকে ক্বেবলামুখী করে বসাবেন। তারপর ওলী কিংবা উকিল পাত্রের মুখোমুখী হয়ে বসে নিম্নলিখিত খোৎবা পাঠ করবেন। ওলী কিংবা উকিল খোৎবা পাঠ করতে না পারলে অন্য কেউ, যিনি খোৎবা পাঠ করতে পারেন, খোৎবাটা পাঠ করবেন। মজলিসে 'কবূল' সম্পন্ন করার পূর্বে খোৎবা পাঠ করা সুন্নাত।

বিবাহের খোৎবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّ نِسَآءً ج وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَ الْاَرْحَامَ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ـ فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلاَثَ وَرُبٰعَ فَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً ـ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلاَ تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ ـ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ فَمَنْ رَّغِبَ عَنْ سُنَّتِىْ فَلَيْسَ مِنِّىْ ـ وَقَالَ تَعَالٰى يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ـ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ـ

খোৎবা পাঠ সমাপ্ত হলে ওলী কিংবা উকিল 'বিসমিল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহ্' বলে সাক্ষীদ্বয়ের উপস্থিতিতে পাত্রকে লক্ষ্য করে বলবেন-"অমুক জায়গা নিবাসী অমুকের কন্যা অমুককে এত টাকা মহরের 'এওয়াযে' (বিনিময়ে) রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শরীয়ত অনুসারে কাবীনের শর্তানুসারে তোমার যাউযিয়াতে সোপর্দ করলাম। (বিবাহ্ দিলাম।) তুমি কবূল করলে তো?" তখন পাত্র কবুল করলে তা স্পষ্টভাষায় বলবে- 'আলহামদুলিল্লাহ্ ওয়াস্ সালাতু ওয়াস্ সালামু আলা রসূলিল্লাহ্, আমি কবূল করলাম' এভাবে তিনবার বলা হবে আর পাত্র তা স্পষ্টভাষায় বলে 'কবূল' করেছেন মর্মে ঘোষণা করবেন। এখন 'কবূল'ও সম্পন্ন হলো। এভাবে শরীয়তমত বিশুদ্ধ বিবাহ্ সম্পন্ন হয়। তারপর নিম্নলিখিত আয়াত শরীফ ও দরূদ শরীফ পাঠ করে বর, কনে ও উভয়পক্ষের সুখ-শান্তি কামনা করে দো'আ-মুনাজাত করবেন-

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِىِّ ـ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ـ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ ـ

দাম্পত্য জীবনের কিছু জরুরী বিষয়

১. চান্দ্র মাসের ১ তারিখ, ১৫ তারিখ ও শেষ তারিখ স্ত্রী সহবাস নিষেধ। এটা অমান্য করলে বহুমুখী ক্ষতির আশংকা রয়েছে। অনুরূপ অমাবস্যা, পূর্ণিমা, চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের সময়ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকতে হয়। অন্যথায় ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে।

২. মঙ্গলবার দিবাগত রাতে স্ত্রী সহবাসের ফলে সহবাসকারী দরিদ্র হয় এবং সন্তান জন্ম হলে সন্তান উন্মাদ অথবা চিররোগী, খুনী ও অত্যাচারী হয়। তাছাড়া, শনিবার দিবাগত রাতের মিলনেও মানুষ দরিদ্র হয় এবং সন্তান পয়দা হলে ওই সন্তান ভাগ্যহীন হয়। ওই সন্তান পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়। উল্লেখিত নিষিদ্ধ দিনগুলো ব্যতীত সোমবার, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার ও শনিবার স্ত্রী মিলন করাই উত্তম। তন্মধ্যে সোমবার, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার সর্বোৎকৃষ্ট। এ সমস্ত দিনে চান্দ্র মাসের নিষিদ্ধ তারিখ পড়লে তাও বর্জন করতে হবে। অতিরিক্ত স্ত্রী মিলনে আয়ু কমে যায় এবং অকালে বৃদ্ধ হয়।

৩. খাওয়ার পর ভরা পেটে, রাত্রির প্রথম অংশে অথবা পশ্চিম মুখী হয়ে স্ত্রী মিলন করলে যে সন্তান পয়দা হয় সে মূর্খ, স্মরণ-শক্তিহীন ও নির্বোধ হয়।

৪. ভুক্ত দ্রব্য হজম হওয়ার পর, মধ্য রাত্রির পর ও শেষ রাতে স্ত্রীস সহবাস করাই উত্তম।

৫. হায়য ও নিফাস (যথাক্রমে ঋতুস্রাব ও প্রসবোত্তর রক্তক্ষরণ অবস্থায় স্ত্রী সহবাস হারাম।

৬. স্বপ্নদোষ হওয়ার পর গোসল না করে স্ত্রী সহবাস করলে এবং এর ফলে সন্তান পয়দা হলে ওই সন্তান পাগল অথবা কৃপণ হবে। সুতরাং এটা অবশ্যই বর্জনীয়।

৭. ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার রাতে এবং বিদেশ গমনের রাতে স্ত্রী সহবাস হতে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। অন্যথায় সন্তান কোন না কোন দোষে দোষী হবে।

৮. স্ত্রী সহবাসের পূর্বে নিম্নলিখিত দো'আ অবশ্যই পাঠ করবে এবং স্বামী-স্ত্রী ওযূ করে নেয়া উত্তম।

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

উচ্চারণঃ বিসমিল্লাহি আল্লা-হুম্মা জান্নিবনাশ শায়ত্বানা ওয়া জান্নিবিশ শায়ত্বানা মা-রাযাক্বতানা।

অর্থাৎ আল্লাহর নামে আরম্ভ করলাম। হে আল্লাহ! আমাদেরকে শয়তান থেকে দূরে রাখো এবং শয়তানকেও আমাদের থেকে দূরে সরিয়ে রাখো।

৯. স্ত্রী সহবাসের সময় সমস্ত শরীর চাঁদর দ্বারা ঢেকে রাখা অতি উত্তম এবং মাথায়ও কাপড় রাখতে বলা হয়েছে। অন্যথায় সন্তান বেয়াদব ও লজ্জাহীন হবার সম্ভাবনা থাকে।

১০. স্ত্রী সহবাসের কিছুক্ষণ পরে উভয়েই প্রস্রাব করে নেয়া উত্তম; অন্যথায় রোগ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তারপর উভয়েই গোসল করে পাক হতে হবে।

নাপাক অবস্থায় ঘুমানো ভাল নয়; গোসল বিলম্বে করার মনস্থ করলে ওযূ করে ঘুমানো উত্তম।

১১. অতিরিক্ত শীত ও অতিরিক্ত গরমের সময় স্ত্রী সহবাস করা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। অতিরিক্ত স্ত্রী সঙ্গমও স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর এবং অকালে বার্ধক্য আনে।

১২. স্ত্রী মিলনের সময় অতিরিক্ত কথা বললে সন্তান বোবা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

১৩. স্ত্রীর গর্ভে সন্তানের বয়স পাঁচ মাস অতিবাহিত হওয়ার পর স্ত্রী টাটকা ও ভাল খাদ্য আহার করলে সন্তান সুন্দর ও স্বাস্থ্যবান হয়।

১৪. পবিত্র রমযান মাসে স্ত্রী সহবাস না করাই উত্তম। অবশ্য রাতের বেলায় স্ত্রী সহবাস নিষিদ্ধ নয়। অনুরূপ, স্ত্রীর গর্ভে সন্তানের বয়স পাঁচ মাস আরম্ভ হওয়ার পর হতে সহবাস না করা উচিত। উভয় ক্ষেত্রে বহুবিধ উপকার রয়েছে।

বিবাহে যৌতুক প্রথা, মহর নির্ধারণ ও অনুষ্ঠানাদি

বিয়ে-শাদীতে কনের পিতা-মাতা বা অভিভাবকগণ কনের নতুন সংসার গঠনের জন্য স্বেচ্ছায় ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে কন্যার প্রতি স্নেহের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে প্রয়োজনীয় কিছু উপহার হিসেবে দিতে পারেন। এটা সুন্নাতও। এ'তে উভয়পক্ষের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও সম্প্রীতি বাড়ে। এতে কোন পক্ষ যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, তেমনি বিয়ে-শাদীর সহজ পন্থাও ব্যাহত হয় না।

উল্লেখ্য, বিয়ে-শাদী যেমন সুন্নাত, তেমনি তাতে রয়েছে অনেক ফযীলত বা উপকার। সৃষ্টির সেরা মানুষের বংশীয় ধারার পবিত্রতা রক্ষা, শিশুর পিতৃপরিচয় নিশ্চিতকরণ, তার প্রতিপালন ও শিক্ষা-দীক্ষার নিশ্চয়তা বিধান, দাম্পত্য জীবন যাপনের মাধ্যমে মানব-জীবনে এক সুন্দর শৃংখলা আনয়ন এবং মারাত্মক রোগ-ব্যাধি থেকে নিরাপদ জীবন যাপন ইত্যাদি শরীয়তসম্মত বিয়ে-শাদীর মাধ্যমেই সম্ভব। এ কারণে ইসলামে বিয়ে-শাদীর বিধান রয়েছে। বাস্তবক্ষেত্রেও বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিয়ে-শাদীর নিয়মাবলীকে একেবারে সহজ করে দিয়েছেন। তিনি নিজের স্নেহের কন্যা হযরত ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার শাদী মুবারক, নিজের পবিত্র শাদীগুলো এবং সাহাবা-ই কেরামের মধ্যে বিবাহ্বন্ধনের নিয়মাবলী ও তাঁর অমীয় বাণী (হাদীস শরীফগুলো)'র মাধ্যমে বিয়ের সহজ-সরল ও পবিত্র মডেল স্থাপন করে দিয়েছেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমানে অ-ইসলামী যৌতুক প্রথা এ পবিত্র পদ্ধতিকে জটিল ও অমানবিক পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দিয়েছে।

সুতরাং বরপক্ষ কনে পক্ষের নিকট থেকে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে দাবী করে যৌতুক উসূল করা ইসলাম সমর্থন করে না। এতে কনে পক্ষ যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তা সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত। এ দাবীকৃত যৌতুক আদায়ে অপারগ হলে হয়তো বিয়ে হচ্ছে না। হলেও ভেঙ্গে যাচ্ছে অথবা অবিবেচক বরপক্ষের হাতে কনে ও কনেপক্ষ লাঞ্ছিত হচ্ছে। এমনকি এ অমানবিক প্রথার বলি হয়ে প্রাণ হারাচ্ছে

অগণিত নিরীহ গৃহবধূ। বিয়ে-শাদীর মাধ্যমে যেখানে পারস্পরিক ভালবাসার বন্ধন সৃষ্টি হবার কথা, সেখানে সৃষ্টি হচ্ছে লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ ও ঘৃণার মতো অনভিপ্রেত অনেক কিছু। এখানে একটি বিষয় স্মর্তব্য যে, এ ধরনের দাবীকৃত কিংবা লোভকৃত যৌতুক প্রথার জন্ম হয়েছে ওইসব ধর্মাবলম্বী কিংবা সমাজ থেকে, যাদের ধর্মে বা সমাজে পিতার সম্পত্তিতে কন্যা সন্তানের জন্য মীরাস বা উত্তরাধিকার নির্ধারিত নেই। সুতরাং এমন ধর্মাবলম্বী ও সমাজের লোকেরা তাদের কন্যাকে বিয়ে দেওয়ার সময় যথাসম্ভব মালামাল বা অর্থকড়ি স্বেচ্ছায় কিংবা বরপক্ষের দাবীর মুখে দিয়ে থাকেন কিংবা দিতে বাধ্য থাকেন। কিন্তু আমাদের পূতঃপবিত্র দ্বীন-ইসলাম এমন কোন সমস্যা রাখেনি। পিতার সম্পত্তিতে কন্যার নির্ধারিত অংশ রয়েছে। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত উপহার ও আতিথ্যের বিধান রয়েছে আমাদের পবিত্র ধর্মে। সুতরাং যারা দাবী করে, অনেকটা জোরপূর্বক যৌতুক উসূল করতে চায় তারা এমন একটি সুন্নাতসম্মত বিষয়কে কেন্দ্র করে অ-ইসলামী পন্থায় অন্যের ধন হাসিল করতে গিয়ে যে নিজের দুনিয়া ও আখিরাতের সুখ-শান্তিকে জলাঞ্জলি দিচ্ছেন তা স্পষ্ট। তাই, আসুন এ বিষয়েও আল্লাহ্ ও তাঁর হাবীবের শিক্ষা, বিধানকেই অবলম্বন করি।

দ্বিতীয়তঃ 'মহর' স্ত্রীর হক্ব। বিয়ের আক্বদের পর স্ত্রীর সাথে শরীয়তসম্মত নির্জনতা কিংবা সহবাসের মাধ্যমে স্বামীর উপর স্ত্রীর 'মহর' ওয়াজিব হয়ে যায়। মহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ (দশ দিরহাম) নির্ধারিত থাকলেও সর্বোচ্চ পরিমাণ শরীয়ত নির্ধারণ করেনি। তাই দম্পত্তির সম্মতিতে সাধারণত এ মহরের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। অন্যথায় 'মহরে মিস্‌ল্ তো আছেই। অবশ্য এ 'মহর' নগদে কিংবা বাকীতে অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে স্বামীকে। স্ত্রী স্বেচ্ছায় ক্ষমা না করলে কিংবা স্বামী পরিশোধ না করলে স্বামী তা থেকে অব্যাহতি পান না। এ ক্ষেত্রে মহর মাফ করানোর জন্য স্বামীর পক্ষ থেকে নানা অপকৌশল অবলম্বন করা হয় বলেও প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও আল্লাহর ভয় অন্তরে রেখে স্ত্রীর মহর সম্পর্কিত হক্ব আদায় করার ব্যাপারে যত্নবান ও সতর্ক হওয়া দরকার।

তৃতীয়তঃ আমরা সবাই জানি, বিবাহ্-শাদী সুন্নাত। সুতরাং সুন্নাতসম্মত উপায়ে এ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করলে তা ইবাদতের সামিল। আরো মনে রাখতে হবে যে, বংশীয় ধারার পবিত্রতা, নেক্কার-পরহেযগার ও বাধ্য-অনুগত সুসন্তান লাভ করাও অনেকটা নির্ভর করে ইসলামসম্মত বিশুদ্ধ বিবাহ্-বন্ধন প্রতিষ্ঠার উপর। এ জন্য স্ত্রী সহবাসেরও সুন্নাতসম্মত নিয়ম রয়েছে ইসলামে। অন্যথায় বিশেষ মুহূর্তে শয়তান হস্তক্ষেপ করে সন্তানের চরিত্রকে প্রভাবিত করার আশংকা থাকে।

আল্লাহ্ পাকের অশেষ কুদরত ও বদান্যতায় এর ব্যতিক্রমও হয়ে থাকে। এটা অবশ্য স্বতন্ত্র ব্যাপার। আমাদেরকে স্বাভাবিক ও সাধারণ নিয়মে আল্লাহ্ ও তাঁর বিধানাবলী অনুসরণ করতে হবে।

এখন দেখা যাচ্ছে যে, বিধর্মীদের যৌতুক প্রথার মতো আমাদের মুসলিম সমাজে বিবাহ্ অনুষ্ঠানেও নানা অ-ইসলামী প্রথার অনুপ্রবেশ ঘটছে। সাদা-মাঠাভাবে আক্বদ অনুষ্ঠান কোন মসজিদ বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে সম্পন্ন হয়, আর বাকী সব ক'টি অনুষ্ঠান হয় সম্পূর্ণ অনৈসলামিক পন্থায়। একেত পুরুষের জন্য মেহেদীর ব্যবহার বিতর্কিত বিষয়; তদুপরি, এ অনুষ্ঠানের নামে চলে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, নাচ-গান, আতশ-বাজি ও পটকা পোড়ানো ইত্যাদি। অবস্থাদৃষ্টে বুঝা যায় এ ধরনের বিয়ে অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে কত অর্থের অপচয় হয়, কত প্রকারের গুনাহ্ সম্পন্ন হয়। বিয়ের আগে যেখানে দাম্পত্য জীবনের ইসলাম

সম্মত অগণিত নিয়মাবলী শিক্ষা ও দাম্পত্য জীবনে সুখ-শান্তির জন্য আল্লাহর দয়া কামনার জন্য সুন্নী ওলামা-মাশাইখের ওয়াজ ও দো'আ মাহফিলের আয়োজন করা শ্রেয়, সেখানে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে মুসলিম পরিবারগুলো আয়োজন করছে- নাচ-গান, প্যাকেজ শো ও রঙ্গ-তামাশার অনুষ্ঠান। অথচ এ ধরনের অনুষ্ঠান করে থাকে অমুসলিম সম্প্রদায়ের লোকেরা। তাদেরই অন্ধ অনুসরণে দেয়া হচ্ছে বিয়ে-শাদীর খুশী প্রকাশের ভুল ব্যাখ্যা। বিশেষত লক্ষণীয় যে, মেহেদী অনুষ্ঠানের প্যাকেজ শোগুলো তৈরী এবং মোটা অঙ্কের বিনিময়ে সরবরাহ্ ও ব্যবস্থা করে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে কাফির-মুশরিকরা। যাদের নেই পরকালে বিশ্বাস। দুনিয়ার আরাম-আয়েশ, আনন্দ-আহলাদই যাদের তথাকথিত ধর্ম। কুফরী ও শিরকি বাক্যাবলী সম্বলিত গান, সঙ্গীত এবং অর্দ্ধ উলঙ্গ বা আটসাঁট পোশাক পরিহিত, গায়িকা ও নর্তকীদের সমন্বয়ে তৈরীকৃত প্যাকেজগুলো প্রকাশ্যে নিলর্জ্জভাবে পরিবেশিত হচ্ছে। সারারাত নারী-পুরুষের অবাধ উপভোগের ব্যবস্থা করা হচ্ছে এ সব অনুষ্ঠানে। সঙ্গীত-যন্ত্রপাতির বিকট শব্দ, গায়ক-গায়িকা ও নর্তক-নর্তকীদের কুরুচিপূর্ণ ধ্বনি ও সুরে এলাকার পরিবেশ হয় দূষিত, শব্দ দূষণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ছাত্র-ছাত্রী ও হৃদরোগসহ অনেক রোগী। বিয়ের পূর্বরাতে সন্তানের বিয়ের এমন প্যাকেজ অনুষ্ঠানের অসহনীয় অবস্থা সহ্য করতে না পেরে অনেক হৃদরোগী মাতা-পিতার মৃত্যুর খবরও শোনা গেছে। ফলে আনন্দঘন বিয়েবাড়িতে নেমে আসে শোক-মাতম।

বলাবাহুল্য, সাধারণ খ্রিস্টানদের সমাজে এহেন অনুষ্ঠানের প্রচলন হয়। অথচ তারা এসব অনুষ্ঠান করে কোন শব্দ নিয়ন্ত্রিত হলে। আর আমাদের মুসলমান নামধারী লোকেরা এসব অনুষ্ঠান করে বাড়ীর খোলা অঙ্গনে, দালানের ছাদে কিংবা বস্তির কোন খোলা জায়গায়। সুতরাং এসব পাপ কাজের কুপ্রভাব নব-দম্পতির জীবনের উপর এবং আয়োজনকারীদের স্বাভাবিক জীবনের উপর যে অবশ্যই

পড়বে- তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। সুতরাং সময় থাকতে মুসলিম সমাজকে সাবধান হতে হবে। নিজেদের ধর্মীয়, সামাজিক অনুষ্ঠানাদি, সামাজিক পরিবেশকে অনৈসলামিক ও ক্ষতিকর কর্মকাণ্ড থেকে মুক্ত রাখতে হবে। এক্ষেত্রে চাই সবার ব্যক্তিগত সচেতনতা ও সম্মিলিত উদ্যোগ।

বিবাহ্ শাদী উপলক্ষে ওয়াজ-মাহফিল বাদ্যযন্ত্রহীন গজল-মুশা'আরাহ্ এবং না'তখানি ইত্যাদি ইসলামী অনুষ্ঠানাদি আয়োজন করা যেতে পারে। এতেই সকলের মঙ্গল। আল্লাহ্ পাক তাওফীক্ব দিন। আ-মী-ন।

স্বামী ও স্ত্রীর কর্তব্য

স্বামীর কর্তব্য

১. প্রয়োজন হলে স্ত্রীকে নামায, রোযা, পাক-নাপাক ইত্যাদির প্রয়োজনীয় ধর্মীয় শিক্ষা দিতে হবে এবং শরীয়তের বিধি-নিষেধ মেনে চলার জন্য আদেশ ও উপদেশ দিতে হবে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র ক্বোরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا ط

তরজমাঃ হে ঈমানদারগণ, তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে দোযখের আগুন হতে বাঁচাও।

উক্ত আয়াত শরীফ হতে একথা পরিস্কারভাবে বুঝা যায় যে, স্বামী নিজেকে এবং তার পরিবারবর্গকে শরীয়তের আদেশ-নিষেধ পালন করে এবং নামায ও রোযা ইত্যাদি ইবাদত-বন্দেগী করে দোযখের আগুন হতে বাঁচাতে হবে।

২. শরিয়তের বিধান মতে স্বামী তার স্ত্রীর উপর পার্থিব ও ধর্মীয় যাবতীয় কাজ-কর্ম ন্যায়সঙ্গতভাবে করার জন্য আদেশ ও উপদেশ প্রদান করার অধিকার রাখে।

৩. স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে। পবিত্র ক্বোরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন-

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

তরজমাঃ তোমরা নিজেদের স্ত্রীগণের সঙ্গে সৎভাবে জীবন-যাপন করো।

পবিত্র হাদীস শরীফে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِاَهْلِهٖ وَاَنَا خَيْرُكُمْ لِاَهْلِىْ (الخ)

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে ওই ব্যক্তিই সর্বোত্তম, যে তোমাদের মধ্যে স্ত্রীর নিকট সর্বোত্তম (সদ্ব্যবহার ও সৎভাবে জীবন-যাপনে) এবং তোমাদের সকলের চেয়ে আমি আমার পত্নিদের নিকট উত্তম।

উল্লেখিত আয়াত শরীফ ও হাদীস শরীফ হতে একথা বুঝা যায় যে, স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি সদ্ব্যবহার করবে এবং তার সাথে আন্তরিক ভালবাসার সাথে

জীবন-যাপন করবে। স্ত্রী যদি কোন দোষ-ক্রটি করে, তবে তা সংশোধনের মানসিকতা নিয়ে ক্ষমা করে দেবে।

৪. স্বামীকে তার সামর্থ্যনুযায়ী তার স্ত্রীর যাবতীয় ভরণ-পোষণ ও পোষাক-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করতে হবে। এটা স্বামীর জন্য ওয়াজিব। স্বামীর সামর্থ্য থাকলে স্ত্রীর সাহায্যের জন্য চাকর বা চাকরানীর ব্যবস্থা করতে হবে। স্ত্রীর মহরও আদায় করে দিতে হবে। একবারে আদায় করতে সক্ষম না হলে ক্রমান্বয়ে অল্প অল্প করে আদায় করে দেবে। স্ত্রী ইচ্ছা করলে মহর মাফও করে দিতে পারে।

৫. স্ত্রীর বাসগৃহে চলাফেরায় যাতে কোন অসুবিধা না হয়, তজ্জন্য স্বামীকে পর্দার বন্দোবস্ত করতে হবে। এটা স্বামীর দায়িত্ব ও কর্তব্য।

৬. স্ত্রীর উপর শারীরিক নির্যাতন চালাতে পবিত্র হাদীস শরীফে নিষেধ করা হয়েছে।

৭. স্ত্রী যদি শরীয়ত-বিরোধী কোন কাজ করতে চায়, তবে তা থেকে বিরত রাখতে হবে।

৮. স্ত্রীর অসুখ-বিসুখের সময় তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

৯. একাধিক স্ত্রী থাকলে প্রত্যেকের সঙ্গে সমানভাবে ব্যবহার করতে হবে। খোর-পোষ, পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার ইত্যাদিতে সমতার প্রতি পূর্ণ খেয়াল রাখতে হবে। সমানভাবে রাতযাপনের পালা বণ্টন করতে হবে।

স্ত্রীর কর্তব্য

১. পবিত্র ক্বোরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন-

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّ بِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ

তরজমাঃ "পুরুষগণ নারীগণের উপর এ জন্য কর্তৃত্বের অধিকারী যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের একেকে (পুরুষকে) অন্যের (নারীর) উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং এজন্যও যে, তারা (পুরুষগণ) তাদের (পুরুষদের ধন-সম্পত্তি (নারীদের জন্য) ব্যয় করে থাকেন।

২. পবিত্র হাদীস শরীফে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

لَوْ كُنْتُ اٰمُرُ اَحَدًا اَنْ يَّسْجُدَ لِاَحَدٍ لَاَمَرْتُ الْمَرْاَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

অর্থাৎ "যদি আমি কাউকে সাজদা করার জন্য আদেশ দিতাম, তাহলে নিশ্চয় স্ত্রীকে হুকুম করতাম, সে যেন তার স্বামীকে সাজদা করে।"

উল্লিখিত আয়াত শরীফ ও হাদীস শরীফ হতে বুঝা যায় যে, স্বামীর মর্যাদা স্ত্রীর নিকট অন্য সব মানবের উর্ধ্বে। স্বামীকে সম্মান করা, তার ইজ্জত-সম্মান

বজায় রাখা ও তার আদেশ-নিষেধ পালন করে চলা স্ত্রীর জন্য কর্তব্য; কিন্তু স্বামী যদি শরিয়তবিরোধী কোন কাজ করতে আদেশ করে, তবে স্ত্রী তা পালন করবে না।

৩. পবিত্র হাদীস শরীফে আছে-

اَيُّمَا اِمْرَأَةٍ مَا تَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ

অর্থাৎ যে স্ত্রী মারা গেলো এমতাবস্থায় যে, তার স্বামী তার উপর সন্তুষ্ট, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

৪. স্বামীকে অন্তরের সাথে ভালবাসা প্রত্যেক স্ত্রীর কর্তব্য। এ মর্মে পবিত্র হাদীস শরীফে আছে- 'যে স্ত্রী তার স্বামীকে ভালবাসে, সে জান্নাতবাসী হবে।'

৫. পবিত্র হাদীস শরীফে আরও আছে- "যে স্ত্রীর উপর তার স্বামী নারাজ, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে স্বামীকে সন্তুষ্ট করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার ইবাদত কবূল হবে না।

৬. স্ত্রী যতই গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত থাকুক না কেন, স্বামী ডাকা মাত্রই তার ডাকে সাড়া দেওয়া স্ত্রীর একান্ত কর্তব্য।

৭. স্বামী ঘরে উপস্থিত থাকা অবস্থায় তার অনুমতি ছাড়া স্ত্রীর জন্য নফল নামায পড়া ও নফল রোযা রাখা এবং তার বিনা অনুমতিতে স্ত্রী কোথাও বেড়াতে যাওয়া জায়েয নয়। স্বামীর অনুমতি ছাড়া তার টাকা-পয়সা, মাল-পত্র ইত্যাদি কাউকে দেওয়া বা দান করাও জায়েয নয়।

৮. শরীয়তের বিধান অনুযায়ী জানা যায় যে, অধিকাংশ স্ত্রী তাদের স্বামীর অবাধ্য হওয়ার কারণে এবং স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ হবার কারণে দোযখে যাবে। সুতরাং স্বামী প্রদত্ত খোরপোষ এবং যে কোন জিনিষের কৃতজ্ঞতা আদায় করা এবং স্বামীর মনে কষ্ট পায় এমন ব্যবহার না করা প্রত্যেক স্ত্রীর কর্তব্য। স্বামীর আর্থিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শান্তিপূর্ণভাবে জীবন যাত্রা নির্বাহ করবে। স্বামী দিতে অসমর্থ এমন কোন জিনিসের জন্য আবদার করবে না।

৯. স্বামীর সাথে কখনও কর্কশ স্বরে কথা বলবে না বা তর্কে লিপ্ত হবে না।

১০. স্বামীর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ও মানবতার খাতিরে স্বামীর মাতা-পিতার সেবা করা স্ত্রীর জন্য বাঞ্ছনীয়।

১১. স্বামীর যাবতীয় জিনিষপত্রের হেফাযত করা এবং ঘর-বাড়ী পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা স্ত্রীর কর্তব্য বলে মনে করতে হবে। স্বামীর বিছানায় কোন পর পুরুষকে বসতেও দেবে না। সন্তান-সন্ততির প্রতিপালনে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়াও স্ত্রীর জন্য উত্তম।

পর্দা

'পর্দা' মানে আবরণ। পর্দা করার অর্থ ঢেকে রাখা। স্ত্রীদের পর্দা করার অর্থ হচ্ছে তার শরীর ঢেকে রাখা।

স্ত্রী লোককে 'আওরত' বলা হয়ে থাকে। এটা আরবী শব্দ। 'আওরত' শব্দের অর্থ ঢেকে রাখার বস্তু। এ জন্যই স্ত্রীলোককে 'আওরত' বলা হয়। স্ত্রীলোকের শরীর ঢেকে রাখা ইসলামের বিধান মতে ফরয।

পর্দা করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র ক্বোরআনের বহু জায়গায় মুসলমানদেরকে নির্দেশ প্রদান করেছেন। এখানে কয়েকটি আয়াত শরীফ উল্লেখ করার প্রয়াস পাচ্ছি।

পবিত্র ক্বোরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন-

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْنَ فُرُوْجَهُمْ ط ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ م بِمَا يَصْنَعُوْنَ ○ وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ

তরজমাঃ হে আমার হাবীব! আপনি মুমিনদেরকে বলে দিন, তারা যেন নিজেদের চক্ষু নিচের দিকে রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। এটা তাদের জন্য পবিত্রতম পন্থা। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলার খবর রয়েছে। তারা যা করছে তা সম্পর্কে এবং ঈমানদার স্ত্রী লোকদেরকে বলে দিন তারা যেন নিজেদের চক্ষু নিচের দিকে রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে এবং তারা যেন আপন সৌন্দর্যের স্থান প্রকাশ না করে; অবশ্য তাদের যতটুকু অঙ্গ-প্রকাশ না হয়ে পারা যায় না (তাতে ক্ষতি নাই) এবং তারা যেন ওড়না দ্বারা তাদের মাথা, গলা ও বুক ভালবাসে ঢেকে রাখে; [সূরা নূরঃ আয়াত-৩০-৩১]

আল্লাহ্ তা'আলা ক্বোরআন মজীদে আরও এরশাদ করেছেন-

وَلاَ يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ط

তরজমাঃ এবং তাদের (স্ত্রীলোকদের) গোপন সৌন্দর্য জানিয়ে দেওয়ার জন্য তারা (স্ত্রীলোকেরা) যেন যমীনের উপর চলার সময় পা জোরে না মারে। [২৪:৩১]

ক্বোরআন মজীদে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন-

يٰۤاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيْبِهِنَّ

তরজমাঃ হে নবী! আপনি আপনার বিবিগণ, আপনার কন্যাগণ এবং মু'মিনদের নারীগণকে বলে দিন, তারা যেন আবরণী বা চাঁদরগুলোর একাংশ তাদের মুখের উপর ঝুলিয়ে রাখে। [৩৩:৫৯]

ক্বোরআন মজীদে আল্লাহ্ তা'আলা আরও এরশাদ করেছেন-

وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى

তরজমাঃ এবং তোমরা তোমাদের ঘরের মধ্যে অবস্থান কর এবং আগের মুর্খ যুগের মেয়েদের মত তোমরা তোমাদের যে কোন সৌন্দর্য পর পুরুষের জন্য প্রকাশ করো না। [৩৩:৩৩]

পবিত্র হাদীস শরীফে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- "স্ত্রীলোক গোপন রাখার বস্তু। যখন সে বের হয়, তখন শয়তান তার দিকে দৃষ্টিপাত করে।"

পবিত্র হাদীস শরীফে আরও আছে-

একদিন হযরত উম্মে সালামাহ্ ও হযরত ময়মূনা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র দরবারে উপস্থিত থাকাকালে উম্মে মাকতুমের ছেলে এসে হযরত আবদুল্লাহ্ সেখানে উপস্থিত হলেন। রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তখন তাদেরকে পর্দা করতে বললে হযরত উম্মে সালামাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়কা ওয়াসাল্লাম) সে কি অন্ধ নয়? সে আমাদেকে দেখতে পাচ্ছে না।" তখন উত্তরে তিনি বললেন, "তোমরা কি অন্ধ, তোমরা কি দেখছো না?"

উপরে বর্ণিত আয়াত শরীফ ও হাদীস শরীফের বিধান মতে এবং পর্দা ও 'আওরত' শব্দের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, স্ত্রী লোকদের জন্য পর্দা করা যে ফরয বা অবশ্যই জরুরী, তা সহজেই বুঝা যায়। পর্দার ব্যাপারে অবহেলা করলে আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর আইন অমান্য করা হবে। সুতরাং পর্দার ব্যাপারে অবহেলা করা মোটেই উচিত হবে না।

শেষোক্ত হাদীস শরীফ মতে, স্ত্রীলোক যেমন পর পুরুষদেরকে দেখা দেওয়া নিষেধ তেমনি স্ত্রীলোকেরাও পর পুরুষদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা নিষেধ।

স্ত্রীলোকদের যাদেরকে শরীয়ত মতে দেখা দেওয়া জায়েয তারা হলেন

১. পিতা ও দাদা, ২. স্বামী, ৩. স্বামীর পিতা ও দাদা, ৪. আপন ভাই, বৈমাত্রেয় ভাই ও বৈপিত্রেয় ভাই, ৫ আপন পুত্র, ৬ সতীনের পুত্র, ৭. আপন ভাইয়ের পুত্র, ৮. আপন বোনের পুত্র, ৯. যে কোন নাবালেগ ছেলে, ১০. আপন মামা, ১১. আপন চাচা, ১২. আপন কন্যার স্বামী (জামাতা) এবং ১৩ মু'মিন স্ত্রীলোক।

উল্লেখিত ব্যক্তিদের বেলায় সম্পূর্ণ শরীর ঢেকে রাখা স্ত্রীলোকদের জন্য উত্তম। যদি মুখ, হাতের কব্জি এবং পায়ের পাতা খোলা অবস্থায়ও দেখা দেয়, তা হলেও শরীয়তের বিধান মতে কোন দোষ হবে না। এর অতিরিক্ত দেখা গেলে কবীরা গুনাহ্ হবে।

কিন্তু স্বামীর বেলায় উল্লিখিত নিয়ম প্রযোজ্য নয়। স্ত্রী যে কোন অবস্থায় স্বামীকে দেখা দিতে পারবে।

আক্বীকা

শিশুর জন্মের পর শুক্‌রিয়া স্বরূপ যে পশু যবেহ করা হয়, সেটাকে আক্বীকা বলে। আক্বীকা সুন্নাত-ই যাইদাহ্ বা মুস্তাহাব। এর জন্য সপ্তম দিবসই উত্তম। যদি সপ্তম দিবসে করা সম্ভব না হয়, তাহলে যখন সম্ভব হয়, তখন করবে, এতে সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। কেউ কেউ বলেছেন- সপ্তম দিনে আক্বীক্বা করা সম্ভব না হলে ১৪শ দিনে, এ দিনেও সম্ভব না হলে ২১তম দিনে আক্বীক্বা করবে। এ দিনেও সম্ভব না হলে যে কোন সময় করা যাবে।

মাসআলাঃ যদি গরু, মহিষ যবেহ করা হয়, তাহলে ছেলের জন্য দু'সপ্তমাংশ এবং মেয়ের জন্য এক সপ্তমাংশ যথেষ্ট।

মাসআলাঃ ক্বোরবানীর পশুর সাথে আক্বীকাও শরীক করা যায়। আক্বীকার পশুর জন্যও ওই শর্ত সমূহ প্রযোজ্য, যেগুলো ক্বোরবানীর পশুর জন্য নির্দিষ্ট।

মাসআলাঃ আক্বীকার মাংস ফক্বীর, আপনজন ও বন্ধুবান্ধবদেরকে কাঁচা বন্টন করে দিতে পারে বা রান্না করে দিতে পারে, অথবা যিয়াফতের মত দাওয়াত দিয়ে খাওয়াতেও পারে, সব পদ্ধতি জায়েয আছে।

মাসআলাঃ ভবিষ্যত মঙ্গলের জন্য যবেহকৃত পশুর হাড়সমূহ না ভাঙ্গাই উত্তম। তবে ভাঙ্গা না-জায়েয নয়। মাংস যেভাবে ইচ্ছে পাকানো যায়; কিন্তু মিষ্টি করে পাকানো ছেলের চরিত্র ভাল হওয়ার সহায়ক বলে মনে করা হয়।

মাসআলাঃ আক্বীকার মাংস মা-বাপ, দাদা-দাদী সবাই খেতে পারে।

মাসআলাঃ আক্বীকার পশু যবেহ করার সময় যেন এ দো'আ পড়া হয়ঃ

اَللّٰهُمَّ هٰذِهٖ عَقِيْقَةُ اِبْنِىْ فُلَانٍ دَمُهَا بِدَمِهٖ وَلَحْمُهَا بِلَحْمِهٖ وَعَظْمُهَا بِعَظْمِهٖ وَجِلْدُهَا بِجِلْدِهٖ وَشَعْرُهَا بِشَعْرِهٖ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا فِدَاءً لِاِبْنِىْ مِنَ النَّارِ بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اَكْبَرُ

অথবা **هٰذِهٖ عَقِيْقَةُ بِنْتِىْ فُلَانَةٍ** বলতে হবে। (নিজে যবেহ করলে **اِبْنِىْ فُلَان** এর স্থলে ছেলের নাম বলবেন আর যদি অন্য কেউ যবেহ করে তাহলে যবেহকারী **ابن فلان** এর স্থলে ছেলের নাম ও ছেলের বাপের বলবেন।)

যদি মেয়ে হয়, তাহলে **ابنى** এর জায়গায় **بنتى** বলতে হয়। অন্যের মেয়ে হলে **بنتى** এর পরিবর্তে **بنت فلان** বলার পর মেয়ের বাপের নাম বলতে হয়।)

এই দো'আটি জানা না থাকলে কেবল **بسم اللّٰه اللّٰه اكبر** বলে যবেহ করলেও আক্বীকা হয়ে যাবে। [বাহারে শরীয়ত]

আ-দাবে মজলিস

[মজলিসে উঠা-বসার নিয়ামাবলী]

আমরা সব সময় বিভিন্ন মজলিসে উঠা-বসা করি। অথচ সুন্নাত মোতাবেক উঠা বসা করা সকলের জন্য কল্যাণকর। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সব সময় ক্বেবলামুখী হয়ে বসতেন এবং উভয় হাঁটু মুবারক দাঁড় করিয়ে পবিত্র পায়ের গোছাদ্বয়কে জড়িয়ে ধরে তাশরীফ রাখতেন, বসার এ ধরনকে আরবীতে 'ইহতিবা' বলা হয়।

আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায আদায় করার পর মসজিদে চার জানু হয়ে বসতেন। এমতাবস্থায় সূর্য ভাল মতে উজ্জ্বল হয়ে উদিত হতো। বালিশে হেলান দিয়ে বসাও নবী করীমের সুন্নাত। তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত জাবির ইবনে সামুরাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বালিশে হেলান দেয়া অবস্থায় দেখেছি।

বসার সময় শালীনতা বজায় রেখে বসা সকলের কর্তব্য। অনেকে একেতঃ আটসাঁট কাপড় পরে দ্বিতীয়তঃ হাটুদ্বয় দাঁড় করিয়ে ডানে-বামে চড়িয়ে রাখে। যার ফলে মাঝে মধ্যে এমন কদাকার দৃশ্য ফুটে উঠে, যা লজ্জাশীল লোকেরা দেখে লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নেয়। হযরত শিরিদ ইবনে সুয়াইদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম একদা আমার পাশ দিয়ে গেলেন। আমি তখন এভাবে বসা ছিলাম যে, আমার বাম হাত পিঠের পিছনে ছিল এবং ডান হাতের উপর হেলাল দেয়া ছিলো, তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তোমরা কি ওইসব লোকের মত বসছো, যাদের উপর আল্লাহর গযব নাযিল হয়েছে?" [আবূ দাঊদ শরীফ]

মজলিস ও সমাবেশ থেকে ওঠে নিম্নলিখিত দো'আটি তিনবার পড়লে গুনাহ মাফ হয়ে যায়ঃ

سُبۡحَانَکَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمۡدِکَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنۡتَ اَسۡتَغۡفِرُکَ وَاَتُوۡبُ اِلَيۡکَ

উচ্চারণঃ সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা ওয়া বিহামদিকা, লা-ইলা-হা ইল্লা-আনতা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলায়কা।

হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কুকুরের মতো বসতে নিষেধ করেছেন। [সহীহ্ বোখারী শরীফ]

চলাফেরার নিয়মাবলী

মুসলমানদের চাল-চলনের নির্ধারিত রীতি-নীতি রয়েছে। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র ও নূরানী জীবদ্দশার জীবনকর্ম আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। যেমন আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন-

لَقَدۡ کَانَ لَکُمۡ فِیۡ رَسُوۡلِ اللّٰهِ اُسۡوَةٌ حَسَنَةٌ

তরজমা: নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহ্র রসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। [৩৩:২১]

সুতরাং চলাফেরাও নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শ অনুসারে হওয়া ঈমানী দায়িত্ব। বুকের বোতাম খুলে, গলায় চেইন ঝুলিয়ে, বুক ফুলিয়ে জোর কদমে চলা অহঙ্কারীদের স্বভাব, যা আল্লাহও পছন্দ করেন না। মধ্যম পন্থায় ও ভদ্রতা সহাকারে চলাটাই মুসলমানদের জন্য সুন্নাতসম্মত রীতি। মহান আল্লাহ পবিত্র ক্বোরআনে এরশাদ করেন-

وَلَا تَمۡشِ فِی الۡاَرۡضِ مَرَحًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُّ کُلَّ مُخۡتَالٍ فَخُوۡرٍ ۚ وَاقۡصِدۡ فِیۡ مَشۡیِکَ وَاغۡضُضۡ مِنۡ صَوۡتِکَ ؕ اِنَّ اَنۡکَرَ الۡاَصۡوَاتِ لَصَوۡتُ الۡحَمِیۡرِ ۠

তরজমা: এবং পৃথিবীতে অহঙ্কার করে বিচরণ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ পছন্দ করেন না কোন উদ্ধত অহঙ্কারীকে। মধ্যম চলনে বিচরণ করো আর আপন কণ্ঠস্বরকে কিছুটা নিচু করো। নিশ্চয় সমস্ত স্বরের মধ্যে অপ্রীতিকর স্বর হচ্ছে গর্ধভের। [সুরা লোকমান, আয়াত- ১৮, তরজমা- কান্যুল ঈমান]

অন্যত্র মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন-

وَعِبَادُ الرَّحۡمٰنِ الَّذِیۡنَ یَمۡشُوۡنَ عَلَی الۡاَرۡضِ هَوۡنًا وَّ اِذَا خَاطَبَهُمُ الۡجٰهِلُوۡنَ قَالُوۡا سَلٰمًا ۝

তরজমা: এবং পরম করুণাময়ের ওই বান্দাগণ, যারা ভূ-পৃষ্ঠে ধীরগতিতে চলাফেরা করে এবং যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা তাদের সাথে কথা বলে তখন বলে, 'ব্যস্ সালাম'। [২৫:৬৩]

আলোচ্য আয়াতে মহান আল্লাহ নেক বান্দাদেরকে চলাফেরা সম্পর্কে বলেছেন, যে এসব লোকেরা ধৈর্য ও ভদ্রতা সহকারে বিনয়ীভাবে চলাফেরা করেন। গর্বভরে অশালীন ভঙ্গিতে সদর্পে চলাফেরা করেন না। আর মুর্খদের মুর্খসুলভ আচরণ থেকে বিরত থাকেন।

হযরত হুমাইদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, করীম নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন চলতেন, তখন সামনের দিকে ঝুঁকে চলছেন বলে মনে হতো। [আবু দাঊদ]

হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পুরুষদেরকে দু'মহিলার মধ্যখানে গমন করা থেকে বারণ করেছেন। [আবু দাঊদ]

রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেছেন, যখন মহিলারা তোমাদের সম্মুখে পড়ে, তখন তাদের মধ্যখানে গমন করো না। তাদের ডান বা বাম পাশের রাস্তা অবলম্বন করো। [আবূ দাউদ]

দাড়ি

দাড়ি রাখা পুরুষদের জন্য ওয়াজিব। সকল নবী-রাসূল দাড়ি রেখেছেন। আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম দাড়ি রাখার ব্যাপারে খুব জোর দিয়েছেন। চর্তুদশ শতাব্দির মুজাদ্দিদ আ'লা হযরত ঈমাম আহমদ রেযা খাঁন ফাযেলে ব্রেলভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর প্রণীত কিতাব 'লুম'আ-তুদ্ দুহা'-এর মধ্যে ক্বোরআনুল করীমের আঠারটি আয়াত, বাহাত্তরটি হাদীস এবং বুযুর্গানে দ্বীনের ষাটটি উক্তির আলোকে দাড়ি রাখা ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছেন। এমনকি দাড়ি মুণ্ডানো বা ছেঁটে খাটো করে এক মুষ্ঠি থেকে কম করে ফেলাকে হারাম প্রমাণিত করেছেন।

ঈমাম গাযালী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহর কিছু এমন ফেরেশতা রয়েছেন, যাঁদের তাসবীহ হচ্ছে শুধু-

سُبْحَانَ مَنْ زَيَّنَ الرِّجَالَ بِاللُّحٰى وَزَيَّنَ النِّسَآءَ بِالذَّوَائِبِ

অর্থাৎ:ওই মহান রবের পবিত্রতা যিনি পুরুষদের সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছেন দাড়ি দ্বারা এবং মহিলাদের সুন্দর করেছেন চুলের খোপা দ্বারা। [কীমিয়ায়ে সা'আত]

দাড়ির সবচেয়ে বড় দুশমন হল শয়তান। কারণ ইতিহাসে সর্বপ্রথম দাড়ি মুণ্ডানোর কুপ্ররোচণা অভিশপ্ত শয়তান হতে পাওয়া যায়। অপরদিকে যারা দাড়ি মুণ্ডায় তারা শয়তানের অনুসারী, দাড়ি মুণ্ডানোও تَغْيِيْرِ خَلْقِ اللّٰهِ বা মহান আল্লাহর সৃষ্ট রীতি ও স্বভাবকে বিকৃত করার শামিল। আল্লাহ দাড়ির মাধ্যমে পুরুষের চেহারাকে সৌন্দর্য দান করেছেন; কিন্তু তারা দাড়ি মুণ্ডিয়ে বা ছেঁটে আল্লাহর সৃষ্ট রীতিকে বিকৃত করছে। তাই বুঝা গেলো যে, যে ব্যক্তি দাড়ি মুণ্ডায়, সে শয়তানের নির্দেশ মান্য করে এবং শয়তান তাকে স্বীয় গোলাম মনে করে। উক্ত অভিশপ্ত শয়তানের চ্যালেঞ্জের উত্তরে আল্লাহ এরশাদ করেন-

وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا

তরজমা: যে শয়তানকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে সে প্রকাশ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

সুতরাং প্রিয় নবীর নিশান স্বীয় চেহারায় সজ্জিত করে শয়তানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার বাস্তব প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে, এটাই ঈমানদারের অঙ্গীকার হওয়া চাই।

দাড়ি মুণ্ডানোর লা'নত সর্বপ্রথম হযরত লূত আলায়হিস সালাম-এর সম্প্রদায়ের উপর বর্ষিত হয়েছিলো। ইতিহাসের আলোকে অবগত হওয়া যায় যে, শয়তানের এ নির্দেশের অনুসরণ সর্বপ্রথম হযরত লূত আলায়হিস্ সালাম-এর সম্প্রদায় করেছিলো। ওদের ছেলেদের যখন দাড়ি গজাতো, তখন তারা কু-উদ্দেশ্যে কিশোর থাকার লক্ষ্যে দাড়ি মুণ্ডিয়ে ফেলতো। শেষ পর্যন্ত যখন কুকর্ম বৃদ্ধি পেলো, তখন আল্লাহর গযব ও শাস্তি জোরে আসলো এবং সম্পূর্ণ এলাকা গযবের শিকার হয়ে সমূলে ধ্বংস হলো। মহান আল্লাহ বলেন-

وَلُوْطًا اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا وَّنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِىْ كَانَتْ تَّعْمَلُ الْخَبٰٓئِثَ ط

اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فٰسِقِيْنَ ○

তরজমা: এবং লূতকে আমি ধর্মীয় প্রজ্ঞা ও জ্ঞান প্রদান করেছি এবং তাকে এমন এক জনপদ থেকে উদ্ধার করেছি, যারা অশ্লীল কাজ করতো; নিশ্চয় তারা মন্দলোক, নির্দেশ অমান্যকারী ছিলো। [সূরা আম্বিয়া, আয়াত- ৭৪]

ওইসব নাফরমান সম্প্রদায়ের প্রতি আসমান থেকে পাথর নিক্ষিপ্ত হয়েছিলো। প্রত্যেক পাথরে প্রত্যেক ব্যক্তির নাম লিখা ছিলো, যার উপর তা পড়েছে; সে ওই স্থানেই রয়ে গেছে। এমনকি লূত আলায়হিস্ সালাম-এর বিবি যখন ওই ভয়ানক দৃশ্য অবলোকন করলো, তখন তার মুখ দিয়ে শুধু বের হলো, "হায়! আমার সম্প্রদায়।" তখন তার গায়েও পাথর এসে পড়লে সেও সেখানে মরে পড়ে রইলো।

'ইহয়াউ উলূমিদ্ দ্বীন'-এ ইমাম গাযালী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, বিশ্বনবীর দাড়ি মুবারক ঘন ছিলো। আর হযরত আবূ বকর ও হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর দাড়ি মোবারক ছিলো সরু ও লম্বা, হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর দাড়ি মোবারক ছিলো কুঞ্চিত, গোটা বক্ষ পরিপূর্ণ ছিলো। সাহাবা-ই কেরাম, মাযহাবের ইমামগণ, প্রতি যুগের ও স্তরের ওলীগণ, ওলামায়ে মিল্লাত সবাই দাড়ি রেখেছেন। ওলামা-ই কেরাম দাড়ি মুণ্ডানোকে ক্বিয়ামতের নিদর্শনসমূহের অন্যতম বলে উল্লেখ করেছেন।

বালেগ হওয়ার পর হতে দাড়ি রাখা ওয়াজিব। আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর 'ফতাওয়া-ই রদ্দুল মুহতার'-এ বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি দাড়িকে মুঠোর মধ্যে ধরে অতিরিক্ত অংশ কেটে ফেলে, তাহলে কোন ক্ষতি নেই। 'রদ্দুল মুহতার' গ্রন্থে একে সুন্নাত বলা হয়েছে।

পাগড়ী

পাগড়ী পরা আমাদের নবী হযরত সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর অতি প্রিয় সুন্নাত। আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বেশীরভাগ সময় শির মুবারকে টুপির উপর পাগড়ী মুবারক সাজিয়ে রাখতেন। 'ফতাওয়া-ই রেজভীয়া'তে ইমামে আহলে সুন্নাত আ'লা হযরত বলেন, পাগড়ি পরা প্রত্যেক যুগের নবীগণের সুন্নাত (রীতি)। মহানবী হযরত সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, পাগড়ি সহকারে দু'রাকাত নামায আদায় করা পাগড়িবিহীন সত্তর রাক'আত নামায পড়া থেকে উত্তম। দায়লামী শরীফে বর্ণিত আছে যে, পাগড়িসহকারে নামায দশ হাজার নেকীর বরাবর। পাগড়ি পড়া মুসলমানদের মর্যাদা ও সম্মান। 'জামে'উস্ সগীর'-এ ইমাম মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেন, পাগড়ি সহকারে এক জুমু'আহ্ আদায় করা পাগড়ি বিহীন সত্তর জুমা আদায়ের সমপরিমাণ।

এটাও বর্ণিত আছে যে, টুপির উপর পাগড়ী মুসলমানদের ও কাফিরদের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশক। যে মুসলমান স্বীয় পাগড়ির ২৩ প্যাঁচ মাথায় দেবে, তার উপর ক্বিয়ামতের দিন প্রতি প্যাঁচে একটি নূর দান করা হবে।

হাকিমে তাবরাণীতে উল্লেখ আছে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, তোমরা পাগড়ি পরিধান করো, তবে তোমাদের সম্মান মর্যাদা ও গাম্ভীর্য বৃদ্ধি পাবে।

সম্মানিত ফক্বীহগণ পাগড়ি পরাকে 'সুন্নাতে যা-ইদাহ্' বা 'সুন্নাতে মুস্তাহাব্বাহ্' হিসেবে উল্লেখ করেছেন; যা অত্যন্ত ফযীলত ও বরকতময়।

হযরত মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর 'মিরকাত'-এ (কিতাব) উল্লেখ করেছেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পাগড়ি মুবারক সাত হাত অথবা বার হাত লম্বা ছিলো, মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর 'মিরআতুল মানাজীহ' কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, পাঞ্জেগানা নামাযে সাত হাত এবং জুমু'আহর নামাযে বারহাত কাপড়ের পাগড়ি পরিধান করা উত্তম। 'শামলাহ্' সম্পর্কে অধিকাংশ ইমাম ও ফক্বীহ বলেছেন- তা যেন সামনের দিকে এনে ঝুলালে বক্ষের নিচে না যায়। এতটুকু লম্বা হওয়া সুন্নাত। পাগড়ি দাঁড়িয়ে বাঁধা এবং বসা অবস্থায় খোলা সুন্নাত-ই মুস্তাহাব্বাহ্।

-----<>-----

সচ্চরিত্র

أَخْلَاقٌ (আখলাক্ব) শব্দটি বহুবচন। একবচনে خُلُقٌ (খুলুক্বুন)। শাব্দিক অর্থ স্বভাব, চরিত্র, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি। আর حَسَنَة (হাসানাহ্) শব্দের অর্থ সুন্দর, সৎ, উত্তম ইত্যাদি। সুতরাং اَخْلَاق حَسَنَة (আখলাক্বে হাসানাহ্) অর্থ হল সচ্চরিত্র ও উত্তম স্বভাব। এ'কে আবার اَخْلَاق حَمِيْدَة (আখলাক্বে হামীদাহ্) বা 'প্রশংসনীয় স্বভাব'ও বলা হয়। এর বিপরীত হচ্ছে اَخلاق شَنِيْعَةٌ (আখলাক্বে শানী'আহ্) বা اَخْلَاقِ ذَمِيْمَهْ (আখ্লাক্ব-ই যমীমাহ্) অর্থাৎ 'মন্দ স্বভাব'।

ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, মানুষের পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য সংশ্লিষ্ট আচার-আচরণ ও কার্যাবলী সুষ্ঠু, সুন্দর ও যথার্থভাবে ভারসাম্য বজায় রেখে পালন ও সম্পাদন করাকে 'আখ্লাক্বে হাসানাহ্' বলা হয়। অন্যভাবে বলা হয় যে, ইসলামী চরিত্রে বিভূষিত হওয়া এবং শয়তানী চরিত্র থেকে বিরত থাকার নামই 'আখ্লাক্বে হাসানাহ্' বা উত্তম চরিত্র।

মানব জীবনে চরিত্র অমূল্য সম্পদ। চরিত্রহীন মানুষ পশুর সমান। اَخْلَاق حَسَنَة বা اَخْلَاقِ حَمِيْدَةَ (উত্তম চরিত্র) এমন একটি মহৎ গুণ, যা প্রতিটি মানুষের মধ্যে উপস্থিত থাকা একান্ত প্রয়োজন। কেউ উত্তম চরিত্রের অধিকারী না হলে সে সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ সাধনে কখনোই সক্ষম হয় না। উত্তম চরিত্রের কারণেই মানুষ মর্যাদার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে। এমনকি সে সর্বত্র স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে থাকে। মহাকালের গর্ভে বিলীন হয় না তাদের ইতিহাস। ইসলামের ধারক ও বাহক সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম, সকল নবী ও রসূল আলায়হিমুস্ সালাম ও সাহাবায়ে কেরাম সচ্চরিত্রেরই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাই মানবেতিহাসের ঊষালগ্ন থেকেই সর্বকালে সর্বদেশে এর গুরুত্ব, মর্যাদা এবং উপকারিতা সর্বজন স্বীকৃত।

উত্তম চরিত্রের গুরুত্ব

মানব জীবনে সৎ স্বভাব বা উত্তম চরিত্রের বিরাট গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। প্রশংসনীয় ও সচ্চরিত্র ছাড়া কখনো প্রকৃত মানুষ বরং প্রকৃত মু'মিন হওয়া যায় না। রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ওই উত্তম চরিত্রের প্রশংসায় পবিত্র ক্বোরআনে এরশাদ হয়েছে-

اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ (ইন্নাকা লা'আলা- খুলুক্বিন 'আযী-ম) অর্থাৎ- হে রসূল! নিঃসন্দেহে আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে মানুষের সচ্চরিত্রের পরিপূর্ণতা প্রদানের লক্ষ্যে পাঠিয়েছেন। খোদ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা

করেছেন- بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَخْلَاقِ অর্থাৎ- "আমি উত্তম চরিত্রগুলোকে পরিপূর্ণতাদানের লক্ষ্যে প্রেরিত হয়েছি।" তিনি আরো বলেন- تَخَلَّقُوْا بِاَخْلَاقِ اللّٰهِ (তাখাল্লাকূ-বি আখলাক্বিল্লা-হি) অর্থাৎ- "তোমরা আল্লাহ্‌র চরিত্রে চরিত্রবান হও।" সচ্চরিত্র ছাড়া ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে শান্তির আশা করা যায় না। একমাত্র সৎ স্বভাব দ্বারাই সমাজে শান্তি আনয়ন করা সম্ভব। কেননা, চরিত্রহীন লোক অন্যায়, ব্যভিচার, অত্যাচার, সংঘাত, কলহ ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির মাধ্যমে সমাজ জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে। পক্ষান্তরে, সচ্চরিত্রবান লোক নিজ চরিত্রগুণে সমাজ-চরিত্রকেও সংশোধনের চেষ্টা করে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেছেন- اِنَّ مِنْ اَحَبِّكُمْ اِلَىَّ اَحْسَنُكُمْ اَخْلَاقًا (ইন্না মিন আহাব্বিকুম ইলায়্যা আহসানুকুম আখ্‌লাকান)। অর্থাৎ আমার কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী প্রিয় হচ্ছে ওই ব্যক্তি, যে চরিত্রের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ। রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেছেন- اِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ اَحْسَنُكُمْ اَخْلَاقًا (ইন্না মিন খিয়ারিকুম আহসানুকুম আখ্‌লাক্বান) অর্থাৎ নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি হচ্ছে ওই ব্যক্তি, তোমাদের মধ্যে যার চরিত্র অধিক সুন্দর।

বিখ্যাত ইংরেজ কবি Anon বলেন-

When wealth is lost, nothing is lost
When health is lost someting is lost
When character is lost everything is lost.

অর্থঃ যখন সম্পদ হারালো, তখন কিছুই হারালোনা, যখন স্বাস্থ্য হারালো, তখন কিছুটা হারালো, আর যখন চরিত্র হারালো তখন সবকিছুই হারালো।

উত্তম চরিত্রের বিভিন্ন দিক

اَخْلَاقِ حَسَنَة (আখলাক্বে হাসানাহ) বা উত্তম চরিত্রের বিভিন্ন দিক ও বিষয়ে ইসলামে বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। উক্ত বিষয়গুলোর মধ্যে তাক্বওয়া, যিক্‌র, শোক্‌র, সবর, ইনসাফ, সহানুভূতি, পারোপকার, জনসেবা, সহনশীলতা, বিনয় ও অল্পে তুষ্টি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। সমাজে এসব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠার জন্য পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজন। মহান আল্লাহ এরশাদ ফরমায়েছেন- وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ "ওয়া তা'আ'-ওয়ানূ- আলাল্ বির্‌রি ওয়াত্ তাক্বওয়া-ওয়ালা-তা'আ'-ওয়ানূ 'আলাল্ ইস্‌মি ওয়াল 'উদ্‌ওয়া-ন।"

তরজমা : এবং তোমরা সৎকাজ এবং খোদাভীরুতার কাজে একে অপরকে সাহায্য করো আর পরস্পরকে পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে সহযোগিতা করো না।

[সূরা মা-ইদাহ, আয়াত- ২]

আদ্‌ল বা ইন্‌সাফ

বিচার ও মীমাংসায় ন্যায়-পরায়ণতা প্রসঙ্গে আল্লাহ এরশাদ করেন- وَاللّٰهُ يَقْضِى الْحَقَّ (আল্লাহ তা'আলা সঠিক ও যথার্থ মীমাংসা করেন)।

ন্যায় বিচার এমন একটি অপরিহার্য ও প্রশংসিত গুণ, যা ব্যতিরেকে মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনে শান্তি, শৃঙ্খলা, উন্নতি, সমৃদ্ধি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা বহাল থাকতে পারে না।

মানবজাতির সার্বিক উন্নতি, সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তার জন্য عـــدل বা 'ইনসাফ' না থাকার কারণে মানব জীবনের সর্বস্তরে অন্যায়-অবিচার সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় চতুর্দিকে এমনিতে ছড়াতে শুরু করে। মানুষের স্বভাবে স্বার্থপরতা, হিংসা-বিদ্বেষ এবং যে কোন মূল্যেই নিজ স্বার্থ হাসিল করার প্রবনতা থাকে। এ কুপ্রবৃত্তির কারণেই মানুষ লোভ-লালসায় পতিত হয়, আর এ লোভ-লালসা হতে মানব মনে হিংসা-বিদ্বেষ চরম পর্যায়ে পৌঁছে শত্রুতার জন্ম দেয়। পক্ষান্তরে, মানুষ যখন ব্যক্তিগত জীবন হতে আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত সর্বস্তরে عدل বা ন্যায় বিচার কায়েম করতে পারে। তখন কেউ কারো প্রতি অন্যায়-অবিচার করে না। কেউ কারো অধিকার নষ্ট করে না। শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে না; বরং মানুষের মাঝে মিল মহব্বত, সৌন্দর্য ও সম্প্রীতি বজায় থাকে। মহান আল্লাহ মানুষকে এ কারণেই عـــدل বা ন্যায় বিচার অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন। আর এ প্রসঙ্গে এরশাদ করেছেন-

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ

তরজমা : নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে ন্যায় বিচার, সদ্যবহার এবং আত্মীয়দেরকে দান করার নির্দেশ দেন। আর অশ্লীলতা ও খারাপ কাজ হতে নিষেধ করেন। [সূরা নাহ্‌লঃ আয়াত- ৯০]

আরো এরশাদ করেন-

وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ

তরজমা: যখন তোমরা মানুষের মধ্যে মীমাংসা করবে, তখন তোমরা ইনসাফের সাথে বিচার ও মীমাংসা করবে। [সূরা-নিসা, আয়াত- ৫৮]

আল্লাহ তা'আলা আরো এরশাদ করেন-

وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

তরজমা : যদি তুমি মীমাংসা করো, তবে তাদের মধ্যে ইনসাফের সাথে মীমাংসা করো, নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালবাসেন।

ন্যায় বিচার কার্যের সাক্ষীগণকেও সঠিক এবং সত্য সাক্ষী দানের বিষয়ে জোর দেয়া হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে এরশাদ হয়েছে- وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى

তরজমা : তোমরা যখন বিচার কার্য সম্পাদন অথবা বিচারের ক্ষেত্রে সাক্ষ্যদানকল্পে কথা বলো, তখন ইনসাফ সহকারে কথা বলো, যদিও তাতে কোন পক্ষ তোমার নিকটআত্মীয় হয়। [সূরা আন-আম, আয়াত-১৫৩]

অনুরূপ, কোন ধনী প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির ব্যাপারে কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব কিংবা অবিচার না করার সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন-

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ○

তরজমা : হে ঈমানদারগণ! ন্যায় বিচারের উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য প্রদানকারী অবস্থায়, যদিও তাতে তোমাদের নিজেদের ক্ষতি হয়। অথবা মাতাপিতার কিংবা আত্মীয়-স্বজনের; যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দাও, সে বিত্তবান হোক কিংবা বিত্তহীন, সর্বাবস্থায় আল্লাহরই সেটার সর্বাধিক ইখতিয়ার রয়েছে। সুতরাং প্রবৃত্তির অনুগামী হয়ো না, যাতে সত্য থেকে আলাদা হয়ে পড়ো; এবং যদি তোমরা হেরফের করো অথবা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আল্লাহর নিকট তোমাদের কর্মসমূহের খবর রয়েছে। [সূরা নিসা, আয়াত- ১৩৫]

অনুরূপ, বিচারকাজে কোন প্রকার উপঢৌকন বা উৎকোচ দিয়ে বিচারকের রায় নিজের কিংবা নিজ পক্ষের কারো অনুকূলে আনার চেষ্টার বিরুদ্ধে পবিত্র ক্বোরআনে মহান আল্লাহ এরশাদ করেন-

وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

তরজমাঃ এবং না বিচারকদের নিকট তাদের মুকাদ্দমা এজন্য পৌঁছাবে যে, লোকজনের কিছু ধন-সম্পদ অবৈধভাবে গ্রাস করে নেবে, জেনে বুঝে। [২:১৮৮]

এইভাবে দু'পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত লেন-দেন সংক্রান্ত চুক্তিপত্র লিখার ব্যাপারেও লিখককে **عدل** বা ন্যায় অবলম্বন করতে হবে। এই চুক্তিপত্র লিখার ক্ষেত্রে 'আদল' এর তাকিদ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন-

وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

তরজমাঃ এবং উচিত যেন তোমাদের মধ্যে কোন লিখক ঠিক ঠিক লিখে। [২:২৮২]

অনুরূপ, বৈবাহিক জীবনে একাধিক বিবাহের ব্যাপারে **عـــدل** বা ন্যায় বিচার করারও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাই এ ক্ষেত্রে অর্থাৎ একাধিক স্ত্রী বিবাহ করলে তাদের মধ্যে **عـــدل** বা সুবিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অপরাগতার আশংকা থাকলে শরীয়ত একাধিক বিবাহের অনুমতি দেয় নি।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন-

فَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لَا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً

তরজমাঃ অতঃপর যদি তোমরা আশঙ্কা করো যে, দু'জন স্ত্রীকে সমানভাবে রাখতে পারবে না, তবে একজনকেই বিবাহ করো। [৪ঃ৩]

সালাম বা অভিভাদন

সালাম (**سلام**) হল আখলাক্বে হামীদাহ বা সচ্চরিত্রের অন্যতম একটি দিক, আবার এটা মহান রাব্বুল আলামীনের একটি গুণবাচক নামও। এর শব্দগত অর্থ দোষত্রুটি হতে মুক্ত থাকা। শান্তি ও নিরাপত্তা কামনা করা। পবিত্র ক্বোরআনে সালাম শব্দটি শান্তি ও নিরাপত্তা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন-

سَلٰمٌ عَلٰى مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ - سَلٰمٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعٰلَمِيْنَ

তরজমাঃ শান্তি বর্ষিত হোক মূসা ও হারূনের উপর, শান্তি বর্ষিত হোক নূহের উপর সমগ্র বিশ্বের মধ্যে।

সালামের ফযীলত

ســــــــلام বা 'আস্ সালামু আলাইকুম' ইসলামী শরীয়তে একটি দো'আ, যা মুসলমানদের পরস্পরের সাক্ষাতের সময় পেশ করা হয়। সালাম দেয়া সুন্নত এবং এর উত্তর দেয়া ওয়াজিব। 'আসসালামু আলাইকুম' অর্থ হচ্ছে- 'আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।' 'আমার পক্ষ হতে আপনাকে/আপনাদেরকে নিরাপত্তা দেয়া হলো। আপনি আমাকে/আমাদেরকে নিরাপত্তা দান করুন।' ক্বোরআন মজীদে মহান আল্লাহ এরশাদ করেন-

اِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَآ اَوْ رُدُّوْهَا

তরজমাঃ এবং যখন তোমাদেরকে কেউ কোন বচন দ্বারা সালাম করে, তবে তোমরা তা অপেক্ষা উত্তম বচন তার জবাবে বলো, কিংবা অনুরূপই বলে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক কিছুর হিসাব গ্রহণকারী। [৪:৮৬]

সুতরাং সালাম প্রদানকারী **السـلام عليـكم** (আস্সালামু আলাইকুম) বলবে। আর এর সাথে **ورحـمة اللّـه** (ওয়া রাহমাতুল্লাহি) অংশটুকু বৃদ্ধি করাও অতি উত্তম। সুতরাং যদি সালামদাতা শুধু 'আস্সালামু আলাইকুম' বলে, তবে উত্তরদাতা জবাবে

اَلسَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ (ওয়ারাহমাতুল্লাহি) বৃদ্ধি করবে। আর যদি সালামদাতা عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ বলে তাহলে জবাবদাতা (ওয়া বরাকাতুহু) অংশটুকুও বৃদ্ধি করবে। আর যদি সালামদাতা 'আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ' বলে তবে উত্তরদাতা 'ওয়া আলাইকুমুস্ সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাক্বাতুহূর সাথে 'ওয়া মাগফিরাতুহূও সংযোজন করতে পারবে। এর থেকে বেশী বলার নিয়ম নেই। অবশ্য পানাহার, মল-মূত্র ত্যাগ, তা'লীম দেয়া, ক্বোরআন তিলাওয়াত করা ও নামায রত অবস্থায় সালাম দেয়াও সালামের জবাব দেয়া মাকরূহ-ই তাহরীমী। অমুসলিম তথা কাফির-মুশরিককে সালাম দেয়া হারাম। যদি কোথাও মুসলমান ও কাফির একত্রিত থাকে, তবে سَلَامٌ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى (সালামুন 'আলা মানিত্তাবা'আল হুদা) বলে সালাম দেবে এবং মনে মনে মুসলমানদের নিয়্যত করবে। সালাম দেয়ার সময় হাত উত্তোলন করা জরুরী নয়; তবে কোন দূরবর্তী লোককে সালাম বলার সময় হাত দ্বারা ইশারাও করতে পারে। অবশ্য মুখে সালাম না বলে শুধু হাত দ্বারা ইশারা করা, মাথা নাড়া ইসলামী শরীয়তের পরিপন্থী; বরং ইহুদী, খ্রিস্টানদের কু-প্রথা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরূপ করতে নিষেধ করেছেন। এবং অভিভাদনের জন্য 'সালাম' প্রথাকেই সুন্দর বিকল্প হিসেবে স্থির করেছেন।

[মিশ্‌কাত শরীফ ও মিরক্বাত শরীফ-সালাম অধ্যায়]

সালাম বিনিময় প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

١. عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاللّٰهِ مَنْ بَدَأَ بِالسَّلَامِ - رَوَاهُ اَبُوْدَاوٗدَ وَاَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ

অর্থাৎ: হযরত আবূ উমামাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলার নিকট অধিকতর উত্তম ব্যক্তি হচ্ছে যে প্রথমে সালাম দেয়।

[আবু দাউদ, আহমদ, তিরমিযী শরীফ]

٢. عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلسَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ

অর্থাৎ: হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, কথাবার্তা বলার পূর্বেই সালাম। [তিরমিযী]

٣. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الْاِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ

تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتُقْرِئُ السَّلَامَ عَلٰى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

অর্থাৎ : হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র দরবারে আরয করলেন, "ইসলামের কোন্ রীতিই উত্তম?" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, তুমি (অপরকে) খানা খাওয়াবে এবং পরিচিত ও অপরিচিত উভয় প্রকার (মুসলমানকে) সালাম করবে।

[বুখারী ও মুসলিম]

٤. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى تُؤْمِنُوْا وَلَا تُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى تَحَابُّوْا اَوَلَا اَدُلُّكُمْ عَلٰى شَىْءٍ اِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ اَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

অর্থাৎ: হযরত আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা ঈমান গ্রহণ করবে, আর ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হবে না যতক্ষণ না তোমরা পরস্পরকে ভালবাসবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন কথা বলে দেবো না, যার উপর আমল করলে তোমরা পরস্পরকে ভালবাসতে থাকবে? তোমরা পরস্পরের মধ্যে সালামের প্রচলন করো

[মুসলিম]

٥. عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلٰى غِلْمَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

অর্থাৎ: হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম একদল বালকের পার্শ্ব দিয়ে গমন করলেন এবং তাদেরকে সালাম বললেন। [বুখারী ও মুসলিম]

প্রাক-ইসলামী যুগে আরবদের অভিভাদন

প্রাক-ইসলামী যুগে আরবদের মধ্যে اَنْعَمَ اللّٰهُ بِكَ عَيْنًا (আন'আমাল্লা-হু বিকা আইনান) আল্লাহ তা'আলা আপনার চক্ষু ঠাণ্ডা করুন। اَنْعِمْ صَبَاحًا (আন'আমা সাবা-হান) অথবা اَنْعِمْ مَسَاءً (আন'আমা মাসা-আন) অর্থাৎ 'শুভ প্রভাত' বা 'শুভ সন্ধ্যা' ইত্যাদি বাক্য বলার প্রচলন ছিলো। ইসলামের আবির্ভাবের পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রাক- ইসলামী যুগে ব্যবহৃত বাক্যগুলো বাদ দিয়ে পরস্পরে সাদর-সম্ভাষণের জন্য 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলতে নির্দেশ দিয়েছেন। বর্তমান আধুনিক প্রগতির যুগে ও পরস্পর সাদর-সম্ভাষণের জন্য এবং

একে অপরের শান্তির কামনায় এর চেয়ে উত্তম কোন সম্প্রীতিমূলক শব্দ বা বাক্য আবিস্কৃত হয়নি। ইসলাম যেমন সার্বজনীন ও বিশ্বব্যাপী ধর্ম, তেমনিভাবে এর প্রতিটি কাজ-কর্ম এবং নিয়ম শৃঙ্খলাও সার্বজনীন এবং ব্যাপক। দেখা-সাক্ষাতে, পরস্পর ভাব-বিনিময় ও সম্ভাষণে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ (আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ) বাক্যটি সার্বজনীন । ছোট, বড়, আমীর, গরীব সকলের ক্ষেত্রে এবং সব সময়ই প্রযোজ্য, তাই নির্দ্বিধায় বলা যায়। অন্য কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের প্রচলিত সম্ভাষণ পদ্ধতির ওই সার্বজনীনতা বা ব্যাপকতা নেই, যা মুসলমানদের সালামের মধ্যে রয়েছে। সুতরাং মুসলমানদের সালাম পদ্ধতিই সর্বোত্তম। এতদ্ভিন্ন, পরকালে বেহেশতবাসীদেরকে বেহেশতে প্রবেশকালেও اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ (আস্‌সালামু আলাইকুম) বলে সাদর সম্ভাষণ জানানো হবে।

সালামের কার্যকারিতা

অপরিচিত ব্যক্তির সাথে পরিচয় লাভ, ভাব-বিনিময় এবং তাকে খুব সহজেই আপন করে নেয়ার জন্য সাক্ষাতের সাথে সাথেই প্রথম সম্ভাষণ হিসেবে সালামই যথেষ্ট। পরিচিত ব্যক্তিদের সাথে 'সালাম' বিনিময়ে পরিচয় আরও সুদৃঢ় ও গাঢ় হয়। এ ছাড়া 'সালাম' আল্লাহর অনুগ্রহ লাভের একটি উত্তম সহায়ক। সালাম বিনিময়ের মাধ্যমে সমাজের মধ্যে পরস্পরের শত্রুতা দূর হয়ে বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয়, সম্প্রীতির পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং পরস্পরের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজেও সর্বাগ্রে সালাম দিতেন এবং সাহাবায়ে কেরামকেও এ ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন। সালামে সাওয়াবও পাওয়া যায়। হাদীস শরীফে এ প্রসঙ্গে বিশুদ্ধ বর্ণনা রয়েছে।

[মিশ্‌কাত শরীফ : সালাম অধ্যায় দেখুন]

মুসাফাহাহ্ ও মু'আনাক্বাহ

[করমর্দন ও আলিঙ্গন]

'مُصَافَحَة' (মুসাফাহাহ) শব্দটি ক্রিয়ামূল; যার আভিধানিক অর্থ একে অপরকে ক্ষমা করা। ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায়-

اَلْمُصَافَحَةُ هِىَ الْاِفْضَاءُ بِصَفْحَةٍ اِلٰى صَفْحَةِ الْيَدِ

অর্থৎ ঃ মুসাফাহাহ্ বলা হয়-একজনের হাতের তালুকে অন্যজনের হাতের তালুর সাথে মিলানো। (যাকে বাংলায় 'করমর্দন' বলা হয়।) মুসাফাহাহ্ 'আখলাকে হামীদাহ, (সচ্চরিত্রাবলী)-এর অন্যতম। সর্বপ্রথম ইয়ামানবাসীরা এর প্রচলন করেছে। অতঃপর ইসলামী শরীয়তে একে বৈধ করা হয়েছে। ইমাম মুহিউদ্দীন যাকারিয়া নাওয়াভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, পরস্পর সাক্ষাতে মুসাফাহাহ্

করা 'সুন্নাতে মুস্‌তাহাব্বাহ' (উত্তম মুস্তাহাব)। মুসাফাহা বা করমর্দনের মাধ্যমে পারস্পরিক বন্ধুত্ব সুদৃঢ় হয়। হাদীসে পাকে বর্ণিত হয়েছে, হযরত ক্বাতাদাহ্ যখন হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে মুসাফাহা'র প্রচলন ছিলো কিনা জিজ্ঞেস করলেন তখন তিনি ইতিবাচক জবাব দিয়েছিলেন। যেমন বর্ণিত হচ্ছে-

عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قُلْتُ لِاَنَسٍ اَكَانَتِ الْمُصَافَحَةُ فِىْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

অর্থাৎ ঃ হযরত ক্বাতাদ্বাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে বললাম, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীদের মধ্যে কি মুসাফাহাহ্ বা করমর্দনের রীতি প্রচলিত ছিলো?" উত্তরে তিনি বললেন, "হ্যাঁ।"

[মিশকাত]

অপর হাদীসে, মুসাফাহার কারণে গুনাহ মাফ হওয়ার কথাও উল্লেখ করা রয়েছে। যেমন-

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنْ مُسْلِمٍ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ غُفِرَلَهُمَا قَبْلَ اَنْ يَتفَرَّقَا - رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَابْنَ مَاجَةَ

অর্থাৎঃ হযরত বারা ইবনে আযিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, দু'জন মুসলমান একত্রিত হয়ে পরস্পর করমর্দন করলে অবশ্যই তারা দু'জনের গুনাহ তারা পরস্পর পৃথক হবার পূর্বেই ক্ষমা করে দেয়া হয় [আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ]

অবশ্য, ইমাম আবূ দাউদ সাজিস্তানী রাহমাতুল্লাহি আলায়হির বর্ণনায় মুসাফাহার সময় আল্লাহর প্রশংসা করলে ও ইস্তিগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা করলে গুনাহ মাফ হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে-

وَحَمِدَا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَاهُ غُفِرَلَهُمَا

অর্থাৎ ঃ এবং তারা উভয়ে (মুসাফাহাহ্ করার সময়) আল্লাহর প্রশংসা করলো এবং উভয়ে তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলো । তারা উভয়কে ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

[আবূ দাউদ]

এখানে 'সগীরাহ গুনাহ'র কথা বলা হয়েছে। 'কবীরা গুনাহ'র ক্ষমা মহান আল্লাহর ইচ্ছাধীন। তওবার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করতে পারেন। তবে حَقُّ الْعِبَادِ বা বান্দার হক নষ্ট করে থাকলে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করবেন না, যতক্ষণ না হক্বদার ক্ষমা করে দেবে।

মু‘আনাক্বা

[আলিঙ্গন]

মু‘আনাক্বা শব্দের আভিধানিক অর্থ ‘আলিঙ্গন করা, পরস্পর গলা মিলানো’। যদি কোন প্রকারের ফিৎনার আশঙ্কা না থাকে, তবে এটাও জায়েয এবং উত্তম। খারাপ উদ্দেশ্যে বা কারো প্রতি আসক্ত হয়ে আলিঙ্গন করা বা চুম্বন করা জায়েয নয়। তবে সম্মান প্রদর্শন ও বরকত লাভের উদ্দেশ্যে এক মুসলমান আরেক মুসলমানের সাথে আলিঙ্গন করা জায়েয হওয়ার বিষয়টি হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত, যেমন নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম অত্যধিক স্নেহ-মমতা ও মুহব্বত বশতঃ যে **معانقه** বা আলিঙ্গন করেছেন, তাই ইসলামী শরীয়তের বৈধ কাজ এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত, যা নিম্মোক্ত হাদীসের মাধ্যমে বুঝা যায়-

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمَ زَيْدُبْنُ حَارِثَةَ الْمَدِيْنَةَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ فِىْ بَيْتِىْ فَاَتَاهُ فَقَرَعَ فَقَامَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرْيَانَا يَجُرُّ ثَوْبَهٗ وَاللّٰهِ مَا رَأَيْتُهٗ عُرْيَانًا قَبْلَهٗ وَلَا بَعْدَهٗ فَاعْتَنَقَهٗ وَقَبَّلَهٗ ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ

অথার্ৎঃ উম্মুল মু’মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বা সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা যায়দ ইবনে হারেসাহ (অভিযান শেষে) মদীনায় মুনাওয়ারায় ফিরে আসলেন, তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে ছিলেন। যায়দ ইবনে হারিসাহ ঘরের দরজায় সঙ্কেত দিলেন। তখনই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম খালি গায়ে চাদর টানতে টানতে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন, (হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহা বলেন, আল্লাহরই শপথ! আমি হুযূরকে এর পূর্বে ও পরে কখনো খালি গায়ে দেখিনি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথে আলিঙ্গন করলেন এবং তাঁকে চুম্বন করলেন। [তিরমিযীর বরাতে মিশকাত]

কদমবুচি

عَنْ زَارِعٍ وَكَانَ فِىْ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ وَجَعَلْنَا نَتَبَادَرُ مِنْ رَوَاحِلِنَا فَنُقَبِّلُ يَدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَرِجْلَهٖ

অনুবাদ: হযরত যারি’ রদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু যিনি আবদুল কায়েস গোত্রের অন্তর্ভুক্ত তিনি বলেন, আমরা যখন মদীনা শরীফে আগমন করলাম, তখন আমাদের বাহন হতে তাড়াতাড়ি নেমে পড়লাম এবং রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম’র হস্ত মুবারক এবং কদম মুবারক চুম্বন করলাম।

-আবূ দাঊদ শরীফের সূত্রে মিশকাতুল মাসাবীহ ৪০২ পৃষ্ঠা

ইসলাম সুন্দরতম একটি আদর্শের নাম। ইসলামের শিষ্টাচার অতি চমৎকার। ছোট-বড় সকলের প্রাপ্য অধিকার সম্মান, স্নেহ, আদব, ভালবাসা, সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও সুন্দর আচরণের যে শিক্ষা ইসলামে দেয়া হয়েছে তা অন্য কোন ধর্মে দেখা যায় না। বড়দের সম্মান এবং ছোটদের স্নেহ সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

مَنْ لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا

অর্থাৎ যে বড়কে সম্মান করেনা এবং ছোটকে স্নেহ করেনা সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন নবী করীমের শিক্ষা। সম্মান প্রদর্শন বিভিন্নভাবে হতে পারে। যেমন সালাম প্রদান, দেখলে সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যাওয়া, কাজকর্মে সহযোগিতা করা, প্রয়োজনীয় বস্তু এগিয়ে দেয়া, দীর্ঘদিন পর সাক্ষাৎ হলে কদমবুচি করা কিংবা কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে যাওয়ার প্রাক্কালে কদমবুচি করা।

বড়দের মধ্যে রয়েছে- মা-বাবা, শিক্ষকমণ্ডলী, দাদা-দাদী, নানা-নানী, খালা-খালু, ফুফা-ফুফু, চাচা-চাচী, মামা-মামী, বড় ভাই, বড় বোন ইত্যাদি মুরব্বীদের কাছ থেকে দো‘আ নেয়ার অন্যতম পন্থা হল সালাম বিনিময়ের পর কদমবুচি করা। এ কাজটি অত্যন্ত চমৎকার একটি শিক্ষা, যাতে করে শিশুরা মুরব্বীদের প্রতি অধিক শ্রদ্ধাশীল ও বিনয়ী হয়ে গড়ে উঠে।

অনেকে এ কদমবুচি নাজায়েয মনে করে, এমনকি মুরব্বীদেরকে কদমবুচি করা হারাম, শির্ক ইত্যাদি ফাতওয়া দিতেও দ্বিধাবোধ করেনা। মূলত পবিত্র ক্বোরআন-হাদীসের দলীল ছাড়া এ ধরনের লাগামহীন বক্তব্য দ্বারা নতুন প্রজন্ম বিভ্রান্তির শিকার হয়। আর সমাজ হয় শিষ্টাচার বঞ্চিত, ছোটদের মনে বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা কমতে থাকে। তাই যুগ যুগ ধরে চলে আসা সুন্দরতম আদব-কায়েদার অন্যতম পন্থা যে কদমবুচি তা ইসলামী শরীয়তে কতটুকু অনুমোদিত তা পাঠকসম্মুখে উপস্থাপন করা প্রয়োজন। নিম্মে কদমবুচির বৈধতার উপর আরো কয়েকটি দলীল উপস্থাপন করা হল:

হযরত ওয়াযে’ ইবনে আমের রদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা হুযূর সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম’র পবিত্র দরবারে উপস্থিত হলাম। **فَاَخَذْنَا بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ نُقَبِّلُهَا** অর্থাৎ আমরা হুযূরের পবিত্র হাত এবং চরণযুগল ধরে চুম্বন করলাম। [আদাবুল মুফরাদ : ১৪৪ পৃষ্ঠা]

হযরত বুরাইদা রদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু বলেন-

سَأَلَ اَعْرَابِىٌّ النَّبِىَّ ﷺ اٰيَةً فَقَالَ لَهٗ قُلْ لِتِلْكَ الشَّجَرَةِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

يَدْعُوكَ فَقَالَ فَمَالَتِ الشَّجَرَةُ عَنْ يَمِيْنِهَا وَشِمَالِهَا وَبَيْنَ يَدَيْهَا وَخَلْفَهَا
فَقَطَعَتْ عُرُوْقَهَا ثُمَّ جَآئَتْ يَتَخِذُ الْاَرْضَ تَجُرُّ عُرُوْقَهَا مُغْبَرَّةً مَتٰى وَقَعَتْ بَيْنَ
يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الْاَعْرَابِىُّ مُرُهَا
فَلْتَرْجِعْ اِلَى مَنْبَتِهَا فَرَجَعَتْ فَدَلَّتْ عُرُوْقُهَا فَاسْتَوَتْ فَقَالَ الْاَعْرَابِىُّ اِئْذَنْ لِىْ
اَسْجُدْلَكَ قَالَ لَوْ اَمَرْتُ اَحَدًا اَنْ يَسْجُدَ لِاَحَدٍ لَاَمَرْتُ الْمَرْأَةَ اَنْ تَسْجُدَ
لِزَوْجِهَا قَالَ فَاْذَنْ لِىْ اَنْ اُقَبِّلَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ فَاذِنَ لَهٗ ـ

অনুবাদ: একজন বেদুঈন হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র কাছে মু'জিযা চাইল। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বেদুঈনকে এরশাদ করলেন, ওই বৃক্ষটাকে বলো আল্লাহ্‌র রসূল তোমাকে ডাকছেন। সে যখন বললো, বৃক্ষটা তার ডানে-বামে, সম্মুখে-পেছনে ঝুঁকলো, তখন ওটার শেকড়গুলো ভেঙ্গে গেলো। তারপর তা মাটি খোদাই করে শিকড়গুলো টেনে ও বালি উড়িয়ে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সম্মুখে এসে দাঁড়াল এবং বলল- আস্‌সালামু আলায়কা এয়া রসূলাল্লাহ্! বেদুঈন বললো, আপনি তাকে আদেশ করুন যেন এটা ওখানে ফিরে যায়। তাঁর নির্দেশে ওটা ফিরে গেলো এবং তার শেকড়গুলোর উপর গিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। বেদুঈন বললো, আমাকে অনুমতি দিন আমি আপনাকে সাজদা করবো। তিনি এরশাদ করলেন, যদি কাউকে সাজদাহ্ করার হুকুম দিতাম তাহলে নারীকে হুকুম দিতাম যেন সে তার স্বামীকে সাজদা করে। বেদুঈন আরয করলো- হুযূর তাহলে আমাকে আপনার হাত ও পায়ে চুম্বন করার অনুমতি দিন। তিনি তাকে অনুমতি প্রদান করলেন।

-শিফা শরীফ, দালাইলুন্নুবূয়্যাহ, আবূ নু'আয়ম পৃষ্ঠা-৩৩২

ক্বসীদায়ে বোরদা শরীফে আছে-

جَآءَتْ لِدَعْوَتِهِ الْاَشْجَارُ سَاجِدَةً تَمْشِىْ اِلَيْهِ عَلٰى سَاقٍ بِلَا قَدَمٖ

অর্থাৎ : হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ডাকা মাত্রই গাছ সাজদা করতে করতে হুযূরের নিকট হাযির হয়ে গেলো। তা হুযূরের দিকে পা নয় বরং আপন কাণ্ডের উপর ভর করেই হেঁটে এসেছে।

হযরত সোহাইব রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন-

رَأَيْتُ عَلِيًا يُقَبِّلُ يَدَ الْعَبَّاسِ وَ رِجْلَيْهِ

অর্থাৎ আমি হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে দেখেছি, তিনি হযরত আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র হাতে ও পায়ে চুমু দিচ্ছেন।

[বুখারী ফিল আদাবিল মুফরাদ, পৃষ্ঠা-১৪৪]

হযরত ইবনে জাদ'আন রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, হযরত সাবিত রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হযরত আনাস রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে বলেছেন-

اَمَسَسْتَ النَّبِىَّ ﷺ بِيَدِكَ قَالَ نَعَم فَقَبَّلَهَا

অর্থাৎ আপনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে আপনার হাত দ্বারা স্পর্শ করেছেন কিনা? তিনি ফরমালেন, হ্যাঁ। তখন তিনি তার হস্তে চুম্বন করলেন। [বুখারী ফিল আদাব : পৃষ্ঠা-১৪৪]

প্রমাণিত হল- ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শনার্থে বুযুর্গানে দ্বীনের হাতে ও পায়ে চুম্বন করা শুধু জায়েযই নয়, বরং সুন্নাত সম্মত।

কতেক লোক বুযুর্গানে দ্বীনের হাত ও পায়ে চুমু খাওয়াকে শির্ক, পূজা ইত্যাদি বলে থাকে। উল্লেখিত বিশুদ্ধ বর্ণনাসমূহ তাদের ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করা উচিত। যদি হস্ত ও পদ চুম্বন করা শির্ক হতো তাহলে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কখনোই তা করার অনুমতি প্রদান করতেন না। প্রতীয়মান হলো- হস্ত ও পদচুম্বন কেবল সম্মান প্রদর্শনার্থে শির্ক কিংবা পূজা নয়। যদি এটাকে শির্ক বলা হয়, তবে বলতে হয় হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি শির্ক করার অনুমতি প্রদান এবং সাহাবায়ে কেরাম দ্বারা শির্ক সংঘটিত হয়েছে। (না'ঊযু বিল্লাহ্!)

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে দ্বীন সহকারে প্রেরিত হয়েছেন তার (দ্বীনের) মৌলিক শিক্ষাই হল, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই।

যেহেতু বিশুদ্ধ হাদীস শরীফ এবং সাহাবা-ই কেরামের পবিত্র জীবনে কদমবুচি তথা সম্মান প্রদর্শনার্থে বুযুর্গানে দ্বীনের হাত ও পা চুম্বন করার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, তাই বলা যায়- কদমবুচি করা কোন গর্হিত কাজ তো নয়ই, বরং এটা একটি বরকতময় আমল। কদমবুচি শির্ক বলে যারা ফিতনা- ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে তারা নির্বিচারে মনে করে মাথা নিচু করাই সাজদাহ্। আর আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে সাজদাহ্ করা হারাম; তাই কদমবুচিও হারাম।তাদের জানা দরকার, রুকু' ও সাজদার জন্য নিয়্যত আবশ্যক। যেহেতু কদমবুচির ক্ষেত্রে কোন মুসলমানের অন্তরে কষ্মিণকালেও সাজদাহ্ করার নিয়্যত থাকেনা, সেহেতু কদমবুচি হারাম বলাটা ফিতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টির নামান্তর।

পরিশেষে বলতে হয়, মা-বাবা, শিক্ষকমণ্ডলী, পীর- মাশাইখ, বুযুর্গানে দ্বীনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে কদমবুচি নিঃসন্দেহে একটি বৈধ আমল, যা নতুন প্রজন্মের জন্য একটি উত্তম আদর্শও বটে। এতে শ্রদ্ধা, সম্প্রীতি, স্নেহ, মমতা ও ভালবাসা বৃদ্ধি পায়।

আদব বা শিষ্টাচার

মানব জীবনের অন্যতম মহৎ গুণ হল আদব, ভদ্রতা ও শিষ্টাচার। বে-আদব মহান আল্লাহর অনুগ্রহ হতে বঞ্চিত হয়। তাই কোন এক বুযুর্গ বলেছেন- بے ادب محروم گشت از فضل رب (বেআদব মাহরূম গাশত আয্ ফদ্বলে রব) অর্থাৎ: বেআদব মহান রবের অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত থাকে। আদব শব্দটি একবচন। এর বহুবচন اداب (আ-দাব)। এর আভিধানিক অর্থ ভূষিত হওয়া, 'উত্তম চরিত্র', সৌজন্যময় ব্যবহার ইত্যাদি। এ ছাড়া এটা 'তত্ত্বাবধান করা' 'একত্রিত করা' ও 'আহবান করার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এর পারিভাষিক অর্থ সম্পর্কে আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, اَلْاَدَبُ هُوَالْاَخْذُ بِمَكَارِمِ الْاَخْلَاقِ অর্থাৎঃ আদব হচ্ছে-উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ অনুসরণ করা। আল্লামা ত্বীবী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন- মর্যাদা লাভের জন্য প্রশংসনীয় ও কঠোর সাধনা করার নাম আদব। 'মিরক্বাত' প্রণেতা বলেন- اَلْاَدَبُ مَا يُحْمَدُ قَوْلاً وفِعْلاً অর্থাৎঃ কথায় ও কাজে এমন আচরণ প্রকাশ করা, যা দ্বারা প্রশংসা লাভ করা যায়। মূলতঃ আদাব এমন কতগুলো উত্তম ও প্রশংসনীয় গুণ বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়, যেগুলোর মাধ্যমে একজন মানুষ আদর্শ ব্যক্তি হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে। 'আদব' শব্দটি ব্যাপক। খাওয়ার আদব, বসার আদব, ঘুমানোর আদব ইত্যাদিও এর অর্ন্তভুক্ত। এসব বিষয় ও কথা যথানিয়মে সম্পন্ন করা জরুরী। এ কারণে বলা হয়- اَلْاَدَبُ جُنَّةٌ لِلنَّاسِ অর্থাৎঃ আদব হচ্ছে মানুষের জন্য ঢাল স্বরূপ।

উত্তম চরিত্র শিক্ষায় ইসলামের অবদান

ইসলাম 'আখলাক্বে হামীদাহ' (প্রশংসনীয় চরিত্র)-এর যে ব্যাপক শিক্ষা দান করেছে, তা বিশ্বের যে কোন জাতি বা সমাজের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ। সর্বোত্তম চরিত্র হচ্ছে নবীকুল সরদার হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র জীবনের এক বাস্তব প্রতিচ্ছবি।

ক্বোরআন মাজীদে মহান আল্লাহ এরশাদ করেন-

اِنَّکَ لَعَلٰی خُلُقٍ عَظِیْمٍ

তরজমাঃ নিঃসন্দেহে আপনি উত্তম চরিত্রের অধিকারী। আর হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে- হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন-

كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْاٰنَ

অর্থাৎঃ তাঁর (হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) চরিত্র হচ্ছে ক্বোরআন মজীদ।

মহান আল্লাহ এ পৃথিবীতে যত নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন সবাইকে মানব চরিত্রের

উৎকর্ষ সাধনের জন্যই প্রেরণ করেছেন। আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَخْلَاقِ

অর্থাৎঃ আমি প্রেরিত হয়েছি উত্তম চরিত্রকে পূর্ণতা দানের লক্ষ্যে। বস্তুত চারিত্রিক মাধুর্যই অন্যের মাঝে ইসলামের প্রভাব প্রতিষ্ঠায় বিশেষভাবে সাহায্য করে। কথা ও কাজে সমন্বয় থাকা অন্যতম উত্তম চরিত্র। ইসলামী আদর্শ প্রচারের জন্য ইসলামী আদর্শের পূর্ণ অনুশীলন বাঞ্ছনীয়।

যেমন- আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন-

لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَالَا تَفْعَلُوْنَ

তরজামা ঃ তোমরা যা করনা তা বলো কেন?

সর্বোপরি, উত্তম চরিত্র মহান আল্লাহর গুণাবলীরও বহিঃপ্রকাশ। আর আল্লাহর গুণাবলী অর্জনের মাধ্যমেই মানুষের জীবন এবং ইসলামের প্রচার ও প্রসার সাফল্যমণ্ডিত হয়। রাসূল-ই করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

اِنَّ مِنْ اَحَبِّكُمْ اِلَیَّ اَحْسَنُكُمْ خُلُقًا

অর্থাৎঃ তোমাদের মধ্যে আমার নিকট অধিক পছন্দনীয় হচ্ছে ওই ব্যক্তি, যার চরিত্র অত্যধিক সুন্দর।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সচ্চরিত্রবান ব্যক্তিকে সর্বোত্তম ব্যক্তি বলে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন তিনি এরশাদ করেন-

اِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ اَحْسَنُكُمْ اَخْلَاقًا

অর্থাৎঃ নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি হচ্ছে তোমাদের মধ্যে যার চারিত্রিক গুণাবলী অধিক সুন্দর।

অনুরূপ ওই চরিত্র মানুষের জন্য সর্বোত্তম নি'মাতও বটে। যেমন সম্মানিত সাহাবীগণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মহান দরবারে আরয করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) মানুষকে যে সব নি'মাত দান করা হয়েছে, তন্মধ্যে সর্বোত্তম নি'মাত কোন্টা? উত্তরে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

اَلْخُلُقُ الْحَسَنُ অর্থাৎ "উত্তম চরিত্র।" এক পর্যায়ে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

اَلْخُلُقُ الْحَسَنُ وَالْقُؤْدَةُ وَالْاِقْتِصَادُ جُزْءٌ مِّنْ اَرْبَعٍ وَّعِشْرِيْنَ جُزْءً مِّنَ النُّبُوَّةِ

অর্থাৎঃ সুন্দর চরিত্র, সুন্দর নেতৃত্ব ও মিতব্যয়িতা নুবূয়তের চব্বিশ ভাগের এক ভাগ।
সচ্চরিত্র দ্বারা যেমন মানুষ নিজে সমাজে সমাদৃত হয়, তেমনি সমাজও তা দ্বারা শান্তি, সমৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা লাভ করে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটিয়েছেন উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে। জোর করে কাউকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হয়নি, বরং মানুষ রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর চারিত্রিক মাধুর্যে মুগ্ধ হয়েই ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

উত্তম চরিত্রের উপকারিতা

উত্তম ও প্রশংসনীয় চরিত্র অবলম্বনের মাধ্যমে মহান রবের ভালবাসা লাভ করা যায়। যেমন- হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

اَحَبُّ عِبَادِ اللّٰهِ اِلَى اللّٰهِ اَحْسَنُهُمْ اَخْلَاقًا

অর্থাৎঃ আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে ওই বান্দা আল্লাহর কাছে বেশী পছন্দনীয়, যে চরিত্রের দিক দিয়ে উত্তম। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেন-

اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ

অর্থাৎ ঃ নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ নম্র, তিনি নম্রতাকে পছন্দ করেন। উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি দুনিয়া ও আখিরাতে অধিক মর্যাদার অধিকারী হন। যেমন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللّٰهُ

অর্থাৎঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সমীপে বিনয়াবনত হয়, আল্লাহ তার মর্যাদাকে উন্নীত করেন।
অনুরূপভাবে, ক্বিয়ামতের দিন নেকীর পাল্লায় উত্তম বা প্রশংসনীয় চরিত্রই ভারী হবে। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

مَامِنْ شَيْئٍ يُوْضَعُ فِى الْمِيْزَانِ اَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ

অর্থাৎঃ কোন বস্তুই, যা 'মিযান'-এ রাখা হবে, সুন্দর চরিত্র অপেক্ষা বেশী ভারী নয়।
হযরত আয়েশা ছিদ্দীক্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলেন, সচ্চরিত্রের মাধ্যমেই প্রকৃত ঈমানদারের পরিচয় হয়। কারণ সে উদার ও চরিত্রবান হয়। পক্ষান্তরে কঠোর হৃদয় ও অমুসলিম ব্যক্তি এমন হয় না। হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

اَلْمُؤْمِنُ غُرٌّ كَرِيْمٌ وَالْفَاجِرُ خَبٌّ لَئِيْمٌ

অর্থাৎঃ মু'মিন হচ্ছে উজ্জ্বল, ভদ্র, আর পাপাচারী হচ্ছে, প্রতারক ও নীচ।
রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে আরয করা হলো, "কোন কাজের জন্য অধিক লোক জান্নাতে যাবে?" তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন- تَقْوَى اللّٰهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ। অর্থাৎঃ খোদাভীতি ও সৎ চরিত্র।
মোট কথা, সচ্চরিত্রে চরিত্রবান মানুষ সকলের কাছে সমাদৃত। সকলে তাকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা ও ভক্তি করে। সবাই তাঁর সম্মান রক্ষা করে চলে। শত্রুগণ ক্ষতি করার জন্য অগ্রসর হলেও আশেপাশের মানুষ তাঁকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসে।

পোষাক-পরিচ্ছদ

উত্তম চরিত্রের অন্যতম দিক হচ্ছে- পোষাক-পরিচ্ছদের শালীনতা। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের পৃথক পৃথক পোষাক রয়েছে; কিন্তু মুসলমানদের পোষাক সবচেয়ে পছন্দনীয়। ক্বোরআন-ই হাকীমে মহান আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন-

يَا بَنِىْ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِىْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ـ

অর্থাৎঃ হে আদমের বংশধর! নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি এমন পোষাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান ঢেকে রাখে এবং তোমাদের জন্য আরাম দায়ক। আর পরহেযগারীর পরিচ্ছদই সর্বোৎকৃষ্ট। এটা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। [সূরা আ'রাফ, আয়াত- ২৬]
আলোচ্য আয়াতে 'পরহেযগারীর পোষাক' বলতে ঈমান, লজ্জা, সৎস্বভাব ও নেক আমলসমূহের কথা বুঝানো হয়েছে। [কানযুল ঈমান, আয়াত- ৮-১০]
আলোচ্য আয়াতে পরহেযগারীর পোষাকের প্রতি জোর দেয়া হয়েছে। আর এটা সুস্পষ্ট যে, পরহেযগারীর পোষাক বলতে সেটাই হতে পারে, যা পরনের জন্য আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম শিক্ষা দিয়েছেন; কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো সুন্নাত অনুসারে কতজন জীবন অতিবাহিত করছে? ইংরেজ জাতি মুসলমানদের অনুকরণ করে না, অথচ মুসলমানরা ইংলিশ ফ্যাশন অবলম্বনের জন্য মাতোয়ারা!
সাদাসিধে পোশাক পরিধান করা উচিত। তবে এটাও স্মরণ রাখতে হবে যে, লেবাস-পোষাক এমনকি প্রত্যেক বিষয়ে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ। হযরত জাবের রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সরকারে মদীনা, নুরে

মুজাস্‌সাম, হুযুর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে তাশরীফ আনলেন। এক ব্যক্তিকে উদাসীন দেখলেন; যার চুলগুলো এলোমেলো ছিলো। হুযূর ইরশাদ ফরমালেন, তার নিকট কি এমন কোন জিনিসও নেই, যাদ্বারা সে চুলগুলো সোজা করতে পারে? আর অন্য এক ব্যক্তিকে ময়লাযুক্ত কাপড় পরিহিত দেখলেন। তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমালেন-কাপড় ধোয়ার মত কোন জিনিসও কি পাওয়া গেলো না?

[নাসাঈ শরীফ]

হযরত আবূ সা'ঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সরকারে মদীনা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করতে শুনেছি যে, মু'মিনের লুঙ্গি পরিধান করা পছন্দনীয়। নিয়ম হচ্ছে অর্ধগোছা পর্যন্ত পরা এবং অর্ধ গোছা থেকে গোড়ালীর উপরিভাগ পর্যন্ত পরলেও কোন গুনাহ নেই। যদি এর নিচে যায় তাহলে সেটা আগুনে জ্বলবে। একথা হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তিনবার বলেছেন এবং যে ব্যক্তি অহঙ্কার বশতঃ স্বীয় কাপড় গোড়ালীর নিচে পর্যন্ত ঝুলায়, ক্বিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা তার দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না। [আবূ দাঊদ শরীফ]

হযরত আমীরুল মু'মেনীন সাইয়্যেদুনা ওমর ফারূক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নতুন পোষাক পরিধান করে বলতেন-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ مَا اُوَارِىْ بِهٖ عَوْرَتِىْ وَاَتَجَمَّلُ بِهٖ فِىْ حَيٰوتِىْ

অর্থাৎঃ সমস্ত প্রশংসা ওই আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে এমন পোষাক পরিধান করিয়েছেন, যাদ্বারা আমি সতর ঢাকি এবং আমার জীবনে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করি।

হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আরো বলেন, 'আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করতে শুনেছি, যে ব্যক্তি নতুন কাপড় পরিধান করার সময় এ দো'আটি পড়ে এবং পুরানো কাপড় সাদক্বা করে দেয়, তাহলে তার জীবদ্দশায় এবং তার মৃত্যুর পর আল্লাহ তার হেফাযতকারী ও রক্ষক হন।

মেয়েদের ঘরের বাইরে যেতে শরীয়তে নিষেধ করা হয়নি। তবে দু'টি শর্ত রয়েছেঃ প্রথম শর্ত হচ্ছে বিনা প্রয়োজনে ঘরের বাইরে ঘুরে বেড়ানো যাবেনা। নিতান্ত অপরিহার্য প্রয়োজন থাকলেই কেবল ওই প্রয়োজন পূরণের জন্য ঘর থেকে বের হওয়া যাবে। আর ২য় শর্ত হচ্ছে নিজের মুখ, মাথা, বুক, পিঠ এবং সমগ্র শরীর ভালভাবে আবৃত করে বের হতে হবে। শরীর, মুখ উন্মুক্ত রেখে-চেহারা প্রকাশ করে ঘর থেকে বের হওয়া মেয়েদের জন্য হারাম। বর্তমানে কিছু সংখ্যক মেয়ে দেহের কিছু অংশ আবৃত রাখে আর কিছু অংশ অনাবৃত বা খোলা রাখে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে

নিজেদের রূপ-সৌন্দর্য পুরুষদের সামনে প্রকাশ করা। এটাই হারাম। বর্তমানে কিছু কিছু মেয়ে এমন পাতলা কাপড় পরিধান করে, যার ফলে দেহের প্রত্যেকটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়।

যে সব মেয়ে তাদের পোষাক পরিধান করেও না পরার মতো হয়, তাদের মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কঠোর বাণী উচ্চারণ করেছেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُسُهُنَّ كَاَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمُسَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَالا يجدن ريحها لتوجد من مسيرة لتوجد من مسيرة كذا وا كذا (مسلم)

অর্থাৎঃ যে সব নারী পোশাক পরিধান করেও উলঙ্গ, যারা নিজেদের কুকর্মকে অন্য লোকের কাছে প্রকাশ করে, যারা বুক ও স্কন্ধ বাঁকা করে এদিকে ওদিকে ঝুঁকে চলে, যাদের মাথা ষাঁড়ের চুটের ন্যায় ডানে বামে হেলেদুলে ঝুঁকে পড়ে। তারা বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। এমনকি বেহেশতের সুগন্ধিও লাভ করতে পারবে না। যদিও বেহেশেতের ওই সুগন্ধি বহুদূর থেকেও পাওয়া যাবে।

আল্লাহ পাক পোষাক ও ভূষণ নাযিল করেছেন, পোশাক এমন বস্তু, যা স্ত্রী পুরুষ সকলের লজ্জাস্থান সমূহকে পূর্ণ মাত্রায় আবৃত করে। তাক্বওয়া বা খোদাভীরুতার পোষাকই উত্তম পোষাক। তাছাড়া পোশাক হতে হবে শোভা বৃদ্ধিকারী ও শরীয়ত সমর্থিত সীমার মধ্যে। তাক্বওয়া বিরোধী পোষাক আল্লাহ পছন্দ করেন না। তাই পরিবারের সকলকেই লক্ষ্য রাখতে হবে- যে পোশাক সতর ঢাকে, তা-ই আল্লাহ পছন্দ করেন, কেবল ওই পোশাকই যেন পরিবারের সকল সদস্য পরিধান করতে অভ্যস্ত হয়, আর এ ব্যাপারে পরিবারের প্রধান যেমন- বাবা-মা ক্ষেত্র বিশেষে বড় ভাই সে জন্য মুখ্য ভূমিকা পালন করবেন।

আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা হতে বর্ণিত, একদিন হযরত আসমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা পাতলা পোশাক পরিধান করে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে আসলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম চেহারা মুবারক ফিরিয়ে নিলেন এবং এরশাদ করলেন- "হে আসমা! যখন নারী প্রাপ্তবয়স্কা হয়, তখন মুখ ও হাতের তালু ব্যতীত তার শরীরের কোন অংশ দেখা না যাওয়া চাই।" নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পাতলা পোশাক পরিধান করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন এবং মু'মিনদের মহীয়সী মা হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা পাতলা ওড়না দেখলেই ছিঁড়ে ফেলতেন। কিন্তু আজ দূর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের সমাজে বিভিন্ন ধরনের পাতলা কাপড়ের ওড়না খুবই প্রচলিত এবং অনেক মহিলার

নিকট পছন্দনীয় এবং এগুলো পরে পর পুরুষের সামনে আসা হারাম। অধিকন্তু এ ধরনের পাতলা ওড়না পরে নামায পড়লে নামাযই শুদ্ধ হবে না। নামাযে এতটুকু মোটা চাদর দ্বারা মাথা ঢাকা ফরয, যার ফলে চুলের কাল রং প্রকাশ না পায়। উল্লেখ্য, ফাসিক্ব জাতীয় ও অধিকন্তু অমুসলিমরাই এসব ফ্যাশনের প্রবর্তক। অথচ মুসলমানদের সেদিকে কোন খেয়াল নেই। তাই অ-ইসলামী ফ্যাশনের পাশাপাশি মুসলমানদেরও ইসলামী নিয়মের পোশাক তৈরি করে তার প্রচারণা ও সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যথায় বাধ্য হয়ে অ-ইসলামী ফ্যাশনের দিকে ঝুঁকে পড়া স্বাভাবিক। তজ্জন্য দায়িত্বশীলগণই দায়ী হবেন বৈ-কি।

হযরত আবূ সা'ঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করতে শুনেছি যে, মু'মিনের লুঙ্গি পরিধান করার পছন্দনীয় নিয়ম হচ্ছে- পায়ের অর্ধ গোছা পর্যন্ত পরা এবং অর্ধ গোছা থেকে গোড়ালী পর্যন্ত পরলেও কোন অসুবিধা নেই। যদি এর নিচে চলে যায় তাহলে সেটা আগুনে জ্বলবে। এ কথাটি হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তিনবার এরশাদ করেছেন। আর যে ব্যক্তি অহঙ্কার করে স্বীয় লুঙ্গী গোড়ালির নিচে পর্যন্ত ঝুলায় ক্বিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা তার দিকে (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না। [আবূ দাঊদ শরীফ]

পানাহার

মহান আল্লাহ আমাদের পানাহারের লক্ষ্যে যা কিছু ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, তা আমাদের জন্য বড় নি'মাত। এরই মাঝে আমাদের জন্য দিয়েছেন নানা প্রকারের স্বাদ ও বরকত। আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত মুতাবেক যদি খাবার গ্রহণ করি ও পানীয় পান করি, তাহলেই এতে আমাদের জন্য অনেক বরকত নিহিত আছে। হালাল আহারের প্রসঙ্গে ইমাম আবূ হামেদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল গাযালী তাঁর প্রণীত গ্রন্থ 'ইহয়াউ উলুমিদ্ দ্বীন' -এ উল্লেখ করেছেন, মুসলমান যখন হালাল খাবারের এক গ্রাস মুখে দেন, তখন তার পূর্বেকার গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।

ত্বাবরানী শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, খাওয়ার আগে ও পরে ওযূ করলে অভাব দূর হয়ে যায় এবং এটা সম্মানিত নবীগণের সুন্নাত। খাবারের পূর্বে 'বিসমিল্লাহ' পড়া সুন্নাত। মুসলিম শরীফে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, ''যে খাবারে 'বিসমিল্লাহ' পাঠ করা হয় না, সে খাবারে শয়তান শরীক হয়ে যায়।''

মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেন- যখন কোন ব্যক্তি আহার করে, তখন সে যেন মহান আল্লাহ্র নাম স্মরণ করে অর্থাৎ 'বিসমিল্লাহ' পড়ে। আর যদি 'বিসমিল্লাহ' পড়তে ভূলে যায়, তাহলে স্মরণ হওয়া মাত্র বলবে بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلَهٗ وَاٰخِرَهٗ (বিসমিল্লাহি আউয়ালাহু ওয়া আখিরাহু)। আর খাবারের জন্য বসার সুন্নাত তরীকা হচ্ছে যে, ডান হাঁটু দাঁড় করিয়ে বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসা।

ডান হাতে পানাহার করা সুন্নাত। হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবীয়ে দু'জাহান সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এশাদ করেন, যখন কেউ খাবার গ্রহণ করে, তখন সে যেন ডান হাতে গ্রহণ করে। আর পানি পান করলে ডান হাতেই পান করে। [মুসলিম শরীফ]

কিন্তু আফ্ফোস! একালের মুসলমানরা এ ব্যাপারে উদাসীন! বরং আমরা দুনিয়ার আধুনিকতার ঘূর্ণিপাকে এমনভাবে পতিত হয়েছি যে, আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতের প্রতি কোন তোয়াক্কাই করি না। হাদীস শরীফের বর্ণনা মতে শয়তান মানুষের শিরা ও উপশিরায় বিচরণ করে। তাই একথা সুস্পষ্ট যে, সে কখনো আমাদেরকে সহজে সুন্নাতসমূহের দিকে যেতে দেবে না। যদিও আমরা ডান হাতে খেয়ে থাকি, কিন্তু এরপরও অন্যদিকে শুধু বাম হাতের আশ্রয় নিয়ে থাকি। এটাও ঠিক নয়। যেমন আহারের সময় ডান হাতে খাদ্য মিশ্রিত হওয়ায় শুধু বাম হাতে পানি পান করি। চা পান করার সময় ডান হাতে কাপ নিয়ে বাম হাতে পানির গ্লাস নিয়ে থাকি এবং বাম হাতেই অন্যদেরকে গ্লাস দিয়ে থাকি। এসব ক্ষেত্রে বাম হাতের সাথে সাথে সাধ্যমতো ডান হাতের ব্যবহারকে প্রাধান্য দিতে হবে। খাদ্য গ্রহণের আগে ও পরে হাত কব্জি পর্যন্ত ধোয়া, কুল্লি করা এবং মুখের বাইরের অংশ ধোয়া সুন্নাত। পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, খাওয়ার সময় বাম পা বিছিয়ে দিয়ে ডান পা খাড়া রাখা সুন্নাত।

পানাহারের আগে নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ করাও বিশেষ উপকারী-

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَيْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

উচ্চারণঃ বিসমিল্লাহিল্লাযী লা-ইয়াদ্বুররু মা'আসমিহী শাইউন ফিল আরদ্বি ওয়ালা ফিস্ সামা-ই ওয়া হুয়াস্ সামী'উল 'আলীম।

আর খাওয়ার পরে নিম্নোক্ত দো'আটি পাঠ করা সুন্নত।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

উচ্চারণঃ আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আত্ব'আমানা ওয়া সাক্বা-না ওয়া জা'আলানা-মিনাল মুসলিমীন।

আর এতটুকু পড়তে না পারলে শুধু اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (আলহামদুল্লিাহ) বলবে। প্রত্যেক তরল পানীয় তিন চুমুকে পান করা সুন্নাত।

বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পানি পান করার সময় তিনবার শ্বাস নিতেন। অর্থাৎ পাত্রের বাইরে নিঃশ্বাস নিতেন। ঝমঝমের পানি ও অযূর অবশিষ্ট পানি দাঁড়িয়ে পান করা সুন্নাত। অন্যান্য পানি দাঁড়িয়ে পান করা মাকরূহ ও ক্ষতিকর।

মন্দ চরিত্র

মানুষ আশরাফুল মাখলুক্বাত তথা সৃষ্টির সেরা। এই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হয় اَخْلَاق حَسَنَة তথা চারিত্রিক গুণের মাধ্যমে। সৎ চরিত্র দ্বারা যেমন মানুষ সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে, তেমনি অসৎ চরিত্র দ্বারা সে জীবজন্তুর চেয়েও নিকৃষ্ট হয়ে যায়। মন্দ চরিত্রের লোককে কেউ পছন্দ করে না। এমনকি অতি আপনজনও তাকে ঘৃণা করে। ফলে মন্দ কাজগুলো চিহ্নিত করে সম্পূর্ণ পরিহার করা একান্ত প্রয়োজন। আর এ মন্দকাজগুলো হচ্ছে হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ-লালসা, পরনিন্দা, অহংকার, মিথ্যা, রিয়া, রাগ, তোষামোদ, গালি-গালাজ, মদ, ব্যভিচার, জুয়া ইত্যাদি। এসব মন্দ কাজের খারাপ পরিণতি সম্পর্কে ক্বোরআন-হাদীসে বিশদ বর্ণনা রয়েছে এবং ওইগুলো পরিত্যাগ করার কঠোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিছু মন্দ কাজের পরিচিতি ও পরিণতি সম্পর্কে ক্বোরআন-হাদীসের আলোকে নিম্নে আলোচনার প্রয়াস পাচ্ছি।

হিংসা-বিদ্বেষ

আরবীতে হিংসা-বিদ্বেষকে 'হাসাদ' বলে। حسد শব্দের অর্থ হলো কারো নি'মাত ও সুখ সাচ্ছন্দ্য দেখে মনে মনে জ্বলে ওঠা ও তার অবসান কামনা করা। ইমাম নাওয়াভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, অন্যের প্রাপ্ত নি'মাতের বিনাশ কামনা করাই হল হাসাদ। [রিয়াদ্বুস্ সালেহীন, পৃষ্ঠা- ৫৯১]

এ হিংসা হারাম ও মহাপাপ। শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, আসমানে সর্বপ্রথম সংঘটিত গুনাহ- হিংসা, যা অভিশপ্ত শয়তান থেকে প্রকাশিত হয়েছে। হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম-এর বিরুদ্ধে, আর পৃথিবীতেও সর্বপ্রথম গুনাহ-হিংসা, যা আদম আলায়হিস্ সালাম-এর পুত্র হাবীলের বিরুদ্ধে ক্বাবিল থেকে প্রকাশিত হয়েছে। [তাফসীরে আযীযী, পৃষ্ঠা- ২৯৭]

এই হিংসার কারণেই তাঁর ভাইয়েরা হযরত ইয়ূসুফ আলায়হিস্ সালামকে স্বীয় পিতা ইয়াক্বুব আলায়হিস্ সালাম থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিলেন। ইহুদী, নাসারা

দ্বীন-ইসলামকে অস্বীকার করেছে হিংসার কারণে। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا

অর্থাৎঃ আহলে কিতাবের অনেকেই হিংসা বশতঃ চায় যে, মুসলমান হওয়ার পরও তোমাদেরকে কোন রকমে কাফির বানিয়ে দেবে। [সূরা বাক্বারা, আয়াত- ৪৩]

হিংসা এমন এক মারাত্মক ব্যাধি, যার কোন ঔষধ নেই, চিকিৎসা নেই। হিংসুক নিজেই হিংসার আগুনে জ্বলে থাকে। হিংসার আগুন অপরকে পোড়াতেও পারে, নাও পারে, কিন্তু সে আগুনে হিংসুক নিজে জ্বলবে- এতে কোন সন্দেহ নেই। হিংসুকের কোন ইবাদত আল্লাহর দরবারে ক্ববূল তো দূরের কথা; পৌঁছবেও না। কেননা হিংসা হিংসুকের যাবতীয় ইবাদত নষ্ট করে দেয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

اِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَاِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ

অর্থাৎঃ তোমরা হিংসা-বিদ্বেষ থেকে বেঁচে থাকো, কেননা হিংসা মানুষের সৎকর্মসমূহকে খেয়ে (নষ্ট করে) ফেলে, যেমনিভাবে আগুন শুকনো লাকড়িকে জ্বালিয়ে ছাই করে দেয়। [আবু দাউদ শরীফ]

অন্যত্র নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

لَاتَبَاغَضُوْا وَلَا تَحَاسَدُوْا وَلَا تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَّهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ

অর্থাৎঃ তোমরা পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করো না। পরস্পরের প্রতি মুখ ফিরিয়ে রেখো না, বরং আল্লাহর বান্দা হিসেবে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও। আর কোন মুসলমানের পক্ষে অন্য মুসলমান ভাইয়ের প্রতি তিনদিনের বেশী সময় পর্যন্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে রাখা জায়েয নয়। [বুখারী ও মুসলিম শরীফ]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হিংসা-বিদ্বেষকে দ্বীন মুণ্ডনকারী মারাত্মক ব্যাধি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে-

دَبَّ اِلَيْكُمْ دَآءُ الْاُمَمِ قَبْلَكُمُ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَآءُ هِيَ الْحَالِقَةُ لَا اَقُوْلُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ لٰكِنْ تَحْلِقُ الدِّيْنَ

অর্থাৎঃ পূর্ববর্তী উম্মতের ব্যাধি তোমাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে; তা হল হিংসা-বিদ্বেষ। এটা মুন্ডনকারী ব্যাধি। (নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন) আমি চুল মুন্ডনকারী বলছি না বরং দ্বীন মুন্ডনকারী। [মেশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা- ৪২৮]

ইমাম গাযালী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম একদা এক ব্যক্তিকে আরশে আ'যমের ছায়ায় দেখে আল্লাহর দরবারে আরয করলেন, "হে আল্লাহ! এ ভাগ্যবান ব্যক্তি কে?" আল্লাহ উত্তর দিলেন তিনটি আমলদ্বারা সে নৈকট্য অর্জন করেছেঃ ১. সে কখনো কারো প্রতিহিংসা করেনি। ২. সে কোন দিন পিতা-মাতার অবাধ্য হয়নি এবং ৩. সে কোন দিন চোগলখোরী করেনি।

[ইহ্ইয়াউল উলূম]

হিংসা এমন এক ভয়ঙ্কর ব্যাধি যে, অজ্ঞ লোক তো বটেই, বড় বড় সাধক দরবেশকেও কাবু করে নেয়। এমনকি তাদেরকে দুনিয়াতে সর্বনাশ করে পরকালে জাহান্নামে পৌঁছিয়ে দেয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ছয় প্রকারের লোক ছয়টি কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করবেঃ আরবগণ স্বজনপ্রীতির কারণে, আমীর-উমারার দল নিপীড়ন-নির্যাতনের কারণে, ব্যবসায়ীগণ খেয়ানতের কারণে, পল্লীবাসীরা মূর্খতার কারণে এবং পীর ও আলিমগণ হিংসার কারণে। [মিনহাজুল আবেদীন, বাংলা, পৃষ্ঠা- ১১৬]

ইমাম গাযালী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, হিংসা সাধারণত পাঁচটি অনিষ্ট করেঃ

১. পূণ্য বিনষ্ট করে।

২. পাপ ও নাফরমানীর প্রেরণা যোগায়।

৩. অহেতুক হয়রানী ও দুশ্চিন্তার উদ্ভব ঘটায়, অধিকন্তু পাপ বৃদ্ধি করে।

৪. হিংসার প্রভাবে হিংসুটের হৃদয় দৃষ্টিহীন হয়ে যায় ও

৫. অবমাননা ও লাঞ্ছনার অভিশাপ ডেকে আনে। [প্রাগুক্ত]

হিংসুক উভয় জগতে ক্ষতিগ্রস্ত। হিংসুকের হিংসার কারণে হিংসাকৃত ব্যক্তির নি'মাত বন্ধ হবে না বরং বাড়বে। ফলে যত নি'মাত বাড়বে তত হিংসুকের অন্তরের জ্বলনও বেড়ে যাবে। হিংসার আগুন অন্যকে জ্বালাবে কিনা সন্দেহ থাকে; কিন্তু হিংসুককে জ্বালাবে এতে কোন সন্দেহ নেই। কারো নি'মাত দেখে হিংসা হওয়া মানে আল্লাহর বন্টনে নারায হওয়া। ইমাম গাযালী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, হযরত যাকারিয়া আলায়হিস্ সালাম এর বাণী- আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দার প্রতি প্রদত্ত নি'মাত দেখে হিংসা করা মানে আমার বন্টনে নারায হওয়া। [খুৎবাতে গাযালী, পৃষ্ঠা- ১০২]

আল্লাহর কাজে নারায হওয়া কুফরী। আর পরকালের ক্ষতি হল দুনিয়ায় হিংসার কারণে তার সব আমল নষ্ট হয়ে যাবে; ফলে ক্বিয়ামত দিবসে আমল শূন্য অবস্থায় উঠবে। অথবা হিংসুকের আমল হিংসাকৃত ব্যক্তির আমল নামায় লিখা হবে, ফলে হিংসুককে আমল বিহীন অবস্থায় জাহান্নামে যেতে হবে।

অতএব, হিংসা সর্বাবস্থায় পরিত্যাজ্য। তবে ঈর্ষা জায়েয। ঈর্ষাও এ অর্থে যে, নি'মাতের অধিকারী ব্যক্তির নি'মাত ধ্বংস কামনা না করে নিজেই অনুরূপ ব্যক্তির

নি'মাত লাভের প্রত্যাশা করা। যেমন কারো ধন-দৌলত, জ্ঞান, গরিমা, তাক্বওয়া-পরহেযগারী দেখে ওদের মত নিজের জন্য আল্লাহর কাছে তা প্রার্থনা করা। এটা মন্দ নয়; বরং উত্তম। যেমন হাদীস শরীফে আছে- যারা নবীও নন, শহীদও নন; কিন্তু ক্বিয়ামতের দিন তাদের মর্যাদা দেখে নবীগণ ও শহীদগণ আল্লাহর কাছে ঈর্ষা করবেন। [মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা-৪২৬]

তাই হিংসা পরিত্যাগ করে ঈর্ষা গ্রহণ করে দুনিয়া-আখেরাতের সফলতা অর্জনে সদা সচেষ্টা থাকা উচিত।

রিয়া

'রিয়া' শব্দের অর্থ হলো লোক দেখানো। মূলতঃ মানুষকে উত্তম চরিত্র দেখিয়ে তাদের ধারণায় মর্যাদাবান হওয়াকে 'রিয়া' বলে। ইমাম গাযালী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন- লোক দেখানো ইবাদতের মাধ্যমে নিজের মহত্ব ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করাই হলো রিয়া। জেনে রেখো, রিয়া হারাম আর রিয়াকারী আল্লাহ তা'আলার নিকট অভিশপ্ত। [তাশকীলে কিরদার, উর্দু, পৃষ্ঠা- ১৭৬]

রিয়া এক প্রকারের ধোঁকা ও প্রতারণা বিধায় হারাম। রিয়াকারীর অন্তরে সর্বশক্তিমান আল্লাহর ভয়ের চেয়ে বান্দার ভয় বেশী থাকে। আল্লাহর নিকট মর্যাদাবান হওয়ার চেয়ে বান্দার নিকট মর্যাদাবান হওয়ার প্রবণতা প্রকট হয়ে দেখা দেয়। এমনকি রিয়াকারী আল্লাহকে বাদ দিয়ে বান্দাকে খুশী করতে আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। এ দিক দিয়ে রিয়াকারী আল্লাহর চেয়ে বান্দাকে বেশী গুরুত্ব দেয়। ফলে এটা শিরকের পর্যায়ে পৌঁছে যায়। এ জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম রিয়াকে 'শিরকে আসগর' বা 'শিরকে খফী' (ছোটতর কিংবা গোপন শির্ক) বলেছেন। হিংসার ন্যায় এটাও অন্তরের এক মারাত্মক ব্যাধি। এ ব্যাধি থেকে সাধারণ মানুষতো দূরের কথা, বড় বড় সুফী সাধকগণও বাঁচতে পারেননি। ইমাম গাযালী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, রিয়াকারী একজন বান্দাকে নিজের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য আল্লাহর চেয়ে বড় শক্তিশালী মনে করে। অথবা বান্দার নৈকট্য অর্জন করা আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের চেয়ে বেশী উত্তম মনে করে; অন্যথায় এমন রাজাধিরাজ মহান আল্লাহর উপর অন্যকে কেন প্রধান্য দেবে?

[তাশকীলে কিরদার, উর্দু, পৃষ্ঠা- ১৮৩]

আল্লাহ তা'আলা ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যথাক্রমে ক্বোরআন ও হাদীস শরীফে এ মারাত্মক অন্তর-ব্যাধি থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلٰوتِهِمْ سَاهُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآؤُنَ

তরজমাঃ দুর্ভোগ সেসব নামাযীর, যারা তাদের নামায সম্বন্ধে বে-খবর, যারা তা লোকদের দেখানোর জন্য করে। [সূরা মা'উন, আয়াত- ৪-৭]

'রিয়া' মুনাফিক্বের অভ্যাস। তারা ইসলামী রাষ্ট্রের সুযোগ-সুবিধা ভোগের উদ্দেশ্যে মুসলমানদের দেখানোর জন্যই নামায, রোযা, ইত্যাদি ইবাদত-বন্দেগী করতো, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন তাদের উদ্দেশ্য ছিলো না। আল্লাহ পাক বলেন-

اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ يُخَادِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَاِذَا قَامُوْا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى
يُرَآؤُنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝

তরজমাঃ "অবশ্যই মুনাফিক্বরা নিজেদের ধারণায় আল্লাহকে প্রতারিত করতে চায়। বস্তুতঃ তিনি তাদেরকে অন্যমনস্ক করে মারবেন আর যখন নামাযে দাঁড়ায়, তখন মনভোলা অবস্থায়, মানুষকে দেখায় মাত্র। আর আল্লাহকে স্মরণ করে না; কিন্তু অল্প সংখ্যক লোক। [সূরা নিসা, আয়াত- ১৪২]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- اِنَّ اَدْنٰى الرِّيَاءِ شِرْكٌ নিশ্চয় বিন্দুপরিমাণ রিয়াও এক প্রকার শির্ক। [তাশকীলে কিরদার, উর্দু, পৃষ্ঠা- ১৭৮]

হযরত শাদ্দাদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদা হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাযির হলাম। আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারা মোবারক বিষন্ন দেখে জিজ্ঞেস করলাম, এর কারণ কি? হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার পরে আমার উম্মত মুশরিক হওয়ার সম্ভাবনা করছি। আমি বল্লাম হুযূরের পরে উম্মত কি শিরকে লিপ্ত হবে? উত্তরে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, তারা তো নিশ্চয় চন্দ্র-সূর্য, পাথর-মূর্তির পূজা করবে না, তবে আমলে রিয়া করবে। আর রিয়াই হল শির্ক। অতঃপর তিনি তেলাওয়াত করেন-

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْلِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ اَحَدًا

তরজমাঃ অতঃপর যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সাক্ষাতের আশা রাখে, তার উচিৎ যেন সৎকর্ম করে এবং তার প্রতিপালকের ইবাদতের সাথে কাউকে শরীক না করে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

اِنَّ اَخْوَفَ مَآ اَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْاَصْغَرُ

অর্থাৎঃ নিশ্চয় আমি তোমাদের ব্যাপারে যে বিষয়ে সবচেয়ে বেশী ভয় করছি, তাহলো শিরর্কে আসগর। উপস্থিত সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম!) শিরকে আসগর কি? উত্তরে তিনি বললেন-

اَلرِّيَآءُ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِذَا جَازَ الْعِبَادُ بِاَعْمَالِهِمْ اِذْهَبُوْا اِلَى
الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُرَآؤُنَ فِى الدُّنْيَا فَانْظُرُوْا هَلْ تَجِدُوْنَ عِنْدَهُمُ الْجَزَآءَ

অর্থাৎঃ শিরকে আসগর হল রিয়া। আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামত দিবসে যখন বান্দাদের আমলের প্রতিদান দেবেন, তখন রিয়াকারদের বলবেন, তোমরা প্রতিদানের জন্য ওইসব ব্যক্তির কাছে যাও, যাদেরকে দেখানোর জন্য আমল করেছিলে।
[তাশকীলে কিরদার উর্দু, পৃষ্ঠা- ১৭৮]

রিয়াকারের কোন আমল আল্লাহ কবূল করবেন না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ عَمَلاً فِيْهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ رِيَاءٍ

অর্থাৎঃ আল্লাহ এমন আমল কবূল করবেন না, যার মধ্যে বিন্দু পরিমাণ রিয়া থাকবে। [প্রাগুক্ত]

রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন- ক্বিয়ামতের দিন মোহরাঙ্কিত করা কিছু আমলনামা আনা হবে, তখন আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে বলবেন, ওই আমলনামা নিক্ষেপ করো। ফেরেশতারা আল্লাহর দরবারে আরয করবেন, হে আল্লাহ! আপনার ইজ্জত ও জালালের ক্বসম, আমাদের তো ওই আমলনামা ভালই মনে হচ্ছে। আল্লাহ বলবেন, হ্যাঁ; কিন্তু ওই আমলতো তারা অন্যের জন্য করেছে। আমি শুধু ওই সব আমল গ্রহণ করি, যা খালেস আমার জন্যই করেছে। [গুনিয়া উর্দু, পৃষ্ঠা- ৪৫১]

হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মাখলূকের ফায়সালা করবেন। প্রত্যেক দল তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হবেন। তখন আল্লাহ ক্বোরআন তেলাওয়াতকারী (ক্বারী), শহীদ এবং সম্পদশালীদের তলব করবেন। প্রথমে ক্বারীকে জিজ্ঞেস করবেন-তুমি যা জানতে তা মোতাবেক কতটুকু আমল করেছো? উত্তরে সে বলবে, আমি দিবা-রাত্রি নামাযে ক্বোরআন তেলাওয়াত করেছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছো। এতে তোমার উদ্দেশ্য ছিলো লোকে তোমাকে ক্বারী বলুক। সুতরাং তোমাকে ক্বারী বলা হয়েছে। তারপর ধনীকে আহবান করবেন এবং বলবেন, আমি যা কিছু তোমাকে দিয়েছি, তা তুমি কোথায় খরচ করেছো? উত্তর সে বলবে, তা আমি গরীব আত্মীয়-স্বজনের জন্য খরচ করেছি এবং দান খয়রাত করেছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যুক। ওইসব কাজে তোমার উদ্দেশ্য ছিলো তোমাকে দানশীল বলা হোক। সুতরাং তোমাকে দানশীল বলা হয়েছে। অতঃপর শহীদকে আহবান করে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি কেন জিহাদে শরীক হয়েছো এবং কেন মারা গিয়েছো? উত্তরে বলবে, হে আল্লাহ আমি

তোমার জন্য তোমার রাস্তায় জিহাদ করেছি, শেষ পর্যন্ত জিহাদে মৃত্যুবরণ করেছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছো। তোমার উদ্দেশ্য এটা ছিলো না বরং তোমার উদ্দেশ্য ছিলো তোমাকে বীর বাহাদুর বলা হোক । সুতরাং তোমাকে বাহাদুর বলা হয়েছে। একথা বলার পর হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আফসোস করে বললেন, হে আবূ হোরায়রা! ক্বিয়ামতের দিন সৃষ্টির মধ্যে তিন প্রকারের লোকই সর্বপ্রথম জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে। [গুনিয়াহ্ উর্দু, পৃষ্ঠা- ৪৫৩]

রিয়াকার প্রতারক

রিয়া এক ধরনের প্রতারণা। রিয়াকার মানুষের সাথে নয়; স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার সাথেই প্রতারণা করতে চায়। তাই সে বড় জঘন্য প্রতারক। জনৈক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, ক্বিয়ামত দিবসে আমার নাজাতের ওসীলা কী হবে? উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তুমি আল্লাহকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করোনা।" লোকটি বললো, "আমি কিভাবে আল্লাহকে ধোকা দেবো?" নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, (ধোঁকার নিয়ম হলো) কাজতো আল্লাহ যা হুকুম করেছেন তাই করবে, কিন্তু উদ্দেশ্য হবে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু। রিয়া থেকে বেঁচে থাকো। কেননা, রিয়া হচ্ছে শির্ক। ক্বিয়ামত দিবসে সমস্ত রিয়াকারদেরকে চারটি নামে ডাকা হবেঃ ১. হে কাফের ২. হে পাপী ৩. হে দাগাবাজ এবং ৪. হে ক্ষতিগ্রস্ত! তোমার সমস্ত আমল বরবাদ, তোমার প্রতিদান নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আজ তোমার জন্য কিছুই নেই। হে প্রতারক! তুমি যার জন্যে আমল করেছিলে, আজ তার কাছ থেকেই সাওয়াব আদায় করো। [গুনিয়াহ উর্দু, পৃষ্ঠা- ৪৫৫]

আরো বর্ণিত আছে যে, রোজ ক্বিয়ামতে এরূপ একটি প্রকাশ্য ঘোষণা শুনা যাবে যে, তারা আজ কোথায়, যারা মানুষের ইবাদত করতো? দাঁড়িয়ে যাও এবং যাদের ইবাদত করতে, তাদের নিকট থেকেই প্রতিদান গ্রহণ করো।

[মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা- ২২২]

রিয়াকারের জন্য বেহেশ্ত হারাম

রিয়া মুনাফিক্বদের চরিত্র। আর মুনাফিক্বের স্থান হল জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে। তাছাড়া রিয়াকে যেহেতু মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম শির্ক বলেছেন, সেহেতু রিয়াকার হবে মুশরিক, আর মুশরিকের জন্য বেহেশ্ত চিরস্থায়ীভাবে হারাম। ইমাম গাযালী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- ক্বিয়ামত দিবসে বেহেশ্ত কথা বলার শক্তি পাবে এবং ঘোষণা করে জানিয়ে দেবে, কৃপণ ও রিয়াকারদের জন্য আমি হারাম। [মিনহাজুল আবেদীন, বাংলা, পৃষ্ঠা- ২২২]

গাউসে পাক রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা যখন 'জান্নাতে আদন' সৃষ্টি করলেন, তখন তন্মধ্যে এমন নি'মাতসমূহ সৃষ্টি করলেন, যা না কোন চোখ দেখেছে, না কোন কান শুনেছে, না কোন মানুষের অন্তরের খেয়ালে এসেছে।তারপর তাকে বললেন- হে 'আদন! তোমার কিছু বলার থাকলে আমাকে বলো । তখন 'জান্নাতে আদন' বলবে- قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ (মুমিনরাই সফলকাম)। তারপর বলবে আমি প্রত্যেক কৃপণ ও রিয়াকারের উপর হারাম [গুনিয়া উর্দু, পৃষ্ঠা- ৪৫৫]

হযরত আদি ইবনে হাতেম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ক্বিয়ামতের দিন কিছু লোককে কঠিন আযাব দেয়া হবে। আল্লাহ তাদেরকে বলবেন, তোমরা আমার সামনে বড় বড় গুনাহ করতে; কিন্তু যখন মানুষের সাথে মিলতে তখন নম্র-ভদ্র হয়ে যেতে। তোমরা লোকদেরকে ভয় করতে, কিন্তু আমাকে ভয় করতে না, তোমরা লোকদেরকে বড় মনে করতে, আমাকে বড় মনে করতে না। আমার ইজ্জতের শপথ! আজ আমি তোমাদেরকে কষ্টদায়ক শাস্তি দেবো। [প্রাগুক্ত]

রিয়া থেকে বাঁচার উপায়

রিয়া আমলকে নষ্ট করে দেয়, আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে দেয়, পরকালে জাহান্নামী বানিয়ে দেয় এবং এটি একটি মারাত্মক অদৃশ্য ব্যাধি। সুতরাং এ ব্যাধি থেকে প্রত্যেক মুসলমানকে বেঁচে থাকতে হবে। রিয়া প্রদর্শনের মাধ্যমে অন্যের কাছ থেকে মান-মর্যাদা, প্রশংসা ইত্যাদি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকে বিধায় প্রথমে রিয়াকারের অন্তর থেকে ওই ধ্বংসাত্মক আশা আকাঙ্ক্ষাগুলো ধুয়ে মুছে ফেলে দিতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ রিয়া হল ইখলাসের বিপরীত। অর্থাৎ যার অন্তরে রিয়া আছে, তার অন্তরে ইখলাস নেই। ইখলাস অর্জন করলে রিয়া দূরীভূত হবে। সুতরাং ইখলাসের মাধ্যমে রিয়া থেকে বাঁচা সম্ভব।

তৃতীয়তঃ যেহেতু এসব গুনাহ্র মূল উৎসাহ প্রদানকারী হল নফ্স শয়তান, সেহেতু সর্বদা তার বিপরীত কাজ করতে হবে। ইমাম গাযালী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, ইবাদতে ইচ্ছুক ব্যক্তির চতুর্থ শত্রু হল নাফ্সে আম্মারাহ্। সুতরাং তাকে এ শত্রুর আওতা থেকে পরিত্রাণ লাভ করা একান্ত জরুরী এবং তা ভারী কঠিন।

[প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৮৫]

চতুর্থতঃ এ ব্যাধি থেকে বাঁচার জন্য আরেকটি উপায় হলো হক্কানী রাব্বানী আলেমে দ্বীন ও পীর-মুর্শেদের সান্নিধ্যে গিয়ে তায্কিয়া-ই নাফ্স বা আত্মার পরিশুদ্ধি লাভ

করা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা এমন আলিমের মজলিসে বসো, যিনি পাঁচটি (ধ্বংসাত্মক) বস্তু থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে পাঁচটি (কল্যাণকর) বস্তুর প্রতি উৎসাহিত করেনঃ

১. দুনিয়ার মোহ থেকে বের করে তাক্বওয়া-পরহেযগারীর প্রতি উৎসাহিত করেন

২. রিয়া থেকে মুক্ত করে ইখলাসের শিক্ষা দেন,

৩. অহঙ্কার থেকে মুক্ত করে নম্রতার শিক্ষা দেন,

৪. অলসতা থেকে মুক্ত করে উপদেশ দেয়ার প্রতি উৎসাহিত করেন এবং

৫. অজ্ঞতা থেকে মুক্ত করে জ্ঞানের প্রতি উৎসাহিত করেন। [প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৫১]

পঞ্চমতঃ এ মারাত্মক ব্যাধি থেকে বাঁচার সর্বশেষ পন্থা হল মহান আল্লাহ্র দরবারে রিয়ামুক্ত হওয়ার জন্য সর্বদা দো'আ করা। আল্লাহ্র ইচ্ছা ছাড়া ভাল-মন্দ, করা না করার কোন ক্ষমতা কারো নেই। রিয়া থেকে বাঁচার উপরোল্লোখিত উপায়গুলো অব্যাহত রাখার সাথে সাথে দো'আ ও চালু রাখতে হবে। এ বিষয়ে অনেক দো'আ হাদীস শরীফ সহ বিভিন্ন দো'আগ্রন্থে বর্ণিত আছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজেও এভাবে দো'আ করতেন-

اَللّٰهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِىْ مِنَ النِّفَاقِ وَعَمَلِىْ مِنَ الرِّيَاءِ وَلِسَانِىْ مِنَ الْكِذْبِ وَعَيْنِىْ مِنَ الْخِيَانَةِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ خَآئِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ত্বাহ্হির ক্বালবী মিনান্ নিফা-ক্বি ওয়া আমালী মিনার রিয়া-ই ওয়া লিসা-নী মিনাল কিয্‌বি, ওয়া 'আয়নী মিনাল্ খিয়ানাতি ওয়াল্লাহু ইয়া'লামু খা-ইনাতাল্ আ'য়ুনি ওয়ামা-তুখ্‌ফিস্ সুদূর।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! আমার অন্তরকে নেফাক্ব থেকে, আমার আমলকে রিয়া থেকে, আমার মুখকে মিথ্যা থেকে, আমার চোখকে খিয়ানত থেকে পবিত্র রাখো। আল্লাহ্ চোখের খিয়ানত ও অন্তরের গোপন অবস্থা সম্পর্কে অবহিত। [প্রাগুক্ত]

মনে রাখতে হবে যে, 'রিয়া' নামক এ ব্যাধি মূর্খ লোকের চেয়ে আলিম, আবিদ, দানশীল, নেক্কার, পরহেযগার ব্যক্তিদের মধ্যে বেশী পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং এ ব্যাধি থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য প্রত্যেকে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করে সর্বদা সচেতন ও সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

অহঙ্কার

অহঙ্কার, অহমিকা ও আত্মম্ভরিতার আরবী প্রতিশব্দ হল 'কিব্র' ও 'তাকাব্বুর'। ইমাম গাযালী রাহমাতুল্লাহি বলেন, অহঙ্কার'র অর্থ হচ্ছে নিজেকে অন্যের চেয়ে বড় মনে করা। আর যখনই কারো মনে এ ধারণা জন্মায়, তখন তার নাফ্স ফুলে ফেঁপে ওঠে। তারপর কথা-বার্তা, কাজ কর্ম, চাল-চলনে তা ফুটে ওঠে। যেমন- চলার সময় আগে আগে চলা, মজলিসে উঁচু আসনে কিংবা একটু সামনে বসা, অন্যদেরকে তুচ্ছ

দৃষ্টিতে দেখা, সালাম না দেয়া, কেউ তাকে সালাম না দিলে রাগ করা, কেউ সম্মান না করলে অসন্তুষ্ট হওয়া, উপদেশ দিলে নাক ছিঁটকানো, সত্য কথা জেনেও অমান্য করা ও সর্বদা মানুষকে লাঞ্ছিত করা ইত্যাদি।

অহঙ্কার পতনের মূল। অহঙ্কারীকে কেই পছন্দ করে না, বরং ঘৃণা করে। কারণ এটা শয়তানের চরিত্র। ক্বোরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে- اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ সে (শয়তান) অস্বীকার করলো এবং অহমিকা দেখালো, ফলে সে কাফিরদের দলভূক্ত হলো। [সূরা বাক্বারা, আয়াত- ৩৪]

সর্বপ্রথম অহঙ্কারের কারণে শয়তানের হাজার হাজার বছরের ইবাদত নষ্ট হয়ে মুহূর্তের মধ্যে কাফিরে পরিণত হয়েছে।

অহঙ্কারের কুফল

ইমাম গাযালী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, অহঙ্কার দ্বারা মানুষের হাজারো প্রকার ক্ষতি হয়। তম্মধ্যে চারটি ক্ষতি তো আবশ্যম্ভাবীঃ

১. অহঙ্কারী সত্যের সন্ধান লাভ হতে বঞ্চিত হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন-

سَاَصْرِفُ عَنْ اٰيٰتِىَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

"আমি আমার নিদর্শনসমূহ থেকে তাদেরকে ফিরিয়ে দেবো, যারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে নিজেদের অহঙ্কার প্রকাশ করতে চায়। [সূরা আ'রাফ, আয়াত, ১৪৬]

অহঙ্কারীর অন্তরে আল্লাহ মোহর অঙ্কিত করে দেন। ফলে আল্লাহর আহ্কামের মা'রিফাত লাভের ব্যাপারে অন্তরে কালো পর্দা পড়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ

এভাবেই আল্লাহ্ অহঙ্কারী ও দাম্ভিকদের অন্তরকে মোহরযুক্ত করে দেন।

[সূরা গাফির, আয়াত- ৩৫]

২. অহংঙ্কারীগণ আল্লাহ্র আযাবের শিকার হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُتَكَبِّرِيْنَ

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ অহংকারীদের পছন্দ করেন না। [সূরা নাহ্‌ল, আয়াত- ২৩]

বর্ণিত আছে যে, হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম আরয করলেন, হে মা'বুদ! আপনি দুনিয়ায় কোন লোকের প্রতি সর্বাপেক্ষা বেশী অসন্তুষ্ট? আল্লাহ পাক জবাব দিলেন, "যার অন্তরে অহমিকা রয়েছে, যার কথায় দাম্ভিকতা আছে।

[মিনহাজুল আবেদীন, বাংলা, পৃষ্ঠা- ১২০]

৩. অহঙ্কারীদের প্রাপ্য হচ্ছে দুনিয়া ও আখেরাতে লাঞ্ছনা ও কঠোর শাস্তি। বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে গর্ব ও দম্ভ প্রকাশ করে, আল্লাহ তাকে ন্যায়সঙ্গতভাবেই অপদস্থ করেন। [মিনহাজুল আবেদীন বাংলা, পৃষ্ঠা- ১২০]

রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

لاَ يَزَالُ الرَّجُلُ يَذْهَبُ بِنَفْسِهٖ حَتّٰى يُكْتَبَ فِى الْجَبَّارِيْنَ فَيُصِيْبُهٗ مَآ اَصَابَهُمْ مِن الْعَذَابِ

অর্থাৎ "মানুষ নিজেকে বড় ভাবতে থাকে। এভাবে সে একদিন আল্লাহর দরবারে দাম্ভিক-অহঙ্কারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। তখন তার উপর ওই সকল আযাব- গযব নাযিল হতে থাকে, যা পূর্বেকার দাম্ভিকদের উপর নাযিল হয়েছিলো।"

[মুকাশাফাতুল কুলূব, বাংলা, পৃষ্ঠা- ৩৪৪]

রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَنْ تَعَظَّمَ مِنْ نَفْسِهٖ وَاخْتَالَ فِىْ مَشْيِهٖ لَقِىَ اللّٰهَ وَهُوَ غَضْبَانُ

অর্থাৎ ঃ "মনে মনে নিজেকে বড় ভেবে,চালচলনে অহঙ্কারী ভঙ্গি প্রদর্শনকারী যখন আল্লাহর দরবারে হাযির হবে, তখন আল্লাহ পাক তার প্রতি রাগান্বিত থাকবেন।

[প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৩৪৮]

৪. অহঙ্কারী নিশ্চিত জাহান্নামী। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ

"যারা আমার ইবাদতে অহংকার করে অচিরেই তারা লাঞ্ছিত অপমানিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। [সূরা আল মু'মিন, আয়াত- ৬০]

হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন-

اَلْكِبْرِيَآءُ رِدَائِىْ وَالْعَظْمَةُ اِزَارِىْ فَمَنْ نَازَعَنِىْ وَاحِدًا مِّنْهَا اَلْقَيْتُهٗ فِىْ جَهَنَّمَ وَلاَ اُبَالِىْ

অর্থাৎ "অহঙ্কার আমার চাদর, মহত্ব ও বড়ত্ব আমার তহবন্দ। অতএব, এতদুভয়ের কোন একটি নিয়ে কেউ যদি আমার সাথে টানাটানি করে, তবে আমি বেপরোয়াভাবে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো।

[মুসলিম ও মুকাশাফাতুল কুলূব, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩৪৩]

অন্য হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে যে,

مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنْ كِبْرٍ اَكَبَّهُ اللّٰهُ فِى النَّارِ عَلٰى وَجْهِهٖ

অর্থাৎঃ যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও অহংকার থাকবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে উল্টোমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

[মুকাশাফাতুল কুলূব, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩৪৩]

হাদীস শরীফে আরো বর্ণিত আছে-

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اَحَدٌ فِىْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنْ كِبْرٍ

অর্থাৎঃ "যে ব্যক্তির অন্তরে সরিষা পরিমাণ অহঙ্কার থাকবে, সে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না।" [মিশকাত, পৃষ্ঠা- ৪৩৩]

দুনিয়াতে যেহেতু অহংকারীরা মানুষকে তুচ্ছ- তাচ্ছিল্য করে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে, সেহেতু ক্বিয়ামত দিবসে কোটি কোটি মানুষের সামনে তাদেরকে লাঞ্ছিত ও হেয়প্রতিপন্ন করা হবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُوْنَ اَمْثَالَ الذُّرِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِىْ صُوَرِ الرِّجَالِ يَغْشَاهُمُ الذُّلُّ مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ يُسَاقُوْنَ اِلٰى سِجْنٍ فِىْ جَهَنَّمَ يُسَمّٰى بُوْلَسَ تَعْلُوْهُمْ نَارُ الْاَنْيَارِ يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ اَهْلِ النَّارِ طِيْنَةَ الْخَبَالِ

অর্থাৎঃ "ক্বিয়ামতের দিন অহঙ্কারীদেরকে ছোট পিপীলিকার ন্যায় একত্রিত করা হবে, কিন্তু আকৃতি হবে মানুষের। চারদিক থেকে আপমান-লাঞ্ছনা তাদেরকে ঘিরে ধরে। জাহান্নামের 'বাওলাস' নামক এক কারাগারের দিকে তাদেরকে হাঁকিয়ে নেয়া হবে। তাদের উপর আগুনের পর আগুন হবে এবং তাদেরকে 'ত্বিনাতুল খাবাল' নামক দোযখীদের দেহ গলিত পঁচা রক্ত ও পুঁজ পান করানো হবে।

[মিশকাত শরীফ, আয়াত- ৪৩৩]

অহঙ্কারের কারণ

ইমাম গাযালী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, মানুষ সাধারণত সাতটি সৎগুণ নিয়ে অহঙ্কার করে। তন্মধ্যে দু'টি দ্বীনিঃ যথা ১. ইল্মের ২. ইবাদত ও আমলের। আর বাকী পাঁচটি দুনিয়াবীঃ ৩. বংশের, ৪. রূপের, ৫.সম্পদের, ৬. শক্তি-সামর্থ্যের ও ৭. অনুসারী ও সাহায্যকারীদের। [তাশকীলে কিরদার উর্দু, পৃষ্ঠা- ২০৮]

অহঙ্কার প্রতিকারের উপায়

নিজকে বড় মনে করা ও বড় বলে প্রকাশ করা থেকে অহংকার সৃষ্টি হয়। আর এ মারাত্মক রোগটি পাওয়া যায় গুণী ব্যক্তিদের মধ্যে। পক্ষান্তরে নিজেকে ক্ষুদ্র ও নগণ্য মনে করা এবং নিজের সৎগুণাবলীকে গোপন রাখার মাধ্যমে বিনয়ের সৃষ্টি হয়। সুতরাং প্রথমে তাকে বিনয়ী হতে হবে। নিজের চেয়ে অপরকে প্রাধান্য দিতে হবে। অন্যের ভালকাজের প্রশংসায় উদার হতে হবে। বুঝতে হবে যে, যেসব গুণ নিয়ে সে অহঙ্কার করছে, ওইগুলো তার নিজস্ব নয়; বরং খোদা প্রদত্ত আর তা চিরস্থায়ীও নয়, বরং ক্ষণস্থায়ী।

নাফসের চাহিদার বিপরীত করতে হবে। একদা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু লাকড়ির বোঝা নিয়ে লোক সম্মুখে বাজারে গমন করেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো-আল্লাহ আপনাকে উচ্চতর মর্যাদা দান করেছেন। তা সত্ত্বেও আপনি কেন এই কষ্ট করছেন? উত্তরে তিনি বলেন- اَرَدْتُ اَنْ اَدْفَعَ الْكِبْرَ عَنْ نَفْسِىْ আমি আমার নফস্ হতে অহঙ্কার দূর করার চেষ্টা করছি।

[মুকাশাফাতুল কুলূব, বাংলা, পৃষ্ঠা-১২৯]

নিজেকে এবং আল্লাহকে চিনতে হবে। স্মরণ রাখতে হবে যে, তার উৎপত্তি এক ফোঁটা নাপাক তরল পদার্থ (বীর্য) থেকে এবং সমাপ্তি দুর্গন্ধময় গলিত লাশে। দুনিয়া-আখিরাতে অহঙ্কারের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে যে সব বর্ণনা রয়েছে, তা পড়তে হবে, শুনতে হবে। প্রয়োজনে হক্কানী রাব্বানী আলেম ও পীর মাশায়েখের সান্নিধ্যে গিয়ে চরিত্র সংশোধন করার মাধ্যমেই অহঙ্কারের প্রতিকার করতে হবে।

অহঙ্কার শয়তানী চরিত্র, কুফরী কাজ, মূর্খ ও নির্বোধের স্বভাব এবং খোদার অভিশাপ। অতএব, কোন জ্ঞানী, বিবেকবান ও ভদ্রলোকের পক্ষে কোন অবস্থাতে অহঙ্কার করা শোভা পায় না। জনৈক তত্ত্বজ্ঞানী কবির উপদেশ হচ্ছে- দম্ভ-অহঙ্কার যারা কেবল মূর্খ তারাই করতে পারে। তুমি যদি জানতে অহঙ্কারের মধ্যে কি ধ্বংসাত্মক বিষ লুক্কায়িত রয়েছে, তবে তুমি কখনো অহঙ্কার করতে না। বস্তুতঃ অহঙ্কার যেমন মানুষের দ্বীন-ধর্মকে ধ্বংস করে দেয়। তেমনি বুদ্ধি-বিবেক এবং মান-সম্মানকেও বিনাশ করে দেয়। বস্তুতঃ নিতান্ত নিম্ন পর্যায়ের লোকেরাই অহঙ্কার করে, থাকে। পক্ষান্তরে বিনয় ও নম্রস্বভাব তারাই অবলম্বন করে যারা অভিজাত ও উচ্চ পর্যায়ের। [মুকাশাফাতুল ক্বুলূব বাংলা, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ১২৮]

সুতরাং তাক্বওয়া, বিনয়-নম্রতা ও আল্লাহর কাছে অহংকার থেকে মুক্তি কামনার মাধ্যমে অন্তরকে এ কুস্বভাব থেকে মুক্ত রাখা একান্ত প্রয়োজন।

’উজব (আত্মবিমোহন)

’উজব শব্দের অর্থ হল আত্মপ্রশংসা বা আত্মম্ভরিতা। এটা অহঙ্কারের প্রাথমিক স্তর। ইমাম গাযালী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন- অন্যের দিকে লক্ষ্য না করে নিজেকে মহৎ গুণের অধিকারী বলে ধারণা করাকে ’উজব বলা হয়। [প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা-২২৬]

তিনি আরো বলেন, ’উজব বা আত্মম্ভরিতার প্রকৃত পরিচয় হল- ইবাদত করে নিজের ব্যাপারে গৌরববোধ করা। ওলামায়ে কেরাম আত্মগৌরবের পরিচয় দিতে গিয়ে বলছেন যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন জিনিস, কোন সৃষ্টি অথবা নাসফের সাথে বুর্যুগী জাহির করাকে আত্মগৌরব বলা হয়।

[মিনহাজুল আবেদীন পৃষ্ঠা- ২৪০]

মোট কথা, নিজের মধ্যে কোন গুণ, সৌন্দর্য ও মহত্ব দেখে গর্বিত হওয়া এবং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা হ্রাস পাওয়াকেই উজব বা আত্মগৌরব বলা হয়। অহঙ্কারের মত এটাও মানুষের আমল বরবাদ করে দেয় এবং আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত রাখে। হুনাইনের যুদ্ধে মুসলমানগণ প্রথমে নিজেদের সংখ্যাধিক্যে বেশ আত্মতুষ্টি লাভ করেছিলেন। ফলে আল্লাহ্‌র সাহায্য মওকুফ হলে তাদেরকে সাময়িক বিপর্যয় বরণ করতে হয়েছিলো। আল্লাহ বলেন-

وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذَا اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ

بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِيْنَ

অর্থাৎঃ “হুনাইনের দিনে, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের প্রফুল্ল করেছিলো কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি এবং পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্যে সঙ্কুচিত হয়েছিলো। অতঃপর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে।

[সূরা তাওবা, আয়াত-২৬]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা’আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

ثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ شُحٌّ مُّطَاعٌ وَهَوًى مُّتَّبَعٌ وَاِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهٖ

অর্থাৎ তিনটি ব্যাধি মানুষকে ধ্বংস করে দেয়ঃ কৃপণতা, নাফসের অনুসরণ ও আত্ম প্রশংসা। [বায়হাক্বী ও মুকাশাফাতুল ক্বুলূব বাংলা, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-১২৮]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাস’ঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু বলেন- اَلْهَلَاكُ فِىْ اِثْنَتَيْنِ اَلْقُنُوْطُ وَالْعُجُبُ অর্থাৎ দুটি বস্তুতে ধ্বংস রয়েছেঃ নৈরাশ্য ও আত্মগৌরব।

[তাশকীলে কিরদার, উর্দু পৃষ্ঠা- ২২৯]

যার মধ্যে ’উজব আছে, তার ধ্বংস অতি আসন্ন হয়ে পড়ে। হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম তাঁর সহচরগণকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন যে, বায়ু বহু প্রদীপকে নিভিয়ে দিয়েছে, আর আত্মম্ভরিতা বহু আবিদেরই সর্বনাশ করেছে। সুতরাং এ মারাত্মক ব্যাধি থেকে বেঁচে থাকা প্রয়োজন। আর বাঁচার উপায় হল সর্বদা বিনয়ী হওয়া, নিজের সব গুণ, সৌন্দর্য ও মহত্বকে খোদাপ্রদত্ত মনে করে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। যা কিছু অর্জন করেছে, সবকিছু আল্লাহর অনুগ্রহের মাধ্যমে হয়েছে, নিজের যোগ্যতা বলে নয়- এ ধারণা পোষণ করা। নিজের সৎ গুণাবলীকে তুচ্ছ মনে করে আরো বেশী সৎ গুণ অর্জনের জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদানের বিশ্বাস রাখা। সর্বোপরি, আল্লাহর অগণিত ও অমূল্য নি’মাতের কথা স্মরণ করে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার মাধ্যমেই আত্মম্ভরিতা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

রাগ

রাগের আরবী শব্দ হল اَلْغَضَبُ। এর বিপরীত শব্দ হল اَلْحِلْمُ অর্থাৎ সহনশীলতা। রাগ মানুষের মনুষ্যত্ব বিধ্বংসী একটি কু-রিপু। ইমাম বায়দ্বাভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এর সজ্ঞায় বলেন-

اَلْغَضَبُ ثَوَرَانُ النَّفْسِ عِنْدَ اِرَادَةِ الْاِنْتِقَامِ

অর্থাৎ “প্রতিশোধ নেওয়ার দৃঢ় সংকল্পের সময় অন্তরে যে জিঘাংসার উদ্রেক হয় তাকেই রাগ বলা হয়।” রাগের সময় মানুষের পশুসুলভ আত্মা সক্রিয় হয়, চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায়। এর প্রভাবে দেহের শিরা-উপশিরা ফুলে উঠে। এ সময় মানুষের

হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। প্রতিপক্ষের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য উন্মত্ত হয়ে ওঠে। এ রাগের বশবর্তী হয়ে কারো উপর যদি অন্যায়-অবৈধভাবে প্রতিশোধ নেওয়া হয়, তাহলে তা অবশ্যই জঘন্য ও গর্হিত কাজ হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে এ রাগ যদি অন্যায়ের বিরুদ্ধে সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য হয় তাহলে তা প্রশংসনীয়।

রাগ শয়তানের পক্ষ হতে আসে

রাগ আসলে মানুষের চেহারা বিকৃত হয়ে যায়, চোখ লাল হয়ে যায়, গলার রগ ফুলে যায়, শরীর গরম হয়ে কপাল দিয়ে ঘাম বের হয়। এসব লক্ষণ আগুনের প্রভাবে হয়ে থাকে। আর শয়তান আগুনের তৈরী বিধায় রাগ শয়তানী চরিত্র এবং শয়তানের পক্ষ হতে আসে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

اِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَاِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ

অর্থাৎঃ রাগ শয়তানের পক্ষ হতে আসে এবং শয়তানকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। [মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা- ৪৩৪]

রাগ ধ্বংসের কারণ

রাগ এমন ধ্বংসাত্মক বস্তু, যা দেরীতে এসে দ্রুত চলে যাওয়া ভাল। রাগ আসলে মানুষের বিবেক-বুদ্ধি লোপ পায়। ফলে তার দ্বারা যে কোন অঘটন ঘটতে পারে। শরীয়ত বিরুদ্ধ সর্বপ্রকার নিন্দনীয় কাজ সংঘটিত হতে পারে। এজন্যই নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম রাগ করতে নিষেধ করেছেন এবং রাগ সংবরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْصِنِىْ قَالَ لاَ تَغْضَبْ فَرَدَّدَ ذَالِكَ مِرَارًا قَالَ لاَ تَغْضَبْ

অর্থাৎঃ এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র দরবারে আরয করলো, ''আমাকে কিছু উপদেশ দিন।'' তিনি বললেন, ''তুমি রাগ করবে না।'' লোকটি বারংবার একই প্রশ্ন করলো। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেকবারই বললেন, ''তুমি রাগ করো না।''

[মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা- ৪৩৩]

রাগ সংবরণ ও ক্ষমা আল্লাহর পছন্দনীয় কাজ। আল্লাহ তা'আলা এগুলোর প্রশংসা করে বলেন-

وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

তরজমাঃ যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে, আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে। বস্তুতঃ আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত- ১৩৪]

উক্ত আয়াতের তাফসীরে মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, বায়হাক্বী শরীফে বর্ণিত আছে যে, ইমাম যয়নুল আবেদীন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র এক দাসী তাঁকে ওযূ করানোর জন্য পানি ভর্তি পাত্র (বদনা) নিয়ে আসলো। ভুলক্রমে বদনা ইমামের শরীরে পড়লে তিনি আহত হন। তিনি (রাগে) তার দিকে চোখ তুলে তাকালে সে বললো- وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ (অর্থাৎ রাগ সংবরণকারীদের আল্লাহ প্রশংসা করেছেন)। তিনি বললেন, ''আমি রাগ হজম করলাম।'' সে বলল, وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ (এবং লোকদের ক্ষমাকারীদেরকে)।'' তিনি বললেন, ''আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন!'' সে আবার বললো, وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ (এবং আল্লাহ্ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন)।'' তিনি বললেন, ''যাও তুমি আল্লাহর ওয়াস্তে আযাদ (মুক্ত)।'' এই ধরনের একটি ঘটনা ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু সম্পর্কেও বর্ণিত আছে।

[তাফসীরে নঈমী, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-২০৫]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَا تَجَرَّعَ عَبْدٌ اَفْضَلَ عِنْدَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ جُرْعَةَ غَيْظٍ يَكْظِمُهَا اِبْتِغَآءَ وَجْهِ اللّٰهِ تَعَالٰى

অর্থাৎঃ আল্লাহর দৃষ্টিতে কোন বান্দা, রাগের ঢোকের চেয়ে উত্তম ঢোক হজম করে না, যা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য সে হজম করে থাকে। [মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা- ৪৩৪]

সুতরাং আল্লাহর কাছে রাগ হজম করাই হল উত্তম কাজ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

مَنْ كَفَّ غَضَبَهٗ كَفَّ اللّٰهُ عَنْهُ عَذَابَهٗ

অর্থাৎঃ যে নিজের রাগ সংবরণ করে, আল্লাহ তার থেকে স্বীয় আযাব প্রত্যাহার করেন। [তাশকীলে কিরদার, উর্দু, পৃষ্ঠা- ১১৬]

ক্রোধ বড় শত্রু

হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ক্রোধকে সবচেয়ে শক্তিশালী ও বিপজ্জনক শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ক্রোধ ষড় রিপুর অন্যতম। সুস্থ বিবেক মানুষকে কল্যাণের দিকে চালিত করে। পক্ষান্তরে, রিপুগুলো বিবেক কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত না হলে মানব প্রকৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করে অকল্যাণের দিকে পরিচালিত করে। তন্মধ্যে ক্রোধ সবচেয়ে বড় শত্রু। পৃথিবীর আদিকাল হতেই সকল ধ্বংস ও পতনের মূল কারণ হল ক্রোধ। মূলত ক্রোধ রিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জয়লাভ করা বড়ই কঠিন ও কষ্টসাধ্য কাজ। যেসব দৈহিক বীর তার প্রতিদ্বন্দ্বী বীরকে শক্তিতে বা রণকৌশলে অতি সহজেই পরাজিত করেছে তাদের চেয়ে শতগুণ শক্তিশালী ওইসব বীর, যারা ক্রোধ নামক রিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে পরাজিত করে সুস্থ বিবেককে বিজয়ী করতে সক্ষম হয়েছে। কারণ একজন

দৈহিক বীরের শক্রতামূলক ক্ষতি অপেক্ষা রাগের ক্ষতি শত সহস্রগুণ বেশী হতে পারে। তাই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

لَيْسَ الشَّدِيْدُ لَصُرَعَةٌ اِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِىْ يَمْلِكُ نَفْسَهٗ عِنْدَ الْغَضَبِ

অর্থাৎ ওই ব্যক্তি শক্তিশালী বীর নয়, যে মানুষকে আছাড় দেয়, বরং ওই ব্যক্তি প্রকৃত শক্তিশালী বীর, যে রাগের সময় নিজেকে সংবরণ করতে সক্ষম হয়।

[মেশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা- ৪৩৩]

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে-

اَشَدُّكُمْ مَنْ غَلَبَ نَفْسَهٗ عِنْدَ الْغَضَبِ وَاَحْلَمُكُمْ مَنْ عَفَا عِنْدَ الْقُدْرَةِ

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে সুদৃঢ় ওই ব্যক্তি, যে রাগের সময় নাফ্সের উপর প্রাধান্য লাভ করে, অর্থাৎ রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়। আর তোমাদের মধ্যে বড় ধৈর্যশীল হলো, যে প্রতিশোধ নেওয়ার শক্তি-সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করে দেয়।

[তাশকীলে কিরদার উর্দু, পৃষ্ঠা- ১১৬]

রাগ ঈমানের পরিপূর্ণতার অন্তরায়

রাগ শয়তানী স্বভাব। পক্ষান্তরে, ঈমান খোদায়ী দান ও এর অনিবার্য বিপরীত। সুতরাং দু' বিপরীত বস্তু একত্রে অবস্থান করতে পারে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

اِنَّ الْغَضَبَ لَيُفْسِدُ الْاِيْمَانَ كَمَا يُفْسِدُ الصَّبِرُ الْعَسَلَ

অর্থাৎঃ রাগ ঈমানকে বিনষ্ট করে দেয় যেমন 'সাবির' (গাছের তিক্ত রস) মধুকে বিনষ্ট করে দেয়। [মিশকাত, পৃষ্ঠা- ৪৩৪]

রাগ সংবরণের উপায়

কোন বস্তুর বিপরীত বস্তু সেটার প্রতিশেধক হতে পারে। যেমন- রাগ মানুষের শরীরে উত্তাপ সৃষ্টি করে। উত্তপ্ততা হচ্ছে আগুনের প্রভাব। আর আগুন পানি দ্বারা নির্বাপিত হয়। তাই রাগ আসলে পানি দ্বারা ওযূর নির্দেশ দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম। হাদীস শরীফে আছে-

فَاِذَا غَضِبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّاْ

অর্থাৎ যখন তোমাদের মধ্যে কারো রাগ আসে, তখন সে যেন ওযূ করে নেয়।

[মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা- ৪৩৪]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

اِذَا غَضِبَ اَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ فَاِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَاِلَّا فَلْيَضْطَجِعْ

অর্থাৎঃ তোমাদের মধ্যে যখন কারো রাগ আসে তখন যদি দাঁড়ানো অবস্থায় থাকে, তবে যেন বসে পড়ে। এতে যদি রাগ চলে যায় তবে উত্তম, নতুবা সে যেন চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে। [মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা- ৪৩৪]

অভিজ্ঞ বুযুর্গানে দ্বীন বলেছেন, রাগের সময়- اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (আ'উযু বিল্লা-হি মিনাশ্ শায়ত্বানীর রাজী-ম) পড়লেও রাগ চলে যায়। অতএব, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী মোতাবেক আমল করার মাধ্যমে ঈমান ও আমল বিধ্বংসী রাগ বা ক্রোধ নামক ব্যাধি থেকে মুক্তি লাভ করা সম্ভব।

জিহবার অপব্যবহার

মানুষের যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, যেমন- হাত, পা, চোখ, কান ও জিহবা ইত্যাদি দ্বারা পাপ সংঘটিত হয়, তম্মধ্যে জিহবা হল প্রধান। মানুষের অধিকাংশ নিত্য-নৈমিত্তিক গুনাহ যেমন- অভিশাপ, অশ্লীলতা, গালিগালাজ, মিথ্যা, গীবত, চোগলখোরী ইত্যাদি কবীরাহ গুণাহ জিহবা দ্বারা সংঘটিত হয়। সুতরাং প্রথমে জিহবার অপপ্রয়োগ থেকে বাঁচা অর্থাৎ রসনা সংযত করা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

জিহ্বা ছোট্ট একটি অঙ্গ হলেও এটি হৃদয়ের দরজা। এটি হৃদয়ের সংবাদ সরবরাহ করে। এর ক্ষমতা প্রবল পরাক্রমশালী নরপতি হতেও বেশী। এটি মানুষকে ধ্বংসের অতলেও ডুবাতে পারে। আবার সাফল্যের শীর্ষেও সমাসীন করতে পারে। এজন্য জিহ্বাকে সংযত রাখা একান্ত প্রয়োজন। জিহবা হল অন্তরের মুখপত্র ও প্রতিনিধি। আর বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জিহবার নিকট দায়বদ্ধ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

اِذَا اَصْبَحَ ابْنُ اٰدَمَ فَاِنَّ الْاَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ فَتَقُوْلُ اِتَّقِ اللّٰهَ فِيْنَا فَاِنَّا
نَحْنُ بِكَ فَاِنِ اسْتَقَمْتَ وَاِنْ اَعْوَجْتَ اَعْوَجْنَا

অর্থাৎ মানুষ যখন সকালে ঘুম হতে উঠে, তখন তার প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জিহবার কাছে অনুনয় বিনয়ের সাথে আরয করে বলে, তুমি আমাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো, অর্থাৎ অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়ো না। কেননা আমরা তোমার সাথে জড়িত। তুমি ঠিক থাকলে আমরাও ঠিক থাকবো। অর্থাৎ তুমি সঠিক পথে পরিচালিত হলে আমরাও সঠিক পথে পরিচালিত হবো। আর তুমি বাঁকা পথে চললে আমরাও বাঁকা হয়ে যাবো। [মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা- ৪১৩]

ফলে বিপদগ্রস্ত হবো এবং আল্লাহর আযাবের শিকার হবো।

জিহবা সংযত করা মুক্তির উপায়

অজ্ঞ ও নির্বোধরা জিহ্বার অধীনস্থ হয়ে জিহ্বার দাসে পরিণত হয়। জিহ্বাকে আয়ত্বে আনতে না পারলে মানুষকে পদে পদে বিপদগ্রস্ত হতে হয়। আল্লাহ ও বান্দার ক্রোধের শিকার হতে হয়। হযরত ওক্ববা ইবনে আমের রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন-

لَقِيتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ مَا النَّجَاةُ فَقَالَ اَمْلِكْ لِسٰنَكَ

অর্থাৎঃ একদা আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং আরয করলাম, "এয়া রাসুলাল্লাহ! (সর্বক্ষেত্রে) মুক্তির উপায় কি?" উত্তরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তুমি তোমার জিহবাকে আয়ত্বে রাখো।" [প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৪১৩]

অর্থাৎ কথা বলার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কোন কথাকে ছোট, তুচ্ছ ও নগণ্য মনে করা উচিত নয়। কারণ অনেক সময় মানুষের তুচ্ছ কথাও আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে তাকে জাহান্নামী বানিয়ে দেয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

اِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللّٰهِ لَا يَلْقٰى لَهَا بَالاً يَهْوِىْ بِهَا فِىْ جَهَنَّمَ

অর্থাৎঃ বান্দা কখনো কখনো এমন কথা বলে, যাতে আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট হন, একথা তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে; অথচ সে এ বিষয়ে ওয়াকিফহাল নয়। [মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা- ৪১১]

অপর এক হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

اَتَدْرُوْنَ مَا اَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ اَلْاَجْوَفَانِ اَلْفَمُ وَالْفَرْجُ

অর্থাৎ তোমরা কি জানো, কোন্ জিনিস মানুষকে সবচেয়ে বেশী জাহান্নামে প্রবেশ করাবে? তা দু'টি গহ্বরঃ একটি মুখ, অপরটি লজ্জাস্থান। [মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা- ৪১২]

হাদীস শরীফে আরো বর্ণিত হয়েছে যে,

اِنَّهٗ لَيَزِلُّ عَنْ لِسَانِهٖ اَشَدُّ مِمَّا يَزِلُّ عَنْ قَدَمِهٖ

অর্থাৎঃ বান্দার পা ফস্কে যাবার চেয়ে মুখ ফস্কে যাওয়া অধিকতর মারাত্মক ক্ষতিকর। [প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৪১৩]

কারণ, জিহ্বা ফস্কে গেলে ঈমান ও আমলের তথা দ্বীনের ক্ষতি হবে, যা শারীরিক ক্ষতির চেয়ে সহস্রগুণ ভয়ানক।

জিহ্বাই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ও সর্বনাশের মূল

পাপ-পুণ্য ও ঈমান-কুফর চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয় জিহ্বা দ্বারা। খুব সাবধানতার সাথে জিহ্বাকে ব্যবহার করতে হবে। এ প্রসঙ্গে হযরত সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ বলেন- আমি একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম-

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اَخْوَفُ مَا تَخَافُ عَلَىَّ قَالَ فَاَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهٖ وَقَالَ هٰذَا

অর্থাৎ ঃ হে আল্লাহর রাসূল! যে জিনিসগুলো আপনি আমার জন্য ভয়ের বস্তু বলে মনে করেন, তন্মধ্যে অধিক ভয়ঙ্কর কোন্ জিনিসটি? হযরত সুফিয়ান বলেন, এটা শুনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজের জিহ্বা ধরে বললেন, "এটা।" [মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা- ৪১৩]

একদা হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হযরত আবূ বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর নিকট গিয়ে দেখলেন, তিনি তাঁর জিহ্বা ধরে টানছেন। অর্থাৎ- জিহ্বার উপর নিজের ক্রোধ প্রকাশ করে শাস্তির উদ্দেশ্যে এরূপ করছেন। এটা দেখে হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বাধা প্রদানের উদ্দেশ্যে বললেন, "থামুন! আপনার কী হয়েছে? কেন এমন করছেন? আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন।" তখন হযরত আবূ বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, "এ জিহ্বাই আমার যতসব সর্বনাশের মূল। এটাই আমাকে ধ্বংসের স্থানসমূহে অবতীর্ণ করছে।" [মেশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা- ৪১৫]

অতএব, সর্বদা প্রত্যেক মানুষকে জিহ্বা সম্পর্কে সতর্ক ও সাবধান থাকতে হবে। একে ভাল কাজে ব্যবহার করে মন্দ কাজ থেকে বিরত রেখে এর ধ্বংসাত্মক অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

অভিশাপ ও অশ্লীলতা

অভিশাপ ও অশ্লীলতা মুখ দিয়ে প্রকাশ পায়; কিন্তু এ দু'টিই হচ্ছে রাগের মন্দ ফসল। এ দু'টি আচরণ মানুষের মর্যাদা ক্ষুন্ন করে, গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট করে দেয়, সমাজকে কলুষিত করে, শান্তি বিনষ্ট করে। এগুলো অভদ্রোচিত ও অসুন্দর আচরণ। পক্ষান্তরে, মু'মিন বলতেই ভদ্র, শান্ত ও সুন্দর আচরণকারীকে বুঝায়। সুতরাং কোন মু'মিনের পক্ষে এ ধরনের আচরণ মোটেই শোভা পায় না। তাই হাদীস শরীফে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

لَا يَنْبَغِىْ لِصِدِّيْقٍ اَنْ يَّكُوْنَ لَعَّانًا

অর্থাৎ একজন সিদ্দীক্ব তথা সাচ্চা মু'মিনের পক্ষে অধিক অভিসম্পাতকারী হওয়া উচিত নয়। [মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা- ৪১১]

অন্য এক বর্ণনায় আছে

لَا يَكُوْنُ الْمُؤْمِنُ لَعَّانًا

অর্থাৎ একজন পূর্ণাঙ্গ মুমিন অধিক অভিসম্পাতকারী হতে পারে না। [প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৪১৩]

উম্মতে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর একটি বিশেষ মর্যাদা হলো তারা ক্বিয়ামত দিবসে পূর্ববর্তী নবীগণের পক্ষে এ মর্মে সাক্ষ্য দান

করবে যে, নবীগণ স্ব-স্ব সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে দ্বীন প্রচারের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন। আর অনেক সৎকর্মশীলের সুপারিশে বহু জাহান্নামীকেও জান্নাত দেয়া হবে। কিন্তু যারা দুনিয়াতে লোকদেরকে কথায় কথায় অহেতুক ও অবান্তরভাবে অভিশাপ দেয়, ক্বিয়ামতের দিন তাদের সাক্ষ্য ও সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করা হবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

إِنَّ اللَّعَّانِيْنَ لَا يَكُوْنُوْنَ شُهَدَآءَ وَلَا شُفَعَآءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থাৎ নিশ্চয় অধিক অভিসম্পাতকারীগণ ক্বিয়ামতের দিন স্বাক্ষ্যদাতা ও সুপারিশকারী হবে না। [প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা- ৪১১]

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত আয়েশা সিদ্দিক্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলেন, একদা হযরত আবূ বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এক দাসকে অভিসম্পাত করছিলেন। এ সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর পাশ দিয়ে গমন করছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম শুনে তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "কা'বার রবের শপথ! অভিসম্পাত-ভৎর্সনাকারী ও সিদ্দীক্ব কখনো এক ব্যক্তি হতে পারে না। অর্থাৎ সিদ্দীক্বিয়াতের মত উৎকৃষ্ট গুণ ও অভিসম্পাত করার মত নিকৃষ্টতম কাজ একই ব্যক্তির মধ্যে সন্নিবিষ্ট হতে পারে না। কেননা দু'টি পরস্পর বিরোধী। এটা শুনে হযরত আবূ বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ওই দিনেই তাঁর কয়েকজন দাসকে মুক্ত করে দিয়ে নবী করীমের কাছে গিয়ে বললেন, "ভবিষ্যতে কখনো এ কাজের (পাপের) পুনরাবৃত্তি করবো না।" [মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা- ৪১৫]

অর্থাৎ ভুলক্রমেও যদি কোন সময় এ ধরনের পাপ সংঘটিত হয়ে যায়, তাহলে সাথে সাথে তার বিপরীত দান-সদক্বাহ্ কিংবা যে কোন নেক্ কাজ করে ভবিষ্যতে আর কোন দিন তা করবে না বলে প্রতিজ্ঞা করলে তা তাওবার পর্যায়ে পৌছে যায়। ফলে গুনাহ মাফ হওয়ার আশা করা যায়।

সমাজে কিছু অশিক্ষিত অজ্ঞ লোক আছে, যারা সামান্য বিষয়ে কথায় কথায় অভিশাপ ও গালিগালাজ করে। এটা অত্যন্ত নিন্দনীয় ও নাজায়েয। মু'মিন ব্যক্তি আদর্শবান ও চরিত্রবান হয়ে থাকে। অভিসম্পাত ও ভৎর্সনা মু'মিনের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এগুলোর ব্যাপারে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

لَا تُلَاعَنُوْا بِلَعْنَةِ اللّٰهِ وَلَا بِغَضَبِ اللّٰهِ وَلَا بِجَهَنَّمَ

অর্থাৎ তোমরা একে অপরকে এ বলে অভিসম্পাত করবে না-'তোমার উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত হোক', 'আল্লাহর গযব হোক' এবং 'তুমি জাহান্নামী'। [প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৪১৩]

অনেকেই প্রাকৃতিক বস্তুকে নিজের প্রতিকূল হতে দেখলে তাকে অভিসম্পাত ও গাল-মন্দ দিতে আরম্ভ করে। অথচ এটা জঘন্য পাপ; কারণ প্রকৃতির সবই আল্লাহর সৃষ্টি। তার নিজের কোন ক্ষমতা নাই। স্বয়ং আল্লাহ্ই ওগুলোর নিয়ন্ত্রক। সুতরাং ওইগুলোকে গালি দেওয়া মানে আল্লাহ্কে গালি দেওয়ার সামিল। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রে অভিসম্পাত নিজের উপর এসে পড়ে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে-

إِنَّ رَجُلاً نَازَعَتْهُ الرِّيْحُ رِدَائَهُ فَلَعَنَهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْعَنْهَا فَاِنَّهَا مَأْمُوْرَةٌ وَاِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْأً لَيْسَ لَهُ بِاَهْلٍ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ

অর্থাৎঃ এক ব্যক্তির গায়ের চাদর বাতাসে উড়িয়ে নিলো। লোকটি বাতাসকে অভিসম্পাত করলো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম শুনে বললেন- বাতাসকে অভিসম্পাত করো না। কেননা তা তো আদিষ্ট (অর্থাৎ আল্লাহর হুকুমে চলে); মনে রেখো, যে ব্যক্তি কোন বস্তুকে লা'নত করে, অথচ ওই বস্তুটি লা'নতের যোগ্য না হয়, তাহলে লা'নত ওই লা'নতকারীর দিকেই ফিরে আসে। [মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা- ৪১৩]

লা'নত করা সম্পর্কে শর'ঈ বিধান

লা'নত বা অভিসম্পাত সম্পর্কে শরীয়তের বিধান হলো, কোন মুসলমানকে নির্দিষ্ট করে লা'নত করা না-জায়েয। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

لَا تَقُوْلُوْا لِلْمُسْلِمِ عَلَيْكَ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَغَضَبُ اللّٰهِ

"তোমার উপর আল্লাহর অভিশাপ ও আল্লাহর গযব হোক"- এরূপ বলোনা। তবে সামগ্রিকভাবে কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের উপর লা'নত করা বৈধ। যেমন বলা হয়- لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكَافِرِيْنَ এবং لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ অর্থাৎ 'মিথ্যুকদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত হোক' এবং 'কাফিরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ হোক'। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তির মৃত্যু কুফর বা শির্ক অবস্থায় হয়েছে বলে নাস্ বা ক্বোরআন ও হাদীসের দলীল দ্বারা প্রমাণিত, তার উপর লা'নত করা বৈধ।

অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা নির্লজ্জতার আলামত। লজ্জা ঈমানের অঙ্গ। লজ্জা না থাকলে মানুষ যে কোন নিকৃষ্ট কাজ করতে পারে। অশ্লীলতা মানুষকে ত্রুটিপূর্ণ করে দেয়। নানাবিধ কুকর্ম ও দোষ ত্রুটির জন্ম দেয়। হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু

তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

مَا كَانَ الْفُحْشُ فِىْ شَئٍ اِلَّا شَانَهُ وَمَا كَانَ الْحَيَاءُ فِىْ شَئٍ اِلَّا زَانَهُ

অর্থাৎ যে কোন বিষয়ে অশ্লীলতা তাকে ত্রুটিপূর্ণ করে আর লজ্জাশীলতা তাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে। ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও শান্তি ইসলামের কাম্য। আর অশ্লীলতা গাল-মন্দ ও হিংসা-বিদ্বেষ এ ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও শান্তি-শৃঙ্খলাকে বিনষ্ট করে ফেলে। ফলে ওইসব খারাপ অভ্যাস পরিত্যাগ করা আবশ্যক।

মিথ্যা বলা

'মিথ্যা বলা মহাপাপ।' কথাটি প্রত্যেক ধর্মেই স্বীকৃত। বিশেষত ইসলামে এটাকে সকল পাপের মূল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। মিথ্যাই মানুষকে পাপ ও অপরাধের প্রতি উৎসাহ যোগায়। একটি মিথ্যাকে চাপা দিতে অসংখ্য মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়। মূলত মিথ্যার উপর ভরসা করেই মানুষ অপরাধ করার সাহস পায়, মিথ্যাবাদীকে কেউ পছন্দ করে না। এমনকি অতি আপনজনও। মহান দয়াবান আল্লাহও তাদের অভিশাপ করেন, পবিত্র ক্বোরআনে বলা হয়েছে-

لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ

তরজমাঃ মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।

মিথ্যা মানুষকে জাহান্নামী বানিয়ে দেয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

اِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ فَاِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِىْ اِلَى الْفُجُوْرِ وَاِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِىْ اِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكِذْبَ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ كَذَّابًا

অর্থাৎ তোমরা মিথ্যাচার হতে বেঁচে থাকো। মিথ্যা পাপাচারের পথ দেখায় আর পাপ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি সর্বদা মিথ্যা কথা বলে এবং মিথ্যা বলতে সচেষ্ট থাকে, আল্লাহ্‌র দরবারে তাকে বড় মিথ্যুক বলে লিখা হয়।

[মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা- ৪১২]

মিথ্যা কত বড় জঘন্য ও নিকৃষ্ট, তা রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর একটি হাদীস শরীফে পরিস্ফূটিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

اِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ تَبَاعَدَ عَنْهُ الْمَلَكُ مِيْلاً مِنْ نَتَنِ مَا جَآءَ بِهٖ

অর্থাৎ বান্দা যখন মিথ্যা বলে, তখন (তার নিরাপত্তায় নিয়োজিত) ফেরেশতা মিথ্যার দুর্গন্ধের কারণে এক মাইল দূরে চলে যায়। [প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৪১৩]

অর্থাৎ মিথ্যা এত বেশী দূর্গন্ধময় যে, যার দুর্গন্ধ এক মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

মিথ্যা কোন প্রকৃত মু'মিনের স্বভাব হতে পারে না। যিনি মু'মিন তিনি সত্যবাদী। সত্য আর মিথ্যা দু'টি বিপরীত ধর্মী জিনিস। এ দু'টি কখনো এক ব্যক্তির মাঝে সন্নিবিষ্ট হতে পারে না। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল-

اَيَكُوْنُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا قَالَ نَعَمْ - فَقِيْلَ لَهٗ اَيَكُوْنُ الْمُؤْمِنُ بَخِيْلاً قَالَ نَعَمْ فَقِيْلَ لَهٗ اَيَكُوْنُ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا قَالَ لاَ

অর্থাৎ ঈমানদার কি ভীরু হতে পারে? রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। তাঁকে আরো জিজ্ঞাসা করা হলো, ঈমানদার কি কৃপণ হতে পারে? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। তাঁকে আবার জিজ্ঞাসা করা হলো, ঈমানদার কি মিথ্যাবাদী হতে পারে? তিনি বললেন, "না"। [মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা- ৪১৪]

অর্থাৎ ভীরুতা ও কার্পণ্য ঈমান বিরোধী স্বভাব নয়। কোন মু'মিনের মধ্যে তা সংক্রমিত হতে পারে। ফলে তাকে কাপুরুষ ও কৃপণ বলা যায়। কিন্তু কোন মু'মিনের মধ্যে মিথ্যা বলার দোষ থাকতে পারে না। কারণ, প্রত্যেক মুসলমান জন্মগতভাবে সত্যবাদিতার উপর জন্ম লাভ করে। সমাজে এমন কিছু লোক দেখা যায়, যারা নিজেদেরকে বিজ্ঞ, জ্ঞানী ও পবিত্র হিসেবে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে, মেলা-মজলিসে উপস্থিত শ্রোতাদের থেকে বাহ্‌বা পাওয়ার জন্য এবং মানুষকে হাসানোর নিমিত্তে মিথ্যা বলে থাকে। এদের জন্য নবী করীম তিনবার অনুশোচনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

وَيْلٌ لِّمَنْ يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَّهٗ وَيْلٌ لَّهٗ

অর্থাৎ অনুশোচনা তাদের জন্য, যারা কথা বলে আর জনতাকে হাসানোর জন্য মিথ্যা বলে, তাদের জন্য অনুশোচনা, তাদের জন্য অনুশোচনা। [প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৪১২]

মিথ্যা মুনাফিক্বসুলভ স্বভাব। রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

اِنَّ الْكِذْبَ بَابٌ مِّنْ اَبْوَابِ النِّفَاقِ

অর্থাৎ নিঃসন্দেহে মিথ্যা মুনাফেক্বীর দরজাসমূহের একটি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

ثَلاَثٌ مَّنْ كُنَّ فِيْهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ وَاِنْ صَامَ وَصَلّٰى وَزَعَمَ اَنَّهٗ مُسْلِمٌ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ

অর্থাৎ যার মধ্যে তিনটি স্বভাব থাকবে সে মুনাফিক্ব; যদিও রোযা রাখে, নামায

পড়ে এবং নিজকে মুসলমান মনে করেঃ যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে এবং আমানত রাখলে খিয়ানত করে। [বুখারী ও মুসলিম]
মিথ্যা দ্বারা মানুষের ন্যায়পরায়ণতা, সততা ও গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট হয়ে যায়। মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হলে মুহাদ্দিসীনে কেরাম তাদের থেকে হাদীস গ্রহণ করতেন না।

ঘটনা

হযরত শিবলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু একজন উঁচু স্তরের ওলী ছিলেন। তিনি কোন অবাস্তব বিষয়কে উদাহরণ হিসেবেও গ্রহণ করতে রাজি ছিলেন না। অথচ উদাহরণে দোষ নেই। তিনি একজন ওস্তাদের নিকট ইলমে নাহ্ভ শিক্ষার জন্য গেলেন। ওস্তাদ বললেন, পড় ضَـرَبَ زَيْدٌ عَـمْـرًوا (যায়েদ আমরকে মেরেছে)। তখন হযরত শিবলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু জিজ্ঞেস করলেন, বাস্তবে কি যায়েদ আমরকে মেরেছে? ওস্তাদ উত্তর দিলেন- মারে নি, তবে এটা একটা উদাহরণ। তখন হযরত শিবলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন- আমি এমন ইল্‌ম পড়বো না, যার ভিত্তিটাই মিথ্যার উপর। এ বলে তিনি চলে গেলেন।
[নুজহাতুল মাজালিস, পৃষ্ঠা- ১১৯]

আগেই বলা হয়েছে- মিথ্যা সকল পাপের মূল ও উৎস। মিথ্যা বলে অস্বীকার করে মুক্তি পাবে এ বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই মানুষ পাপাচারে লিপ্ত হয়। তাই প্রথমে উৎসকে বন্ধ করতে হবে। এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে এসে বললো, "এয়া রাসূলাল্লাহ! আমি মুসলমান হতে চাই। তবে আমার মধ্যে অনেক মন্দ স্বভাব আছে, যা আমি মোটেই ছাড়তে পারবো না। আমি ব্যাভিচার করি, মদ্যপান করি, চুরির অভ্যাসও আছে এবং মিথ্যাও বলি। আমাকে দয়া করে ওইগুলোর অনুমতি দিন। আমি ধীরে ধীরে একটি একটি করে ত্যাগ করবো।" রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাকে এরশাদ করলেন, "তুমি কি মিথ্যা ত্যাগ করতে পারবে?" লোকটি ভাবলো, এটাতো সহজ। আর বললো, "ঠিক আছে; আমি ওয়াদা করলাম-মিথ্যা ত্যাগ করবো।" এ বলে চলে গেলো। এখন সে তার অভ্যাস অনুযায়ী যখন যিনা করার ইচ্ছা করলো তখন চিন্তা করল আল্লাহর রাসূলের দরবারে যখন হাযির হবো তখন মিথ্যা বলতে পারবো না। আর সত্য বললে লজ্জিত হবো ও শাস্তি পাবো। অতএব, সে যিনার ইচ্ছা ত্যাগ করলো। এভাবে মদ্যপানের ইচ্ছা করলো এবং রাতে চুরি করার ইচ্ছা করলো। ঠিক তার অন্তরে তখন ওই কথা এসে গেলো। ফলে মিথ্যা বলতে পারবে না বলে সে একেকটি করে সব পাপ কাজ পরিত্যাগ করে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেলো।
[নুজহাতুল মাজালিস, পৃষ্ঠা- ১১৯]

সাধারণত মিথ্যা দু'ধরনের হতে পারেঃ **ক.** মানুষের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টির

উদ্দেশ্যে, নিজের লাভ, অন্যের ক্ষতির উদ্দেশ্যে অথবা পাপাচারের শাস্তি থেকে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে। এটা না জায়েয ও হারাম। আল্লাহ পাক বলেন- وَاجْتَـنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ "তোমরা মিথ্যা কথা পরিহার করো। [সূরা হাজ্জ, আয়াত- ৩০]

খ. বিবাদমান দু'ব্যক্তি বা দু'দলের সমঝোতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অথবা কোন মুসলমানের কল্যানার্থে কিংবা কোন মুসলমানকে ক্ষতি থেকে বাঁচানোর জন্য মিথ্যা বলা শুধু বৈধ নয়; বরং ক্ষেত্র বিশেষে ওয়াজিব হয়ে যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِىْ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ

অর্থাৎ ওই ব্যক্তি মিথ্যুক নয়, যে লোকদের মধ্যে মীমাংসা করে। [মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা- ৪১২]
হযরত সাওবান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন-

اَلْكِذْبُ كُلُّهٗ اِثْمٌ اِلَّا مَا نَفَعَ بِهٖ مُسْلِمًا اَوْدَفَعَ عَنْهُ ضَرَرًا

অর্থাৎ প্রত্যেক মিথ্যা গুনাহ; তবে যে মিথ্যা দ্বারা কোন মুসলমানের কল্যাণ সাধিত হয় কিংবা কোন মুসলমানকে ক্ষতি থেকে বাঁচানোর জন্য বলা হয় তা বৈধ।
[তাশকীলে কিরদার, উর্দু, পৃষ্ঠা- ৭৬]

তবে যতক্ষণ সত্য দ্বারা সম্ভব হয় ততক্ষণ মিথ্যার আশ্রয় না নেয়াই শ্রেয়। সর্বদা মনে রাখতে হবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী

اَلصِّدْقُ يُنْجِىْ وَالْكِذْبُ يُهْلِكُ

অর্থাৎ "সত্য মুক্তিদান করে আর মিথ্যা ধ্বংস করে।"

গীবত

গীবত বা পরনিন্দা মুসলিম সমাজের একটি মারাত্মক ব্যাধি ও সমাজে হিংসা-বিদ্বেষ ও বিশৃংখলা সৃষ্টির একটি মহামন্ত্র। পরস্পর বিশ্বাস, সহমর্মিতা ও বন্ধুত্ব গীবতের কারণে বিনষ্ট হয়। দুনিয়া-আখিরাতের ক্ষতিকারক এই মহাব্যাধি থেকে বেঁচে থাকার জন্য পবিত্র ক্বোরআনে সুস্পষ্ট নির্দেশ এবং হাদীস শরীফে কঠোর সর্তকবাণী এসেছে। সুতরাং গীবত বা দোষ চর্চা হতে বাঁচতে হলে প্রথমে এ ব্যাপারে সম্যক জ্ঞান বা ধারণা থাকা উচিত।

গীবতের পরিচয়

মৌলভী আবদুল হাই লৌক্ষ্মভী সাহেব বলেন, কারো অনুপস্থিতিতে তার এমন কোন দোষ-ক্রটি আলোচনা করা, যা সে শুনলে মনে আঘাত পাবে, ইসলামী পরিভাষায় তা-ই গীবত। তা মুখের আলোচনায়, ইশারা-ইঙ্গিতে, কলমে কিংবা অন্য যে কোন উপায়ে হোক, গীবত সাব্যস্ত হবে। [গীবত, পৃষ্ঠা- ১]

মূলত আমরা গীবতের প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞ। অনেকেই মনে করে আমি

অন্যের সম্পর্কে যা বলছি, তা তো সত্য, মিথ্যা নয়। অর্থাৎ ওই দোষ তার মধ্যে বিদ্যমান। সুতরাং এটা গীবত হবে কেন? এ ধারণা ভুল। কোন ব্যক্তির মধ্যে বাস্তবে যে দোষ রয়েছে, তার অনুপস্থিতিতে সে দোষ আলোচনা করার নামই গীবত। পক্ষান্তরে, ব্যক্তির মধ্যে আদৌ যে দোষ নেই, তার প্রতি এরূপ মিথ্যা দোষারোপ করাকে মিথ্যা অপবাদ বলা হয়। মোটকথা হল বাস্তব সত্যও যদি কারো অনুপস্থিতিতে বলা হয, তাও গীবত। গীবতের পরিচয় দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

اَتَـدْرُوْنَ مَـاالْـغِيْبَةُ قَـالُوْا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ ذِكْرُكَ اَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيْلَ اَفَـرَأَيْـتَ اِنْ كَـانَ فِـىْ اَخِىْ مَااَقُوْلُ قَالَ اِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدِ اغْتَبْتَهٗ وَاِنْ لَّمْ يَكُنْ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ بَهَتَّهٗ

অর্থাৎ তোমরা কি জান গীবত কাকে বলে? সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের কোন (মুসলমান) ভাই সম্পর্কে এমন কথা বলা, বা (শুনলে) তার কাছে খারাপ লাগবে। জিজ্ঞেস করা হলো, যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে ওই ত্রুটি বিদ্যমান থাকে, যে ত্রুটি সম্পর্কে আমি বললাম, তবুও কি গীবত হবে? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি যে দোষ-ত্রুটির কথা বললে, আর যদি ওই দোষ-ত্রুটি তার মধ্যে থাকে তবে তুমি তার গীবতই করলে, আর যদি তুমি যা বলছো তা না থাকে, তবে তুমি তার প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিলে।

[মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা- ৪১২]

উক্ত হাদীস শরীফ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মিথ্যা অপবাদ গীবতের চেয়ে মারাত্মক। গীবত হারাম, কবীরাহ গুনাহ বা মহাপাপ। এটা অত্যন্ত ঘৃণিত, দূর্গন্ধময় ও অতি নিকৃষ্ট কাজ। পবিত্র ক্বোরআনে গীবতকারী ব্যক্তিকে আপন ভাইয়ের মৃতদেহের গোশত ভক্ষণকারী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর তা হলো, কুকুর ও ইতর প্রাণীর কাজ। আল্লাহ পাক বলেন-

وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ

অর্থাৎ তোমরা কেউ কারো গীবত করো না। তোমাদের কেউ কি আপন মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? বস্তুতঃ তোমরা তা অপছন্দ করো।

[সূরা হুজুরাত, আয়াত-১২]

ইমাম যয়নুল আবেদীন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু একদা এক গীবতকারীর উদ্দেশে করে বললেন, اِيَّـاكَ وَالْـغِيْبَةَ فَاِنَّهَا اِدَامُ كِلَابِ النَّاسِ অর্থাৎ তুমি গীবত থেকে বেঁচে থাকো, কারণ তা মানবরূপী কুকুরদের ব্যঞ্জন।

[কিমিয়ায়ে সা'দাত, সূত্র ঃ গীবত]

একদা হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে উম্মুল মু'মিনীন হযরত সফিয়্যাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন-

حَسْبُكَ مِـنْ صَـفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا تَعْنِىْ قَصِيْرَةً فَقَالَ لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَ بِهَا الْبَحْرُ لَمَزَجَتْهُ

অর্থাৎ সফিয়্যার দোষ সম্পর্কে আপনাকে এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, সে এরূপ; অর্থাৎ সে বেঁটে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আয়েশা! তুমি এমন এক জঘন্য কথা বলেছো, যদি সমুদ্রের পানির সাথে তা মিশ্রণ করা হয়, তাহলে তার (দুর্গন্ধে) সমুদ্রকে পরিবর্তিত করে দেবে। অর্থাৎ সমুদ্রের পানিকে আবর্জনার দুর্গন্ধে পরিণত করে ফেলবে। [মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা- ৪১৪]

হযরত জাবের রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে গীবতের দুর্গন্ধ অনুভব করা যেতো; কারণ তখন গীবতের অস্তিত্ব ছিলো খুবই কম। কিন্তু এখনকার সময় গীবতের প্রাদুর্ভাবের কারণে লোকজন এত অভ্যস্থ হয়ে পড়েছে যে, দুর্গন্ধ অনুভূত হয় না। যেমন কোন অনভ্যস্থ ব্যক্তি চামড়ার গুদামে গেলে দুর্গন্ধের কারণে বেশীক্ষণ অবস্থান করতে পারবে না। কিন্তু অভ্যস্থ ব্যক্তিরা চামড়ার উপরে বসে খাওয়া-দাওয়া করছে, অথচ কোন রূপ দুর্গন্ধ অনুভব করছে না। গীবতের অবস্থাও তাই। [মুকাশাফাতুল ক্বুলূব, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৭০]

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- মি'রাজের রাতে আমি এমন কিছু লোকের নিকট দিয়ে অতিক্রম করেছিলাম, যারা নিজেদের মুখমণ্ডল বিরাটাকার ধারালো নখ দ্বারা আঁচড়াচ্ছিলো এবং গলিত পঁচা লাভা ভক্ষণ করছিলো। জিব্রাইলকে এদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে সে বললো, এরা দুনিয়াতে (অন্যের গীবত করে) মরা লাশের গোশ্‌ত ভক্ষণ করতো। [প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১৬৮]

হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, যে ব্যক্তি পার্থিব জগতে তার ভাইয়ের গোশত খেয়েছে গীবতের মাধ্যমে, ক্বিয়ামত দিবসে তার সামনে ওই ব্যক্তির গোশ্‌ত হাযির করা হবে এবং বলা হবে যেভাবে তুমি দুনিয়ায় তার গোশত খেয়েছিলে সেভাবে তা মৃত অবস্থায় ভক্ষণ করো। [আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, সূত্র-গীবত]

অধিকাংশ ফক্বীহ্‌র মতে গীবত দ্বারা নামায, রোযা ও ওযূ ভঙ্গ না হলেও কিন্তু এগুলোর সাওয়াব কমে যায় কিংবা যার গীবত করেছে সাওয়াব তার আমলনামায় চলে যায়। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে- ক্বিয়ামতের দিন গীবতকারীর আমল গীবতকৃত ব্যক্তিকে প্রদান করা হবে। ফলে গীবতকারী আমলশূন্য হয়ে জাহান্নামে

প্রবেশ করবে। হযরত হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু একবার জানতে পারলেন যে, জনৈক ব্যক্তি তাঁর গীবত করেছে। সংবাদ পেয়ে তিনি ওই ব্যক্তির নিকট কিছু হাদিয়া পাঠিয়ে দিলেন এবং বললেন, "তুমি আমার গীবত করে তোমার নেক বা সৎকর্মগুলো আমাকে দিয়ে দিয়েছো। সুতরাং তোমার এ উপকারের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সামান্য এ হাদিয়া পাঠালাম।" [গীবত, সূত্রঃ নুজহাতুল মাজালিস]

গীবত ব্যাভিচার হতেও মারাত্মক। কারণ গীবত বান্দার হক্ব। বান্দা ক্ষমা না করলে আল্লাহ তা ক্ষমা করেন না। তাছাড়া যিনাকে গুনাহ মনে করে যিনাকারী তা গোপনে করে। পক্ষান্তরে, সাধারণত গীবতকে গীবৎকারী গুনাহও মনে করে না। আর গুনাহকে গুনাহ মনে না করা বড় গুনাহ। কবীরা গুনাহ মাফ হয় তাওবা দ্বারা। গীবতকারী যেহেতু গীবতকে গুনাহ মনে করে না সেহেতু তাওবাও করে না। ফলে গুনাহগার হয়ে দোযাখী হয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন-

اَلْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ الْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا قَالَ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَزْنِىْ فَيَتُوْبُ فَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَفِىْ رِوَايَةٍ فَيَتُوْبُ فَيَغْفِرُ اللّٰهُ لَهُ وَاِنَّ صَاحِبَ الْغِيْبَةِ لَا يُغْفَرُلَهُ حَتّٰى يَغْفِرَ لَهُ صَاحِبُهُ وَفِىْ رِوَايَةِ اَنَسٍ قَالَ صَاحِبُ الزِّنَا يَتُوْبُ وَصَاحِبُ الْغِيْبَةِ لَيْسَ لَهُ تَوْبَةٌ

অর্থাৎ "গীবত ব্যভিচার অপেক্ষা মারাত্মক। সাহাবীগণ আরয করলেন, "এটা কিভাবে?" রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, "মানুষ ব্যাভিচার করে, অতঃপর তাওবা করে এবং আল্লাহ পাক অনুগ্রহ করে তাওবা কবূল করেন; কিন্তু পরনিন্দাকারীকে আল্লাহ ক্ষমা করেন না, যতক্ষণ না যার নিন্দা করা হয়েছে সে ক্ষমা করে।" হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, ব্যাভিচারী তাওবা করে কিন্তু পর নিন্দাকারীর জন্য তাওবা নেই।

[গীবত, সূত্রঃ নুজহাতুল মাজালিস]

কারো দোষ চর্চা করা যেমন পাপ, তেমনি শোনাও পাপ। বসে বসে গীবত শোনা এবং তাতে বাধা না দেওয়া গীবত করার নামান্তর। কারণ, এতে গীবতকারীকে উৎসাহ প্রদান করা হয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কোন মজলিসে কারো গীবত চর্চা হলে, যার গীবত করা হচ্ছে তার প্রশংসা করে গীবতকারীকে গীবত থেকে বেঁচে থাকতে সহায়তা করো। গীবতকারীকে গীবত হতে বাধা প্রদান করো নতুবা মজলিস ত্যাগ করে চলে যাও। চুপচাপ বসে থাকলে তুমি ও গীবতকারী বলে গণ্য হবে। [দুররে মনসুর]

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে-

مَنْ ذَبَّ عَنْ عَرْضِ اَخِيْهِ بِالْغِيْبَةِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُعْتِقَهٗ مِنَ النَّارِ

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি গীবত দ্বারা কোন মুসলমানের সম্মানহানি থেকে লোকদেরকে প্রতিহত করবে, তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া মহান আল্লাহর অনুগ্রহের যিম্মায় অপরিহার্য হয়ে যায়। [মুসনাদে আহমদ ও তিরমিযী]

গীবত শ্রবণ করার পর প্রথম করণীয় হচ্ছে, যার গীবত শোনা হচ্ছে, তার সম্পর্কে খারাপ ধারণা না করা, তার মন্দ বিষয়গুলোকে সত্য মনে না করা। কারণ গীবতকারী মহাপাপী। সে কোন অবস্থাতেই বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র মজলিসে একব্যক্তি হযরত ইমাম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি'র গীবত করলে ইবনে মুবারক তাকে থামিয়ে বললেন, তুমি ইমাম আবূ হানিফার গীবত করছো, অথচ তাঁর শান হল একাধারে চল্লিশ বছর তিনি একই ওযূ দিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়েছেন।

[দুররুল মোখতার পাদটীকা]

গীবতের পরিণাম

গীবতকারীর দো'আ কবুল হয় না। ফক্বীহ আবুল লাইস্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেছেন-

ثَلَاثَةٌ لَّا يُسْتَجَابُ دَعْوَتُهُمْ اٰكِلُ الْحَرَامِ وَمِكْثَارُ الْغِيْبَةِ وَمَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهٖ بُخْلٌ وَحَسَدٌ لِلْمُسْلِمِيْنَ

অর্থাৎ তিন ব্যক্তির দো'আ ক্বূল হয় না- হারাম খাদ্য ভক্ষণকারী, অধিকহারে গীবতকারী, কৃপণ ও হিংসুক ব্যক্তি। হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলায়হিকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, আমাদের দো'আ কবূল না হওয়ার কারণ কী? তিনি আটটি দোষের কারণে দো'আ কবুল হয় না বলে উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে আট নাম্বারে বলেন- তোমরা ভোরে ঘুম থেকে উঠেই নিজের দোষ-ক্রটির প্রতি না তাকিয়ে অপরের দোষ চর্চা শুরু করে দাও। একারণেই তোমাদের উপর আল্লাহর রহমত নাযিল হয় না এবং দো'আ কবূল হয় না। [প্রাগুক্ত]

গীবতের কারণে তিনটি মহা ক্ষতি সাধিত হয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

اِيَّاكُمْ وَالْغِيْبَةَ فَاِنَّ فِيْهَا ثَلَاثُ اٰفَاتٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهُ الدُّعَاءُ وَلَا يُقْبَلُ لَهُ الْحَسَنَاتُ وَيَزْدَادُ عَلَيْهِ السَّيِّاٰتُ

অর্থাৎ গীবত হতে বেঁচে থাকো। কেননা, এতে তিনটি বালা ও মুসীবত রয়েছে- **এক.** গীবতকারীর দো'আ ক্বূল হয় না। **দুই.** তার নেক আমলসমূহ ক্বূল হয় না। **তিন.** তার পাপসমূহ বৃদ্ধি পেতে থাকে। [প্রাগুক্ত]

গীবতকারী সর্বাগ্রে জাহান্নামে যাবে। প্রসিদ্ধ তাবে'ঈ হযরত কা'বে আহবার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আল আনহু বলেন, আমি পূর্ববর্তী নবীগণের কিতাবে পড়েছি-

مَنْ مَاتَ تَآئِبًا مِنَ الْغِيْبَةِ كَانَ اٰخِرَ مَنْ يَّدْخُلُ الْجَنَّةَ وَمَنْ مَاتَ مُصِرًّا عَلَيْهِ كَانَ اَوَّلَ مَنْ يَّدْخُلُ النَّارَ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি গীবৎ থেকে তাওবা করে মৃত্যুবরণ করেছে সে সবশেষে জান্নাতে প্রবেশ করবে। পক্ষান্তরে, যে গীবতের উপর অটল থাকা অবস্থায় (তাওবা বিহীন) মৃত্যুবরণ করবে, সে সবার আগে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

[কিমিয়ায়ে সা'আদাত। সূত্র, গীবত]

কবরে এক তৃতীয়াংশ শাস্তি গীবতের কারণে হবে। বর্ণিত আছে-

عَذَابُ الْقَبْرِ ثُلُثٌ مِّنَ الْغِيْبَةِ وَثُلُثٌ مِّنَ النَّمِيْمَةِ وَثُلُثٌ مِّنَ الْبَوْلِ

অর্থাৎ কবরে আযাব এক তৃতীয়াংশ গীবতের দরুন, এক তৃতীয়াংশ চোগলখোরীর দরুন এবং অপর এক তৃতীয়াংশ প্রস্রাব হতে ভালভাবে পরিচ্ছন্নতা অর্জন না করার দরুন। [গীবত ও তান্বীহুল গাফেলীন, পৃষ্ঠা- ১০৮]

হযরত হাতিম-ই আসাম্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেছেন- গীবতকারী জাহান্নামে বানরের আকৃতিতে, মিথ্যাবাদী কুকুররূপে এবং হিংসুক শূকররূপে অবস্থান করবে। [নুজহাতুল মাজালিস, সূত্র, গীবত]

গীবতের কাফ্ফারা

আগেই বলা হয়েছে গীবত হল বান্দার হক। সুতরাং কাফফারা বান্দার সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ যার গীবত করা হয়েছে প্রথমে তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে, যদি তিনি উপস্থিত থাকেন কিংবা বেঁচে থাকেন। পক্ষান্তরে, যদি সে দূরে থাকার কারণে সাক্ষাৎ সম্ভব না হয় বা মৃত্যুবরণ করে। তবে সে ক্ষেত্রে আল্লাহর নিকট তাওবা করবে এবং ওই ব্যক্তির জন্য মাগফিরাত কামনা করবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, গীবতের কাফ্ফারা হলো তুমি যার গীবত করেছো, তার জন্য মাগফিরাত কামনা করবে এভাবে- হে আল্লাহ্! আমাদেরকে এবং তাকে ক্ষমা করো। [মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা- ৪১৫]

অতএব, গীবতের অশুভ পরিণাম ও এর মারাত্মক অনিষ্ট সম্পর্কে জানার পর আশা করি, কোন বিবেকবান মানুষ গীবতে লিপ্ত হতে পারে না। তবে কারো সাক্ষাতে তাকে সংশোধনের উদ্দেশ্যে, জনসাধারণের বৃহত্তর স্বার্থে ও দ্বীনের হেফাযতের উদ্দেশ্যে কারো নিন্দা প্রকাশ করা বৈধ। অত্যাচারীর কখনো কখনো নিন্দা করা বা খোদাদ্রোহীদের দোষ-ত্রুটি তুলে ধরা দ্বীনের বিরুদ্ধে তাদের ষড়যন্ত্রের স্বরূপ

উদঘাটন করে দ্বীনের হেফাযত করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। অত্যাচারিত ও নিপীড়িত ব্যক্তি অত্যাচারী সম্পর্কে জনগণের নিকট কিংবা বিচারকের নিকট তার অত্যাচারের কাহিনী ও দোষ-ত্রুটি তুলে ধরতে পারবে, শরীয়তের পরিপন্থী বিদ্'আত প্রচারকারীর দোষ বর্ণনা করা জায়েয। হযরত সুফিয়ান ইবনে ওয়ায়না রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন-

ثَلَاثَةٌ لَيْسَتْ لَهٗ غِيْبَةٌ اَلْاِمَامُ الْجَابِرُ وَالْفَاسِقُ الْمُعْلَنُ بِفِسْقِهٖ وَالْمُبْتَدِعُ الَّذِىْ يَدْعُو النَّاسَ اِلٰى بِدْعَتِهٖ

অর্থাৎ "তিন প্রকারের মানুষের সমালোচনা করা গীবত হয় নাঃ এক. অত্যাচারী শাসক, দুই. প্রকাশ্যে অনাচারী এবং তিন. ওই বিদ্'আতী লোক, যে মানুষকে নিজের বিদ্'আতের দিকে আহবান করে। [বায়হাক্বী, সূত্র-গীবত]

সার কথা হল গীবত মানুষের দুনিয়া-আখিরাত বিধ্বংসী একটি মহাপাপ। সুতরাং এ ধরনের পাপকে ঘৃণা করা উচিত। অতি নম্রভাবে হিকমত সহকারে নসীহত করা দরকার, যাতে সে তার ভুল বুঝতে পারে এবং আল্লাহর কাছে সাচ্চা অন্তরে তাওবা করে নেক্কার হয়ে যায়। পবিত্র ক্বোরআন মজীদে আল্লাহ্ তা'আলা হিকমত ও সুন্দর নসীহত দ্বারা আল্লাহর পথে ডাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

গীবতের আলোচনা হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার একটি মূল্যবান বাণী দিয়ে সমাপ্ত করছি। তিনি বলেন-

اِذَا اَرَدْتَّ اَنْ تَذْكُرَ عُيُوْبَ صَاحِبِكَ فَاذْكُرْ عُيُوْبَكَ

অর্থাৎ যখন তুমি তোমার কোন সঙ্গীর দোষ সম্পর্কে গীবত করতে চাইবে তখন নিজের দোষসমূহের কথা স্মরণ করো। গীবত থেকে বেঁচে থাকার এটা সর্বোত্তম ও সহজপন্থা। এই সহজ পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমেই আল্লাহ আমাদেরকে গীবত ও এর অনিষ্ট হতে বেঁচে থাকার তাওফীক্ব দান করুন। আ-মী-ন!

চোগলখোরী

একজনের কথা কিংবা দোষ অপরজনকে বলে বেড়ানোকে চোগলখোরী বলা হয়। চোগলখোরী অত্যন্ত নিকৃষ্ট কাজ। এটা হারাম। এর ফলে ইসলামের কাম্য ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব, শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়। সমাজে, পরিবারে, ভাইয়ে-ভাইয়ে, পিতা-পুত্রে কলহ-বিবাদ লেগে থাকে। স্বর্গীয় পরিবেশ নরকে পরিণত হয়।

পবিত্র ক্বোরআনে বলা হয়েছে-

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ

তরজমাঃ প্রত্যেক পশ্চাতে ও সম্মুখে পরনিন্দাকারীর জন্য দুর্ভোগ।

[সূরা হুমাযাহ, আয়াত-১]

চোগলখোর সমাজে সর্বদা ফিতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি করায় লিপ্ত থাকে। একজনের বিরুদ্ধে আর একজনকে কিভাবে ক্ষেপাবে সে চিন্তায় রাত দিন মগ্ন থাকে। ফলে নিজেও শান্তি পায় না অপরকেও শান্তিতে থাকতে দেয় না। এরা সমাজবিধ্বংসী কীট। এদেরকে কেউ পছন্দ করে না।

আল্লাহ বলেন-

وَاللّٰهُ لاَ يُحِبُ الْمُفْسِدِيْنَ

তরজমাঃ আল্লাহ ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না।

পৃথিবীতে ফিৎনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি করা মুনাফিক্বের চরিত্র। পবিত্র ক্বোরআনে আছে-

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ لا قَالُوْا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ ○ اَلاَ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لاَّ يَشْعُرُوْنَ ○

তরজমাঃ যখন মুনাফিক্বদেরকে বলা হয়, 'দুনিয়ায় ফিতনা- ফ্যাসাদ করো না।' তখন তারা বলে, 'আমরাতো সংশোধনকারী'। সাবধান! তারাই ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী, কিন্তু তারা তা উপলব্দি করে না। [সূরা বাক্বারা, আয়াত- ১১-১২]

চোগলখোর জান্নাতে যাবে না। রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- لاَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ (পরনিন্দাকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।)

[মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা- ৪১১]

অর্থাৎ তারা অন্যান্য সৎ কর্মপরায়ণদের সাথে প্রথম পর্যায়ে বেহেশতে যাবে না; বরং তারা কৃতকর্মের প্রতিফল তথা শাস্তি ভোগ করার পর প্রবেশ করবে।

চোগলখোরের কবরে আযাব

চোগলখোর দুনিয়াতে যেমন লাঞ্চিত হয় তেমন কবরেও কঠিন শাস্তি ভোগ করে। বোখারী ও মুসলিম শরীফে একাধিক স্থানে বর্ণিত বিশুদ্ধ হাদীসে, হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম একদা দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ যাত্রাবিরতি করে বললেন- এ দু'টি কবরবাসীর উপর আযাব হচ্ছে; কারণ ওদের একজন চোগলখোরী করতো আর অপরজন প্রস্রাব হতে ভালভাবে পবিত্রতা অর্জন করত না। [মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা- ৪২]

মৌলভী আবদুল হাই লক্ষ্মৌভী 'তাম্বীহুল গাফেলীন'-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, জনৈক আনসারী সাহাবীর বোনের ইন্তেকাল হলো। কাফন-দাফন শেষে বাড়ী ফিরে তার স্মরণ হলো যে, তার টাকার থলে কবরের ভিতর রয়ে গেছে। অতঃপর কবর খনন করে তা নিতে গিয়ে দেখলো যে, কবরে আগুন জ্বলছে। বোনের মমার্ন্তিক পরিণতি প্রত্যক্ষ করে সে তাড়াতাড়ি মাটি দ্বারা ঢেকে দিয়ে মায়ের

কাছে গিয়ে ঘটনার বিবরণ দিলেন। তার আমল সম্পর্কে মাকে জিজ্ঞেস করলে উত্তরে মা বললেন, তার তেমন কোন দোষ ছিল না; তবে তার চোগলখোরীর অভ্যাস ছিলো, নামায বিলম্বে পড়তো এবং পাক-পবিত্রতায় উদাসীন থাকতো। এ কারণেই খুব সম্ভব তার এই আযাব হচ্ছে। [গীবত ও মুকাশাফাতুল কুলূব, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৬৮]

চোগলখোর আল্লাহর নিকট অতি নিকৃষ্ট ও ইতর। মানুষের ঘৃণার পাত্র হয় চোগলখোর। এদেরকে দেখলে মানুষ মুখ ফিরিয়ে নেয়, কথা বলা বন্ধ করে দেয় এবং তাদের অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে। চোগলখোর ওলীদ ইবনে মুগীরাকে ক্বোরআনে পাকে হারামযাদা তথা 'জারজসন্তান' বলে চিহ্নিত করেছে। রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

خِيَارُ عِبَادِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ اِذَا رُأُوْاذُكِرَ اللّٰهُ وَشِرَارُ عِبَادِ اللّٰهِ الْمَشَّاؤَنَ بِالنَّمِيْمَةِ الْمُفَرِّقُوْنَ بَيْنَ الْاَحِبَّةِ الْبَاغُوْنَ اُبُرَآءَ الْعَنَتَ

অর্থাৎ আল্লাহর প্রিয়বান্দা তারা, যাদেরকে দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়। আল্লাহর নিকট নিকৃষ্ট বান্দা তারা, যারা মানুষের পরোক্ষ নিন্দা করে বেড়ায়। বন্ধুদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং পূত পবিত্র লোকদের পদস্খল কামনা করে।

[মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা- ৪১৫]

অর্থাৎ চোগলখোরীর মাধ্যমে ভাল মানুষদেরকে বিপর্যয়, পাপাচার, ধ্বংস, পতন ও ব্যাভিচারে ফেলার সুযোগের সন্ধান করে।

চোগলখোরের দো'আ তো দূরের কথা তার কারণে অন্যদের দো'আও কবূল হয় না। ফলে সে শুধু নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, অপরকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে। তাদের কারণে আল্লাহর রহমত ও নি'মাত হতে সবাইকে বঞ্চিত হতে হয়।

ঘটনা

হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম-এর সম্প্রদায় বনী ইস্রাইলে একদা অনাবৃষ্টির কারণে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো। হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের নিয়ে লাগাতার তিনদিন বৃষ্টির জন্য দো'আ করলেন; কিন্তু দো'আ কবূল হয়নি, বৃষ্টিও হয়নি। হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম আল্লাহকে জিজ্ঞেস করলেন- এর কারণ কি? তখন ওহী নাযিল হলো, হে মূসা! তোমার সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন চোগলখোর আছে। যার কারণে দো'আ কবূল হচ্ছে না এবং হবেও না।" হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম বললেন, "হে আল্লাহ! ওই বদ্বখত কে? আপনি আমাকে তার পরিচয় করিয়ে দিন, আমি তাকে বের করে দেবো।" আল্লাহ তা'আলা বললেন, "আমি চোগলখোরী করতে তোমাদেরকে নিষেধ করি আর আমি কিভাবে

চোগলখোরী করবো?” হুকুম হল তোমরা সবাই একত্রে তাওবা করো, তাহলে দো'আ কবূল হতে পারে। অতএব সবাই খালেস অন্তরে তাওবা করলো আর তাৎক্ষণিকভাবে বৃষ্টি বর্ষিত হলো।

[কিমিয়ায়ে সা'আদাত, পৃষ্ঠা- ২১৩, তাম্বীহুল গাফেলীন, আরবী, পৃষ্ঠা-১০৯]

ইমাম ইয়াহিয়া আকসাম রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, চোগলখোর যাদুকরের চেয়ে অধিক ক্ষতিকারক। একজন চোগলখোর এক ঘন্টায় যা করতে পারে যাদুকর তা একমাসেও পারে না। [তাম্বীহুল গাফেলীন, আরবী পৃষ্ঠা- ১০৮]

কথিত আছে যে, চোগলখোরের কাজ শয়তানের কাজের চেয়েও ক্ষতিকর। কেননা শয়তানের কাজ হল ভিতরে, খেয়ালে ও প্ররোচনার মাধ্যমে, পক্ষান্তরে চোগলখোরের কাজ প্রত্যক্ষ ও সামনাসামনি। [তাম্বীহুল গাফেলীন, আরবী, পৃষ্ঠা- ১০৮]

আরবী প্রবাদে চোগলখোরকে حَمَّالَةً তথা লাকড়ি বাহক বলা হতো। অধিকাংশ মুফাস্‌সির ক্বোরআনের আয়াত حَمَّالَةَ الْحَطَبِ থেকেও 'চোগলখোর' অর্থ নিয়েছেন। শুকনো লাকড়ি যেমন আগুনের ইন্ধন হয়, চোগলখোর ব্যক্তিবর্গও পরিবারে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। [প্রাগুক্ত]

হযরত মাস'আব ইবনে জুবাইর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমার মতে চোগলখোরের কথা শোনা চোগলী করার চেয়েও মারাত্মক অপরাধ। চোগলখোরের উদ্দেশ্য হলো উত্তেজিত করা আর শ্রবণকারী তা কবূল করে তাকে উৎসাহিত করা।

[কিমিয়ায়ে সা'আদাত, পৃষ্ঠা ৩৯৪]

হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, যে ব্যক্তি তোমার সামনে অন্যের কথা বলে সে অবশ্যই তোমার কথা অন্যের কাছে বলে বেড়াবে। সুতরাং সর্বাবস্থায় চোগলখারের খপ্পর থেকে অবশ্যই বেঁচে থাকা আবশ্যক।

মদ ও জুয়া

ইসলাম বিজ্ঞানসম্মত ধর্ম। এর প্রতিটি আদেশ-নিষেধ হিকমতে পরিপূর্ণ। ইসলামে বস্তুর শুধু বাহ্যিক দিকটা বিচার্য নয়; বরং ভিতরে বাইরে সবকিছুর বিচার করে ভাল-মন্দের সিদ্ধান্ত দেয়া হয়। প্রাক-ইসলামী যুগে সমগ্র আরব সমাজে মদ ও জুয়ার ব্যাপক প্রচলন ছিলো। শুধু তা নয়, মদ তথাকথিত আভিজাত্যের প্রতীক ছিলো। আল্লাহ তা'আলা মদ্যপানকে হিকমতপূর্ণ পদ্ধতিতে পর্যায়ক্রমে হারাম করেছেন। কারণ দীর্ঘদিনের অভ্যাস মানুষ সহজে ত্যাগ করতে পারে না। তাই আল্লাহ তা'আলা প্রথমে মদ্যপানের অপকারিতা সম্পর্কে সতর্ক করে দেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

তরজমাঃ “তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলেন দিন, এতদুভয়ের মধ্যে মহাপাপ রয়েছে এবং মানুষের জন্য উপকারিতাও আছে; তবে এগুলোর পাপ উপকারিতা অপেক্ষা অনেক বড়। [সূরা বাক্বারা, আয়াত- ২১৯]

এ দু'টির মধ্যে মানুষের ধারণা মোতাবেক সামান্য উপকারিতা থাকলেও অপকারিতা কিন্তু অনেক বেশী। কারণ মানুষের সবচেয়ে বড় নি'মাত ও দামী বস্তু হচ্ছে আক্বল বা বিবেক, যা দ্বারা মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। তা মদ্যপান দ্বারা বিলুপ্ত হয়ে যায়। ফলে যে কোন পাপ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। হযরত ইবনে আব্বাস, হযরত আলী ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুজাহিদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত ইদ্রিস আলায়হিস্ সালাম-এর যামানায় মানুষ বিভিন্ন পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়লে ফেরেশতারা আল্লাহর দরবারে আরয করলেন, 'ইনসান বড় গুনাহগার।' আমরা প্রথমেই বলেছিলাম, এরা দুনিয়ায় গিয়ে খুন-খারাবীতে লিপ্ত হবে। এখন আমাদের কথা সত্য প্রমাণিত হচ্ছে।' আল্লাহ তা'আলা বললেন, “মানুষকে ক্রোধ, ক্ষুধা ও লোভ-লালসা দেওয়া হয়েছে, যা দ্বারা তারা গুনাহে লিপ্ত হয়। তোমাদেরকেও যদি ওইগুলি দেওয়া হয়, তাহলে তোমরাও গুনাহে লিপ্ত হবে।” তারা বললেন, “আমাদেরকে এগুলি দিলেও আমরা গুনাহে লিপ্ত হবো না। তাদেরকে বলা হলো- তাহলে তোমাদের মধ্যে থেকে দু'জন সবচেয়ে বড় পরহেযগার নির্বাচিত কর। তাদেরকে ওইগুলি দিয়ে পরীক্ষা করা হবে। তাঁরা বাছাই করে হারূত ও মারূত দু'জন ফেরেশতাকে নির্বাচিত করলেন। আল্লাহ তাঁদেরকে 'শাহ্ওয়াত' (কামপ্রবৃত্তি) ও রাগ দিয়ে পৃথিবীতে বাবেল শহরে পাঠালেন। তাঁরা দিনের বেলায় ক্বাযী হয়ে ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা করতেন আর সন্ধ্যা বেলায় ইস্মে আ'যমের মাধ্যমে আসমানে উঠে যেতেন। ন্যায়পরায়ণতায় তাঁরা প্রসিদ্ধি লাভ করলেন। বহু মোকাদ্দমা তাঁদের কাছে আসতে লাগলো। একদা যোহরা নামের এক সুন্দরী মহিলা স্বামীর বিরুদ্ধে মোক্বাদ্দমা নিয়ে আসে। তাকে দেখা মাত্রই ওই দু'জন ফেরেশতা তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন এবং অন্যায় কাজের প্রস্তাব দিয়ে বসেন। মহিলাটি বললেন- আমার স্বামী অত্যন্ত রাগী। শুনলে আমাকে হত্যা করে ফেলবে। একথা শুনে তাদের আসক্তি আরো বেড়ে গেলো। মহিলা প্রস্তাব দিল আমাকে ইসমে আ'যম শিক্ষা দাও অথবা আমার স্বামীকে হত্যা করো অথবা মদ্যপান করো। তাঁরা বললেন, ইসমে আ'যম 'আসরারে এলাহী'। এটা প্রকাশ করা খেয়ানত ও যুল্ম। হত্যা বান্দার হক্ব, এগুলো আমাদের দ্বারা অসম্ভব। তবে মদ্যপান করতে পারি। অতএব, তাঁরা মদ্যপানে সম্মত হয়ে মদ্যপান করে মাতাল হয়ে পড়লেন।

ফলে মাতাল অবস্থায় তাঁরা ইসমে আ'যম শিখালেন এবং মহিলার স্বামীকে হত্যা করলেন। পরে হুঁশ আসলে তারা লজ্জিত হলেন আল্লাহর দরবারে তাওবা করলেন তারা তাঁদের তাওবা কবূল হবার পূর্বশর্ত স্বরূপ ক্বিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়াতে শাস্তি ভোগ করতে থাকবেন। [তাফসীর নঈমী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৫৬৬]

অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থায় যেসব গুনাহ করতে সাহস পায়নি মদ্যপান করে মাতাল হয়ে সেসব কাজ অনায়াসেই করে ফেলেছেন। অতএব, বলা হয় যে, বিবেক বিলুপ্ত হয়ে গেলেই প্রতিটি মন্দ কাজের পথ সুগম হয়ে যায়।

মধ্যপান সম্পর্কে দ্বিতীয় আয়াত নাযিল হয়- يَـٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى **তরজমাঃ** হে ঈমানদারগণ! তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের কাছেও যেওনা। [সূরা নিসা, আয়াত- ৪৩, কানযুল ঈমান]

আয়াতের শানে নুযূল হচ্ছে-হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর ঘরে সাহাবা-ই কেরামকে আহারের দাওয়াত করলেন। আহারের পর 'শরাব' (মদ বিশেষ) পরিবেশিত হলো। কারণ, তখন মদ হারাম হয়নি। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ তা পান করলেন। ইত্যবসরে মাগরিবের নামাযের সময় হলো। তাঁদের মধ্যে একজন সাহাবী ইমামত করলেন। তখন ইমামের মধ্যে শরাবের প্রভাব বিরাজিত ছিলো। তিনি قُلْ يٰـاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ (সূরা কাফেরূন) পড়ছিলেন। কিন্তু তাঁর পড়ার সময় প্রতিটি স্থানে لا শব্দটি বাদ পড়ে গেলো। ফলে অর্থ- সম্পূর্ণ বিগড়ে গেলো। এরপর উপরোক্ত আয়াত শরীফ নাযিল হলো এবং নামাযের সময় শরাব (মদ্যপান) হারাম করা হলো।

পরবর্তীতে আরো এক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মদ্যপান স্থায়ীভাবে হারাম মর্মে চূড়ান্ত আয়াত নাযিল হয়। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন-

يَـٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ

তরজমাঃ হে ঈমানদারগণ! মদ, জূয়া, মূর্তি এবং লটারী এগুলো অপবিত্র, শয়তানের কাজ। সুতরাং এগুলো থেকে বিরত থাকো। [সূরা মা-ইদাহ, আয়াত- ৯০]

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- সর্বপ্রকার অপকর্ম এবং অশ্লীলতার জন্মদাতা হচ্ছে শরাব (মদ)। এটি পান করে মানুষ নিকৃষ্টতর পাপে লিপ্ত হয়ে যেতে পারে। নিম্নলিখিত আয়াতে এরশাদ হয়েছে-

اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ

তরজমাঃ 'শয়তান তো চায়, মদ ও জুয়ার মধ্যে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে তোমাদের বিরত রাখতে। তবুও কি তোমরা তা থেকে বিরত থাকবে না? [সূরা মা-ইদাহ, আয়াত- ৯১]

উপরোক্ত আয়াত থেকে মদ্যপান ও জুয়ার ক্ষতিসমূহ চিহ্নিত হয়েছে এবং শয়তান কাউকে মদ্যপান ও জুয়া খেলায় লিপ্ত রাখতে পারলে অনেক কল্যাণজনক কাজ থেকে বিরত এবং বহু ধ্বংসাত্মক কাজে পতিত করতে পারে আর এটাই শয়তানের কাম্য। হযরত সা'ঈদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হযরত ক্বাতাদাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, চার ব্যক্তি জান্নাতের সুগন্ধি পাবে না অথচ তা পাঁচশত বছরের দূরত্বে বিরাজিত থাকবে। আর তারা হলো কৃপণ, খোঁটা প্রদানকারী, মদ্যপানে অভ্যস্থ ব্যক্তি ও পিতা-মাতার অবাধ্য। [তাম্বীহুল গাফেলীন, আরবী, পৃষ্ঠা- ৯১]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মস'ঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, মদের সাথে সম্পর্ক যুক্ত দশ শ্রেণীর লোকের উপর রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম লা'নত করেছেনঃ ১. যে মদের নির্যাস বের করে, ২. প্রস্তুতকারক, ৩. যে পান করে, ৪. যে পান করায়, ৫. আমদানী কারক, ৬. যার জন্য আমদানী করা হয়, ৭. বিক্রেতা, ৮. ক্রেতা, ৯. সরবরাহকারী, ১০. এর লভ্যাংশ ভোগকারী। [প্রাগুক্ত]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, ক্বিয়ামতের দিন মদ্যপায়ীকে উপস্থিত করা হবে, তার চেহারা থাকবে কুৎসিৎ, চোখ দু'টো

নীলবর্ণের, জিহবা বুক পর্যন্ত ঝুলন্ত এবং তা থেকে লালা ঝরতে থাকবে। তার এরূপ অবস্থা যে দেখবে, সে তার দুর্গন্ধের কারণে তাকে ঘৃণা করবে। তোমরা মদ্যপায়ীদের সালাম দেবে না, অসুস্থ হলে দেখতে যাবে না এবং তারা মারা গেলে তাদের জানাযা পড়বে না। [প্রাগুক্ত]

হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, তোমরা মদ্যপান থেকে বিরত থাকো। কেননা এ হচ্ছে সকল গুনাহ্র মূল। কোন ব্যক্তির অন্তরে ঈমান ও মদ একত্রিত হতে পারে না। এ দু'টির একটি অপরটিকে ধ্বংস করে দেয়। অর্থাৎ মদ্যপায়ী হলো হতাশাগ্রস্ত অবস্থায় তার মুখ দিয়ে কুফরী শব্দ বের হয়ে যেতে পারে। মৃত্যুকালে তার মুখ দিয়ে কুফরী প্রকাশ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ফলে দুনিয়া থেকে কুফরী অবস্থায় যাবে এবং চিরকাল ধরে জাহান্নামী হবে। [তাম্বীহুল গাফেলীন, পৃষ্ঠা- ৯১]

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে- নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- ক্বিয়ামতের দিন মদ্যপায়ী যখন কবর থেকে উঠবে তখন সে পঁচা লাশের চেয়েও দুর্গন্ধযুক্ত হবে। তার গলায় থাকবে মদের ভাণ্ড ঝুলানো, হাতে পেয়ালা, তার চামড়া ও গোশতের মাঝখানটা সাপ-বিচ্ছুতে ভরা থাকবে। তাকে আগুনের এক জোড়া জুতা পরতে দেয়া হবে। তাতে তার মাথার মগজ টগবগ করতে থাকবে। সে দেখবে যে, তার কবরটি জাহান্নামের একটি গর্ত এবং জাহান্নামে সে হবে ফেরআউন এবং হামানের সাথী। [প্রাগুক্ত]

হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন, আমি রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মদ পান করে, সাত দিন পর্যন্ত তার নামায কবূল হবে না। যদি তাতে তার জ্ঞান লোপ পায় তাহলে চল্লিশ দিন যাবৎ নামায কবূল হবে না। যদি মারা যায় তাহলে সে কাফির রূপে মারা যাবে। অন্য এক হাদীস শরীফে আছে- কেউ যখন একবার মদপান করে তখন চল্লিশ দিন যাবৎ তার নামায, রোযা বা কোন আমল কবূল হবে না। দ্বিতীয়বার পান করলে আশি দিন যাবৎ তার কোন আমল আল্লাহ কবুল করবেন না। তৃতীয়বার পান করলে একশ' বিশদিন পর্যন্ত, চতুর্থবার পান করলে তোমরা তাকে হত্যা করবে। কেননা সে কাফির এবং তাকে জাহান্নামীদের গলিত পুঁজ পান করানো আল্লাহর কাছে অবধারিত। [প্রাগুক্ত]

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে সব ধরনের পাপাচার থেকে বাঁচার তাওফীক্ব দিন। আমিন!

-----<>-----

ফাযা-ইলে ক্বোরআন

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন উম্মতে মুহাম্মদীর উপর একটি বড় অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের উপর ধর্মগ্রন্থ হিসেবে ক্বোরআনুল করীম অবতীর্ণ করেছেন। এ পবিত্র ক্বোরআন মানব জাতির ইহ জগতের পূর্ণাঙ্গ কল্যাণময় জীবন-বিধান এবং পরজগতের মুক্তির সনদরূপে স্বীকৃত। এ পবিত্র ক্বোরআনের মাধ্যমে মানব জাতি সহজ, সরল এবং সৎপথপ্রাপ্ত হয়। কেননা এর মধ্যে আদেশ-নিষেধ পরিষ্কারভাবে বর্ণিত আছে। হালাল ও হারামকে অতীব স্পষ্টভাবে পার্থক্য করা হয়েছে। মূলত এ পবিত্র ক্বোরআন হল নূর। এটা দ্বারা গোমরাহী থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। অন্তরের কালিমা দুর করার এক মহৌষধ হলো পবিত্র ক্বোরআন। আল্লাহ ও বান্দার মাঝে সেতু বন্ধনের অন্যতম উপায় হলো পবিত্র ক্বোরআন মজিদ। এটা একটা পরিপূর্ণ জীবন বিধান। এটা তিলাওয়াত করার মধ্যেও রয়েছে অসংখ্য ফযীলত। নিম্নে পবিত্র হাদীসের আলোকে এর কিছু ফযীলত ও গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হলঃ

ক্বোরআন শিক্ষার্থী ও শিক্ষাদাতা শ্রেষ্ঠ

عَنْ عُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ [بخارى]

অর্থাৎঃ হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে ওই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, যে নিজে ক্বোরআন শরীফ শিখেছে এবং অপরকে শিক্ষা দিয়েছে।

ক্বোরআন শিক্ষাই হল শ্রেষ্ঠ সম্পদ

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِىْ الصُّفَّةِ فَقَالَ اَيُّكُمْ يُحِبُّ اَنْ يَغْدُوَ كُلَّ يَوْمٍ اِلٰى بُطْحَانَ اَوِ الْعَقِيْقِ فَيَأْتِىْ بِنَا قَتَيْنِ كُوْمَاوَيْنِ فِىْ غَيْرِ اِثْمٍ وَلَا قَطْعَةِ رَحْمٍ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كُلُّنَا نُحِبُّ ذَالِكَ قَالَ اَفَلَا يَغْدُوْ اَحَدُكُمْ اِلَى الْمَسْجِدِ فَيُعَلِّمُ اَوْ يَقْرَأُ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّهٗ مِنْ .... اَوْ اَرْبَعٍ خَيْرٌ لَّهٗ مِنْ اَرْبَعٍ وَمِنْ اَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْاِبِلِ [رواه مسلم]

অর্থাৎঃ হযরত ওক্ববা ইবনে আমির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা মসজিদে নবভীর সোফ্ফায় বসা ছিলাম। এমন সময় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনলেন এবং আমাদের উদ্দেশ্যে এরশাদ করলেন, ''তোমাদের মধ্যে কেউ কি এটা পছন্দ করবে যে, সে প্রত্যহ ভোর বেলায় বোতহান বা আকীক্ব নামক বাজারে গিয়ে কোনরূপ অন্যায় বা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা ব্যতিরেকে অতি উৎকৃষ্ট ধরনের দু' দু'টি উটনী নিয়ে আসবে?'' সাহাবীগণ আরয করলেন, ''তা তো আমাদের সকলেই পছন্দ করবে।'' প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'মসজিদে গিয়ে দু'টি আয়াত শিক্ষা দেওয়া দু'টি উটনী হতে এবং তিনটি আয়াত তিনটি উটনী হতে এবং চারটি আয়াত চারটি উটনী হতে উত্তম, তেমনিভাবে যে কোন সংখ্যক আয়াত সেটার সমসংখ্যক উটনী হতে উত্তম। [মুসলিম]

এক হরফের বিনিময়ে দশটি সাওয়াব

عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ فَلَهٗ بِهٖ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا لَا اَقُوْلُ الٓمٓ حَرْفٌ اَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيْمٌ حَرْفٌ [رواه الترمذى والدارمى]

অর্থাৎঃ হযরত ইবনে মাস'ঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ক্বোরআনের একটি অক্ষর পাঠ করলো তার জন্য সেটার বিনিময়ে নেকী রয়েছে এবং এক নেকীর সাওয়াব দশগুণ। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি বলছিনা যে, الٓمٓ একটি অক্ষর; (বরং) আলিফ একটি অক্ষর, লা-ম একটি অক্ষর এবং মী-ম একটি অক্ষর। [তিরিমিযী]

ক্বোরআন বিহীন অন্তর শূন্য ঘরের ন্যায়

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الَّذِىْ لَيْسَ فِىْ جَوْفِهٖ شَىْءٌ مِنَ الْقُرْاٰنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ [رواه الترمذى والدارمى]

অর্থাৎঃ হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যার অন্তরে ক্বোরানের কিছুই নেই, ওই অন্তর হল শূন্য ঘরের ন্যায়। [তিরমিযী]

নফল ইবাদতগুলোর মধ্যে ক্বোরআন তিলাওয়াত শ্রেষ্ঠ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قِرَاةُ الْقُرْاٰنِ فِى الصَّلٰوةِ اَفْضَلُ مِنْ قِرَاةِ الْقُرْاٰنِ فِىْ غَيْرِ الصَّلٰوةِ وَقِرَاةُ الْقُرْاٰنِ فِىْ غَيْرِ الصَّلٰوةِ اَفْضَلُ مِنَ التَّسْبِيْحِ وَالتَّكْبِيْرِ وَالتَّسْبِيْحُ اَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصَّدَقَةُ اَفْضَلُ مِنَ الصَّوْمِ وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ مِّنَ النَّارِ - [بيهقى]

অর্থাৎঃ হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা হতে বর্ণিত, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, নামাযের অভ্যন্তরে ক্বোরআন তেলাওয়াত করা নামাযের বাইরে তিলাওয়াতের চেয়ে উত্তম। আর নামাযের বাইরে ক্বোরআন তেলাওয়াত করা তাসবীহ ও তাকবীরের চেয়ে উত্তম, তাসবীহ পাঠ করা সাদক্বাহ্ করা হতে উত্তম, সাদক্বাহ্ করা রোযা হতে উত্তম আর রোযা দোযখ হতে বাঁচার জন্য ঢাল স্বরূপ। [বায়হাক্বী]

অন্তরের মরিচা ক্বোরআন তিলাওয়াত দ্বারা দূরীভূত হয়

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ هٰذِهِ الْقُلُوْبَ تَصْدَاُ كَمَا يُصْدَءُ الْحَدِيْدُ اِذَا اَصَابَهُ الْمَاءُ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا جِلَائُهَا قَالَ كَثْرَةُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَتِلَاوَةُ الْقُرْاٰنِ - [بيهقى فى شعب الايمان ومشكوة ١٨٩ صفحه]

অর্থাৎঃ হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, লোহাকে পানি স্পর্শ করলে যেভাবে মরিচা পড়ে যায়, তদ্রূপ মানুষের ক্বলবের মধ্যেও মরিচা পড়ে যায়। কেউ জিজ্ঞাসা করলো, হে আল্লাহর রাসূল! সেটা দূর করার উপায় কি? প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, মৃত্যুকে অধিক পরিমাণ স্মরণ করা ও ক্বোরআনুল করীম তেলাওয়াত করা। [বায়হাক্বী]

ক্বোরআন তেলাওয়াতকারীর মাতা-পিতাকে নূরের তাজ পরানো হবে

عَنْ مُعَاذِ نِ الْجُهَنِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيْهِ اُلْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَّوْمَ الْقِيَامَةِ ضُوْئُهٗ اَحْسَنُ مِنْ ضُوْءِ الشَّمْسِ فِىْ بُيُوْتِ الدُّنْيَا لَوْكَانَتْ فِيْكُمْ فَمَا ظَنُّكُمْ بِالَّذِىْ عَمِلَ بِهٰذَا [احمد و ابو داود]

অর্থাৎঃ হযরত মু'আয জুহানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে বক্তি ক্বোরআন শরীফ পড়ে এবং তদনুযায়ী আমল করে তার পিতামাতাকে ক্বিয়ামতের

দিন এমন একটি নূরের তাজ পরিধান করানো হবে, যার আলো সূর্যের আলোর চেয়েও অধিক হবে। যদি এ সূর্য তোমাদের ঘরে উদিত হয়! অতএব যে স্বয়ং ক্বোরআনুল করীমের উপর আমল করে তার সম্পর্কে তোমাদের কী ধারণা হতে পারে? [আবূ দাঊদ]

আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের অন্যতম মাধ্যম হলো ক্বোরআন তেলাওয়াত করা

عَنْ اَبِیْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّكُمْ لَا تَرْجِعُوْنَ اِلَى اللّٰهِ بِشَیْءٍ اَفْضَلَ مِمَّا خَرَجَ مِنْهُ يَعْنِی الْقُرْاٰنَ [ابوا داود]

অর্থাৎঃ হযরত আবূ যার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয় তোমরা ওই জিনিস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আর কোন জিনিস সহকারে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে না, যা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে নাযিল হয়েছে অর্থাৎ ক্বোরআন মজীদ। [আবূ দাঊদ]

ক্বোরআন তেলাওয়াতকারীদের প্রতি সর্বদা আল্লাহর কৃপাদৃষ্টি থাকে

عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما اذن الله شیءٍ ما اذن نبی يتغنی بالقران [بخاری ومسلم]

অর্থাৎঃ হযরত আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসালাম এরশাদ করেন, মহান আল্লাহ তা'আলা এত অধিক মনযোগ কারো প্রতি দেননা, যতটুকু মনযোগের সাথে ওই নবীর আওয়াজ শুনে থাকেন, যিনি মধুর স্বরে ক্বোরআনুল করীম পাঠ করে থাকেন। [বোখারী, মুসলিম]

ক্বোরআনুল করীম উম্মতের জন্য সুপারিশকারী

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصِّيَامُ وَالْقُرْاٰنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَقُوْلُ الصِّيَامُ رَبِّ اِنِّیْ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ فِی النَّهَارِ فَشَفِّعْنِیْ فِيْهِ وَيَقُوْلُ الْقُرْاٰنُ اِنِّیْ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِیْ فِيْهِ فَيُشَفَّعَانِ ـ

অর্থাৎঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসালাম এরশাদ করেন, রোযা এবং ক্বোরআন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে রোযা বলবে, হে আমার রব! আমি তাকে দিনের বেলায় পানাহার থেকে বিরত রেখেছি। অতএব, তার ব্যাপারে তুমি আমার সুপারিশ কবূল করো। ক্বোরআনুল করীম বলবে, তাকে আমি রাতের বেলায় নিদ্রা হতে বিরত রেখেছি। কাজেই তার পক্ষে তুমি আমার সুপারিশ কবূল করো। সুতরাং (আল্লাহ তা'আলার দরবারে) উভয়ের সুপারিশ কবূল করা হবে। [মিশকাত শরীফ]

ক্বোরআনুল করীম শ্রবণেও ফযীলত রয়েছে

عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اسْتَمَعَ اِلٰی اٰيَةٍ مِّنْ كِتَابِ اللّٰهِ كُتِبَتْ لَهٗ حَسَنَةٌ مُضَاعَفَةٌ وَمَنْ تَلَاهَا كَانَتْ لَهٗ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ [رواه احمد]

অর্থাৎঃ হযরত আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসালাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মনযোগ সহকারে ক্বোরআনুল করীমের একটি আয়াত শ্রবণ করবে, তার জন্য দ্বিগুণ সাওয়াব লিখা হবে। আর যে ব্যক্তি স্বয়ং তিলাওয়াত করবে ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য তা নূর হবে। [আহমদ]

সূরা-ই ফাতেহা পাঠের ফযীলত

عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاُبَیِّ بْنِ كَعْبٍ كَيْفَ تَقْرَاُ فِی الصَّلٰوةِ فَقَرَاَ اُمَّ الْقُرْاٰنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِیْ نَفْسِیْ بِيَدِهٖ مَا اُنْزِلَتْ فِی التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَلَا فِی الزَّبُوْرِ وَلَا فِی الْقُرْاٰنِ مِثْلُهَا

অর্থাৎঃ হযরত আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত উবাই ইবনে কা'বকে বললেন, তুমি নামাযে কি পাঠ করেছো? তিনি বললেন, "সূরা-ই ফাতেহা পাঠ করেছি।" তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, "যার কুদরতের হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ করে বলছি, তাওরাত, ইঞ্জিল, যাবূর এমনকি ক্বোরআন শরীফেও এর মতো বরকতপূর্ণ সূরা আর অবতীর্ণ হয়নি। [তিরমিযী শরীফ]

সূরা ইয়াসীনের ফযীলত

عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِكُلِّ شَیْءٍ قَلْبٌ وَقَلْبُ الْقُرْاٰنِ يٰسٓ كَتَبَ اللّٰهُ لَهٗ بِقِرَاءَتِهَا قِرَاءَةَ الْقُرْاٰنِ عَشَرَ مَرَّاتٍ

অর্থাৎঃ হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, প্রত্যেক বস্তুর একটি প্রাণ রয়েছে, আর ক্বোরআনের প্রাণ হলো সূরা ইয়াসীন। অতএব যে ব্যক্তি সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে, তাঁর জন্য আল্লাহ তা'আলা দশবার পূর্ণ ক্বোরআন তেলাওয়াতের সাওয়াব লিপিবদ্ধ করবেন। [তিরমিযী শরীফ]

সূরা ইয়াসীন পাঠ করার দরুণ সকল চাহিদা পূর্ণ হয়

عَنْ عَطَاءِ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ بَلَغَنِىْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَأَ يٰسٓ فِىْ صَدْرِ النَّهَارِ قُضِيَتْ حَوَآئِجُهٗ

অর্থাৎঃ হযরত 'আত্বা ইবনে রাবাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি অবগত হলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, দিনের প্রথমাংশে যে সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে, তার সকল হাজত পূর্ণ হয়ে যাবে। [দারেমী শরীফ]

সূরা ইয়াসীন পাঠের দরুণ পূর্বাপর সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায়ঃ

عَنْ مَعْقَلِ بْنِ يَاسِرِ نِالْمُزَنِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَاَ يٰسٓ اِبْتِغَآءَ وَجْهِ اللّٰهِ تَعَالٰى غُفِرَلَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ فَاقْرَأُوْهَا عِنْدَ مَوْتٰكُمْ

অর্থাৎঃ হযরত মা'ক্বাল ইবনে ইয়াসের মুযানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে, তাঁর পূর্বাপর সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হবে। অতএব, তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের নিকটও তা পাঠ করো। [বায়হাক্বী]

সূরা আর্‌রাহমানের ফযীলত

عَنْ عَلِىٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لِكُلِّ عَرُوْسٌ وَعَرُوْسُ الْقُرْاٰنِ الرَّحْمٰنُ۔

অর্থাৎঃ হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করতে শুনেছি যে, প্রতিটি বস্তুর একটি বিশেষ সৌন্দর্য রয়েছে। আর ক্বোরআনের বিশেষ সৌন্দর্য হলো 'আররহমান।' [বায়হাক্বী]

সূরা ইখলাসের ফযীলত

عَنْ اَبِى الدَّرْدَآءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَدُكُمْ اَنْ يَقْرَءَ فِىْ لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ قَالُوْا وَكَيْفَ يَقْرَءُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنَ قَالَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ يَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ۔

অর্থাৎঃ হযরত আবূ দারদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, ''তোমাদের মধ্যে কেউ কি রাত্রিকালে ক্বোরআনের এক তৃতীয়াংশ পাঠ করতে পারে না?'' সাহাবীগণ আরয করলেন, ''ক্বোরআনের এক তৃতীয়াংশ কিভাবে পাঠ করা যায়?'' রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ (সম্পূর্ণ সূরা ইখলাস) ক্বোরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান। [বুখারী ও মুসলিম]

ক্বোরআন শিখে ভুলে যাওয়ার পরিণাম ভয়াবহ

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ اِمْرِءٍ يَقْرَءُ الْقُرْاٰنَ ثُمَّ يَنْسَاهُ اِلَّا لَقِىَ اللّٰهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَجْزَمَ۔

অর্থাৎঃ হযরত সা'ঈদ ইবনে উবাদাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ক্বোরআন শরীফ পড়ার পর ভুলে গেলো, সে ক্বিয়ামতের দিন কুষ্ঠরোগগ্রস্ত অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে।

ক্বোরআন পাঠ প্রসঙ্গে বুযুর্গদের বাণী

১. হযরত সুফিয়ান সাওরী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, যখন মানুষ ক্বোরআন পাঠ করে, তখন ফেরেশতাগণ তার দু'চোখের মাঝে চুম্বন করে।

২. হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, আল্লাহর শপথ, ক্বোরআনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ধন আর নেই, আর ক্বোরআনের অভাবের চেয়ে বড় আর কোন অভাব নেই।

৩. হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, তিনটি জিনিস স্মরণশক্তি বাড়ায় এবং শ্লেষ্মা দুর করে। তার একটি হল মিসওয়াক, দ্বিতীয়টি রোযা এবং তৃতীয়টি হল কুরআন তিলাওয়াত।

৪. ফুযাইল বিন আয়ায রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামাযের পর সূরা হাশরের শেষাংশ পাঠ করে, অতঃপর সেদিনই তার মৃত্যু হয়, তাকে শহীদের মোহর ছেপে দেওয়া হয়।

৫. হযরত আমর ইবনুল আস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, ক্বোরআনের প্রত্যেকটি আয়াত বেহেশেতের একেকটি দরজা এবং তোমাদের গৃহের একেকটি বাতি স্বরূপ।

৬. হযরত আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, যে ঘরে ক্বোরআন পাঠ করা হয়, সে ঘরে ফিরিশতাদের সমাবেশ ঘটে। শয়তান ও তার দলবল সে ঘর থেকে দূর হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যে ঘরে আল্লাহর ক্বোরআন পাঠ করা হয় না, সে গৃহবাসীর রিযক্ব সংকীর্ণ হয়ে যায়। তাদের উপর থেকে কল্যাণ হ্রাস পায়।

৭. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, আমি আল্লাহ তা'আলাকে স্বপ্নযোগে জিজ্ঞাসা করলাম, হে মাবুদ! তোমার নৈকট্য লাভ করার জন্য সর্বোত্তম বস্তু কোনটি? আল্লাহ তা'আলা জবাব দিলেন, ক্বোরআন।

৮. ক্বাসিম ইবনে আবদুর রহমান বলেছেন, আমি জনৈক আবিদকে জিজ্ঞেস করলাম, এখানে এমন কেউ আছে কি, যার সাথে আপনার বন্ধুত্ব আছে? আবেদ ব্যক্তিটি ক্বোরআন পাকের দিকে হাত বাড়িয়ে তা নিজের বুকে টেনে নিয়ে বললেন, হ্যাঁ এ ক্বোরআন রয়েছে।

কয়েকটি মাসআলা

১. নামাযের বাইরে কোন সূরার শুরুতে তিলাওয়াতের পূর্বে اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (আ'উযু বিল্লা-হি মিনাশ্ শায়ত্বা-নির রাজীম) পাঠ করা মুস্তাহাব এবং বিসমিল্লাহ পাঠ করা সুন্নাত। সূরার মধ্যভাগ থেকে তিলাওয়াতের সময় শুরুতে আ'উযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পাঠ করা মুস্তাহাব। [বাহারে শরীয়ত]

২. সম্পূর্ণ ক্বোরআন শরীফ মুখস্থ করা ফরযে কেফায়াহ এবং সূরায়ে ফাতেহা ও অন্য একটি ছোট সুরা অথবা তৎসমপরিমাণ তিনটি ছোট আয়াত অথবা একটি বড় আয়াত মুখস্থ করা ওয়াজিব।[বাহারে শরীয়ত]

৩. এ ز ج، ض د، ک ق ' ہ ح، ع ء ا، ظ ض، ذ، ط، ت، ص، س، ث হরফগুলোকে বিশুদ্ধভাবে সতর্কতার সাথে উচ্চারণ করতে হবে, নচেৎ নামায বিশুদ্ধ হবে না। [বাহারে শরীয়ত]

৪. আজকাল অধিকাংশ হাফেয ক্বোরআন মজীদ প্রতিযোগিতামূলকভাবে এতই দ্রুত তিলাওয়াত করে যে, শেষে تَعْلَمُوْنَ ও يَعْلَمُوْنَ ব্যতীত অন্য কিছু বুঝা যায় না, প্রতিটি হরফের যথাযথ উচ্চারণ হয় না। এভাবে ক্বোরআন মজীদ তেলাওয়াত করা হারাম। [বাহারে শরীয়ত, ৩য় খণ্ড, ৩১৫ পৃষ্ঠা]

৫. নামাযের বাইরে মুখস্থ পড়ার চেয়ে ক্বোরআন মজীদ দেখে দেখে পাঠ করা উত্তম, কেননা এতে পড়া ও দেখা উভয়টি পাওয়ায় যায় আবার হাতের স্পর্শও এতে বিদ্যমান, যার সব ক'টি কাজই ইবাদত। [বাহারে শরীয়ত]

-----<>-----

ফাযা-ইলে দুরূদ শরীফ

মহান আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন-

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

তরজমাঃ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর ফিরিশতাগণ দুরূদ প্রেরণ করেন ওই অদৃশ্যবক্তা (নবী)'র প্রতি; হে ঈমানদারগণ, তাঁর প্রতি দুরূদ ও খুব সালাম প্রেরণ করো। [সূরা আহযাব, আয়াত- ৫৬]

এ পবিত্র আয়াতে মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ওই মহান মর্যাদার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, যা তাঁর নিকটও সর্বোচ্চ স্থানে সংরক্ষিত। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীবের প্রশংসা ও গুণগান মর্যাদাময় স্থানে করছেন এবং তাঁর উপর রহমত প্রেরণ করছেন। ফিরিশতাগণও রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মহত্ব বর্ণনা করেছেন। অতএব, মুসলমানদেরও এরূপ মর্যাদাসহকারে দুরূদ সালাম প্রেরণ করা উচিত।

পৃথিবীর প্রতিটি বস্তু আল্লাহ তা'আলার গুণগান করে; কিন্তু স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করেন, একারণেই দুরূদ শরীফ পাঠ করা একটি শ্রেষ্ঠ ইবাদত। হযরত সাহ্ল ইবনে সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন-

اَلصَّلٰوةُ عَلَى النَّبِيِّ اَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ لِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى....... ها هو وَمَلٰئِكَتَهٗ ثُمَّ اَمَرَبِهَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَسَآئِرُ الْعِبَادَاتِ لَيْسَ كَذَالِكَ يَعْنِىْ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَمَرَ بِسَآئِرِ الْعِبَادَاتِ وَلَمْ يَفْعَلْهُ بِنَفْسِهٖ

অর্থাৎঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা সকল ইবাদতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কেননা আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং তা পাঠ করছেন এবং ফেরেশতাগণও। অতঃপর সকল ঈমানদারগণকেও পাঠের আদেশ দিয়েছেন।কিন্তু অন্যসব ইবাদত এরূপ নয়। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সকল ইবাদত সম্পাদনের হুকুম দিয়েছেন, তিনি নিজে কিন্তু সম্পাদন করেন না।" যেমন তিনি নামাযের আদেশ দিয়েছেন ঠিক, কিন্তু তিনি নিজে নামায পড়েন না। রোযা, হজ্জ্ ও যাকাত ইত্যাদির আদেশ দিয়েছেন; কিন্তু নিজে সম্পাদন করেন না। আর দুরূদ শরীফ হলো এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। দুরূদ শরীফ তিনি নিজেও পাঠ করেন এবং বান্দাদেরকেও পাঠ করার হুকুম দিয়েছেন। [তাফসীরে রুহুল বয়ান]

সর্বাপেক্ষা বড় কৃপণ

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আমি কি তোমাদেরকে সর্বাপেক্ষা বড় কৃপণ সম্পর্কে সংবাদ দেবো? সে হচ্ছে-

مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهٗ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَىَّ

অর্থাৎ যার নিকট আমার আলোচনা করা হয়েছে অতঃপর সে আমার উপর দুরূদ পাঠ করল না। [তিরমিযী শরীফ, পৃষ্ঠা-৮৭]

দীদার থেকে বঞ্চিত

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা একদা সাহরীর সময়ে একটি কাপড় সেলাই করছিলেন। এমন সময়ে হঠাৎ সুঁচটি হাত থেকে পড়ে গেলো এবং ঘরের বাতিটিও নিভে গেলো। এদিকে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত আশেয়া ছিদ্দীক্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার হুজরায় প্রবেশ করলেন। ফলে তাঁর নূরানী চেহারার আলোয় সমস্ত ঘর এমনভাবে আলোকিত হয়ে গিয়েছিলো যে, হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা সুঁচটি খুঁজে পেয়েছিলেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলেন, আপনার চেহারা মুবারকের নূর কতবেশী সমুজ্জ্বল! তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন- وَيْلٌ لِّمَنْ لَا يَرَانِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ অর্থাৎ আফফোস! ওই ব্যক্তির জন্য, যে আমাকে ক্বিয়ামত দিবসে দেখতে পাবে না! [আল-ক্বওলুল বদী'; পৃষ্ঠা-১৪৮]

হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, ওই হতভাগা ব্যক্তি কে, যে ক্বিয়ামতের দিন আপনার দীদার থেকে বঞ্চিত হবে? হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, সে হলো কৃপণ। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বললেন, "কৃপণ কে?"

قَالَ الَّذِىْ لَا يُصَلِّىْ عَلَىَّ اِذَا سَمِعَ بِاِسْمِىْ

অর্থাৎঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, প্রকৃত কৃপণ ওই ব্যক্তি, যে আমার নাম শ্রবণ করার পর আমার উপর দরূদ পাঠ করলো না।
[আল-ক্বওলুল বদী'; পৃষ্ঠা- ১৪৭]

রাসূলের নাম শুনে দরূদ না পড়ার কারণে প্রিয় নবীর অভিশাপ

হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা হতে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম একদিন মিম্বর শরীফে তাশরীফ রাখছিলেন। যখন তিনি মিম্বরের প্রথম

ধাপে আরোহন করলেন, তখন বললেন, "আমীন" (হে আল্লাহ কবূল করুন!) যখন দ্বিতীয় ধাপে পা মুবারক রাখলেন, তখন আবার বললেন, "আ-মী-ন"। যখন তৃতীয় ধাপে পা মুবারক রাখলেন, তখন আবারও বললেন, "আ-মী-ন"।

অতঃপর সাহাবা-ই কেরাম আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আজ মিম্বরে আরোহনের সময় তিনবার 'আ-মী-ন' বলেছেন, তার প্রকৃত রহস্য বা কারণ কি? তখন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, যখন আমি মিম্বরের ১ম ধাপে পা রেখেছি, তখন জীব্রাঈল আমীন উপস্থিত হয়ে আরয করলো, ওই ব্যক্তি ধ্বংস হোক, যে রমযান মাস পেয়ে তার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে নিজের পাপ ক্ষমা করাতে পারলো না। তখন আমি বললাম, "আ-মী-ন ।" অতঃপর আমি যখন দ্বিতীয় ধাপে আরোহণ করছিলাম, তখন জীব্রাঈল আমার পাশে দাঁড়িয়ে বলছিলো, "ওই ব্যক্তি ধ্বংস হোক, যে তার বৃদ্ধ মা-বাবাকে পাওয়ার পর তাদের খেদমতের মাধ্যমে জান্নাত লাভ করতে পারলো না। তখন আমি 'আ-মী-ন" বললাম। আমি তৃতীয় ধাপে আরোহণের সময় জীব্রাঈল (আলায়হিস সালাম) বলছিলো, ধ্বংস হোক ওই ব্যক্তি- ذُكِرْتَ عِنْدَهٗ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَقُلْتُ اٰمِيْنَ যার নিকটে আপনার আলোচনা করা হয়েছে, তবুও সে আপনার প্রতি দুরূদ পাঠ করলো না, (প্রিয় নবী বললেন) তখন আমি বললাম, "আ-মী-ন"।

জান্নাতের পথ ভুলে যাবে

হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

مَنْ نَسِىَ الصَّلَوٰاتِ عَلَىَّ نَبِىَ طَرِيْقَ الْجَنَّةِ

অর্থাৎঃ যে ব্যক্তি আমার উপর দুরূদ পাঠ করতে ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তাও ভুলে যাবে। [আল-ক্বওলুল বদী' পৃষ্ঠা-১৪৫]

আল্লামা আবদুর রহমান সফূরী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, কতেক লোককে ক্বিয়ামতের দিনে জান্নাতে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হবে; কিন্তু তারা জান্নাতের পথ ভুলে যাবে। আরয করা হলো? হে আল্লাহর রাসূল! ওইসব লোক কারা?

قَالَ سَمِعُوْا بِاِسْمِىْ وَلَمْ يُصَلُّوْا عَلَىَّ

অর্থাৎ হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, যারা আমার নাম শুনেছে, কিন্তু আমার উপর দরূদ পাঠ করে নি। [নুযহাতুল মাজালিস]

সকল দো'আ বা আবেদন ঝুলন্ত থাকে

বান্দা যখন আল্লাহর দরবারে দো'আ করে, তখন ওই দো'আ আল্লাহর দরবারে উপস্থাপিত হয়। অতঃপর আল্লাহর ইচ্ছা হলে তা ক্বূবল করেন অথবা করেন না। কিন্তু ওই দো'আ, যা'তে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করা হয়নি, ওই দো'আ ক্বূবল হওয়াতো অনেক দূরের কথা; তা আল্লাহর দরবারে উপস্থাপিতও হয় না; অর্থাৎ পৌঁছেও না।

হযরত ওমর ফারূক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত-

اِنَّ الدُّعَآءَ مَوْقُوْفٌ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتّٰى تُصَلِّيَ عَلٰى نَبِيِّكَ

অর্থাৎ নিঃসন্দেহে প্রত্যেক দো'আ আসমান ও যমীনের মধ্যখানে ঝুলন্ত থাকে, তা থেকে কিছুই উপরে আরোহণ করে না, যতক্ষণ না তুমি তোমার নবীর উপর দুরূদ শরীফ পড়বে।

প্রিয় নবীর সর্বাধিক নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً

অর্থাৎ ক্বিয়ামতের দিনে আমার সর্বাপেক্ষা নিকটতম ওই ব্যক্তিই হবে, যে আমার উপর অধিক হারে দুরূদ পাঠ করে। [তিরমিযী, পৃষ্ঠা-৬৪, ১ম খণ্ড]

হযরত সিদ্দীক্বে আকবর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করতে শুনেছি-

مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ كُنْتُ شَفِيْعَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থাৎ যে আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করবে, আমি ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য সুপারিশকারী হবো। [আল-ক্বওলুল বদী' পৃষ্ঠা- ১২১]

অন্তরের পরিচ্ছন্নতা

দুরূদ শরীফ পাঠ করলে অন্তরের মরিচা বা কালিমা দূর হয়ে যায় এবং গুনাহ্র কাফ্ফারা হয়। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

صَلُّوْا عَلَيَّ فَاِنَّ الصَّلٰوةَ عَلَيَّ كَفَّارَةٌ لَّكُمْ وَزَكَاةٌ

অর্থাৎ তোমরা আমার উপর দুরূদ পাঠ করো। কেননা আমার উপর দুরূদ পাঠ করাই তোমাদের জন্য গুনাহ্র কাফ্ফারা এবং (অভ্যন্তরীণ) পবিত্রতা হবে। [আল-ক্বওলুল বদী' পৃষ্ঠা- ১০৩]

অপর বর্ণনায় আছে-

لِكُلِّ شَيْءٍ طَهَارَةٌ وَغَسْلٌ وَطَهَارَةُ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنَ الصَّدَآءِ الصَّلٰوةُ ـ

অর্থাৎঃ প্রত্যেক জিনিসের জন্য রয়েছে পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা। আর মু'মিনদের অন্তরের মরিচা দূর করার মাধ্যম হল আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করা।

গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়

বর্ণিত আছে যে, আরশের নিচে লিখা আছে যে, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, যে আমার সন্তুষ্টি কামনা করে, আমি তাকে দয়া করি। আর যে আমার কাছে চায়, আমি তাকে দান করি এবং যে আমার মাহবূব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দুরূদ পাঠ করে সে আমার নৈকট্য অর্জন করতে চায়।

غَفَرْتُ لَهٗ ذُنُوْبَهٗ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدَةِ الْبَحْرِ

আমি তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেবো, যদিও তার গুনাহ সমুদ্রের ফেনার সমপরিমাণ হয়। [দালা-ইলুল খায়রাত, পৃষ্ঠা- ১৩]

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَيَنْظُرُ اِلٰى مَنْ يُّصَلِّيْ عَلَيَّ مَنْ نَظَرَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِلَيْهِ لَا يُعَذِّبُهٗ اَبَدًا

অর্থাৎ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা ওই ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টি দেন, যে আমার প্রতি দুরূদ শরীফ পাঠ করে। আর যে ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ তাঁর ক্বুদরতের দৃষ্টি দান করেন, তাঁকে কখনো আযাব প্রদান করবেন না।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার উপর অধিক হারে দুরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার মৃত্যুর সময়ে আল্লাহ তা'আলা সকল সৃষ্টিকে আহবান করে বলবেন, হে আমার সৃষ্টিকুল, এ বান্দার মাগফিরাতের জন্য তোমরা দো'আ করো। [নুজহাতুল মাজালিস, পৃষ্ঠা- ১১০]

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ فِيْ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ لَمْ يَمُتْ حَتّٰى يَرٰى مَقْعَدَهٗ مِنَ الْجَنَّةِ

অর্থাৎঃ যে ব্যক্তি প্রতিদিন আমার উপর এক হাজার বার দুরূদ শরীফ পাঠ করবে, ওই মুহূর্ত পর্যন্ত তার মৃত্যু হবে না, যতক্ষণ না সে বেহেশতে তার ঠিকানা দেখতে পায়। [আল-ক্বওলুল বদী' পৃষ্ঠা- ১২৬]

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثَمَانِيْنَ مَرَّةً غُفِرَتْ ذُنُوْبُهٗ ثَمَانِيْنَ سَنَةً

অর্থাৎ যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন ৮০ বার আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার ৮০ বছরের গুনাহ্ মাফ করে দেওয়া হবে। [দালা-ইলুল খায়রাত]

দুরূদ শরীফ নূর-ই

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

زَيِّنُوْا مَجَالِسَكُمْ بِالصَّلٰوةِ عَلَيَّ فَاِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ نُوْرٌ لَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থাৎ তোমরা তোমাদের সমাবেশকে আমার উপর দুরূদ পাঠ করার মাধ্যমে সৌন্দর্যমণ্ডিত করো। নিঃসন্দেহে আমার উপর দুরূদ পাঠ করা ক্বিয়ামতের দিনে তোমাদের জন্য নূর হবে।

হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠকারীদের জন্য পুলসিরাত্বে নূর থাকবে; لَمْ يَكُنْ مِنْ اَهْلِ النَّارِ সে দোযখবাসী হবে না। [দালা-ইলুল খায়রাত]

দশটি গুনাহ মাফ হয়ে যায়

عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلٰوةٍ وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيَّاتٍ وَرُفِعَتْ لَهٗ عَشْرُ دَرَجَاتٍ

অর্থাৎ হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর দশটি রহমত বর্ষণ করেন, দশটি গুনাহ ক্ষমা করেন এবং দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন।

[মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা- ৮৭]

সত্তরবার ফেরেশতা রহমত বর্ষণ করেন

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ مَنْ صَلّٰى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمَلٰئِكَتُهٗ سَبْعِيْنَ صَلٰوةً

অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে একবার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর ফেরেশতাগণ সত্তর বার তার উপর রহমত বর্ষণ করেন।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুর রহমান ইবনে 'আউফ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম জনপদ হতে বের হলেন, এক পর্যায়ে একটি খেজুর বাগানে প্রবেশ করলেন। অতঃপর সাজদায় রত হলেন এবং এত দীর্ঘ সময় সাজদারত হলেন যে, আমি মনে ভয় করেছিলাম, না জানি আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীবকে

এ ক্ষণস্থায়ী জগত থেকে স্থায়ী জগত তথা জান্নাতে তুলে নিলেন কিনা। হাদীস বর্ণনাকারী আবদুর রহমান ইবনে 'আউফ বলেন, আমি তাঁকে দেখতে দেখতে নিকটে আসলাম, এমতাবস্থায় হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পবিত্র মস্তক ওঠালেন এবং বললেন, তোমার কী হয়েছে, কী দেখছো? উত্তরে আমি আমার উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার কথা আরয করলাম। আবদুর রহমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, অতঃপর তিনি এরশাদ করলেন, হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম আমাকে বলেছেন, আপনাকে কি এমন একটি সুসংবাদ দেবোনা, যা মহান আল্লাহ তা'আলা আপনার সম্পর্কে বলেছেন? যে ব্যক্তি আপনার প্রতি দুরূদ শরীফ পাঠ করবে, আমি তার প্রতি রহমত নাযিল করবো এবং যে আপনার প্রতি সালাম পাঠাবে আমি তাঁর প্রতি শান্তি বর্ষণ করবো। [মুসনাদে ইমাম আহমদ]

উম্মতের দুরূদ রাসূল স্বয়ং শ্রবণ করেন

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, কোন এক সাহাবী রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র দরবারে আরয করলেন, "হে আল্লাহর রাসুল! ওই সব ব্যক্তির দুরূদ শরীফ সম্বন্ধে বলুন, যাঁরা আপনার কাছ থেকে অনুপস্থিত বা দূরে অবস্থান করে।" অর্থাৎ-আপনার পবিত্র জীবদ্দশায় আপনার প্রতি দুরূদ প্রেরণ করবে এবং ভবিষ্যতে ওফাত শরীফের পরও দুরূদ প্রেরণ করবে। আপনার নিকট এ দু'দলের কী অবস্থা হবে? তদুত্তরে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন-

اَسْمَعُ صَلٰوةَ اَهْلِ مُحَبَّتِيْ وَاَعْرِفُهُمْ وَتُعْرَضُ عَلَيَّ صَلٰوةُ غَيْرِهِمْ عَرْضًا

অর্থাৎ আমার প্রতি মুহব্বত ও ভালবাসাসম্পন্নদের দরূদ শরীফ কোন প্রকার মাধ্যম ছাড়াই আমি স্বয়ং শ্রবণ করি এবং তাদেরকে আমি চিনি। এছাড়া অন্যান্যদের দুরূদ ফিরিশতাদের মাধ্যমে আমার নিকট পেশ করা হয়।

[দালা-ইলুল খায়রাত]

কতিপয় ঘটনার আলোকে দুরূদ শরীফের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

এক

হযরত ইমাম সাখাভী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেন, মুহাম্মদ ইবনে সা'দ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি সর্বদা শয়ন করার পূর্বে সুনির্দিষ্ট সংখ্যক দরূদ শরীফ পাঠ করতেন। তিনি বলেন, এক রাতে আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখি যে, তিনি আমার ঘরকে সমুজ্জ্বল ও আলোকিত করেছেন এবং আমাকে সম্বোধন করে বললেন, "যে মুখ দিয়ে তুমি আমার প্রতি দুরূদ শরীফ পাঠ করো, ওই মুখ আমার নিকটবর্তী করো, যাতে আমি চুম্বন করতে পারি। তিনি

বলেন, আমি স্বীয় মুখ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র মুখমণ্ডলের নিকটবর্তী করতে লজ্জাবোধ করছি। অতঃপর আমি স্বীয় মুখকে তাঁর পবিত্র অবয়বের সন্নিকটে নিয়ে গেলাম, তখন তিনি এর ওপর সদয় চুম্বন করলেন।'' আমি যখন জাগ্রত হলাম, তখন আমার সমগ্র ঘর মুশকের সুগন্ধে সুবাসিত ছিলো এবং আট দিন পর্যন্ত ওই সুগন্ধি বিরাজিত ছিলো। আর আমার মুখমণ্ডলও অনুরূপ আট দিন পর্যন্ত সুবাসিত ছিলো।

দুই

একদা আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম-এর প্রতি ওহী অবতীর্ণ করলেন, "তুমি কি ইচ্ছে করো যে, তোমার জিহ্বার সাথে তোমার কথার যে সম্পর্ক, আমি তার থেকেও তোমার অধিক নিকটবর্তী এবং তোমার বিপদ-আপদে তোমার ও তোমার অন্তরের সাথে, তোমার আত্মা ও তোমার শরীরের সাথে এবং তোমার দৃষ্টি ও তোমার চোখের সাথে যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে তার চেয়েও অধিক নিকটবর্তী হই?" উত্তরে তিনি বললেন, "হ্যাঁ"। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, ''তুমি আমার প্রিয় হাবীব মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি অসংখ্য দরূদ শরীফ প্রেরণ করো, যাতে তুমি এ সৌভাগ্য ও নৈকট্য অর্জন করতে পারো।''

তিন

কথিত আছে যে, হজ্জের মৌসুমে লোকেরা এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলো যে, তিনি তাওয়াফ, সা'ঈ এবং হজ্জের সমুদয় প্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পাদনের সময় সংশ্লিষ্ট স্থানগুলোতে দো'আ-ই মাসূরার স্থলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করছেন। এমতাবস্থায় লোকেরা তাকে বললো, আপনি দো'আ-ই মাসূরাহ্, হাদীসসমূহের দো'আসমূহ কেন পড়ছেন না? তিনি বললেন, আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে, দুরূদ শরীফে অন্য কোন কিছুকে শরীক করবো না। কারণ আমার পিতা যখন ইন্তিকাল করেন, তখন তার মুখমণ্ডল গাধার চেহারায় রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিলো। এতদ্দর্শনে আমি অত্যন্ত চিন্তিত ও শোকাহত হয়ে পড়লাম। এমতাবস্থায় আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। আমি নিদ্রায় হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দেখে অতি দ্রুত গিয়ে তাঁর আঁচল মুবারক আঁকড়ে ধরলাম এবং আমার পিতার জন্যে সুপারিশের আবেদন করলাম এবং তাঁর এ অবস্থার কারণ সম্পর্কে জানতে চাইলাম। তখন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, সে সুদ্খোর ছিলো এবং যে ব্যক্তি সুদখোর হবে ইহকাল এবং পরকালে তার শাস্তি এরূপ হবে। কিন্তু তোমার পিতা শয়নকালে আমার প্রতি ১০০ বার দুরূদ শরীফ পাঠ করতো বিধায় আমি তার জন্যে

সুপারিশ করেছি, যা ক্ববূল করা হয়েছে। অতঃপর আমি জাগ্রত হয়ে আমার পিতার চেহারা দেখলাম সেটা চৌদ্দ তারিখের পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় ধবধবে এবং সমুজ্জ্বল হয়ে গেছে। তাকে দাফন করার প্রাক্কালে অদৃশ্য হতে আমি আওয়াজ শুনতে পেলাম, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলা দয়া ও অনুগ্রহ করেছেন এবং রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি সালাত ও সালাম পেশ করার দরুণ তাকে ক্ষমা করা হয়েছে।

চার

হযরত ওমর ফারূক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন, একদা আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দাওয়াত করি। খাবারের জন্যে বাজার থেকে একটি মাছ ক্রয় করা হলো। এখন উক্ত মাছ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে হাঁড়িতে রাখা হলো এবং রান্নার জন্য আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হলো। তখন শত চেষ্টা করেও মাছটি সামান্য পরিমাণও রান্না করা গেলো না। এমতাবস্থায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনয়ন করলে সব ঘটনা তাঁর নিকট আরয করলাম। তিনি বললেন, "এ মাছটি সমুদ্রের একজন জাহাজ আরোহী ব্যবসায়ীর নিকট দুরূদ শরীফ শ্রবণ করছিলো; এজন্য উক্ত মাছকে আগুন জ্বালাচ্ছে না।''

পাঁচ

মাওলানা রূমী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি 'মসনবী শরীফে' উল্লেখ করেছেন, একদা নবীকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মৌমাছিদের বললেন, ''তোমরা প্রত্যেক প্রকারের ফুল থেকে রস আহরণ করো। এতে কিছু মিষ্ট, কিছু তিক্ত এবং কিছু টকও রয়েছে। এতদসত্ত্বেও সমুদয় রস কীভাবে মিষ্ট হয়ে মধুতে পরিণত হয়?''

মৌমাছিরা আরয করলো, "হে সমগ্র সৃষ্টির পথ প্রদর্শক! আমরা ফুল হতে রস আহরণ করে ঘরে প্রত্যাবর্তন করা অবধি আপনার প্রতি দুরূদ শরীফ পাঠ করে থাকি । সমুদয় রস এরই বদৌলতে সুমিষ্ট মধু হয়ে যায়।"

گفت چوخوانیم براحمد درود + می شود شیرین تلخی رار بود

উচ্চারণঃ গোফ্‌ত চূঁ খা-নেম বর আহমদ দুরূদ + মী-শাওয়াদ শীরীন তলখীরা রবূদ! অর্থাৎ যখন আমরা হযরত আহমদ মুজতাবা মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করি, তখন তা মিষ্ট হয়ে যায় এবং তিক্ততা চলে যায়।

ছয়

একদা এক ব্যক্তি অভিশপ্ত আবূ জাহ্ল থেকে কিছু ভিক্ষা চেয়েছিল, আবূ জাহ্ল ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করে ওই ব্যক্তিকে বললো, ‘‘শেরে খোদা আলীর নিকট যাও, তিনি একজন অর্থশালী ব্যক্তি, অবশ্যই তোমাকে কিছু না কিছু দান করবেন।’’ অতএব, সে হযরত আলীর মহান দরবারে উপস্থিত হয়ে কিছু সাহায্য প্রার্থনা করলো; অথচ প্রকৃত অবস্থা এ ছিলো যে, ওই সময় হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু-এর নিকট প্রার্থনাকারীকে দেওয়ার মত কিছুই ছিলো না। সুবহানাল্লাহ! আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উম্মতের ওলীগণের শান-মান, মর্যাদা এ যে, শাহে বেলায়ত হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু বললেন, ‘‘হে ভিক্ষুক! তোমার হাত আমার দিকে প্রসারিত করো।’’ সে তার হাত পেশ করলো। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু তিনবার দরূদ শরীফ পাঠ করে বললেন, ‘‘এ মাটিকে মুষ্ঠিতে শক্তভাবে ধরো এবং আবূ জাহ্লের সামনে গিয়ে খুলবে।’’ ওদিকে আবূ জাহ্ল এ ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে হাসি ও বিদ্রূপ করছিলো। ভিক্ষুক আবূ জাহ্লের নিকট আসলে সে বললো, ‘‘মুষ্ঠি খোল।’’ সে মুষ্ঠি খুলে দেখলো ওই মাটিগুলো তার হাতে মণি-মুক্তায় পরিণত হয়ে আছে। আবূ জাহ্ল এবং মক্কার কাফিররা এ অবস্থা দেখে হতভম্ব হয়ে গেলো এবং বিদ্রুপকারীদের মুখ থুবড়ে পড়লো।

দরূদ শরীফ সম্পর্কিত কতিপয় মাসআলা

যখন ও যেখানে দরূদ শরীফ পাঠ করা মুস্তাহাব

১. জুমু‘আর রাতে বা জুমু‘আর দিনে, ২. যখন প্রিয় নবীর পবিত্র নাম মুখে উচ্চারিত হবে এবং কানে শুনবে, ৩. যখন কোন বৈঠকে বসবে, ওঠার পূর্বে দরূদ শরীফ পাঠ করা ৪. দো‘আর শুরু এবং শেষে পাঠ করা, ৫. মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার প্রাক্কালে, ৬. আযানের পরে, ৭. ওযূর পর, ৮. হুযূর সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র রওযা শরীফ যিয়ারতের সময়, ৯. প্রত্যেহ সকাল-সন্ধ্যায়, ১০. সাফা-মারওয়া পাহাড় দু’টির নিকটে, ১১. জুমু‘আর খুৎবায়, ১২. যখন অদৃশ্য ধ্বনি কানে আসে, ১৩. লিখার প্রারম্ভে, ১৪. তাহাজ্জুদের সময়, ১৫. যখন কোন বিষয় ভুলে যায়, ১৬. ওয়ায-নসীহতের সময়, ১৭. বিবাহের সময় এবং ১৮. পাঠ অধ্যয়ন ও পাঠ দানকালে ইত্যাদি।

-----<>-----

যিক্রের ফযীলত

যিক্রের মমার্থ হলো বারংবার স্মরণ করা। আল্লাহ তা‘আলার প্রশংসাবলী অন্তরে বা মুখে উচ্চারণ করার নাম যিক্রে ইলাহী বা আল্লাহর যিক্র। আল্লাহর যিক্র দ্বারা মানুষের ঈমানের জ্যোতি বৃদ্ধি পায়, অন্তরে প্রশান্তি আসে এবং কৃত কর্মেও দৃঢ়তা সৃষ্টি হয়। এ কারণে মুসলমান নর-নারীর সর্বদা আল্লাহর যিক্র করা উচিত। আল্লাহ্র স্মরণ হলো মানুষের জীবনের মূল উদ্দেশ্য এবং তা ইবাদতের প্রাণ। সুতরাং ইবাদতের প্রাণ সচল রাখার নিমিত্তে আল্লাহর যিক্র একান্ত প্রয়োজন।

পবিত্র ক্বোরআনের আলোকে যিক্র-ই ইলাহীর গুরুত্ব ও তাৎপর্য

١ . فَاذْكُرُوْنِىْ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْالِىْ وَلَا تَكْفُرُوْنَ [بقرة]

তরজমাঃ সুতরাং আমার স্মরণ করো, আমিও তোমাদের চর্চা করবো। আর আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করো এবং আমার প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়ো না।

[সূরা বাক্বারাহ, আয়াত ১৫২, তরজমা- কানযুল ঈমান]

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, আল্লাহ আমাদের জন্য বড়ই সহজতর করে দিয়েছেন যে, আল্লাহর যিক্রের জন্য কোন নির্দিষ্ট স্থান নির্ধারণ করে দেননি। যদি আল্লাহ তা‘আলা যিক্রের জন্য কোন স্থান নির্ধারিত করে দিতেন তাহলে সে স্থানে গিয়েই আল্লাহর যিক্র করা আবশ্যক হতো। অতএব, তোমরা এর জন্য আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করো এবং সদা তাঁর যিকর করো।

٢ . يَآاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا

তরজমাঃ হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে অধিক স্মরণ করো।[সূরা আহযাব ঃ আয়াত- ৪১]

উক্ত আয়াতে **ذكـــر كثيـــر** (যিক্রে কসীর) দ্বারা উদ্দেশ্য হল আল্লাহ তা‘আলাকে অধিক স্মরণ করা। অতএব, মহান আল্লাহকে প্রতিনিয়ত স্মরণ করার অপরিহার্যতা এ আয়াত থেকে বুঝা যায়। সুতরাং প্রত্যেক বান্দার প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহ তা’আলার যিক্র করা উচিত।

٣. وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ

তরজমাঃ নিশ্চয় আল্লাহর স্মরণ- সর্বাপেক্ষা বড় এবং আল্লাহ জানেন যা তোমরা করো। [সূরা আনকাবুত, আয়াত- ৪৫, তরজমা- কানযুল ঈমান]

আলোচ্য আয়াতে ‘যিকরুল্লাহ’ দ্বারা হয়তো নামায বুঝায়, অর্থাৎ সমস্ত ইবাদতের মধ্যে নামায হলো উত্তম ইবাদত। অথবা এখানে আল্লাহর সাধারণ যিক্র বুঝানো উদ্দেশ্য। কেননা, সমস্ত ইবাদতের বিনিময় হল জান্নাত। আর আল্লাহর যিক্রের

বিনিময় হচ্ছে যিক্রই। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, তোমরা আমাকে স্মরণ করো আমি তোমাদের স্মরণ করবো। [সূরা-২, আয়াত- ১৫২]

৪. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ

তরজমাঃ আপন রবকে খুব স্মরণ করো, আর বিকেলে ও প্রভাতে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করো। [সূরা আলে ইমরান- ৪১, তরজমা- কান্‌যুল ঈমান]

উক্ত আয়াতেও আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ অধিক পরিমাণে আল্লাহর স্মরণ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন; বিশেষ করে বিকেলে ও প্রভাতে। যদিও তাসবীহ তাহলীল, তথা আল্লাহর সমুদয় যিকর সব সময় উত্তম, কিন্তু বিশেষ করে প্রভাত ও বিকেলে বেশী ভাল। কেননা, এ দু'টি সময়ে দিন ও রাতের ফিরিশতারা একত্রিত হন। মহান আল্লাহ এরশাদ করেন-

৫. اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا

তরজমাঃ নিঃসন্দেহে ভোরের ক্বারআন তেলাওয়াতে ফিরিশতাগণ হাযির হয়। (তখন সমস্ত সৃষ্টি বিশেষ করে আল্লাহকে স্মরণ করে।)

[সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত-৭৮, তরজমা কান্‌যুল ঈমান, সূত্রঃ তাফসীর-ই নূরুল ইরফান]

৬. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا۔

তরজমাঃ নিশ্চয় তোমাদের জন্য রাসূলের অনুসরণ উত্তম, তারই জন্য, যে আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে খুব স্মরণ করে।

[সূরা আহযাব ঃ আয়াত-২১, তরজমা, কান্‌যুল ঈমান]

উপরোক্ত আয়াত শরীফ দ্বারা বুঝা গেলো যে, কোন কোন অবস্থায় নীরবে যিক্র করা উচ্চস্বরে যিক্র করা অপেক্ষা উত্তম। কেননা, তাতে রিয়া বা লোক দেখানোর সম্ভাবনা থাকে না। তাছাড়া ক্বোরআন শোনার সময় যদি আল্লাহর যিক্র করতে হয়, তবে আওয়াজ সহকারে করো না; বরং নীরবে করো। এটাই আয়াতের মমার্থ। যদি এসব কারণ না থাকে তবে উচ্চস্বরে যিক্র করা উত্তম।

[তাফসীর-ই নূরুল ইরফান]

আয়াতের শেষাংশে মহান আল্লাহ বিকেলে, প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায় যিকরের নির্দেশ দিয়েছেন। যেহেতু ফজর ও আসরের পর নফল নামায পড়া নিষিদ্ধ, যেহেতু ওই সময় দু'টিতে আল্লাহর যিকরের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে, যাতে মু'মিনের কোন সময় উদাসীনতায় অতিবাহিত না হয়।

৭. اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ

তরজমাঃ যারা আল্লাহর স্মরণ করে দাঁড়িয়ে, বসে এবং করটের উপর (শুয়ে)।

[সূরা আলে ইমরান-১৯১]

উপরোক্ত আয়াতের সাথে তার পূর্বোক্ত আয়াতের একটি যোগসূত্র রয়েছে। পূর্বোক্ত আয়াতে বিবেকবান মানুষের আলোচনা করা হয়েছে আর আলোচ্য আয়াতে বিবেকবান মানুষের স্বরূপ বর্ণনা করেছেন। আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বিবেকবান হচ্ছে ওই ব্যক্তি, যে আপন জীবন আল্লাহর স্মরণের মধ্যে অতিবাহিত করে; যদিও দুনিয়াবী সম্পদ বেশী উপার্জন করে না। উপরোক্ত আয়াত দ্বারা এটাও সুস্পষ্টভাবে বুঝা গেলো যে, আল্লাহর যিক্র সর্বাবস্থায় করা যায়। একারণে আল্লাহর যিকরের জন্য ওযূ ইত্যাদির শর্তারোপ করা হয়নি।

৮. وَمَنْ يُّعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهٖ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا

তরজমাঃ এবং যে ব্যক্তি আপন রবের স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকবে, তাকে তিনি ক্রমবর্ধমান শাস্তির মধ্যে নিক্ষেপ করবেন। [সূরা জিনঃ আয়াত ঃ ১৭]

এ আয়াতে আল্লাহ্‌র যিক্র থেকে উদাসীন হওয়ার প্রতিফল বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তার যিক্র থেকে উদাসীন ব্যক্তিদের এমন শাস্তিতে নিপতিত করবেন, যা প্রতিটি মুহূর্তে বৃদ্ধিই পেতে থাকবে, কখনো লঘূ বা হালকা হবে না। দুনিয়ার কষ্ট প্রথমে বেশী অনুভূত হয়, তারপর কমে আসে।

৯. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا

তরজমাঃ এবং আপন রবের নাম স্মরণ করুন। আর সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁরই দিকে মনোনিবেশ করুন। [সূরা মুয্‌যাম্মিল ঃ আয়াত - ৮]

আলোচ্য আয়াত শরীফের পূর্বাপর আয়াতগুলোর নিরিখে এ কথা বুঝা যায় যে, নামায ছাড়া অন্যান্য সময়েও আল্লাহকে স্মরণ করুন। নামায ছাড়াও আপনার জীবনের ধরন এমনি হোক যে, আপনার হাতে থাকবে কাজ আর হৃদয়ে থাকবে আল্লাহর স্মরণ। আপনার অন্তরে মহান রব ব্যতীত অন্য কিছু থাকবে না। সুতরাং 'সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে' দ্বারা সংসার ত্যাগের বৈধতা প্রমাণিত হয় না। আয়াতের এটাই প্রকৃত মমার্থ।

১০. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ ۙ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ

তরজমাঃ সুসংবাদ শুনিয়ে দিন ওই বিনীত লোকদেরকে (যারা এমন সব লোক) যে, যখন আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয় তখন তাদের হৃদয় ভয়ে কম্পিত হতে থাকে।

[সূরা হজ্জ্ ঃ আয়াত- ৩৫]

আল্লাহর যিক্র দ্বারা মানুষের অন্তরে মহান আল্লাহর প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও ভয়ের

সঞ্চার হয়। যার প্রমাণ এ আয়াত। যিক্‌র দ্বারা তেলাওয়াত-ই ক্বোরআন, ওয়ায ও যিকরের মাহফিল, একাকীত্বে আল্লাহকে স্মরণ করা-সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

١١. يَآاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَالِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ـ

তরজমাঃ হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ, তোমাদের সন্তান-সন্ততি কোন কিছুই যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন না করে; এবং যে কেউ তেমন করে; তবে ওই সমস্ত লোক ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।

[সূরা মুনাফিক্বূন ঃ আয়াত-৯]

শরীয়তের দৃষ্টিতে 'ফরয যিকর' বলতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযকে বুঝায়। আর তরীক্বতের দৃষ্টিতে 'সাধারণ অর্থে যিক্‌র'; যেমন পাঁচ ওয়াক্তের নামায, ক্বোরআন তেলাওয়াত, দুরূদ শরীফ পাঠ ইত্যাদি। অর্থাৎ সন্তান-সন্ততিদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে আল্লাহর যিকর থেকে উদাসীন হয়ে যেয়োনা।

উল্লেখ্য যে, যিক্‌রে মশগুল থাকার জন্য সংসার ত্যাগ করা আবশ্যক নয়। সুফী সম্প্রদায় বলেন, "নিজের রসনাকে সব সময় আল্লাহর যিক্‌র দ্বারা সিক্ত রাখো; সুতরাং যখনই প্রাণবায়ু বের হবে, তখন তা আল্লাহর যিকরের অবস্থায় বের হবে। ভেজা কাঠকে আগুন জ্বালায় না; ভেজা রসনাকেও দোযখের আগুন জ্বালাবে না।"

হাদীসের আলোকে যিকরের গুরুত্ব

যিকরে ইলাহী বা আল্লাহর যিকর সম্পর্কে প্রিয় নবী মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর অসংখ্য অমীয় বাণী (হাদীস শরীফ) রয়েছে যেগুলোতে উম্মতদের বারংবার আল্লাহর যিক্‌রের প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয়েছে এবং তাকিদ দেওয়া হয়েছে। কেননা আল্লাহর যিকরে মানুষের মুক্তি নিহিত আছে। নিম্নে এতদ্‌সম্পর্কিত কিছু হাদীস শরীফ উপস্থাপন করা হলো-

১. স্বীয় যবানকে আল্লাহর যিকির দ্বারা ভেজা রাখুন

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ اَنَّ رَجُلاً قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ شَرَآئِعَ الْاِسْلَامَ قَدْ كَثُرَتْ عَلَىَّ فَاخْبِرْنِىْ بِشَيْءٍ اَتَشَبَّثُ بِهٖ قَالَ لاَ يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ـ

অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুস্‌র থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার উপর তো ইসলামের অনেক বিধান আরোপিত হয়েছে, তন্মধ্যে আপনি একটি বিষয়ের নির্দেশনা দান করুন, যার উপর আমি পূর্ণ ভরসা রাখতে

পারি। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, তোমার জিহ্বাকে সব সময় আল্লাহর যিক্‌র দ্বারা সিক্ত রেখো। [তিরমিযী]

মুসলমানদের জন্য শরীয়তের সকল বিধি-বিধান পালন করা তো আবশ্যক; কিন্তু আল্লাহর যিকর এমন একটি আমল, যা প্রতিনিয়ত সম্পাদন করা যায়। সামাজিক জীবনে অন্যান্য কাজ সম্পাদন করা সত্ত্বেও মানুষ স্বীয় অন্তর ও জিহ্বাকে আল্লাহর যিক্‌রে রত রাখতে পারে। এ জন্যই আমাদের প্রিয় নবী-সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাচ্ছেন, স্বীয় জিহ্বায় সর্বদা আল্লাহর যিক্‌র চালু রাখো। অতএব, সকল মুসলমান রাসূলের নির্দেশিত এ পন্থার উপর আমল করতে চেষ্টা করা উচিত।

২.কথোপকথনে আল্লাহর যিকরের নির্দেশ

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُكْثِرُوْا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللّٰهِ فَاِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللّٰهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ وَاِنَّ أَ بْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللّٰهِ الْقَلْبُ الْقَاسِى

অর্থাৎ হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আল্লাহর যিক্‌র ছাড়া তোমাদের পারস্পরিক কথাবার্তা বা আলাপচারিতা বেশী করবে না। কেননা, আল্লাহর যিকর বিহীন পারস্পরিক আলোচনা হৃদয়কে পাষাণ করে। আর পাষাণ ক্বলব মানুষকে আল্লাহর নৈকট্য থেকে দুরে সরিয়ে রাখে। [তিরমিযী]

মানুষের প্রতিদিনকার পরস্পর আলোচনা কথোপকথনে যেকোনভাবে আল্লাহর যিক্‌র করা উচিত। অপ্রয়োজনীয় অনর্থক কথাবার্তা থেকে বেঁচে থাকো। কেননা, যে কথাবার্তা বা আলোচনায় আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয়, সে আলোচনা আল্লাহর আশ্রয়ে চলে আসে বিধায় অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়। শয়তানের কু-মন্ত্রণা থেকেও নিরাপদ থাকে। নচেৎ আল্লাহর যিক্‌র বিহীন আলোচনায় শয়তানের প্ররোচনার অবকাশ থেকে যায়, যে প্ররোচনা মানুষের অন্তরে হিংসা, বিদ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টি করে, অন্তরকে পাষাণ ও কলুষিত করে দেয়। যা আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্তির অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। আর এ জন্যেই আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কথোপকথনে আল্লাহর যিক্‌র করার জন্য জোর তাগিদ দিয়েছেন।

৩. যিক্‌রে ইলাহী একটি সর্বোত্তম আমল

عَنْ اَبِى الدَّرْدَآءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلاَ اُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ

اَعْمَالِكُمْ وَاَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيْكِكُمْ وَاَرْفَعِهَا فِىْ دَرَجَتِكُمْ وَخَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ اِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ وَخَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ اَنْ تُلْقُوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوْا اَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوْا اَعْنَاقَكُمْ قَالُوْا بَلٰى قَالَ ذِكْرُ اللّٰهِ۔

অর্থাৎ হযরত আবুদ দারদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন আমল সম্পর্কে সুসংবাদ দেবোনা, যা হবে তোমাদের সর্বোত্তম আমল, তোমাদের মুনিবের নিকটও পছন্দনীয় এবং মর্যাদার নিরিখে যা বুলন্দ, স্বর্ণ ও সম্পদ ব্যয় করার চেয়েও উত্তম, এমনকি শত্রুর সাথে জিহাদ করা অপেক্ষাও উত্তম। সাহাবীগণ আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল আপনি আমাদেরকে বলুন! তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- (তাহলো) আল্লাহর যিক্‌র। [তিরমিযী]

আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করা ও জিহাদ করা এমন আমল, যা অন্যান্য আমল থেকে অবশ্যই শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার। কিন্তু উপরোক্ত হাদীসটুকুতে আল্লাহ্‌র যিক্‌রকে ওই আমলগুলো থেকেও শ্রেষ্ঠ ঘোষণা করা হয়েছে। কেননা আল্লাহ্‌র যিক্‌র হলো স্থায়ী। আল্লাহর যিক্‌র দ্বারা রূহানিয়াত বা আধ্যাত্মিকতার পথ সুগম হয়। অভ্যন্তরীণ অন্তরায়গুলো দূরীভূত হয়ে যায়। আর এ কারণেই এ আমল অন্যান্য আমলের চেয়ে শ্রেয় বলা হয়েছে। এছাড়া যিকর বা আল্লাহর স্মরণ সব ইবাদতে শামিল থাকে।

৪. আল্লাহর যিকর অন্তরের প্রশান্তি

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَاَبِىْ سَعِيْدٍ قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَقْعُدُ قَوْمٌ يَّذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلآئِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهٗ۔

অর্থাৎ হযরত আবূ হোরায়রা ও আবূ সা'ঈদ খুদুরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, মানুষ যখনই সমবেতভাবে আল্লাহ্‌র যিক্‌রের জন্য বসবে, তখন আল্লাহ্‌র ফেরেশতারা তাঁদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখেন, আল্লাহর রহমত তাঁদেরকে আচ্ছাদন করে রাখে, তাঁদের উপর শান্তি অবতীর্ণ হয়, সর্বোপরি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাদের নিয়ে ওই সকল লোকের (যারা আল্লাহ্‌র যিকরে রত), আলোচনা করেন। [মুসলিম শরীফ]

যে স্থানে আল্লাহ্‌র যিক্‌র হয়, সেখানে আল্লাহর ফেরেশতারা এবং তাঁর বিশেষ

রহমতের বারিধারা অবতীর্ণ হয়, যাদ্বারা যিক্‌রকারী অন্তরের প্রশান্তি লাভ করেন। এ কারণেই উপরোক্ত হাদীসে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যিক্‌রের প্রতি উম্মতদের উদ্বুদ্ধ করেছেন, যাতে প্রকৃত আন্তরিক প্রসন্নতা অর্জন করে মানুষ ধন্য হতে পারে। কেননা আন্তরিক প্রসন্নতা বা ক্বলবের শান্তি কেবল আল্লাহর যিক্‌র ও ইবাদতের মধ্যে নিহিত।

হযরত হাসান বসরী রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহু বলেন, তিনটি জিনিসের মধ্যে প্রকৃত শান্তি বা স্বাদ অন্বেষণ করোঃ নামাযের মধ্যে, আল্লাহর যিক্‌রের মধ্যে এবং ক্বোরআন তেলওয়াতের মধ্যে। যদি তোমার প্রশান্তি অর্জন হয় তাহলে মনে কর তুমি সফল বা সৌভাগ্যবান; নচেৎ হতভাগা।

৫. যিক্‌রে ইলাহী আযাব থেকে রক্ষাকারী

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ مَا عَمَلُ الْعَبْدِ عَمَلاً اَنْجٰى لَهٗ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ

অর্থাৎ হযরত মু'আয ইবনে জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বান্দা আল্লাহর যিক্‌র ছাড়া এমন কোন আমল করে না, যা তাকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করবে। অর্থাৎ আল্লাহর যিকর মানুষকে আযাব থেকে রক্ষা করবে। [তিরমিযী, ইবনে মাজাহ শরীফ]

মানুষের জন্য আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় হলো তার আমল। তবে আমলের শ্রেণীভেদ রয়েছে, তম্মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও উঁচু আমল হলো আল্লাহর যিক্‌র করা। কেননা, এ যিক্‌র বা স্মরণের মাধ্যমে ইবাদতে একাগ্রতা আসে।

৬. যিক্‌রের প্রতিদান

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ بِىْ وَاَنَا مَعَهٗ اِذَا ذَكَرَنِىْ فَاِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ نَفْسِهٖ ذَكَرْتُ فِىْ نَفْسِىْ وَاِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ مَلَأٍ ذَكَرْتُهٗ فِىْ مَلَأٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ

অর্থাৎ হযরত আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন, আমার সত্ত্বা সম্পর্কে বান্দা যে ধারণা করে আমি তার প্রতি সেরূপ আচরণ করি। যখন সে (বান্দা) আমার যিকর করে তখন আমি তার সাথে থাকি। যদি সে একাকী আমার স্মরণ করে, তাহলে আমিও একাকী তাকে স্মরণ করি এবং যদি কোন সমাবেশে সে আমার যিক্‌র (স্মরণ) করে, তাহলে আমি তার চেয়ে উত্তম সমাবেশে তাকে স্মরণ করি। [বোখারী শরীফ]

এ হাদীস হাদীসে কুদ্‌সী, যা'তে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন যে, আমি বান্দার ধারণার নিকটে থাকি অর্থাৎ যেভাবে বান্দা ধ্যান, চিন্তা, চেতনা দ্বারা আল্লাহর সাথে সম্বন্ধ বা সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করে আল্লাহ তা'আলাও যিকিরকারীদের সাথে সেরূপ সম্পর্ক স্থাপন করেন।

যদি কেউ আল্লাহ্ তা'আলার কাছে গুনাহ মার্জনার আশা রাখে, তাহলে তিনি ক্ষমা করে দেন। যদি কেউ প্রার্থনা কবূলের আশা রাখে, তাহলে কবূল করে নেন। প্রতীয়মান হলো যে, বান্দা যেভাবে আল্লাহর কাছে আশা করে, যেভাবে তাঁকে ধারণা করে, ঠিক সেভাবে সে আল্লাহকে পায়।

৭. শয়তান থেকে বাঁচার অন্যতম উপায় হল আল্লাহর যিক্‌র

عَـنُ اِبُـنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوُلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اَلشَّيُطَانُ جَاثِمٌ عَلٰى قَلُبِ اِبُنِ اٰدَمَ فَاِذَا ذَكَرَ اللّٰهَ خَنَسَ وَاِذَا غَفَلَ وَسُوَسَ

অর্থাৎ হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, শয়তান হল মানুষের অন্তরের (ক্বলবের) অদৃশ্য বাতাস। কিন্তু যখন সে (বান্দা) আল্লাহ্‌র যিক্‌র করে তখন (শয়তান) দূর হয়ে যায়। আর যখন আদম সন্তানরা আল্লাহ্‌র যিক্‌র থেকে অলস হয়ে যায়, তখনই শয়তান কুমন্ত্রণা দেয়। [বুখারী শরীফ]

আল্লাহর যিক্‌র শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা পাওয়ার উত্তম সহায়ক। কেননা যখন কোন বান্দা আল্লাহর যিকর থেকে উদাসীন থাকে, তখন শয়তান অন্তরে বিভিন্ন প্রকারের প্ররোচনা যোগায়।

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্‌র যিক্‌র ঈমানের অন্যতম নিদর্শন। এটা মুনাফেক্বী থেকে দুরে রাখে, শয়তান থেকে হিফাযত করে এবং জাহান্নামের আগুন থেকেও মুক্তি দেয়। যিক্‌রে ইত্যাকার উপকারিতার দরুন আল্লাহ্‌র যিক্‌রকে অন্যান্য বহু ইবাদতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ঘোষণা করা হয়েছে। বিশেষ করে শয়তানের মরণ ফাঁদ থেকে বাঁচিয়ে রাখার ক্ষেত্রে যিক্‌রে ইলাহী শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার।

আবার এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, শয়তান সর্বদা মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা প্রদানের অপচেষ্টায় লিপ্ত থাকে। তখন সে (শয়তান) নিরাশ হয়ে পিছু হটে। আর যখন মানুষ আল্লাহ্‌র যিক্‌র থেকে উদাসীন থাকে, তখন সে কুমন্ত্রণা দিতে পারে।

৮. আল্লাহর যিক্‌র দ্বারা ক্বলবের পবিত্রতা অর্জিত হয়

عَـنُ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اِنَّهٗ كَانَ يَقُوُلُ لِكُلِّ شَيُءٍ صِـقَـالَةٌ وَصِقَالَةُ الُقُلُوُبِ ذِكُرُ اللّٰهِ وَمَا مِنُ شَيُءٍ اَنُجٰى مِنُ عَذَابِ اللّٰهِ مِنُ ذِكُرِ

اللّٰهِ قَالُوُا وَلاَ الُجِهَادُ فِيُ سَبِيُلِ اللّٰهِ قَالَ وَلاَ اَنُ يَضُرِبَ بِسَيُفِهِ ـ

অর্থাৎঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি এরশাদ করেছেন, প্রতিটি জিনিসকে পরিচ্ছন্ন বা স্বচ্ছ করার জন্য কোন না কোন বস্তু থাকে আর অন্তরের স্বচ্ছতা আসে আল্লাহ্‌র যিক্‌র দ্বারা এবং আল্লাহর যিক্‌র ব্যতীত অন্য কোন কিছু পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র আযাব থেকে মুক্তি দিতে পারে না। সাহাবী আরয করলেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করাও কি? রাসূলুল্লাহ্ এরশাদ করেন, "হ্যাঁ জিহাদও।"

প্রতীয়মান হলো, "আল্লাহর যিকর অন্তরের পবিত্রতার একমাত্র সহায়ক। গুনাহ ও পাপের কাজে লিপ্ত হওয়ার দরুন অন্তর কলুষিত হয়ে যায়। অন্তর গুনাহ্‌র কালো পর্দা দ্বারা আবৃত হয়ে যায়। এমনকি গুনাহ্‌র আধিক্যের কারণে অন্তরে একটি অন্ধকারের গর্ত হয়।

কিন্তু যিকর অন্তরের অন্ধকারকে দুরীভূত করে। এমনকি যিক্‌রে ইলাহীর আধিক্যের কারণে অন্তরে এমন একটি অবস্থা হয় যে, অন্তর হয়ে যায় এক স্বচ্ছ আয়না স্বরূপ, যা দ্বারা অভ্যন্তরীণ সকল বস্তু অবলোকন করা যায়।

৯. পাপকে পূণ্য দ্বারা রূপান্তর করার অন্যতম পন্থা হলো আল্লাহর যিক্‌র

عَـنُ اَنَـسٍ عَـنُ رَسُـوُلِ الـلّٰـهِ صَـلَّـى اللّٰهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنُ قَوُمٍ يَجُتَمِعُوُنَ يَـذُكُـرُوُنَ الـلّٰـهَ لاَ يُـرِيُـدُوُنَ بِـذٰلِكَ اِلاَّ وَجُهَهٗ اِلاَّ نَادَاهُمُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَآءِ اَنُ قُوُمُوُا مَغُفُوُرًا لَّكُمُ قَدُ بَدَّلُتُ سَيِّاٰتِكُمُ حَسَنَاتٍ

অর্থাৎ হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যারা আল্লাহর যিক্‌র করার জন্য একত্রিত হয় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তখন আসমান হতে জনৈক ফিরিশতা ঘোষণা করে, তোমরা ক্ষমাপ্রাপ্ত অবস্থায় উঠে যাও। তোমাদের পাপসমূহকে নেকীতে পরিবর্তিত করা হয়েছে।

আলোচ্য হাদীস শরীফ দ্বারা বুঝা যায় যে, যিক্‌র দ্বারা স্বীয় পাপকার্যসমূহ পুণ্যে পরিবর্তিত হয়ে যায়। তবে তার জন্যে রয়েছে একটি পূর্বশর্ত রয়েছে, তা হলো ইখলাস বা নিষ্ঠা। ইখলাস বা নিষ্ঠা বিহীন যিক্‌র লোক দেখানো যিক্‌র বলে বিবেচ্য। আর লোক দেখানো যিক্‌র আল্লাহ্‌র দরবারে কবূল হয় না।যারা স্বীয় হীন স্বার্থকে চরিতার্থ করার জন্য সাধারণ মুসলমানদের মাঝে বাতিল আক্বীদা প্রচারের নিমিত্তে লোক দেখানো যিক্‌র করে বেড়ায়, তাদের থেকে সকলের দূরে থাকা উচিত।

১০. ফজর ও আসর নামাযের পর যিকরের প্রতি রাসূলে পাকের তাগিদ

عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا يَذْكُرُ عَنْ رَبِّهٖ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اُذْكُرْنِىْ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ سَاعَةً اَكْفِيْكَ فِيْمَا بَيْنَهُمَا

অর্থাৎ হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, মহান আল্লাহ তা'আলার এরশাদ যে, আপনি আমাকে ফজর ও আসর নামাযের পর কিছুক্ষণ স্মরণ করুন। আমি এ উভয়ের মধ্যবর্তী সময়ে আপনাকে প্রাচুর্য ও যথেষ্ট বরকত দান করবো।

ঘটনার আলোকে আল্লাহ্র যিক্রের মাহাত্ম্য

১. যিক্রে ইলাহীর দরুণ জ্বলন্ত আগুন থেকে মুক্তি লাভ

কথিত আছে যে, একদা কোন এক শহরের বাজারে আগুন ধরলো। যাদ্বারা বাজারের সম্পদ, মালামাল, দাসদাসী যা তাতে ছিলো সব পুড়ে গেলো; কিন্তু দু'জন রোমের দাসী যারা অত্যন্ত সুশ্রী ছিলো, তারা এ জ্বলন্ত আগুন থেকে অলৌকিকভাবে মুক্তি পেয়ে গেলো। তবে তারাও পুড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিলো। এমন সময় ঘোষণা দেওয়া হলো এ দু'জন সুশ্রী দাসীকে যে আগুন থেকে মুক্ত করতে পারবে তাকে হাজার দিরহাম পুরস্কার দেয়া হবে। এমনি সময়ে তার পাশ দিয়ে গমন করছিলেন আল্লাহর এক ওলী হযরত আবুল হাসান নূরী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি। তিনি ওই দু' দাসীকে জ্বলন্ত আগুনের ভিতর থেকে রক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। আর ভাবলেন, আমি যদিও পুড়ে যাই তবু উক্ত দু'জন তো বেঁচে যাবে। অতএব, তিনি মুখে আল্লাহর যিক্র নিয়ে 'বিস্‌মিল্লাহ' বলে জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং উক্ত দু'জন দাসীকে নিরাপদে বের করে আনলেন।

যিক্রের বিবিধ আলোচনা

যিকরুল্লাহ বা আল্লাহর স্মরণ সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় আমাদের একান্তভাবে জানা থাকা দরকারঃ

১. যিক্রুল্লাহ কত প্রকার।
২. যিক্রুল্লাহ কতো প্রকারে করা যায়।
৩. যিক্রুল্লাহয় কী উপকার আছে।
৪. কোন্ যিক্র উত্তম।

এখন সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা

১. যিক্রুল্লাহ তিন প্রকারঃ এক. সোজাসুজি খোদার যাত ও গুণাবলীর যিক্র, দুই. আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাগণ ও তাঁর প্রিয় জিনিসসমূহ হতে মাহাত্ম্য বর্ণনাপূর্বক যিক্র

এবং তিন. আল্লাহ্র দুশমনদের তিরস্কার ও নিন্দাপূর্বক যিকর।
সম্পূর্ণ ক্বোরআন শরীফ আল্লাহ্র যিক্র। কোন কোন জায়গায় আল্লাহ্র যাত ও গুণাবলীর যিক্র, কোন জায়গায় নবী-ওলীগণ, কা'বা মু'আয্যমাহ্ বা পবিত্র বরকতময় স্থানসমূহের যিক্র এবং কোন জায়গায় আল্লাহর দুশমনদের যিক্র। এমনকি আল্লাহর আহকামের বর্ণনাও আল্লাহর যিক্র।

২. শরীরের অঙ্গসমূহের যিকর আলাদা আলাদা। চোখের যিকর হচ্ছে আল্লাহর নিয়ামতসমূহ, মহব্বতের দৃষ্টিতে বা ওগুলোকে স্মরণ করে কান্না করা, কানের যিক্র হচ্ছে আল্লাহর গুণগান মনযোগ সহকারে শুনা, মুখের যিক্র হচ্ছে আল্লাহর জপনায় মুখ বা রসনা সিক্ত রাখা, হাতের যিক্র হচ্ছে ক্বোরআন শরীফ ও অন্যান্য ভাল বস্তুসমূহ স্পর্শ করা ও নেক্কারদের সাথে মুসাফাহাহ্ করা এবং হৃদয়ের যিক্র হচ্ছে নিজের গুনাহসমূহ, আল্লাহর দানসমুহ নিজের অপকর্মসমূহ এবং আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করা।

৩. যিকরের অগণিত ফায়দা রয়েছে; যা ইতোপূর্বে ক্বোরআন ও হাদীসের আলোকে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। তবে সবচেয়ে বড় কথা হলো যিকরের বরকতে আল্লাহর দরবারে আমরা গুনাহগারদের যিকর বা আলোচনা হয়। যে ব্যক্তি এটা জানতে ইচ্ছে করে যে, আল্লাহর সেখানে আমার যিক্র কতটুকু হয়, তাহলে সে আগে দেখে নেবে যে, সে আল্লাহর কী পরিমাণ যিকর করে। আরেকটি ফায়দা হলো, যা ক্বোরআনুল করীমে উল্লেখিত আছে । তা হচ্ছে- اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ (অর্থাৎ আল্লাহর যিক্রে অস্থির মন শান্ত হয়।) হবেওনা বা কেন? আমাদের অস্থিরতা আমাদের গুনাহ্সমূহের কারণে হয়ে থাকে। আল্লাহ্র যিক্র হচ্ছে এ সব গুনাহর মাগফেরাতের ওসীলা। গুনাহ মাফ হলে স্বস্তির ভাব এসে যায়। মাওলানা রুমী আলাইহির রহমাহ বলেন-

چوں بیاید نام پاکش در دہاں + نے پلیدی ماندو نے آں دہاں
ذکر حق پاکیست چوں پاکی رسید + رخت می بندد بیروں آید پلید

উচ্চারণঃ বয়া-য়দ নামে পাকশ দর দাহাঁ, নায় পলীদী 'আনেদও নায় আঁ-দাঁহা।
যিকরে হক্ক পাকীস্ত পাকী- রসীদ, রাখ্ত মী-বন্দদ বে-রোঁ আয়দ পলীদ।

অর্থাৎঃ যখন আল্লাহ্র পবিত্র নাম মুখে আসে, তখন ওই মুখে কোন নাপাকী থাকতে পারে না। আল্লাহর যিকর হচ্ছে পবিত্র জিনিষ, তাই পবিত্রতা আসলে, অপবিত্রতা নিশ্চয় অপসারিত হয়ে যায়।

আল্লাহ্র যিক্র রূহ ও অন্তরের জন্য আপন দেশের চিঠির মত। দেশের চিঠি ও আলোচনা দ্বারা প্রবাসীদের যেমন সান্ত্বনা লাভ হয়, তেমন আল্লাহ্র যিকর দ্বারা রূহ ও অন্তরের সান্তনা অর্জিত হয়। আজকাল লোকেরা মনে করে মনের সান্ত্বনা ও

অস্থিরতা দূর করার জন্য সিনেমা, গান-বাজনা, ইত্যাদি উপভোগ করা দরকার। আসলে এর দ্বারা রূহের তৃপ্তি হয় না; বরং কু-প্রবৃত্তিই পরিতৃপ্ত হয়। অতএব, যদি মনের প্রকৃত শান্তি পেতে হয়, তাহলে গুনাহসমূহের নাপাকী আল্লাহর যিকর দ্বারা বিদূরিত করা দরকার। তৃতীয় ফায়দা হলো, আল্লাহর যিকর দ্বারা বান্দার ইজ্জত, সম্মান বৃদ্ধি পায়। আমাদের মুখ দিয়ে আল্লাহর যিক্র যত বেশী হবে, লোকদের মনে আমাদের সম্মানও ওই পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। তাই মাওলানা রূমী বলেন-

گرچہ خواہی زیستن باآبرو + ذکراوکن ذکراوکن ذکراو

উচ্চারণঃ গরছেহ্ খাহী যেস্তন বা-আব্রু, যিক্রে উ কুন্ যিক্রে উ কুন, যিক্রে উ।
অর্থাৎঃ তুমি যদি মান-সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকতে চাও, তাহলে আল্লাহর যিক্র করো। চতুর্থ ফায়দা হলো, আল্লাহর যিক্র হচ্ছে ঈমানের ভূষণ। এর বরকতে লোকদের মধ্যে যিক্রকারীর আলাদা বৈশিষ্ট্য অর্জিত হয়।
মাওলানা রূমী বলেন-

ہرگدارا ذکراوسلطاں کند + ذکراومرزیورےایماں بود
ہرکہ دیوانہ بود درذکرحق + زیرپائش عرش وکرسی نوفلک

উচ্চারণঃ হার গদা রা-যিক্রে উ সুলতাঁ কুনাদ, যিক্রে উ মর যেওরে- ঈমাঁ-বুয়াদ।
হারকেহ্ দিওয়া-নাহ্ বুয়াদ দর যিক্রে হক্ব, যে-রে পায়শ আরশও কুরসী নও ফলক।
অর্থাৎঃ আল্লাহ্র যিক্র ফক্বীরকে বাদশাহ বানিয়ে দেয়। আল্লাহ্র যিকর হচ্ছে ঈমানের অলঙ্কার।
যে ব্যক্তি আল্লাহ্র যিক্রে দেওয়ানা হয়ে যায়, আরশ ও কুরসী নভোঃমণ্ডল তার অধীনস্থ হয়ে যায়।
স্মরণ রাখা দরকার যে, কতেক যিক্র মক্ববূল, কতেক যিক্র মাহবূব এবং কতেক যিক্র মরদূদ। আল্লাহ্র আযাব থেকে রক্ষা বা রহমত লাভের জন্য আল্লাহর যিকর করা তথা আল্লাহকে স্মরণ করা ইনশা-আল্লাহ মক্ববূল বা গ্রহণীয় যিক্র। আল্লাহ তা'আলা এর বরকতে বান্দার আরজু পূর্ণ করবেন, দোযখ থেকে রক্ষা করবেন এবং জান্নাত দান করবেন।
জান্নাত-দোযখের খেয়ালে নয়, কেবল আল্লাহর মহব্বতে তাঁকে স্মরণ করা মাহবূব যিক্র। এ ধরনের যিক্রের বরকতে বান্দা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করে মাহবূব হয়ে যায়। কেননা এ যিক্রে বান্দার নিজস্ব কোন স্বার্থের বিষয় অন্তর্ভুক্ত নেই।
আর মরদূদ বা প্রত্যাখ্যাত যিক্র হচ্ছে কোন অসৎ ব্যক্তি অসৎ উদ্দেশ্যে ধোঁকাবাজি ও হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য আল্লাহ্র নাম নেয়া। পেশাদার ভিক্ষুক দিনরাত 'আল্লাহ্' 'আল্লাহ্' করে ঘুরে বেড়ায়। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কয়েক হাজার বার আল্লাহ্র নাম নেয়; কিন্তু তা শুধু কয়েক গ্রাস খাদ্যের জন্য। মিথ্যা শপথকারীরা

ক্বোরআনেও হাত দেয়; কিন্তু তা কেবলই ধোঁকা এবং মিথ্যাকে সত্যে পরিণত করার জন্য। এ ধরনের যিক্র মরদূদ বা প্রত্যাখ্যাত।

কোন্ প্রকার যিক্র উত্তম

এখানে এটা বলা সমীচীন যে, নক্বশবন্দী ত্বরীকায় নিম্নস্বরে যিক্র করা উত্তম এবং অপর তিন সিল্সিলায় উচ্চস্বরে যিক্র উত্তম। নক্বশবন্দী শায়খদের দলীল হলো এ আয়াতে করীমাহ্- اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً **তরজমাঃ** "তোমাদের রবকে বিনীত ও গোপনভাবে ডাকো।" তাঁরা আরো বলেন যে, যাঁকে শুনানোর উদ্দেশ্যে এ যিক্র করা হচ্ছে তা তো তিনি নিম্নস্বরে বললেও শুনেন।
অপর তিন সিল্সিলার শায়খগণ নিম্নোক্ত আয়াত দলীল হিসেবে পেশ করেন- فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآئَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا **তরজমাঃ** "তোমাদের পিতৃপুরুষকে স্মরণ করার মত আল্লাহকে স্মরণ করো অথবা এর থেকেও জোরালোভাবে।"
উল্লেখ্য যে, নক্বশবন্দীদের নিম্নস্বরে যিক্রও হক্ব এবং অপর তিন সিল্সিলার উচ্চ স্বরের যিক্রও হক্ব। একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম শেষ রাতে হযরত ছিদ্দিক্বে আকবর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে খুবই নিম্নস্বরে তেলাওয়াত করতে দেখলেন এবং হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে উচ্চস্বরে তেলাওয়াত করতে শুনলেন। সকালে উভয়কে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তখন হযরত ছিদ্দিক্বে আকবর আরয করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! যাঁকে শুনানোর ছিলো, তাঁকে আমি শুনিয়েছি এবং হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আরয করলেন, আমি উচ্চস্বরে যিক্র দ্বারা লোকদের জাগাচ্ছিলাম, শয়তানকে তাড়াচ্ছিলাম এবং আল্লাহকে শুনাচ্ছিলাম।
[দরসুল ক্বোরআন, কৃত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি]

যিক্র সম্পর্কে সুফী ও আউলিয়া-ই কেরামের বাণী

১. হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, আমি হযরত সারিউস্ সাক্তী রাহমাতুল্লাহি আলায়হিকে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা আসমানী কিতাবসমূহে বলেছেন- যখন বান্দাদের মধ্যে আমার যিক্র প্রাধান্য পায়, তখন সে আমার আশেক্ব হয়ে যায় এবং আমিও তার আশেক্ব হয়ে যাই।
২. হযরত আবূ জা'ফর রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, আল্লাহ্র ওলী ওই ব্যক্তি হতে পারে, যে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করে। তাঁর অন্তর স্বীয় রবের যিক্র বা স্মরণ থেকে কখনো মুক্ত থাকে না।
৩. হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন যে, আল্লাহর নিকট ওই ব্যক্তি বেশী পছন্দনীয়, যে অধিক হারে আল্লাহ্র যিকর করে।
৪. হযরত জোনায়দ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, আল্লাহকে ভালবাসার

অন্যতম নিদর্শন হল স্বীয় অন্তরে আল্লাহ্‌র যিক্‌র করা।

৫. হযরত নেযাম উদ্দীন আউলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, প্রতিদিন যমীনের একটি অংশ অপর অংশের অবস্থা সম্পর্কে পরস্পর জিজ্ঞাসা করে যে, তোমার উপর আজ আল্লাহ্‌র যিকরকারী বান্দা গমন করেছেন কিনা। যদি বলে, হ্যাঁ, তাহলে যমীনের যে অংশের উপর আল্লাহ্‌র যিক্‌রকারী গমন করেছেন, সেটা অপর অংশের চেয়ে নিজকে অধিক সৌভাগ্যবান ও শ্রেষ্ঠ মনে করে। কেননা, ওই অংশ আল্লাহর যিকিরকারী, সৌভাগ্যবান, আল্লাহর প্রিয় বান্দার পদধূলিতে ধন্য হয়েছে।

৬. হযরত শায়খ সাইয়্যেদ আহমদ কবীর রেফা'ঈ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, তোমাদের সর্বদা আল্লাহ্‌র যিক্‌র করা উচিত। কেননা আল্লাহ্‌র যিক্‌র হলো আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার একমাত্র চাবিকাঠি।

৭. হযরত বাহাউদ্দীন যাকারিয়া মুলতানী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর আশ্রয় কামনা করে তার উচিত সর্বদা আল্লাহ্‌র যিক্‌র করা। কেননা, অধিক যিক্‌র দ্বারা আল্লাহর সাথে সেতুবন্ধন রচিত হয়।

৮. হযরত শরফুদ্দীন ইয়াহয়া মান্‌য়ায়ী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, প্রকৃত যিকরকারী হলো ঐ ব্যক্তি, যার যবান আল্লাহর যিকরে তরুতাজা থাকে। অন্তর আল্লাহ-প্রাপ্তির আকাঙক্ষায় থাকে।

৯. হযরত সদরুদ্দীন আরিফ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, আল্লাহ তা'আলা যার কল্যাণ চান, তাঁকে স্বীয় যিক্‌রের তাওফীক্ব দান করেন। কেননা, আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য প্রাপ্তির অন্যতম মাধ্যম হল আল্লাহর যিক্‌র।

১০. হযরত খাজা বাক্বী বিল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, আল্লাহ তা'আলার স্মরণ ব্যতীত অন্যান্য বস্তুর স্মরণ থেকে অন্তরকে মুক্ত রাখা ও অন্য সব কিছু ভুলে যাওয়ার নামই হলো যিক্‌র।

১১. হযরত আবূ বকর শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, যিক্‌রের মহাত্ম্য হলো এ যে, বান্দা আল্লাহ তা'আলার যিক্‌রের মধ্যে রত থাকার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র এতটুকু নিকটতর হয়ে যায় যে, আল্লাহ্‌র দীদার বা দর্শন লাভ করে নিজের অস্তিত্বের কথা ভুলে যায়।

---<>---

সুন্নাত ও বিদ'আত

মানুষের জীবনের পরম স্বার্থকতা আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের মধ্যেই নিহিত। আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী, হুকুম-আহকাম পালন করে তাঁরই অনুমোদিত পথে জীবন যাপনের মাধ্যমেই তাঁর সন্তুষ্টি পাওয়া সম্ভব। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّالِيَعْبُدُوْنَ

তরজমাঃ আমি জিন্ ও ইনসানকে সৃষ্টিই করেছি আমার ইবাদত করার জন্য। [সূরা যারিয়াত, আয়াত-৫৭]

বান্দা কীভাবে তাঁর ইবাদত বন্দেগী করবে? কোন্ জীবনযাত্রা তাকে আল্লাহ্‌র পরিচয় দানে ধন্য করবে? আল্লাহর সঠিক আনুগত্য কীভাবে হবে? এ সব প্রশ্নের সমাধান দিয়েই আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন-

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ

তরজমাঃ যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করলো, সে তো আল্লাহ তা'আলারই আনুগত্য করলো। [সূরা নিসা, আয়াত-৮০]

আল্লাহ্ তা'আলা আরও এরশাদ করেন-

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

তরজমাঃ বলুন (হে হাবীব), যদি তোমরা আল্লাহ্‌র ভালবাসা চাও, তবে আমার অনুসরণ করো। তা হলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ভালবাসবেন আর তোমাদের পাপ মার্জনা করবেন, আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমাশীল, দয়ালু। [সূরা আ-লে ইমরান ঃ ৩১]

আল্লাহ্ তা'আলার পছন্দনীয় মানবজীবন রাসূলের আনুগত্য ও অনুসরণের মধ্যেই নিহিত। এক কথায় আল্লাহর রাসূলের জীবনাচরণকে অনুসরণ করলেই আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের উপর খুশী হবেন। প্রিয় নবীর জীবনচলায় উম্মতের অনুসরণ যোগ্য সকল বিষয়কেই সুন্নাত বলা হয়।

'সুন্নাত'র পরিচিতি

'সুন্নাত' (سُنَّةٌ) - এর শাব্দিক অর্থ তরীক্বা, কার্যপ্রণালী, জীবনাচার, প্রক্রিয়া, পদ্ধতি ইত্যাদি। এর বহুবচন سُنَنٌ (সুনানুন)। যেমন ক্বোরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে, قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ (তোমাদের আগে অতীত হয়েছে অনেক ধরনের জীবনাচরণ) [সূরা আলে এমরান, আয়াত-১৩৭]

অপর জায়গায় মহান আল্লাহ এরশাদ করেন-

سُنَّةَ مَنْ قَدْ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلَاتَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيْلاً

তরজমাঃ আপনার পূর্বে আমি যত রাসুল প্রেরণ করেছি, সবার ক্ষেত্রে এরূপ নিয়ম-প্রক্রিয়া চালু ছিলো। আপনি আমার নিয়মে ব্যতিক্রম পাবেন না।

[সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত- ৭৭]

শরীয়তের পরিভাষায় রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র কথা, কাজ, সম্মতি, যা উম্মতের জন্য অনুসরণযোগ্য সেটাই সুন্নাত।

সংক্ষেপে এর শর'ঈ সংজ্ঞা হলো-

اَلسُّنَّةُ تُطْلَقُ عَلٰى قَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَفِعْلِهٖ وَسُكُوْتِهٖ وَعَلٰى اَقْوَالِ الصَّحَابَةِ وَاَفْعَالِهِمْ

অর্থাৎ "সুন্নাত বলা হয় রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী, কাজ ও নীরব সম্মতিকে। সাহাবায়ে কেরামের কথা এবং কাজকেও এ অর্থে প্রযোজ্য।"

[নুরুল আনোয়ার কৃত মোল্লা জীবন রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, ওফাত- ১১৩০ হিজরি, মিরক্বাত, কৃত- মোল্লা আলী ক্বারী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি]

হাদীসের সংজ্ঞা এবং পরিভাষাও অনুরূপ। এ জন্য সব সুন্নাতই হাদীস; কিন্তু সব হাদীসকে সুন্নাত বলা হয় না।

এ প্রসঙ্গে মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন-

سنت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے فرمان اور وہ افعال اور احوال ہیں جو مسلمانوں کے لئے قابل عمل ہیں

অর্থাৎ-সুন্নাত বলতে বুঝায়- হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসালাম'র সকল বাণী এবং ওই সমস্ত কাজ ও অবস্থাকে, যা মুসলমানদের ক্ষেত্রে আমলের উপযোগী। [মিরআত শরহে মিশকাত, অধ্যায়- কিতাব ও সুন্নাতকে মজবুত করে ধারণ করা।]

প্রিয় নবীর জীবনের ওই সব বিষয়, যেগুলো একান্তই তাঁর বিশেষত্ব বলে সাব্যস্ত, কিন্তু উম্মতের বেলায় তা প্রযোজ্য নয়, তা হাদীস; সুন্নাত নয়। যেমন 'সওমে বেসাল' (ইফতারবিহীন একটানা রোযা রাখা), চারের অধিক স্ত্রী গ্রহণের বিষয় ইত্যাদি। এগুলো নবীর জন্য খাস, তবে উম্মতের আমলের উপযোগী নয়। নবীর জন্য বিশেষিত আমল ছাড়া বাকী সব সুন্নাত; উম্মতের জন্য উভয় জগতের পাথেয় স্বরূপ।

ক্বোরআন মজীদের আলোকে 'সুন্নাত'

এরশাদ হচ্ছে-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلاً

তরজমাঃ "হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ্র হুকুম মান্য করো, রাসূলের হুকুম মান্য করো। আর তোমাদের শাসন-বারণের যারা অধিকারী তাদের নির্দেশও পালন করো। যদি তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে ঝগড়া ওঠে, তবে তা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি রুজু' করে দাও, যদি তোমরা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হও। এটাই উত্তম এবং পরিণতি হিসাবে চমৎকার।" [সূরা নিসা, আয়াত-৫৯]

এ থেকে বুঝা যায়, আল্লাহ্র নির্দেশের পাশাপাশি নবীর নির্দেশ তথা সুন্নাতের আনুগত্যও জরুরী। এছাড়া যে নিজেদের বিবাদ-কলহের ফায়সালাকারী হিসাবে আল্লাহ ও রাসূলকে মানতে রাজী নয়, সে প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী নয়।

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ

তরজমাঃ "যে রাসূলের আনুগত্য করলো, সে তো আল্লাহ্রই আনুগত্য করলো।

[সূরা নিসা ঃ ৮০]

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

তরজমাঃ হে হাবীব, আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবেসে থাকো, তবে আমারই আনুগত্য করো। তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ভালবাসবেন। আর তোমাদের পাপরাশি মার্জনা করবেন। আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল, দয়ালু।

[সূরা আলে ইমরান, আয়াত-৩১]

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

তরজমাঃ "হে ঈমানদারগণ, তোমরা পরিপূর্ণভাবেই ইসলামে দাখিল হয়ে যাও। শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিঃসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

[সূরা বাক্বারা, আয়াত-২০৮]

এ আয়াত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পরও উটের গোশ্ত আহার করতেন না। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এ ছিলো যে, এটা যেহেতু আমাদের নবীর শরীয়তে ওয়াজিব নয়; সুতরাং এতে গুনাহ হবে না। উপরন্তু হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম-এর শরীয়ত অনুযায়ীও আমল হয়ে যাবে।

তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর এ খেয়ালের খণ্ডন করে উপরোক্ত আয়াত নাযিল করতঃ জানিয়ে দিলেন আমার আখেরী নবীর পূর্ণ অনুসরণ ছাড়া ইসলামে পূর্ণ দীক্ষিত হওয়া যায় না। প্রিয় নবীর পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের নামই ইসলাম। আয়াতে **كافة** (কাফ্‌ফাতান) শব্দের তাফসীরে বলা হয়েছে- فِي جَمِيْعِ شَرَائِعِهٖ অর্থাৎ- তাঁর সকল নিময় কানুনেই তাঁকে অনুসরণ করার মাধ্যমে ইসলামে দাখিল হও।

[তাফসীরে জালালাইন শরীফ]

مَآ اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

তরজমাঃ রাসূল তোমাদের যা দেন, তা গ্রহণ করো। আর যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকো। [সূরা হাশর, আয়াত-৭]

রাসুল থেকে পাওয়া নির্দেশনাই সুন্নত, যা অনুসরণ করা আল্লাহরই নির্দেশ।

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْبَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيَاتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ـ

তরজমাঃ নিশ্চয় আল্লাহ্‌র মহান অনুগ্রহ হয়েছে মুসলমানদের উপর যে, তাদেরই মধ্য থেকে একজন রসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের উপর আয়াতসমূহ পাঠ করেন এবং তাদেরকে পবিত্র করেন আর তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দান করেন। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১৬৪]

প্রিয় নবীর পবিত্র মুখে বর্ণিত ক্বোরআনের মর্মার্থই সুন্নাত।

يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ

অর্থাৎ- তিনি তাদের সৎকর্মের নির্দেশ দেন, অসৎকর্ম থেকে বারণ করেন। পবিত্র বস্তুসমূহ তাদের জন্য হালাল করবেন এবং অপবিত্র বস্তুগুলো হারাম করবেন।

[সূরা আ'রাফ, আয়াত-১৫৭]

শরীয়তের যাবতীয় হালাল-হারাম বিষয়াদি সুস্পষ্ট করতে হলে নবীর শরণাপন্ন হওয়ার বিকল্প নেই। স্মর্তব্য যে, নবীর ব্যাখ্যায় এবং তাঁর আমলের মাধ্যমে তথা সুন্নাতে রাসূলের আলোকে শরীয়তের আহকাম সাব্যস্ত হয়েছে-

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

তরজমাঃ "নিঃসন্দেহে তোমাদের জন্য রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ

।[সূরা আহযাব, আয়াত-২১]

সুন্নাতে রাসুল'র চাইতে অনুকরণীয় সুন্দর ও উত্তম জীবনাদর্শ আর নেই।

اِنَّآ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَآ اَرٰكَ اللّٰهُ

তরজমাঃ 'হে মাহবুব! (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) নিশ্চয় আমি

আপনার প্রতি সত্য কিতাব নাযিল করেছি, যাতে আপনি মানুষের মধ্যে ফয়সালা করবেন, যেভাবে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে দেখান। [সূরা নিসা, আয়াত-১০৫]

এখানে লক্ষণীয় যে, আল্লাহর নির্দেশনা মোতাবেক রাসূলের ফয়সালা, মীমাংসা ও দিকনির্দেশনা সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত-

وَاِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِيْنُ

তরজমাঃ "যদি তোমরা রাসূলের আনুগত্য করো, তবে হেদায়ত পাবে, রাসূলের দায়িত্ব তো শুধু সুস্পষ্টভাবে পৌছিয়ে দেয়াই।" [সূরা নূর, আয়াত-৫৪]

হাদীসে পাকের আলোকে সুন্নাত

১. হযরত আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল এরশাদ করেন-

مَآاَمَرْتُكُمْ بِهٖ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

অর্থাৎ-আমি তোমাদের প্রতি যা আদেশ করি, তোমরা তা গ্রহণ করো, আর আমি যা নিষেধ করি, তা থেকে বিরত থাকো।[ইবনে মাজাহ্‌, সুন্নাতে রাসূলের অনুসরণ অধ্যায়]

২. হযরত আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

مَنْ اَطَاعَنِيْ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো, সে তো আল্লাহ্‌র আনুগত্য করলো। আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্য হলো, সে তো আল্লাহ্‌রই অবাধ্য হলো। [প্রাগুক্ত]

৩. হযরত মালেক ইবনে আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এক মুরসাল হাদীস-এ বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

تَرَكْتُ فِيْكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَاتَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِهٖ

অর্থাৎ "আমি তোমাদের কাছে দু'টি এমন বিষয় রেখে যাচ্ছি, যতক্ষণ এ দু'টি আঁকড়ে ধরে রাখবে, তোমরা পথভ্রষ্ট হবে নাঃ একটি হচ্ছে আল্লাহর কিতাব, অপরটি হল তাঁর রাসূলের সুন্নাত।" [মিশকাত ৩১ পৃষ্ঠা। হাদিসটি মুআত্তায় বর্ণিত আছে]

৪. হযরত ইরদ্বাব ইবনে সা-রিয়া থেকে বর্ণিত এক হাদীসে আল্লাহর রাসূল এরশাদ করেন-

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ

অর্থাৎ তোমরা আমার সুন্নাত ও হিদায়তপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীন'র সুন্নাতকে অবলম্বন করো। [আহমদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্‌]

৫. হযরত আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

كُلُّ اُمَّتِىْ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ اَبىٰ قِيْلَ مَنْ اَبىٰ قَالَ مَنْ اَطَاعَنِىْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ اَبىٰ -

অর্থাৎ "আমার সকল উম্মত বেহেশতে প্রবেশ করবে, তবে যে (আমাকে) প্রত্যাখ্যান করেছে সে ব্যতীত। আরয করা হলো, কে প্রত্যাখ্যান করলো? এরশাদ করেন, যে আমার আনুগত্য করবে, সে বেহেশতে প্রবেশ করবে। যে আমার অবাধ্য হবে, সেই প্রত্যাখ্যানকারী।" [বুখারী, মিশকাত]

৬. হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

لَوْكَانَ مُوْسٰى حَيًّا مَا وَسِعَهٗ اِلَّااتِّبَاعِىْ

অর্থাৎ যদি এ সময় মূসা (আলায়হিস্ সালাম) জাগতিক জীবনে বিদ্যমান থাকতেন, তবে আমার অনুসরণ ছাড়া তাঁর গত্যন্তর থাকতো না।
[আহমদ ও বায়হাক্বীর বরাতে মিশকাত, পৃষ্ঠা- ৩০]

৭. দারেমী গ্রন্থে বর্ণিত এক হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ وَلَوْبَدَالَكُمْ مُوْسٰى فَاتَّبَعْتُمُوْهُ وَتَرَكْتُمُوْنِىْ لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ

অর্থাৎ "আর শপথ ওই মহান সত্তার, যাঁর ক্বুদরতের কব্জায় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর জান, যদি তোমাদের মাঝে মূসা (আলায়হিস সালাম) আত্মপ্রকাশ করতেন, আর তোমরা আমাকে ছেড়ে তাঁর অনুসরণ করতে, তবে অবশ্যই তোমরা সত্যপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যেতে।"

উপকারিতা

৮. হযরত আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল এরশাদ করেন-

مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِىْ عِنْدَ فَسَادِ اُمَّتِىْ فَلَهٗ اَجْرُ مِائَةِ شَهِيْدٍ

অর্থাৎ "আমার উম্মতের ফ্যাসাদ-বিপর্যয়ের মূহূর্তে যে ব্যক্তি আমার সুন্নত'র উপর আমল করবে, তার জন্য শত শহীদের প্রতিদান থাকবে।" [মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা-৩০]

৯. হযরত আনাস ইবনে মালেক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত এক হাদীসে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

مَنْ اَحَبَّ سُنَّتِىْ فَقَدْ اَحَبَّنِىْ وَمَنْ اَحَبَّنِىْ كَانَ مَعِىْ فِى الْجَنَّةِ

অর্থাৎ "যে আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো, সে আমাকেই ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসবে, সে জান্নাতে আমার সঙ্গী হবে।" [তিরমিযী শরীফ]

১০. হযরত বেলাল ইবনে হারেস থেকে বর্ণিত অপর এক হাদীসে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

مَنْ اَحَبَّ سُنَّةً مِّنْ سُنَّتِىْ قَدْ اُمِيْتَتْ بَعْدِىْ فَاِنَّ لَهٗ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلَ اُجُوْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّنْقُصَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا -

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার ইন্তিকালের পর আমার সুন্নাতসমূহ থেকে মিটে যাওয়া কোন সুন্নাতকে জীবিত করবে, তাকে ওই সুন্নাতের উপর সব আমলকারীর সমান সাওয়াব প্রদান করা হবে। তবে আমলকারীদের কোন সাওয়াব কমানো হবে না।
[মিশকাত শরীফ]

১১. হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত এক হাদীসে আল্লাহর রাসুল এরশাদ করেন-

خَيْرُ الْهُدٰى هُدٰى مُحَمَّدٍ

অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র জীবন-যাত্রাই হচ্ছে সর্বোত্তম জীবনযাত্রা। [মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা-২৭]

সুন্নাত পরিহারের অপকারিতা

১২. হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

اَمَا وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاَخْشَاكُمْ لِلّٰهِ وَاَتْقَاكُمْ لَهٗ وَلٰكِنِّىْ اَصُوْمُ وَاُفْطِرُ وَاُصَلِّىْ وَاَرْقُدُ وَاَتَزَوَّجُ النِّسَآءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِىْ فَلَيْسَ مِنِّىْ (متفق عليه)

অর্থাৎ "আল্লাহর ক্বসম, অবশ্যই আমি তোমাদের সবার চাইতে বেশী খোদাভীতি ও পরহেযগারী সম্পন্ন। কিন্তু জেনে রেখো, আমি রোযাও রাখি, ইফতারও করি। (রাত জেগে) নামাযও পড়ি, আবার শয্যাও গ্রহণ করি, বিবিদের সাথে বিবাহও করি (এবং তাদের সাথে আমি দাম্পত্য সম্পর্কও রক্ষা করি)। যে ব্যক্তি আমার 'সুন্নাত' থেকে বিমুখ হয়, সে আমার (দলভুক্ত) নয়। [মিশকাত শরীফ]

১৩. দারেমী গ্রন্থে উল্লিখিত একটি হাদীসে বলা হয়েছে-

اَوَّلُ ذِهَابِ الدِّيْنِ تَرْكُ السُّنَّةِ

অর্থাৎ 'দ্বীন' বিলুপ্তির প্রথম সোপান হলো সুন্নত পরিহার করা।

১৪. মু'মিন-জননী হযরত সাইয়্যেদাহ্ আয়েশা সিদ্দীক্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

صَنَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَرَخَّصَ فِيْهِ فَتَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمٌ فَبَلَغَ ذَالِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللّٰهَ ثُمَّ قَالَ مَابَالُ اَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُوْنَ عَنِ الشَّيْءِ اَصْنَعُهُ فَوَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاَعْلَمُهُمْ بِاللّٰهِ وَاَشَدُّ لَهُ خَشْيَةً (متفق عليه)

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কোন কাজ করলেন, তারঃপর তা অনুমোদিত হয়ে গেলো। কিন্তু কিছু লোক তা করা থেকে বিরত রইলো। বিষয়টির সংবাদ আল্লাহ্ রাসূলের কাছে পৌঁছে যায়। এতে তিনি এক খুৎবা দিলেন এবং আল্লাহর 'হামদ' বা প্রশংসা শেষে এরশাদ করলেন, ''ওই লোকদের কী হলো? যে কাজটি আমি করছি, তা থেকে তারা বিরত থাকছে। আল্লাহ্র ক্বসম! আমি তাদের সবার চাইতে আল্লাহ তা'আলাকে অধিক জানি। আর খোদাভীতির প্রশ্নে আমি তাদের সবার চাইতে বেশী সতর্ক। [বুখারী মুসলিম ও মিশকাত শরীফ]

১৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন-

لَوْتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ

অর্থাৎ-যদি তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নাতকে পরিহার করো, তবে নিশ্চিতভাবে তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। [মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা-৯৭]

অভ্যাসগত কাজগুলো পুণ্যে পরিণত করুন

আমাদের সুস্বাদু খাবার, উত্তম পরিধেয় বস্তুর মধ্যে আয়েশ-জৌলুস উদ্দেশ্য না হওয়া চাই বরং খানা-পিনার বস্তুগুলোতে সুন্নাত পালনের নিয়্যতের মাধ্যমে তা নেক কাজে পরিণত করে নেওয়া উচিত। সুন্নাতের নেক উদ্দেশ্যে সম্পাদন করলে আমাদের অভ্যাসগত কাজগুলোও বয়ে আনতে পারে পুণ্যের সওগাত।

প্রিয়জনের অনুসরণে প্রিয় হওয়া যায়

হুযূর সরওয়ারে কা-ইনাত সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রিয় প্রিয়জনের আচরণ, চলা-ফেরা, উঠা-বসা, বচন-বাচন এক কথায় সবকিছুই প্রিয় হয়ে থাকে। কাজেই নিজ হাবীবের আচরণও আল্লাহ তা'আলার কাছে অত্যন্ত প্রিয়। আর এ প্রিয় সুন্নাত যাঁরা মুহাব্বত সহকারে অনুসরণ করবে, তাঁরাও নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র প্রিয়ভাজন হয়ে ওঠবে। কারণ একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, প্রিয়জনের অনুসরণে প্রিয় হওয়া যায়। আসুন, তাঁর প্রিয় হাবীবের সুন্নাতে অভ্যস্ত হয়ে আমরাও তাঁর প্রিয় হয়ে ওঠি।

একটি শর'ঈ হুকুম মতে আমল সহস্র চিল্লাহ্র চেয়ে শ্রেয়

মুজাদ্দিদে আলফে সানী হযরত শেখ আহমদ সেরহেন্দী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি এরশাদ করেছেন, শরীয়তের চাহিদা মাফিক যতটুকু আমল হবে, ঠিক ততখানি নাফসানী খাহেশ বান্দার অন্তর থেকে তিরোহিত হবে। সুতরাং শর'ঈ আহকাম থেকে একটি হুকুম পালন করা কুপ্রবৃত্তি বা নফসানী খাহেশ বিদূরিত করতে সহস্র বছর এমন রিয়াযত ও মুজাহাদা থেকে উত্তম, যা নিজ খুশীমত করা হয়।'' [ইমামে রাব্বানী, মাকতুব, পৃষ্ঠা-৫২, ২য়খণ্ড]

কাজেই শরীয়ত প্রবর্তক ওই নবীর সুন্নাত অনুযায়ী আমল করতে উদ্যোগী হওয়াই প্রকৃত মু'মিনের কর্তব্য।

উচ্চতর বেলায়ত পূর্ণাঙ্গ সুন্নাত অনুসরণেই অর্জিত হয়

ইমামে রাব্বানী মুজাদ্দেদে আলফে সানী হযরত শেখ আহমদ সেরহিন্দী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, বেলায়তের অনেক মক্বাম বা স্তর রয়েছে। আবার প্রত্যেক নবীর কদম বা অনুসরণে একেক বিশেষ বেলায়ত রয়েছে। যেমন বেলায়তে মুসাভী, ঈসাভী, মুহাম্মদী ইত্যাদি। কিন্তু সর্বোচ্চ বেলায়ত আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র পদাঙ্ক অনুসরণেই নিহিত রয়েছে। আর এ বিরল মর্যাদা হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সুন্নাতকে পরিপূর্ণ অনুসরণের মাধ্যমেই অর্জিত হয়।

[জাহানে ইমামে রব্বানী,পৃষ্ঠা- ৮০৮, ইমাম রাব্বানী ফাউণ্ডেশন, করাচী]

অনুসরণের আলোয় আলোকিত না হলে ইবাদত মূল্যহীন

যদি সহস্র বছর ইবাদত করা হয়, কঠিন রিয়াযত, কঠোর সাধনা করা হয়, কিন্তু তা যদি নবীর আনুগত্য ও অনুসরণের আলোয় আলোকিত না হয় অর্থাৎ সুন্নাতে রাসূলের অনুবর্তী না হয়, তবে আল্লাহর কাছে তার মূল্য যবের দানা পরিমাণও নেই। [মাক্তূবাত, পৃষ্ঠা-১৯১, ৩য় খণ্ড]

কাজেই সুন্নাতের আলোতে আমাদের সব আমল আলোকিত করা চাই। সুন্নাতের অনুসরণে হয়নি এমন সব রিয়াযত থেকে সুন্নাত মতে শয্যা গ্রহণও অনেক শ্রেয়।

বিদ'আত

প্রত্যেক বস্তু তার বিপরীত সত্তার মাধ্যমে চেনা যায়। বলা হয়-

تُعْرَفُ الْاَشْيَآءُ بَاَضْدَادِهَا

অর্থাৎ বস্তুসমূহ পরিচিত হয় বিপরীত বস্তু দ্বারা। যেমন রাতের অস্তিত্ব থেকে দিনের পরিচয় উপলব্ধিতে আসে। সাদার পরিচয় কালো দ্বারা, আলোর পরিচয় অন্ধকার

দ্বারা। বিপরীত সত্তা যেমন বস্তুর পরিচয় নির্ণয়ে সহায়ক তেমনি সুন্নাতকে উপলব্ধি করতে তার বিপরীত বিদ'আতের পরিচয়ও প্রয়োজন। পক্ষান্তরে, বিদ'আত দ্বারা সম্যক উপলব্ধি করা যাবে সুন্নাতের পরিচয়।

বিদ'আতের সংজ্ঞা

সাধারণভাবে বিদ'আত কোন নতুন কথা, কোন নতুন প্রবর্তনকেই বলা হয়। দ্বীনের পরিপন্থী কোন কাজকে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত হিসাবে রেওয়াজ দেওয়াই বিদ'আত।
বিদ'আত (**بدعت**) আরবী শব্দ بـ د ع থেকে উদ্ভূত, পূর্ব নমুনা বা নির্দেশনা ছাড়া সম্পূর্ণ নতুন উদ্ভাবনই শাব্দিকভাবে বিদ'আতের অর্থ। যেমন- ক্বোরআনে পাকে উল্লেখ আছে-

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ

তরজমাঃ আপনি বলুন, 'আমি কোন নতুন রসূল নই। [৪৬:৯]

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

তরজমাঃ আল্লাহ, নতুনভাবে (নমুনা ছাড়া) সৃষ্টিকারী আসমানসমূহের ও যমীনের। [২:১১৭]

وَرَهْبَانِيَةَ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ

তরজমাঃ এবং বৈরাগী হওয়া- এ বিষয়টা তো তারা ধর্মের মধ্যে নিজেদের নিকট থেকে আবিষ্কার করেছে, আমি তাদের উপর বিধিবদ্ধ করিনি। [৫৭:২৭]
এ প্রসঙ্গে ইমাম নাওয়াভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র বরাতে মোল্লা আলী ক্বারী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন-

قَالَ النَّوَوِيُّ اَلْبِدْعَةُ كُلُّ شَيْءٍ عُمِلَ عَلٰى غَيْرِ مِثَالٍ سَبَقَ

অর্থাৎ পূর্বে অতিক্রান্ত কোন দৃষ্টান্ত ছাড়া কোন কাজ করাকে বিদ'আত বলা হয়।
[মিরক্বাত শরহে মিশকাতঃইʼতিসাম বিল কিতাবি ওয়াস্ সুন্নাহ' অধ্যায়ঃ কৃত মোল্লা আলী ক্বারী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি]
শরীয়তের পরিভাষায় ওই বিশ্বাস বা কাজকে বিদ'আত বলা হয়, যা হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র যাহেরী হায়াতে প্রচলিত ছিলো না, পরে হয়েছে। মোল্লা আলী ক্বারীর মতে-

اِحْدَاثُ مَالَمْ يَكُنْ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থাৎ ওই বস্তুর নব-আবিষ্কার করা, যা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে ছিলো না।

বিদ'আতের প্রকারসমূহ

শর'ঈ বিদ'আত অর্থাৎ শরীয়তের দৃষ্টিতে বিদ'আত প্রথমতঃ দু'প্রকারঃ
১. ই'তিক্বাদী (আক্বীদাগত)
২. আমলী (আমলগত)
আক্বীদাগত বিদ'আতই হাদীসে পাকের আলোকে চরম পথভ্রষ্টতা হিসেবে বিবেচ্য। ই'তিক্বাদী বিদ'আত ওই আক্বীদাসমূহকে বলা হয়, যা হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র যাহেরী অবস্থানের পরে অর্থাৎ তাঁর তিরোধানের পরেই ইসলামের নামে এ ধর্মের অভ্যন্তরে উদ্ভূত হয়। এ প্রকারের বিদ'আতের অস্তিত্বের প্রমাণে 'দুররে মুখতার' গ্রন্থে বলা হয়েছে-

وَمُبْتَدِعٌ اَىْ صَاحِبُ بِدْعَةٍ وَهِىَ اِعْتِقَادُ خِلَافِ الْمَعْرُوْفِ عَنِ الرَّسُوْلِ

অর্থাৎ (ইমাম হওয়ার প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, বিদ'আতী ইমামের পিছনে নামায মাকরূহে তাহরীমী।) আর বিদ'আত হলো ওইসব আক্বীদা বা বিশ্বাসের পরিপন্থী আক্বীদা পোষণ করা, যা হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র যুগ থেকে প্রসিদ্ধ ছিলো। [কিতাবুস সালাত, বাবুল ইমামত]
মিশকাত গ্রন্থের 'কিতাবুল ঈমান'র এক হাদীসে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

يَكُوْنُ فِىْ اُمَّتِىْ خَسْفٌ وَمَسْخٌ اَوْقَذْفٌ فِىْ اَهْلِ الْقَدْرِ

অর্থাৎ আমার উম্মতের মধ্যে ভূমিধ্বস, চেহারা বিকৃতি ও পাথর বর্ষণ (জাতীয় আযাব) হবে ক্বদরিয়া সম্প্রদায়ের উপর।
ফাত্ওয়ায়ে রশীদিয়ায় উল্লেখ রয়েছে-

جس بدعت میں ایسی شدید وعید ہے وہ بدعت فی العقائد ہے جیسا کہ روافض خوارج کی بدعت

অর্থাৎ যে বিদ'আত সম্পর্কে এরূপ কঠোর শাস্তির কথা বলা হয়েছে তা হলো আক্বীদাগত বিদ'আত। যেমন রাফেযী, খারেজীদের বিদ'আত।
[১ম খণ্ড, কিতাবুল বিদ'আত, পৃষ্ঠা-৯০]
কাজেই, আক্বীদাগত বিদ'আত'র বিষয়টি স্বীকার্য। সুতরাং ক্বদরিয়া, রাফেযী, খারেজী, মুরজিয়া, গায়রে মুক্বাল্লিদ ইত্যাদি (আহলে হাদীস) আক্বীদাগত বিদ'আতের উদাহরণ। এভাবে পরবর্তীতে উদ্ভূত সকল বাতিল ফির্ক্বাও এ প্রকারভুক্ত।এ প্রকারের প্রত্যেকটি বিদ'আতই নিঃসন্দেহে গোমরাহী ও ভ্রান্তি এবং অনেক ক্ষেত্রে কুফরী ও বে-ঈমানী পর্যন্ত পৌঁছে যায়।
বিদ'আতে আমলী হচ্ছে এমন কাজ, যা হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি

ওয়াসাল্লাম'র পবিত্র যমানার পরে প্রচলিত হয়েছে। দুনিয়াবী হোক বা দ্বীনি, সাহাবায়ে কেরামের সময়ে হোক কিংবা পরে। শেখ আব্দুল হক্ব মুহাদ্দিস দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হিও এটাই বলেছেন। [আশি'আতুল লুম'আত, বাবুল ই'তিসাম]

বিদ'আতে আমলী আবার দু'প্রকারঃ বিদ'আতে হাসানাহ্ ও বিদ'আতে সায়্যিআহ্। হাসানাহ বলা হয় ওই সব নতুন কর্মকাণ্ডকে, যা কোন সুন্নাতের পরিপন্থী নয়; বরং দ্বীনের সহায়ক হিসেবে গণ্য হয়। যেমন মিলাদ মাহফিল, ঈদে মিলাদুন্নবী, জশনে জুলূস, খতমে গাউসিয়া শরীফ, সুন্নী মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা, ক্বোরআন, কিতাব ইত্যাদি ছাপানো প্রভৃতি।

বিদ'আতে সায়্যিআহ্ বলা হয়, যা কোন সুন্নাতের পরিপন্থী, বিরোধী বা উচ্ছেদের কারণ হয়। হযরত শায়খ আব্দুল হক্ব মুহাদ্দিস দেহলভী বলেন-

آنچہ موافق اصول وقواعد سنت است وقیاس کردہ شدہ است آں را بدعت حسنہ گونید وآنچہ مخالف آں باشد بدعت ضلالت گوىند

অর্থাৎ-পরবর্তীতে প্রবর্তিত যে সব কাজ মৌলিক রীতি-নীতি ও সুন্নাতের অনুবর্তী হয় অথবা তার আলোকেই ক্বিয়াস প্রসূত হয় তাকে বিদ'আতে হাসানাহ্ বলে।

[আশি'আতুল লুম'আত, ১ম খণ্ড: কৃত শায়খে মুহাক্বিক্ব আব্দুল হক্ব মুহাদ্দিস দেলেভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি]

তার পরিপন্থী হলো বিদ'আতে দ্বালালাত, যা হাদীস অনুযায়ী পথভ্রষ্টতা।

বিদ'আতে হাসানাহ্ তিন প্রকারের এবং সায়্যিআহ দু'প্রকারের এ প্রসঙ্গে মোল্লা আলী ক্বারী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন-

اَلْبِدْعَةُ اِمَّا وَاجِبَةٌ كَتَعَلّمُ النَّحْوِ وَتَدْوِيْنِ اُصُوْلِ الْفِقْهِ وَاِمَّا مُحَرَّمَةٌ كَمَذْهَبِ الْجَبَرِيَّةِ وَاِمَّا مَنْدُوْبَةٌ كَاِ حُدَاثِ الرَّوَابِطِ وَالْمَدَارِسِ وَكُلِّ اِحْسَانٍ لَّمْ يَعْهَدُ فِى الصَّدْرِ الْاَوَّلِ وَكَالتَّرَاوِيْحِ اَىْ بِالْجَمَاعَةِ الْعَامَّةِ وَاِمَّا مَكْرُوْهَةٌ كَزَخْرَفَةِ الْمَسَاجِدِ وَاِمَّا مُبَاحَةٌ كَالْمُصَافَحَةِ عَقِيْبَ الصُّبْحِ وَالتَّنَوُّعِ بِلَذِيْذِ الْمَاكِلِ وَالْمَشَارِبِ ـ

অর্থাৎ বিদ'আত হয়তো ওয়াজিব, যেমন ইলমে নাহ্ভ শিক্ষা করা, উসূলে ফিক্বহের বিষয় প্রণয়ন করা অথবা হারাম, যেমন জবরিয়া আক্বীদার উদ্ভব। অথবা মুস্তাহাব, যেমন মুসাফির খানা, মাদরাসা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করা এবং ওইসব নেক প্রয়াস, যা প্রথমে ছিলো না, যেমন সাধারণ মুসল্লীদের জামা'আত সহকারে তারাবীহর নামায আদায় করা। অথবা মাকরূহ বিদ'আত, যেমন মসজিদগুলোকে কারুকার্য খচিত করা। অথবা জায়েয বা মোবাহ্, যেমন ফজর নামাযের পর মুসাফাহা করা এবং নানাধরনের খানা-পিনা তৈরী করা ইত্যাদি।

[মিরক্বাত শরহে মিশকাত, কৃত মোল্লা আলী ক্বারী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এবং শামী, ১মখণ্ড]

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে,

বিদ'আত মাত্রই হারাম নয়। যা হারাম অথবা শরীয়তের নীতিমালার পরিপন্থী অবশ্যই তা হারাম এবং হাদীসে পাকে প্রিয় নবীর এরশাদে পাকে كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ (অর্থাৎ প্রত্যেক বিদ'আত পথভ্রষ্টতা) দ্বারা সকল সায়্যিআহ বিদ'আতকেই বুঝানো হয়েছে।

এ পর্যায়ে গোমরাহীমূলক বিদ'আতের অপকারিতা সুন্নাতে রসূলের দৃষ্টিতে পর্যালোচনার করা হচ্ছে-

হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

مَنْ اَحْدَثَ فِىْ اَمْرِنَا هٰذَا مَالَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ (متفق عليه)

অর্থাৎ যে আমাদের দ্বীনের মধ্যে এমন কোন বিষয় উদ্ভাবন করে, যা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয় বরং দ্বীনের পরিপন্থী সে (ব্যক্তি বা তার উদ্ভাবিত কাজ) প্রত্যাখ্যাত।

[বুখারী ও মুসলিম শরীফের বরাতে মিশকাত পৃষ্ঠা-২৭]

হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত এক হাদীসে আল্লাহ্র রাসূল এরশাদ করেন- شَرُّ الْاُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ অর্থাৎ সর্ব নিকৃষ্ট বিষয় হলো (দ্বীনের মধ্যে) নতুন বিষয়ের উদ্ভাবন। আর প্রত্যেক বিদ'আত (যা দ্বীনের পরিপন্থী তা) গোমরাহী। [মিশকাত, বাবুল ই'তিসাম বিল কিতাব ওয়াস্ সুন্নাহ ও ইবনে মাজাহ]

হযরত ইরবাদ্ব ইবনে সারিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

اِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْاُمُوْرِ فَاِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

অর্থাৎ তোমরা (দ্বীনের মধ্যে) নব উদ্ভাবন করা থেকে বেঁচে থাকো। দ্বীনের প্রত্যেক নব-উদ্ভাবনই (যা দ্বীন বহির্ভূত তা) বিদ'আত। আর প্রত্যেক বিদ'আত (যা দ্বীন বহির্ভূত তা) গোমরাহী। [আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ]

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন-

یہاں نئی چیز سے مراد نئے عقیدے ہیں جو اسلام میں حضور کے بعد ایجاد کئے جائیں اسلئے کہ یہاں اسے گمراہی کہا گیا گمراہی عقیدہ میں ہوتی ہے

অর্থাৎ এখানে নতুন বিষয় বলতে নতুন আক্বীদা বুঝানোই উদ্দেশ্য, যা ইসলামের নামে নবীর পরে উদ্ভাবিত হয়েছে। কারণ এখানে এটাকে গোমরাহী বলা হয়েছে। গোমরাহী সাধারণতঃ আক্বীদার বিষয়েই হয়ে থাকে। [মিরআত শরহে মিশকাত]

হযরত হাসসান ইবনে সাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন-

مَا ابْتَدَعَ قَوْمٌ بِدْعَةً فِىْ دِيْنِهِمْ اِلَّا نَزَعَ اللّٰهُ مِنْ سُنَّتِهِمْ مِثْلَهَا ثُمَّ لَا يُعِيْدُهَا اِلَيْهِمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (رواه الدارمى)

অর্থাৎ যে সম্প্রদায়ই তাদের দ্বীনে কোন বিদ‘আতের প্রচলন করবে, আল্লাহ তা‘আলা তার বিনিময়ে দ্বীন থেকে একটি সুন্নাত উঠিয়ে নেবেন। ক্বিয়ামত পর্যন্ত তা আর ফিরায়ে দেবেন না। [মিশকাত, বাবুল ই’তিসাম বিল কিতাব ওয়াস্ সুন্নাহ]

হযরত ইবরাহীম ইবনে মায়সারা রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

مَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ اَعَانَ عَلٰى هَدْمِ الْاِسْلَامِ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন বিদ‘আতীকে সম্মান করে, সে অবশ্যই দ্বীন’র ধ্বংসযজ্ঞে সহায়তা করলো। [প্রাগুক্ত]

উল্লেখ্য যে, এ সকল হাদীস শরীফে দ্বীন বহির্ভূত বা দ্বীনের পরিপন্থী বিদ‘আতকে বুঝানো হয়েছে, যা উম্মতের জন্য চরম দূর্ভাগ্য ও অভিশাপ।

বুঝা যাচ্ছে দ্বীন-ধর্ম বেঁচে থাকবে সুন্নাত পালনের মাধ্যমেই। সুন্নাত উঠে যাওয়ার মাধ্যমেই ইসলাম ক্রমশঃ ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে যাবে। আল্লাহ তা’আলা আমাদের সুন্নাত পালন ও বিদ‘আতে সায়্যিয়াহ্ বর্জনের পূর্ণশক্তি দান করুন।

বিদ‘আতের প্রকারভেদ

ইমামে রাব্বানী মুজাদ্দিদে আলফে সানী শেখ আহমদ সেরহেন্দি রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বিদ‘আতের প্রকারভেদকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁর মতে বিদ‘আত বলতেই ভ্রষ্ঠতা, কোন ভাল কাজকে বিদ‘আত বলা যায় না। বিদ‘আত বলতেই যা পূণ্যের আশা রাখে এমন কোন ভাল কাজকে বোঝায় না। বিদ‘আতের মধ্যে তিনি কোন সৌন্দর্য, কোন আলোরছটা দেখেন না, অন্ধকার আর কলুষতা ছাড়া সেখানে ভিন্ন কিছু অনুভূত হয় না। তিনি সব ভাল কাজকে সুন্নাতে হাসানার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। [মাকতুব নং ১৮৬, দফরত-১, খণ্ড ৩য়, জাহানে ইমামে রাব্বানী থেকে]

সামঞ্জস্য বিধান

বিষয়টি সমাধানে মাক্বামাতে সা’ঈদিয়াতে আল্লামা শেখ মাযহার দেহলভী লিখেছেন-

اَلْبِدْعَةُ الْحَسَنَةُ عِنْدَ الْاِمَامِ الرَّبَّانِيِّ قُدِّسَ سِرُّهٗ دَاخِلَةٌ فِى السُّنَّةِ وَلَا يُطْلَقُ عَلَيْهَا اِسْمُ الْبِدْعَةِ بِمُوْجَبِ كُلِّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَالنِّزَاعُ لَفْظِىٌّ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْعُلَمَآءِ بِوَجُوْدِ الْحُسْنِ فِى الْبِدْعِ

অর্থাৎ বিদ‘আতে হাসানাহ্ ইমামে রাব্বানীর দৃষ্টিতে সুন্নাতেরই অন্তর্ভুক্ত। তিনি ‘প্রত্যেক বিদ‘আত পথভ্রষ্ঠতা’ হাদীসের এ বক্তব্যের ভিত্তিতে এটাতে বিদ‘আত শব্দের প্রযোজ্যতাকেই স্বীকার করেন নি। এটা তাঁর এবং অপরাপর ওলামায়ে কেরামের মধ্যে শব্দ চয়নগত মতভিন্নতা ছাড়া আর কিছু নয়। অর্থাৎ ইমামে রাব্বানী ও অন্যান্য ওলামা-ই কেরামের অভিমত এ প্রসঙ্গে এক ও অভিন্ন।

[জাহানে ইমাম রাব্বানী (করাচী থেকে মূদ্রিত), পৃষ্ঠা-৩৪৩]

হালাল ও হারাম

হালাল শব্দের অর্থ অনুমোদিত বা সিদ্ধ বিষয়। শরীয়তের পরিভাষায়-

مَا اَجَازَهُ الشَّارِعُ فَهُوَ حَلَالٌ

অর্থাৎ শরীয়ত প্রবর্তক যা করার বা বলার অনুমতি দিয়েছেন, তাই হালাল।

হাদীস শরীফে, রসূল সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যা হালাল করেছেন তা-ই হালাল।

আর হারাম শব্দের আভিধানিক অর্থ নিষিদ্ধ বিষয়।

শরীয়তের পরিভাষায় وَمَانَهٰى عَنْهُ فَهُوَ حَرَامٌ অর্থাৎ শরীয়ত প্রবর্তক যা স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেছেন, যা করার পরিণামে পরকালে শাস্তি অনিবার্য, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে পার্থিব জীবনেও দণ্ডনীয় হতে হয় এরূপ বস্তু বা কাজকে হারাম বলা হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

وَمَا حَرَّمَ اللّٰهُ فِىْ كِتَابِهٖ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفُوٌّ فَاقْبَلُوْا مِنَ اللّٰهِ عَافِيَتَهٗ

অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর কিতাবে যা হারাম করেছেন তা-ই হারাম। আর যে বিষয়ে কিছু এরশাদ করেন নি তা ক্ষমাযোগ্য। সুতরাং তোমরা মহান আল্লাহর ক্ষমাকেই গ্রহণ করো।

হালাল ও হারাম নির্ণয়ের উপায়

ইসলামী শরীয়তে হালাল ও হারাম নির্ধারণের মূলনীতি হলো প্রত্যেক বস্তুর মৌলিকত্ব হচ্ছে হালাল, শরীয়ত প্রবর্তক দ্বারা অকাট্য ও সুস্পষ্টরূপে কোন বস্তুকে হারাম করা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তা নিঃসন্দেহে হালাল বা অনুমোদনযোগ্য বলে গণ্য হবে; সেটাকে নিছক ধারণা দ্বারা কিংবা কোন দুর্বল সূত্র দ্বারা হারাম বলা যাবে না। কারণ, মহান আল্লাহ সকল বস্তুই মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর কল্যাণকর বস্তু মাত্রই হালাল বা বৈধ হওয়ার দাবী রাখে। তবে কিছু কিছু বস্তুর মধ্যে অল্প বিস্তর ক্ষতিকর বিষয়ও থাকে বিধায় ওই বস্তুর অবৈধতা বিবেচিত হয়। যেমন ক্বোরআন মাজীদে خمر (মদ) ميسر (জুয়াখেলা) সম্পর্কে বলা হয়েছে-

قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

অর্থাৎ হে রসূল, (সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়কা ওয়াসাল্লাম) আপনি বলে দিন, ওই দু’টির মধ্যে রয়েছে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য কিছু উপকারও। তবে ওই দুটির গুনাহ্ উভয়ের উপকার থেকে বড়। [সূরা বাক্বারা ২১৯]

সুতরাং **خمر** (মদ) এবং **ميسر** (জুয়া) এ দুটিকে হারাম করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা সকল বস্তুই যে মানুষের কল্যাণে সৃষ্টি করেছেন, তার প্রমাণ হচ্ছে-

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا

তরজমাঃ তিনি ওই মহান সত্ত্বা, যিনি তোমাদের কল্যাণার্থে পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। [সূরা বাক্বারা, আয়াত- ২৯]

একথা স্বতসিদ্ধ যে, সকল বস্তুর মৌলিকত্ব বৈধ বলে প্রমাণিত হওয়ার পর একেকটি নিশ্চিত সত্য করে হালাল বস্তু নিরূপণ করা সম্ভব নয়; বরং সে ক্ষেত্রে শুধু হারাম বলে ঘোষিত বস্তুসমূহকে চিহ্নিত করাই যথেষ্ট। কারণ, ওইগুলোর সংখ্যাই সীমিত। পক্ষান্তরে, হালালের সংখ্যা অসংখ্য। ক্বোরআনে পাকে এ প্রসঙ্গে এরশাদ হয়েছে-

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

তরজমাঃ এবং তিনি তোমাদের জন্য বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন যা কিছু তিনি তোমাদের উপর হারাম করেছেন। [সূরা আন'আম, আয়াত- ২৯]

মহান আল্লাহ যে সব বস্তুকে হারামের পর্যায়ভুক্ত করেছেন, সেগুলোই হারাম বলে গণ্য হবে। এ ছাড়া অপরাপর যাবতীয় বস্তুই তার মৌলিক অবস্থায় হালাল হিসেবে থাকবে।

ইসলাম মানবতার ধর্ম, বিশ্ব মানবের সার্বিক কল্যাণই ইসলামের লক্ষ্য। তাই ইসলাম মানুষের জন্য ওই সকল বস্তুর পক্ষে সম্মতি দিয়েছে, যা পবিত্র ও নিষ্কলুষ। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ এরশাদ করেন-

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ-

তরজমাঃ হে লোকেরা! তোমরা ওই হালাল ও পবিত্র বস্তু আহার করো, যা যমীনে রয়েছে এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে প্রকাশ্য শত্রু।

অতঃপর মহান আল্লাহ তা'আলা অপবিত্রগুলোকে চিহ্নিত করে, মু'মিন বান্দারকে সম্বোধন করে এরশাদ করেন-

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَاۤ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَاۤ اِثْمَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ-

তরজমাঃ তিনি এসবই তোমাদের উপর হারাম করেছেন- মড়া, রক্ত, শুকরের মাংস এবং ওই পশু, যাকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যকারো নাম নিয়ে যবেহ করা হয়েছে; তবে যে ব্যক্তি অনন্যোপায় হয়ে, না এমন যে, একান্ত কামনার বশবর্তী হয়ে আহার করে, এমনও নয় যে, প্রয়োজনের সীমা লঙ্ঘন করে, তবে তার গুনাহ্ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু। [২ :১৭৩]

মহান আল্লাহ আরো এরশাদ করেন-

اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهٗ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۚ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ؕ

তরজমাঃ হালাল করা হয়েছে তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার এবং তা ভক্ষণ করা; তোমাদের ও মুসাফিরদের উপকারার্থে; এবং তোমাদের জন্য হারাম স্থলের শিকার যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ইহরাম অবস্থায় থাকবে। [৫:৯৬]

পক্ষান্তরে, মদ ও জুয়া মানুষের চরিত্র বিধ্বংসী। এদু'টি মানুষের প্রভূত ক্ষতি সাধন করে; যার কারণে মহান আল্লাহ পবিত্র ক্বোরআনে মদ ও জুয়াকে হারাম করেছেন। তিনি এরশাদ করেন-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

তরজমাঃ হে ঈমানদারগণ! জুয়া, মূর্তি এবং ভাগ্য-নির্ণায়ক শর অপবিত্র, শয়তানী কাজ। সুতরাং তোমরা তা থেকে বেঁচে থাকো, যাতে তোমরা সাফল্য লাভ করো। [৫:৯০]

অনুরূপ, হারাম কাজে সহযোগিতা করা বা মদদ যোগানো হারাম। সুতরাং সুদ খাওয়া যেমন হারাম, সুদ দেয়াও হারাম। সুদী লেন-দেনের চুক্তিপত্র লিখা, তাতে সাক্ষী হওয়া, সুদ আদায়ে কোন প্রকার সহযোগিতা করা সবকিছু হারাম। অনুরূপ, ব্যভিচার হারাম, এ হারাম কাজে যাবতীয় সহায়তা ও সহযোগিতাও হারাম। যথা- যুবক-যুবতীর অবাধ মেলামেলা, তাদের নির্জনে একত্রিত হওয়া, অবাধ দেখা-সাক্ষাৎ করা, নগ্ন, উলঙ্গ ও যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধিকারী ছবি দেখা, অশ্লীল পত্র-পত্রিকা ও চিত্র দেখা ইত্যাদি ব্যভিচারের মতই হারাম। অতএব, হারাম কাজের সহায়ক কাজও হারাম আর হালাল কাজের সহায়ক কাজও হালাল। ক্বোরআনে পাকে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন-

تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

তরজমাঃ তোমরা সৎকাজে ও খোদাভীরুতায় পরস্পরের সহযোগিতা করো আর পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না। [সূরা মা-ইদাহ্, আয়াত-২]

উপরোক্ত আয়াতের মর্মানুসারে স্পষ্টত বুঝা গেলো যে, যেমনিভাবে সৎকাজে এবং খোদাভীরুতার কাজে একজন অন্যজনকে সহযোগিতা করা প্রয়োজন, তেমনিপাপ ও যাবতীয় যুল্ম ও সীমালঙ্ঘনের কাজে একজন অপরজনকে সহযোগিতা করাও হারাম বা নিষিদ্ধ।

অনুরূপ হারামকে হালাল করার উদ্দেশ্যে কৌশল ও ফন্দি আবলম্বন করাও শরীয়তে হারাম, ইহুদীগণ এমনি অপকৌশল অবলম্বন করে হারামকে হালাল করতে দ্বিধাবোধ করতো না। যার তারা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামও স্বীয় উম্মতের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়ে এরশাদ করেন-

لَا تَرْكَبُوْا مَا ارْتَكَبَهُ الْيَهُوْدُ وَتَسْتَحِلُّوْا مَحَارِمَ اللّٰهِ بِاَدْنٰى الْحِيَلِ

অর্থাৎ ইহুদীগণ যে কাজ করেছিলো, তোমরা সে কাজ করো না আর আল্লাহ তা'আলার হারামকৃত বস্তুসমূহকে নগণ্য কৌশল ও ফন্দি অবলম্বন করে অর্থাৎ হালাল করেনা।

এভাবে ইসলাম শালীনতা রক্ষাকারী কার্যাদি হালাল এবং বৈধ করেছে। যেমন পুরুষের যৌন চাহিদা পুরণের লক্ষ্যে ইসলাম বিবাহ বন্ধনের ব্যবস্থা করেছে। ক্বোরআনে পাকে এরশাদ হয়েছে-

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلَاثَ وَرُبٰعَ

তরজমাঃ তোমরা নারীদের মধ্য হতে তোমাদের পছন্দ অনুসারে দুই-দুই, তিন-তিন, চার-চার নারী পর্যন্ত বিবাহ করতে পারো। অর্থাৎ একত্রে চারজন নারী পর্যন্ত বিবাহ করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। পবিত্র ক্বোরআনের উপরোক্ত নির্দেশাবলীর মাধ্যমে বিবাহ বন্ধনের ঘোষণার সাথে সাথে ব্যভিচার ও অশ্লীলতাকে হারাম ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন-

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ...... الاية

তরজমাঃ ব্যাভিচারীনী ও ব্যাভিচারী এদের প্রত্যেককে একশ' করে চাবুক মারো।
[সূরা নূর, আয়াত- ২]

অবিবাহিত ব্যাভিচারী ও ব্যাভিচারিণীর এই শাস্তি। বিবাহিত ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর শাস্তি হল 'রাজম' বা পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে হত্যা করা।

ইসলামী শরীয়তে অশ্লীলশতা ও ব্যাভিচারের পথরোধ কল্পে পবিত্র বিবাহ প্রথার প্রবর্তন করা হয়েছে।

এভাবে মহা পবিত্র ইসলামী শরীয়ত পবিত্র ও উপকারী বস্তুকে হালাল এবং বৈধ করেছে আর অপবিত্র, অশ্লীল ও অপকারী বস্তুকে হারাম ও নিষিদ্ধ করেছে। এটাই ইসলামী শরীয়তে হালাল-হারামের যৌক্তিকতা ও যথার্থতা।

----<>---

ঘুষ

ইসলামে হালাল ও হারামের ব্যাপারে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, আল্লাহ পাকের নিকট ইবাদত কবূল হবার পূর্বশর্ত হচ্ছে হালাল জীবিকা, হালাল উপার্জন। হালাল উপার্জন ও তজ্জন্য চেষ্টা-ফিকির করাও ইবাদত। বান্দার উপার্জন যদি সৎপথে না হয় অর্থাৎ হালাল না হয়, তাহলে তার কোন ইবাদতই আল্লাহ তা'আলার নিকট গ্রহণযোগ্য হয় না। তাই দয়াবান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর বান্দাদের জন্য হালালকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন এবং হারাম বিষয়গুলোকেও চিহ্নিত করে দিয়েছেন।

যে সব জিনিস পবিত্র, পরিচ্ছন্ন এবং উৎকৃষ্ট সে সবই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানুষের জন্য হালাল করেছেন। পবিত্র ক্বোরআনে এরশাদ হয়েছে-

يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَآ اُحِلَّ لَهُمْ ط قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ

তরজমাঃ ''লোকেরা আপনাকে প্রশ্ন করবে তাদের জন্য কি কি হালাল করা হয়েছে? বলুন, সমস্ত পবিত্র ও ভাল জিনিস তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে।''
[সূরা মা-ইদাহ্, আয়াত-৪]

আরো এরশাদ হয়েছে-

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ

তরজমাঃ আজ তোমাদের জন্য সমস্ত পবিত্র ও ভাল জিনিসগুলো হালাল করা হলো।''
[সূরা মা-ইদাহ্, আয়াত-৫]

পবিত্র ক্বোরআনের বাণী-

وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ○

তরজমাঃ আল্লাহ তোমাদেরকে যে হালাল ও উৎকৃষ্ট জীবিকা দিয়েছেন তা হতে ভক্ষণ করো এবং ভয় করো আল্লাহকে যার প্রতি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছো।''
[সূরা মা-ইদাহ্, আয়াত- ৮৮]

পবিত্র ক্বোরআনে আরো বলা হয়েছে-

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ز وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ط اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ○

তরজমাঃ হে মানবজাতি! পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রয়েছে তা হতে তোমরা আহার করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।
[সূরা বাক্বারা, আয়াত ১৬৮]

فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ص وَّاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ

তরজমাঃ আল্লাহ তোমাদেরকে হালাল ও পবিত্র যা দিয়েছেন তা থেকে তোমরা আহার করো এবং আল্লাহর অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, যদি তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করো।" [সূরা নাহল, আয়াত-১১৪]

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

طَلَبُ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ وَّ مُسْلِمَةٍ

অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলিম নরনারীর উপর হালাল জীবিকা অন্বেষণ করা ফরয। [আল হাদীস]

প্রিয় নবী রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, "যে হালাল দ্রব্যের মধ্যে হারামের সংমিশ্রণ নেই, এরূপ হালাল বস্তু যে ব্যক্তি একাধারে ৪০ দিন পর্যন্ত আহার করে, আল্লাহ তা'আলা তার হৃদয়কে জ্যোর্তিময় করে দেন এবং তার অন্তর হতে হিকমতের উৎস প্রবাহিত করে দেন।" একদিন হযরত সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র দরবারে আরয করলেন, "এয়া রাসূলুল্লাহ! আমার জন্য দো'আ করুন, আমি যে বিষয়ের জন্য আল্লাহ পাকের নিকট প্রার্থনা করি তা যেন কবূল হয়।" উত্তরে আল্লাহর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন,"হালাল খাদ্য ভক্ষণ করো, তাতেই তোমার সকল দো'আ কবূল হবে।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন-

اَلرَّجُلُ يُطِيْلُ السَّفَرَ اَشْعَثَ اَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ اِلَى السَّمَاۤءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهٗ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهٗ حَرَامٌ وَ مَلْبَسُهٗ حَرَامٌ وَغُذِّىَ بِالْحَرَامِ فَاَنّٰى يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ ـ

অর্থাৎ এক ব্যক্তি দীর্ঘ পথ সফর করে, তার মাথার চুল এলোমেলো, ধূলিবালিময়, পদযুগল মলিন, সে তার দু'টি হাত উপরের দিকে তুলে দো'আ করে, হে আমার রব, হে আমার রব! কিন্তু তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পরিচ্ছদ হারাম, হারাম খাদ্যে সে লালিত পালিত হয়েছে। এহেন ব্যক্তির দো'আ আল্লাহর নিকট কি করে কবূল হতে পারে? [সহীহ্ মুসলিম ও তিরমিযী]

হাদীস শরীফে রয়েছে- যদি কোন ব্যক্তি দশ দিরহাম মূল্যের বস্ত্র ক্রয় করে এবং তার মধ্যে এক দিরহাম হারাম মিশ্রিত থাকে তবে যতদিন পর্যন্ত হারাম বস্ত্রখানি তার শরীরে থাকবে, ততোদিন তার নামায কবূল হবে না।" তিনি আরো বলেছেন: হারাম বস্তু ভক্ষণের ফলে শরীরে যে রক্ত, মাংস গঠিত হয় তা জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে। [বায়হাক্বী]

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেছেন- জীবিকা উপার্জন হালাল পন্থায় হচ্ছে, না হারাম পন্থায়, সেদিকে যার সতর্ক দৃষ্টি

থাকে না, তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপের সময় কোন্ পথে নিক্ষেপ করা হবে আল্লাহ পাক সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করবেন না। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম অন্যত্র বলেছেন-

لَا يَكْسِبُ عَبْدٌ مَالاً حَرَامًا فَيَتَصَدَّقُ بِهٖ فَيُقْبَلُ مِنْهُ وَلَا يُنْفِقُ مِنْهُ فَيُبَارِكُ لَهٗ فِيْهِ وَلَا يَتْرُكُهٗ خَلْفَ ظَهْرِهٖ اِلَّا كَانَ زَادُهٗ اِلَى النَّارِ ـ

অর্থাৎ যে কোন বান্দাই হারাম সম্পদ উপার্জন করে অতঃপর তা সাদক্বাহ্ করে, তা কবূল হবে না, তা থেকে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করলে তাতে বরকত হবে না এবং যে সম্পদ সে রেখে যায়, তা তার জন্য জাহান্নামের পথেরই পাথেয় হবে। [মুসনাদে ইমাম আহমদ]

ঘুষদাতা ও ঘুষ গ্রহিতা অভিশপ্ত

হাদীস শরীফে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতাকে অভিশপ্ত বলে আখ্যায়িত করেছেন-

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِىَ وَالْمُرْتَشِىَ ـ

অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ঘুষদাতা ও ঘুষ গ্রহীতা উভয়কেই অভিসম্পাত করেছেন।" [তিরমিযী]

ঘুষ চাওয়া, ঘুষ লওয়ার চেষ্টা করা এবং ঘুষ না দিলে বিপদ হবে বলে হুমকি বা ধমক দেয়াও ঘুষ গ্রহণের শামিল। এছাড়া যারা ঘুষ দেবে এবং যারা ঘুষের আদান প্রদানে কোনরূপ সাহায্য-সহযোগিতা করবে তারাও ঘুষদাতা ও ঘুষ গ্রহীতার ন্যায় সমান অপরাধী বলে গণ্য হবে। কেননা হারাম কাজ করা যেমন অন্যায়, তদ্রূপ হারাম কাজে সাহায্য- সহযোগিতা করাও অন্যায়।

হযরত সাওবান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত-

لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِىَ وَالْمُرْتَشِىَ وَالرَّائِشَ

অর্থাৎঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ঘুষদাতা, ঘুষ গ্রহীতা এবং উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনকারী সকলের উপর অভিসম্পাত করেছেন।" [মুসনাদে আহমদ ও মুস্তাদরাক লিল হাকিম]

অন্য হাদীসে বলা হয়েছে-

اَلرَّاشِىُ وَالْمُرْتَشِىُ فِى النَّارِ

অর্থাৎ ঘুষদাতা ও ঘুষ গ্রহীতা অগ্নিবাসী [জাহান্নামী]

"ঘুষ গ্রহণকারী নিজের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্যে অবহেলা প্রদর্শন করে মানুষকে ঠকানোর ব্যবস্থা নিজ হাতে তুলে নেয়। এ জাতীয় প্রতারণা সম্পর্কে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র ক্বোরআনে ইরশাদ করেছেন-

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرٰكَ اللّٰهُ ۚ وَلَا تَكُنْ لِّلْخَآئِنِيْنَ خَصِيْمًا ۝ وَّ اسْتَغْفِرِ اللّٰهَ ۖ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَانُوْنَ أَنْفُسَهُمْ ۚ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيْمًا ۝ يَّسْتَخْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللّٰهِ

তরজমাঃ "(হে মাহবূব!) আমি তো আপনার প্রতি সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি, আল্লাহ্ আপনাকে যা দেখিয়ে দিয়েছেন সে অনুসারে মানুষের মধ্যে বিচার-মীমাংসা করেন এবং বিশ্বাস ভঙ্গকারীদের সমর্থনে তর্ককারী হবেন না। আর আল্লাহর নিকট (উম্মতের জন্য) ক্ষমা প্রার্থনা করুন! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। যারা নিজেদেরকে প্রতারিত করে তাদের পক্ষে বাদানুবাদ করবেন না, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বিশ্বাস ভঙ্গকারী পাপীকে পছন্দ করেন না। তারা মানুষ হতে গোপন করতে চায় কিন্তু আল্লাহ্ হতে গোপন করতে পারে না।
[সূরা নিসা, আয়াত- ১০৫- ১০৮]

অর্থাৎ বান্দা হারাম মাল উপার্জন করে যা দান করে তা ক্বূবূল করা হবে না। তা থেকে সে যা ব্যয় করে তাতে বরকতও হবে না। আর যা পশ্চাতে রেখে যায়, তা তার জাহান্নামে যাবার পাথেয় হয় মাত্র।" [মুসনদে আহমদ]

মানুষের উপর আল্লাহ্ পাকের বড় নি'মাত হচ্ছে এ যে, তিনি যেমন মানুষের জন্য হালালকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন, তেমনি হারামকেও চিহ্নিত করে দিয়েছেন।
পবিত্র ক্বোরআনে ইরশাদ হয়েছে-

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

তরজমাঃ আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যা হারাম করেছেন তা তিনি তোমাদের নিকট বিস্তারিতভাবে বিবৃত করে দিয়েছেন।" [সূরা আন'আমঃ আয়াত-১১৯]

আরো এরশাদ হয়েছে-

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّأَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

অর্থাৎ হে আমার প্রিয় রাসূল! আপনি বলুন, নিশ্চয়ই আমার রব হারাম করেছেন

প্রকাশ্য ও গোপনীয় অশ্লীলতা আর পাপ এবং অসঙ্গত বিরোধিতা আর কোন কিছুকে আল্লাহর সাথে শরীক করা, যার সমর্থনে তিনি কোন সনদ প্রেরণ করেননি এবং আল্লাহ্ সম্পর্কে এমন কিছু বলা যা তোমরা জানো না।" [সূরা আ'রাফ, আয়াত-৩৩]

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেছেন, হে মুমিনগণ! আল্লাহ্ তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট বস্তু হালাল করেছেন। সেগুলোকে তোমরা হারাম করো না এবং সীমা লঙ্ঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সীমা লঙ্ঘনকারীকে ভালবাসেন না। [সূরা মা-ইদাহ্, আয়াত-৮৭]

আরো এরশাদ হয়েছে-

وَلَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

তরজমাঃ তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না।" [সূরা বাক্বারা, আয়াত- ১১৮]

রাহমাতুল্ লিল আলামিন হুযূরে আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, ওই ব্যক্তি (প্রকৃত) মুসলমান নয়, যার মুখ ও হাত হতে অপর মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে না। [বোখারী শরীফ]

বাধ্য হয়ে এবং যুল্ম থেকে বাঁচার জন্য ঘুষ দিলে ঘুষদাতা অভিশপ্ত ও গুনাহ্গার হবে কিনা

যারা ঘুষ খায় তারা স্বেচ্ছায় ঘুষ খায়। তারা হয়তো অন্যদেরকে ঘুষ দিতে বাধ্য করে, অথবা নিজেরা খায় কিন্তু কাউকে ঘুষ খেতে বাধ্য করে না। এদিকে প্রত্যেকে চায় অতিরিক্ত কোন খরচ না দিয়ে তার কাজটি আদায় করে নিতে। যে সব ক্ষেত্রে ঘুষ দাতা অবৈধভাবে কোন সুবিধা আদায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ঘুষ গ্রহণের জন্য প্রভাবিত করে, সে ক্ষেত্রেও গ্রহীতার ইচ্ছার স্বাধীনতা থাকে। সেসব ইচ্ছা করলে ঘুষের মত পাপ কাজে লিপ্তও হতে পারে; আবার ইচ্ছা করলে বিরতও থাকতে পারে।

কিন্তু যারা ঘুষ দেয় তাদের অধিকাংশ বাধ্য হয়ে ঘুষ দেয়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার ন্যায্য প্রাপ্য আদায়ের জন্য অনেকক্ষেত্রে ঘুষ দিতে হয়। অন্যথায় কাজ আদায় হয় না। ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে হয়। ঘুষ সম্পর্কে শরীয়তের বিধান হচ্ছে- ঘুষ হারাম। যেমন, হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে- ঘুষদাতা ও ঘুষ গ্রহীতা উভয়েই অভিশপ্ত। অন্যত্র বলা হয়েছে, ঘুষদাতা ও ঘুষ গ্রহীতা উভয়েই জাহান্নামী।

এখন প্রশ্ন জাগে যে, যারা অনিচ্ছা এবং ঘৃণা থাকা সত্ত্বেও ন্যায্য প্রাপ্য ও অধিকার আদায়ের জন্য ঘুষ দিতে বাধ্য হয়, তারাও কি অভিশপ্তদের অন্তর্ভূক্ত হবে? এ বিষয়ে ইমামগণ একমত হয়েছেন যে, ঘুষদাতার উপর অভিসম্পাত তখনই পতিত

হবে, যখন সে ঘুষ দিয়ে অন্যের ক্ষতি সাধনে লিপ্ত হবে কিংবা অবৈধ ও নিয়মবহির্ভূতভাবে কোন সুযোগ সুবিধা আদায়ের জন্য চেষ্টা করবে কিংবা অন্যের ন্যায্য প্রাপ্যকে নিজের মালিকানায় আনার প্রচেষ্টা চালাবে। কিন্তু সে যদি নিজের কোন ন্যায্য প্রাপ্য আদায়ের জন্য অথবা কারো যুল্‌ম থেকে বাঁচার জন্য হালাল বা ন্যায়সঙ্গত সকল পথে চেষ্টা, সাধনা ও যাচাই করে কোন ফল না পেয়ে শেষ পর্যায়ে নিরুপায় হয়ে অনিচ্ছাকৃতভাবে, বাধ্য হয়ে এবং ঘৃণা সহকারে ঘুষ দেয় তাহলে তার উপর অভিসম্পাত পতিত হবে না এবং তাকে দোষারূপ করাও যাবে না, তবুও সে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

ঘুষের আভিধানিক অর্থ

'ঘুষ'-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে 'উৎকোচ'। এটি বিশেষ্য বা নামবাচক শব্দ। কখনো কখনো 'ঘুষ' শব্দটি বস্তুবাচক বিশেষ্যের, আবার কখনো গুণবাচক বিশেষ্যের রূপ লাভ করে। 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ' কর্তৃক প্রকাশিত 'আধুনিক বাংলা অভিধান'-এ 'ঘুষ' বলতে বুঝানো হয়েছে, ''সাহায্য লাভের নিমিত্তে গোপনে প্রদত্ত পুরস্কার, উৎকোচ, অবৈধ পারিতোষিক।''

বাংলা একাডেমী, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত 'বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান'-এ 'ঘুষ' শব্দের অর্থ করা হয়েছে 'উৎকোচ, অবৈধ সহায়তার জন্য প্রদত্ত গোপন পারিতোষিক।' কোলকাতা সাহিত্য সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত 'সংসদ বাঙ্গালা অভিধান'-এ 'ঘুষ' বলতে বুঝানো হয়েছে, 'অন্যায় কাজে সাহায্য লাভ করার জন্য গোপনে প্রদত্ত পুরস্কার, উৎকোচ।' যে ব্যক্তি ঘুষ গ্রহণ করে অথবা ঘুষ খায় তাকে বলা হয় 'ঘুষখোর' বা 'ঘুষ গ্রহীতা'। আর যে ব্যক্তি ঘুষ দেয় বা প্রদান করে তাকে বলা হয় 'ঘুষদাতা' বা 'ঘুষ প্রদানকারী'।

আরবী ভাষায় 'ঘুষ' কে বলা হয় رِشْوَةٌ (রিশ্‌ওয়াতুন) বা رَشْوَةٌ (রাশ্‌ওয়াতুন)। ঘুষ দেওয়া বা লওয়াকে বলা হয় رَشْــوٌ (রাশভুন)। যে ব্যক্তি ঘুষ গ্রহণ করে বা খায় তাকে বলা হয় مُــرْتَشِــىْ (মুরতাশী) অর্থাৎ- ঘুষখোর, বা ঘুষ গ্রহীতা। আর যে ব্যক্তি ঘুষ দেয় তাকে বলা হয়- رَاشِــىْ (রাশী) অর্থাৎ- ঘুষদাতা বা ঘুষ প্রদানকারী। বাংলা ভাষায় 'ঘুষ' শব্দটি আরবী 'রিশওয়াতুন' বা 'রাশওয়াতুন' শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যহৃত হয়। উর্দূ এবং ফারসীতেও ঘুষকে বলা হয় رشــوت (রিশওয়াত)। আর যে ঘুষ খায় তাকে বলা হয় رِشــوت خــور (রিশওয়াত খোর) অর্থাৎ- ঘুষখোর বা ঘুষগ্রহীতা।

ঘুষের প্রকারভেদ

ঘুষকে প্রধানত: দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন ১. প্রত্যক্ষ ঘুষ এবং পরোক্ষ ঘুষ।

১. প্রত্যক্ষ ঘুষ ঃ প্রত্যক্ষ ঘুষ বলতে সাধারণতঃ কার্যসম্পাদন-এর বিনিময়ে কাজের মালিক কর্তৃক কার্য সম্পাদনকারীকে কোন কিছু দেয়ার সরাসরি প্রস্তাব করা এবং দেয়া কিংবা কার্য সম্পাদনকারী কর্তৃক কাজের মালিকের নিকট সরাসরি কোন কিছু চাওয়া এবং লওয়াকে বুঝায়।

এ ধরনের ঘুষ নগদ অর্থও হতে পারে কিংবা পণ্য সামগ্রী বা অন্য কিছুও হতে পারে।

নগদ অর্থঃ যেমন- টাকা, ডলার, পাউন্ড বা অন্য কোন বৈদেশিক মুদ্রা।

পণ্য সামগ্রীঃ যেমন রেডিও, টু-ইনওয়ান, টেলিভিশন, ফ্রিজ, খাট, আলমিরা, পাখা, ফার্নিচার, স্বর্ণালংকার, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি।

অন্য কিছুঃ যেমন বিদেশ ভ্রমণ করা, ভাই, ভাতিজা, ভাগিনার চাকুরী দেয়া, বাড়িতে যাবার জন্য প্রাইভেট গাড়ি চাওয়া, সন্তানদের স্কুল, কলেজে ভর্তির ব্যবস্থা করে দেয়া, টেলিফোন লাইনের ব্যবস্থা করে দেয়া ইত্যাদির সরাসরি প্রস্তাব করা বা চাওয়া।

২.পরোক্ষ ঘুষঃ কার্য সম্পাদনের বিনিময়ে কার্যের মালিক কর্তৃক যদি ঘুষের সমার্থবোধক কোন শব্দ দ্বারা কার্য সম্পাদনকারীকে কোন কিছু দেয়ার প্রস্তাব করা হয়; কিংবা কার্য সম্পাদনকারী কর্তৃক যদি তৃতীয় কোন ব্যক্তির মাধ্যমে বা কারো নাম ব্যবহার করে কার্যের মালিকের নিকট কোন কিছু চাওয়া হয় তাহলে তা হবে পরোক্ষ ঘুষ। এ ধরনের ঘুষ নগদ অর্থও হতে পারে আবার পণ্য সামগ্রী বা অন্য কিছুও হতে পারে। এ ধরনের ঘুষকে সাধারণতঃ ঘুসের সমার্থবোধক শব্দে ব্যবহার করা হয়।

সমার্থবোধক শব্দ- বখশিশ, খরচপাতি, খুশি করানো, সুদৃষ্টি, সম্মানী, ম্যানেজ, কমিশন, নেগোসিয়েশান, এক্সট্রা পারিশ্রমিক, টোকেন মানি, ক্লিয়ারেন্স ইত্যাদি।

তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে উপস্থাপন করাঃ যেমন- বলা হয় দেখুন আমি এসব (ঘুষ-টুস) খাইনা কিন্তু উপরে বস্ আছেন তো, ওনাকে খুশি করতে (ঘুষ দিতে) হবে; ফাইলটা আমার হাতেই আছে কিন্তু ওনার সাথে আপনি অবসর সময়ে আলাপ করুন। (ঘুষের আলাপ)। ওরা সারাদিন পরিশ্রম করে একটু মিষ্টিমুখ করাতে হবে ইত্যাদি। সুতরাং সরাসরি ঘুষ না চেয়ে অন্য যে কোন উপায়ে নগদ অর্থ, দ্রব্য বা কোন কিছু দ্বারা চাওয়া হলে বা দিলে তা হবে পরোক্ষ ঘুষ। উল্লেখ্য যে, ঘুষের উপাদান, ধরন, প্রকৃতি, সময়, অবস্থা, পাত্র, পদ্ধতি ইত্যাদির বিভিন্নতা ভেদে ঘুষের আরো বিভিন্ন শ্রেণী-বিভাগ রয়েছে। লোক ও পদমর্যাদা ভেদে তথা চেয়ারের ক্ষমতা ভেদে এর পরিমাণ উঠানামা করে ও ধরন বদলায়।

মানুষ ঘুষ কেন খায়?

ইসলামে ঘুষের আদান-প্রদান সম্পূর্ণরূপে হারাম। কিন্তু এরপরও বর্তমান বিশ্বে বিশেষ করে আমাদের বাংলাদেশে এখন ঘুষ নিত্যদিনের একটি মা'মুলী ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঘুষের লেনদেন হারাম ও পাপকাজ হওয়া সত্ত্বেও এক শ্রেণীর মানুষের অন্তরে এর প্রতি তেমন কোন ঘৃণা সৃষ্টি হচ্ছে না। পাপকাজে নেই কোন ভয়ভীতি। কিছু কিছু অসৎ কর্মকর্তা ও কর্মচারী আছে, যারা ঘুষ ছাড়া কোন কাজই করতে চায় না। অনেক ক্ষেত্রে সরাসরি নির্দ্বিধায় ঘুষ চেয়ে বসে। 'ঘুষ দিন কাজ নিন' এ হলো তাদের স্পষ্ট বক্তব্য। শিক্ষা মানুষকে সৎ ও নীতিবান করে। মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা অর্জন করেও তারা কেন ঘুষের মতো আবর্জনা খায়। এ প্রশ্নের জবাব এক কথায় দেয়া সম্ভব নয়। কারণ একক কোন কারণে মানুষ ঘুষ খায় না। ঘুষ খাওয়ার পেছনে রয়েছে বহুবিধ কারণ। নিম্নে ঘুষ খাওয়ার কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা হলো-

১. উচ্চাভিলাষী মনোভাবঃ কিছু কর্মকর্তা ও কর্মচারী এমন আছে যাদের রয়েছে উচ্চাভিলাষী মনোভাব। তারা রাতারাতি বড় লোক হতে চায়। শহরের বিভিন্ন নামিদামি স্থানে অট্টালিকা গড়ে তুলতে চায়। তারা ভূলে যায় যে, তারা চাকুরীজীবি, সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ। তারা স্বপ্ন দেখে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হবার। ফলে উচ্চাভিলাষী মনোভাবের কারণে তারা বেছে নেয় ঘুষ খাওয়ার জঘন পথ; অথচ উচ্চাভিলাষী না হয়ে নিজের থেকে ছোট ও নিম্ন পর্যায়ের মানুষের প্রতি লক্ষ্য রেখে স্বীয় প্রাপ্ত নি'মাতগুলোর শুকরিয়া আদায়ের প্রতি ইসলামী শরীয়ত উৎসাহিত করেছে।

২. অত্যাধিক লোভ প্রবণতাঃ পৃথিবীতে সেই কেবল সুখী যে অল্পে তুষ্ট। অর্থাৎ যার যা কিছু আছে, তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে পারলে সে সুখী হতে পারে। কিন্তু কতিপয় লোক আছে যারা অল্পে তুষ্ট হতে পারে না।, কারো বাড়ী, গাড়ী, দালান কোটা দেখলেই তার প্রতি লোভ এসে যায়। সেও হতে চায় তার মত গাড়ী ও বাড়ির মালিক। অন্যের সম্পদ দেখে লোভকে সামলাতে না পেরে সে পা বাড়ায় ঘুষ খাওয়া বা উপরি আয়ের দিকে; অথচ লোভের মত ক্ষতিকর সব অভ্যাস পরিত্যাগ করার জন্য ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে।

৩. ধর্মীয় শিক্ষা ও অনুশাসনের অভাবঃ বর্তমান সমাজে যে ঘুষ খায় সে সাধারণত শিক্ষিত এবং পদস্থ কর্মকর্তা বা কর্মচারী। সে প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চ শিক্ষা হয়তো পেয়েছে; কিন্তু যে শিক্ষা মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথ দেখার সে শিক্ষা তার হয়তো নেই, নতুবা সে পায়নি। আর পেয়ে থাকলেও হয়তো অনুশাসন

নেই। যদি তার মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষা ও অনুশাসন থাকতো তাহলে হয়তো তার হৃদয়ে এ অনুভূতিটুকু আসতো যে, তার প্রতিটি কৃতকর্ম সম্পর্কে একদিন আল্লাহ পাকের দরবারে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে জবাবদিহি করতে হবে, পার্থিব বিচারের কাঠগড়ায়ও হয়তো একদিন দাঁড়াতে হবে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই সে ঘুষের মত অবৈধ উপার্জন থেকে বিরত থাকতে পারতো। ধর্মীয় শিক্ষা ও অনুশাসনের অভাবে অনেকে ঘুষ খেয়ে থাকে। এজন্য ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন ও ধর্মীয় অনুশাসন পালনের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি অর্জনের প্রতি ইসলাম উৎসাহিত করেছে, তাকীদও দিয়েছে।

৪. ঘুষদাতার প্রলোভনঃ অনেক কর্মকর্তা ও কর্মচারী আছে যারা ঘুষ খায় না; বরং কষ্ট করে সৎভাবে জীবন যাপন করতে চায়। কিন্তু ঘুষ দিয়ে যারা অবৈধ ও নিয়মবহির্ভূতভাবে কাজ সম্পাদন করে নিতে চায়, তারা সংশ্লিষ্ট কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের মোটা অংকের লোভ দেখাতে থাকে। ফলে আস্তে আস্তে ওই সৎ লোকটিও হয়ে যায় অসৎ। ভাবতে থাকে, 'চাকুরী করেতো জীবনে কিছুই করতে পারলাম না বা পারবো না। ঠিক আছে, একবার না হয় ঘুষ খেয়েই দেখি।' এভাবে একদিন, দু'দিন, তিনদিন আস্তে আস্তে ঘুষদাতার প্রলোভনে পড়ে সেও হয়ে যায় আস্ত ঘুষখোর। অথচ যে ব্যক্তি সৎ ও ন্যায়ের পথে চলে তাকে সহযোগিতা করাই প্রকৃত মু'মিনের আদর্শ।

৫. পরিবেশের প্রভাবঃ কোন ভদ্রলোক হয়তো এমন আছেন, যিনি ঘুষ খান না; অথচ তার পার্শ্বের টেবিলের কর্মকর্তা ঘুষ খাচ্ছে, স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করছে। কিন্তু এ ভদ্রলোক যে অফিসে চাকুরী করে তার নাম শুনলেই অনেকেই ভাবে তিনিও ঘুষখোর। আর এ ভদ্রলোকও ভাবেন এ অফিসে চাকুরী করে ঘুষ না খেলেও অন্যেরা মনে করে ঘুষ খায়। আর আমি একা না খেয়ে ভাল থাকলে কি হবে, অন্যেরাতো খায়-ই। ফলে আস্তে আস্তে পরিবেশ তার উপর প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। সেও শুরু করে ঘুষ খেতে। অথচ ইসলাম এ ধরনের পরিবেশে সৎভাবে থাকার দৃঢ় প্রত্যয় গ্রহণের শিক্ষা দেয়।

৬. অভ্যাসঃ ঘুষ খেতে খেতে কারুর মধ্যে তা এমন অভ্যাসে পরিণত হয় যে, ঘুষ না পেলে তাদের আর ভালই লাগে না। কোন দিন অফিসে ঘুষ না পেলে ভাবে, 'আজ যে কার মুখ দেখে এসেছি, সারাটা দিন একেবারেই নিরামিষ হয়ে আছে।' এ সময়ে কাউকে পেলে সাধারণত একটি সিগারেট বা এক কাপ চায়ের পয়সার আবদার করতেও লজ্জাবোধ করে না। অথচ বদ অভ্যাসকে বর্জন করে সৎকাজে অভ্যস্থ হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ, ইসলামের শিক্ষা।

৭. আইনের প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন না থাকাঃ বাংলাদেশ দণ্ডবিধি ১৬১- ১৬৫ ধারায় ঘুষ খোরদের শাস্তির বিধান উল্লেখ আছে। কিন্তু এর যথাযথ প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন নেই। আইন কেবল বইয়ের পাতায় যথাযথভাবে আছে। অপরদিকে যারা

আইনকে প্রয়োগ করবে তাদের ব্যাপারেই যদি চাঁদা, টোকেন মানি, মালপানি, সেলামী ইত্যাদি গ্রহণের অভিযোগ উঠে তাহলে স্বাভাবিকভাবেই অন্যেরা মনে করবে তারা যখন ঘুষ খেয়ে পার পেয়ে যায়, তখন আমাদের খেতে দোষ কি? শুরু হয় ঘুষ খাওয়ার প্রতিযোগিতা। তাই ক্বোরআন-সুন্নাহ্‌র আইন ও প্রকৃত ইসলামী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা আইনের যথাযথ প্রয়োগ করাই সংরক্ষিত জাতি ও সমাজের জন্য কল্যাণকর বৈ-কি।

৮. অধার্মিক প্ররোচনাঃ অনেক সৎস্বামী আছেন যারা হালাল জীবিকার উপর কষ্ট করে জীবন যাপন করতে চান। কিন্তু অধার্মিক স্ত্রীর কারণে স্বামী তার সততা রক্ষা করতে পারেন না। স্ত্রী তার বান্ধবীর দামী দামী পোশাক পরিচ্ছদ দেখে লোভে পড়ে যায়। স্বামীকে তা ক্রয় করে আনতেও চাপ সৃষ্টি করে। অনেক ক্ষেত্রে স্ত্রী বলেই ফেলে, "অমুকের হাজব্যান্ড চাকুরী করে যদি এতো কিছু আনতে পারে তুমি পারো না কেন? ও আর তুমি তো একই অফিসে চাকুরী করো। আসলে তুমি ভাল শিক্ষিত ও চালাক হতে পারো নি; হয়েছো বোকা।" বেচারা স্বামী ভাবে, "ঘুষ খাইনা বলে বোকা হয়ে গেলাম।" শেষ পর্যন্ত স্ত্রীর প্ররোচনায় সৎ স্বামীটিও হয়ে যায় অসৎ ও ঘুষখোর। একজন স্ত্রী ইচ্ছে করলে তার স্বামীকে আল্লাহ-ওয়ালা বানাতে পারে। আবার ইচ্ছে করলে অসৎ ও ঘুষখোরও বানাতে পারে। এ জন্য সৎ ও নেককার মহিলা শাদী করার প্রতিই রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে তাগিদ দিয়েছেন।

৯. নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ঃ এক শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারী আছে যাদের প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চ ডিগ্রী আছে বটে; কিন্তু নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটেছে। ফলে তারা ঘুষ ছাড়া কোন কাজ করতে রাজি হয় না। সুতরাং নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করার জন্য মহান আল্লাহ তা'আলা দ্বীনি সঠিক জ্ঞানার্জন ও সেটার অনুশীলন এবং সত্যবাদী ও প্রকৃত আউলিয়া-ই কেরামের সঙ্গ লাভ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

ঘুষ দেয়ার কারণসমূহ

ঘুষ কেন দেয় এর কারণ অনেক। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রক্তকে পানি করে উপার্জিত অর্থ কেউই কাউকে অনর্থক দিতে চায় না। অর্থ এমন এক জিনিস যার প্রতি লোভের শেষ নেই। যার যত অর্থই থাকুক না কেন তার আরো চাই। অভাবেরও শেষ নেই। অর্থকে কেন্দ্র করে ভাই-এ ভাই-এ ঝগড়া করে, পিতা পুত্রে ঝগড়া হয়, সংসার ভেঙ্গে যায়। পিতার মৃত্যুর পর বোনের অধিকারকে খর্ব করা হয়। তখন এ অর্থই সকল অনর্থের মূল হয়। সুতরাং কেউ কাউকে স্বেচ্ছায় নিজের উপার্জিত অর্থ দিয়ে দেয় না বা দিতেও চায় না। তাই প্রশ্ন জাগে ঘুষ দেয়া ইসলামে, এমনকি সকল ধর্মেই নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও মানুষ কেন ঘুষ দেয়? এর জবাবে বলা যায় যে, মানুষ দু'টি কারণে ঘুষ দিয়ে থাকেঃ

১. অবৈধ সুযোগ সুবিধা লাভের জন্যঃ এক শ্রেণীর লোক যারা রাতারাতি বড় লোক হবার স্বপ্ন দেখে, তারা অবৈধ এবং নিয়ম বহির্ভূতভাবে সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য ঘুষ দিয়ে কাজ আদায় করে। তাদের ভাষা 'ঘুষ নিন কাজ দিন।' কেউ যদি ঘুষ খেয়ে অবৈধ কাজ করতে রাজি না হয় তাহলে তাকে হতে হয় নানামুখী ষড়যন্ত্রের শিকার। ঘুষ দেখিয়ে তারা কাজ সম্পাদনকারীকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। কেউই তাদেরকে ঘুষ দিতে বলে না; বরং তারা স্বেচ্ছায় ঘুষ দিয়ে অবৈধ কাজ করার চেষ্টা করে।

২. বাধ্য হয়ে বা চাপে পড়ে ঘুষ দেয়ঃ অনেক লোক আছেন, যারা ন্যায়ের পথে চলতে চান। তারা কাউকে ঘুষ দিতে রাজি নন। কারো নিকট হতে অবৈধ ও নিয়ম বহির্ভূতভাবে কাজ আদায় করারও চেষ্টা করেন না। তারা চান ন্যায়ের পথে তাদের যতটুকু প্রাপ্য ততটুকই পেতে। ন্যায্য অধিকার যেন কেউ হরণ না করে। কিন্তু কিছু কিছু অসৎ কর্মকর্তা ও কর্মচারী আছে, যারা ঘুষ ছাড়া কোন কাজ করতে রাজি নয়। এমনকি সরাসরি ঘুষ চেয়ে বসে। অন্যথায় তাদের ফাইল আটকে রাখা হয়, ছাড়া হয় না। ঘুষ দিয়ে অন্যরা অবৈধ পন্থায় টেন্ডার নিয়ে যায়। এমতাবস্থায় ন্যায্য প্রাপ্যটুকু পাবার জন্য কেউ কেউ মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঘুষ দিতে বাধ্য হয়।

কর্মচারীরা বেতনভাতার অতিরিক্ত জনগণের নিকট হতে হাদিয়া বা উপঢৌকন হিসাবে কোন কিছু গ্রহণ করতে পারবে কিনা

সরকারী কর্মচারীরা জনগণের কল্যাণে নির্ধারিত দায়িত্ব পালনের জন্য নিযুক্ত হয়ে থাকেন। বিনিময়ে সরকার কর্মচারীদের বেতন-ভাতা দিয়ে থাকে। কর্মচারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে, জনগণের কাজ সম্পাদন করে দেয়া। কিন্তু কাজের বিনিময়ে তারা জনগণের নিকট হতে কোন কিছু গ্রহণ করতে পারবে না। যদি গ্রহণ করা হয় তাহলে সেটা হবে ঘুষ। এ সম্পর্কে আল্লাহর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلٰى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا اَخَذَ بَعْدَ ذَالِكَ فَهُوَ غُلُوْلٌ ـ

অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুরায়দা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর পিতার মাধ্যমে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমরা যাকে কোন (রাষ্ট্রীয়) কাজে নিযুক্ত করি এবং তাকে সে কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক প্রদান করি, সে যদি (জনগণের নিকট হতে) তার পারিশ্রমিকের অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করে তাহলে তা হবে 'গুলূল' অর্থাৎ খিয়ানত তথা অবৈধ। [সুনানে আবূ দাঊদ]

রাষ্ট্রের প্রতিটি কাজ সরকারী কর্মচারীদের নিকট পবিত্র আমানত। এ আমানতের খিয়ানত করা যাবে না। পবিত্র ক্বোরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন-

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ وَ تَخُوْنُوْا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَ اَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَّ اَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ اَجْرٌ عَظِيْمٌ-

তরজমাঃ 'হে মুমিনগণ! জেনে শুনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে খিয়ানত (বিশ্বাস ভঙ্গ) করো না এবং তোমাদের পরস্পরের আমানত সম্পর্কেও খিয়ানত করো না। জেনে রেখো, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতো এক পরীক্ষা। আর আল্লাহরই নিকট মহা পুরস্কার রয়েছে। [সূরা আনফাল, আয়াত- ২৭-২৮]

عَنْ عَدِىِّ بْنِ عُمَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اِسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلٰى عَمَلٍ فَكَتَمْنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهٗ كَانَ يَاْتِىْ بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

অর্থাৎ "হযরত আদী ইবনে ওমায়রাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে যাকে আমি (রাষ্ট্রীয় কার্যে) কর্মচারী নিযুক্ত করি, আর সে যদি আমাদের নিকট থেকে একটি সূঁচ অথবা তদপেক্ষা ছোট কিছুও গোপন করে তাহলে নিশ্চয়ই তা হবে আমানতের খিয়ানত, যা নিয়ে সে ক্বিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে। [সহীহ মুসলিম শরীফ]

একবার খলীফা উমর ইবনে আবদুল আযীয রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর নিকট কিছু হাদিয়া পেশ করা হলে তিনি তা ফিরিয়ে দেন। তখন তাকে বলা হলো, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হাদিয়া গ্রহণ করতেন; কিন্তু আপনি করছেন না কেন? উত্তরে তিনি বললেন, "হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হাদিয়াই গ্রহণ করেছেন; কিন্তু আমাদের জন্য এটাতো রিশওয়াত (ঘুষ) ছাড়া আর কিছু নয়। তাঁর বিশাল মর্যাদার কারণে হাদিয়া দ্বারা তার নৈকট্যের আকাঙ্ক্ষা করা হতো; কিন্তু আমাদেরকে এখন আমাদের শাসন ক্ষমতার জন্য কিছু দেয়া হয়।"

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى الْيَمَنِ فَلَمَّا سِرْتُ اَرْسَلَ فِىْ اَثَرِىْ فَرُدِدْتُ فَقَالَ اَتَدْرِىْ لِمَا بَعَثْتُ اِلَيْكَ لاَ تُغِيْبَنَّ شَيْئًا بِغَيْرِ اِذْنِىْ فَاِنَّهٗ غُلُوْلٌ وَمَنْ يَّغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِهٰذَا دَعَوْتُكَ وَامْضِ لِعَمَلِكَ-

অর্থাৎ হযরত মুআ'য ইবনে জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাকে ইয়ামনে পাঠালেন। আমি রওয়ানা হলে তিনি আমার পেছনে এক ব্যক্তিকে পাঠিয়ে আমাকে ফিরিয়ে আনলেন। তিনি আমাকে বললেন, "তুমি কি বুঝতে পেরেছে আমি কেন (লোক পাঠিয়ে) তোমাকে ডেকে এনেছি?" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার অনুমতি ব্যতীত তুমি (মানুষের নিকট হতে উপঢৌকন হিসেবে) কোন মাল গ্রহণ করবে না। কেননা এভাবে গ্রহণ করা আত্মসাত বা খেয়ানত। যে ব্যক্তি আত্মসাত করবে সে হাশরের দিন আত্মসাতের মালসহ উপস্থিত হবে। আমি তোমাকে এ কথাগুলো বলে দেবার জন্যই ডেকেছি। এখন নিজের কাজে রওয়ানা হও।" [তিরমিযী]

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাকে ইহুদীদের নিকট প্রেরণ করেছিলেন। তাঁর দায়িত্ব ছিলো ইহুদীদের খেজুর বাগানের 'খারাজ' (কর) কত হয় তার পরিমাণ নির্ধারণ করা। তিনি যখন ইহুদীদের নিকট পৌঁছলেন তখন তাঁর সামনে 'রিশওয়াত' (ঘুষ) স্বরূপ কিছু মাল পেশ করা হলো। হযরত সাওবান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তা দেখে তাদেরকে বললেন, তোমরা যা পেশ করেছো তা তো 'রিশওয়াত' (ঘুষ)। আমরা তা কিছুতেই গ্রহণ করবো না। [মুআত্তা ইমাম মালিক]

বিচারক ঘুষ গ্রহণ করলে তার কি হুকুম

বিচারক বিবাদমান পক্ষদ্বয়ের কারো নিকট হতে কোন হাদিয়া বা উপহার গ্রহণ করতে পারবে না। গ্রহণ করা হলে তা ঘুষ হিসেবে গণ্য হবে। ইসলামী রাষ্ট্রে বিচারক তার পর্যাপ্ত বেতন ভাতা এবং তার পরিবারের ভরণপোষণ সরকার থেকে প্রাপ্ত হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- আমরা কাউকে সরকারী কাজে নিয়োগ করলে তার বাসস্থান না থাকলে তার ব্যবস্থা করে দেবো, তার খাদেম না থাকলে আমরা তা ব্যবস্থা করে দেবো, আর স্ত্রী না থাকলে আমরা তার বিবাহের ব্যবস্থা করে দেবো। যদি কোন বিচারক যদি ঘুষ গ্রহণ করে তাহলে ইসলামী আইনে সে তার স্বীয় পদ হতে সরাসরি বরখাস্ত না হলেও তাকে বরখাস্ত করা সরকারের কর্তব্য।

হানাফী মাযহাব মতে বিচারক ঘুষ গ্রহণ করলে বা অনুরূপ কোন দুষ্কর্মে লিপ্ত হলে সে সরাসরি বরখাস্ত হবে না; তবে সরকার অবশ্যই তাকে বরখাস্ত করবে এবং তার অপরাধের জন্য প্রয়োজন মনে করলে শাস্তির ব্যবস্থাও করবে। কিন্তু ইমাম শাফে'ঈ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এর মতে বিচারক কোন দুষ্কর্মে লিপ্ত হলে সে সরাসরি বরখাস্ত হয়ে যাবে। হানাফী মাযহাবের কিছু সংখ্যক ফক্বীহ্র মতও তাই।

আইনের ভাষায় ঘুষের সংজ্ঞা

প্রচলিত আইনে ঘুষকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। আইনের প্রখ্যাত ভাষ্যকার, আইনশাস্ত্রের বহুগ্রন্থ প্রণেতা গাজী শামসুর রহমান তার প্রণীত 'দণ্ডবিধির ভাষ্য' গ্রন্থে লিখেছেন-

১. সরকারী কর্মচারী হয়ে বা হবার প্রত্যাশায় কোন সরকারী কার্য সম্পাদন করার জন্য যা লওয়া হয় তাই বা তাকে অনুগ্রহ বা সন্তোষ প্রদর্শন করার জন্য যা লওয়া হয় তাই ঘুষ।
২. সরকারী কর্মচারী যে কাজ করার জন্য বখশিশ গ্রহণ করছে, সেই কাজ করা তার ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত থাকলে ওটা নিশ্চয়ই ঘুষ। নিজে না করে অন্যকে দিয়ে করিয়ে দেয়ার জন্য অর্থ গ্রহণ করাও ঘুষের মধ্যে পড়ে।
৩. ঘুষ যে শুধু টাকা হবে এমন নয়; অন্য কোন বস্তুও হতে পারে। কোন দান প্রতিষ্ঠানের জন্য গ্রহণ করাও ঘুষ হতে পারে।

ঘুষের কুফলসমূহ

ঘুষের মধ্যে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য কুফল। তবে এর মধ্যে যে কোন সুফল বা লাভ নেই, তাও নয়। পৃথিবীতে এমন কোন জিনিষ বা কাজ নেই যার মধ্যে কোন উপকারিতা নেই। সুদ, মদ, জুয়া, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, সন্ত্রাস, মানুষ হত্যা, নারী ধর্ষণ, ওজনে কম দেয়া, মজুদদারী ইত্যাদি সকল অপকর্ম ও কুকর্মের মধ্যে কম হলেও লাভ রয়েছে। এ সকল অপকর্মের মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠি লাভবান হয়ে থাকে; তবে জ্ঞানী ব্যক্তিগণ যেসব জিনিসে অপকারিতার চেয়ে উপকারিতা বেশী সেটিকে উপকারী জিনিষ বলে গণ্য করে গ্রহণ করে থাকেন, আর যে জিনিসে উপকারিতার চেয়ে অপকারিতা বেশী সেটাকে অপকারী জিনিষ হিসেবে গণ্য করে তা পরিহার করে চলেন। ঘুষের ব্যাপারটিও অনুরূপ। ঘুষের মধ্যে রয়েছে কিছু ব্যক্তি কেন্দ্রিক সুফল। যেমন- বর্তমানে ঘুষ দিয়ে অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়। কথায় বলে, টাকা হলে বাঘের চোখও মিলে। ঘুষ দিয়ে বর্তমানে সাময়িকভাবে হলেও সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্যরূপে চালিয়ে দেয়া যায়, ঘুষে দ্রুত কাজ সম্পাদিত হয়, রাতারাতি বড় লোক হওয়া যায়, বিচারের রায় স্বপক্ষে আনা যায়, চাকুরীর ক্ষেত্রে নিয়োগ, বদলী, পদোন্নতি ইত্যাদি সহজ করা যায়, গাড়ি বাড়ি কিনে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন কাটানো যায়, টেন্ডার ও বিল পেতে কোন ঘুরাঘুরি করতে হয় না, অফিসের সব কিছু বাসা পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করে দেয় ঘুষ। এ হলো ঘুষের ইতিবাচক দিক।

ঘুষের এ সকল সুফলের তুলনায় এর মধ্যে অপকারিতা বা কুফলই বেশি। নিম্নে ঘুষের কুফলসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করা হলোঃ

১. ঘুষ মানুষের মধ্যে উদারতা, সহনশীলতা, দানশীলতা, সহযোগিতা ও উপকারিতার মনোভাবের পরিবর্তে স্বার্থপরতা, সংকীর্ণতা, কৃপণতা, নির্মমতা ও প্রতিশোধমূলক মনোভাবের জন্ম দেয়।
২. ঘুষ মানুষের মধ্যে সীমাহীনভাবে লোভ সৃষ্টি করে এবং দানশীলতা হ্রাস পায়।
৩. ঘুষ হচ্ছে মানুষের উন্নত ও আদর্শ চরিত্র গঠনের প্রতিবন্ধক।
৪. ঘুষখোররা কোন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতি দয়ার্দ্র হবার পরিবর্তে তার বিপদ ও জরুরী প্রয়োজনের সুযোগে তার নিকট হতে মোটা অংকের ঘুষ আদায় করার চেষ্টায় মত্ত থাকে।
৫. ঘুষ সমাজ ও রাষ্ট্রে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার প্রতিবন্ধক। ফলে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, হত্যা, গুম করা, রাহাজানি ইত্যাদি বেড়ে যায় এবং আইন শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়।
৬. ঘুষ সমাজে ব্যাপক অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি করে।
৭. ঘুষ উৎপাদন ও সঠিক খাতে বিনিয়োগকে বিনষ্ট করে।
৮. ঘুষ দ্রব্য-সামগ্রীর মূল্য বাড়িয়ে দেয়। কারণ দ্রুত কাজ সম্পাদনের জন্য যত টাকা ঘুষ দেয়া হয় তা স্বাভাবিকভাবেই পণ্যের মূল্যের সাথে যোগ করে সে হারে তার বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করা হয়।
৯. ঘুষ জাতীয় উন্নয়নকে বিনষ্ট করে। কারণ কোন উন্নয়নমূলক কাজের টেন্ডার পাবার জন্য যতটাকা ঘুষ দেয়া হয় তত টাকা বা এর চেয়ে কয়েকগুণ বেশী নিজ পকেটে রাখার উদ্দেশ্যে নিম্নমানের মাল দিয়ে কাজ সম্পাদন করা হয়।
১০. ঘুষ দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতাকে অসৎ লোকদের হাতে তুলে দেয় এবং ক্ষমতার এক কেন্দ্রিকতা সৃষ্টি করে।
১১. ঘুষের মাধ্যমে এক শ্রেণীর প্রভাবশালী লোক অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে ব্যক্তিগত সুবিধা লাভের অধিক সুযোগ পায়।

এসবই মানুষের জন্য ধ্বংসাত্মক ও ইসলামী আদর্শের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ইসলাম এসব কারণে ঘুষকে কঠোরভাবে হারাম করেছে।

ঘুষ দূর করার উপায় বা প্রতিকার

আমাদের বর্তমান সমাজে ঘুষ একটি মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় বিস্তার লাভ করেছে। ঘুষ ছাড়া কাজ হয় না। কেউ ঘুষ দিচ্ছে স্বেচ্ছায়, আবার কেউ ঘুষ দিচ্ছে বাধ্য হয়ে, অথচ ঘৃণাভরে। কিন্তু যারা ঘুষ গ্রহণ করে তাদের বাধ্য হয়ে কিংবা ঘৃণাভরে ঘুষ গ্রহণ করার প্রশ্নই ওঠে না। ঘুষের অর্থ আজ প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে মিশে আছে আমাদের সমাজের প্রায় সব মানুষের রক্ত মাংসের সাথে।

কিন্তু এ ঘুষ একদিনে আমাদের সমাজে বিস্তার লাভ করেনি। তাই, যুগ যুগ ধরে চলে আসা এ সংক্রামক ব্যাধি একদিনে দূর করাও সম্ভব নয়। ঘুষ দূর করতে হলে প্রথমে ঘুষ খাওয়ার কারণগুলো চিহ্নিত করতে হবে এবং এর সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় ও বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আমাদের সমাজ থেকে ঘুষ দূর করতে হলে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা প্রয়োজনঃ

১. গণ সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ

ঘুষ দেয়া এবং নেয়া উভয়টিই অপরাধ। কিন্তু ঘুষের কুফল সম্পর্কে অনেকেই অবগত নয়। যারা ঘুষ দেয় তাদের কেউ কেউ ব্যক্তি স্বার্থ হাসিলের জন্য এবং নিয়ম বহির্ভূতভাবে কাজ আদায়ের জন্য ঘুষ দিয়ে কাজ সম্পাদনকারীকে প্রভাবিত করে। কিন্তু অনেকেই ঘুষ দেয় বাধ্য হয়ে কিংবা মনে করে যে, কাজ করে দিলেই কিছু বখশিশ দিতে হয়। যারা ঘুষ গ্রহণ করে তারাতো স্বেচ্ছায় এবং অন্যের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ঘুষ আদায় করে থাকে। অথচ নিয়ম মোতাবেক যথাসময়ে কাজ করে দেয়া তার দায়িত্ব এবং এ দায়িত্ব পালনের জন্যই তাকে চাকুরীতে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। আর বেতন ও নির্ধারণ করা হয়েছে; কিন্তু এ বিষয়ে অনেকেই সচেতন নয়। তাই বৃক্ষ রোপন, টিকা দান, শিশু পালন, মাদকাসক্তি ইত্যাদির ন্যায় ঘুষের ব্যাপারেও গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এর জন্য সরকারকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

২. কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধিকরণ

আমাদের দেশে সরকারী, আধা সরকারী এবং বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের যে বেতন ভাতা দেয়া হয় থাকে তা বর্তমান দ্রব্যমূল্য, বাসাভাড়া ও অন্যান্য প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। কম বেতন দিয়ে সংসার চালাতে অনেক সময় হিমশিম খেতে হয় ফলে অভাবের তাড়নায় চাহিদা মেটানোর জন্য ঘুষ খাওয়ার পথ বেছে নেয়। এমতাবস্থায় দ্রব্যমূল্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উপযুক্ত বেতন ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। এ বিষয়ে সরকারকেই বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, কুকুরের মর্যাদা মানুষের মর্যাদা হতে কখনো বেশি নয়। যেখানে একটি কুকুরের খাবার বাবদ মাসিক খরচ হয় প্রায় ৭ হাজার টাকা সেখানে শ্রমিকের বেতন কখনো ১৫০০ টাকা হতে পারে না।

৩. নৈতিকতার উন্নতি সাধন করা

বর্তমানে আমাদের সমাজে যে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী ঘুষ খায় তাদের

প্রায় সিংহভাগ লোকই প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত। শিক্ষা অর্জনে তাদের উন্নতি হয়েছে বটে; কিন্তু খোদাভীতি ও নৈতিকতার অবক্ষয় ঘটেছে। এমতাবস্থায় ওই সকল ঘুষখোর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নৈতিক মূল্যবোধের উন্নতি সাধনের বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৪. দারিদ্র বিমোচন, বেকারত্ব দূরীকরণ ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা

আমাদের সমাজের অধিকাংশ লোকই দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে। অনেক পরিবার আছে যেখানে একাধিক লোক বেকার জীবন যাপন করছে। কোন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেই। ফলে সংসারে একজন মাত্র লোকের চাকুরীর বেতন কিংবা আয় দিয়ে ১০/১২ জন লোকের ভরণপোষণ করতে হয়। ফলে সে সামান্য বেতন কিংবা আয় দিয়ে সংসার চালাতে পারে না বলে অতিরিক্ত আয়ের পথ হিসেবে ঘুষের পথ বেছে নেয়। এমতাবস্থায় পরিবারের সবার জন্যই যদি কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হতো তাহলে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করা সম্ভব হতো; কোন উপরি আয়ের চিন্তা করতে হতো না। তাই বেকার লোকদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে দারিদ্র বিমোচনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে সরকারকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

৫. সময়োপযোগী ও পর্যাপ্ত আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের ব্যবস্থা করা

বর্তমানে আমাদের দেশে ঘুষখোরদের শাস্তির জন্য যে আইন বলবৎ আছে তা যথেষ্ট নয়। আর যতটুকু আছে তার তেমন কোন প্রয়োগও নেই। আইনের ফাঁক-ফোকরে ঘুষখোরেরা থাকে ধরা ছোঁয়ার বাইরে। এছাড়া আইনের যথাযথ প্রয়োগও হচ্ছে না। যারা আইন প্রয়োগ করবেন তাঁদের থাকতে হবে যাবতীয় দুর্নীতির উর্ধ্বে। কেননা আইন প্রয়োগকারীগণই যদি দুর্নীতি তথা ঘুষের লেনদেনে জড়িত হয়ে পড়েন, তবে আইনের যথাযথ প্রয়োগ হবে না। অন্যদিকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ যাতে সততা ও নিষ্ঠার সাথে এবং জনগণের প্রকৃত- সেবক ও বন্ধু হয়ে নিশ্চিন্তে স্বীয় কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করতে পারেন সে দিক বিবেচনা করে তাদের উল্লেখযোগ্য এবং সন্তোষজনক বেতন-ভাতা প্রদান করতে হবে। কারণ তাদেরকে অভাবে রেখে তাদের থেকে উত্তম সেবার আশা করা যায় না। এছাড়া দেশের সার্বিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে প্রয়োজনীয় ও সময়োপযোগী আইন তৈরি করতে হবে। এ ব্যাপারে প্রধানত: সরকারকেই উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৬. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা

আইন যতই তৈরি করা হোক না কেন, যদি সত্যিকার অর্থে দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা না হয় তাহলে ঘুষ দূর করা যাবে না। ঘুষখোর যেই হোক

না কেন, আইন অনুযায়ী তার বিচার করতে হবে। এটা কেবল শ্লোগানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে হবে না। এটার বাস্তবায়ন করতে হবে । হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "আমার আদরের কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করতো, আল্লাহর ক্বসম আমি তার হাত কেটে দিতাম।" [সহীহ্ বুখারী শরীফ]

সুতরাং সমাজ থেকে ঘুষ দূর করার লক্ষ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রধানত; সরকারকেই আন্তরিক হতে হবে এবং অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

৭. ইসলামী শিক্ষার সম্প্রসারণ করা

বর্তমানে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটিগুলোতে ইসলামী শিক্ষা প্রায় অবহেলিত। ধর্ম মানুষকে সত্য ও কল্যাণের পথে নিয়ে যায়। যে শিক্ষা ব্যবস্থায় ওহীর জ্ঞান অনুপস্থিত সে শিক্ষা মানুষকে কখনো আদর্শবান করে গড়ে তুলতে পারে না, যার বাস্তব প্রমাণ বর্তমান সমাজে অত্যাচার, অনাচার, ব্যভিচার, হত্যা, ধর্ষণ, দুর্নীতি, ঘুষ ইত্যাদি। এমতাবস্থায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় তথা ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা অপরিহার্য।

৮. ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা

ইসলামে ঘুষ হারাম । হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে ঘুষদাতা ও গ্রহীতা উভয়েই জাহান্নামী। হারাম মালে উৎপাদিত রক্ত মাংস জান্নাতে প্রবেশ করবে না। ঘুষ হারাম এ কথা জেনেশুনেও অনেকে ঘুষ খায়। অর্থাৎ ধর্মীয় জ্ঞান আছে বটে; কিন্তু ধর্মীয় অনুশাসন নেই। তাই ঘুষ রোধ করার জন্য ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা তথা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বিধি-বিধান ও রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ বা তরীক্বার অনুশীলন প্রত্যেকে নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে।

৯. অল্পে তুষ্ট থাকার মনোভাব সৃষ্টি করা

অর্থের লোভ অনেক সময় মানুষকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেয়। অর্থের উপর মানুষের শেষ নেই। যার যত অর্থ আছে তার কেবল আরো চাই। অন্যের অর্থকড়ি, গাড়ী, বাড়ি, ভোগ বিলাস দেখে সে তাও অর্জন করতে চায়। ফলে অধিক অর্থ উপার্জনের জন্য মানুষ উপরি আয়ের জন্য ঘুষের পথ বেছে নেয়। এমতাবস্থায় অল্পে তুষ্টির মনোভাব সৃষ্টি করতে হবে অর্থাৎ অধিক লোভ না করে যার যা কিছু আছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকার মন-মানসিকতা সৃষ্টি করতে হবে। প্রত্যেককে আত্মসংযমী হতে হবে।

১০. ঘুষের কুফল ও শাস্তির বিধান ব্যাপকভাবে প্রচারণার ব্যবস্থা করা

আমাদের দেশে ঘুষখোরদের শাস্তির ব্যাপারে প্রচলিত আইন সম্পর্কে অনেকেই অবগত নয়। জনগণের মধ্যে এ ব্যাপারে ব্যাপক প্রচারণার প্রয়োজন। এছাড়া ঘুষের সুদূর প্রসারী কুফল সম্পর্কেও প্রচারণার প্রয়োজন। এ বিষয়ে রেডিও, টেলিভিশন, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ায-মাহফিল, অনুষ্ঠান, বইপত্র, সাপ্তাহিক ও মাসিক বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, পোষ্টার, ষ্টিকার ইত্যাদির মাধ্যমে ঘুষের বিভিন্ন কুফল সম্পর্কে প্রচারণার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে প্রধানত সরকারের আন্তরিক সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

১১. শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ইসলামী শ্রমনীতির বাস্তবায়ন

শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে ইসলাম। আল্লাহর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম শ্রমের উত্তম মর্যাদা দান করেছেন। শ্রমিক তার পারিশ্রমিকের বিনিময়ে একটি নির্ধারিত সময়ের জন্য সময় অবশ্য নির্ধারিত থাকবে। মালিক যদি শ্রমিকের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে শ্রমিকের নিকট হতে নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত শ্রম আদায় করে তাহলে তাকে অবশ্যই অতিরিক্ত সময়ের জন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিক (ওভার টাইম) দিতে হবে। অন্যথায় এটা হবে শ্রমিকের উপর মালিকের যুল্ম এবং এর জন্য শ্রমিক অন্যায় পথ অনুসরণ করতে পারে। হযরত রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "শ্রমিকের শরীরের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার (ন্যায্য) পারিশ্রমিক দিয়ে দাও।" [সুনানে ইবনে মাজাহ]

তিনি আরো বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন আমি-তিনশ্রেণীর ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ করবঃ ১. যে আমার নামে কাউকে নিরাপত্তা দান করলো, অতঃপর বিশ্বাসঘাতকতা করলো, ২. যে ব্যক্তি কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রি করে এর মূল্য ভক্ষণ করলো এবং ৩. যে ব্যক্তি কোন শ্রমিককে কাজে নিয়োগ করে তার নিকট থেকে শ্রম আদায় করে নিলো অথচ (ন্যায্য) পারিশ্রমিক প্রদান করলো না। [সহীহ্ বুখারী শরীফ]

সুতরাং শ্রমিকের অধিকার এবং ইসলামী শ্রমনীতির বাস্তবায়ন করার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১২. ঘুষ প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলা

ঘুষ প্রতিরোধ করার জন্য সামাজিকভাবে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। "আমরা কাউকে ঘুষ দেবো না, কারো নিকট হতে ঘুষ নেবো না"- এটিকে একটি আন্দোলনে রূপ দিতে হবে। এ বিষয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ঘুষ

প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা যেতে পারে। ঘুষখোরদের ধরে তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দানের ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া ঘুষ কেন খায়, কোন্ কোন্ স্থানে ঘুষের প্রচলন বেশী ইত্যাদি তথ্যাবলী সংগ্রহ করে তা রোধ কল্পে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক কথায় ঘুষখোর দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে সামাজিকভাবে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

হাদিয়া (উপহার) আদান-প্রদান করা

হাদিয়া অর্থ উপহার বা উপঢৌকন। এটা নগদ অর্থও হতে পারে, আবার পণ্য সামগ্রীও হতে পারে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য এবং পারলৌকিক সাওয়াবের উদ্দেশ্যে কাউকে কোনরূপ বিনিময় ব্যতীত যা কিছু দেয়া হয় তাই হাদিয়া। হাদিয়া আদান প্রদানের ক্ষেত্রে কাউকে খুশি করার মাধ্যমে দুনিয়াবী কোন স্বার্থ অর্জন করা উদ্দেশ্য থাকে না। উদ্দেশ্য থাকে কেবলমাত্র পারলৌকিক সাওয়াব লাভ এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জন। হাদিয়া সাধারণত ব্যক্তির সততা, তাক্বওয়া, দ্বীনদারী ও পরহেযগারীর উপর ভিত্তি করেই দেয়া হয়। সুপাত্রে হাদিয়া দেয়া এবং তা গ্রহণ করা সুন্নাত এবং অনেক পুণ্যের কাজ। হাদিয়া আদান-প্রদানের মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে মহব্বত ও আন্তরিকতা সৃষ্টি হয়।

হযরত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হাদিয়া গ্রহণ করতেন এবং এর প্রতিদান দিতেন-

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا اَنَّ النَّاسَ كَانُوْا يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ يَبْتَغُوْنَ بِهَا اَوْ يَبْتَغُوْنَ بِذَالِکَ مَرْضَاةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

অর্থাৎ-হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট তাদের হাদিয়া (উপহার)সমূহ পাঠাবার জন্য হযরত আয়েশার দিনের (অর্থাৎ যেদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশার ঘরে থাকবেন) অপেক্ষা করতেন। এর পেছনে তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য হতো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সন্তুষ্টি লাভ করা। [সহীহ্ বোখারী শরীফ]

عَنْ عَـائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَ يُثِيْبُ عَلَيْهَا۔

অর্থাৎ হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হাদিয়া গ্রহণ করতেন এবং এর প্রতিদানও দিতেন। [সহীহ্ বোখারী শরীফ]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে নিজ থেকেই কিছু দান (হাদিয়া) করতেন। একদিন ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, এয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়কা ওয়াসাল্লাম! যে ব্যক্তি আমার চেয়ে বেশী অভাবগ্রস্ত তাকে দিন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, সাওয়াল না করে অর্থাৎ না চেয়ে যে জিনিস পাওয়া যায় তা ফিরিয়ে দিওনা বরং গ্রহণ কর। অতঃপর ইচ্ছে হলে তা নিজের নিকট রাখবে, ইচ্ছ হলে সাদক্বাহ্ করে দেবে। আর যে জিনিষ না চেয়ে পাওয়া যাবে না তার জন্য আকঙক্ষা করো না। [সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফ]

ঘুষ ও হাদিয়ার মধ্যে পার্থক্য

'রিশওয়াত' (ঘুষ) ও 'হাদিয়া' (উপহার) বাহ্যিকভাবে দেখতে প্রায় একই দেখায়। তাই অনেকে ঘুষ ও হাদিয়ার মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। যারা ঘুষ খায় এবং ঘুষ দেয় তারা বর্তমানে ঘুষের নাম-পরিবর্তন করে একে হাদিয়া, উপহার, উপঢৌকন, সম্মানী, ভালবাসার নিদর্শন ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করে আদান-প্রদান করে থাকে। আসলে এ দু'য়ের মধ্যে রয়েছে বিরাট পার্থক্য। নিম্নে ঘুষ ও হাদিয়ার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য লিপিবদ্ধ করা হলোঃ

ঘুষঃ ঘুষ হারাম এবং কবীরাহ্ গুনাহ। ঘুষ আদান-প্রদানের মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে কোন মুহব্বাত সৃষ্টি হয় না; বরং প্রতিহিংসা, প্রতিশোধ এবং পরস্পরের মধ্যে বৈরী মনোভাব সৃষ্টি করে। ঘুষ আদান প্রদানে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জন কিংবা পারলৌকিক কোন উদ্দেশ্য থাকে না; বরং মূল উদ্দেশ্য থাকে বিশেষ ব্যক্তিকে খুশি করার মাধ্যমে নিয়ম বহির্ভূতভাবে ব্যক্তি স্বার্থ কিংবা দুনিয়াবী কোন সুযোগ-সুবিধা লাভ করা। ঘুষের ক্ষেত্রে গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়। কেননা এটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ ছাড়া কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদমর্যাদা ও চেয়ারের ক্ষমতা ভেদে ঘুষের পরিমাণ উঠানামা করে। সরকারী ও বেসরকারী অফিসে বেতনভুক্ত কর্মচারী নিয়োগ করা হয় জনগণের কিংবা প্রতিষ্ঠানের গ্রাহকদের সেবা করার জন্য তথা তার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার জন্য; যাতে জনগণ কিংবা প্রতিষ্ঠানের গ্রাহকগণ কোন কষ্ট না পায় এবং তারা যাতে তাদের ন্যায্য অধিকার যথাযথভাবে লাভ করতে পারে। নিয়োগ প্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবে, বিনিময়ে প্রতিষ্ঠান তাদেরকে চুক্তি মোতাবেক পারিশ্রমিক দিয়ে দেবে। এক্ষেত্রে কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ কর্তৃক তাদের কাজের বিনিময়ে গ্রাহকদের নিকট হতে যদি কোন কিছু গ্রহণ করে তাহলে তা হবে ঘুষ। ঘুষ সাধারণত কোন অনুগ্রহ, দয়া বা অন্য কোন কিছুর বিনিময়ে দেয়া হয়।

হাদিয়াঃ হাদিয়া দেয়া ও তা গ্রহণ করা সুন্নত এবং অনেক পূণ্যের কাজ। হাদিয়া আদান প্রদানের মধ্যে মহব্বত ও আন্তরিকতা সৃষ্টি হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে হাদিয়া আদান প্রদানের জন্য উৎসাহ প্রদান করেছেন এবং তিনি নিজেও হাদিয়া দিতেন ও গ্রহণ করতেন। হাদিয়া আদান-প্রদানের মধ্যে একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে পারলৌকিক তথা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জন করা। ব্যক্তি স্বার্থ কিংবা পার্থিব জীবনে কোন সুযোগ সুবিধা লাভ করা উদ্দেশ্য থাকে না; বরং এ বিষয়ে হাদিয়া দাতা হাদিয়া গ্রহীতার নিকট কোন রূপ মুখাপেক্ষীও নয়। হাদিয়ার ক্ষেত্রে কোন বিনিময় থাকে না। হাদিয়া সাধারণত ব্যক্তির তাক্বওয়া দ্বীনদারী, পরহেযগারী ইত্যাদির উপর ভিত্তি করেই দেয়া হয়ে থাকে। এ ছাড়া হাদিয়ার ক্ষেত্রে গোপনীয়তা রক্ষা করা শর্ত নয়। তবে গোপনীয়তা রক্ষা করা উত্তম।

----<>----

ব্যাংক ও বীমা

সুদমুক্ত ব্যাংক ব্যবস্থা

এক

একালের অর্থ ব্যবস্থা মূলত নিরংকুশ ব্যক্তি মালিকানা ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা। সুদ ব্যবস্থা এ অর্থনীতির মেরুদন্ডে পরিণত হয়েছে। পুঁজিবাদী সমাজে সাধারণ মানুষের সুখ-সুবিধা ও অর্থনৈতিক উন্নতি সর্বতোভাবে উপেক্ষিত ও অন্যায়ভাবে অপহৃত হয়ে থাকে। এ ব্যবস্থায় ব্যাংক ও বীমা হয় ব্যক্তিগত শোষণের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা বাহ্যত এর বিপরীত। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রই হয় সকল বিত্ত-সম্পত্তি ও উৎপাদন-উপায়ে একচ্ছত্র মালিক ও অধিকারী। ব্যক্তিরা তথায় কোনরূপ মুনাফা, সুদ বা বোনাস কিংবা লভ্যাংশ পাওয়ার অধিকারী হয় না। ওই ব্যবস্থায় সকলকেই শ্রম দিতে হয় এবং তারা শ্রমের বিনিময়ে শুধু মজুরী পাওয়ার অধিকারী হয়ে থাকে। তারা সকলেই হয় রাষ্ট্রের মালিকানাধীন জমির চাষী, কল-কারখানার শ্রমিক এবং অফিস বা দোকানের নির্দিষ্ট পরিমাণের বেতনভুক্ত কর্মচারী মাত্র। এ অর্থ ব্যবস্থায় ব্যাংক ও বীমা ইত্যাদি চলে রাষ্ট্রের মালিকানাধীন। সারাদেশে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন একটা সর্বাত্মক অর্থ ব্যবস্থা গড়ে উঠে। জাতির দু'টি শক্তি-একটি রাজনৈতিক অপরটি অর্থনৈতিক। পুঁজিবাদী সমাজে রাজনৈতিক শক্তি রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীন থাকলেও অর্থনৈতিক শক্তি থাকে জনগণের হাতে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এ দু'টি শক্তিই একান্তভাবে চলে যায় রাষ্ট্রের নিরংকুশ কর্তৃত্বের অধীনে। ফলে জনগণের স্বাধীনতা বলতে কিছুই থাকে না। থাকে না স্বাধীনভাবে মাথা তুলে দাঁড়াবার কোন স্বতন্ত্র ভিত্তি। ফলে, রাষ্ট্রের মুষ্টিমেয় শাসকরা সেখানে হয়ে বসে একচ্ছত্র ডিকটেটর।

সমাজতন্ত্রে সাম্যের গালভরা দাবি আকাশ-বাতাস ভারী করে; কিন্তু কার্যত, জনগণের সর্বপ্রকারের স্বাধীনতা এবং নিম্নতম মানবিক অধিকারও সম্পূর্ণরূপে হরণ করে নেয়। পুঁজিবাদী সমাজে তা হয় আকাশকুসুম কল্পনা মাত্র। সমাজতন্ত্রকে যদি বলা যায় রাষ্ট্রীয় স্বৈরতন্ত্র তাহলে পুঁজিবাদ হচ্ছে অর্থনৈতিক শোষণের লীলাক্ষেত্র।

ইসলামী অর্থব্যবস্থা মৌলিকভাবে এ দু'টি অর্থ ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। ইসলাম হচ্ছে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বিশ্বমানবের জন্যে দেয়া স্বভাবসম্মত ও মানবিক সাম্যের প্রতীক পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। অর্থনৈতিক

ক্ষেত্রে ইসলামের নীতি ও দৃষ্টিকোণ পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র-উভয় থেকেই সম্পূর্ণ আলাদা। এ দু'টি যেমন দু' প্রান্তিক ব্যবস্থা, তেমনি ইসলাম এক মধ্যবর্তী, সুবিচার ভিত্তিক ও ভারসাম্যপূর্ণ অর্থ ব্যবস্থা। পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক শোষণ এবং সমাজতান্ত্রিক বঞ্চনা ও নির্যাতন থেকে ইসলামী অর্থ ব্যব্যস্থা সম্পূর্ণ মুক্ত। উপরন্ত ওই দু'টি ব্যবস্থায় ব্যক্তির জন্যে কোনরূপ নিরাপত্তাই নেই, কিন্তু ইসলামে রয়েছে মানুষের জীবন ও জীবিকার সমান গুরুত্ব সহকারে পূর্ণ মাত্রার নিরাপত্তার ব্যবস্থা। তাতে ব্যক্তির অধিকার ও মালিকত্বের নিশ্চয়তা পুরোপুরি বর্তমান; কিন্তু তাই বলে সমাজ সমষ্টির অন্যান্য শ্রেণীর অধিকার ও স্বার্থের ওপর কোনরূপ আঘাত হানার সুযোগ রাখা হয়নি। কতিপয় ব্যক্তির হাতে জাতীয় সম্পদের একীভূত হওয়াকে ইসলাম সমর্থন করেনি। বিভিন্ন উপায় ও পন্থার প্রবর্তনের সাহায্যে ইসলাম সমাজের লোকদের মধ্যে জাতীয় সম্পদের ব্যাপক বিস্তৃতির কার্যকর ব্যবস্থা করেছে। প্রাকৃতিক সম্পদের ন্যায্য অংশ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়েছে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে।

ইসলামী সমাজে উৎপাদনে, ব্যবসায়ে ও মুনাফায় মূল ব্যবসায়ী, কর্মাধ্যক্ষ তা থেকে প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রাপ্য পেয়ে যাবে। সমতা ও সুবিচারপূর্ণ বন্টননীতি ইসলামী অর্থনীতির একটা বিশেষ ও তুলনাহীন অবদান। তারা সমষ্টিগতভাবে যা সঞ্চয় করবে, মূলধনের যা কিছু বাড়তি মূল্য পাবে, তাতে তারা সকলে সমতাপূর্ণ মালিকানার অধিকারী হবে, আর তা যেমন ব্যক্তির কল্যাণে নিয়োজিত ও ব্যয়িত হবে, তেমনি হবে সমষ্টির কল্যাণেও।

ইসলামের দৃষ্টিতে একটি আদর্শ সমাজের ভারসাম্যপূর্ণ নীতি হচ্ছে ন্যায়পরায়ণ পক্ষপাতশূন্য বন্টন। সমাজতন্ত্রে আর্থিক সাম্য বা সমান বন্টনের শ্লোগান দেয়া হয় বটে, কিন্তু কার্যত তা একটা ভিত্তিহীন ও অবাস্তব দাবি মাত্র। এই বাস্তব জগতে 'সমান বন্টন' অথবা পরিমাণে সাম্য কিংবা মাত্রায়-সাম্যের কোন স্থান নেই । মেধা, স্বাস্থ্য, আকার-আকৃতি, সৌন্দর্য, যোগ্যতা, কর্মশক্তি ও বিচার বিবেচনা, বুদ্ধি প্রভৃতি খোদায়ী অনুদানে কোথাও 'সমান' খুঁজে পাওয়া যাবে না।, তাই 'সমান পরিমাণ বন্টন' কথাটি নিতান্ত প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সূচনায় এ পর্যায়ের চেষ্টা চরমভাবে ব্যর্থ হয় । কারণ, হাত বা পায়ের পাঁচটি আঙ্গুলও সমান দীর্ঘ নয়, তাই বলা যায় দুনিয়ার অর্থনীতিতে সমান পরিমাণের কোন অস্তিত্ব নেই। ইসলামে পরিমাণ-সাম্যের পরিবর্তে অধিকার ও সুযোগ-সুবিধায় সাম্যের ব্যবস্থা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান।

পাশ্চত্যের পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে একটি প্রধান মারাত্মক রোগ হচ্ছে অবাধ সুদপ্রথা। ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার সাথে তার মৌলিক বিরোধের এটাই প্রধান কারণ। কেননা সুদ হচ্ছে মানুষকে শোষণ এবং তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার একটা বড়

মাধ্যম। পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থায় হালাল-হারামের কোন তারতম্য বিচার নেই। ইসলামী অর্থনীতিতে এই প্রশ্ন অধিকতর প্রবল ও প্রকট। ইসলাম উপার্জনের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম এ প্রশ্নই তুলে ধরে প্রত্যেকটি মুসলিমের সম্মুখে। তা যেমন উপায় ও পন্থার ক্ষেত্রে, তেমনি দ্রব্য ও বস্তুর ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। এটা ইসলামের একটা শাশ্বত বিধান। সুদ প্রথা ইসলামে চিরঘৃণ্য, চির পরিত্যাজ্য এবং চিরকালের জন্যে হারাম। কেননা, সুদী কারবারে ব্যক্তিগত অর্থলোভ ও স্বার্থবাদিতা চরিতার্থ করার অবাধ সুযোগ থাকে। নিতান্ত ঠেকায় পড়া মানুষকে নির্মমভাবে শোষণ করা হয়। ইসলাম তা কোনক্রমেই সমর্থন করতে পারে না। তাছাড়া তাতে যেমন পরের ধনে পোদ্দারী, তেমনি প্রকৃত একশ' টাকাকে একহাজার টাকায় স্ফীত করে মূলধনের কৃত্রিম বৃদ্ধির প্রবণতা বিদ্যমান। বিশেষ করে আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থায় এটা সাংঘাতিকভাবে প্রকট। ব্যাংক ব্যবস্থার ইতিহাসই তা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে। ইসলাম সুদমুক্ত অর্থ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাতা। তাই সুদভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থা ইসলামী সমাজে অচল। তবে সুদ মুক্ত ব্যাংক ব্যবস্থা ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে। স্মরণ করা যেতে পারে, প্রাচীন সমাজে লোকেরা তাদের স্বর্ণালংকার বা নগদ টাকা নিরাপদ ব্যক্তির হাতে সংরক্ষণের লক্ষ্যে গচ্ছিত রাখতো। আমানতদার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা তার জন্যে রশিদ দিতে শুরু করেন, যেন সেই রশিদ দেখিয়ে প্রত্যেকেই নিজ নিজ গচ্ছিত সম্পদ ফেরত নিতে পারে। এ জন্যে আমানতদার নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা বাবদ কিছু অর্থ আদায় করে নিতেন।

দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় দেখা গেলো, গচ্ছিত সম্পদের খুব বেশি হলেও এক দশমাংশের অধিক ফেরত চাওয়া বা নেয়া হয় না। অবশিষ্ট সম্পদ আমনতদারের নিকটই পড়ে থাকে। তারা এই ফেরত না নেওয়া ও তাদের নিকট বিনা কাজে পড়ে থাকা সম্পদকে সুদের ভিত্তিতে বিনিয়োগ করার একটা মহা সুযোগ পেয়ে গেলো। তারা এই বিনিয়োগে মূলে স্বর্ণালংকার বা গচ্ছিত নগদ টাকা হস্তান্তর করার কোন প্রয়োজনও দেখতে পেলো না। তারা পার্থিব ঋণের বদলে তার রশিদ দিতে শুরু করলো। তা থেকে নিঃসন্দেহে বোঝা যেতো যে, রশিদে লিখিত পরিমাণের স্বর্ণ বা নগদ সম্পদ তাদের নিকট গচ্ছিত রয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, কেউ এক হাজার টাকা মূল্যের স্বর্ণালংকার আমানত রাখলো। অর্থ বিনিয়োগকারী তার মোকাবেলায় এক হাজার টাকা মূল্যের দশটি রশিদ তৈরি করলো, এ রশিদের প্রতিটি তার নিকট এক হাজার টাকার স্বর্ণ মওজুদ থাকার প্রমাণ হয়ে দাঁড়াল। তার একটি রশিদ দিল তাকে যে গচ্ছিত রাখল, আর অপর নয়টি রশিদ সুদের ভিত্তিতে দিল তাদের যারা সুদের ভিত্তিতে ঋণ গ্রহণ করতে চেয়েছিল। সেভিংস একাউন্ট ও ফিক্সড ডিপোজিটের নামে মাত্র সুদ দেয়া হয়; কিন্তু কারেন্ট একাউন্টে কোন সুদ দেয়া হয় না অথচ মোট ব্যাংক একাউন্টের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগই হচ্ছে এই কারেন্ট একাউন্টের জমা।

দুই

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, উক্ত দুই ধরনের জমায় সুদ দেয়া হয় কেন? বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ এ প্রশ্নের বিভিন্ন জবাব দিয়েছেন।

ক. ঋণদাতা যখন টাকা দেয় তখন সে একটা ঝুঁকি গ্রহণ করে বলে এই ঝুঁকি গ্রহণের বিনিময়ে তাকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ মূল্য দেয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে। একে বলা হয় ঝুঁকির মূল্য।

খ. ঋণদাতাকেও বিবেচনায় রাখতে হয় এবং তাকে কর্মচারীর বেতন, যন্ত্রপাতি, ঘর, অফিস ইত্যাদির ভাড়া বা ক্রয় খরচ বহন করতে হয়। এ সব খরচের বিনিময়ে তার কিছু না কিছু প্রাপ্য হয়। এ হচ্ছে ব্যবস্থাপনা খরচ।

গ. ঋণদাতা তার সংগৃহীত মূলধণের একটা অংশ ঋণ বাবদ দেয় বলে তাকে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। তার এ অসুবিধাগুলো দূর করার জন্যে তার টাকার ওপর কিছু না কিছু অবশ্যই প্রাপ্য হতে পারে।

ঘ. গোটা অর্থনৈতিক কার্যক্রমটি মূলধনের ওপর নির্ভরশীল। ব্যক্তিরা নিজেদের প্রয়োজন পরিহার করে সঞ্চয় করে বলে এ মূলধন সঞ্চিত হয়। এ মূলধন তাদের ত্যাগের প্রতীক। সেজন্যে কোনরূপ প্রলোভন না থাকলে তারা সঞ্চয়ই করবে না। এদের মত লোকদের মধ্যে সঞ্চয়ের প্রবণতা সৃষ্টির একমাত্র উপায় হচ্ছে সুদের প্রলোভন। তাই সুদ না থাকলে লোকেরা অন্যদের জন্যে মূলধন সঞ্চয় করবে কেন?

ঙ. সময়ের ব্যবধানে টাকার মূল্য কমে যেতে পারে। ৫০০ টাকার মূল্যের পণ্য উৎপাদনে এক বছর পর ৫৫০ টাকা লাগতে পারে। এ জন্যে ঋণদাতার কিছু অতিরিক্ত পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকা দরকার।

পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা সুদের ভিত্তি ছাড়া সম্পূর্ণ অচল। সে কারণে সুদ দেয়ার যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্যে সাধারণত এ কথাগুলোই বলা হয়। এক্ষণে এর প্রতিটি কথার বিশ্লেষণ করলে প্রমাণিত হবে যে, আসলে মূলধন ঋণের ক্ষেত্রে সুদ দেয়া আদৌ যুক্তিসঙ্গত নয়। আমরা ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে বলবো-

ক. ঋণদান একটা ঝুঁকি বটে, কিন্তু সে জন্যে সুদ দেয়ার কোন প্রয়োজন থাকতে পারে না। টাকার বিনিময়ে অতিরিক্ত টাকা গ্রহণ সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং নৈতিক সব দিক দিয়েই অমানবিক এবং এ প্রথা অত্যন্ত মারাত্মক।

খ. ঋণদাতার ঝুঁকির মূল্য সুদ হতে পারে না কখনই। কেননা ঋণ বাবদ দেয়া টাকার তুলনায় সুদের টাকার পরিমাণ অনেক কম। তাই তা ঋণের ক্ষতিপূরণও হতে পারে না। ঋণের টাকা পরিশোধ করা না হলে সুদ নিয়ে ঋণদাতার কোন ফায়দা হবে না। পুঁজিবাদী সমাজে এ সুদের প্রকৃত কোনই মূল্য হয় না; কিন্তু ইসলামী সমাজে ঋণবাবদ পাওয়া টাকা মেরে দিতে পারে না। তাই ঝুঁকির মূল্য হিসেবে সুদ ধার্য করারও কোন প্রশ্ন উঠে না। ফলে সুদের Risk theory সম্পূর্ণ অর্থহীন।

গ. ব্যাংকের প্রাতিষ্ঠানিক খরচাদি সুদ না দিয়েও ব্যাংকের মুনাফা ভিত্তিক বিনিয়োগ প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা পূর্ণ করা চলে।

ঘ. অন্য লোকদের অসুবিধা দূর করণার্থে যদি কেউ কোন টাকা ধার দিয়ে ত্যাগ স্বীকার করে, তাহলে সুদ বাবদ প্রাপ্ত সামান্য অর্থ তার বিনিময় হতে পারে না। ঋণদাতা অভাবগ্রস্ত লোকদের অভাব মোচনার্থে সাময়িকভাবে ঋণ দিয়ে একদিকে নিজে মানসিক প্রশান্তি ও স্বস্তি পেতে পারে এবং অপরদিকে আল্লাহর রাসূলের সন্তুষ্টি ও অর্জন করতে পারে। সামান্য সুদ তার মূল্য হতে পারে না; যদিও পুঁজিবাদী সমাজে এই মানসিক প্রশান্তি ও আল্লাহর রাসূলের সন্তুষ্টির কোন মূল্য নেই। কেননা আল্লাহ ও রাসূলকে বাদ দিয়েই তো তাদের জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্র।

ঙ. সুদ পাওয়ার আশাটাই মূলধন সঞ্চয়ের একমাত্র প্রেরণা হতে পারে না। বহু লোক তো নিজস্ব প্রেরণায়, স্বীয় ও স্বীয় পরিজনের ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের চিন্তায় মূলধন সঞ্চয় করে থাকে, তাছাড়া স্বাভাবিক মিতব্যয়িতার কারণেও অনেকে সঞ্চয় করে, কোনরূপ মুনাফা বা সুদে লগ্নি করার ইচ্ছা ছাড়াই। আবার অনেকে স্বাভাবিকভাবেই অর্থের অপচয়কারী হয়ে থাকে, সুদের আশা বা আকর্ষণেও তারা মিতব্যয়িতা রক্ষার দিকে কিছুমাত্র ভ্রুক্ষেপ করে না। তাই সুদ ব্যবস্থাকে সঞ্চয়ের আসল প্রেরণা বলা সম্পূর্ণ অবাস্তব কথা।

চ. দ্রব্যমূল্য ক্রমশ বৃদ্ধি পায়- একথা সত্য হলেও তা সব সময়ই যে সত্য হবে, এমন কথা নেই। মুদ্রা পরিবেশনের হার বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে সমান মাত্রায় উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেই মূল্যমান স্থিতিশীল হতে পারে। সঞ্চিত মূলধন সুদ ছাড়া ও শুধুমাত্র মুনাফার ভিত্তিতে বিনিয়োগ করা যেতে পারে। অভাবগ্রস্ত মানুষের নিঃস্বার্থ সহায়তা করাই যদি ইচ্ছা থাকে, তাহলে ঠেকায় পড়া ও বিপদগ্রস্ত লোকদের কোনরূপ সুদ ছাড়াই টাকা দেয়া বাঞ্ছনীয়। অভাবগস্ত ও বিপদগ্রস্ত মানুষের অসুবিধার সুযোগ নিয়ে তাকে সুদ দিতে বাধ্য করা আর যা-ই হোক, মানবিক কাজ হতে পারে না। কেননা, ঠেকায় পড়া এ লোকটির পক্ষে ‘আসল’ দেয়াই দুরূহ ব্যাপার। তার ওপর সুদ দিতে তাকে বাধ্য করা তো মড়ার ওপর খাড়ার ঘা হয়ে দাঁড়ায়। তাই সাময়িক ঋণদানের কাজটিকে মানবিক ও সৌজন্যমূলক করে রাখাই কর্তব্য। তাকে কখনও শোষণের সুযোগ বা হাতিয়ার করে রাখা উচিত হবে না। বিপদে সাহায্যকারী মানুষ অবশ্যই আল্লাহর সাহায্য

লাভ করতে সক্ষম হবে, এই দুনিয়ারও যেমন, তেমিন পরকালে হাশরের দিনের কঠিনতম সময়েও। এটা স্বভাব সম্মত ও অনাসক্ত চিন্তার সফল। তাই পুঁজিবাদী সমাজেও এরূপ চিন্তার সন্ধান পাওয়া যায়। পুঁজিবাদী সমাজে Mills সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যিনি সভ্যতার অগ্রগণ্য বাহন হিসেবে সূদের হার যত কম করা যায় তার ব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয়তা প্রকাশ করেছেন। অর্থনীতি বিশারদ লর্ড কীন্সও এটাই চিন্তা করেছেন। কয়েকজন অর্থনীতিবিদ এ মতও দিয়েছেন যে, মূলধন যদি অপ্রাচুর্যতা ও দুস্প্রাপ্যতার চরিত্র হারিয়ে ফেলে অর্থাৎ অবাধে পাওয়া যায়, তাহলে সুদের হার শূণ্যতে নেমে যেতে পারে এবং তাই বাঞ্ছনীয়।

এ পর্যায়ে প্রশ্ন উঠে, সুদের হার নিশ্চিত করে কোন্ Factorগুলো? এক কথায় বলা যায়, ঋণবাদে পাওয়ার যোগ্য মূলধনের চাহিদার তারতম্যের ভিতিতেই সুদে হারের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। ঋণের চাহিদা এবং মূলধন পরিবেশেনের সম্ভাব্যতার ওপর তা একান্তভাবে নির্ভর করে। ঋণদাতাদের সংখ্যা কম এবং ঋণ-গ্রহীতার সংখ্যা বেশি হলে সুদের হার বৃদ্ধি পাবে। পক্ষান্তরে কারো কারো মতে, টাকার মালিকরা যদি ঋণ দিতে আগ্রহী না হয় তাহলে তারা উচ্চ হারের সুদের দাবি করে। এর বিপরীত তারা যদি অন্যদের চাহিদা মেটাতে আগ্রহী হয়, তাহলে সুদহার এমনিতেই কমে আসে। এ কারণে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ যখন ঋণের চাহিদা বেশি দেখতে পায়, তখন সুদ হার বাড়িয়ে দেয়। আর চাহিদা বেশি না দেখলে সুদ হার কমিয়ে দেয়। এ ছাড়া দীর্ঘমেয়াদী ঋনের সুদহার উঁচু হতে পারে। তা অবশ্য ঋণ প্রয়োগকারী লোকদের যোগ্যতার উপর অনেকটা নির্ভর করে। অনেক সময় ব্যাংক ব্যক্তিদের হাতে সঞ্চিত মূলধনকে নিজের আয়ত্বে নিয়ে অধিক পরিমাণে সুদের ব্যবসায় করার লক্ষ্যে সুদের হার বাড়িয়ে দিয়ে থাকে।

বস্তুত পুঁজিবাদী সমাজে বিনিয়োগের মাত্রার সাথে সুদহার ওঁৎপ্রোতভাবে জড়িত। বিনিয়োগ মাত্রা কম হলে সুদহার কম হবে, আবার বিনিয়োগ মাত্রা উঁচু হলে সুদহারও উঁচু হবে, অন্য কথায় সুদ হারের উচ্চতা বেকারত্বের মাত্রাতিরিক্ততার কারণ ও সুদহারের হ্রাস প্রাপ্তি বেকারত্বের মাত্রা হ্রাসের কারণ।

"Higher the rate of interest, higher the level of unemployment and lower the rate of interest,lower the level of unemployment" বিশিষ্ট অর্থনীতিবদের নিকট এই কথাটি একটি অর্থনৈতিক ফর্মূলা হিসেবে স্বীকৃত, তাই আমরা বলতে পারি যে, বিনিয়োগ (Investment) ও কর্মে নিযুক্তি (employment) সুদ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এর অর্থ, আয়ের উৎপাদন ক্রিয়া সূদ দ্বারা পরিলিখিত। অতএব, সুদের উচ্চতর হার আয় ও কর্মযোগানের নিম্মমানের কারণ। ফলে এ ক্ষেত্রে সঞ্চয়েরও নিম্নহার অবধারিত।

এর বিপরীত উচ্চমানের সঞ্চয় হবে সুদহার শূন্য হলে। জাতীয় ভিত্তিক উচ্চমানের আয় সম্ভব হবে কেবল ওই শূন্যহারের সুদ ব্যবস্থা কার্যকর হলে অর্থাৎ সুদ ব্যবস্থা নির্মূল হলে।

নিম্নমানের মজুরী, অযৌক্তিক মুনাফা, উচ্চতর দ্রব্যমূল্য এবং ব্যক্তিগত আয় ও নবতর পুঁজিনীতির কৌশলের মধ্যকার ক্রমবর্ধমান পার্থক্য জাতীয় জীবনে একটি কঠিন দোষ ও খুঁত বিশেষ। এ দোষ ও খুঁতের একমাত্র প্রতিবিধান হচ্ছে elimination of interest সুদ ব্যবহারের অবসান সাধন।

প্রচলিত ব্যবস্থায় জনগণ তাদের শ্রম ও মেধা এমন একটা উদ্যোগে বিনিয়োগ করে, যাতে তারা তাদের পুঁজি বিনিয়োগ করে বিরাট ক্ষতির ঝুঁকি বহন করে মাত্র। কিন্তু যারা ঋণ বাবদ মূলধন দিয়েছে, তারা স্বীকৃত পরিমাণের সুদটা অবশ্যই পেয়ে যাবে। মূল উদ্যোগটা ব্যর্থ হোক কি সফল তা নিয়ে তাদের কোন মাথা ব্যথা থাকে না। এই অবস্থা অর্থনীতির ন্যায়পরায়ণ আদর্শ বা যৌক্তিকতার সাথে কিছুমাত্র সামঞ্জস্যশীলও নয়।

বস্তুত সুদভিত্তিক অর্থনৈতিক সমাজে অর্থাৎ পুঁজিবাদী সমাজে অর্থাগমনের উপায়সমূহের প্রতিই অধিকতর আগ্রহী।

তিন

সাধারণতঃ মনে করা হয় যে, এক সাথে দু'টি অর্থাগমনের পরিকল্পনা লোক সমক্ষে প্রসিদ্ধঃ একটি আবাসিক গৃহ নির্মাণ পরিকল্পনা- যা গৃহহীনদের আশ্রয়ের কাজ দেবে। আর দ্বিতীয়টি সিনেমা হল- যা অর্থ ও অবসর প্রাপ্ত লোকদের চিত্তবিনোদনের কাজ করবে। প্রথমটিতে সিনেমার আয়ের তুলনায় মুনাফার মাত্রা কম হলেও তা অধিকতর জনকল্যাণমূলক আর দ্বিতীয়টিতে বিপুল মুনাফার সম্ভাবনা থাকে। এমতাবস্থায় লোকেরা সাধারণত প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয়টিতে মূলধন বিনিয়োগে অধিকতর আগ্রহী হবে এবং সেজন্যে উচ্চতর হারের সূদের শর্তে ঋণ গ্রহণে প্রস্তুত হবে। এরূপ অবস্থা চলতে দিলে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন অবাস্তবই থেকে যাবে। এ থেকে বোঝা গেল, সুদ সামাজিক জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনার একটি অতি বড় কারণ। এক্ষণে ঋণের দাবির স্বরূপ নির্ধারণ করা যেতে পারে। বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণকারীর সাধারণ শ্রেণীভিত্তিক নিম্নলিখিতরূপ হতে পারেঃ

১. সমাজে এমন বহুলোক রয়েছে, যাদের মূলধন নেই এবং ঋণের নিরাপত্তা হিসেবেও কিছু পেশ করতে পারে না, ব্যবসায়ের জন্যে ঋণ করে মূলধন সংগ্রহ করা ছাড়া তাদের অন্যকোন উপায়ও নেই, তারা ঋণের টাকা ফেরত দেবে এ ওয়াদার ব্যক্তিগত জামানতের ভিত্তিতে তারা ঋণ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। একে বলা যায় unsecured loan (জামানত বিহীন ঋণ)।

২. কতিপয় লোক পণ্যদ্রব্য বন্ধক রেখে ঋণ গ্রহণ করে। ঋণের টাকা ফেরত দিয়ে পণ্য দ্রব্য মুক্ত করে নেয়। একে বলা হয় Short-term secured borrower's wishing temporary loans (স্বল্প মেয়াদী জামানতী ঋণ)।

৩. অনেকে শিল্প ব্যবসায়ে বিনিয়োগের জন্যে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ গ্রহণ করে থাকে। এ হচ্ছে Long term loans (দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ)।

৪. ব্যাংকে ব্যক্তিগত একাউন্টে Overdrafts (অতিরিক্ত টাকা তোলা)।

সুদমুক্ত ব্যাংক ব্যবস্থায় নিম্নোক্ত ধরনের কার্যক্রম চলতে পারে

ক. প্রথম ধরনের ঋণের শর্ত আরোপ করা যেতে পারে, ঋণ গ্রহীতা তার ব্যবসায়ের মুনাফার একটা অংশ ব্যাংককে দিতে বাধ্য থাকবে। ব্যবসায়ে লোকসান হলে ব্যাংক শুধু ঋণবাবদ দেয়া মূলধনটাই ফেরত পাওয়ার শর্ত আরোপ করতে পারে, তার অতিরিক্ত কিছু নয়।

খ. এ অবস্থায় ব্যাংক মূল ব্যবসায়ে লাভ লোকসানে শরীক থাকার শর্ত আরোপ করতে পারে। এ ক্ষেত্রে ব্যাংক মূল ব্যবসায়ে সক্রিয় অংশীদার হবে না, বরং Sleeping এর ন্যায় থাকবে।

গ. কোন শিল্প-কারখানায় বিনিয়োগের জন্যে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ চাইলে ব্যাংক অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে মূলধন যোগান দিতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে ব্যাংক তার প্রতিনিধির মাধ্যমে শিল্পোৎপাদনের কাজে অংশ গ্রহণ করতে পারে। এরূপ অবস্থায় লাভ ও লোকসান বন্টন করা হবে বিনিয়োগকৃত মূলধনের হার অনুপাতে এবং ব্যাংকও সেভাবেই কারখানার অংশীদার হবে। আমরা মনি করি, সুদের ভিত্তিতে মূলধন দিলে ব্যাংক সুদ বাবদ যতটা পাবে, তার তুলনায় অনেক বেশি মুনাফা পেতে পারে উৎপাদনে অংশীদার হিসেবে শরীক থেকে।

ঘ. ব্যাংক একান্ত অস্থায়ীভাবে একাউন্ট হোল্ডাদেরকে ওভারড্রাফ্‌ট দিতে পারে একটা নির্দিষ্ট পরিমান সীমা পর্যন্ত এবং তার জন্যে ব্যাংক প্রয়োজনীয় ফী কিংবা আনুষাঙ্গিক (Ineidental) চার্জের ক্ষেত্রে এ একটি শরিয়তসম্মত পন্থা উদ্ভাবন করতে পারে। তাছাড়া সমাজে এমন বহু লোকই রয়েছে, ঋণের বিনিময়ে বন্ধক রাখার মতো কোন জিনিসই যাদের নেই। ভবিষ্যতে মূলধনের টাকাটা ফেরত দেয়ার সাধ্যও হয়ত তাদের হবে না। এ ধরনের লোকদের জন্যে ঋণ নয়, আর্থিক সাহায্যদানের ব্যবস্থা ইসলামী সমাজে থাকা আবশ্যক।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, সুদব্যবস্থা না থাকলে প্রয়োজন পরিমাণ মূলধন কেমন করে পাওয়া যাবে? আমরা মনে করি, সুদী ব্যবস্থা না থাকলেও মূলধনের কোন অভাব হবে না। মনে করা যায়, ঋণগ্রহীতা হয়তো এক লাখ টাকা ঋণ নিলো। সে

হয়তো কোন পাইকারী দোকানদারের নিকট থেকে সে টাকা দিয়ে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করলো। পাইকারী দোকানদার পরের দিনই হয়ত ওই এক লাখ টাকা ওই ব্যাংকেই জমা রেখে যাবে। এরূপ অবস্থায় তা রিজার্ভ রেখে অবশিষ্ট ৯০ হাজার টাকা আবার ঋণ বাবদ দেয়া যেতে পারে। মোটকথা, ব্যাংকের ঋণদানের ব্যাপারটি কখানোই বন্ধ হবে না। অর্থনীতিবিদদের theory হচ্ছে "Every loan generates on indentical deposit and every deposit enables the bank to advance further loan."

সুদপ্রথা রহিত হওয়ার কারণে মূলধনের চাহিদা তাৎক্ষণিকভাবে দ্বিগুণ হয়। আর তা হলে তাতে Bank Credit সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থের অকর্তন বৃদ্ধি পাবে। হিসাব করে দেখা গেছে, শতকরা দশ টাকা হারে রিজার্ভ ফাণ্ড গড়লে একশ টাকার নগদ জমা দ্বারা ব্যাংক ব্যবস্থা ৯০০ টাকার ঋণ মঞ্জুর করতে পারে। জমার গৌণতার কারণে যা প্রথম ৯০ টাকার ঋণ সূচিত করবে। যদ্দিন মূলধন আবর্তনে থাকবে তদ্দিন তা কখনই থেমে যাবে না। সুদই হচ্ছে এ আবর্তনের পথের একমাত্র প্রতিবন্ধক। সুদ প্রথা রহিত হওয়ার দরুন মূলধনের যে চাহিদা বৃদ্ধি পাবে, তা অবশ্যই পূরণ করা যাবে। সুদ বন্ধ হয়ে গেলে মূলধন পাওয়া যাবে না-এটা একটা ভ্রমাত্মক ধারণা মাত্র।

আমরা ইতিপূর্বেও বলেছি, আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থায়ও Current accounts-এ কোনরূপ সুদ দেয়ার রীতি নেই। যদিও ব্যাংকের শতকরা আশিভাগ account ই এই পর্যায়ের। সেভিংস একাউন্টেও অনেকেই সুদ গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে থাকে।

এতে স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, সুদ দেয়ার ব্যাপারটা ততটা গুরুতর কিছু নয়, যতটা গ্রহণের ব্যাপারটা গুরুত্বর ও জটিল। আর তারও সমাধান করা অসম্ভব বা সুকঠিন কিছু নয়। ব্যাংকের সুদভিত্তিক টাকা লগ্নি করার কাজটা বন্ধ করে বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য ব্যবসায়ে মুনাফার অংশ পাওয়ার শর্তের ভিত্তিতে মূলধন বিনিয়োগের ব্যবস্থা চালু করে দিলেই এ পর্যায়ের সুদ প্রথাও রহিত হতে পারে। তাছাড়া L.C. খোলা, টাকার ড্রাফট বানানো, ট্রাভেলিং চেক ইস্যু করা ইত্যাদি সাধারণ কাজ সুদমুক্ত ব্যাংক অনায়াসেই করতে পারবে। প্রচলিত নিয়মে ব্যাংক চার্জ নিয়েই তা চলতে থাকবে। তবে বৈদেশিক ঋণ সুদ ছাড়া পাওয়া যাবে না বলে উপস্থিতভাবে একটা অজুহাত খাড়া করা যেতে পারে বটে।

এ পর্যায়ে প্রথম কথা, আমরা যদি সুদকে 'হারাম' জেনে ও মেনে নিয়েই তা পরিহার করার সিদ্ধান্ত নিই তাহলে যত প্রতিকূল অবস্থারই সম্মুখীন হতে হোক না কেন, তা থেকে পিছপা হওয়া যাবে না, প্রাথমিক পর্যায়ে কিছুটা অসুবিধা দেখা

দিলেও ধীরে ধীরে বৈদেশিক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহও যে আমাদের সুদমুক্ত নীতি মেনে নিয়ে আমাদের সাথে ব্যবসায় বা ঋণদানের কাজ করতে রাজী হবে, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এ জন্যে অবশ্য নীতির ওপর দাঁড়িয়ে থাকার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করতে হবে। ওসব দেশের সাথে কথাবার্তা বলতে গিয়ে কোনরূপ দুর্বলতা দেখানো চলবে না। বিগত দু'টি মহাযুদ্ধে পূর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহ এই সুদের কারণেই চরম দুরবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলো, তারা তাদের রাজস্ব গ্রহণের কর্তৃত্বকে পর্যন্ত আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণে সাপর্দ করতে বাধ্য হয়েছিলো তাদের ঋণের সার্ভিস চার্জ মেটাবার জন্যে। এ ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, সুদভিত্তিক ঋণ গ্রহণ দেশের শুধু সচ্ছলতাকেই ক্ষুণ্ন করবে না, স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকেও পঙ্গু বা বিপন্ন করে দেবে। এর ফলে ঋণদাতা দেশসমূহ ঋণ গ্রহণকারী দেশের তুলনায় সুবিধাজনক পজিশনে থাকে। তারা ঋণের উপর সুদ গ্রহণ করেই ক্ষান্ত হয় না, ঋণ গ্রহণকারী দেশে তাদের পণ্যদ্রব্যের জন্যে একচেটিয়া বাজার সৃষ্টি করতেও সচেষ্ট হয়। এ অবস্থাটা খুবই সুবিধাজনক বিধায় ঋণদাতা দেশগুলো বিনাসুদে ঋণ দিতেও কুণ্ঠিত হবে না।

আমরা স্বীকার করছি, সুদপ্রথা রহিত করা হলে ব্যাংক ব্যবস্থা প্রথম দিক দিয়ে খানিকটা অসুবিধার সম্মুখীন হবে। কিন্তু তবু রাষ্ট্রের সহায়তা ও আনুকূল্য পেয়ে সে অসুবিধা অনায়াসেই কাটিয়ে উঠতে পারবে। আমরা তা যদি বাঁধ, সড়ক নির্মাণ ও তার রক্ষণাবেক্ষণে অর্থ ব্যয় করতে পারি, তা হলে একটা সীমিত সময়ের জন্যে এমন একটা পথ উন্মুক্ত করতে সীমিত পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে প্রস্তুত হবো না কেন, যার ফলে আমরা বেকারত্ব দূর করতে ও উচ্চহারে মজুরী দিতে সক্ষম হবো? যার ফলে মুনাফার পরিমাণ কম হবে, দ্রব্যমূল্য কম থাকবে, সম্পদ বন্টন সুষ্ঠু হবে এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা কার্যকর হবে? বস্তুত যে সরকার সুদমুক্ত ব্যাংক ব্যবস্থা চালু করতে রাজী হবে, রাষ্ট্র যদি ইসলামী আদর্শানুযায়ী হয় এবং জনগণ যদি ইসলামী বিধান পালন করে চলতে শুরু করে তাহলে দারিদ্র কখনোই সততা অবলম্বনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। তাই সুদমুক্ত অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থা গ্রহণেও কোন প্রতিবন্ধকতা থাকা উচিত নয়। অতএব সুদ বন্ধ করে যাকাতভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা চালু করা আমাদের একান্ত কর্তব্য।

----<>----

বীমা

সাধারণভাবে মুসলমানদের মধ্যে একটা ধারণা বিরাজমান রয়েছে যে, বীমা সম্পূর্ণ ইসলাম পরিপন্থী। কেউ কেউ বলেন, তাঁরা তাঁদের জীবনের বীমা করেন না। কেননা তাঁরা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখেন যে, তাঁদের মৃত্যুর পরে তাঁদের উপর নির্ভরশীলদের জীবন ও জীবিকার ব্যবস্থা তিনিই করবেন। কিন্তু লোকদের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের জীবন-জীবিকার ব্যবস্থা করে যাওয়ার ওপর ইসলামে কোন নিষেধাজ্ঞা তো নেই-ই, বরঞ্চ এ জন্যে তৎপর হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বুখারী শরীফে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর এ বাণী উদ্ধৃত রয়েছে ঃ

তোমাদের উত্তরাধিকারীদের নিঃস্ব, পরমুখাপেক্ষী ও অপর লোকদের ওপর নির্ভরশীল করে রেখে যাওয়া অপেক্ষা তাদেরকে সচ্ছল, ধনী ও সম্পদশালী করে রেখে যাওয়া তোমাদের জন্যে অধিকতর উত্তম।

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উক্তিটি নিশ্চয়ই আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল, অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আস্থার বিন্দুমাত্র পরিপন্থী নয়। এ প্রসঙ্গে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর অপর একটি বাণীও স্মরণীয়। একজন লোক উটের উপর সওয়ার হয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য এসেছিলেন। তিনি উটটিকে না বেঁধে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, উটটিকে বেঁধে রেখেছো, তো? লোকটি বললেন, না ''আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে না বেঁধেই ছেড়ে এসেছি।'' তখন রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, প্রথমে উটটি বাঁধো তারপর আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করো। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়ায় হালাল জিনিসসমূহ অর্জন করতে চাইবে- তার আত্মমর্যাদা রক্ষা, স্বীয় পরিবারবর্গের প্রয়োজন পূরণ ও নিজের প্রতিবেশীর প্রতি দয়াপরবশ হওয়ার উদ্দেশ্যে, তাহলে সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে এরূপ অবস্থায় যে, তার মুখমণ্ডল পূর্ণিমার রাতের চাঁদের মতো অত্যুজ্জ্বল ও আলোকমণ্ডিত হবে। [তাবরানী ইত্যাদি]

বীমাকে জুয়া মনে করার কারণেই সে ব্যাপারে আপত্তি রয়েছে। কারণ কোন বীমাকারী ব্যক্তি যদি নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে মরে যায়, তাহলে তার উত্তরাধিকারীরা (বা যার নামে বীমা করা হবে) এক সাথে বিপুল পরিমাণ টাকা পেয়ে যায়, যদিও সে বীমার সামান্য পরিমাণ টাকাই প্রিমিয়াম বাবদ দিয়েছিলো। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এ

অতিরিক্ত টাকা কি জূয়া কিংবা সূদ? এখন বীমা শব্দের ব্যাখ্যা দেখুন তা হচ্ছে Concise dictionary তে লেখা হয়েছে Taking great risks to secure great results in finance অর্থাৎ অর্থের ক্ষেত্রে ফলাফল নিশ্চিত করার নিমিত্তে একটি বড় ঝুঁকি নেয়া হচ্ছে বীমা।

কিন্তু বীমায় পলিসিকারী বা বীমা কোম্পানী কেউ-ই কোন Risk (ঝুঁকি) নিচ্ছে না। পলিসিকারী বেঁচে থাকলে তার পলিসির Maturity- এর সময়ে সে তার টাকা পেয়ে যাবে। বীমা কোম্পানীও কোন Risk বহন করছে না। কোম্পানীর এই কথা নিশ্চিতভাবে জানা আছে যে, পলিসিকারীরা প্রতি বছর মরবে না, যাদের উত্তরাধিকারীদের পলিসির সম্পূর্ণ মূল্য আদায় করে দিতে কোম্পানী বাধ্য হতে পারে। একথা জানাশোনার পরই লোকেরা তাদের প্রিমিয়ামের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে। বীমা কোম্পানীসমূহ সাধারণ মৃত্যুহার সম্পর্কে দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতার আলোকে হিসাব-নিকাশ করেই এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে এবং প্রত্যেক বয়সের একটা গড় বের করে নিয়েছে। এভাবে গোটা জিনিসটি এভাবে দাঁড়াল-

এক হাজার ব্যক্তি প্রতি বছর পর্যন্ত নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার প্রিমিয়াম বা চাঁদা নির্দিষ্ট কতেক বছর পর্যন্ত দেয়ার সিদ্ধান্ত করে এবং চুক্তি করে যে, সে নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে যারা মরে যাবে, তাদের উপর নির্ভরশীল লোকদের জন্যে তারা সম্মিলিতভাবে জৈবিক প্রয়োজন পূরণের অথবা একসাথে এত পরিমাণ টাকা দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। জীবন বীমার মৌলিক কথা তো এতটুকুই। বীমা কোম্পানীগুলোর যুক্তি হচ্ছে যে, আসলে এটা একটা মহৎ উদ্দেশ্যে একটি পারস্পরিক সাহায্য সংস্থার ব্যাপার মাত্র। এটা কোনক্রমেই জূয়া হতে পারে না।

এখন বর্তমানকার প্রচলিত জীবনবীমা পদ্ধতি সম্পর্কে শরীয়তের আলোকে আমাদের বক্তব্য নিম্নে পেশ কর হলোঃ

বর্তমান বীমা ব্যবস্থপনা ও পদ্ধতি ইসলামী শরীয়ত সমর্থিত নয়। কারণ এর লেনদেনের সুদ কিংবা জূয়া প্রক্রিয়ার বাইরে তৃতীয় কিছু নয়। আর বীমার এই মৌলিক ত্রুটি দূরীভূত করলে বীমা ব্যবস্থার অস্তিত্বই থাকে না। সুতরাং এ থেকে দুরে থাকা অপরিহার্য। আসলে বীমা শব্দটি ফার্সী, হিন্দী, উর্দু এবং বাংলা ভাষায়ও ব্যবহৃত হয়। যার বাংলা অর্থ নিরাপদ করা ও নিশ্চিত করা। পরিভাষায় বীমা বলা হয় চুরি-ডাকাতির ভয়ে নির্দিষ্ট হারে টেক্স আদায় করে সরকার নিরাপদে কোন মাল-সম্পদ বা টাকা অন্যত্র পৌঁছে দেওয়ার জন্য অর্পণ করা। যা সরকার স্বীয় হেফাযতে নির্ধারিত স্থানে পৌঁছিয়ে দেয়। যেমন বীমাকৃত পার্শ্বেল ইত্যাদি।

[লুগাতে কিশ্ওয়ারী ও ইত্যাদী]

উপরোক্ত বীমায় ধর্মীয় কোন নিষেধাজ্ঞা নেই; বরং এ ধরনের ব্যবস্থা মানবীয়

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা হিসেবে সাব্যস্ত। তবে বর্তমানে প্রচলিত জীবন বীমা পদ্ধতি যা বীমা কোম্পানী কর্তৃক বীমাকারী যে নির্দিষ্ট হারে বা নির্দিষ্ট কিস্তিতে প্রিমিয়াম জমা দেওয়ার পর স্বীয় জীবিত সন্তানের নিরাপত্তার জন্য নির্ধারিত সময়ের পর জমা দেয়া অংকের চেয়ে অনেক বিরাট অংকের প্রতিশ্রুতি প্রদান করে, যাকে আরবীতে التامين على الحياة ফার্সিতে 'বীমায়ে জিন্দেগী' এবং ইংরেজীতে Life Insurance বলা হয়। জীবন বীমা ব্যবস্থার গোড়া পত্তনে ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ড তথা ইহুদী-নাসারার সুদূর প্রসরী ষড়যন্ত্র আছে নিঃসন্দেহে। যদিও তারা জীবন বীমা ব্যবস্থাকে জোর গলায় মানব সেবা হিসেবে চিহ্নিত করছে। কিন্তু এই ব্যবস্থা প্রথমতঃ মুসলিম মিল্লাতকে ইসলামের সুমহান বিধান যাকাত ব্যবস্থা থেকে ক্রমান্বয়ে দূরে সরিয়ে নেওয়ার গোপন চক্রান্ত, দ্বিতীয়তঃ জীবন বীমা ব্যবস্থার মাধ্যমে পৃথিবীর সরলমনা মুসলমানদেরকে হালাল ব্যবসা থেকে বিচ্যুত করে সুদের মহাজনী হারাম ব্যবসার দিকে ধাবিত করা, যেহেতু ব্যাংকিং সুদ পদ্ধতির বা ব্যবস্থার সাথে জীবন বীমা ব্যবস্থার কোন প্রকার মিল পাওয়া যায় না; বরং প্রত্যেক প্রকার সুদের লেন-দেনকে ক্বোর'আন ও হাদীস শরীফে স্পষ্টভাবে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে, সেহেতু জীবন বীমা ব্যবস্থায় বীমাকারীরা মৃত্যুর পর বা নির্ধারিত সময়ের পর বীমা কোম্পানী যে বর্ধিত ও অতিরিক্ত টাকা প্রদান করে তা এক টাকা হাওলাত বা জমা দিয়ে দশ টাকা নেয়ার মত সুদ হবে না কেন? মানব সেবা যদি তাদের উদ্দেশ্য হয় তবে সুদ প্রথা তথা জীবন বীমা পদ্ধতি ছাড়া কি মানব সেবা করা যায় না? তদুপরি অনেক সময় দেখা যায় যে, জীবন বীমা পদ্ধতিতে তিন-চার কিস্তি প্রিমিয়াম জমা দেয়ার পর অপরাগতার দরুন আর জমা দিতে না পারলে অনেক বীমাকারীর জমাকৃত টাকা গায়েব হয়ে যায়- এটা কি মানব সেবা, না মানব সেবার নামে জ্বলন্ত প্রতারণা? জীবন বীমা কোম্পানী কর্তৃক প্রচারিত হেন্ডবিলে কয়েকজন দেওবন্দী-খারেজী মৌলভী যদিও কিছু বিনিময় নিয়ে বর্তমানে প্রচলিত জীবন বীমা ব্যবস্থাকে শরীয়ত সম্মত ব্যবস্থা হিসেবে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, কিন্তু যুগের হাক্বক্বানী খোদাভীরু ওলামায়ে কেরাম এ ধরনের সূদী ব্যবসা থেকে নিজেও বিরত থাকেন এবং মুসলিম সমাজকে বিরত থাকার জন্য আহবান জানান।

ব্যক্তিগত ব্যয়ের জন্য ঋণ

ব্যক্তিগত পর্যায়ের ব্যয় ও ব্যবহারের জন্য প্রদত্ত ঋণ যদিও একটি জাতির মোট অর্থনৈতিক চাহিদার তুলনায় নিতান্ত অনুল্লেখযোগ্য অংশই হয়ে থাকে, তবুও তা যে প্রয়োজন আছে তা অনস্বীকার্য। ইসলাম এ সমস্যার সমাধান করার ব্যবস্থা দিয়েছে। একজন লোক যখন ব্যক্তিগত ব্যয়ের জন্য ঋণের প্রয়োজন মনে করবে, যা সে

কিছুদিনের মধ্যেই পরিশোধ করতে পারবে বলে ধারণা রাখছে, তখন তার অধিকতর সৌভাগ্যবান প্রতিবেশি বা নিকটাত্মীয় অথবা কোন বন্ধু তাকে এ ঋণ সরবরাহ করবে। এটাই ইসলামের বিধান। অবশ্য তাতে সে কোন প্রকারের সুদ ধার্য কিংবা গ্রহণ করতে পারবে না। এসব ঋণকে ক্বোরআনী পরিভাষায় বলা হয় 'করযে হাসানাহ্' (সুন্দর ঋণ। করযে হাসানার বহু ফযীলত পবিত্র ক্বোরআন ও হাদীসে বর্ণিত আছে।

কিন্তু আধুনিক সমাজে ব্যক্তিতন্ত্র যেভাবে প্রকট হয়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে তাতে কোন প্রতিবেশী নিকটাত্মীয় বা বন্ধুর নিকট থেকে সব সময় প্রয়োজনীয় পরিমাণ ঋণ পাওয়া সম্ভবপর নাও হতে পারে বরং না হওয়াটাই যেন স্বাভাবিক হয়ে পড়েছে।

তাই জনগণের কর্তব্য হচ্ছে সকল প্রকার জরুরী অবস্থার মোকাবেলা করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা; কিন্তু তা সত্ত্বেও এমন অবস্থা নিশ্চয়ই দেখা দেবে, যখন নিজস্ব উপায়-উপকরণ দ্বারা নিজেদের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করা সকলের পক্ষে সম্ভবপর হবে না। এ অনির্দিষ্ট ও না দেখা পরিস্থিতিতে ব্যক্তিগত পর্যায়ে ব্যয় ব্যবহার মূলক ঋণ সংগ্রহের লক্ষ্যে ঋণদান প্রয়োজনে বিনাসুদে ঋণ গ্রহণের সুবিধা পাবে।

----<>----

আমানত ও খেয়ানত

সবচেয়ে বড় আমানত, যা প্রত্যেক মানুষের রয়েছে, যা থেকে কোন মানুষই মুক্ত নয়, হচ্ছে মানুষের অস্তিত্ব ও তার জীবন যাপন এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, হাত ও পা ইত্যাদি। এ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ব্যবহার করার জন্যে দিয়েছেন। সুতরাং এ গুলো আল্লাহর পক্ষ হতে আমানত স্বরূপ। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে নিজের সুস্থতা ও জ্ঞানকে শুধু সে কাজেই ব্যবহার করবে, যে কাজের জন্যে এগুলো দেওয়া হয়েছে। তা ব্যতীত অন্য কোন কাজে ব্যবহার করলে খেয়ানত হবে। হাদীস শরীফে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মুনাফিক্বের তিনটি চিহ্ন উল্লেখ করেছেন, তম্মধ্যে একটি হচ্ছে আমানতের খিয়ানত। এ তিনটি কাজ কোন মু'মিনের কাজ নয়। এ তিনটি কাজ যাদের মধ্যে পাওয়া যায় তাদেরকে সঠিক অর্থে মুসলমান বা মু'মিন বলা যায় না।

আমানতের গুরুত্ব

মুনাফিক্বের পরিচিতি হচ্ছে গচ্ছিত বস্তুতে খেয়ানত করা; অর্থাৎ- কোন মুসলমানের এ কাজ নয় যে, সে আমানতের মধ্যে খেয়ানত করবে; বরং তাহলো মুনাফিক্বের কাজ। অনেক আয়াত ও হাদীস দ্বারা আমানত ও আমানতের দাবীসমূহ পূর্ণ করার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ক্বোরআনে কারীমে এরশাদ করেন-

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰى اَهْلِهَا الاية-

তরজমাঃ "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দেন যেন তোমরা আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌঁছিয়ে দাও।" [সূরা নিসা, আয়াত- ৫৮]

আমানতের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করে হাদীস শরীফে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- لَااِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهٗ অর্থাৎ- "যার আমানতদারী নেই তার ঈমানও নেই।" সুতরাং ঈমানের দাবির জন্য আমানতদার হওয়া আবশ্যকীয়।

আরবী ভাষায় আমানতের অর্থ হলো কোন ব্যক্তির উপর কোন ব্যাপারে ভরসা করা। সুতরাং যে সকল জিনিস কারো নিকট অর্পণ করা হয়েছে আর অর্পণকারী ব্যক্তি তার প্রতি এ ভরসা করে যে, সে তার হক্ব যথার্থভাবে আদায় করবে- এটা হলো আমানতের মূল অর্থ। বস্তুত কোন ব্যক্তির কোন কাজ অথবা কোন বস্তু কিংবা কোন মাল যা অন্যের নিকট অর্পণ করে এবং অর্পণকারী ব্যক্তির এ দৃঢ় বিশ্বাস

থাকে যে, ওই ব্যক্তি তার দায়িত্ব সঠিকভাবেই আদায় করবে, তাতে কোন প্রকারের ক্রটি করবে না। এটাই আমানতের অর্থ। আমানতের এ অর্থ সামনে রাখা হলে অনেক বিষয় আমানতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

আল্লাহ তা'আলা মানবজাতি হতে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন, আমি কি তোমাদের রব নই? তোমরা আমার আনুগত্য করবে কি? সকল মানবগোষ্ঠীই স্বীকার করেছিলো যে, আমরা নিশ্চয় আপনার আনুগত্য করবো। ওই অঙ্গীকার সূরা আহযাবের সর্বশেষ রুকু'তে আমানত হিসেবেই ব্যক্ত করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে-

اِذْ عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلاً

অর্থাৎ-আমি আসমানের প্রতি 'আমানত' পেশ করে জিজ্ঞেস করলাম যে, তুমি কি এর দায়িত্ব বহন করতে সক্ষম হবে? আসমান তাতে অস্বীকৃতি জানালো। অতঃপর যমীনের প্রতি পেশ করলাম যে, তুমি কি এ আমানত বহন করতে সক্ষম? যমীনও অস্বীকার করলো। পরবর্তীতে পর্বতমালার প্রতি আমানত পেশ করলাম তোমরা কি তা বহন করতে সক্ষম? তারাও সে আমানত বহন করতে অপারগতা প্রকাশ করলো। সকল সৃষ্টি জগতই এ আমানত বহন করতে ভয় পেয়ে গেলো; কিন্তু যখনই এ আমানত মানবজাতির নিকট পেশ করা হলো, তৎক্ষণাৎ সে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে স্বীকার করে নিলো, 'আমরা এ আমানতকে বহন করতে সক্ষম। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন যে, এ মানব গোষ্ঠী অত্যন্ত যালিম ও জাহিল; এহেন ভারী বস্তুকে বহন করার জন্যে নিয়ে গেলো; একথা ভাবেওনি যে, 'কখনও তা বহন করতে অক্ষম হয়ে পড়বে কিনা; যার ফলে তার পরিণতি হবে ভয়াবহ!'

এ জীবন হলো আমানত

একটা ভারী বস্তুকে আল্লাহ তা'আলা আমানত হিসেবে ব্যক্ত করেছেন। মানুষের নিকট যে আমানত পেশ করা হয়েছিলো তা কি ছিলো? মুফাস্‌সিরীনে কেরাম বলেন যে, এ ক্ষেত্রে আমানতের অর্থ মানবজাতিকে বলে দেয়া হয়েছিলো যে, তোমাদেরকে একটি জীবন দেয়া হবে, এতে তোমাদেরকে ভাল করার ইখতিয়ার দেওয়া হবে এবং খারাপ কাজ করারও। আর যখন ভাল কাজ করবে তখন আমার সন্তুষ্টি লাভ করবে, চিরদিনের জন্যে বেহেশতের নি'মাত তোমাদের লাভ হবে। আর যদি মন্দ কাজ করো, তাহলে তোমরা আমার রোষানলের শিকার হবে। আর এ জন্যে জাহান্নামের শাস্তি অবধারিত। এখন বলতো এমন জীবন তোমাদের কাম্য কিনা? সুতরাং অন্য সকলেই তা অস্বীকার করলো? কিন্তু মানুষ তা গ্রহণের জন্যে তৈরি হয়ে গেলো। এ সারাটা জীবন আমাদের নিকট আমানত। আর এ আমানতের

দাবী হলো এ জীবনকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ অনুযায়ী চালানো। কোন ব্যক্তিই এ দায়িত্ব থেকে মুক্ত নয়। ওই আমানত হলো মানুষের অস্তিত্ব ও তার জীবন, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, ও সময়। এ সব কিছুই আমানত, কোন মানুষ কি এ কথা মনে করতে পারে 'আমি আমার হাতের মালিক, আমার চোখের মালিক আমি নিজেই?' তা-তো এমন নয় বরং এ সব কিছুই আমাদের নিকট আমানত। আমরা এর মালিক নই; ফলে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে তাকে ব্যবহার করতে পারবো না; বরং আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এ নি'মাতসমূহ দান করেছেন ব্যবহার করার জন্যে। সুতরাং এ নি'মাতের দাবী হলো এ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, নিজের অস্তিত্ব নিজ যোগ্যতা এবং নিজেদের বলবীর্যকে সে কাজেই ব্যবহার করা যে কাজের জন্য দেওয়া হয়েছে। অন্য কোন কাজে ব্যবহার করা হলে তা আমানতের খিয়ানত হবে।

চক্ষু একটি নি'মাত

চক্ষু আল্লাহ তা'আলার একটি নি'মাত, যা আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দান করেছেন। এমন একটি নি'মাত, যা দুনিয়ার সমুদয় মাল-সম্পদ খরচ করে অর্জন করার চেষ্টা করলেও তা অর্জন করা সম্ভব নয়; কিন্তু এর মূল্য বুঝে আসে না, কারণ জন্মলগ্ন হতেই এ ফ্রি মেশিনটি কাজ করে আসছে। এটা অর্জন করতে কোন টাকা পয়সার প্রয়োজন হয়নি, কোন কষ্টও করতে হয়নি। কিন্তু যখন চোখের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হবে বা হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেবে তখনই এর মর্যাদা ও মূল্য বোঝা যাবে। আর সে অবস্থায় মানুষ তার সকল ধন-দৌলত দৃষ্টিশক্তির জন্যে খরচ করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। এ ফ্রি মেশিনের কোন তৈলের প্রয়োজন হয় না। কোন ট্যাক্স দিতে হয় না। এর ভাড়াও দিতে হয় না; বরং বিনামূল্যেই এটা অর্জিত হয়েছে; কিন্তু এ মেশিনটি আমানত স্বরূপ। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দিয়েছেন যেন এ মেশিনটির আমরা সদ্ব্যবহার করি। এটা দ্বারা দুনিয়া দেখো। দুনিয়ার দৃশ্য দেখো। দুনিয়ার দৃশ্য দেখে আনন্দ-ভোগ করো। সব কিছুই করো; কিন্তু কিছু কিছু জিনিস দেখতে নিষেধ করেছেন। ফ্রি এ মেশিনকে সকল কাজে ব্যবহার করবে না। যেমন নির্দেশ হয়েছে এর দ্বারা তোমরা গায়র মুহরিমের প্রতি দেখবে না। (যাদের সাথে বিবাহ জায়েয) ।এখন যদি আমরা গায়র মুহরিমদেরকে কু-উদ্দেশ্যে দেখি, তাহলে আল্লাহ তা'আলার আমানতে খিয়ানত হবে, এ জন্যেই ক্বোরআনে কারীমে গায়র মুহরিমকে দেখাকে খিয়ানত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন-

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ

তরজমাঃ চোখের খেয়ানত সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা অবগত রয়েছেন।

[সুরা মু'মিন, আয়াত-১৯]

যদি কেউ দৃষ্টিকে এমন স্থানে ব্যবহার করে, যে স্থানে ব্যবহার করা থেকে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন, তবে তা হবে খিয়ানত। ব্যাপারটি তেমনি হলো যেমন কোন ব্যক্তি কোন মাল অপর এক ব্যক্তির নিকট আমানত স্বরূপ গচ্ছিত রাখলো। তখন ওই ব্যক্তি যদি দৃষ্টির আড়ালে ওই গচ্ছিত মাল ব্যবহার করে, তবে তা হবে খিয়ানত। তদ্রূপ কোন ব্যক্তি আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতসমূহ তথা অঙ্গ-প্রতঙ্গকে এমন কাজে ব্যবহার করে, যা আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন, তাও খিয়ানতের অন্তর্ভুক্ত। আর এ নির্বোধের সে জ্ঞানটুকু নেই যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট কোন কাজ গোপন থাকতে পারে না। সে জন্যেই আল্লাহ তা'আলা চোখের খিয়ানতকে বড় গুনাহ ও অপরাধ বলেই চিহ্নিত করেছেন। আর চোখের এ আমানত ও নি'মাতকে যদি যথাযথ স্থানে ব্যবহার করে, তা হলে আল্লাহ তা'আলার রহমত অবতীর্ণ হবে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, কোন ব্যক্তি যদি বাইরে থেকে ঘরে এসে স্বীয় স্ত্রীর দিকে ভালবাসার দৃষ্টিতে তাকায় এবং স্ত্রীও স্বামীর প্রতি ভালবাসার দৃষ্টিতে তাকায় তখন আল্লাহ তা'আলা উভয় জনের প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকান। কারণ হচ্ছে, তারা তাদের আমানতকে সঠিক স্থানে ব্যবহার করছে। তারা সেটা যেহেতু আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অনুযায়ী করেছে সেহেতু তাদের প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হলো।

কান একটি আমানত

অনুরূপ আল্লাহ তা'আলা শ্রবণ করার জন্য কান দান করেছেন, আবার সবকিছুই শ্রবণ করার অনুমতি দিয়েছেন; কিন্তু কয়েকটি জিনিসের উপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছেন যে, তোমরা অশ্লীল গান-বাজনা শোনবেনা। গীবত, নাট্যানুষ্ঠান এবং মিথ্যাচার শোনবে না। যদি কান এ সকল বিষয় শ্রবণ করার কাজে ব্যবহৃত হয় তাহলে তা হবে আমানতের খিয়ানত।

জিহ্বা একটি আমানত

'জিহ্বা' খোদা প্রদত্ত এমন একটি নি'মাত, যা প্রত্যেকের জন্মলগ্ন হতে চলে আসে। মৃত্যু পর্যন্ত তা চলতে থাকে। জিহ্বার সামান্যতম নড়া-চড়া দ্বারা মানুষ কত কাজ করে যাচ্ছে! জিহ্বা এমন একটি নি'মাত, যদি জিহ্বা নেড়ে একবার 'সুবহানাল্লাহ' বলে, হাদীস শরীফে এসেছে, তার নেকীর পাল্লা ভরে যাবে। সুতরাং এর মাধ্যমে আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করার প্রয়োজন রয়েছে; কিন্তু ওই জিহ্বা যদি মিথ্যা বলার কাজে ব্যবহৃত হয় এবং অন্যকে কষ্ট দেওয়ার জন্যে ব্যবহৃত হয়, তাহলে তা হবে আমানতের খিয়ানত।

গুনাহ করা খেয়ানত

আল্লাহ তা'আলা এ পরিপূর্ণ দেহ, প্রাণ, সুস্থতা, এবং শক্তি-সামর্থ্য সব কিছুই আমাদেরকে আমানত হিসেবে দান করেছেন। বস্তুত গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা

যায় এ পূর্ণ জীবনটাই আমানত। সুতরাং এ জীবনের কোন কর্মসূচী এবং সকল অঙ্গ-প্রতঙ্গ দ্বারা সম্পাদিত কোন আমল, কোন কথা এবং কোন কাজ যেন এমন না হয়, যা আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত আমানতের খিয়ানতের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং আমানতের যে সীমারেখা আমাদের ধারণায় রয়েছে তা হচ্ছে, কোন ব্যক্তি যদি টাকা-পয়সা রেখে যায় এবং আমরা সিন্ধুক খুলে সে টাকা-পয়সা বের করে খরচ করে নিই তা হলে সেটা খিয়ানত। কেবল এটা রক্ষা করা আমানত নয়; বরং এ পূর্ণ জীবনটাই হচ্ছে আমানত। ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, আমানতের খিয়ানত করা নিফাক্বের পরিচায়ক। এর উদ্দেশ্য হলো গুনাহ যত প্রকারের হোক না কেন চোখের গুনাহ হোক অথবা কর্ণের গুনাহ, অথবা জিহ্বার গুনাহ কিংবা অন্য কোন অঙ্গের গুনাহ, সবকিছুই আমানতের খেয়ানত করার অন্তর্ভুক্ত। আর তা মু'মিনের কাজ নয়; বরং তা হলো মুনাফিক্বের কাজ।

ধারকৃত বস্তু আমানত

এ পর্যন্ত আমানত সম্পর্কীয় ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে; আমানতের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রও রয়েছে। কখনো কখনো আমরা সেটাকে আমানত বলে মনে করি না ও আমানতের ন্যায় রক্ষণাবেক্ষণ করি না, যেমন ধারণকৃত বস্তু- যেমন । কোন এক ব্যক্তির কোন বস্তুর প্রয়োজন হলো, কিন্তু তা তার নিকট ছিল না। এ জন্যে সে বস্তুটি ব্যবহার করার জন্যে অন্য কারো নিকট ধার চাইলো যে, অমুক জিনিসের আমার প্রয়োজন। কিছুক্ষণ বা কিছু দিনের জন্য তা দিন। এখন এ ধার করা বস্তুও আমানত। উদাহরণস্বরূপ একটি কিতাব পড়ার আমার ইচ্ছে হলো; অথচ কিতাবটি আমার নিকট ছিলো না। সুতরাং আমি তা পড়ে ফেরৎ দেবো। এখন এ কিতাব আমার নিকট হলো ধার বা আমানত। শরীয়তের পরিভাষায় তাকে 'আ-রিয়ত বা ধার লওয়া বলা হয়। যথা সময়ে তাও মালিকের নিকট পৌঁছিয়ে দিতে হবে।

এতিমের হক্ব

এতিমের হক্ব সম্পর্কে ইসলামের বিধান খুবই কঠোর। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ ফরমান ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا ـ

তরজমাঃ যারা অন্যায়ভাবে এতিমদের ধন-সম্পত্তি গ্রাস করে, নিশ্চয়ই তারা স্বীয় উদরে অগ্নি ব্যতীত আর কিছু ভক্ষণ করে না এবং অবিলম্বে তারা জ্বলন্ত আগুনে যাবে। [সূরা নিসা, আয়াত- ১০]

আল্লাহ তা'আলা আরো ফরমান ঃ

وَاٰتُوا الْيَتٰمٰى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَهُمْ اِلٰى اَمْوَالِكُمْ اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا

তরজমাঃ আর এতিমদেরকে তাদের ধন-সম্পত্তি প্রদান করো এবং ভালোর সাথে মন্দের বিনিময় করো না। আর তোমাদের ধন-সম্পদের সাথে ওদের ধন-সম্পদ ভোগ করো না। নিশ্চয়ই এটা গুরুতর অপরাধ।'' [সূরা নিসা, আয়াত- ২]

যে সকল দাম্ভিক লোক নিরাশ্রয় এতিম বালক-বালিকাদের প্রতি অবজ্ঞা, উপহাস, অত্যাচার, অবিচার, অনাচার কিংবা অসদ্ব্যবহার করে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, তোমরাও অকস্মাৎ মৃত্যুবরণ করতে পারো আর তোমাদের সন্তানগণও অসহায়, নিরাশ্রয় ও বিপন্ন হয়ে পড়তে পারে। তাই এ শোচনীয় অবস্থা স্মরণ করে ভীত হও এবং অসহায় এতিম বালক-বালিকাদের প্রতি সহানুভূতিসূচক সদয় ব্যবহার করো।

হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এতিমের হক্ব সম্পর্কে খুবই তাগীদ দিয়েছেন এবং সতর্ক করেছেন। রসূল করীম এরশাদ করেছেন- ক্বিয়ামতের দিন কিছু সংখ্যক লোক এমতাবস্থায় কবর হতে উঠবে যে, তাদের মুখ হতে আগুনের শিখা বের হতে থাকবে। জনৈক সাহাবী আরয করলেন, ''হুযূর,তারা কারা?'' এরশাদ ফরমালেন, ''তোমরা কি শুনোনি, আল্লাহ পাক ক্বোরআন মজীদে এরশাদ করেছেন, যারা এতিমের মাল অন্যায়ভাবে খায়, তারা জ্বলন্ত আগুনই পেটে ভর্তি করে নেয়?'' তাই, কেবল ধনী হওয়ার জন্য সম্পদ অর্জন ঠিক নয়।

হালাল উপার্জনের চেষ্টাকারীর ফযীলত

হযরত আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এ জন্য হালাল উপার্জন করে যেন ভিক্ষা করা থেকে রক্ষা পায়, পরিবার-পরিজনের জন্য কিছু অর্জন করে এবং প্রতীবেশীর সাথে সদাচরণ করে, সে ক্বিয়ামতের দিন এভাবে উঠবে যে, তার চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মত ঝলমল করবে এবং যে ব্যক্তি অধিক সম্পদ পুঞ্জিভূত করার জন্য, অন্য লোকের সামনে গর্ব-অহঙ্কার করার জন্য উপার্জন করে, সে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র সাথে এ অবস্থায় মিলিত হবে যে, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি নারাজ হবে। [তাম্বীহুল গাফেলীন]

সম্পদের মোহ বাস্তবিকই খুব খারাপ। 'তাম্বীহুল গাফেলীন' কিতাবে বর্ণিত আছে- হযরত হাসান বসরী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, যখন প্রথম মুদ্রা তৈরি করা হয়েছিলো, তখন শয়তান সেটাকে চোখে লাগিয়ে বলেছিলো, ''যে তোমার সাথে মহব্বত করবে, সে আমার গোলাম।'' হযরত হাসান বসরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু প্রসিদ্ধ বুযুর্গ তাবে'ঈ ছিলেন। তিনি আমীরুল মু'মিনীন হযরত মাওলা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে খিলাফতের খিরক্বা পরিধান করেছেন। তাই তাঁর কথা বাস্তবিকই চিন্তা করার বিষয়। সম্পদের প্রতি যে আকৃষ্ট হয়েছে, তাকে অধিক

গুনাহে লিপ্ত হতে দেখা যায় এবং এটাই তো শয়তানের গোলামী। সুতরাং সম্পদের মহব্বত বর্জন করো। আল্লাহ এরশাদ ফরমাচ্ছেন, ব্যবসা করো। কেননা, রুজির দশটি অংশ রয়েছে। এর নয় অংশ কেবল ব্যবসাতে রয়েছে।'' [কিমিয়ায়ে সা'আদাত]

হুযূর আক্‌রাম আরো এরশাদ করেন, সৎ ব্যবসায়ীকে ক্বিয়ামতের দিন বিশ্বাসীগণ ও শহীদগণের সাথে উঠানো হবে। [সুনান-ই ইবনে মাজাহ]

সবচে' পবিত্র খাবারঃ উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা হতে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, যা কিছু তোমরা আহার করো, ওইগুলোর মধ্যে সবচে' পবিত্র সেটাই, যা তোমাদের উপার্জন থেকে প্রাপ্ত এবং তোমাদের সন্তানাদিও মোটামুটি উপার্জনভুক্ত; অর্থাৎ প্রয়োজনের সময় মানুষ তার সন্তানের উপার্জন থেকেও খেতে পারে।[তিরমিযী]

ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, কোন এক সাহাবী আরয করলেন, এয়া রাসূলাল্লাহ! কোন্ ধরনের উপার্জন বেশি পবিত্র? হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমালেন, মানুষের নিজ হাতে কাজ করা এবং সৎ ব্যবসা করা। অর্থাৎ ওই ধরনের ব্যবসা, যেখানে ধোঁকা ও বিশ্বাসঘাতকতার স্থান নেই। [তাবরানী]

জিনিষের অনর্থক প্রশংসা করো নাঃ আজকাল জিনিস ক্রয় করার সময় ক্রেতা ওই জিনিসের অনর্থক সমালোচনা করে এবং বিক্রেতা বিক্রয়ের সময় বিনা প্রয়োজনে অধিক প্রচারণার আশ্রয় নেয় এবং স্বীয় জিনিসের অধিক প্রশংসা করে। এ উভয় আচরণ নিষিদ্ধ। যেমন হযরত মু'আয ইবনে জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাচ্ছেন, সমস্ত উপার্জনের মধ্যে বেশী পবিত্র ওইসব ব্যবসায়ীর উপার্জন, যখন তারা কথা বলে, মিথ্যা বলে না, যখন তাদের কাছে আমানত রাখা হয়, খিয়ানত করে না এবং ওয়াদা করে এর বিপরীত করে না, যখন কোন জিনিষ ক্রয় করে, তখন সেটার দোষ বের করে না, যখন নিজের জিনিস বিক্রি করে তখন সেটার অতিরিক্ত প্রশংসা করে না। তাদের প্রতি কেউ প্রাপক হলে, পরিশোধ করতে বিলম্ব করে না এবং যখন তারা কারো কাছে প্রাপক হয়, তখন জোর জবরদস্তি করে না।

[বায়হাক্বী]

সৎ ব্যবসায়ী মুজাহিদঃ ব্যবসায়িক আদান-প্রদান, পরিমাপ, ক্রয়-বিক্রয় প্রত্যেক ব্যাপারে শয়তান কুপ্ররোচনা দিতে থাকে। যেমন এক বুযুর্গকে লোকেরা জিজ্ঞাসা করেছিলো, আবেদ উত্তম, না সৎ ব্যবসায়ী? ওই বুযুর্গ বলেছেন, ''সৎ ব্যবসায়ী উত্তম। কারণ সে জিহাদে লিপ্ত। কেননা পরিমাপ আদান-প্রদানের সময় শয়তান তার পিছে লেগে থাকে; কিন্তু সৎ ব্যবসায়ী তার বিপরীত করে।'' [কিমিয়ায়ে সা'আদাত]

ব্যবসায় সম্পদ পুঞ্জিভূত করার জন্য নাফ্‌স নানা রকম ফন্দি শেখায় কিন্তু সৎ ব্যবসায়ী নাফ্‌স ও শয়তানের প্রত্যেক উদ্যোগকে অকেজো করে দেয়। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে-

اَلْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ

অর্থাৎ "মুজাহিদ সে-ই, যে নিজের নাফসের সাথে জিহাদ করে।" হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হালাল উপার্জনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতেন; অথচ আমাদের প্রিয় রাসূলের কি কোন অভাব ছিলো? মোটেই ছিলো না। তবুও তিনি ব্যবসা-বাণিজ্য করেছেন। এতে শ্রমজীবীদের জন্য বড় সান্ত্বনা রয়েছে এবং তাদের জন্য উৎসাহ ব্যঞ্জকও বটে। আল্লাহর নৈকট্যধন্য নবীগণও হালাল উপার্জন করেছেন। কেউ কাপড় সেলাই করে, কেউ ব্যবসা করে, কেউ অন্যান্য হালাল পেশা অবলম্বনের মাধ্যমে হালাল রিয্‌ক্ব অর্জন করতেন।

সৎ ব্যবসায়ী রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে জান্নাতে থাকবে

একবার সরকারে দু'আলম'র দরবারে কয়েকজন সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। কোন একজন আরয করলেন, এয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কাপড় সেলাইয়ের কাজ করি। এরশাদ ফরমালেন যদি তুমি এতে সততার সাথে কাজ করো, তাহলে হযরত ইদ্রিস আলায়হিস সালাম-এর সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

অন্যজন আরয করলেন, হুযূর! আমি রাজমিস্ত্রি। এরশাদ ফরমালেন, যদি তুমি সততার সাথে কাজ করো, তাহলে হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস সালাম-এর সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর একজন আরয করলেন, হে আক্বা! আমি ব্যবসা করি, এরশাদ করলেন, তুমি যদি সততার সাথে কাজ করো, তাহলে আমার সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো, আপনি ওই ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলেন, যিনি ইবাদতের জন্য মসজিদে বসে থাকেন এবং বলেন, আল্লাহ আমাকে রিয্‌ক্ব দেবেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বললেন, "সে মুর্খ, সে শরীয়ত জানে না।"

হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ আমার রুজি আমার তীরের ছায়ায় রেখেছেন। (অর্থাৎ জিহাদ করার মধ্যে।) নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক কিছুর উপর ক্ষমতাবান। [সহীহ বুখারী শরীফ-কিতাবুল জিহাদ]

হালাল রিযিক উপার্জন হুযূর-ই আক্রামের সুন্নাত। [কিমিয়ায়ে সা'আদত]

হযরত আমের রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই এবং

যে মুসলমান স্বীয় ভাই-এর কাছে ত্রুটিপূর্ণ জিনিস বিক্রি করে, তাহলে যতক্ষণ প্রকাশ না করে, ততক্ষণ সেটা বিক্রি করা হালাল নয়। [মুসনাদে আহমদ, ইবনে মাজাহ্ ও হাকিম]

হযরত আবূ হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম একদা খাদ্য শস্যের স্তুপের পার্শ্ব দিয়ে যাবার সময় সেখানে হাত মুবারক দিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র হাত মোবারকের আঙ্গুলসমূহে আদ্রতা অনুভূত হলো। তিনি বললেন, হে শস্য বিক্রেতা! এর উপর কি বৃষ্টির পানি পড়েছিলো? হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, তুমি ভেজাগুলোকে লোকেরা দেখার জন্য উপরে রাখোনি কেন? যে ধোঁকা দেয়, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়। [মুসলিম শরীফ]

খাবার জিনিসে যারা পানি ছিঁটিয়ে ওজন বৃদ্ধি করে, এ হাদীস শরীফ থেকে তাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ।

মাল যতবেশী হবে, বিপদও ততবেশী হবে এবং ওই সবের হিসাব দিতে হবে। কোন এক বুযুর্গ এক ব্যবসায়ীকে সপ্ন দেখে জানতে চাইলেন, তোমার সাথে আল্লাহ কেমন আচরণ করেছেন? সে জবাব দিলো, আল্লাহ পঞ্চাশ হাজার পুস্তিকা আমার সামনে রাখলেন। আমি আরয করলাম, হে আল্লাহ! এ পঞ্চাশ হাজার পুস্তিকা কিসের? তখন আল্লাহ তা'আলা ফরমালেন, "তুমি দুনিয়াতে পঞ্চাশ হাজার ব্যক্তির সাথে লেনদেন করেছো। এগুলো তাদের প্রত্যেকের সাথে সংশ্লিষ্ট আমলনামা।" অতঃপর আমি প্রত্যেক পুস্তিকায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকের সাথে কৃত লেনদেনের হিসাব দেখলাম।

ইমাম গাযালী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এ ঘটনা উদ্ধৃত করার পর বলেন, সারকথা হলো, যদি একটি টাকাও কারো যিম্মায় থাকে, তাহলে যার থেকে সে ছলচাতুরী বা ধোঁকা দিয়ে নিয়ে থাকে, এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে এবং কোন কিছুতে তার উপকার হবে না- সে যতক্ষণ সেটা পরিশোধ করে দায়িত্ব মুক্ত হবে না। [কিমিয়ায়ে সা'আদত]

ব্যবসায়ীদের প্রতিদিন কিছু দান খায়রাত করা উচিত

হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন, ব্যবসায় মিথ্যা ও কুসম হয়ে যায়। এর সাথে সাদক্বাকে সংযুক্ত করো। [আবূ দাঊদ, তিরমিযী]

ব্যবসা খুবই উত্তম ও পবিত্র কাজ। কিন্তু অধিকাংশ ব্যবসায়ী মিথ্যা কথার আশ্রয় নেয়। এমনকি মিথ্যা শপথও করে। এ জন্য অধিকাংশ হাদীসে যেখানে ব্যবসার কথা বর্ণিত হয়েছে, সেখানে সাথে সাথে মিথ্যা বলা ও মিথ্যা শপথ করার নিষেধাজ্ঞার কথাও বর্ণিত হয়েছে।

বাস্তব কথা হচ্ছে- ব্যবসায়ী যদি ব্যবসায় বরকত দেখতে চায়, তাহলে এসব বদ অভ্যাস থেকে যেন বিরত থাকে। ব্যবসায়ীদের এ সমস্ত মন্দ আচরণের কারণেই

বাজারকে যমীনের নিকৃষ্ট অংশ বলা হয়েছে এবং আরো বলা হয়েছে শয়তান প্রতিদিন সকালে স্বীয় ঝাণ্ডা নিয়ে বাজারে পৌঁছে যায়। এ জন্য বিনা প্রয়োজনে বাজারে যাওয়াকে মন্দ বলা হয়েছে। কেননা, বাজারে ঘুরাফেরা, সম্পদের লালসা মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন করে দেয়, কিন্তু আল্লাহর নেক বান্দাগণ যে কোন অবস্থায় আল্লাহর স্মরণ করতে থাকে। যেমন আল্লাহর বাণী-

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ

তরজমাঃ ওই ব্যক্তিগণ, যাদেরকে কোন ব্যবসা এবং কোন বেচাকেনা আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন করে না। [কানযুল ঈমান]

ক্বোরআন মজীদের এ বাণী এ কথার দিকে ইঙ্গিত করে যে, ব্যবসা ও বেচাকেনা আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীনকারী বিষয়। এর প্রতি মনোনিবেশ অলসতা সৃষ্টি করে। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন-

وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوَ ۨانْفَضُّوْا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا

তরজমাঃ এবং যখন তারা কোন ব্যবসা বা তামাশা দেখলো, তথা সে দিকে চলে গেলো এবং আপনাকে খুৎবায় দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে গেলো। [৬২:১১, কানযুল ঈমান]

সুতরাং ব্যবসায় এত ব্যস্ত না হওয়া চাই, যার ফলে আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন হতে বাধ্য হয়। সাহাবায়ে কেরাম বেচাকেনা ও ব্যবসা করতেন। কিন্তু যখন আল্লাহ্র হক্বগুলো থেকে কোন একটি হক্ব সম্মুখীন হত, তখন তাঁদেরকে বেচাকেনা, আল্লাহ্র স্মরণ হতে বাধা দিতে পারতো না। তাঁরা ওই হক্ব যথাসময়ে পালন করতেন।

আমাদেরও উচিৎ যখন আমরা বাজারে যাই, তখন যেন, যিক্র, দুরূদ শরীফ ও আল্লাহ্র স্মরণ থেকে উদাসীন না থাকি। এটা মনে করবেন যে, যিক্র ও তাসবীহ না করা দ্বারা আখিরাতের যে মুনাফাটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সমস্ত দুনিয়ার মুনাফাও সেটার সমতুল্য হতে পারে না।

অলস লোকদের মধ্যে আল্লাহর স্মরণকারীর উদাহরণ তেমনি, যেমন শুকনো বৃক্ষরাজির মধ্যে তরুতাজা বৃক্ষ, মৃতদের মধ্যে জীবিত এবং কাপুরুষদের মধ্যে গাযী।

অধিকন্তু যখন আযানের আওয়াজ কানে আসে, তখন সঙ্গে সঙ্গে যেন কাজকর্ম বন্ধ করে আযানের জবাব দিই এবং নামাযের প্রস্তুতি গ্রহণ করি। আমাদের পূর্ববর্তী মনীষীগণ এ ব্যাপারে খবুই তৎপর ছিলেন। সাহাবা-ই কেরাম যখন আযান শুনতেন, তখনই দোকানের উপর পর্দা ফেলে মসজিদের দিকে যাত্রা করতেন।

ইমাম গাযালী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি কিমিয়ায়ে সা'আদাতে কতেক বুযুর্গানে

কেরাম প্রসঙ্গে বলেন যে, তাঁদের মধ্যে একজন লোহার কাজ করতেন। তিনি যখন হাতুড়ী লোহার উপর মারার জন্য উঠাতেন আর এ দিকে আযানের আওয়াজ কানে এসে পৌঁছতো তখন সেটাকে নিচে নামাতেন না অর্থাৎ লোহার উপর না মেরে রেখে দিতেন এবং নামাযের জন্য চলে যেতেন।

অন্যজন চামড়ার কাজ করতেন, তিনি যখন চামড়ার মধ্যে সুঁই চালাতেন আর এদিকে আযানের আওয়াজ শুনতেন, তখন সেটা বের করতেন না। ওইভাবে রেখেই নামায সম্পন্ন করার জন্য চলে যেতেন। এটাই ছিল আমাদের পূর্বসূরী বুযুর্গদের বৈশিষ্ট্য। আযান হওয়ার সাথে সাথে যেন দুনিয়ার সম্পূর্ণ নিয়মনীতি বদলে যেতো। প্রত্যেককে মসজিদের দিকে যাত্রা করতে দেখা যেতো এবং জুমু'আর প্রতি এতো গুরুত্বারোপ করা হতো যে, অনেক দূর-দুরান্তর থেকে লোকেরা ভোর হওয়ার আগেই বাতি নিয়ে মসজিদের দিকে যাত্রা করতেন যেন প্রথম কাতারে স্থান পান। কিন্তু আজ? হায়! মসজিদসমূহ জনশূন্য দেখে মন ব্যথাতুর হয়ে উঠে।

হারাম মাল থেকে দান ক্বূল হয় না। আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন, যে ব্যক্তি হারাম মাল উপার্জন করে এবং সেটা যদি সাদক্বা করে, তাহলে তার জন্য তাতে কোন বরকত নেই এবং রেখে মারা গেলে, তা হবে জাহান্নামে যাবার সম্বল।

অর্থাৎ-মালের তিন অবস্থা আছে এবং হারাম মালের জন্য সেই তিন অবস্থাই ক্ষতিকর। আল্লাহ তা'আলা মন্দ দ্বারা নেকী বিলোপ করেন না। অবশ্যই নেকী দ্বারা মন্দ বিলোপ করেন। [মুসনাদে আহমদ]

হারামখোরের দো'আ কবূল হবে না

প্রিয় আক্বা হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ফরমান, আল্লাহ পাক পবিত্রতাকে ভালবাসেন এবং আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা মু'মিনদেরও সেটার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি রসূলগণকে বলেছেনঃ

يٰاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا الاية-

তরজমাঃ হে রসূলগণ! পবিত্র জিনিসগুলো খাও এবং ভাল কাজ করো। [সূরা মু'মিনূন, আয়াত-৫১]

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ مَارَزَقْنٰكُمْ الاية-

তরজমাঃ হে ঈমানদারগণ! আমার দেয়া পাক-পবিত্র জিনিসগুলো খাও। পুনরায় এরশাদ ফরমালেন, এক ব্যক্তি দীর্ঘ সফর করার ফলে চুল এলোমেলো এবং শরীর ধূলি-ধূসরিত (অর্থাৎ তার এমন অবস্থা যে, সে যেটা প্রার্থনা করবে, সেটা ক্বূল হবে) সে আসমানের দিকে হাত তুলে হে আল্লাহ! হে আল্লাহ! বলে (দো'আ করে)

কিন্তু অবস্থা হচ্ছে পানাহার হারাম, পোষাক হারাম, আহার্য হারাম তথা সবগুলি হারামে ভর্তি। তাই তার দো'আ কি করে কবূল হতে পারে? [মুসলিম শরীফ]

কোন জিনিসে কোন প্রকার দোষক্রুটি থাকলে তা প্রকাশ করা ওয়াজিব। ওই ধরনের দোষক্রুটি গোপন করা হারাম ও কবীরাহ্ গুনাহ্। এ পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নে কয়েকটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করা হলঃ

হযরত ওয়াসেলাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, যে ক্রুটিপূর্ণ জিনিস বিক্রি করলো এবং ওই ক্রুটি প্রকাশ করলো না, সে সব সময় আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টিতে থাকে অথবা বলেছেন যে, সব সময় ফিরিশতাগণ তার প্রতি লা'নত করতে থাকেন।

[সুনানে ইবনে মাজাহ]

ওজনে কম দেয়া হারাম

আজকাল ওজনে কম দেয়া একেবারে সাধারণ ব্যাপার হয়ে গেছে এবং মোটেই দুষণীয় মনে করা হয় না। অথচ এটা হারাম ও কবীরাহ্ গুণাহ্ এবং বান্দার হক্ব আত্মসাৎ করার সামিল। এভাবে সম্পদে বাহ্যত সাময়িকভাবে মুনাফা হলেও কি হবে? পরিণাম ফলতো ধ্বংস আর ধ্বংস। দুনিয়াতেও অপদস্থ এবং পরকালেও কঠিন শাস্তির উপযোগী। দুনিয়াতে মাঝে মধ্যে হারাম মাল অসুখ-বিসুখ, মামলা-মুকাদ্দামায় ব্যয় হয়ে যায় এবং কখনো কখনো ডাকাতেরও হস্তগত হয়ে যায়।

কতেক হারাম কাজ

ইমাম গাযালী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, কাপড় ব্যবসায়ী কাপড় ক্রয় করার সময় ঢিলা করে মাপে এবং বিক্রয় করার সময় খুব জোরে টেনে ধরে মাপে, এ ধরনের ব্যবসায়ী নিকৃষ্টতর ফাসিক্ব লোকদের দলভুক্ত। যে কসাই ওই হাড্ডি মাংসের সাথে রেখে বিক্রি করে, যেগুলো বিক্রি করার রেওয়াজ নেই, সেও নিকৃষ্টতর ফাসিক্বদের দলভুক্ত। আর যে ব্যক্তি শস্য বিক্রি করে এবং সচরাচর নিয়মের অতিরিক্ত মাটি শস্যের সাথে রেখে দেয়, সেও তাদের দলভুক্ত এবং এ ধরনের আচরণ হারাম ও না-জায়েয। প্রত্যেক প্রকার ব্যবসায় এবং কাজকর্মে লোকদের সাথে সততা এবং ন্যায় বিচার করা ফরয ও জরুরী। [কিমিয়ায়ে সা'আদাত]

অনুরূপ, দুধের সাথে পানি মিশ্রিত করা, ভাল জিনিস উপরে এবং নিকৃষ্ট জিনিস নিচে রাখা, (ধোঁকা দেয়ার উদ্দেশ্যে) ভাল জিনিস দেখিয়ে নিকৃষ্ট জিনিস দেয়া, ফলমূল ইত্যাদির উপর পানি ছিঁটিয়ে ওজন বৃদ্ধি করা এ সবই হারাম। অবশ্য দোষ ক্রুটি গ্রাহককে দেখানোর পর জিনিষ বিক্রি করলে, এতে কোন গুণাহ নেই। পরিমাপে কম দেয়া খুবই জঘন্য অপরাধ। আল্লাহ এর প্রতি ভীষণ অসন্তুষ্ট হন।

যেমন ঃ আল্লাহর বাণী-

وَيۡلٌ لِّلۡمُطَفِّفِيۡنَ الَّذِيۡنَ اِذَا اكۡتَالُوۡا عَلَى النَّاسِ يَسۡتَوۡفُوۡنَ وَاِذَا كَالُوۡهُمۡ اَوۡ وَّزَنُوۡهُمۡ يُخۡسِرُوۡنَ ـ اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمۡ مَّبۡعُوۡثُوۡنَ لِيَوۡمٍ عَظِيۡمٍ ـ يَّوۡمَ يَقُوۡمُ النَّاسُ لِرَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ ـ

তরজমাঃ পরিমাপে কম প্রদানকারীর জন্য মন্দ পরিণাম। তারা যখন অন্যদের থেকে মেপে নেয়, পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করে এবং যখন তারা মেপে দেয়, তখন কম দেয়। তাদের কি এ ধারণা নেই যে, পুণরুত্থিত হতে হবে এমন এক মহান দিনের জন্য, যে দিন সবাইকে আল্লাহর সম্মুখে দাঁড়াতে হবে?

[সূরা মুতাফফিফীন, তরজমা কানযুল ঈমান]

ওজনে কম প্রদানকারীদের ভয়ানক আযাব

বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি ওজনে বিশ্বাসঘাতকতা করে, ক্বিয়ামতের দিন তাকে দোযখের অতল গহবরে নিক্ষেপ করা হবে এবং দু'টি আগুনের পাহাড়ের মাঝখানে বসিয়ে নির্দেশ দেয়া হবে-এ পাহাড় দুটি মাপো ও ওজন করো। যখন সে ওজন করতে শুরু করবে, তখন আগুন তাকে জ্বালিয়ে ফেলবে। [তাফসীরে হুসাইনী]

ওজনে কম প্রদানকারীর পরিণাম খুবই মন্দ হয়ে থাকে। ক্বোরআন মজীদে উল্লিখিত মাদায়েন শহরবাসীদের ঘটনা ওজনে কম প্রদানকারীদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়।

মাদায়েনবাসীর উপর আযাব

মাদায়েন শহরের লোকেরা ব্যবসা বাণিজ্য করতো এবং সুখে শান্তিতে ছিলো; কিন্তু মূর্তি উপাসক ছিলো এবং ওজনে কম দিতো। অর্থাৎ- তাদের আক্বীদা ও আমল উভয়টি ভ্রান্ত ছিলো। আল্লাহ তাদের হিদায়তের জন্য হযরত শু'আইব আলায়হিস সালামকে প্রেরণ করলেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করো, ওজনে কম করো না। নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের সন্তোসজনক অবস্থা দেখছি। কিন্তু বিচারের দিন তোমাদের উপর আযাবের ভয় হচ্ছে। হে আমার সম্প্রদায়! মাপে ইনসাফের সাথে কাজ করো এবং লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য থেকে কম দিওনা এবং দ্বীনের ব্যাপারে ফ্যাসাদ করো না। আল্লাহ'র প্রদত্ত বিষয় থেকে যা অবশিষ্ট থাকে ওটা তোমাদের জন্য মঙ্গল। যদি তোমাদের বিশ্বাস না হয়, তাহলে আমি তোমাদেরকে আল্লাহর আযাব হতে রক্ষা করতে পারবো না। এর উত্তরে হযরত শু'আইব আলায়হিস্ সালামকে তাঁর সম্প্রদায় বললোঃ

قَالُوۡا يٰشُعَيۡبُ اَصَلٰوتُكَ تَاۡمُرُكَ اَنۡ نَّتۡرُكَ مَا يَعۡبُدُ اٰبَآؤُنَا اَوۡ اَنۡ نَّفۡعَلَ فِىۡۤ اَمۡوَالِنَا مَا نَشٰٓؤُا اِنَّكَ لَاَنۡتَ الۡحَلِيۡمُ الرَّشِيۡدُ ـ

তরজমাঃ তারা বললো, হে শু'আইব! তোমার নামায তোমাকে কি এ নির্দেশ দিচ্ছে, যে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের খোদাগুলেকে ত্যাগ করবো অথবা আমাদের সম্পদের ব্যাপারে যা ইচ্ছে তা করবো না? নিশ্চয়ই তুমি বড় বুদ্ধিমান সদাচারী!

[সূরা হুদ, পারা-১২, আয়াত-৮৭]

হযরত শু'আইব আলায়হিস সালাম স্বীয় সম্প্রদায়কে যথেষ্ট সময় যাবত বুঝালেন; কিন্তু তারা তাদের আচরণ থেকে ফিরে আসলো না। যখন তিনি তাদেরকে আল্লাহর আযাবের ভয় দেখালেন, তখন তারা বললোঃ

فَاَسۡقِطۡ عَلَيۡنَا كِسَفًامِنَ السَّمَآءِ اِنۡ كُنۡتَ مِنَ الصّٰدِقِيۡنَ

তরজমাঃ আপনি আমাদের উপর আসমানের যে কোন একটি টুকরা ফেলে দিন, যদি আপনি সত্যবাদী হোন। [সূরা শু'আরা, আয়াত- ১৮৭, কানযুল ঈমান]

হযরত শু'আইব, আলাইহিস সালাম যখন তাদের বুঝিয়ে সম্পুর্ণভাবে নিরাশ হয়ে গেলেন, তখন আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনা করলেন ঃ

رَبَّنَا افۡتَحۡ بَيۡنَنَا وَبَيۡنَ قَوۡمِ لَّنَا بِالۡحَقِّ وَاَنۡتَ خَيۡرُ الۡفٰتِحِيۡنَ

তরজমাঃ হে আমাদের রব! আমাদের মধ্যে এবং আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায্য ফয়সালা করে দাও এবং তোমার ফয়সালাই সর্বাপেক্ষা উত্তম

[সূরা আ'রাফ, নবম পারা, আয়াত -৮৯, কানযুল ঈমান]

আল্লাহর সত্য নবীর দোয়া বিফল হলো না। হযরত শু'আইব আলায়হিস সালাম দো'আ করার সাথে সাথেই আল্লাহ ক্ববূল করে নিলেন। যেমন ক্বোরআন মজীদে এরশাদ করেছেন ঃ

فَكَذَّبُوۡهُ فَاَخَذَهُمۡ عَذَابُ يَوۡمِ الظُّلَّةِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ عَذَابَ يَوۡمٍ عَظِيۡمٍ۔

তরজমাঃ অতঃপর তারা তাঁকে অস্বীকার করলো। পরে তাদেরকে মেঘাচ্ছন্ন দিবসের আযাব পরিবেষ্টিত করলো। নিশ্চয়ই সেটা এক ভীষণ দিনের আযাব ছিলো

[সূরা শু'আরা, আয়াত-১৮৯]

অগ্নিমেঘ

মাদায়েনবাসীর উপর অগ্নিমেঘ নিয়োজিত করা হয়েছিলো, যা থেকে আগুন বর্ষিত হয়েছিলো এবং সবাই ধ্বংস ও বিলীন হয়ে গিয়েছিলো। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা এ আযাবের বিস্তারিত বর্ণনা এভাবে দিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলা ওই সম্প্রদায়ের প্রতি জাহান্নামের দরজা খুলে দিয়েছিলেন এবং দোযখের অসহনীয় তাপ প্রেরণ করেছিলেন। তারা শহর থেকে বের হয়ে জঙ্গলের দিকে যাত্রা করেছিলো। আল্লাহ তা'আলা একটি ছায়াশীতল মনঃপূত মেঘ প্রেরণ করলেন। তাদের নারী-পুরুষ, ছেলে-মেয়ে সবাই মেঘের নিচে সমবেত হলো।

যখন সবাই ওই মেঘের নিচে একত্রিত হলো তখন ওই মেঘ থেকে আগুন বর্ষিত হতে লাগলো এবং সবাই পুড়ে ছাই হয়ে গেলো। আল্লাহর কাছে পানাহ চাই! আমাদেরকে যেন তাঁর গযব থেকে নিরাপদ রাখেন। আ-মী-ন বিহুরমতিন নাবিয়্যিল আ-মী-ন।

ওজনে কম প্রদানকারীর মৃত্যুর সময় কলেমা নসীব হয় না। মাপে কম প্রদানকারীদের পরিণতি অতিমন্দ। কিন্তু আজকাল অধিকাংশ মুসলমান এসব হারামকে মায়ের দুধ মনে করছে। এখনতো এ তরল চুমুক অতি অনায়সে কণ্ঠনালীর নিচে চলে যাচ্ছে; কিন্তু মৃত্যুর পর সমস্ত আনন্দ আহ্লাদ বের হয়ে যাবে। আল্লাহ্কে ভয় করুন! একটু সজাগ হোন। মাত্র কয়েক দিনের যিন্দেগীতে হারাম খেয়ে কতদিন থাকতে পারবেন? শেষ পর্যন্ত এসব ছেড়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হবে। কতদিন আর টাকা গুণতে থাকবেন? সারা জীবনই কি টাকা-পয়সা সংগ্রহে থাকবেন? স্মরণ রাখবেন দেখতে দেখতেই মৃত্যু এসে যাবে।

হারাম খোরদের দো'আ কবুল হয় না

হযরত ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হযরত মূসা কালীমুলাহ আলায়হিস সালাম এক ব্যক্তিকে খুবই কান্নাকাটি করে দো'আ-প্রার্থনা করতে দেখলেন। আল্লাহর দরবারে তিনি আরয করলেন, হে পরওয়ারদিগার! আপনি এ বান্দার দো'আ কেন ক্ববূল করছেন না? তখন মূসা আলায়হিস্ সালাম-এর প্রতি ওহী আসলো, হে মূসা! যদি এ লোকটি এভাবে কান্নাকাটি করে নিজেকে বিলীন করে দেয় এবং স্বীয় হাত এতটুকু উঠায় যে, আসমান পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তবুও আমি তার দো'আ ক্ববূল করবো না। কেননা তার পিঠে হারাম, পেটে হারাম এবং তার ঘরে হারাম। [মজালিসুস্ সানিয়্যাহ]

আজকাল প্রত্যেককে এমনও বলতে শুনা যায়, "আমার দো'য়া কবূল হয় না। আমার পেরেশানী দুর হয় না। জানিনা, আমার দ্বারা কি গুণাহ হয়েছে, যার শাস্তি মিলছে।" স্মরণ রাখবেন, এটাও শয়তানের একটি সফল আক্রমণ। মানুষ গুণাহ করে তবুও তার মনে এ ধারণাটা সৃষ্টি করে যে, তোমার কোন গুনাহ হয়নি; অথচ তার সম্পদ হারামের উপার্জন, সে নামাযের প্রতি উদাসীন, তার সবসময় মিথ্যা বলার অভ্যাস, কুধারণা, চুগলী ও অহঙ্কারের অভ্যাস আছে, চেহারা অগ্নি উপাস্যকদের মত অর্থাৎ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র পবিত্র সুন্নাত দাড়ি চেহারা থেকে উধাও। সরকারে মদীনা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, "দাড়ি বৃদ্ধি করো, গোঁফ খাটো করো এবং অগ্নি উপাসকদের বিরোধিতা করো অর্থাৎ তাদের চেহারার মতো করো না।" মনে রাখবেন, চিবুকের নিচ থেকে কম পক্ষে এক মুষ্ঠি পরিমাণ দাড়ি রাখা ওয়াজিব

এবং মুণ্ডানো বা ছেঁটে এক মুষ্ঠি থেকে খাটো করা হারাম। এ হারাম কাজটি ইদানিং বেশ দৃষ্টিগোচর হয়। এসব কিছু সুন্নাতের পরিবেশ থেকে দূরে থাকারই পরিণাম। যদি আমরা সুন্নাতসমূহের প্রতি দরদ পোষণকারী ইসলামী ভাইদের পরিবেশে থাকতাম তাহলে কমপক্ষে আমাদের গুণাহসমূহের প্রতি দৃষ্টি পড়তো। বাস্তবিকপক্ষে তাঁরাই নেক্‌কার হয়ে থাকেন, যাঁরা নিজেদেরকে গুণাহগার মনে করেন। আর আমরা এত গুণাহ করার পরও কোন গুণাহ চোখে পড়ে না। যা হোক, এ ধরনের কথা কখনো বলা উচিৎ নয়- 'জানি না, আমার কি গুণাহ হয়ে গেলো, যার শাস্তি ভোগ করছি।' নিশ্চয়ই মনে করবেন, আমাদের গুণাহ এত বেশী যে, আমাদের উপর আসমান ভেঙ্গে পড়ছেনা এবং যমীন ফেটে যাচ্ছে না- এটা আমাদের সৌভাগ্য! এটা আল্লাহর মেহেরবানীর উপর মেহেরবাণী যে, আমরা এত গুণাহ করার পরও আমাদেরকে তিনি সুযোগের উপর সুযোগ দিচ্ছেন। হে আল্লাহ! আমাদের হালাল রিযক্ব দান করুন!

হারাম খাওয়া ও উপার্জন থেকে রক্ষা করুন এবং সব রকমের গুণাহ থেকে বিরত থাকার তাওফীক্ব দান করার সাথে সাথে বিনয়ী হওয়ার সামর্থ্য দান করুন।! (আ-মী-ন)

হযরত ওমর ফারুক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এরশাদ করেছেন, উপার্জন করা ত্যাগ করো না। (হালাল রুজির প্রচেষ্টা চালু রেখো)। কেননা, আল্লাহ আসমান থেকে সোনা রূপা নিক্ষেপ করেন না। অর্থাৎ এ বিষয়ে আল্লাহ্‌র ক্বুদরততো নিশ্চয়ই আছে; কিন্তু যে কোন উপায়ে রুজি দেয়াটা তাঁরই পবিত্র নিয়ম।

[ইহ্‌য়াউল উলূম, কৃতঃ ইমাম গাযালী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি]

----<>---

বেচা-কেনা

[পবিত্র হাদীসের আলোকে]

হযরত আবূ হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- মানুষের জন্য এমন এক সময় আসবে, যখন সে তার উপার্জনকৃত সম্পদ হালাল, না হারাম পথে অর্জিত হল তা যাচাই করার কোন প্রয়োজন বোধ করবে না। হালাল উপার্জনের অন্যতম উত্তম উপায় হচ্ছে ব্যবসা।

ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য যমীনে ছড়িয়ে পড়া চাই

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ ফরমান-

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ -

তরজমাঃ তোমাদের নামায পড়া শেষ হলে যমীনে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণ করতে থাকো, আল্লাহকে বেশী পরিমাণে স্মরণ করো। তা হলেই নিশ্চয় তোমরা সফলকাম হবে। [সূরা জুমু'আহ্, আয়াত ১০]

কিছু জরুরী মাসাইল

বাকীতে খরিদ করা জায়েয

হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা হতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এক ইয়াহুদীর নিকট হতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একটি লৌহবর্ম বন্ধক রেখে কিছু খাদ্যবস্তু বাকীতে খরিদ করেছিলেন।

নিজের শারিরিক পরিশ্রম দ্বারা অর্থ উপার্জন করা অতি ফযীলতমণ্ডিত

হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রিয় নবী রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণ রুজি-রোজগারের জন্য নিজেরা শারিরিক পরিশ্রম করতেন।

হযরত মিক্বদাম ইবনে মা'দীকারুব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, নিজের হাত দ্বারা কাজ করে উপার্জনকৃত খাদ্য অপেক্ষা উত্তম খাদ্য কেউ কোন দিন খেতে পারেনি। আল্লাহ্‌র নবী হযরত দাঊদ আলায়হিস সালাম নিজের হাতে কাজ করে যা কিছু উপার্জন করতেন তা দ্বারাই জীবন যাপন করতেন।

ব্যবসায়ীদের প্রতি আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, মহান আল্লাহ এমন সহনশীল ব্যক্তির প্রতি রহমত বর্ষণ করেন, যে ব্যক্তি ক্রয়, বিক্রয় ও নিজের অধিকার আদায়ের সময় নম্রতা ও সহনশীল আচরণ করে।

কর্মচারীকে অবকাশ প্রদান

হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের কোন এক ব্যক্তির মৃত্যুর সময় ফিরিশতাগণ তার রূহের সাথে সাক্ষাত করে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি জীবনে কখনও ভাল কাজ করেছো? উত্তরে সে বললো, আমি আমার কর্মচারীদেরকে অবকাশ দিতাম। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, একথা শুনে ফিরিশতাগণ তাকে অব্যাহতি দিয়ে দিলেন।

ক্রয়-বিক্রয়ের সময় মিথ্যা শপথ করা হারাম

হযরত আবূ হুরাইরা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, মিথ্যা শপথ দ্বারা পণ্য-সামগ্রী বিক্রি হয় বটে, কিন্তু এতে বরকত ও কল্যাণ বিনষ্ট হয়ে যায়।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবূ আওফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার এক ব্যক্তি তাঁর পণ্য-সামগ্রী বিক্রি করতে বাজারে গিয়ে মুসলমানদেরকে ফাঁদে ফেলার জন্য আল্লাহর নামে ক্বসম করে বললো, ''আমি ওই মাল যত দামে ক্রয় করেছি এখনও কেউ সেই মূল্য বলেনি।'' তখন আল্লাহ তা'আলা ক্বোরআনের এ আয়াত শরীফ নাযিল করেন-

اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا الاية-

তরজমাঃ নিশ্চয় যারা অঙ্গীকার এবং নিজেদের শপথের পরিবর্তে হীন মূল্যে গ্রহণ করে। পরকালে তাদের কোন অংশ নেই। [সূরা আল-ই ইমরান, আয়াত- ৭৭]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জাহেলী যুগে ওকায, মায়েনা ও যুল মাজায মানুষের ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিলো। ইসলামের আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠার পর মুসলমানগণ সেখানে ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্য করাকে গুনাহর কাজ মনে করতো। তাই আল্লাহ তা'আলা ক্বোরআনের আয়াত নাযিল করলেন।

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ الاية-

তরজমাঃ হজ্জের মৌসুমে ক্রয়-বিক্রয় করাতে কোন গুনাহ নেই, তোমরা আল্লাহ পাকের করুণা ও কল্যাণ কামনা করো। [সূরা বাক্বারা, আয়াত ১৯৮]

হযরত আবদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, ক্রেতা ও বিক্রেতার বেচা-কেনার ক্ষেত্রে তা বাতিল করার ইখতিয়ার ততক্ষণ পর্যন্ত থাকে যতক্ষণ না তারা উভয়ে একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। অথবা ক্রয়-বিক্রয় শর্তাধীন হয়। বর্ণনাকারী বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র কোন জিনিস পছন্দ হলে ক্রয় করার পর তাড়াতাড়ি বিক্রেতার নিকট হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তেন।

ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকা দেয়া ও মাপে কম দেয়া হারাম

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বললেন, হুযূর! আমি ক্রয়-বিক্রয়ে প্রতারিত হই। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, যখন তুমি কোন বস্তু ক্রয় করবে, তখন বলবে, আমাকে যেন ধোঁকা দেয়া না হয়।

হযরত মিক্বদাম ইবনে মা'দীকারুব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন। তোমরা তোমাদের খাদ্য-দ্রব্যের ওজন করবে। তোমরা যদি ওজন করে ঠিকভাবে দাও তবে তোমাদের জন্য বরকত ও কল্যাণ দান করা হবে।

খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করে গুদামজাত করা বৈধ নয়

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি দেখেছি যে সব লোক আন্দাজ বা অনুমান করে খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করতো, প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হতো, যাতে তারা ওই মালগুলো নিজেদের স্থানে নিয়ে যাওয়ার পরই বিক্রি করে অর্থাৎ গুদামজাত না করে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, কেউ খাদ্য-দ্রব্য ক্রয় করলে তা হাতে আসার আগেই যেন সে তা বিক্রি না করে।

নিলামে বা ডাকে বিক্রি করা বৈধ

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নিজের ক্রীতদাস সম্পর্কে ঘোষণা করলেন, সে আমার মৃত্যুর

পর আযাদ। কিন্তু সে ব্যক্তি হঠাৎ করে দরিদ্র হয়ে পড়লো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তার নিকট হতে গোলামটি ক্রয় করে নিয়ে এসে বললেন, আমার নিকট হতে কেউ এ ব্যক্তিকে ক্রয় করবে কি? অতঃপর হযরত নু'আইম ইবনে আবদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা তাকে এত দামে ক্রয় করলেন। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম উক্ত গোলামটিকে তার হাতে সোপর্দ করলেন।

গর্ভের বাচ্চা ক্রয়-বিক্রয় করা নিষিদ্ধ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম, গর্ভস্থ বাচ্চা ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। জাহেলী যুগে এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় হতো; অর্থাৎ কেউ এ শর্তে উট ক্রয় করতো যে, তার পেটে বাচ্চা হলে বা ওই বাচ্চার পেটে বাচ্চা হলে সে তার মূল্য পরিশোধ করবে।

ক্রয়ের উদ্দেশ্যে ছাড়া দরদাম করা অনুচিত

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবূ হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কেউ তার অপর (মু'মিন) ভাইয়ের কেনার সময় যেন সে উক্ত জিনিসের দর না করে। আর কেনার উদ্দেশ্য ছাড়াই দাম-দর করে বস্তুর মূল্য বৃদ্ধি করো না।

ক্ষেতের ফসল ক্ষেতে থাকা অবস্থায় ক্রয়-বিক্রয়

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, 'মোযাবানা' পদ্ধতিতে ফল বিক্রি ততক্ষণ পর্যন্ত করো না, যতক্ষণ না তার পক্কতা সৃষ্টি হয়। আর শুকনো খেজুরের পরিবর্তে গাছের তাজা খেজুর বিক্রি করো না।

ক্ষেতের ফসল (যা এখনো কাটা হয়নি) ওজন কৃত খাদ্য শস্যের বিনিময়ে বিক্রি করার বর্ণনা

হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 'মোযাবানা' ধরনের কেনা-বেচা করতে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ বাগানের ফল যদি খুরমা হয়, তবে তা ওজনকৃত শুকনো খুরমার বিনিময়ে, আঙ্গুর হলে ওজনকৃত শুকনো আঙ্গুরের বিনিময়ে এবং অন্য কোন ফসল হলে (যা এখনো ক্ষেত থেকে কাটা হয়নি) ওজনকৃত খাদ্য-শস্যের বিনিময়ে বিক্রয় করতে এবং এরূপ প্রকৃতির সকল রকম বেচা-কেনা করতে নিষেধ করেছেন।

মৃত জন্তুর চর্বি গলানো জায়েয নেই

এরূপে চর্বিজাত দ্রব্য বা তৈল বিক্রয় করা যাবে না। হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী-ই পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন। একদা হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু জানতে পারলেন যে, অমুক লোক শরাব বিক্রি করে। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করুন। সে কি জানে না যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, মহান রব ইহুদীদেরকে ধ্বংস করুন! তাদের জন্য চর্বি খাওয়া হারাম ছিলো। তবুও তারা তা গলিয়ে বিক্রি করতো।

মদের ব্যবসাও হারাম

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা ছিদ্দীক্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলেন, সূরা বাক্বারার শেষোক্ত আয়াতগুলো যখন অবতীর্ণ হলো তখন নবী-ই পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম লোকদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন এবং ঘোষণা করে দিলেন যে, মদের ব্যবসা নিষিদ্ধ (হারাম) করে দেয়া হয়েছে।

মূর্তি ও মৃত জন্তু বেচা-কেনা করা হারাম

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, মদ, মৃত জন্তু, শূকরের চর্বি সম্পর্কে আপনি কি বলেন? উত্তরে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, তা বেচাকেনা করাও যাবে না; বরং এসবকে কাজেও ব্যবহার করা হারাম। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, আল্লাহ ইহুদীদের ধ্বংস করুন! আল্লাহ তাদের জন্য মৃত জন্তুর চর্বি হারাম করেছেন। তা সত্ত্বেও তারা তা গলিয়ে বিক্রি করে তার মূল্য ভোগ করে থাকে।

যে সকল আয় নিষিদ্ধ

হযরত আবূ মাস'উদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, হযরত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তিন প্রকার উপার্জিত আয় নিষিদ্ধ তথা হারাম ঘোষণা করেছেনঃ ১. বেশ্যাবৃত্তি দ্বারা উপার্জিত অর্থ, ২. কুকুর বিক্রির অর্থ, এবং ৩. গণনাবৃত্তি দ্বারা প্রাপ্ত অর্থ।

তিন শ্রেণীর অর্থ উপার্জন নিষিদ্ধ বা হারাম

হযরত আবূ হোযায়ফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর পুত্র বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, তাঁর পিতা বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি

ওয়াসাল্লাম নিম্নে বর্ণিত তিন প্রকারের অর্থ উপার্জন নিষিদ্ধ করেছেনঃ ১. রক্ত-মোক্ষন কার্য দ্বারা উপার্জন করা, ২. কুকুর বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করা। ৩. ক্রীতদাসীকে ব্যভিচারে লিপ্ত করে অর্থ উপার্জন করা। একদিন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিম্নে বর্ণিত লোকদের বিরুদ্ধে দো'আ করেছেনঃ ১. যে ব্যক্তি মানুষের শরীরে সূচ বিদ্ধ করে চিত্র অঙ্কণের ব্যবসা করে, ২. যে ব্যক্তি নিজের শরীরে ওই চিত্র গ্রহণ করে, ৩. যে ব্যক্তি সুদ গ্রহণ করে, ৪. যে ব্যক্তি সুদ প্রদান করে। এবং ৫. রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ছবি প্রস্তুতকারীর প্রতিও লা'নত করেছেন।

বাকীতে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয

হযরত আ'মাশ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আ আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ইবরাহীম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র কাছে বাকীতে ক্রয়ের জন্য বন্ধক রাখার বিষয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম। তখন তিনি বলেন, হযরত আসওয়াদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে আমার কাছে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম জনৈক ইহুদীর কাছ থেকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মূল্য আদায়ের শর্তে খাদ্য ক্রয় করেন এবং উক্ত ইহুদীর কাছে নিজের লৌহবর্ম বন্ধক রাখেন।

হযরত আনাস ইবনে মালেক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি যবের আটা ও পুরানো গন্ধযুক্ত চর্বি নিয়ে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসলাম। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, মদীনায় অবস্থানকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর বর্ম জনৈক ইহুদীর কাছে বন্ধক রেখে তা দিয়ে পরিবারের জন্য খাদ্য ক্রয় করেন।

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র পরিবারে এক সা' পরিমাণ গম বা আটা থাকতো না; অথচ তখন হুযূরের নয় জন স্ত্রী ছিলেন।

পশুর স্তনে দুধ আটকে রেখে ক্রয়-বিক্রয়

হযরত আবূ হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূল-ই পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা ছাগল ও উটনীর দুধ স্তনে আটকে রেখো না। এমন পশু কেউ ক্রয় করলে দোহনের পর দু'টি অধিকারের যেটি তার মনঃপূত হয় তা করতে পারবে। ইচ্ছা করলে কেনা পশুটি রেখে দিতে পারে, অথবা ফেরত দিতে পারে। তবে এর সাথে এক সা' পরিমাণ খেজুর দেবে।

ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে বরকত

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ''আমরা যখন মদীনায় আসলাম রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তখন সা'দ ইবনে রবী' এবং আমার মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন করে দেন।'' পরে হযরত সা'দ ইবনে রবী' রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, ''আমি আনসারদের মধ্যে অধিক ধন সম্পদের মালিক। আমার অর্ধেক সম্পত্তি তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি এবং স্ত্রীদ্বয়ের মধ্যে যাকে তোমার পছন্দ হয়, তুমি ইচ্ছে করলে তাকে আমি ছেড়ে দেবো। ইদ্দত পালনের পর তুমি তাকে বিয়ে করবে।'' হযরত আবদুর রহমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, ''এ সবের আমার প্রয়োজন নেই; বরং ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য কোন হাটহাজার আছে কিনা তা বলুন।'' তিনি বললেন, ''ক্বায়নুক্বার বাজার আছে।'' পরদিন আবদুর রহমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বাজারে গিয়ে পনির ও ঘি ক্রয় করে নিয়ে এলেন। তারপর থেকে তিনি ব্যবসায়িক কাজে প্রতিদিন যাতায়াত করতে থাকেন। কিছুদিন পর হযরত আবদুর রহমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র কাপড়ে বিয়ের মেহেদী দেখা গেলো। তা দেখে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, ''তুমি কি বিয়ে করেছো?'' তিনি বললেন, ''হে আল্লাহর রাসূল, হাঁ।'' রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, ''কাকে? তিনি বললেন, ''জনৈকা আনসারী মহিলাকে।'' তিনি আবার এরশাদ করলেন, ''কত মহর দিয়েছো?'' হযরত আবদুর রহমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, ''খেজুরের এক আঁটি পরিমাণ সোনা।'' হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, ''একটি ছাগল দিয়ে হলেও ওলীমা করো।''

অগ্রীম ক্রয়-বিক্রয়ের শর্ত

হযরত মুহাম্মদ ইবনে আবুল মুজালেদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ ও হযরত আবূ বুরদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবী আওফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে জিজ্ঞেস করলেন- রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণ কি তাঁর সময়ে গমের অগ্রিম বেচাকেনা করতেন? তিনি বললেন, আমরা সিরিয়ার কৃষকদের কাছ থেকে গম, যব ও ভুট্টা নির্দিষ্ট পরিমাণ উল্লেখ করে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অগ্রিম মূল্য দিয়ে ক্রয় করতাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম- এমন লোককে কি অগ্রীম দেয়া হতো, যার বাগান বা ক্ষেত রয়েছে? তিনি বললেন, সে বিষয়ে আমরা জিজ্ঞেস করতাম না। তারপর তারা আমাকে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার কাছে পাঠালেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন,

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সময় তাঁর সাহাবীগণ অগ্রিম মূল্য দিতেন এবং তাদের ক্ষেত্র রয়েছে কিনা তা জিজ্ঞাসা করা হত না।

প্রতিবেশীর হক্ব

হযরত আমর ইবনে শারীক হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্বক্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনাহুর কাছে দাঁড়িয়েছিলাম, তখন হযরত মিসওয়ার ইবনে মাখরামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এসে আমার কাঁধে হাত রাখেন। তখন রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর আযাদকৃত গোলাম আবূ রাফি' রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এসে বললেন, হে সা'দ! আপনার বাড়ীতে আমার যে দু'টি ঘর আছে, সে দু'টি আপনি খরিদ করে নিন। হযরত সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আল্লাহর শপথ! সে দুটি ক্রয় করবো না। তখন হযরত মিসওয়ার বললেন, আল্লাহর ক্বসম, আপনি ঘর দুটি অবশ্যই খরিদ করবেন। হযরত সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আল্লাহর ক্বসম, আমি তোমাকে কিস্তিতে চার হাজার দিরহামের বেশী দেবো না। হযরত আবূ রাফি' রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, "এ ঘর দু'টির বিনিময়ে ৫০০ দিনারের প্রস্তাব পেয়েছি। আমি যদি রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর কথা না শুনতাম যে, প্রতিবেশী অধিক হকদার, আপনি অধিক নিকটবর্তী না হলে আমি ঘর দুটি আপনাকে ৪০০০ দিরহামের বিনিময়ে দিতাম না।" ঘরগুলোর জন্য আমাকে ৫০০ দীনার দেয়ার প্রস্তাব দেয়া হয়েছিলো। এরপর হযরত রাফি' রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হযরত সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে ঘর দিয়ে দিলেন।

জমি ইজারা নেয়ার নিয়ম

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল-ই পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম খায়বারের জমি এ শর্তে দিয়েছিলেন যে, তারা চাষাবাদ করে ফসল উৎপন্ন করবে এবং উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক তারা পাবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হযরত নাফি' রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে বলেছেন, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সময়ে কিছু মূল্যের বিনিময়ে জমি ইজারা দেয়া হতো।

কোন্ প্রতিবেশীর অধিকার বেশী

হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, এয়া রাসূলাল্লাহ! আমার দু'জন প্রতিবেশী রয়েছে। হাদিয়া বা উপঢৌকন তাদের দু'জনের মধ্যে কাকে দেবো? উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, যার ঘরের দরজা তোমার অধিক নিকটবর্তী তাকে।

প্রয়োজনে অমুসলিমকে শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ করা জায়েয

হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং হযরত আবূ বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হিজরতের সময় বণী দলী গোত্রের এক ব্যক্তিকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তাঁদের সঙ্গে পথ প্রদর্শক রূপে লওয়ার সাব্যস্ত করলেন। ওই ব্যক্তি অমুসলিম ছিলো। তার উপর তাঁদের আস্থা ছিলো। তাই তাঁরা বাহন ওই ব্যক্তিকে অর্পণ করলেন এবং বলে দিলেন, তিনরাত অতিবাহিত হওয়ার পর তুমি আমাদের বাহন নিয়ে সওর পর্বতের গুহার নিকট উপস্থিত হয়ো। অতঃপর ওই ব্যক্তি তিন রাত্রি অতিবাহিত হওয়ার পর বাহন নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলো এবং তাঁদেরকে নিয়ে সমুদ্রের উপকূল ধরে মদীনা মুনাওয়ারার পথে যাত্রা করলো।

ঝাড়-ফুঁক ও তাবিজের বিনিময়ে হাদিয়া নেয়া জায়েয

হযরত আবূ সা'ঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর একদল সাহাবী সফররত অবস্থায় বিশ্রাম গ্রহণের জন্য কোন এক বস্তিবাসীদের কাছে গেলেন; কিন্তু বস্তিবাসীরা তাদের কোন প্রকার সহায়তা করতে রাজি হলো না। এমতাবস্থায় বস্তির সর্দারকে সাপে দংশন করলো। বস্তিবাসীগণ সাপের বিষ নামানোর সকল প্রকার চেষ্টা ও তাদবীর করলো; কিন্তু কোন ফল হল না। তখন তাদের মধ্যে কেউ পরামর্শ দিল-রাতে যে একদল বিদেশী মুসাফির এসেছিল তাদেরকে খোঁজ করে দেখা যাক তাদের নিকট কোন তদবীর থাকতে পারে। অতঃপর বস্তিবাদীদের এক প্রতিনিধি দল সাহাবীগণের সাথে সাক্ষাত করে সকল ঘটনা ব্যক্ত করলো এবং তাঁদের নিকট কোন চিকিৎসা আছে কিনা জিজ্ঞাসা করলো। সাহাবা কেরামদের মধ্যে এক ব্যক্তি বললেন, হ্যাঁ আমি ঝাড়-ফুঁক করে থাকি। আমরা তোমাদের কিছু সহযোগিতা চেয়েছিলাম। কিন্তু তোমরা তাতে সম্মত হওনি। আমি এখন ঝাড়-ফুঁক করব না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আমাদেরকে বিনিময় (হাদিয়া) প্রদান করবে না। এখন উভয় পক্ষের মধ্যে ৩০ টি ছাগল প্রদান করা সাব্যস্ত হলো। অতঃপর ওই সাহাবী স্বর্পে দংশিত ব্যক্তির কাছে উপস্থিত হয়ে 'আলহামদু' শরীফ পাঠ করে তার উপর সাত বার ফুঁক দিলেন। স্বর্পে দংশিত ব্যক্তি পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলো। তারপর বস্তিবাসী নির্ধারিত হাদিয়া পরিশোধ করে দিলো। ওই সাহাবী ফিরে আসলে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে ছাগলগুলোর ব্যবহার নিয়ে মতবিরোধ হলো। তখন সাব্যস্ত হলো- 'আমরা সকলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে উপস্থিত হয়ে যাবতীয় ঘটনা আরয করবো। এ ব্যাপারে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যে সিদ্ধান্ত দেবেন তাই আমরা পালন করবো।' সাহাবীগণ রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে

উপস্থিত হয়ে সমস্ত ঘটনা আরয করলেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা কোন অবৈধ কাজ কর নি। তোমরা সেগুলো বন্টন করে নাও এবং আমার জন্যও একটি অংশ রাখিও।

ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধ করা

আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে ঋণগ্রহণ ও তার পরিণাম

হযরত আবূ হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি পরিশোধ করার দৃঢ় সংকল্পের সাথে মানুষের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সে ঋণ পরিশোধে সাহায্য করবেন। আর যে ব্যক্তি তা আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করে আল্লাহ তাকে ধ্বংস করবেন।

ঋণ পরিশোধের গুরুত্ব প্রসঙ্গে

হযরত আবূ যার গিফারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন একদিন আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলাম। তখন তিনি দূর হতে উহুদ পর্বতটি দেখে বললেন, এ পর্বতটি যদি আমার জন্য স্বর্ণ করে দেয়া হয়, তবে তিনদিনের বেশি একটি মুদ্রা পরিমাণও আমার কাছে বাকী রাখতাম না; কিন্তু যদি আমার ঋণ থাকে তবে তা পরিশোধ করার পরিমাণ রাখতাম। তারপর রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যারা অধিক ধনী তারাই ক্বিয়ামতে অধিক অভাবগ্রস্ত হবে; কিন্তু যে ধনী লোক আল্লাহর রাস্তায় সৎকাজে চারদিকে ধনসম্পদ ব্যয় করে। আর এরূপ ধনীদের সংখ্যা খুবই কম।

উত্তম পন্থায় তাগাদা দেয়া প্রসঙ্গ

হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করতে শুনেছি যে, এক ব্যক্তি মারা গেলে তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, তুমি দুনিয়াতে কি কাজ করতে? উত্তরে লোকটি বললো, "আমি লোকদের সাথে ক্রয়-বিক্রয় করতাম। আর সেটার মধ্যে স্বচ্ছল লোকদেরকে আমি দেনা দিতে অবকাশ দিতাম এবং গরীবদেরকে দেনা মাফ করে দিতাম।" এ কারণে তার গুণাহ মাফ করে দেয়া হলো। হযরত আবূ মাস'ঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র কাছ থেকে এ হাদীস শুনেছি।

হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর পিতা হযরত আবদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র ঋণ পরিশোধ

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাঁর পিতা উহুদের যুদ্ধে শহীদ হন এবং তার উপর কিছু ঋণ ছিলো।

পাওনাদাররা এ ব্যাপারে পীড়াপিড়ি শুরু করলে আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র দরবারে উপস্থিত হলাম। তিনি তাদেরকে আমাদের বাগানের ফল নিয়ে নিতে এবং আমার পিতার অবশিষ্ট ঋণ মাফ করে দিতে বললেন। কিন্তু তারা তা মানলো না। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমার বাগানটি তাদেরকে দিলেন না; বরং আমাকে বললেন, আমি সকালে তোমার বাগানে যাবো। সকালেই তিনি আমাদের কাছে তাশরীফ আনলেন এবং বাগানের চারদিকে ঘুরে বকরতের জন্য দো'আ করলেন। এর বরকতে আমি ফল পেড়ে তাদের সমস্ত ঋণ পরিশোধ করে দিলাম এবং আমার কাছে আরো বাড়তি খেজুর রয়ে গেলো।

পাওনাদারের তাগাদা দেয়ার অধিকার আছে

হযরত আবূ হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র নিকট পাওনার জন্য কড়া ভাষায় তাগাদা দিলে সাহাবীরা তাকে হত্যার জন্য উদ্যত হলেন। তিনি বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। পাওনাদারের তাগাদা দেয়ার অধিকার আছে। একটা উট ক্রয় করে তাকে বিদায় দাও। তারা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে জানালেন, উক্ত ব্যক্তির পাওনা উট হতে উত্তম উট পাওয়া গেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, উত্তম উটটি তাকে কিনে দাও। তোমাদের মধ্যে ওই ব্যক্তি উত্তম, যে সুন্দরভাবে ঋণ পরিশোধ করে।"

ঋণ পরিশোধে টালবাহানা করা যুলম্

হযরত আবূ হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ঋণ পরিশোধে সামর্থ্যবান ব্যক্তির টালবাহানা যুল্মের সামিল।

তিনটি কাজ হারাম ও তিনটি কাজ অপছন্দনীয়

হযরত মুগীরাহ্ ইবনে শো'বাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমরা ভালভাবে জেনে রেখো আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর তিনটি কাজ হারাম করেছেনঃ ১. মায়ের নাফরমানী করা, ২. মেয়ে হলে জীবিত অবস্থায় মাটিতে পুঁতে ফেলা এবং ৩. নিজে চুপ থেকে অন্য লোকের মাধ্যমে জোর করে আদায় করা। তা ছাড়া তিনটি কাজ আল্লাহ তা'আলা অপছন্দ করেনঃ ১. অযথা তর্ক-বিতর্ক বা অনর্থক কাজে লিপ্ত হওয়া, ২. বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া অন্যের নিকট হাত পাতা অর্থাৎ ভিক্ষায় লিপ্ত হওয়া বা অধিক প্রশ্নের অবতারণা করা এবং ৩. ধন-সম্পদের অপচয় করা।

[উপরোক্ত হাদীসসমূহ মিশকাত শরীফ, সহীহ বোখারী ও মুসলিম শরীফ, ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায় হতে নেয়া হয়েছে]

----<>----

ইসলামে তাক্বলীদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ অনুশাসনগুলোর মধ্যে 'তাক্বলীদ' অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য বিষয়। 'তাক্বলীদ'-এর পক্ষে নির্ভরযোগ্য ও অকাট্য প্রমাণাদি রয়েছে। নিম্নে 'তাক্বলীদ' সম্পর্কে কতিপয় জরুরী বিষয় প্রমাণ সহকারে আলোচনা করা হলো।

এক

'তাক্বলীদ' -এর অর্থ

'তাক্বলীদ' আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে-'গলায় হার অথবা পাট্টা পরিধান করা', আর পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে- কারো বাণী ও কর্মকে নিজের উপর শরীয়ত মতে অপরিহার্য বলে জানা- এটা মেনে নিয়ে যে, তাঁর বাণী ও কর্ম নিজের জন্য অনুসরণযোগ্য দলীল, যেহেতু তা শরীয়ত সম্মতভাবে প্রমাণিত। যেমন- আমরা ইমাম আ'যম রাহমাতুল্লাহি আলায়হির বাণী ও কর্মকে নিজেদের জন্য দলীল মনে করে থাকি এবং শরীয়তের দলীলাদির দিকে নজর দেওয়ার প্রয়োজনই অনুভব করি না। (হাশিয়া-ই হুস্‌সামী, শরহে মুখ্‌তাসারুল মানার, ইমাম গাযালী কৃত কিতাবুল মুস্‌তাসফাঃ ২য় খণ্ড এবং মুসাল্লামুস সুবূত)।

উপরোক্ত সংজ্ঞা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র আনুগত্য করাকে 'তাক্বলীদ' বলা যাবে না। কারণ, তাঁর প্রতিটি বাণী ও কর্ম শরীয়তের দলীলই। 'তাক্বলীদ'-এর মধ্যে শরীয়তের দলীলাদির দিকে দেখা হয় না। এ কারণে আমরা হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর 'উম্মত'; 'মুক্বাল্লিদ' বা 'তাক্বলীদকারী' নই। অনুরূপ, সাহাবা কেরাম এবং আইম্মা-ই দ্বীনও হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মতই; 'মুক্বাল্লিদ' বা (তাক্বলীদকারী) নন। আর আলিমদের আনুগত্য, যা সাধারণ মুসলমান করে থাকে, সেটাকেও 'তাক্বলীদ' বলা যাবে না। কেননা, কেউ ওই আলিমের বাণী কিংবা কর্মকে নিজের জন্য শরীয়তের দলীল মনে করে না, বরং এ কথা মনে করে তাঁদের কথা মান্য করে যে, তিনি একজন আলিম। তিনি কিতাব দেখেই হয়তো বলছেন; কিন্তু যদি এ কথা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, তাঁর দেওয়া ফাত্ওয়া ভুল ছিলো, কিতাবের পরিপন্থী ছিলো, তবে তা কেউ মান্য করে না। অবশ্য, ইমাম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলায়হির বাণীর বিষয়টা এর ব্যতিক্রম। তিনি যদি ক্বোরআন, হাদীস ও উম্মতের ইজমা' দেখেই মাসআলা বলে দেন, তবে তাতো গ্রহণযোগ্য; আর যদি তিনি স্বীয় অনুমান থেকেই নির্দেশ দিয়ে দেন, তবুও তা গ্রহণযোগ্য। এ পার্থক্যটা অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে।

দুই

'তাক্বলীদ' দু'প্রকারঃ

১. শরীয়ত বিষয়ক তাক্বলীদ এবং
২. শরীয়ত ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে তাক্বলীদ।

প্রথমোক্ত 'তাক্বলীদ' তো শরীয়তের বিধানাবলীতে কারো 'তাক্বলীদ' বা অনুসরণ করাকেই বলা হয়। যেমন নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত ইত্যাদি বিষয়ক মাসআলাসমূহে দ্বীনের ইমামগণের আনুগত্য করা হয়। আর শেষোক্ত 'তাক্বলীদ' হচ্ছে পার্থিব বিষয়াদিতে কারো অনুসরণ করা। যেমন, চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা চিকিৎসা বিজ্ঞানে 'বূ-আলী সীনার', উর্দু কবিগণ 'দাগ', আমীর অথবা মির্যা গালিবের এবং আরবী ব্যাকরণবিদরা সীভওয়াইহ্ ও খলীলের অনুসরণ করে থাকেন। অনুরূপ প্রত্যেক পেশাজীবী আপন আপন পেশায় ওই বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের অনুসরণ করে থাকেন। এটা হচ্ছে 'দুনিয়াবী তাক্বলীদ'।

আর সুফীগণ ওযীফা ও কর্মসমূহে আপন পীর-মাশাইখের বাণী ও কর্মের অনুসরণ করে থাকেন। তা 'ধর্মীয় তাক্বলীদ' তো বটে, কিন্তু শরীয়ত বিষয়ক তাক্বলীদ নয়, বরং সেটাকে 'তাক্বলীদ ফিত্তরীক্বত' বলা হয়। তা এ কারণে যে, এটা শরীয়তের মাসা-ইল, হারাম ও হালালের মধ্যে 'তাক্বলীদ' নয়। অবশ্য এটাও একটা দ্বীনী কর্মে 'তাক্বলীদ' বটে।

শরীয়ত ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে 'তাক্বলীদ' যদি শরীয়ত বিরোধী কাজে হয়, তবে তা হবে হারাম। যদি ইসলাম বিরোধী না হয়, তবে জায়েয। বৃদ্ধারা বিয়ে-শাদীর ক্ষেত্রে তাদের বাপদাদার আবিস্কৃত যে সমস্ত রসম ও নিয়মাবলী নির্ধারণ করে বসে, সেগুলো যদি শরীয়ত বিরোধী হয় তবে হারাম। আর চিকিৎসকগণ চিকিৎসা-সম্পর্কিত বিষয়াদিতে বূ-আলী সীনা প্রমুখের যেই অনুসরণ করে থাকেন, সেসব বিষয়ের কোনটা শরীয়ত-বিরোধী না হলে তা জায়েজ (বৈধ)।

শরীয়ত-বিরোধী কার্যাদিতে 'তাক্বলীদ' বা অনুসরণ করার নিষেধ পবিত্র ক্বোরআনে কতিপয় স্থানে ঘোষণা করা হয়েছে। এ ধরণের অনুসরণকারীরও বিভিন্ন জায়গায় সমালোচনা করা হয়েছে। নিম্নে এতদসম্পর্কিত কতিপয় আয়াতের উদ্ধৃতি দেওয়া হলো-

وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا۔

তরজমাঃ তার কথা মানবে না, যার অন্তরকে আমি আমার স্মরণে অমনযোগী করে দিয়েছি এবং সে আপন খেয়াল খুশীর অনুসরণ করেছে আর তার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে গেছে। [১৮ঃ২৮, তরজমা- কানযুল ঈমান]

وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلٰى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَالَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ـ

তরজমাঃ এবং যদি তারা তোমার উপর এ প্রচেষ্টা চালায় যেন তুমি আমার শরীক স্থির করো- যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, তবে তাদের কথা মান্য করো না।''

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآئَنَا اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآئُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ ـ

তরজমাঃ এবং যখন তাদেরকে বলা হয়, 'এসো সেটার দিকে, যা আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেছেন এবং রসূলের দিকে, তখন বলে, 'আমাদের জন্য সেটাই যথেষ্ট, যার উপর আমাদের বাপদাদাকে পেয়েছি।' যদিও কি তাদের বাপদাদা কিছুই না জানে এবং সৎপথের উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়?

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَآ اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَآئَنَا

তরজমাঃ এবং যখন তাদেরকে বলা হয়, 'আল্লাহর অবতীর্ণের অনুসরণ করো', তখন বলবে, 'বরং আমরাতো সেটারই অনুসরণ করবো, যার উপর আমাদের বাপদাদাকে পেয়েছি।'

এসব আয়াতে এবং এ ধরনের অন্যান্য আয়াতে ওই তাক্বলীদই মন্দ বলে ঘোষণা করা হয়েছে, যা শরীয়তের মোকাবেলায় মুর্খ বাপদাদার হারাম বা অবৈধ কার্যাদির মধ্যে করা হয়, আর একথা বলে বেড়ায় আমাদের বাপদাদা এমনি করতো, আমরাও করবো হোক না সেটা বৈধ কিংবা অবৈধ।

বাকী রইলো, শরীয়ত বিষয়ক কার্যাদিতে 'তাক্বলীদ' ও মাযহাবের ইমামগণের আনুগত্য করা। এ বিষয়ের সাথে উপরোক্ত আয়াতগুলোর কোন সম্পর্ক নেই। সুতরাং উপরোক্ত আয়াতগুলোর উদ্ধৃতি দিয়ে ইমামগণের তাক্বলীদকে শির্ক কিংবা হারাম বলা নিছক বে-দ্বীনীই। এ ব্যাপারে অবশ্যই সতর্ক থাকা দরকার।

তিন

কোন্ কোন্ বিষয়ে তাক্বলীদ করা যায় আর কোন্ কোন্ বিষয়ে করা যায় না?

'শরীয়ত বিষয়ক তাক্বলীদ'-এ কিছুটা ব্যাখ্যা বিন্যাস রয়েছে। যেমন-

শরীয়তের বিষয়াদি তিন প্রকার। যথা-

১. আক্বাইদ
২. ওই সমস্ত বিধান, যেগুলো ক্বোরআন পাক কিংবা হাদীস শরীফ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত; ইজতিহাদের সেগুলোতে কোনরূপ দখল নেই এবং
৩. ওইসব বিধান, যেগুলো ক্বোরআন কিংবা হাদীস থেকে অনুমান ও ইজতিহাদ করে বের করা হয়।

এখন দেখুন এতদ্সম্পর্কীয় বিধান

এক

আক্বাইদে কারো 'তাক্বলীদ' বৈধ নয়। 'তাফসীর-ই রূহুল বয়ান'-এ 'সূরা হূদ'-এর শেষাংশের আয়াত نَصِيْبَهُمْ غَيْرَ مَنْصُوْصٍ -এর ব্যাখ্যায় রয়েছে

وَفِى الْاٰيَةِ ذَمُّ التَّقْلِيْدِ وَهُوَ قَبُوْلُ قَوْلِ الْغَيْرِ بِلَادَلِيْلٍ وَهُوَ جَائِزٌ فِى الْفُرُوْعِ وَالْعَمَلِيَّاتِ وَلَا يَجُوْزُ فِىْ اُصُوْلِ الدِّيْنِ وَالْاِعْتِقَادِيَّاتِ بَلْ لَا بُدَّ مِنَ النَّظَرِ وَالْاِسْتِدْلَالِ ـ

অর্থাৎ আয়াতের মধ্যে 'তাক্বলীদ'-কে মন্দ বলা হয়েছে। 'তাক্বলীদ' হচ্ছে- কারো কথা কোন দলীল-প্রমাণ তলব করা ছাড়াই গ্রহণ করে নেওয়া। এটা শরীয়তের মূলনীতিমালা থেকে অনুমিত ও কর্মসংক্রান্ত বিধানাবলীতে বৈধ; কিন্তু তা বৈধ নয় দ্বীনের মৌলিক বিষয়াদি ও আক্বাইদ সংক্রান্ত বিষয়াদিতে। এ শেষোক্ত বিষয়াদিতে চিন্তাভাবনা করা ও দলীলাদি অনুসন্ধান করা জরুরী।''

সুতরাং যদি কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করে-তাওহীদ ও রিসালতের বিষয়াদি ইত্যাদি তোমরা কিভাবে মান্য করলে? তবে একথা বলা যাবে না যে, 'হযরত ইমাম আবূ হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেছেন বিধায়, অথবা ইমাম আ'যমের ফিক্বহে আকবর-এর অনুসরণেই তা মেনে নিয়েছি, বরং তাওহীদ ও রিসালতের প্রমাণাদির ভিত্তিতেই তা মান্য করেছি।' কেননা, আক্বাইদে 'তাক্বলীদ' নেই।

'ফাতা-ওয়া-ই শামীর' ভূমিকায় تَقْلِيْدُ الْمَفْضُوْلِ مَعَ الْاَفْضَلِ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে-

(عَنْ مُعْتَقَدِنَا) اَىْ عَمَّا نَعْتَقِدُهٗ مِنْ غَيْرِ الْمَسَائِلِ الْفَرْعِيَّةِ مِمَّا يَجِبُ اِعْتِقَادُهٗ عَلٰى كُلِّ مُكَلَّفٍ بِلَا تَقْلِيْدٍ لِاَحَدٍ وَهُوَ مَا عَلَيْهِ اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَهُمُ الْاَشَاعِرَةُ وَالْمَاتُرِيْدِيَّةُ ـ

অর্থাৎ ''যেসব বিষয়ে আক্বীদা বা বিশ্বাস রাখা শরীয়তের বিধান বর্তায় এমন প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ওয়াজিব বা অপরিহার্য, সেসব বিষয়ে বিশ্বাস (আক্বীদা) রাখা কারো 'তাক্বলীদ' বা অনুসরণের ভিত্তিতে নয়। কিন্তু শরীয়তের নীতিমালা থেকে অনুমিত মাসাইলের ব্যাপারটা এর বিপরীত। অর্থাৎ তাতে 'তাক্বলীদ' বা অনুসরণ করা যাবে। এটাই হচ্ছে আহলে সুন্নাতের সর্বসম্মত মত- আশা'ইয়ারও, মাতুরীদিয়ারও।''

'তাফসীর-ই কবীর'-এ দশম পারার আয়াত فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلَامَ اللّٰهِ -এর ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে-

هٰذِهِ الْاٰيَةُ تَدُلُّ عَلٰى اَنَّ التَّقْلِيْدَ غَيْرُ كَافٍ فِىْ الدِّيْنِ وَاَنَّهٗ لَابُدَّ مِنَ النَّظْرِ وَالْاِسْتِدْلَالِ

অর্থাৎ ''এ আয়াত এ কথার পক্ষে দলীল যে, 'তাক্বলীদ' দ্বীন (আক্বীদা)-এর ব্যাপারে যথেষ্ট নয়; নিশ্চয় তাতে চিন্তা-ভাবনা ও দলীল-প্রমাণ অনুসন্ধান করা জরুরী।''

দুই

সুস্পষ্ট বিধানাবলীতেও কারো 'তাক্বলীদ' বৈধ নয়। পঞ্জেগানা নামায, নামাযের রাক'আতগুলো, ত্রিশ রোযা, রোযা পালনকালে পানাহার হারাম হওয়া- এগুলো হচ্ছে এমন সব মাসা-ইল, যেগুলো ক্বোরআন,হাদীস (نــــص) থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। এ কারণে একথা বলা যাবে না যে, নামায পাঁচ ওয়াক্ত কিংবা রোযা এক মাস যাবৎ এজন্য যে, 'ফিক্বহে আকবর'- এ লিখা হয়েছে অথবা ইমাম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেছেন; বরং এজন্য যে, ক্বোরআন ও হাদীসে সরাসরি এর পক্ষে প্রমাণাদি মওজুদ রয়েছে।

তিন

যেসব মাস্আলা ক্বোরআন, হাদীস এবং ইজমা-'ই উম্মত থেকে 'ইজতিহাদ' ও 'ইসতিম্বাত' (মূলনীতিমালা থেকে অনুমান) করে বের করা হয়, সেগুলোতেই 'মুজতাহিদ নয় এমন ব্যক্তি'র উপর 'তাক্বলীদ' করা ওয়াজিব বা অপরিহার্য।

উপরোক্ত সুবিন্যস্ত বর্ণনা থেকে একথা সুস্পষ্ট হলো যে, কোন্ মাস্আলা 'তাক্বলীদী' (অনুসরণযোগ্য), আর কোন্ মাস্আলা 'তাক্বলীদী' নয়। সুতরাং উপরোক্ত প্রকারভেদের প্রতি যত্নবান হলে কোন 'গায়র মুক্বাল্লিদ' (মাযহাবের ইমামগণের অনুসরণকে মূলতঃ অস্বীকারকারী ভ্রান্ত সম্প্রদায়) এ আপত্তি করার সুযোগ পাবে না যে, 'মুক্বাল্লিদের কোন অধিকার নেই দলীলাদি থেকে সরাসরি মাস্আলা অনুমান করে বের করার। কাজেই নামায-রোযার আলোচনা করার সময় ক্বোরআন-হাদীসের আয়াত ও উদ্ধৃতি বর্ণনা করার অধিকারও কোন মুক্বাল্লিদের নেই।' এর জবাবে এখন একথা বলা যাবে যে-

ক. নামায-রোযার মাসাইলতো 'তাক্বলীদী' নয়। সুতরাং সরাসরি ক্বোরআন-হাদীসের উদ্ধৃতি পেশ করতে অসুবিধা নেই।

খ. একথাও বুঝা গেলো যে, বিধি-বিধান ব্যতীত 'খবর' ইত্যাদিতেও 'তাক্বলীদ' হবে না। যেমন- এযিদের কুফরীর মাস্আলা ইত্যাদি।

গ. মূলনীতিমালা থেকে অনুমানযোগ্য মাস্আলাগুলোর মধ্যে ফক্বীহ্গণ ক্বোরআন

হাদীস থেকে যেই দলীলাদি পেশ করে থাকেন, তাও শুধু গ্রহণযোগ্য মাস্আলাগুলোর সমর্থনের জন্য মাত্র। কারণ ওই সমস্ত মাস্আলাতো ইমাম সাহেবের অভিমত দ্বারা প্রমাণিত হয়ে থাকে। সুতরাং 'মুক্বাল্লিদ' দলীলের অনুসন্ধান করবে না। এর এ অর্থ নয় যে, মুক্বাল্লিদ মাত্রই কোন দলীল দেখতে কিংবা উদ্ধৃতি দিতে পারবে না; বরং এর অর্থ হচ্ছে এ যে, 'মুক্বাল্লিদ' সরাসরি দলীলাদি থেকে মাস্আলা বের করবে না।

চার

কার উপর 'তাক্বলীদ' করা ওয়াজিব এবং কার উপর ওয়াজিব নয়

শরীয়তের বিধি-বিধান বর্তায় এমন মুসলমান দু'প্রকারঃ

১. মুজ্তাহিদ ও ২. গায়র মুজ্তাহিদ (মুজ্তাহিদ নয় এমন)। 'মুজতাহিদ' বলে ওই ব্যক্তিকে, যাঁর মধ্যে এমন জ্ঞানগত যোগ্যতা থাকে যে, তিনি ক্বোরআনের ইঙ্গিত ও সুক্ষ্ম বিষয়াদি বুঝতে পারেন, তিনি আল্লাহর কালামের মাহাত্ম্য ও উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে পারেন, তা থেকে মাস্আলাসমূহ (সমাধান) বের করতে পারেন, নাসিখ ও মানসুখ সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান রাখেন, ইলমে সরফ, নাহ্ভ ও বালাগাত ইত্যাদিতে পূর্ণ দক্ষতা রাখেন এবং বিধি-বিধানের আয়াত ও হাদীসগুলোর উপর তাঁর পূর্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। তাছাড়া, তাঁর মধ্যে বুদ্ধিমত্তা ও সঠিক বুঝশক্তি থাকাও আবশ্যক।

[তাফসীরাত-ই আহমদিয়্যাহ্]

পক্ষান্তরে, যারা উপরোক্ত মর্যাদায় পৌঁছতে পারেনি, তারা হলো 'গায়র মুজ্তাহিদ' (মুজতাহিদ নয় এমন) বা 'মুক্বাল্লিদ'। 'গায়র মুজ্তাহিদ'-এর উপর 'তাক্বলীদ' করা ওয়াজিব বা জরুরী। আর মুজতাহিদদের জন্য 'তাক্বলীদ' নিষিদ্ধ।

মুজতাহিদদের বিভিন্ন স্তর

মুজ্তাহিদদের ছয়টা স্তর-

১. মুজ্তাহিদ ফিশ্শর'ই- (مجتهد فى الشرع)

২. মুজ্তাহিদ ফিল্ মাযহাব- (مجتهد فى المذهب)

৩. মুজ্তাহিদ ফিল্ মাসাইল- (مجتهد فى المسائل)

৪. আস্হাবুত্তাখরীজ- (اصحاب التخريج)

৫. আস্হাবুত্তারজীহ্ - (اصحاب الترجيح)

৬. আস্হাবুত্তামীয- (اصحاب التمييز)

[মুক্বাদ্দমা-ই শামী ঃ তাবক্বাতুল ফোক্বাহা অধ্যায়]

সংজ্ঞা

মুজ্‌তাহিদ ফিশ্‌শর’ই হচ্ছেন

ওইসব হযরত, যাঁরা ইজতিহাদ করার মূলনীতিমালা প্রণয়ন করেন। যেমন-মাযহাবের চার ইমাম- ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম শাফে’ঈ, ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহুম আজমা’ঈন)।

মুজ্‌তাহিদ ফিল মাযহাব

ওইসব হযরত, যাঁরা উপরোক্ত মূলনীতিমালা (اصـــول)-এর অনুসরণ করেন এবং ওইসব মূলনীতি থেকে শরীয়তের বিধান ও এর শাখা-প্রশাখা নিজেরাই অনুমান করে বের করতে পারেন। যেমন-ইমাম আবূ ইয়ূসুফ, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম আবদুল্লাহ্ ইবনে মুবারক রাহিমাহুমুল্লাহু তা‘আলা আজমা’ঈন প্রমুখ। তাঁরা ‘ক্বাওয়াইদ’ (মূলনীতিমালা)-এর মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু-এর ‘তাক্বলীদকারী’ (মুক্বাল্লিদ) ও মাস্‌আলা-মাসাইলের মধ্যে নিজেরা ‘মুজ্‌তাহিদ’।

মুজতাহিদ ফিল মাসাইল

ওইসব হযরত, যাঁরা মূলনীতিমালা (اصـــول) ও সেগুলো থেকে অনুমিত মাসাইল (مســـائل فرعية) উভয়ের মধ্যেই ‘মুক্বাল্লিদ’। কিন্তু ওইসব মাস্‌আলা, যেগুলো সম্পর্কে ইমামগণের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না, সেগুলোকে ক্বোরআন ও হাদীস ইত্যাদি দলীল থেকে বের করতে পারেন। যেমন- ইমাম তাহাভী, ক্বাযীখান ও শামসুল আইম্মাহ্ সারাখ্‌সী প্রমুখ।

আস্‌হাব-ই তাখরীজ

ওইসব হযরত, যাঁরা ইজ্‌তিহাদ তো মোটেই করতে পারেন না, তবে ইমামগণের মধ্যে কারো সংক্ষিপ্ত অভিমতকে সুবিন্যস্তরূপে ব্যাখ্যা করতে পারেন। যেমন-ইমাম করখী প্রমুখ।

আস্‌হাব-ই তারজীহ্

ওইসব হযরত, যাঁরা ইমাম সাহেবের কতিপয় অভিমত থেকে কোন একটাকে প্রাধান্য দিতে পারেন। অর্থাৎ যদি কোন মাসআলায় হযরত ইমাম আবূ হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু-এর দু’টি অভিমত বর্ণিত হয়ে থাকে, তবে ওই দু’টি থেকে কোন একটাকে প্রাধান্য দিতে পারেন। অনুরূপ, যেখানে ‘ইমাম সাহেব’ ও ‘সাহিবাঈন’ (ইমাম আ’যম এবং ইমাম আবূ ইয়ূসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ) -এর অভিমতের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, সেখানে কোন একটি অভিমতকে প্রধান্য দিতে পারেন, هٰذا اولٰى (এটা উত্তম), هٰذا اصحّ (এটা বিশুদ্ধতর) বলে রায় দিতে সক্ষম ইত্যাদি। যেমন ‘কুদূরী’ ও ‘হিদায়া’-এর প্রণেতাদ্বয়।

আস্‌হাবে তামীয

ওইসব হযরত, যাঁরা মাযহাবের সুস্পষ্ট ও প্রসিদ্ধ রায় এবং অপ্রসিদ্ধ অভিমতসমূহ, অনুরূপ, দুর্বল, শক্তিশালী ও অধিকতর শক্তিশালী অভিমতগুলোর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারেন। অর্থাৎ তাঁরা প্রত্যাহারকৃত অভিমতগুলো ও দুর্বল বর্ণনাদিকে বাদ দিয়ে বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য অভিমতগুলোকে গ্রহণ করতে পারেন। যেমন- ‘কান্‌য’ ও ‘দুররে মুখ্‌তার’ ইত্যাদির প্রণেতাগণ।

যাদের মধ্যে উপরোক্ত ছয়টি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটাও নেই, তাঁরা হচ্ছেন নিছক মুক্বাল্লিদ। যেমন-আমাদের যমানার ওলামা-সমাজ। তাঁদের কাজ হবে শুধু এটাই যে, কিতাব থেকে মাসআলা বা সমাধান দেখে লোকজনকে বলে দেবেন। সুতরাং সাধারণ মুসলমানগণ তো মুক্বাল্লিদের পর্যায়ভূক্ত হবেনই।

আর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুজ্‌তাহিদের জন্য ‘তাক্বলীদ’ করা হারাম। সুতরাং উক্ত ছয় স্তরের মধ্যে যিনি যেই স্তরের মুজ্‌তাহিদ, তিনি অবশ্য সমস্তরের কারো ‘তাক্বলীদ’ (অনুসরণ) করবেন না, কিন্তু তাঁর ঊর্ধ্বতন স্তরের মুজ্‌তাহিদদের তাক্বলীদ করবেন। যেমন- ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহি আলায়হিমা ‘উসূল’ ও ‘ক্বাওয়াইদ’ (মূলনীতিমালা)’-এর মধ্যে তো ইমাম আ’যমের মুক্বাল্লিদ, কিন্তু মাস্‌আলা-মাসাইলের মধ্যে তাঁরা যেহেতু নিজেরা ‘মুজতাহিদ’, সেহেতু তাঁরা সেগুলোতে ‘মুক্বাল্লিদ’ নন।

এ বিস্তারিত বিবরণ থেকে ভ্রান্ত ‘গায়র মুক্বাল্লিদ সম্প্রদায়’ (যারা মাযহাব মানে না)-এর একটি আপত্তিরও জবাব হয়ে যায়। তা হচ্ছে- তারা বলে বেড়ায়-‘ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ তো হানাফী’ এবং ‘মুক্বাল্লিদ’। কাজেই, তাঁরা কোন কোন স্থানে ইমাম আ’যমের বিরোধিতা করেছেন কেন?’ তাদের জবাবে একথা বলা যাবে যে, ‘উসূল ও ক্বাওয়াইদ’ (মূলনীতিমালা)- এর মধ্যে এ হযরতগণ ‘মুক্বাল্লিদ’। তাতে তাঁরা ইমাম আ’যমের বিরোধিতা করেননি; বরং মূলনীতিগুলো থেকে অনুমিত মাস্‌আলাগুলোতে (فـروعـى مسـائل) কোন কোন জায়গায় ভিন্ন অভিমত প্রকাশ করেছেন মাত্র। কারণ, এগুলোতে তাঁরা নিজেরা ‘মুজ্‌তাহিদ’; মুক্বাল্লিদ নন।

তাছাড়া-এ প্রসঙ্গে ভ্রান্ত ‘গায়র মুক্বাল্লিদ’ সম্প্রদায়ের আরো কতিপয় প্রশ্নের জবাব প্রদত্ত হলো

প্রশ্নঃ বহু মাসআলায় আপনারা ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহি আলায়হিমা’র অভিমতানুসারে ফাত্‌ওয়া দিয়ে থাকেন এবং ইমাম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি-এর অভিমতকে বর্জন করেন। কাজেই, আপনারা হানাফী কিভাবে?

জবাবঃ কোন কোন স্তরের ফক্বীহ হলেন ‘আসহাবে তারজীহ’; যাঁরা কতিপয়

অভিমতের মধ্যে কোন এটকাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। সুতরাং ওইসব ফক্বীহ কর্তৃক প্রাধান্য দেওয়া অভিমত অনুসারেই আমরা ফাত্ওয়া দিয়ে থাকি। সুতরাং তাও তো ইমাম আ'যমের অভিমত হলো।

প্রশ্নঃ তখন নিজেদেরকে হানাফী না বলে 'ইউসুফী', 'মুহাম্মদী' কিংবা 'ইবনে মুবারকী' বলেন না কেন? কারণ অনেক জায়গায় তো আপনারা তাঁদের অভিমতানুসারে কাজ করে থাকেন এবং ইমাম আবূ হানীফার অভিমতকে বর্জন করে থাকেন?

জবাবঃ যেহেতু ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম ইবনে মুবারক রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হিম'র সমস্ত অভিমতই ইমাম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র 'উসূল ও ক্বাওয়াইদ'-এর উপর ভিত্তি করে প্রদত্ত, সেহেতু তাঁদের যে কোন অভিমতকেই গ্রহণ করা, প্রকৃতপক্ষে, ইমাম-ই আ'যমের অভিমতকে গ্রহণ করার সামিল। যেমন, হাদীসের উপর আমল করা প্রকৃতপক্ষে ক্বোরআনের উপর আমল করারই নামান্তর। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলাই তদনুযায়ী আমল করার নির্দেশ দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, ইমাম আ'যম রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, 'কোন হাদীস সহীহ্ প্রমাণিত হয়ে গেলে, সেটাই হবে আমার মাযহাব।' কাজেই, এখন যদি ইমাম আবূ ইয়ূসুফ রাহমাতুল্লাহি আলায়হির মতো কোন 'মুজতাহিদ ফিল্ মাযহাব' কোন সহীহ্ হাদীস পাওয়ার পর সেটা অনুসারে আমল করেন, তবে তিনি তাতে ইমাম আ'যমের 'তাক্বলীদ' বর্জনকারী হলেন না, বরং হানাফীই রইলেন। কারণ, তিনি তো ওই হাদীসের উপর আমল ওই মূলনীতির উপরই করলেন, যা ইমাম আ'যমই প্রণয়ন করেছেন। (ফাত্ওয়া শামীর ভূমিকায়ও একথা উল্লেখ করা হয়েছে। **مطلب : صح عن الامام اذا صح الحديث فهو مذهبى** শীর্ষক অধ্যায়)।

তাছাড়া, ইমাম আ'যমের উপরোক্ত বক্তব্যের অর্থ এটাও হতে পারে যে, 'যখন কোন হাদীস বিশুদ্ধই পাওয়া গেছে তখনই সেটা আমার মাযহাবে পরিণত হয়েছে; এর পূর্বে নয়। অর্থাৎ প্রতিটি মাসআলা ও প্রতিটি হাদীসে আমি অত্যন্ত যাচাই-বাছাই ও অনুসন্ধান করেছি। যেটা বিশুদ্ধ পাওয়া গেছে, সেটাই আমি বেছে নিয়েছি।'

মোটকথা, ইমাম আবূ ইয়ূসুফ প্রমুখের অভিমত বাস্তবিক পক্ষে ইমাম আ'যমেরই অভিমত হলো। কাজেই, এমতাবস্থায় 'হানাফী' হবার দাবীই যুক্তিযুক্ত।

বলাবাহুল্য, উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা হৃদয়ঙ্গম করা গেলে অনেক ধরনের প্রশ্নের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেওয়া যাবে, ইন্শা-আল্লাহ্। প্রসঙ্গত: 'মাযহাব ও তাক্বলীদের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকারকারীদের' একটা বিভ্রান্তিকর দাবী কখনো কখনো শুনা যায়। তা হচ্ছে-তারা বলে, ''আমাদের মধ্যে ইজতিহাদ' করার সামর্থ্য আছে। কাজেই, আমরা কারো তাক্বলীদ করতে যাবো কেন?'' ওই ভ্রান্তের জবাবে

দীর্ঘ কথোপকথনের প্রয়োজন নেই। ইজতিহাদের জন্য যতটুকু জ্ঞান ও যোগ্যতার দরকার ততটুকু জ্ঞান তার মধ্যে আছে কিনা তা যাচাই করলেই যথেষ্ট হবে।

হযরত ইমাম রাযী, ইমাম গাযালী, ইমাম তিরমিযী, ইমাম আবূ দাঊদ, হুযূর গাউসে পাক, হযরত বায়েযীদ বোস্তামী, শাহ্ বাহাউল হক নক্বশ্বন্দ প্রমুখ- ইসলামের মধ্যে এমন এমন উচ্চ পর্যায়ের ওলামা ও মাশাইখ গত হয়েছেন, যাঁদেরকে নিয়ে মুসলিম সমাজ যতই গর্ব করুক না কেন, তা অপ্রতুলই, কিন্তু তাঁদের মধ্যে কেউ 'মুজতাহিদ' হলেন না; বরং তাঁরা কোন না কোন ইমামের 'মুক্বাল্লিদই' রইলেন। কেউ ইমাম শাফে'ঈর মুক্বাল্লিদ, কেউ ইমাম আ'যমের মুক্বাল্লিদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম আজমা'ঈন। বর্তমান যুগে এমন কে আছে, যে তাঁদের মধ্যে কারো সম মর্যাদার হতে পারে? যখন ওই সমস্ত বুর্যুগের জ্ঞান 'মুজতাহিদ' হওয়ার জন্য যথেষ্ট হলো না, তখন যেসব লোক এখনো হাদীসের কিতাবগুলোর নাম পর্যন্ত ভাল করে জানে না, তারা এক্ষেত্রে কোন্ পর্যায়ে গণ্য হবে- তাতো বলার অপেক্ষা রাখে না।

মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি লিখেছেন- তাঁর সামনে একজন লোক ইজতিহাদ করার দাবী করেছিলো। তখন হযরত মুফতী সাহেব ক্বেবলা শুধু এতটুকু বললেন, ''আপনি সূরা তাকাসুর থেকে কি পরিমাণ মাস্আলা বের করতে পারেন? তাতে হাক্বীক্বত ও মাজায, সরীহ ও কিনায়া, যাহির ও নাস্ কতটি আছে? জবাবে লোকটা যা বলেছিলো তাতে এতটুকু বুঝা গেলো যে, সে উক্ত বিষয়গুলোর নাকি কখনো নামও শুনেনি!

পাঁচ

'তাক্বলীদ' ওয়াজিব বা অপরিহার্য হবার প্রমাণাদি

এ প্রসঙ্গে দু'টি বিষয় রয়েছে: 'সাধারণ অর্থে তাক্বলীদ' এবং 'বিশেষ ইমামের তাক্বলীদ'।

সাধারণ অর্থে তাক্বলীদ ওয়াজিব বা অপরিহার্য হবার বহু প্রমাণ রয়েছে। এখানে কয়েকটি অকাট্য প্রমাণ উল্লেখ করা হচ্ছে-

এক. পবিত্র ক্বোরআন মজীদ থেকে-

اِهۡدِنَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِيۡمَ ۙ صِرَاطَ الَّذِيۡنَ اَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ ۙ (سورہ فاتحہ)

তরজমাঃ ''আমাদেরকে সোজা পথে পরিচালিত করো, তাঁদেরই পথে, যাঁদের উপর তুমি অনুগ্রহ করেছো।'' [সূরা ফাতিহা]

এ থেকে বুঝা গেলো যে, 'সেরাতুল মুস্তাক্বীম' (সরল-সোজা পথ) হচ্ছে সেটাই, যার উপর আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাগণ চলেছেন। বলাবহুল্য, মুফাস্সিরীন-ই কেরাম, মুহাদ্দেসীন, ফোক্বাহা, আল্লাহর ওলীগণ, গাউস, ক্বুত্ব্ এবং আবদাল হলেন

আল্লাহর নেক বান্দা। তাঁরা প্রায় মুক্বাল্লিদই ছিলেন। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, 'তাক্বলীদ'ই হলো সোজা-সরল পথ। কোন মুহাদ্দিস, মুফাস্‌সির ও ওলী 'গায়র মুক্বাল্লিদ' ছিলেন না। এখানে 'গায়র মুক্বাল্লিদ' বলে তাকেই বুঝানো হয়েছে, যে 'মুজাহিদ'ও নয়, তাক্বলীদও করেনা। অবশ্য যিনি 'মুজতাহিদ' হয়ে তাক্বলীদ করেন না, তিনি 'গায়র মুক্বাল্লিদ' নন। কারণ, তাঁর জন্য তাক্বলীদ করাতো এমনিতেই জায়েয নয়।

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا

তরজমাঃ "আল্লাহ কোন আত্মার উপর বোঝা অর্পণ করেন না, কিন্তু তার সাধ্য পরিমাণ"। [২:২৮৬]

এ থেকে বুঝা গেলো যে, কারো সামর্থ্যের বাইরে কাউকে আল্লাহ তা'আলা কোন কাজের নির্দেশ দেন না। কাজেই, যে ব্যক্তি 'ইজতিহাদ' করতে পারে না এবং ক্বোরআন থেকে মাসআলা বের করতে পারে না, তার দ্বারা 'তাক্বলীদ' না করিয়ে 'ইজতিহাদ' করানো তাকে সামর্থ্যের বাইরে কর্ম সম্পাদনের নির্দেশ দেওয়ারই সামিল। যেহেতু, গরীব মানুষের উপর উপর যাকাত ও হজ্‌ ফরয নয়, সেহেতু জ্ঞানহীন ও যোগ্যতাহীন ব্যক্তির উপর 'ইজতিহাদ' করা জরুরী হবে কেন? তাক্বলীদই তার জন্য জরুরী।

اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ اُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ

তরজমাঃ "আনুগত্য করো আল্লাহর, আনুগত্য করো রসূলের এবং তোমাদের নির্দেশদাতাদের।" [৪:৫৯]

এ আয়াতে তিনটি সত্তার আনুগত্য করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে- ১.আল্লাহর (ক্বোরআন), ২. রসূল আলাহিস্‌ সালামের সুন্নাহ্ এবং ৩. নির্দেশদাতাদের (ফিক্বহ্ ও ইস্‌তিম্বাতের যোগ্যতাসম্পন্ন আলিমগণ)।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, এখানে اَطِيْعُوْا (আনুগত্য করো) ক্রিয়া পদটা দু'জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহর জন্য একবার এবং রসূল আলায়হিস্‌ সালাম ও নির্দেশদাতাদের জন্য একবার। কারণ, আল্লাহর নির্দেশেরই শুধু আনুগত্য করা যায়। তাঁর কর্মের অনুসরণ করা সম্ভব নয়। যেমন- আল্লাহ তা'আলা কাফিরদেরকেও জীবিকা দেন, কখনো কখনো তাদেরকে প্রকাশ্য বিজয় দেন- তাৎক্ষণিক শাস্তি দেন না। অথচ কাফিরদেরকে সাহায্য করা আমাদের জন্য বৈধ নয়। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং মুজতাহিদ ইমামের প্রতিটি বাণী, প্রতিটি কর্ম ও তাঁদের কারো কোন কাজ দেখে নীরবতা পালন করলে এ তিনটিরই আনুগত্য ও অনুসরণ করা যায়। এ পার্থক্যের কারণে

মাত্র দু'স্থানেই اَطِيْعُوْا (আনুগত্য করো) এরশাদ করা হয়েছে।

فَاسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

তরজমাঃ "কাজেই হে লোকেরা! ইল্‌মসম্পন্নদেরকে জিজ্ঞাসা করো যদি তোমাদের 'ইল্‌ম' না থাকে।" [২১:৭]

এ আয়াত থেকে বুঝা গেলো যে, যার নিকট মাস্‌আলার জ্ঞান নেই সে যেন তা ইল্‌মসম্পন্ন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করে। ওই ইজতিহাদী মাস্‌আলা, যার সমাধান ক্বোরআন-হাদীস থেকে বের করে নেওয়ার ক্ষমতা আমাদের নেই, তা যেন মুজতাহিদদের জিজ্ঞাসা করে নেওয়া হয়।

يَوْمَ نَدْعُوْ كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ

তরজমাঃ "যেদিন আমি প্রত্যেক মানব দলকে তার ইমামের সাথে ডাকবো"-এর ব্যাখ্যায় তাফসীর-ই রুহুল বয়ানে উল্লেখ করা হয়েছে-

اَوْ مُقَدَّمٍ فِى الدِّيْنِ فَيُقَالُ يَا حَنَفِىُّ يَا شَافِعِىُّ

তরজমাঃ "অথবা ইমাম হচ্ছেন দ্বীনি পেশোয়া। সুতরাং ক্বিয়ামত বলা হবে- "হে হানাফী, হে ইমাম শাফে'ঈ'র অনুসারী!"

এ থেকে বুঝা যায় যে, ক্বিয়ামত-দিবসে প্রত্যেক মানুষকে তার ইমামের সাথে ডাকা হবে। এভাবে বলা হবে- "হে হানাফীরা!" "হে শাফেঈরা!" "হে মালেকীরা!" চলো!

সুতরাং যে ব্যক্তি ইমামই গ্রহণ করে নি, তাকে কার সাথে ডাকা হবে? এ সম্পর্কে সুফীগণ বলেন- 'যার কোন ইমাম নেই, তার ইমাম হচ্ছে -শয়তান।"

দুই. মুফাস্‌সির ও মুহাদ্দিসগণের বাণী থেকে-

তাফ্‌সীর-ই খাযিনঃ আয়াত فَاسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ-এর ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে- فَاسْئَلُوْا الْمُؤْمِنِيْنَ الْعَالِمِيْنَ مِنْ اَهْلِ الْقُرْاٰنِ অর্থাৎ "তোমরা এমন ওলামার নিকট জিজ্ঞাসা করো, যাঁরা ঈমানদার এবং ক্বোরআনের জ্ঞান রাখেন।"

দারেমী শরীফঃ বাবুল ইক্বতিদা বিল্‌ ওলামা (আলিমদের অনুসরণ-শীর্ষক অধ্যায়)- তে বর্ণিত হয়েছে-

اَخْبَرَنَا يَعْلٰى قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ قَالُوْا اُولُوا الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ

অর্থাৎ আমাদেরকে ইয়া'লা খবর দিয়েছেন, আমাদেরকে আবদুল মালেক বলেছেন,

তিনি হযরত 'আত্বা থেকে বর্ণনা করেছেন, ''আনুগত্য করো আল্লাহর, আনুগত্য করো রসূলের এবং নিজেদের মধ্য থেকে নির্দেশদাতাদের।'' হযরত আত্বা বলেছেন (এ আয়াতে) اُولُوا الْاَمْرِ (নির্দেশদাতা) হলেন সম্মানিত জ্ঞানী ও ফিক্বহবিদ ব্যক্তিবর্গ।

তাফসীর-ই দুর্‌রে মান্‌সূরে আয়াত فَاسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ -এর তাফসীরে উল্লেখ করা হয়েছে-

اَخْرَجَ اِبْنُ مَرْدَوِيَه عَنْ اَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ الرَّجُلَ يُصَلِّىْ وَيَصُوْمُ وَيَحُجُّ وَيَغْزُوْ وَاِنَّهٗ مُنَافِقٌ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِمَاذَا دَخَلَ عَلَيْهِ النِّفَاقُ قَالَ لِطَعْنِهٖ عَلٰى اِمَامِهٖ وَاِمَامُهٗ مَنْ قَالَ قَالَ اللّٰهُ فِىْ كِتَابِهٖ فَاسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ـ

অর্থাৎ ইবনে মারদাওয়াইহ্ হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি- তিনি এরশাদ ফরমাচ্ছিলেন- ''কিছু লোক নামাযও পড়ে, রোযাও রাখে, হজ্জ এবং জিহাদও করে, অথচ তারা মুনাফিক্ব।'' সাহাবা কেরাম আরয করলেন, ''হে আল্লাহর রাসূল! কি কারণে তাদের মধ্যে মুনাফেক্বী আসলো?'' এরশাদ ফরমালেন, ''আপন ইমামের বিরুদ্ধে সমালোচনা করার কারণে।'' ইমাম কে? এরশাদ ফরমালেন- মহান রব এরশাদ ফরমায়েছেন- ''তোমরা ইল্‌ম সম্পন্নদের জিজ্ঞাসা করো যদি তোমাদের ইল্‌ম না থাকে।''

তাফসীর-ই সাভীতে وَاذْكُرْ رَّبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ -এর তাফসীরে উল্লেখ করা হয়েছে-

وَلَا يَجُوْزُ تَقْلِيْدُ مَا عَدَا الْمَذَاهِبِ الْاَرْبَعَةِ وَلَوْ وَافَقَ قَوْلَ الصَّحَابَةِ وَالْحَدِيْثَ الصَّحِيْحَ وَالْاٰيَةَ ـ وَالْخَارِجُ عَنِ الْمَذَاهِبِ الْاَرْبَعَةِ ضَالٌّ مُّضِلٌّ وَرُبَّمَا اَدَّاهُ ذٰلِكَ اِلَى الْكُفْرِ لِاَنَّ الْاَخْذَ بِظَوَاهِرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنْ اُصُوْلِ الْكُفْرِ ـ

অর্থাৎ 'চার মাযহাব ব্যতীত অন্য কারো তাক্বলীদ করা বৈধ নয়, যদিও তা হয় সাহাবা কেরামের অভিমত, সহীহ হাদীস ও আয়াতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যে ব্যক্তি এ চার মযহাব বহির্ভূত হয় সে নিজেও পথভ্রষ্ট, অপরকেও পথভ্রষ্টকারী। কারণ, ক্বোরআন ও হাদীসের নিছক যাহেরী অর্থ লওয়া কুফরের মূল।''

তিন. হাদীস শরীফ থেকে

মুসলিম শরীফ ঃ ১ম খণ্ড ঃ ৫৪ পৃষ্ঠা ঃ اِنَّ الدِّيْنَ النَّصِيْحَةُ শীর্ষক অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে-

عَنْ تَمِيْمِ الدَّارِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِلّٰهِ وَلِكِتَابِه وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِاَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ ـ

অর্থাৎ ঃ হযরত তামীম-ই দারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- দ্বীন হচ্ছে হিতকামনা। আমরা আরয করলাম, ''কার?'' এরশাদ করলেন, ''আল্লাহর, তাঁর কিতাবের, তাঁর রসূলের, মুসলমানদের ইমামগণের এবং মুসলিম সাধারণের।''

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম নাওয়াভী লিখেছেন-

وَقَدْ يَتَنَا وَلُ ذٰلِكَ عَلَى الْاَئِمَّةِ الَّذِيْنَ هُمْ عُلَمَآءُ الدِّيْنِ وَاِنَّ مِنْ نَصِيْحَتِهِمْ قُبُوْلَ مَا رَوَوْهُ وَتَقْلِيْدَهُمْ فِىْ الْاَحْكَامِ وَاِحْسَانَ الظَّنِّ بِهِمْ ـ

অর্থাৎ এ হাদীস ওই সব ইমামকেও অন্তর্ভুক্ত করে নেয়, যাঁরা ওলামা-ই দ্বীন। আর ওলামার হিতকামনা হচ্ছে- তাঁদের বর্ণিত হাদীসসমূহ কবূল করা, তাঁদের প্রদত্ত সমাধানগুলোর 'তাক্বলীদ' (অনুসরণ) করা এবং তাঁদের প্রতি ভাল ধারণা রাখা।

'তাক্বলীদ-ই শাখ্‌সী'

[ইমাম-বিশেষের তাক্বলীদ করা]

উপরোল্লিখিত আলোচনা থেকে 'তাক্বলীদ'-এর বৈধতা, বরং ক্বোরআন-সুন্নাহ তথা ইসলাম সম্মত হওয়া প্রমাণিত হলো। এখন দেখুন এক ইমামেরই তাক্বলীদ করা ও এক মযহাবেরই অনুসারী হওয়ার পক্ষে প্রমাণাদি-

এক. 'মিশকাত শরীফ কিতাবুল ইমারত'-এ মুসলিম শরীফের বরাত দিয়ে বর্ণিত হয়, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

مَنْ اَتَاكُمْ وَاَمْرُكُمْ جَمِيْعٌ عَلٰى رَجُلٍ يُرِيْدُ اَن يَشُقَّ عَصَاكُمْ وَيُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوْهُ

অর্থাৎ- ''যে ব্যক্তি তোমাদের নিকট আসবে, এমতাবস্থায় যে, তোমরা এক ব্যক্তির অনুসরণের উপর একমত হয়েছো,' আর সে চায় তোমাদের (ঐক্যের) লাঠি ভেঙ্গে দিতে এবং তোমাদের দলে ফাটল ধরাতে, তবে তাকে কতল করে দাও।''

এতে ইমাম ও ওলামা-ই দ্বীনের কথাই বুঝানো হয়েছে। আর তা একজন ইমাম ও তাঁর মাযহাবের অনুসরণ ও আনুগত্যের প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিতবহ। বস্তুতঃ এটাই জরুরী।

দুই. মিশ্‌কাত শরীফ ঃ কিতাবুল বুয়ূ'ঃ বাবুল ফরাইয-এ বোখারী শরীফের বর্ণনার

বরাতে উল্লেখ করা হয়েছে- হযরত আবূ মূসা আশ'আরী হযরত ইবনে মাস্'উদ সম্পর্কে বলেন-"যতদিন পর্যন্ত এই আল্লামা তোমাদের মধ্যে থাকবেন, ততদিন পর্যন্ত আমার নিকট মাস্আলা-মাসাইল জিজ্ঞাসা করো না।"

এ থেকে বুঝা গেলো যে, শ্রেষ্ঠতর জ্ঞানী থাকাবস্থায় তাঁর থেকে নিম্নতর ব্যক্তির আনুগত্য করা যাবে না। বস্তুতঃ প্রত্যেক মুক্বাল্লিদের দৃষ্টিতে আপন ইমামই শ্রেষ্ঠতর হয়ে থাকেন।

তিন. 'ফতহুল ক্বদীর'-এ উল্লেখ করা হয়েছে-

مَنْ تَوَلّٰى اَمْرَ الْمُسْلِمِيْنَ شَيْئًا فَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً وَيَعْلَمُ اَنَّ فِيْهِمْ مَنْ هُوَ اَوْلٰى بِذٰلِكَ وَاَعْلَمُ مِنْهُ بِكِتَابِ اللّٰهِ وَسُنَّةِ رَسُوْلِهٖ فَقَدْ خَانَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَجَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ-

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি মুসলমানদের শাসন- ক্ষমতার অধিকারী হয়, অতঃপর তাদের উপর কাউকে শাসক নিয়োগ করে, অথচ সে জানে যে, মুসলমানদের মধ্যে তার চেয়েও অধিক উপযোগী এবং ক্বোরআন ও হাদীসের জ্ঞানী রয়েছে, তবে সে আল্লাহ্ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং সাধারণ মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।"

চার. 'মিশকাত শরীফ' কিতাবুল ইমারতঃ প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে-

مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِىْ عُنُقِهٖ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছে এমতাবস্থায় যে, তার গলায় কারো 'বায়'আত' নেই সে জাহেলী যুগের মৃত্যুই বরণ করেছে। এতে কোন ইমামের তাক্বলীদ এবং আল্লাহর কোন ওলীর হাতে বায়'আত গ্রহণের কথা সবই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

পাঁচ. উপরোক্ত কতিপয় আয়াত ও হাদীসই মাত্র এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হলো। এখন মুসলিম উম্মাহ্র আমল দেখুন! তব্'ই তাবে'ঈনের যমানা থেকে এ পর্যন্ত আল্লাহ্র দয়াপ্রাপ্ত সমস্ত উম্মতই 'তাক্বলীদ' করে আসছেন।

কাজেই, যাঁরা 'ইজতিহাদ'-এর যোগ্যতাসম্পন্ন নয়, তাঁরা যেন অবশ্যই কোন একজন 'মুজতাহিদ' (মাযহাবের ইমাম)-এর 'তাক্বলীদ' করেন। কারণ, তাক্বলীদ করার পক্ষে উম্মতের ইজমা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটাও শরীয়তের একটা দলীল। এ দলীল অনুযায়ী আমল করার অপরিহার্যতা ক্বোরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। যেমন- ক্বোরআনে পাকে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ ফরমায়েছেন-

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا

অর্থাৎ "যে বক্তি রসূলের বিরোধিতা করে এরপর যে, সত্য পথ তার সম্মুখে সুস্পষ্ট হয়েছে এবং মুসলমানদের পথ থেকে পৃথক পথে চলে, আমি তাকে তার অবস্থার

উপর ছেড়ে দেবো এবং তাকে দোযখে প্রবিষ্ট করবো। আর সেটা কতই মন্দ স্থান প্রত্যাবর্তনের!" এ থেকে বুঝা গেলো যে, যে পথ সাধারণ মুসলমানদেরই হয় সেটাকেই গ্রহণ করা ফরয। 'তাক্বলীদ' হচ্ছে- মুসলমানদেরই সর্বসম্মত অনুসৃত পথ (ইজমা')।

মিশকাত শরীফ ঃ বাবুল-ই'তিসাম বিল্ কিতাবি ওয়াস্ সুন্নাহ'র মধ্যে বর্ণিত হয়েছে- হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

اِتَّبِعُوا السَّوَادَ الْاَعْظَمَ فَاِنَّهٗ مَنْ شَذَّ شُذَّ فِى النَّارِ

অর্থাৎ "বৃহত্তম দলের অনুসরণ করো। কেননা, যে ব্যক্তি মুসলমানদের জমা'আত (দল) থেকে পৃথক রয়েছে, তাকে আলাদা করে জাহান্নামেই পাঠানো হবে।"

অন্য হাদীসে এরশাদ হয়েছে-

مَارَاٰهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنٌ

অর্থাৎ "যাকে মুসলমানগণ ভাল জানে, তা আল্লাহর নিকটও ভাল।"

এখন ভেবে দেখা দরকার যে, বর্তমানেও, এর পূর্বেও সাধারণ মুসলমানগণ 'তাক্বলীদ-ই শাখসী' (যে কোন একজন ইমামের তাক্বলীদ)-কেই ভাল জেনে আসছেন এবং 'মুক্বাল্লিদ' হয়ে আসছেন। আজ পর্যন্ত মুসলিম সমাজ- আরব ও আজমে কোন না কোন ইমামেরই তাক্বলীদ (**تقليد شخصى**) করে আসছেন। সুতরাং যে 'গায়র মুক্বাল্লিদ' (মাযহাব অমান্যকারী) হয়েছে, সে ইজমা'কেই অস্বীকার করেছে। 'ইজমা'-এর বৈধতা ও গুরুত্বকে অস্বীকার করলে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব ও হযরত ওমর ফারূক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার খিলাফতের বৈধতা কিভাবে প্রমাণ করবেন? তাওতো 'ইজমা-ই উম্মত' দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। আর যে ব্যক্তি এ দু' খলীফার মধ্যে কারো খিলাফতের বৈধতাকে অস্বীকার করবে সে নিঃসন্দেহে কাফির। [ফতাওয়া-ই শামী ইত্যাদি]

তাফসীর

তাফসীর-ই খাযিনে আয়াত وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ -এর ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু আনসারের উদ্দেশ্যে বলেন, "ক্বোরআন শরীফে মুহাজিরদেরকে 'সাদেক্বীন' (সত্যবাদী) বলা হয়েছে। যেমন এরশাদ হয়েছে - اُولٰئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ (তারাই হচ্ছে সত্যবাদী।) অতঃপর এরশাদ ফরমায়েছেন- وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ (এবং তোমরা সত্যবাদীদের সাথে থাকো।) সুতরাং তোমরাও আলাদা খেলাফত প্রতিষ্ঠা করো না, আমাদেরই সাথে থাকো।"

অনুরূপ, আমরাও 'গায়র মুক্বাল্লিদ' (ভ্রান্ত সম্প্রদায় বিশেষ)-এর উদ্দেশে বলছি- "সত্যবাদীগণ তাক্বলীদ করেছেন। কোন না কোন মাযহাবের ইমামের অনুসরণ করেছেন। তোমরাও তাঁদের সাথে থাকো! মুক্বাল্লিদই থাকো।"

যুক্তিভিত্তিক প্রমাণাদি

ক্বোরআন, হাদীস ও ইজমা'র ভিত্তিতে তাক্বলীদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য কতটুকু তাতো দেখলেন। এখন দেখুন যুক্তিতর্ক ভিত্তিক প্রমাণাদি-

দুনিয়ার মানুষ মাত্রই কোন কাজ কারো অনুসরণেই সম্পন্ন করে থাকে। প্রত্যেক পেশা ও জ্ঞানের মৌলিক নিয়মাবলী সবটিতে তো এর দক্ষ ও বিজ্ঞদের অনুসরণেই করতে হয়। দ্বীনি বিষয়াদিতো দুনিয়াবী বিষয়াদি অপেক্ষা বহুগুণ কঠিন ও জটিল। সুতরাং তাতেও এর দক্ষ ও বিজ্ঞ ব্যক্তিদের অনুসরণ করতে হবে। ইলমে হাদীসেও 'তাক্বলীদ' আছে। যেমন- অমুক হাদীস এজন্যই দুর্বল যে, ইমাম বোখারী কিংবা অমুক হাদীস বিশারদ অমুক বর্ণনাকারীকে 'দুর্বল' বলেছেন। তাঁর কথা মানাইতো তাক্বলীদ হলো। পবিত্র ক্বোরআনের ক্বিরআত বিশারদ (ক্বারী)দের তাক্বলীদ করা হয়, পবিত্র ক্বোরআনের যের-যবর-পেশ ইত্যাদি এবং আয়াতের সংখ্যা নির্ণয় ইত্যাদিতেও 'তাক্বলীদ' করা হয়। নামাযে যখন জমা'আত হয়, তখন ইমামকেই অনুসরণ করা হয়। ইসলামী হুকুমতে সমস্ত মুসলমানের জন্য একই শাসকের তাক্বলীদ (অনুসরণ) করার বিধান রয়েছে। রেলে ভ্রমণ করার সময় সমস্ত বগি একই ইঞ্জিনের 'তাক্বলীদ' করে। মোটকথা, মানুষ প্রতিটি কাজে 'তাক্বলীদ'ই করে থাকে। বস্তুতঃ প্রতিটি বিষয়ে ইন্সান 'মুক্বাল্লিদ'ই। এখানে আরো একটা বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, এসব সূরতেই 'তাক্বলীদ-ই শাখ্সী বা বিশেষ এক জনেরই অনুসরণ করা হয়। নামাযের ইমাম একসাথে দু'জন হন না। ইসলামী হুকুমতে শাসক একজনই হন। কাজেই, শরীয়তের ক্ষেত্রেও এক জনের 'ইমাম' একজনই হবেন। দুই বা ততোধিক নির্ধারণ করা যাবে না।

মিশ্‌কাত শরীফ ঃ কিতাবুল জিহাদের বা-বু আ-দা-বিস্ সফর-এ বর্ণিত হয়েছে- হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

اِذَا كَانَ ثَلٰثَةٌ فِىْ سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا اَحَدَهُمْ۔

অর্থাৎ "যখন তিনজন লোক সফরে থাকে তখন একজনকে যেন নিজেদের 'আমীর' (প্রধান) নিযুক্ত করে নেয়।"

অতএব, একথা মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় সুস্পষ্ট হলো যে, ইসলামে 'তাক্বলীদ'-এর গুরুত্ব অপরিসীম। 'তাক্বলীদ' তথা 'তাক্বলীদ-ই- শাখ্সী (মুক্বাল্লিদের জন্য) ইসলামী অনুশাসন পালনের একমাত্র সহায়ক পন্থা। পক্ষান্তরে যারা 'তাক্বলীদকে অস্বীকার করে তারা ভ্রান্তির অতল গহ্বরে পতিত। আল্লাহ পাক ইসলামের এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে অনুধাবন করে তদনুযায়ী আমল করার তাওফীক দিন! আ-মী-ন!।

---<>---

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা

রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর

সংক্ষিপ্ত জীবনী

আজ বিশ্বের দুই তৃতীয়াংশেরও বেশী মুসলমান হানাফী মাযহাবের অনুসারী। আমরাও হানাফী সুন্নী মুসলমান। আলহামদুলিল্লাহ্। সুতরাং আমাদের ইমাম সম্পর্কেও জানা উচিত। তখন আমাদের হৃদয়-মন আনন্দিত হবে একথা জেনে যে, আল্লাহ্ ও রসূল-ই পাক আমাদেরকে এমন মহান ইমামের অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

ভূমিকাঃ দিশেহারা মানুষকে যাঁরা ইসলামের চতুর্দলীল তথা আল্লাহ্ পাকের খলীফা-ই আ'যম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র আদর্শালোকে এবং নিজের অসাধারণ যোগ্যতা, ব্যক্তিচরিত্র ও আদর্শ দ্বারা সঠিক পথের দিশা দিয়ে বিশ্বে চিরস্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন তাঁদের মধ্যে ইমাম-ই আ'যম আবূ হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হলেন শীর্ষস্থানীয়। সায়্যিদুনা ইমাম-ই আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হলেন শরীয়তের এমন উজ্জ্বল প্রদীপ এবং দ্বীনের এমন আলোকদীপ্ত মশাল, যাঁর মত জ্ঞানদীপ্তদের শরণাপন্ন হয়ে সমস্যার সমাধান খোঁজার জন্য খোদ মহান আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন- "ফাস্আলূ--- আহ্লায্ যিক্‌রি ইন্ কুন্তুম্ লা-তা'লামূ-ন্।" (...যদি তোমাদের জানা না থাকে তাহলে ইল্মসম্পন্নদেরকে জিজ্ঞেস কর)। আমাদের মহানতম ইমাম হলেন এমন ব্যক্তিত্ব, যাঁর সম্পর্কে তাঁর জন্মের বহু বছর পূর্বে খোদ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণীর মাধ্যমে সুসংবাদ দিয়েছেন- "লাও কা-নাল 'ইলমু 'ইনদাস সুরাইয়া লাতানা-ওয়ালাহূ রাজুলুম্ মিন আবনা-ই ফা-রিস।" (যদি জ্ঞান সুরাইয়া নক্ষত্রের সমপরিমাণ উচ্চতায়ও ওঠে যায়, তবু (তা সংগ্রহ করে নিয়ে আসার জন্য) পারস্যের এক যুবক পুরুষ সেটা পর্যন্তও পৌঁছে যাবে)। ইমাম-ই আ'যম আবূ হানীফা হলেন এমন এক অনন্য প্রতীভা, যাঁর গুণাবলী ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিবর্গ নির্দ্বিধায় প্রশংসাপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। আমীরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনুল মুবারক মন্তব্য করেছেন- "যদি আল্লাহ্ তা'আলা ইমাম-ই আ'যম আবূ হানীফা ও সুফিয়ান সওরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা'র মাধ্যমে আমাকে সাহায্য না করতেন, তবে আমি (এত উঁচু মর্যাদাবান হতাম না, বরং) একজন সাধারণ মানুষই হতাম।" -[তাহযীবুত্ তাহযীব : ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৫০]

মাযহাবের ইমাম হযরত শাফে'ঈ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেছেন, "সমস্ত লোক ফিক্বহ'র মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা'র মুখাপেক্ষী। যে ব্যক্তি ইমাম আবূ হানীফার

কিতাবগুলো পাঠ-পর্যালোচনা করেনি তার জ্ঞান-গভীরতা অর্জিত হয়নি। সে ফক্বীহ্ও হয়নি।"
-[আল্-খায়রা-তুল হিসান : ৫ ও ২৫ পৃষ্ঠা]

ইমাম আ'মাশ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেছেন, "হে ফক্বীহ্'র দল! আপনারা হলেন চিকিৎসক, আমরা মুহাদ্দিসগণ হলাম 'আত্তার (আতর সরবরাহকারী)। আর তিনি (ইমাম-ই আ'যম) উভয়টিই অর্জন করে নিয়েছেন।
-[আল্-খায়রা-তুল হিসান : ৬১ পৃষ্ঠা]

ইমাম বোখারীর শীর্ষস্থানীয় শায়খ (ওস্তাদ) হযরত মক্কী ইবনে ইব্রাহীম রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেছেন, "ইমাম আবূ হানীফা আপন যুগের সর্বাপেক্ষা বড় আলিম ছিলেন।"
[প্রাগুক্ত : ৩১ পৃষ্ঠা]

এবং হাফিযে হাদীস আল্লামা ইমাম মুহাম্মদ ইবনে মায়মূন বলেছেন, "ইমাম আবূ হানীফা'র যুগে তাঁর চেয়ে বড় না কোন আলিম ছিলেন, না ছিলেন কোন পরহেযগার, না দুনিয়ার কোন মোহত্যাগী, না কোন আরিফ, না কোন ফিক্বহ্শাস্ত্রবিদ।"
-[আল্-খায়রা-তুল হিসান : ৩২ পৃষ্ঠা]

জন্ম : হযরত আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি আবূ নু'আয়মের প্রসিদ্ধ কিতাব 'হুলিয়া'র বরাতে লিখেছেন, হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, "যদি ইলম সুরাইয়া নক্ষত্রের সমপরিমাণ উচ্চতায়ও পৌঁছে যায়, তবে পারস্যের যুবকদের অন্যতম এক যুবক সেখানেও পৌঁছে যাবে (অর্থাৎ ওই জ্ঞান সেখান থেকে আহরণ করে নিয়ে আসবে)। ইমাম সুয়ূতী বলেছেন যে, এ হাদীস শরীফে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যেই মহান ব্যক্তির দিকে ইঙ্গিত করেছেন তিনি হলেন, ইমাম-ই আ'যম হযরত আবূ হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। এ হাদীস বহুসূত্রে বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপ, সায়্যিদুনা হযরত 'আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেছেন, "আমি তোমাদেরকে কূফা নগরীর এমন এক ব্যক্তির কথা বলছি, যার উপনাম হবে 'আবূ হানীফা', তাঁর হৃদয় হবে ইল্‌ম ও হিকমতের সমুদ্র, তাঁর কারণে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র উম্মত ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে যাবে। কিন্তু কিছু লোক তাঁর প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করবে।"
[মাক্বামাতে ইমাম-ই আ'যম; কৃত ইমাম হাফিয উদ্দীন কারদারী, ফাতাওয়া-ই বায্‌যাযিয়া'র প্রণেতা]

'মাদীনাতুল্ ইল্‌ম্' (জ্ঞাননগরী) হুযূর আকরম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং ওই জ্ঞাননগরীর 'প্রধান ফটক' হযরত আলী কাররামাল্লাহু তা'আলা ওয়াজ্‌হাহূ'র ওই ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তব রূপ ধারণ করল মাত্র সাত দশকাধিক কাল পর। হিজরি ৮০ সনে মুসলিম উম্মাহ্‌কে আলোকিত করে ওই 'সিরাজুল উম্মাহ্' (উম্মতের প্রদীপ) কুফা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন।
-[মক্বামাতে ইমাম-ই আ'যম]

বংশীয় শাজরা : খতীব-ই বাগদাদী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, ইমাম-ই আ'যমের বংশীয় ধারা হচ্ছে- আবূ হানীফা নু'মান ইবনে সাবিত ইবনে নু'মান ইবনে মারযুবান। ইমাম-ই আ'যম'র পৌত্র হযরত ইসমাঈল ইবনে হাম্মাদ ইবনে আবূ হানীফা এ শাজরা বর্ণনা করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, "আমরা মূলতঃ পারস্যের অধিবাসী। আমরা সব সময় আযাদ হিসেবে চলে আসছি। আমাদের খান্দানে দাসত্বের কোন কালিমা নেই।" কেউ কেউ তাঁর জন্মের সময় তাঁর পিতা খ্রিস্টান ছিলেন বলে যে অপবাদ রচনা করেছে তার খণ্ডন করে ইমাম-ই আ'যমের সাহেবযাদা হযরত হাম্মাদ ইবনে আবূ হানীফা বলেছেন, "তাঁর পিতা সাবিত দ্বীন ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করেছেন।"
[তারীখ-ই বাগদাদঃ ১৩শ খণ্ডঃ ৩২৫ পৃষ্ঠা, তাহযীবুত্ তাহযীব : ১০ম খণ্ড : ২৪৯ পৃষ্ঠা, যায়লুল জাওয়াহিরিল মুদ্বিয়্যাহ্ : ২য় খণ্ডঃ ৪৫২ পৃষ্ঠা, তায্‌কিরাতুল্ মুহাদ্দিসীন : ৪৬ পৃষ্ঠা]

উল্লেখ্য, আমাদের এ মহান ইমামের উপনাম হচ্ছে 'আবূ হানীফা'; শাব্দিক অর্থে 'হানীফার পিতা'। বস্তুত 'হানীফা' নামের কোন সন্তান ইমাম-ই আ'যমের ছিল না। তবুও তার এ নামের মাহাত্ম্য কি? বাস্তবিকপক্ষে, 'আবূ' মানে মালিক ও ধারক'। আর 'হানীফাহ্' মানে সব বাতিল ধর্ম থেকে বিমুখ হয়ে সত্য দ্বীন (ইসলাম)কেই অবলম্বন করা।' সুতরাং 'আবূ হানীফা'র মানে দাঁড়ায়- 'সব ধরনের বাতিল ধর্ম থেকে বিমুখ হয়ে সত্য দ্বীনেরই ধারক। -[তাযকিরাতুল মুহাদ্দিসীন : ৪৭ পৃষ্ঠা]

তাছাড়া, তাঁর 'নু'মান' নামেরও অতি হৃদয়গ্রাহী তাৎপর্য রয়েছে, যা আল্লামা ইবনে হাজার হায়তামী মক্কী রহমাতুল্লাহি আলায়হি উদ্‌ঘাটন করেছেন। তিনি বলেন, "আভিধানিক অর্থে 'নু'মান' হচ্ছে ওই রক্ত যার উপর ভিত্তি করে দেহের পূর্ণ কাঠামো স্থির থাকে; ওই রক্তের মাধ্যমেই দেহের মেশিনারীগুলো কাজ করে। সুতরাং ইমাম-ই আ'যমের 'নু'মান' নামের তাৎপর্য হচ্ছে তাঁর মহান সত্তাও ইসলামী সংবিধানের চালিকাশক্তি এবং ইবাদতসমূহ, লেনদেন ও কাজকারবারসহ সমস্ত বিধানের জন্য 'রূহ' বা 'আত্মা'স্বরূপ।" তিনি আরো বলেন, "নু'মান শব্দের আরেক অর্থ 'লাল রঙের সুরভিত ঘাস।' যেহেতু তাঁর ইজতিহাদ (গভীর-সূক্ষ্ম গবেষণা) ও মাসআলা'র অনুমান দ্বারাও ইসলামী 'ফিক্বহ' শাস্ত্র গোটা দুনিয়ায় আপন সুবাস ছড়িয়েছে।
-[তাযকিরাতুল মুহাদ্দিসীন : ৪৮ পৃষ্ঠা]

ইমাম আবূ হানীফা'র জ্ঞান ঈমানের প্রাণ সায়্যিদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সান্নিধ্যে পৌঁছিয়ে দেয়। 'আরিফ-ই কামিল দাতা গঞ্জেবখ্‌শ্ সাইয়্যেদ 'আলী হাজভীরী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর 'কাশফুল মাহজূব' কিতাবে এক ঘটনার অবতারণা করেছেন, হযরত ইয়াহ্‌য়া মু'আয রাযী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখলাম, আমি আরয করলাম, "হুযূর আমি আপনাকে তালাশ

করে কোথায় পাব? হুযূর এরশাদ করলেন, আবূ হানীফার ইল্‌মের নিকট।"

-[কাশফুল মাহজূব : ২১৬ পৃষ্ঠা]

শিক্ষা জীবন : ইমাম আবূ হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু প্রাথমিক ও প্রয়োজনীয় দ্বীনী শিক্ষা অর্জন করার পর ব্যবসার দিকে মনোনিবেশ করলেন। একদিন তিনি ব্যবসার কাজে বাজারে যাচ্ছিলেন। রাস্তায় ইমাম শা'বীর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়ে যায়। তিনি তাঁর চেহারায় অসাধারণ মেধা ও সৌভাগ্যের চিহ্ন দেখতে পান। তিনি তাঁকে ডাকলেন আর বললেন, "কোথায় যাচ্ছ?" ইমাম বললেন, "আমি বাজারে যাচ্ছি।" তিনি বললেন, "আলিমদের মজলিসে বস?" ইমাম বললেন, "না।" তিনি বললেন, "তুমি আলিমদের মজলিসে বস। কারণ, আমি তোমার চেহারায় জ্ঞান ও গুণের চিহ্নাদির ঔজ্জ্বলতা দেখতে পাচ্ছি।"

-[মানা-ক্বিব-ই ইমাম-ই আ'যম : ১ম খণ্ড : ৫৯ পৃষ্ঠা]

এরপর ইমাম-ই আ'যমের মনে শিক্ষার্জনের আগ্রহ সৃষ্টি হল। সুতরাং তিনি প্রথমে 'ইলমে কালাম' শিখতে আরম্ভ করলেন। এতে দক্ষতা অর্জন করে গোমরাহ ফির্কাগুলো- যেমন জাহমিয়া ও ক্বদরিয়া ফির্কার লোকদের সাথে তর্ক-মুনাযারা আরম্ভ করে দিলেন। এভাবে কিছুদিন এসব বাতিল ফির্কার বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকেন এবং তাদের ভ্রান্তিগুলোকে লোকসমক্ষে আরো স্পষ্ট করে দিলেন। তারপর শরীয়ত ও ফিক্বহ্'র মাসআলা-মাসা-ইলের গবেষণায় মগ্ন হলেন। ইলমে ফিক্বহ্'র দিকে গভীরভাবে মনযোগ দেওয়ার কয়েকটা কারণ নিম্নরূপ:

প্রথমত: একদিন এক মহিলা ইমাম-ই আ'যমকে একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করলেন- "যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে সুন্নাত অনুসারে তালাক্ব দিতে চায়, তবে সে কিভাবে দেবে?" তিনি বললেন, "হযরত হাম্মাদকে এ মাসআলা জিজ্ঞেস করুন এবং তাঁর প্রদত্ত জবাব আমাকে এসে বলবেন।" অতঃপর হযরত হাম্মাদ ওই মহিলা'র প্রশ্নের জবাবে বললেন- "লোকটি তার স্ত্রীকে দু'ঋতুস্রাবের মধ্যবর্তী এমন পবিত্র অবস্থার মেয়াদকালে এক তালাক্ব দেবে, যা'তে সে ওই স্ত্রীর সাথে সহবাস করেনি। অতঃপর তাকে এভাবে রেখে দেবে। তারপর একইভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পবিত্রতার মেয়াদকালে পরপর আরো দু'তালাক্ব দেবে। অতএব যখন ওই স্ত্রী তৃতীয় ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র হয়ে যাবে ও গোসল করে নেবে, তখন সে অন্যত্র বিয়ে করার জন্য মুক্ত হয়ে যাবে।" এ জবাব ইমাম-ই আ'যমের খুব পছন্দ হল এবং হযরত হাম্মাদের শিক্ষার মজলিস অবলম্বন করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

-[মানা-ক্বিব-ই ইমাম-ই আ'যম : ১ম খণ্ড : ৫৫ পৃষ্ঠা]

এখানে উল্লেখ্য যে, ইমাম-ই আ'যম বলেছেন, তিনটি মহিলা আমার জীবনযাত্রার ধরন পাল্টে দিয়েছে- একজন ধোঁকা দিয়েছে, দ্বিতীয় মহিলা ফিক্বহ্ শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ

করেছে এবং তৃতীয় মহিলা সারারাত জাগরণ করে ইবাদতে উৎসাহিত করেছে।

প্রথম মহিলা একদিন রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে চোখের ইশারায় কি যেন বলল সে। আমি তাকে বোবা মনে করে তার সাহায্যে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু সে আমাকে রাস্তার দিকে ইঙ্গিত করে বুঝাতে চাইল যে, তার কোন জিনিস পড়ে গেছে। আমি যেন তাকে তা তুলে এনে দিই। আমি তা তুলে এনে তাকে দিতে চাইলে সে বলল, এটা আপনি রাখুন! এটার মালিক এসে আপনার নিকট থেকে নিয়ে যাবে। বস্তুতঃ সেটা ছিল 'লুক্বতাহ্' (কুঁড়িয়ে পাওয়া বস্তু)।

দ্বিতীয় মহিলাটি আলোচ্য মাসআলা আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমি হযরত হাম্মাদকে জিজ্ঞেস করার কথা বলেছিলাম। এতে আমি মনে মনে লজ্জিত হয়ে ফিক্বহ্ শিখতে উদ্বুদ্ধ হলাম।

তৃতীয় মহিলাটি আমার দিকে ইঙ্গিত করে সঙ্গীনীদেরকে বলছিল, "ইনি হলেন এমন ইবাদত পরায়ণ ব্যক্তি, যিনি সারারাত আল্লাহ্'র ইবাদত করেন।" অথচ আমি তখনো রাতের একটা অংশ ঘুমাতাম। তখন থেকে আমি ভাবলাম আমাকে সারারাত জাগতে হবে, যাতে মুসলমানদের ধারণা সঠিক প্রমাণিত হয়।

-[মাক্বা-মাত-ই ইমামে আ'যম (উর্দু): পৃষ্ঠা-৭৩৯]

দ্বিতীয়ত : ইমাম-ই আ'যম এক রাতে স্বপ্নে দেখলেন, তিনি হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র রওযা মুবারক খনন করছেন। স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারী হিসেবে প্রসিদ্ধ যুগশ্রেষ্ঠ আলিম ও ইমাম আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে সীরীনকে এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করা হল। তিনি এ স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বলেছেন, "আপনি হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র হাদীস ও সুনান থেকে এমন মাসআলা বের করবেন এবং এমন এমন সমস্যার সমাধান করবেন, যা তাঁর পূর্বে কেউ কখনো করেন্ নি।" এ স্বপ্ন ও এর ব্যাখ্যাকে তিনি একটি অদৃশ্য ইঙ্গিত বলে সাব্যস্ত করলেন। এরপর থেকে তিনি ইলমে ফিক্বহ অর্জন করতে আরম্ভ করে দিলেন। -[মানা-ক্বিব-ই ইমাম-ই আ'যম : ১ম খণ্ড : ৫৭ পৃষ্ঠা]

হযরত হাম্মাদের দরসে তিনি বিশেষ স্থান পেয়ে যান এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে ওস্তাদের চোখের মণি হয়ে যান। কিছুদিনের মধ্যে তিনি ওস্তাদের মর্যাদায় উন্নীত হন। ইত্যবসরে তিনি আলাদা দরসের মজলিস কায়েম করার মনস্থ করলেন। কিন্তু হযরত হাম্মাদ কিছুদিনের জন্য কোথাও গিয়েছিলেন এবং ইমাম-ই আ'যমকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে যান। তাঁর অনুপস্থিতিতে ইমাম-ই আ'যম ৬০টা ফাতওয়া জারী করেন। পরবর্তীতে হযরত হাম্মাদের নিকট ফাতওয়াগুলো পেশ করা হলে ৪০টি ফাতওয়ার সাথে তিনি ঐকমত্য পোষণ করলেন আর বাকি ২০টি মাসআলায় মুজতাহিদসূলভ বিরোধিতা করলেন। তখন ইমাম-ই আ'যম শপথ

করে নিলেন, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি হযরত হাম্মাদের দরসের মজলিস ছাড়বেন না। তিনি তা পূর্ণও করেছিলেন।-[মানা-ক্বিব-ই ইমাম-ই আ'যম : ১ম খণ্ড ৫৬ পৃষ্ঠা]

ইমাম আ'যমের শিক্ষকমণ্ডলী : ফিক্বহের সাথে সাথে ইমাম-ই আ'যম ইলমে হাদীসের শিক্ষাও গ্রহণ করেন। সাহাবা-ই কেরাম ও উল্লেখযোগ্য তাবে'ঈদের মধ্য হতে যাঁরা তদানীনন্তনকালে হাদীস শাস্ত্রের 'ইমাম' ও 'হুজ্জাত' বলে বিবেচ্য তিনি তাঁদের ছাত্রত্ব অবলম্বন করলেন। সদরুল আইম্মাহ্ ইমাম মুয়াফ্ফাক্ব উদ্দীন আহমদ মক্কী আবূ আবদুল্লাহ্ ইবনে হাফ্সের বরাতে ইমাম-ই আ'যমের ৪০০০ (চার হাজার) শিক্ষকের কথা উল্লেখ করেন। -[প্রাগুক্ত : ৩৮ পৃষ্ঠা]

তাঁদের সবার নাম উল্লেখ করা তো সম্ভব নয়। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজন হলেন- **সাহাবা-ই কেরামদের মধ্যে:** হযরত আনাস এবং হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আবী আওফা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হাদীস বিশারদগণের মধ্যে: হযরত আত্বা ইবনে রাবাহ্, আসেম ইবনে আবিন্নুজূদ, আলক্বামাহ্ ইবনে মারসাদ, হাম্মাদ ইবনে আবী সুলায়মান, হাকাম ইবনে ওতবাহ্ প্রমুখ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইমাম-ই আ'যমের ছাত্রদের সংখ্যাও গণনার বাইরে। ইমাম আবূ ইয়ূসুফ, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম যোফর, ইমাম হাম্মাদ ইবনে নু'মান, ইমাম ইব্রাহীম ইবনে তাহসীন, আবূ ইয়াহ্ইয়া হাম্মানী, আবূ নু'আঈম ও আবূ আবূ আসিন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তারাও বিশ্ববরেণ্য ফিক্বহবিদ ইমাম। [তাহ্যীযুত্ তাহযীবঃ ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪৯]

আদর্শ চরিত্র : ইমাম-ই আ'যম শুধু জ্ঞানে অদ্বিতীয় ছিলেন না, তিনি সুন্দর চরিত্রের দিক দিয়েও অনন্য ছিলেন। তাঁর নির্ভুল চিন্তাধারা ও জ্ঞানের প্রশস্ততা যেভাবে ক্বিয়ামত পর্যন্ত মানুষের জন্য একটি কর্মসূচি সরবরাহ করেছে, অনুরূপ তাঁর উন্নত এবং আদর্শ চরিত্রও মানুষের কর্মপদ্ধতিকে মহত্ত্বের উপাদান দান করেছে। তাঁর আদর্শ চরিত্রের বিবরণ দিতে গিয়ে বড় বড় গ্রন্থ ও ইতিহাস রচিত হয়েছে। এ ক্ষুদ্র পরিসরে একটি মাত্র ঘটনার অবতারণা করার প্রয়াস পাচ্ছি-

ইমাম যা'ফরানী লিখছেন, একদা বাদশাহ্ হারূনুর রশীদ ইমাম আবূ ইয়ূসুফকে বললেন, "ইমাম আবূ হানীফার কিছু গুণ বর্ণনা করুন।" তিনি বললেন, "ইমাম-ই আ'যম হারাম কার্যাদি থেকে কঠোরভাবে বিরত থাকতেন। জ্ঞানবিহীন দ্বীনী বিষয়ে কোন কথা বলতে খুবই ভয় করতেন। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতে চূড়ান্ত পর্যায়ের চেষ্টা করতেন। দুনিয়াবাসীদের সামনে কখনো তাদের প্রশংসা করতেন না। বেশির ভাগ সময় নিশ্চুপ থাকতেন। দ্বীনী মাসাইলের সমাধান নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করতেন। এত বড় জ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত সাদাসিধে ও বিনয়ী ছিলেন। যখন তাঁকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করা হত, তখন তিনি কিতাব ও সুন্নাহ'র দিকে প্রত্যাবর্তন করতেন। যদি সেটার উদাহরণ ক্বোরআন ও হাদীসে না

পেতেন, তাহলে ক্বিয়াস (অনুমান) করতেন। কারো নিকট থেকে কিছু পাওয়ার অভিলাষ তাঁর ছিল না। কারো সম্পর্কে আলোচনা করলে তার সদগুণাবলী নিয়েই আলোচনা করতেন।" এসব শুনে বাদশাহ্ হারূনুর রশীদ বললেন, "নেককার বুযুর্গদের চরিত্র এমনি হয়ে থাকে।" অতঃপর তিনি কেরানীকে বললেন "এ গুণগুলো লিখে নাও," আর পুত্রকে বললেন, "এসব গুণাবলী মুখস্থ করে নাও।"

-[মানা-ক্বিব-ই কারদারী : ১ম খণ্ড : ২২৬ পৃষ্ঠা]

ইবাদত ও সাধনা : ইমাম আবূ হানীফা দীর্ঘ ৪০ বছর যাবৎ এশার নামাযের ওযূ দিয়ে ফজরের নামায সম্পন্ন করেছেন। উল্লেখ্য, এ ধরনের ঘটনা কারো বিবেক-বুদ্ধির নিকট অসম্ভব বলে মনে হলেও আল্লাহ্'র প্রিয় বান্দাদের জন্য এসব সাধনা সম্ভব। এখানে কারো নিজের ক্ষুদ্র বিবেক ও ত্রুটিপূর্ণ চরিত্র ও আমলের নীরিখে আল্লাহ্'র ওলীগণের বিষয়কে অনুমান করাই হবে তার গোমরাহীর অনিবার্য কারণ। দেখুন- আজ কেউ কি এ কথা অস্বীকার করতে পারবে যে, ইমাম বোখারীর কয়েক লক্ষ হাদীস মুখস্থ ছিল। ইমাম শামসুদ্দীন সারাখসী তাঁর বিরাটাকার ত্রিশ খণ্ড সম্বলিত কিতাব 'মাবসূত্ব' কোন কিতাব দেখা ছাড়াই মুখে বলে লিখিয়েছিলেন? কিন্তু মৌং শিবলী তার 'তারীখে ইমাম-ই আযম'র এ ইবাদতের কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন -এ কথা বলে যে, এটা নাকি বিবেক ও যুক্তিতে ধরে না। হায়রে! বদ-আক্বীদার বিবেক!

ইমাম আবূ ইয়ূসুফ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেছেন, ইমাম-ই আ'যম সারারাত জেগে ইবাদত করার বাহ্যিক কারণ এ ছিল যে, একদা এক ব্যক্তি তাঁকে দেখে বলল, "ইনি ওই ব্যক্তি, যিনি সারারাত ইবাদতের মধ্যে অতিবাহিত করেন।" ইমাম আবূ হানীফা এ কথা শুনে বলতে লাগলেন, "আমাকে মানুষের ধারণানুসারে গঠন করতে হবে।" এরপর থেকে তিনি সারারাত জেগে ইবাদত করতে লাগলেন। দীর্ঘ চল্লিশ বছর যাবৎ তাঁর এ নিয়ম অব্যাহত ছিল।

[আল্-খায়রা-তুল হিসান : ৮২ পৃষ্ঠা]

ফাদ্বল্ ইবনে ওয়াকীল বলেন, আমি তাবে'ঈদের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা'র মত কাউকে এত বেশি বিনয়ের সাথে নামায পড়তে দেখিনি। দো'আ করার সময় আল্লাহ্'র ভয়ে তাঁর চেহারা হল্দে যেত। অধিক ইবাদতের কারণে তাঁর দেহ একেবারে হালকা-পাতলা হয়ে গিয়েছিল। একদা রাতে ক্বিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থার বিবরণ সম্বলিত আয়াত নামাযে তিলায়াত করে তাঁর মধ্যে এমন ভীতির সঞ্চার হয়েছিল যে, তিনি অনেকটা বিভোর অবস্থায় ওই আয়াতটা বারংবার পড়তে লাগলেন- শেষ পর্যন্ত এভাবে মু'আয্যিন ফজরের আযান দিয়ে দিল। আয়াতটি ছিল- "বালিস সা-'আতু মাও'ইদুহুম ওয়াস্ সা-'আতু আদহা- ওয়া আমাররু।"

-[প্রাগুক্ত : পৃষ্ঠা ৮৩]

তাক্বওয়া ও পরহেযগারী : তাক্বওয়া ও খোদাভীরুতার সারকথা হচ্ছে- এমন প্রতিটি বস্তু পরিহার করা, যার কারণে দ্বীনে কোন প্রকার সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ইমাম আ'যমের মর্যাদা বহু উঁচু ছিল। যে জিনিসের মধ্যে সামান্যটুকুও অপছন্দের আশঙ্কা দেখা দিত ওই জিনিস, থেকে তিনি সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকতেন। দুনিয়ার মোহ ত্যাগের অবস্থা এ ছিল যে, মাল ও দৌলতের দিকে তিনি ভ্রূক্ষেপও করতেন না। বড় অঙ্কের অর্থও যদি তাঁর সামনে পেশ করা হত তখন তিনি তাঁর অমুখাপেক্ষিতার কথাই প্রকাশ করার মাধ্যমে তা প্রত্যাখ্যান করতেন। হযরত হাসান ইবনে যিয়াদ বলেছেন, ইমাম আ'যম কখনো কোন বেতন-ভাতা কিংবা কারো কোন হাদিয়া-উপঢৌকন গ্রহণ করেননি। এ ছিল তাঁর দুনিয়ার প্রতি মোহত্যাগ। তাঁর তাক্বওয়া বা খোদাভীরুতার আন্দাজ এ থেকে করুন যে, একদা তিনি আপন শরীকদারের নিকট ব্যবসার জন্য কাপড়ের কতগুলো থান পাঠিয়েছিলেন। একটি থানের মধ্যে কিছুটা ত্রুটি ছিল। তিনি আপন শরীকদারকে বলে পাঠালেন যেন ওই থান বিক্রি করার সময় সেটার ত্রুটিও উল্লেখ করে। শরীকদার ওই থানটিও বিক্রি করে ফেলল, কিন্তু গ্রাহককে সেটার ত্রুটির কথা বলে দিতে ভুলে গিয়েছিল। পরবর্তীতে এ কথাও স্মরণ ছিল না যে, সেটা কার নিকট বিক্রি করেছিল। ইমাম-ই আ'যম যখন এ কথা জানতে পারলেন, তখন তিনি ত্রিশ হাজার দিরহাম মূল্যের ওই থানগুলোর সম্পূর্ণ টাকা সাদক্বাহ্ করে দিয়েছিলেন।

ইমাম-ই আ'যমের বৈশিষ্ট্য : ইমাম আ'যমের মধ্যে সরাসরি খোদাপ্রদত্ত ও তাঁর উপার্জিত বহু ধরনের উন্নত বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ঘটেছিল। জ্ঞানের দিকে দেখলে দেখা যায় তিনি এক অকুল সমুদ্র, তাক্বাওয়া-পরহেযগারীর দিকে দেখলে দেখা যায়, তিনিই তাঁর বিরল উদাহরণ, দূরদর্শিতা ও বুদ্ধিমত্তায় তিনি হলেন অদ্বিতীয়, মাসআলা-মাসাইল বুঝা ও অনুমানের দিকে দেখলে দেখা যায় ইমাম আ'মাশ এবং ইমাম সুফিয়ান সওরীও তাঁর নিকট মাসাইলের সমাধান চেয়েছেন। ইমাম আ'যমের বৈশিষ্ট্যাবলী অগণিত। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ:

- ইমাম আ'যম সর্বসম্মতভাবে উত্তম তিন যুগের প্রথম যুগে পয়দা হন । (৮০ হিজরি)
- হযরত আনাস এবং হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আবী আওফাসহ বেশ কয়েকজন সাহাবীর জীবদ্দশায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ৮জন সাহাবীর সাথে তাঁর সরাসরি সাক্ষাৎ ঘটে। সুতরাং তিনি শীর্ষস্থানীয় তাবে'ঈ ছিলেন।
- তিনি হযরত আনাস, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আবী আওফা ও হযরত আয়েশা বিনতে আজরাদ প্রমুখ সাহাবী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম থেকে হাদীস বর্ণনা করে ধন্য হন।

- তাঁর ওস্তাদ ও শাগরিদদের সংখ্যা অন্য সমস্ত ইমামের ওস্তাদ ও শাগরিদদের তুলনায় বেশি।
- তিনিই সর্বপ্রথম ফিক্বহ শাস্ত্র প্রবর্তন করেন এবং অধ্যায় ও পর্বের দিক দিয়ে প্রথম বিন্যাসকারী তিনিই। সুতরাং ইমাম মালিক মুআত্তার বিন্যাসকার্যে তাঁকেই অনুসরণ করেছেন।
- তাঁর ইজতিহাদের নিয়মাবলী সমস্ত ইমাম ও মুজতাহিদকে উপকৃত করেছে। সুতরাং ইমাম শাফে'ঈ বলেছেন 'আল্ ফুক্বাহা-'উ কুল্লুহুম 'আয়া-লু আবী হানীফাতা ফিল ফিক্বহি' (ফক্বীহ্গণ সবাই ফিক্বহ্শাস্ত্রে ইমাম আবূ হানীফার মুখাপেক্ষী)।
- ইমাম আ'যমের মাযহাব ও চিন্তাধারা এমন সব দেশে পৌঁছেছে যেখানে অন্য কোন মাযহাব পৌঁছেনি বললেও অত্যুক্তি হবে না। যেমন- ভারত, পাকিস্তান, রোম (গ্রীস), তুর্কিস্তান ও ক্যাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী দেশগুলো ইত্যাদি।
- মোল্লা আলী ক্বারীর গবেষণা অনুসারে, বর্তমানে দুনিয়ার দু'তৃতীয়াংশ মুসলমান হানাফী মাযহাব অনুসরণ করে। অবশিষ্ট এক তৃতীয়াংশ অন্যান্য ইমামদের অনুসারী।
- তিনি কখনো কারো হাদিয়া-উপঢৌকন গ্রহণ করেননি। স্বীয় উপার্জন থেকে নিজেও আহার করতেন, অন্যান্য আলিম এবং ফক্বীরদেরও প্রদান করতেন।
- দুনিয়ার মোহত্যাগ, খোদাভীরুতা, ইবাদতপরায়ণতা ও আধ্যাত্মিক সাধনায় তাঁর পূর্ণ প্রচেষ্টার যে প্রমাণ পাওয়া যায় ইতিহাসে অন্য কোন ইমামের তেমন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

এভাবে ইমাম-ই আ'যমের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী লিখতে গেলে বিরাট পরিসরের প্রয়োজন। তাঁর এসব অগণিত ও অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে তিনি গোটা দুনিয়ার ইমাম-ই আ'যম (বৃহত্তম ইমাম) নামে পরিচিত। তাঁর মাযহাবই বিশ্বে সর্বোত্তম বলে বিবেচিত, বিশ্বের দু'তৃতীয়াংশ মুসলমান তাঁর মাযহাবের অনুসারী। ফিক্বহ ও ইজতিহাদ জগতে তিনিই প্রধান পথপ্রদর্শক। তাঁর উদ্ভাবিত উসূল-ই ফিক্বহ্ এবং তাঁর লিখিত কিতাবাদি শুধু তাঁর যুগে নয়, ক্বিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের সমস্যাদির সমাধানের পথে উজ্জ্বল মশালের কাজ দিয়ে যাচ্ছে।

লেখনী: তাঁর কিতাবাদির মধ্যে ১. কিতাবুল আলিম ওয়াল মুতা'আল্লিম, ২. কিতাবুল ফিক্বহিল আকবার, ৩. কিতাবুল ওয়াসায়া, ৪. কিতাবুল মাক্বসূদ, ৫. কিতাবুল আওসাত্ব ইত্যাদি আজও 'মাশহূর' ও 'মুতাওয়াতির' পর্যায়ের সমাদৃত। (অর্থাৎ মুসলিম সমাজে প্রতিটি যুগে অসাধারণভাবে গ্রহণীয় ও অনুকরণীয়) ইমাম-ই আ'যম আপন শাগরিদদেরকে হাদীসসমূহ লিখিয়েছেন শ্রুতলিখন

(উরপঃধঃরড়হ)র মাধ্যমে। এর নাম রেখেছেন 'কিতা-বুল আ-সা-র্'। ইমাম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি পাঁচ লক্ষ দ্বীনী মাসাইল একত্রিত করেন। তিনি তাঁর কিতাবগুলোতে এমন এমন গূঢ়-গভীর মাসআলার উপর আলোচনা করেছেন যার কল্পনাও করা যায় না। তিনি কঠিন থেকে কঠিনতম মাসআলাও সহজ করে দিয়েছেন।

ইমাম-ই আ'যম তাঁর সমসাময়িক সব ধরনের বাতিল ফির্কার সাথেও সফল মোকাবেলা করেছেন। ফির্কা-ই জাহমিয়া, রাফেযী-শিয়া, খারেজী, মু'তাযিলা এবং মুলহিদ (নাস্তিক)দের খণ্ডন করেছেন। মুলহিদ-নাস্তিকদের সাথে তো দস্তুর মত মুনাযারাও করেছেন এবং জনসমক্ষে তাদের কাফিরসুলভ মুখোশ উন্মোচন করেছেন।

একদা মুলহিদদের সাথে মুনাযারায় বিশাল মজলিসে এক হৃদয়গ্রাহী যুক্তি পেশ করে তাদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন এবং আল্লাহ্'র অস্তিত্ব প্রমাণ করে অগণিত মুলহিদের ভ্রান্তধারণা ত্যাগ করার পথ সুগম করেছেন। বর্ণিত আছে যে, ইমাম-ই আ'যম ইচ্ছা করে মুনাযারাহ্ (তর্কযুদ্ধ)স্থলে আসতে দেরী করলেন। অগণিত মানুষ সভাস্থলে অপেক্ষমান ছিল। এ সুবাদে নাস্তিকরা ইমাম-ই আ'যমের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করারও সুযোগ নিচ্ছিল। ইমাম-ই আ'যম সভাস্থলে উপস্থিত হলে তারা তাঁর বিলম্বের কারণ জিজ্ঞেস করল।

ইমাম-ই আ'যম হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম'র সুন্নাত পালন করেছিলেন। হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম মুর্তিখানার সব ছোট মুর্তি ভেঙ্গে কুঠারটা বড় মুর্তির কাঁধে রেখে দিয়েছিলেন এবং তজ্জন্য তাঁকে (হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম) জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন, বড় মুর্তিকে জিজ্ঞেস কর, তার কাঁধেই তো কুঠারটা দেখা যাচ্ছে। এতে মুর্তির অসারতা ও অপারগতা তাদের সামনে আরো সুস্পষ্ট হয়েছিল।

অনুরূপ, ইমাম-ই আ'যমও বলেছিলেন- আমার বিলম্বের কারণ এও হতে পারে যে, আমি আসার পথে সামনে একটা নদী পড়ল। তখন সেখানে কোন নৌযান ছিল না। নদী পার হবার ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করছিলাম। ইত্যবসরে নদীর ধারের একটি বড় গাছ গোড়া থেকে কেটে পড়ে গেল। দেখতে দেখতে গাছটি চিরে বহু তক্তা হয়ে গেল। তারপর তক্তাগুলো জোড়া লেগে গেল। তারপর একটি বড় নৌযান হয়ে গেল। আমি তাতে চড়ে বসলাম। তাতে তো কোন চালকও ছিল না। কিন্তু নৌযানটি পানিতে চলতে লাগল, আর আমাকে পার করে দিল। এতসব সম্পন্ন হতে একটু দেরী হয়ে গেল।

ইমামের বিবরণ শুনে মুলহিদ-নাস্তিকরা তাঁর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করার আরেকটা

সুযোগ নিল। তারা সমস্বরে বলে ওঠল- ইমাম আগাগোড়া অসত্যই আওড়িয়ে গেছেন। কারণ, গাছটি যেমন নিজে নিজে কেটে পড়তে ও চিরে যেতে পারে না, নৌকাও তেমনি কারিগর ছাড়া তৈরি হতে পারে না। আর মাঝি ব্যতীতও নদী পার হওয়া যায় না। এটা একেবারে অসম্ভব।

তখন আমাদের বিচক্ষণ অসাধারণ মেধা ও ধীশক্তিসম্পন্ন ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইমাম-ই আ'যম উপস্থিত জনতার উদ্দেশে বললেন, "আপনারা নিজেরাই শুনলেন- এসব মুলহিদ বলেছে যে, কারিগর ছাড়া নৌযান হতে পারে না, মাঝি ছাড়া সমুদ্র পাড়ি দেওয়া যায় না। যদি একটি মাত্র ক্ষুদ্র নৌযান কারিগর ছাড়া তৈরি হতে না পারে, আর মাঝি ছাড়া ওই নৌযানটিও চলতে না পারে, তবে এত বড় বিশ্ব, আসমান, যমীন ও এ দু'য়ের মধ্যবর্তী আঠার হাজার মাখলূক্বাত কীভাবে স্রষ্টা ও রব ছাড়া সৃষ্টি ও পরিচালিত হতে পারে?" ইমাম-ই আ'যমের এ অতি হৃদয়গ্রাহী যুক্তি তাদের পক্ষে খণ্ডন করা সম্ভব হয়নি, বরং অমান্যকারীদের শোচনীয় পরাজয় এবং বিবেকবান ও সৌভাগবানদের হিদায়তের কারণ হয়েছিল।

ওফাত : হুযূর সাইয়্যেদ-ই 'আলামীন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন- "আশাদ্দুন্না-সি বালা-আন আল্ আম্বিয়া-উ সুম্মাল আমসালু ফাল আমসালু।" অর্থাৎ: সর্বাপেক্ষা বেশি কষ্ট নবীগণ আলায়হিমুস্ সালাম'র উপর আপতিত হয়, তারপর যাঁরা তাঁদের নিকটস্থ, অতঃপর ওই নিকটস্থদের যারা নিকটে থাকেন তাঁদের উপর আসে। ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু'র সম্মান ও মর্যাদার কথা কে না জানে? এতদসত্তেও তিনি কারবালার ময়দানে মাযলূম (অত্যাচারিত) অবস্থায় শহীদ হন।

হযরত ইমাম-ই আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র মহত্বের সূর্য দীর্ঘকাল যাবৎ জ্ঞান ও গুণাবলীর আকাশে চমকাতে থাকে, এখনো চমকিত আছে; কিন্তু শেষ বয়সে তদানীনন্তনকালীন আব্বাসী খলীফা আবূ জা'ফর মানসূর তার দরবারে তাঁকে প্রধান বিচারকের পদে নিয়োগ করার জন্য আহ্বান জানালেন। তিনি এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। এ কারণে তাঁর উপর খলীফা মানসূরের পক্ষ থেকে নির্যাতনের স্টীম রোলার নেমে আসে। বাগদাদের জেলখানায় তাঁকে বন্দী করা হল। ঐতিহাসিকদের বর্ণনা মতে, তাঁকে প্রতিদিন কশাঘাতও করা হত। শেষ পর্যন্ত একদিন অর্থাৎ ১৫০ হিজরির রজব কিংবা শা'বান মাসে আল্লাহ্'র দরবারে সাজদাহ্রত অবস্থায় দুনিয়াখ্যাত ইমাম-ই আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ইন্তিকাল করলেন। প্রথমবার ৫০ হাজার মানুষ এ মহান ইমামকে জানাযার নামাযের মাধ্যমে শেষ বিদায় জানান। এরপর তাঁর কবরের পাশে তাঁর জানাযার নামায হতে থাকে। ইমাম মুরাফ্ফাক্ব বলেছেন, খায়যুরানে তাঁকে দাফন করা হয়েছে।

আর দাফনের পরও দীর্ঘ বিশ দিন যাবৎ লোকেরা তাঁর কবরকে সামনে রেখে জানাযার নামায পড়তে থাকে। খলীফা আবূ জা'ফর মানসূরও পরবর্তীতে তাঁর কবরের পাশে নামায পড়েছেন। সব শেষে ইমাম-ই আ'যম'র সাহেবযাদা হযরত হাম্মাদ ইবনে আবূ হানীফা তাঁর জানাযার নামায পড়িয়েছেন।

-[মানা-ক্বিব-ই ইমাম-ই আ'যম : ২য় খণ্ড : পৃষ্ঠা ৭৯]

পরিশেষে, এ মহান ইমাম, দুনিয়াবাসীর জন্য শরীয়ত-ই মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম অনুসারে সহজ ও একেবারে সঠিকভাবে আমল করে উভয় জাহানে সফলকাম হবার পথকে সুগম করে দিয়েছেন। তাঁর মাযহাব যেমন সঠিক ও সহজ, তেমনি তাঁর আদর্শ জীবনের সবক'টি বিষয়ও মানুষের জীবনের জন্য একান্ত অনুকরণীয়। আসুন! আমরা তাঁর মাযহাবানুসারে আমল করে দ্বীনী বিধানাবলী যথাযথভাবে পালনে সচেষ্ট হই, তেমনি তাঁকে অন্যান্য সব বিষয়েও অনুকরণ করে আল্লাহ্ ও তাঁর হাবীবের প্রিয়ভাজন হওয়ার জন্য সচেষ্ট হই। আল্লাহ্ তাওফীক্ব দিন। আ-মীন্॥ .

---<>---

তরীক্বতের প্রয়োজনীয়তা

আরবী 'তরীক্বুন' শব্দ থেকে 'ত্বরীক্বত' (তরীক্বাহ্) শব্দটির উৎপত্তি। এর অর্থ পথ বা রাস্তা। আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জমা'আতই ইসলামের সঠিক রূপরেখা। আল্লাহর নির্দেশিত, প্রিয় নবীর প্রদর্শিত এবং সাহাবা-ই কেরামের অনুসৃত বিধিমালার যথার্থ অনুসরণের নাম ত্বরীক্বত। আরো পরিস্কাররূপে বলা যায় যে, যুগে যুগে আল্লাহর প্রিয় বান্দারা ক্বোরআন-সুন্নাহ্‌র আলোকে সৎ পথের নির্দেশ নিয়ে মুক্তিকামী মানুষের পরিত্রাণের জন্য, অন্ধকার থেকে আলোর পথে পৌঁছার যে নিয়ম পদ্ধতির নির্দেশনা দিয়ে গেছেন সেটাই ত্বরীক্বত বা তরীক্বাহ্।

তরীক্বতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তরীক্বত অবলম্বনের অপরিহার্যতার প্রমাণে ক্বোরআন সুন্নাহর নির্দেশনাই মূলভিত্তি। নিম্নে এ বিষয়ে ক্বোরআন-হাদীস ভিত্তিক প্রমাণ্য আলোচনা উপস্থাপন হচ্ছে-

তরীক্বতের মূলনীতি প্রসঙ্গে সূরা ফাতিহা-এ এরশাদ হয়েছে-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

তরজমাঃ আমাদের সরল পথে পরিচালিত করুন, তাদের পথে, যাদেরকে আপনি অনুগ্রহ করেছেন। [সূরা ফাতিহা, আয়াত-৫]

উপরোক্ত আয়াতের বিশদ বর্ণনায় নিম্নোক্ত আয়াতে চারশ্রেণীর নি'মাত প্রাপ্ত বান্দাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার শিক্ষা দিয়েছেন। এরশাদ হচ্ছে-

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ
وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ○

তরজমাঃ যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে, তারা ওইসব লোকের সাথে থাকবে, যাদের উপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন অর্থাৎ নবীগণ, সত্যনিষ্ঠগণ, শহীদগণ এবং সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ। [সূরা নিসা, আয়াত-৬৯]

আল্লাহর মনোনীত বুযুর্গ বান্দাদের পদাঙ্ক অনুসরণের প্রয়োজনীয়তার কথা ক্বোরআনুল করীমের বহু স্থানে বিঘোষিত হয়েছে। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন-

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ

তরজমাঃ হে মু'মিনগণ আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সঙ্গ অবলম্বণ করো। [সূরা তাওবা, আয়াত-১১৯]

আল্লাহর নির্দেশিত পথে যাঁরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন, দ্বীনী খিদমত, সত্য প্রতিষ্ঠা, মানবতার কল্যাণ, ন্যায়নীতি ও ইনসাফ ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায়-যারা স্রষ্টা ও সৃষ্টির সাথে যোগসূত্র স্থাপন করেছেন তাঁদের অনুসরণে মানব জাতির মুক্তি

নিশ্চিত। তাঁদের জীবনাদর্শ মানবজাতির জন্য অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়। এটি শান্তিময় পবিত্র সুন্দর জীবনের অধিকারী হওয়ার জন্য তাঁদের পূণ্যময় জীবনপ্রণালী একটি উত্তম আদর্শ। আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন এ শ্রেণীর বান্দাদের অনুসরণ প্রসঙ্গে নির্দেশ দিয়েছেন-

وَاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ

তরজমাঃ যে ব্যক্তি আমার দিকে রুজু, হয়েছে তার পথকে অনুসরণ করো। [সূরা লোক্বমান, আয়াত-১৫]

আরো এরশাদ হয়েছে-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْۤا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ

তরজমাঃ হে মু'মিনগণ আল্লাহকে ভয় করো এবং তাঁর দিকে ওসীলা অন্বেষণ করো। [সূরা মা-ইদাহ, আয়াত-৩৫]

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে রুহুল বয়ানে উল্লেখ করা হয়েছে-

اَلْوُصُوْلُ لَايَحْصِلُ اِلَّا بِالْوَسِيْلَةِ وَهِىَ عُلَمَآءُ الْحَقِيْقَةِ وَمَشَآئِخُ الطَّرِيْقَةِ

অর্থাৎ ওসীলা ব্যতীত আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জন করা যায় না, ওসীলা হচ্ছে হক্বানী ওলামা-ই কেরাম এবং ত্বরীক্বতপন্থী মাশায়েখ বা কামিল পীর-মুর্শিদগণ। সত্যিকার ত্বরীক্বতপন্থী, দ্বীনের অনুসারী, মুত্তাক্বী-পরহেযগার বান্দারা হচ্ছেন হিদায়তপ্রাপ্ত,তরীক্বতের আদর্শ। শিক্ষাচ্যুত বান্দা গোমরাহ ও পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন-

مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ وَلِيًّا مُّرْشِدًا

তরজমাঃ আল্লাহ পাক যাকে হিদায়ত করেন সে হিদায়ত পায় এবং যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য কোন ওলী-(কামিল) মুর্শিদ পাবে না। [সূরা কাহফ, আয়াত- ১৭]

ঈমান-ইসলামের হিফাযতের জন্য সকল মুজতাহিদ ইমামগণ কামিল পীর-মুর্শিদের পদাঙ্ক অনুসরণকে অপরিহার্য মনে করেছেন। হুযূর গাউসুল আ'যম শায়খ আবদুল ক্বাদের জীলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু প্রণীত 'সিররুল আসরার' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে-

وَلِذَالِكَ طَلَبُ اَهْلِ التَّلْقِيْنِ لِحَيَاةِ الْقُلُوْبِ فَرْضٌ

অর্থাৎ অন্তরাত্মাকে যিন্দা করার জন্য আহলে তালক্বীন তথা কামিল মুর্শিদের শরণাপন্ন হওয়া অপরিহার্য। আলিমকুল শিরোমণি, হানাফী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমামুল উম্মাহ্ হযরত ইমাম আ'যম আবূ হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন-

لَوْ لَا سَنَتَانِ لَهَلَكَ نُعْمَانُ

অর্থাৎ আমি আবূ হানিফা যদি আমার পীর মুর্শিদ ইমাম জা'ফর সাদেক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র সান্নিধ্যে বায়'আত গ্রহণপূর্বক দু'বছর না থাকতাম, তবে আমি ধ্বংস হয়ে যেতাম।

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযালী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি প্রণীত 'কীমিয়া-ই সা'আদাত' গ্রন্থে, হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি প্রণীত 'মকতুবাত' শরীফে, সৈয়দুল আউলিয়া হযরত ইমাম আহমদ কবীর রেফা'ঈ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি প্রণীত 'আল বুনিয়ানুল মুশাইয়্যাদ' গ্রন্থে, আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা ফাযেলে বেরলভী কুদ্দিসা সিররুল আযীয প্রণীত 'নিক্বাউস সিলাফাহ্ ফী আহকামিল বায়'আতি ওয়াল খিলাফাহ' (১৩১৯ হিঃ) গ্রন্থে ইলমে তাসাউফ অর্জন তথা পীর-মুর্শিদের বায়'আত গ্রহণ করাকে অপরিহার্য বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এমন কোন মুজতাহিদ, ইমাম, মুহাদ্দিস, ফক্বীহ, মুফতী, মুফাস্সির, জ্ঞানীগুণী, পন্ডিত, ইসলামী দার্শনিক নেই, যিনি তরীক্বতের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। প্রত্যেকে স্ব-স্ব যুগের প্রখ্যাত মাশায়েখ-ই ইযামের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। তরীক্বতের দীক্ষা অবলম্বন করেছেন। এক্ষেত্রে বিশ্বখ্যাত আলেমে দ্বীন মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি ও তাঁর পীর-মুর্শিদ হযরত শামসুদ্দীন তাবরিযীর ঘটনা প্রনিধানযোগ্য। মাওলানা রুমী বলেন-

مولانا ہرگز نشد مولائے روم - تا غلام شمس تبریز نشد

অর্থাৎ আমি মাওলানা রুম কখনই মাওলানা রুমী হতে পারতাম না
যদি না আমার পীর শামসে তাবরীযের গোলামী করতাম।

এ কারণে যত বড় জ্ঞানী হোক না কেন, শর'ঈ জ্ঞানের পাশাপাশি তরীক্বত তথা তাসাওফের জ্ঞান না থাকলে গোমরাহ তথা পথভ্রষ্ট হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। হযরত ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি তাঁর প্রণীত 'মু'আত্তা'য় এ প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি এতে বর্ণনা করেন-

مَنْ تَفَقَّهَ وَلَمْ يَتَصَوَّفْ فَقَدْ تَفَسَّقَ مَنْ تَصَوَّفَ وَلَمْ يَتَفَقَّهْ فَقَدْ تَزَنْدَقَ
وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَقَدْ تَحَقَّقَ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইলমে ফিক্বহ্ তথা শর'ঈ জ্ঞান অর্জন করলো এবং ইলমে তাসাওফ তথা তরীক্বতের জ্ঞান অর্জন করলো না সে ফাসিক্ব হলো। আর যে ব্যক্তি ইলমে তাসাওফ শিক্ষা করলো অথচ ইলমে ফিক্বহ্ শিক্ষা করলো না সে যিন্দিক্ব হলো। আর যে ব্যক্তি উভয় প্রকার ইল্ম অর্জন করলো, সে প্রকৃত সত্যের সন্ধান লাভ করলো। [সূত্র: ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৩৪ বর্ষ, ২য় সংখ্যা তাসাওফের তত্ত্বজ্ঞান, কৃত: আর.ম. আলী হায়দার]

---<>--

আউলিয়া-ই কেরাম তথা পীর-মুর্শিদ প্রয়োজন কেন?

আউলিয়া-ই কেরামের অনুসৃত তরীক্বতের দিশারী পীর-মুর্শিদ কেন প্রয়োজন এ প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হলো-

১. ধরাধামে প্রত্যেকে একে অপরের মুখাপেক্ষী। কেউ ফয়য গ্রহণকারী কেউ বিতরণকারী। যেমন সূর্য এবং বৃষ্টি হচ্ছে প্রদানকারী, যমীন তথা ভূখণ্ডের প্রতিটি ক্ষেত্র ও ফসল-বাগান হচ্ছে গ্রহণকারী। একইভাবে রুহানী জগতের সম্মানিত নবীগণ এবং তাঁদের মাধ্যমে সকল ওলী, গাউস, কুত্ব, আবদাল, ওলামা-মাশায়েখ ফয়য প্রদানকারী, সমগ্র পৃথিবীবাসী তাঁদের মুখাপেক্ষী ও ফয়য গ্রহণকারী।

২. যেমনিভাবে পৃথিবীর জন্য সূর্য ও বৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। একইভাবে জগতবাসীর জন্য শরীয়ত-ত্বরীক্বত তথা আলিম ও ওলীগণের অপরিহার্যতা অনিবার্য।

৩. আম্বিয়া-ই কেরাম যাহের-বাতেনকে পরিশুদ্ধ করার জন্য তাশরীফ এনেছেন। তাঁদের তিরোধানের পর আলিম ও ওলীগণের উপর এ দায়িত্ব অর্পিত হয়। বাহ্যিক সংশোধনের দায়িত্ব আলিমগণের উপর। বাতেনী পরিশুদ্ধির দায়িত্ব ওলীগণের উপর অর্পিত।

নামাযের জন্য শরীর পাক, কাপড় পাক ও নামাযের জায়গা পাক, সতর ঢাকা, কেবলামুখী হওয়া ইত্যাদি এবং সূরা ক্বিরআত শিক্ষা দেয়া আলিমগণের দায়িত্ব আর নামাযের মধ্যে হুযূর-ই ক্বলব তথা ইখলাস-আন্তরিকতা তথা আল্লাহর প্রতি একাগ্রতা ও ধ্যানমগ্নতা ওলীগণের মাধ্যমেই অর্জিত হয়। মূলত: ওলামায়ে কেরাম নামায আদায় করার শর্ত পূর্ণ করে দেন, আর আউলিয়ায়ে কেরাম নামায ক্বূবুল হওয়ার শর্তাদি পূর্ণ করে দেন।

৪. তরীক্বত চর্চা ও অনুশীলন তথা ওলীগণের সোহবত অর্জন বড় উপকারী। ক্বা'বা শরীফের যিয়ারতকারী সাহাবী নয়, কিন্তু ঈমানের সাথে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর এক নজর দর্শনকারী সাহাবী। প্রমাণিত হলো আমলের চেয়ে সোহবত অধিকতর প্রভাব বিস্তারকারী। মাওলানা রুমী বলেন-

এক যমানা সোহবতে বা আউলিয়া,
বেহতর আয সদ সা-লাহ্ তা'আত বে-রিয়া।

অর্থাৎ শত বৎসরের বে-রিয়া (খাঁটি) ইবাদতের চেয়ে ওলীগণের সান্নিধ্যে কিছুক্ষণ বসা অনেক উত্তম।

৫. শারীরিক ব্যাধির জন্য যেভাবে চিকিৎসক রয়েছেন, অনুরূপ অন্তরের ব্যাধি

থেকে আরোগ্য লাভের জন্য ঈমানী ডাক্তার রয়েছেন। তরীক্বতের দীক্ষায় পীর-মুর্শিদের সোহবতে অন্তরাত্মা আলোকিত হয় এবং গোমরাহী মুক্ত হয়। পীর-মুর্শিদের প্রদত্ত সবক চর্চা ও অনুশীলনের মাধ্যমে আত্মার উন্নতি সাধিত হয়, কলুষিত অন্তর আলোকিত হয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

اِنَّ الْمُؤْمِنَ اِذَا اَذْنَبَ كَانَتْ نُقْطَةٌ سَوْدَاءَ فِى قَلْبِهٖ فَاِذَا تَابَ وَاسْتَغْفَرَ صَقُلَ قَلْبُهٗ

অর্থাৎ মু'মিন বান্দা যখন পাপ করে ফেলে, তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। অতঃপর যখন সে তওবা করে ও ক্ষমা চায় তখন সে ময়লা দুরীভূত হয়ে অন্তর পরিস্কার হয়ে যায়।

[সূত্র: 'হাক্বীক্বাতু মা'রিফাতির রব্বানীয়াহ' কৃত: মাওলানা নিসার উদ্দীন আহমদ]

৬. জীবন চলার পথে দুনিয়ার যমিনে মুসাফিরের জন্য যেমন একজন পথ প্রদর্শকের প্রয়োজন, তদ্রূপ পরকালের সফরের কামিয়াবী বা সফলতার জন্য একজন রাহনুমায়ে শরীয়ত ও রাহবরে তরীক্বত, হক্ব্ক্বানী পীর-মুর্শিদ প্রয়োজন।

৭. ঈমান ও আমল অমূল্য সম্পদ। শয়তান মানুষের চিরশত্রু, মৃত্যুকালে ঈমান ছিনতাইকারী ডাকাত। সত্যিকার আউলিয়ায়ে কেরাম তথা পীর-মুর্শিদ হচ্ছেন বিপদের মুহূর্তে ঈমানের হিফাযতকারী।

৮. নাফ্স হচ্ছে কুকুর। যে কুকুরের গলায় বেল্ট থাকে না সে কুকুর মানুষের জন্য নিরাপদ নয়। ভয়ঙ্কর। সুতরাং নাফ্সের গলায় হক্বানী পীর-মুর্শিদের সিলসিলার বেল্ট বেঁধে দাও। নাফ্সের গলায় বেল্ট বাঁধা থাকলে এবং বেল্টের কড়া শায়খের মাধ্যমে প্রিয়নবী হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র নূরানী হাতে থাকলে ওই নাফ্স কখনো পথভ্রষ্ট হবে না।

[সূত্র : হাদা-ইক্বে বখশিশ, কৃত. আ'লা হযরত]

৯. তরীক্বতের সম্পর্ক নাজাতের ওসীলা তরীক্বতের সিলসিলা হচ্ছে রেল লাইনের উপর উপবিষ্ট বগির মত। বিভিন্ন শ্রেণীর বগি রয়েছে। কোন বগির অবস্থা যত নিম্নমানের হোক না কেন, সম্পর্ক যদি ইঞ্জিনের সাথে থাকে, তবে তা যথাসময়ে গন্তব্যে পৌঁছে যাবে। তদ্রূপ সিলসিলা-পরম্পরার সম্পর্ক যদি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পীর-মুর্শিদের মাধ্যমে অক্ষুন্ন ও অবিচ্ছেদ্য থাকে, তাহলে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছা সম্ভব হবে।

[সূত্র : শানে হাবীবুর রহমান (উর্দু), কৃত. হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি]

----<>----

ইসলামের দৃষ্টিতে বায়'আতের গুরুত্ব

আল্লাহর একত্ববাদ প্রচারে যুগে যুগে এ পৃথিবীতে অসংখ্য সম্মানিত নবী-রসূল আলাইহিমুস্ সালাম শুভাগমন করেছেন। সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম আদর্শ ইমামুল আম্বিয়া সৈয়্যদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শুভ আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে নবী ও রসূল আগমনের ধারাবাহিকতার সমাপ্তি ঘটে। মহান রাব্বুল আলামীন ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন হিসেবে ঘোষণা করলেন। হুযূর করীমের ওফাত শরীফের পর ইসলাম প্রচারের এ গুরু দায়িত্ব অর্পিত হয় সাহাবা-ই কেরাম, তাবে'ঈন, তব'ই তাবে'ঈন, বুযুর্গানে দ্বীন আউলিয়া-ই কামেলীন এবং হক্কানী আলিম-ওলামা, মাশাইখ-ই ইযামের উপর। তাঁদের রূহানী প্রভাব, ব্যবহারিক আদর্শ, উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী ও ইসলামী আদর্শের মডেলে উত্তম কর্মপদ্ধতির যথার্থ বাস্তবায়নে বিশ্বব্যাপী ইসলাম আজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর ক্রমশঃ মহান আউলিয়া-ই কেরামের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অকৃত্রিম ক্বোরবানীর বিনিময়ে মুসলমানদের অন্তরাত্মা ঈমানী চেতনা ও ইসলামী ভাবধারায় উজ্জীবিত হয়েছিলো।

পরবর্তীতে তাঁদের স্বর্ণালী যে ইতিহাস গৌরবময় হয়েছিলো তা চরমভাবে উপেক্ষিত হতে থাকে। ইসলামী দর্শনে স্বীকৃত সূফীতত্ত্ব তথা আধ্যাত্মিকতা নিয়েও ক্রমশঃ বিতর্কের সৃষ্টি হতে থাকে। অথচ ইসলামী বিশ্ব তথা ইরাক, ইরান, আরব, সিরিয়া, মিশর, স্পেন, তুর্কীস্তান, মধ্য এশিয়া ও পাক-বাংলা-ভারত তথা সমগ্র বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রচার-প্রসারে সম্মানিত সূফীগণের ভূমিকা ও অবদান ইতিহাসে এক গৌরবজ্জ্বল অধ্যায়; অথচ দুঃখজনক হলেও বাস্তব সত্য যে, আজ এক শ্রেণীর কপট সূফী ও তাদের উপর ভিত্তি করে ভ্রান্ত মতবাদীদের অপপ্রচারে তাঁদের ভূমিকা ও অবদান ম্লান হতে চলেছে। এ জন্য আমাদের কর্মতৎপরতাও কম দায়ী নয়। আজ সুন্নী নামধারী কপট অসাধু ভণ্ড সূফীদের অশুভ পদচারণা ও অনৈতিক কর্মকাণ্ডের কারণে বাতিল পন্থীরা, সত্যিকার সূফী-দরবেশ পীর-মাশায়েখ, ওলী-বুযুর্গদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করার সুযোগ গ্রহণ করেছে। হাজারো পীর-মাশায়েখ আউলিয়ায়ে কেরামের পদধুলিতে যে দেশের মাটি ধন্য সে দেশের রাষ্ট্রীয় মসনদে আউলিয়ায়ে কেরামের আদর্শ ও চেতনা বিরোধী বাতিল অপশক্তিরা আজ প্রতিনিয়ত তাদের ভ্রান্তনীতি ও ভ্রান্ত মতবাদ প্রতিষ্ঠায় তৎপর। প্রকৃতপক্ষে যারা ইসলামের সুফীতত্ত্ব ও আধ্যাত্মিকতাকে স্বীকার করে না, ইসলামে পীর-মুরিদী ও বায়'আতের গুরুত্ব যারা উপলব্ধি করে না, তারাও কিন্তু বর্তমানে সরলপ্রাণ মুসলমানদের

ঈমান-আক্বীদা বিনষ্ট করার সুদূর প্রসারী চক্রান্তে মেতে উঠেছে। পক্ষান্তরে, আরেক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী ভণ্ড পীর-মুরিদীর রমরমা ব্যবসা অব্যাহত রেখে সত্যিকার পীর-মুরীদি ও বায়'আয়াতের তাৎপর্য ও গুরুত্বের প্রয়োজনীয়তাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলেছে। সত্যিকার অর্থে ইসলামের দৃষ্টিতে ত্বরীক্বত ও বায়'আতের গুরুত্ব সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা গেলো-

বায়'আত কি? কোন্ বিষয়ের নাম বা'আয়ত, বায়'আত কেন হয়? বা'আয়তের উপকারিতা কি? শরীয়তে বায়'আতের ভিত্তি কতটুকু? বায়'আত কি ক্বোরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত? বায়'আত কখন থেকে প্রচলিত? এখন দেখুন এগুলোর জবাব!

ইসলামের দৃষ্টিতে বায়'আতের গুরুত্ব অপরিসীম

বায়'আত-এর সংজ্ঞা বর্ণনায় সৈয়্যদুল আউলিয়া হযরত মীর সৈয়দ আবদুল ওয়াহেদ বলগেরামী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেন, বায়'আত হচ্ছে-মুরীদ পীরের হাতে হাত রেখে দৃঢ় অঙ্গীকারের নাম। পীর-মুর্শিদ স্বীয় হাত মুরীদের হাতের উপর রাখবেন এবং কলেমা পাঠ, এস্তেগফার ও তওবা করাবেন। মুরীদ থেকে এ মর্মে অঙ্গীকার নেবেন-

وَمَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

(রসূল যা তোমাদের দিয়েছেন তা গ্রহণ করো, যা থেকে তোমাদের নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকো।) [সব'ই সানাবেল শরীফ, পৃ. ১০৪]

উল্লেখ্য, আমাদের মুর্শিদে বরহক্ব শাহানশাহে সিরিকোট ও বায়'আত গ্রহণের সময় (বায়'আয়ত গ্রহণকারীদের সংখ্যা কম হলে হাতে হাত রেখে অন্যথায় রুমালের মাধ্যমে সকলের হাত নিজের বরকতময় হাতে নিয়ে) যা বলে অঙ্গীকার নেন তাও এ অভিমতটির একেবারে অনুরূপ। যেমন-তখন বলা হয় "ইয়া আল্লাহ! হাম তাওবা করতে হ্যাঁয় তামাম গুনাহোঁ সে, ছোটে বড়ে, জেতনে গুনাহ্ হামনে কিয়ে হ্যাঁয় তামাম গুনাহোঁ সে তাওবা করতে হ্যাঁয়। আয়েন্দাহ কে লিয়ে উয়হ কাম করেঙ্গে, জিস সে আল্লাহ্ ও রসূল রাযী হোঁ, আওর উয়হ কাম নেহী করেঙ্গে জিস সে আল্লাহ ও রসূল না-রায হোঁ।" অর্থাৎ-হে আল্লাহ! আমি তাওবা করছি সমস্ত গুনাহ্ থেকে-ছোট বড় যত গুনাহ্ আমি করেছি সব গুনাহ্ থেকে তাওবা করছি। আগামীতে ওই কাজ করবো, যাতে আল্লাহ ও রসূল রাজী হন, ওই কাজ করবো না, যাতে আল্লাহ্-রসূল নারাজ হন।"

বায়'আতের হাক্বীকত ব্যাখ্যায় মাওলানা রুমী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি

বলেন-

مریدی چیست توبہ از گناہاں - شدن تقصیر ہارا عذر خواہاں
مریدی عقد توبہ بستن آمد - ز اخلاق ذمیمہ رستن آمد
چوں دین بے توبہ در نقصان وشین ست
مریدی عین نص وفرض عین ست

অর্থাৎ ১. মুরিদী কি? নিজ গুণাহসমূহ থেকে তওবা করা। নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতি, ভুলভ্রান্তিতে অনুতপ্ত ও অনুশোচনা (তাওবা) করা।

২. মুরিদী হচ্ছে তওবা করা ও মন্দ কথা থেকে নিষ্কৃতি লাভের অঙ্গীকার।

যেহেতু তওবা ছাড়া দ্বীন ত্রুটিযুক্ত কলুষিত থাকে, সেহেতু মুরিদ হওয়া ক্বোরআন-সুন্নাহ্ সম্মত, প্রত্যেকের জন্য একান্ত অপরিহার্য। [মসনভী শরীফ]

এ বায়'আতকে যারা অস্বীকার করে তাদেরও পীর রয়েছে। বিশুদ্ধ সুন্নী আক্বিদাপন্থী পীরের অনুসরণ না করলেও তাদের একজন পীর আছে তার নাম শয়তান। مَــنْ لَيْسَ لَهُ شَيْخٌ فَشَيْخُهُ شَيْطَانٌ (যার কোন পীর নেই তার পীর হলো শয়তান)।

[সূত্র: ফাতাওয়া-ই রেযভিয়াহ্, কৃত. আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২০৭]

বায়'আত ঈমান রক্ষাকারী

ঈমান এক অমূল্য সম্পদ, পার্থিব জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হলো ঈমান। ঈমানের চেয়ে মূল্যবান কোন বস্তু নেই। এমন মূল্যবান সম্পদ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা কি নেই? কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি তার সম্পদের সংরক্ষণ না করে কি থাকতে পারেন? অবশ্যই না। সুন্নী মুসলমানদের কাছে সবচেয়ে বড় দৌলত হচ্ছে ঈমান, যা পৃথিবীর কোন কিছুর বিনিময়ে বিক্রয় করা যায় না। অলী-ই কামেল পীর-মুর্শিদের হাতে বায়'আত গ্রহণ করে সুন্নী মুসলমানগণ নিজেদের মূল্যবান ঈমান-আক্বিদার হেফাযত করেন, যেন ঈমান হননকারী কোন বাতিলপন্থী ও নবীর কোন শত্রু তার ঈমান ছিনিয়ে নিতে না পারে।

মুরীদ হওয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে মাওলানা রুমী আরো বলেন-

مریدی ہر گناہے را پناہ ست سراپائ وجود ما گناہ ست
مریدی شد حصار دین وایمان غم ایمان خورد مرد مسلمان

অর্থাৎ ১. আমাদের আপাদমস্তকে গুণাহ্ বিদ্যমান। মুরীদ হওয়া সকল গুণাহ থেকে বাঁচার আশ্রয়স্থল।

২.মুরিদী হচ্ছে দ্বীন ঈমান হিফাযতের বেষ্টনী। প্রত্যেক মুসলমানের অন্তরে নিজ ঈমানের চিন্তা থাকা বাঞ্ছনীয়। [মসনভী শরীফ]

ক্বোরআন মজীদের আলোকে বায়'আত

ক্বোরআনুল করীমের আয়াতে করীমাহ্ বায়'আত শরীয়ত সম্মত হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। নিম্নে কয়েকটি আয়াত উল্লেখপূর্বক এ প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হচ্ছে । এরশাদ হচ্ছে-

اِنَّ الَّـذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ ؕ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ ۚ فَمَنْ نَّكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ اَوْفٰى بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ○

তরজমাঃ ওইসব লোক, যারা আপনার নিকট বায়'আত গ্রহণ করছে, তারা তো আল্লাহরই নিকট বায়'আত গ্রহণ করছে। তাদের হাতগুলোর উপর 'আল্লাহর হাত' রয়েছে। সুতরাং যে কেউ অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে, সে নিজেরই অনিষ্টার্থে অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে। আর যে কেউ পূরণ করেছে ওই অঙ্গীকারকে, যা সে আল্লাহর সাথে করেছিলো, তবে অতিসত্ত্বর আল্লাহ তাকে মহা পুরস্কার দেবেন। [৪৮:১০]

[অনুবাদ: কানযুল ঈমান, মূল: আ'লা হযরত, বঙ্গানুবাদ : মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান]

২. ক্বোরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে অন্যত্র এরশাদ করেন-

لَقَدْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ عَلِمَ مَافِىْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا ۔

তরজমাঃ নিশ্চয় আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন ঈমানদারের প্রতি যখন তারা এ বৃক্ষের নীচে আপনার নিকট বায়'আত গ্রহণ করছিলো। সুতরাং আল্লাহ জেনেছেন যা তাদের অন্তরসমূহে রয়েছে, অতঃপর তাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ করেছেন এবং তাদেরকে শীঘ্র আগমনকারী বিজয়ের পুরস্কার দিয়েছেন।

[সূরা ফাত্হ্, পারা ২৬, আয়াত-১৮, তরজমা: প্রাগুক্ত]

৩. ক্বোরআন মজীদের আর এক স্থানে বায়'আত প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক আরো এরশাদ করেনঃ

يٰۤاَيُّهَا النَّبِىُّ اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِىْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۔

তরজমাঃ হে নবী! যখন আপনার সম্মুখে মুসলমান নারীরা হাযির হয় আপনার নিকট বায়'আত গ্রহণের জন্য এ মর্মে যে, তাঁরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক স্থির করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, আপন সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, না তারা অপবাদ আনবে, যাকে আপন হাত ও পাগুলোর মধ্যখানে অর্থাৎ জন্মের

স্থানে (রচনা করে) রটায়, এবং কোন সৎকাজে আপনার নির্দেশ অমান্য করবে না, তখন তাদের নিকট থেকে বায়'আত গ্রহণ করুন এবং আল্লাহর নিকট তাদের ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

[সুরা, মুমতাহিনাহ্, পারা ২৮, আয়াত-১২, তরজমা : কানযুল ঈমান]

ক্বোরআনুল করীমের উপরোল্লিখিত আয়াতগুলো দ্বারা বায়'আতের বৈধতা সুস্পষ্টরূপে ও অকাট্যভাবে প্রমাণিত হলো।

হাদীস শরীফের আলোকে বায়'আত

সিহাহ্ সিত্তাহ্ (ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থে)'র বরাতে বহু বর্ণনাকারী সাহাবা-ই কেরাম প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র নুরানী হাতে বায়'আত গ্রহণ করছেন মর্মে সুস্পষ্টরূপে অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়। নিম্নে এতদ্সংক্রান্ত কয়েকটি হাদীস শরীফ উপস্থাপন করা হলো-

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَوْلَهٗ عِصَابَةٌ مِنْ اَصْحَابِهٖ بَايِعُوْنِىْ عَلٰى اَنْ لَّا تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَيْـًٔا وَلَا تَسْرِقُوْا وَلَا تَزْنُوْا وَلَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوْا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُوْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَاَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُوْا فِىْ مَعْرُوْفٍ فَمَنْ وَفّٰى مِنْكُمْ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْـًٔا فَعُوْقِبَ بِهٖ فِى الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْـًٔا ثُمَّ سَتَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَهُوَ اِلَى اللّٰهِ اِنْ شَآءَ عَفَاعَنْهُ وَاِنْ شَآءَ عَاقَبَهٗ فَبَايَعْنَاهُ عَلٰى ذٰلِكَ [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]

অর্থাৎ হযরত ওবাদাহ্ ইবনে সামিত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন সাহাবা-ই কেরামের একটি দল রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে ঘিরে বসেছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি তাঁদেরকে বললেন, আমার হাতে এ মর্মে বা'আয়াত গ্রহণ করো যে, তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কিছুকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, যিনা বা ব্যভিচার করবে না, তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, কারো প্রতি ওই মিথ্যা অপবাদ দেবে না, যা তোমরা তোমাদের হাত ও পাগুলোর মধ্যখানে অর্থাৎ জন্মের স্থানে রচনা করে থাকো, কোন পুণ্যের কাজে অবাধ্য হবে না। যে ব্যক্তি এসব অঙ্গীকার পূর্ণ করবে তার জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে পুরস্কার রয়েছে। আর যে ব্যক্তি এসব অপরাধের কোন একটিতে লিপ্ত হবে এবং সেজন্য পৃথিবীতে তার শাস্তিও হবে, তখন তা হবে ওই অপরাধের কাফ্ফারা স্বরূপ। আর যে ব্যক্তি এসব অপরাধের কোন একটিতে লিপ্ত হয়ে

পড়েছিলো, অথচ আল্লাহ তা'আলা তা গোপন করে রেখেছেন, (যে কারণে সেটার শাস্তি হতে পারে নি) তখন তা হবে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। তিনি ইচ্ছা করলে সেটা ক্ষমা করবেন, ইচ্ছা করলে এজন্য অপরাধীকে শাস্তিও দিতে পারেন। ওবাদাহ্ ইবনে সামেত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, অতঃপর আমরা এসব কথার উপর তাঁর হাতে বায়'আত করলাম। [বোখারী শরীফ, পৃ. ৭, ১ম খণ্ড]

عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَايَعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى اِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ -

অর্থাৎ হযরত জরীর ইবনে আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট নামায আদায় করার, যাকাত প্রদানের এবং প্রত্যেক মুসলমানকে নসীহত করার বায়'আত গ্রহণ করেছি। [বোখারী শরীফ ১ম খণ্ড পৃ. ৭৫]

হযরত ওবাদা ইবনে সামিত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কর্তৃক বর্ণিত, এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে-

بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمُكْرَهِ وَعَلٰى اَثْرِهٖ عَلَيْنَا وَعَلٰى اَنْ لَّا نُنَازِعَ الْاَمْرَ اَهْلَهٗ وَعَلٰى اَنْ نَّقُوْلَ بِالْحَقِّ اَيْنَمَا كُنَّا لَانَخَافُ فِى اللّٰهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ

অর্থাৎ আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এ মর্মে বায়'আত গ্রহণ করেছি যে, আমরা আমাদের সুখ-দুঃখ, পছন্দ-অপছন্দ তথা সর্বাবস্থায় তাঁর কথা শুনবো ও আনুগত্য করবো। আনুগত্যের শপথের সময় আমরা আমাদের নিজেদের উপর অন্যদেরকে প্রাধান্য দেয়া এবং দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের সাথে কখনো বিবাদে লিপ্ত না হওয়ার উপরও অঙ্গীকার করেছি। আর তখন আমরা এ মর্মেও অঙ্গীকার করেছি যে, যেখানেই থাকি সদা সত্য কথা বলবো। এ ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবো না। [বোখারী শরীফ ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৬৯]

বোখারী শরীফে আরো বর্ণিত হয়েছে যে,

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ

অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এ মর্মে বায়'আত গ্রহণ করেছি যে, আমরা তাঁর কথা শুনবো ও আনুগত্য করবো।

[বোখারী শরীফ ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৭০]

বায়'আত অস্বীকারকারীর বিধান

যে বায়'আতকে অপ্রয়োজনীয় ও অনর্থক ধারণা করবে এবং তা অস্বীকার করবে সে পথভ্রষ্ট ও বে-দ্বীন। আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেন, যে অস্বীকারবশতঃ বায়'আত বর্জন করলো, সে নিঃসন্দেহে পথভ্রষ্ট ও শয়তানের মুরীদ হলো।

[সূত্র : বায়'আত ওয়া খিলাফাত কে আহকাম, পৃ. ৬০, কৃত: আ'লা হযরত]

বায়'আতের শর্তাবলী (পীর সাহেবের মধ্যে)

ইসলামী শরীয়তে বায়'আতের ক্ষেত্রে চারটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে। ওই চারটি শর্তের মধ্যে একটিও কম হলে ওই ব্যক্তি পীর হবার ও বায়'আত গ্রহণের যোগ্য নয়। আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন-

১. আলেমে দ্বীন হওয়া, কমপক্ষে এতটুকু ইল্ম থাকা আবশ্যক যেন নিজ যোগ্যতায় কিতাবাদি হতে অত্যাবশ্যকীয় মাসআলাসমূহ বের করতে সক্ষম হন। আক্বায়েদে আহলে সুন্নাত সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবগত হওয়া। ইসলাম, কুফর, হিদায়ত ও গোমরাহী সম্পর্কে পার্থক্য নির্ণয়ে যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়া।

২. বিশুদ্ধ সুন্নী আক্বিদার অনুসারী হওয়া, কোনো বাতিল মতাদর্শী কোনো অবস্থাতেই পীর হওয়ার উপযুক্ত নয়। যেমন ওহাবী, দেওবন্দী, মওদুদী, ক্বাদিয়ানী, রাফেযী, খারেজী প্রমুখ। ভ্রান্ত মতবাদীদের হাতে বায়'আত নেয়া হারাম।

৩. সুন্নাতের অনুসারী ও শরীয়তের পাবন্দ হওয়া। কবীরা গুনাহ্ হতে বেঁচে থাকা আবশ্যক। সগীরা গুনাহ্ যেন বারংবার না হয়। দাড়ি মুণ্ডানো ব্যক্তি, নামায, রোযা ও শরীয়তের বিধান পরিত্যাগকারী, প্রকাশ্যে গুনাহ্কারীরা কোনোভাবেই পীর হবার যোগ্য বা উপযুক্ত নয়। (শরীয়ত বিরোধী আমলকারী ব্যক্তি যতবড় ঐতিহ্যবাহী দরবার বা খানকার গদীনশীন বা সাজ্জাদানশীন হোক না কেন কখনো পীর হবার যোগ্য নয়।) তাদের হাতে বায়'আত হওয়া সম্পূর্ণরূপে না-জায়েয ও ক্ষতিকর।

৪. পীরের সিলসিলা ধারাবাহিকভাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সম্পৃক্ত থাকা, কোথাও যেন ছিন্ন না হয়।

উপরোক্ত শর্তাবলীর আলোকে তরীক্বতের বায়'আত গ্রহণ শরীয়ত সম্মত। শর্তাবলীর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বিবেচনায় না এনে ত্বরীকতের নামে পীর-মুরিদী প্রথার অপব্যবহার শরীয়তের বিধান লংঘনের শামিল, যা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।

মুসলিম মিল্লাতের এ জাতীয় ভণ্ড প্রতারক চক্রের দূরভিসন্ধি থেকে অমূল্য সম্পদ ঈমান-ইসলামের হেফাযত করাও ঈমানী দায়িত্ব। পক্ষান্তরে, সত্যিকার হাক্বক্বানী পীরানে তরীক্বতের সান্নিধ্যে সিল্সিলাভুক্ত হয়ে ঈমান-আক্বীদার হেফাযতের গুরুত্ব অনুধাবন করা বর্তমান সময়ে অপরিহার্য দায়িত্ব। আল্লাহ্ পাক প্রত্যেককে সহীহ্ মুর্শিদের মাধ্যমে আউলিয়ায়ে কেরামের রূহানী ফুয়ূযাত লাভের তাওফীক্ব নসীব করুন। আ-মী-ন।

অবশ্য, শাহ্ ওলী উল্লাহ্ সাহেব তার 'আল-ক্বাওলুল জামীল'-এ পীরের জন্য আরো কিছু শর্তের কথা উল্লেখ করেছেন। ওই শর্তগুলোর মূল বক্তব্য উপরোক্ত চারটি শর্তের মধ্যে এসে গেছে। আল্হামদু লিল্লাহ! আমাদের সিল্সিলা-ই আলিয়া ক্বাদেরিয়া সিরিকোটিয়ার মুর্শিদে বরহক্বের মধ্যে এ শর্তগুলো পুরোপুরিভাবে রয়েছে। যেমন ত্বরীক্বাহ্-ই সিরিকোটিয়ার প্রত্যেক মুর্শিদে বরহক দক্ষ আলিম, ইলমে দ্বীনের পৃষ্ঠপোষক, সুন্নী আক্বীদার ক্ষেত্রে প্রবাদপুরুষ, আমলের দিক দিয়ে শরীয়তের পূর্ণ পাবন্দ এবং সিল্সিলাহ্ খাঁটি সুন্নী মাশাইখের মাধ্যমে হুযূর গাউসে পাক হয়ে ধারাবাহিকভাবে হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। এ কারণে, ইমামে আহলে সুন্নাত আল্লামা গাযী শেরে বাংলা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হিও শাহানশাহ্-ই সিরিকোটের হাতে বায়'আত গ্রহণের জন্য মুসলিম সমাজকে উৎসাহিত করতেন। সুতরাং উপমহাদেশের ওলামা-মাশাইখের নিকট বরেণ্য এ মুর্শিদে বরহক্বের হাতে বায়'আত হয়ে সিলসিলাহ্ভুক্ত হওয়া বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়। আল্লাহ্ তাওফীক্ব দিন! আমীন!!

----<>----

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত তথা

সুন্নী জামা'আতের পরিচয়

আজ থেকে চৌদ্দশ' বছরাধিক কাল পূর্বে একদিন হুযূর পূরনূর বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরাত সাহাবা-ই কেরামের এক জনাকীর্ণ পরিবেশে এরশাদ করলেন-

اِنَّ بَنِیْ اِسْرَآئِیْلَ تَفَرَّقَتْ عَلٰی ثِنْتَیْنِ وَسَبْعِیْنَ مِلَّةً وَّ تَفْتَرِقُ اُمَّتِیْ عَلٰی ثَلٰثٍ وَّ سَبْعِیْنَ مِلَّةً کُلُّهُمْ فِی النَّارِ اِلَّا مِلَّةً وَّاحِدَةً [مشکوة صـ ٣٠]

অর্থাৎ বনী ইস্রাঈল ৭২ ফিরক্বা বা দলে বিভক্ত হয়েছিলো, আমার উম্মতের লোকেরা ৭৩ ফিরক্বায় বিভক্ত হবে। তাদের মধ্যে একটি দল বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সব ফিরক্বা দোযখী হবে। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর এ বাণী মুবারক শুনে সাহাবা-ই কেরাম আরয করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! ওই ফিরক্বার পরিচয় কি হবে?" হুযূর জবাবে এরশাদ করলেন- مَا اَنَا عَلَیْهِ وَاَصْحَابِیْ অর্থাৎ যে আক্বীদার উপর আমি এবং আমার সাহাবীগণ রয়েছে ওই আক্বীদার উপর ওই দলটি থাকবে। [মিশকাত শরীফ পৃ. ৩০]

হুযূর-ই পাকের উপরোক্ত হাদীস শরীফ দ্বারা চারটি বিষয় প্রমাণিত হয়ঃ ১. মুসলমান নামধারী লোকেরা বহুদলে বিভক্ত হবে, ২. মুসলমানদের শুধু একটি দল সত্যের উপর থাকবে। অবশিষ্ট সব দল পথভ্রষ্ট ও দোযখী হবে, ৩. ওই সত্য দলের আক্বীদা সুন্নাত-ই মোস্তফা ও জামা'আত-ই সাহাবার অনুরূপ হবে এবং ৪. হুযূর মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণ সত্যের মাপকাঠি। যারা তাঁদের পথে থাকবে তারা সত্যের উপর রয়েছে বলে সাব্যস্ত হবে। যারা তাদের পথ পরিহার করবে তারা পথভ্রষ্ট।

আল্লাহ্ তা'আলার দানক্রমে যা কিছু বিশ্বে হয়েছে ও যা কিছু ক্বিয়ামত পর্যন্ত হতে থাকবে সব কিছু হুযূরের দৃষ্টি মোবারকের সামনে ছিলো। হুযূর ভালভাবে জানতেন যে, তাঁর উম্মতের লোকেরা অদূর ভবিষ্যতে এ পথের উপর অটল থাকবে না বরং বিভিন্ন পথ ও মত অবলম্বন করবে। অনুরূপ, তাদের কয়েকটি দল হবে, যাদের মধ্যে শুধু একটি দলই সত্যের উপর থাকবে। অন্য সব দল পথভ্রষ্ট ও দোযখীদের। অতঃপর হুযূর-ই আকরাম এসব বিষয় সম্মানিত সাহাবীদেরকে বলে দিয়েছেন, যাতে সাহাবীগণ নিজেরাও সচেতন থাকেন, পরবর্তীতে আগমনকারী মুসলমানদেরকেও সতর্ক রাখেন। বলা বাহুল্য, হুযূর যা বলেছেন তাই বাস্তবে ঘটেছে।

খোদ্ সাহাবা-ই কেরামের যুগের শেষ ভাগ থেকে পথভ্রষ্ট ফিরক্বাগুলোর জন্ম হতে থাকে; কিন্তু সাহাবীদের নিষ্ঠা ও তাঁদের শানিত তরবারিগুলোর ঝঙ্কারে ওইসব বাতিল ফির্কা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারেনি। অতঃপর সম্মানিত সাহাবীদের যুগ সমাপ্ত হলো। তারপর পুরানা দমিত উক্ত বাতিল ফির্কাগুলোর অবশিষ্ট উত্তরসূরীরা পুনরায় মাথাচাড়া দিলো। তাদের সাথে দু/একটি নতুন নতুন ফিরক্বাও পয়দা হতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত ৭২ দোযখী ফির্কার সংখ্যা পূর্ণ হয়ে গেলো।

যখন কোন কোন ধূর্ত পথভ্রষ্ট দল আপন-আপন দলের সুন্দর সুন্দর নাম দিয়ে ওইগুলোকে প্রসিদ্ধ করেছে এবং সরলপ্রাণ মুসলমানদেরকে পথভ্রষ্ট করে নিজ নিজ দলের অন্তর্ভুক্ত করতে লাগলো, তখন সাহাবা-ই কেরামের পদাঙ্ক অনুসরণকারী মুসলমানদের উপর অপরিহার্য হয়ে পড়লো আপন দলেরও একটি বিশেষ ও স্বতন্ত্র নাম নির্ধারণ করা। সুতরাং তাঁরা এর নাম 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত' সাব্যস্ত করলেন। সংক্ষেপে এর নাম 'সুন্নী' রেখেছেন। 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত'-এর অর্থ হচ্ছে- 'সুন্নাত-ই মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও জামা'আত-ই সাহাবাকে মান্যকারী লোকেরা'। দেখুন, যখন সাহাবীগণ হুযূর-ই আক্বদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সত্যপন্থী দলের পরিচয় জানতে চাইলেন, তখন হুযূর জবাবে এরশাদ করেছেন- مَا اَنَا عَلَیْهِ وَاَصْحَابِیْ যার সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে- সুন্নাত-ই রাসূল ও জামা'আত-ই সাহাবাকে মান্যকারী দলই হচ্ছে সত্যপন্থী দল। হুযূরের এ জবাবকে সামনে রেখে সত্যপন্থী মুসলমানগণ নিজেদের স্বতন্ত্র নাম 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত' সাব্যস্ত করেছেন। এ নামেই তাঁরা আজ পর্যন্ত সারা বিশ্বে প্রসিদ্ধ।

আহলে সুন্নাত ওয়া জামা'আত (সুন্নী জামা'আত)-এ বড় বড় প্রসিদ্ধ ইমাম, মুহাদ্দিস, আউলিয়া-ই কেরাম, গাউস, কুতুব, ওলামা ও বাদশাহ্ পয়দা হয়েছেন, যাঁরা সাহাবা-ই কেরামের পথে চলে দ্বীন-ই ইসলামের খুব প্রচারনা ও প্রসারের কাজ করে গেছেন। হযরত ইমাম-ই আ'যম আবূ হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, হযরত ইমাম মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, হযরত ইমাম শাফে'ঈ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু প্রমুখ সাহাবা-ই কেরামের পথে গোটা দুনিয়ার সুন্নী মুসলমানদের পেশোয়া হিসেবে পরিগণিত হন।

হযরত সাইয়্যেদুনা ইমাম যায়নুল আবেদীন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, হযরত সাইয়্যেদুনা ইমাম বাক্বের রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, হযরত সাইয়্যেদুনা ইমাম মূসা কাযেম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, হযরত সাইয়্যেদুনা ইমাম আলী রেযা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু প্রমুখ আহলে বায়ত-ই রাসূল সাহাবাই কেরামের পথে ও মতে চলে ইসলামের ঝাণ্ডাকে বুলন্দ করেছেন। আর তাঁদের রূহানী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দ্বারা লাখো সুন্নী মুসলমানদের হৃদয়কে আলোকদীপ্ত করেছেন।

হযরত ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বোখারী, হযরত ইমাম মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ নিশাপুরী, হযরত ইমাম আবু দাউদ সাজিস্তানী, হযরত ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ঈসা তিরমিযী, হযরত ইমাম নাসাঈ, হযরত ইমাম ইবনে মাজাহ্, হযরত ইমাম ক্বাযী আয়ায আন্দালূসী, হযরত ইমাম ইবনে হুম্মাম, হযরত ইমাম গাযযালী, হযরত ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূতী প্রমুখ মুহাদ্দিস রিদ্বওয়ানুল্লাহি তা'আলা আন্হুম আজমা'ঈন আপন আপন যুগে সাহাবা-ই কেরামের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ইসলামী শিক্ষার প্রসার ঘটান। আর সুন্নী মুসলমানদের পথ-প্রদর্শনের গুরু দায়িত্ব পালন করেন।

হুযূর গাউসে আ'যম আব্দুল ক্বাদের (মুহি-উদ্দীন) জীলানী বাগদাদী রাদ্বিয়াল্লাহু

তা'আলা আনহু, হযরত খাজা গরীব নওয়ায শায়খ মু'ঈন উদ্দীন চিশতী আজমীরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, হযরত ইমামূল আরেফীন শায়খ শেহাব উদ্দীন সোহ্‌রাওয়ার্দী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, হযরত খাজা-ই খাজেগান বাহাউদ্দীন নক্বশবন্দী বোখারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু প্রমুখ সম্মানিত ওলী সম্মানিত সাহাবীগণের অনুসরণে আহলে সুন্নাতের ঝাণ্ডাকে উড্ডীন করেছেন এবং হাজার হাজার মুসলমানের আত্মার পরিশুদ্ধি ও বিভিন্ন দ্বীনী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে ওলী ও মুত্তাক্বী-পরহেযগার করে দিয়েছেন।

হযরত সাইয়্যেদ সালার-ই মাস'ঊদ, গাযী সরকার-ই বাহরাইচ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, হযরত খাজা নেযাম উদ্দীন সুলতানুল আউলিয়া সরকার-ই দিল্লী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, হযরত মাখদূম আশরাফ জাহাঙ্গীর সরকার-ই কচওয়াচাহ্ ফয়যাবাদী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, মা'আরিফ-ই লাদুন্নিয়ার প্রস্রবণ ও উলূম-ই ইলাহিয়্যার ধারক হযরত আব্দুর রহমান চৌহরভী, কুত্ববুল আউলিয়া হযরত সাইয়্যেদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটী, গাউসে যামান হযরত সাইয়্যেদ মুহাম্মদ তাইয়্যেব শাহ্ সিরিকোটি পেশোয়ারী প্রমুখ রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম সুন্নী মুসলমানদের ওইসব পেশোয়া, যাঁরা, পাক-বাংলা-ভারত উপমহাদেশে স্থায়ীভাবে ইসলামের ঝাণ্ডাকে স্থাপন করেছেন।

খলীফা ও বাদশাহদের মধ্যে হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, হযরত গাযী সুলতান নূর উদ্দীন যঙ্গী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, হযরত গাযী সুলতান সালাহ উদ্দীন আইয়ূবী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, হযরত গাযী সুলতান মাহমুদ গযনভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, হযরত গাযী সুলতান আওরঙ্গযেব আলমগীর শাহানশাহে হিন্দ আলায়হির রাহমাহ্ প্রমুখ হলেন ওইসব সুন্নী শাসক, যাঁরা আপন আপন যুগে ইসলামের ভিত্তিকে মজবুত করে গেছেন এবং দ্বীনের ঝাণ্ডাকে উড্ডীন করেছেন।

ভারতের বিজ্ঞ আলিমদের মধ্যে হযরত শায়খ আব্দুল হক্ব মুহাদ্দিসে দেহলভী, হযরত মীর সাইয়্যেদ মাওলানা আবদুল ওয়াহিদ বলগ্রামী, হযরত শায়খ মুজাদ্দিদ আহমদ ফারূক্বী সেরহিন্দী, হযরত মাওলানা শাহ্ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী, হযরত মাওলানা শাহ্ ফদ্বলে রসূল ওসমানী বদায়ূনী, হযরত মাওলানা আব্দুল আলী ফিরিঙ্গী-মহল্লী লক্ষ্ণৌভী, হযরত মাওলানা শাহ্ সাইয়্যেদ আবুল হোসাইন আহমদ নূরী বরকাতী মারহারাভী, আ'লা হযরত মুজাদ্দিদে মিল্লাত শাহ্ আহমদ রেযা বেরলভী, বাংলাদেশে আল্লামা গাযী আযীযুল হক শেরে বাংলা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি প্রমুখ হলেন সুন্নী মুসলমানদের এমনসব পেশোয়া, যাঁরা একদিকে দ্বীন ও মাযহাবের হিফাযতের কর্তব্য পালন করেছেন, অন্যদিকে আক্বাইদে আহলে সুন্নাতের শত্রু দলগুলোর ধবজা উড়িয়ে দিয়েছেন। সুতরাং ইসলামের এ মূল ধারায় যারা নিষ্ঠার সাথে আক্বীদা ও আমলে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন তাঁরাই প্রকৃত 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত' (সুন্নী মুসলমান)

---<>---

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ- কী ও কেন?

প্রেক্ষাপট ও উদ্দেশ্য

হাদীস শরীফের পবিত্র ভাষ্য অনুসারে মুসলমানরা ৭৩ দলে বিভক্ত হয়েছে বা হয়ে থাকবে। এর মধ্যে ৭২ দলই জাহান্নামী। শুধুমাত্র একটি দলই জান্নাতি। ইসলামের একমাত্র নাজাতপ্রাপ্ত দল তথা মূলধারার নাম **আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত।**

[সূত্র: মোল্লা আলী ক্বারী, মিরক্বাত, শরহে মিশকাত]

হানাফী, শাফে'ঈ, মালেকী ও হাম্বলী-এ চার মাযহাব আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত'র এক একটি শাখা বিধায় নাজাতপ্রাপ্ত মূলধারার অন্তর্ভুক্ত। ঠিক তেমনি ক্বাদেরিয়া, চিশতিয়া, নক্বশ্‌বন্দিয়া, সোহরাওয়ার্দিয়া ইত্যাদি ত্বরিকাগুলোও একই শ্রেণীভুক্ত আধ্যাত্মিক ধারা। এসব ত্বরীকার মানুষগুলো কেউ হানাফী, কেউ মালেকী এভাবে কোন না কোন মাযহাবের অনুসারী সুন্নী মুসলমান। এর বাইরের অর্থাৎ সুন্নী মতাদর্শ থেকে বিচ্যুত মানুষগুলোই পথভ্রষ্ট বা জাহান্নামী ৭২ দলের অন্তর্ভুক্ত। হযরত বড়পীর গাউসুল আ'যম আবদুল ক্বাদের জীলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু জন্মগ্রহণ করেন ৪৭০ হিজরিতে। অর্থাৎ রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র জন্মের প্রায় পাঁচশত বছর পরে। অথচ এ সময়েই ইসলামের নামে ভ্রান্ত ৭২ দলের আবির্ভাব পূর্ণ হয়ে যায়। গাউসুল আ'যম জীলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু স্বলিখিত 'গুনিয়াতুত্ তালেবীন' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে উক্ত হাদীস শরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতই একমাত্র নাজাত প্রাপ্ত দল। অন্যান্য ৭২ দল জাহান্নামী। তিনি সুন্নী জামাত'র পরিচয়ের সাথে সাথে পাশাপাশি ৭২ দলের পরিচয়সহ একটি তালিকা প্রদান করেন। ওই ৭২ দলে খারেজী, রাফেযী, শিয়া, মু'তাযিলা, ক্বদরিয়া, জবরিয়া, মুশাব্বেহা ইত্যাদি মূল বাতেল দল ও এদের শাখা-প্রশাখাগুলোর নাম রয়েছে। সব মিলিয়ে গাউসে পাক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র সময়ে বাতিলের সংখ্যা ৭২ পূর্ণ হয়। ফলে ওই সময়ে ৭২টি ভ্রান্ত দল-উপদলের সাথে মোকাবেলা করতে গিয়ে একটি মূলধারার এমন নাজুক এবং মুমূর্ষু অবস্থা বিরাজ করছিলো যে, একে রক্ষা করতে এমন মহান সংস্কারকের আগমন অপরিহার্য হয়েছিলো। ঠিক এই সময়েই হযরত বড়পীর জীলানীর আগমনে এবং তাঁরই পরিচর্যায় ইসলাম পায় নতুন জীবন। যে কারণে গাউসুল আ'যম জীলানীর অপর নাম হলো 'মুহীউদ্দীন' অর্থাৎ দ্বীনকে পূনর্জীবনদানকারী। এ সংক্রান্ত অলৌকিক ঘটনাটি হলো- গাউসে পাক বাগদাদের

রাস্তায় চলার পথে দেখলেন এক বৃদ্ধ রোগাক্রান্ত মুমূর্ষু মানুষ তাঁকে আহ্বান করছে সাহায্যের জন্য। গাউসে পাক ওই মরণযাত্রীকে টেনে তুলে দাঁড় করাবার জন্য স্পর্শ করতেই লোকটি অলৌকিকভাবে সুস্থ সবল নওজোয়ান হয়ে যায়। গাউসে আ'যম এ ঘটনায় অবাক হয়ে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে লোকটি উত্তর দিলো আরো অলৌকিকভাবে যে, 'আমি কোনো মানুষ নই' মূলতঃ পাঁচশ বছর পূর্বে আপনার পূর্বপুরুষ রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যে দ্বীন ইসলাম রেখে যান আমি তারই প্রতিরূপ, যা এমন মুমূর্ষু অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছিলো, কিন্তু আজ আপনার হাতে এ মুমূর্ষু দ্বীন লাভ করলো পুনর্জীবন। [বাহ্জাতুল আসরার]

হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী তাঁর 'শামায়েলে এমদাদীয়া'য় গাউসুল আ'যম দস্তগীর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে 'দ্বীনের ডুবন্ত জাহাজ উদ্ধারকারী' বলে মন্তব্য করেন- যা 'মুহীউদ্দিন' উপাধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। 'দ্বীনের ডুবন্ত জাহাজ উদ্ধারকারী' তথা দ্বীনকে পূনর্জীবন দানকারী 'মুহীউদ্দীন' গাউসুল আ'যম আবদুল কাদের জীলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র মহান আদর্শ এই সমাজে বাস্তবায়নের জন্যই মূলতঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ'। অপর কথায় বলা যায়, গাউসুল আ'যম কর্তৃক পুনর্জীবিত এবং প্রদর্শিত পথ ও মতকে সমাজে মানুষের কাছে তুলে ধরার জন্যই 'গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

কী এই পথ, মত বা আদর্শ? গাউসে পাকের 'গাউসিয়াত'-এর এ আদর্শকে তাঁর কর্মময় জীবন, লেখালেখি ও বক্তব্য-মন্তব্যের আলোকে বিশ্লেষণ করলে আমরা তিনটি অলঙ্ঘনীয়, কর্মসূচী দেখতে পাই- ১. ইসলামের মূলধারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত-এর আদর্শ তথা 'সুন্নিয়াত'-এর প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ করা। ২.ইসলামের নামে আবির্ভূত বাতেল দল এবং ভ্রান্ত মানব গড়া মতবাদ (যেমন গ্রীক দর্শন)-এর মূলোৎপাটন, এবং ৩. আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে খোদা তালাশের একটি সহজ পথ 'সিলসিলাহ আলীয়া কাদেরিয়া'র পথ প্রদর্শন। গাউসে পাক উক্ত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে নেতৃত্ব দিয়ে এবং সংস্কার করে দ্বীনকে পুর্নজীবন দিয়ে গেছেন- যা পরবর্তীতে তাঁর প্রতিনিধি তথা খলীফাগণের পরিচর্যায় দুনিয়ার দেশে দেশে অনুসৃত ও প্রদর্শিত হয়ে দ্বীন ইসলামের সংরক্ষণ ও পরিধিবৃদ্ধিকে নিশ্চিত করেছে। বাংলাদেশের মানুষ বিংশ শতাব্দিতে, গাউসে পাকের যে প্রতিনিধির সংস্পর্শে এসে সুন্নিয়াত ও ত্বরীক্বতের আলোকে অধিকতর আলোকিত হয়েছেন তিনি শাহানশাহে সিরিকোট, পেশ্ওয়ায়ে আহলে সুন্নাত এবং 'সৈয়্যদুল আউলিয়া' হিসেবে হিসেবে। তিনি হলেন আল্লামা হাফেয ক্বারী সৈয়্যদ আহমদ শাহ সিরিকোটী পেশোয়ারী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি। বর্তমান পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে দরবারে আলীয়া ক্বাদেরিয়া, সিরিকোট শরীফ তাঁর ঠিকানা।

সেখানেই ১৮৫৬-৫৭'র দিকে তাঁর জন্ম এবং ১৯৬১ সনে (১১ জিলক্বদ ১৩৮০হিজরি) ইন্তিক্বাল করেন। রাসুল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র ৩৯ তম অধঃস্তন পুরুষ সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটী তাঁর পূর্বপুরুষ আহলে বায়তদের অনুসরণে মাতৃভূমির মায়া ত্যাগ করে দ্বীনের মশাল হাতে নিয়ে প্রথমে হিজরত করেন দক্ষিণ আফ্রিকায়। সেখানেই স্থানীয় কৃষ্ণাঙ্গ বিধর্মীদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের সাথে সাথে নবদীক্ষিত মুসলমানদের ইবাদতের জন্য ১৯১১ সনে সেখানকার প্রথম জামে মসজিদ নির্মাণ করেন। শুধু তাই নয়, পারস্য থেকে একদল শিয়া ধর্ম প্রচারক তাদের ভ্রান্ত মতবাদ প্রচারে গিয়েছিলো সেখানে, কিন্তু হযরত সৈয়্যদ আহমদ পেশোয়ারী'র নেতৃত্বে সেখানে সুন্নিয়াতই শুধু স্থান পায় এবং শিয়া সম্প্রদায় প্রভাব বিস্তারে ব্যর্থ হয় (Dr. Ibrahim M Mahdi, A Short history of the Muslims in South Africa) গাউসে পাক যেভাবে ইসলামের মূলধারা সুন্নিয়াতকে শিয়া ইত্যাদি মতবাদের কবল থেকে রক্ষা করেছিলেন ঠিক তেমনি সিরিকোটী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হিও আফ্রিকায় বাতিল সম্প্রদায়ের মূলোৎপাটনের মাধ্যমে তাঁর দ্বীন প্রচারের কর্মসূচি শুরু করেন জীবনের প্রথম ভাগে। এরপরই তিনি গ্রহণ করলেন গাউসে পাক প্রতিষ্ঠিত সিল্সিলাহ্ -এ আলিয়া ক্বাদেরিয়া'র শিষ্যত্ব। তাঁর পীর-মুর্শিদ গাউসে দাওরাঁ হযরত খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি'র খিদমতে তিনি নিজের আমিত্ব, অহঙ্কার বিসর্জন দিয়ে ত্বরীকতের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে খেলাফত লাভে ধন্য হন এবং পীরের নির্দেশে সুন্নীয়ত ও ত্বরীকতের এ মিশন হাতে নিয়ে ১৯২০ সনে তশরীফ নিয়ে যান সুদূর রেঙ্গুনে।

দীর্ঘ দুই দশকের রেঙ্গুন জীবন (১৯২০-১৯৪১) -এর এক পর্যায়ে তিনি তাশরীফ আনলেন বাংলাদেশে। এখানে তিনি এই মিশনের জন্য কাজ করেন ১৯৩৫-১৯৬১ অর্থাৎ জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত। ১৯২৫ সনে তাঁর পীর সাহেব হযরত খাজা চৌহরভী'র ইন্তেকালের পর থেকে স্বদেশের হরিপুরে প্রতিষ্ঠিত 'দারুল উলুম রহমানিয়া' (১৯০২) কে তিনি একটি পূর্ণাঙ্গ দ্বীনি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। এ বছর (১৯২৫) থেকেই তিনি আপন পীরের প্রধান খলিফা হিসেবে শরিয়ত ও ত্বরীকতের পূর্ণাঙ্গ দায়িত্ব প্রাপ্ত হন এবং এ দায়িত্বকে যথাযথভাবে আঞ্জাম দিতে বিশেষতঃ সুন্নীয়তের প্রচার-প্রসার, বাতিল পন্থীদের স্বরূপ উম্মোচন এবং ক্বাদেরিয়া ত্বরীকা প্রতিষ্ঠার মহান দায়িত্ব গাউসুল আ'যম জীলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র পক্ষ থেকে সিলসিলাহ পরম্পরায় তাঁর উপর অর্পিত হয়। এমন কর্মসূচীর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় তাঁর সাধারণ মুরীদ-ভক্তদেরও অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করে তাদের দুনিয়া-আখিরাত উজ্জ্বল করতে, বিশেষত সংশ্লিষ্ট সমাজকে আলোকিত করতে তিনি

রেঙ্গুনে প্রতিষ্ঠা করেন এ সিলসিলাহর প্রথম সংগঠন-'আনজুমানে শূরা-এ রহমানিয়া' (১৯২৫)। এই সংগঠনের ব্যবস্থাপনায় রহমানিয়া মাদরাসা এক বিশাল দ্বীনি মারকাযে পরিণত হয়। বিশেষ করে তাঁর পীর খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি, জীবনে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জনের সুযোগ ছাড়া মাত্র ৭ বছর বয়সে স্বীয় আব্বা হুযুর গাউসে যামান খাজা ফক্বীর মুহাম্মদ খিদ্বরীর স্থলাভিষিক্ত হন, অথচ জীবন সায়াহ্নে এসে এমন এক উচ্চ মানের আরবী ভাষার দরূদ গ্রন্থ লিখে যান, যা এই দুনিয়ায় এক অদ্বিতীয় গ্রন্থ **মজমুয়ায়ে সালাওয়াতে রাসূল** নামে পরিচিত।

আল্লাহ্‌র কালাম আল কুরআন আর রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সহীহ হাদীস সংকলন বোখারী শরীফের পর, এটিই কোনো মানুষের রচিত ৩০ পারা সম্বলিত গ্রন্থ যার প্রতিটি পারায় রয়েছে ৪৮ পৃষ্ঠা করে। আর এ গ্রন্থটি হলো নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সৃষ্টি, যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও গুণাগুণ-জাত-সিফাত এবং আক্বীদা ও আমলের বর্ণনাসহ দুরূদ-সালামের এক অপূর্ব বর্ণনা সম্ভার। আর এ বিরল গ্রন্থটি চার হাজার টাকা ব্যয়ে ছাপিয়ে ছিলো আজ থেকে আশি বছর আগে এ 'শূরা-এ রহমানিয়া'। হুযূরের চট্টগ্রাম আগমনের সাথে সাথে চট্টগ্রামবাসী রেঙ্গুনের মুরীদদের নেতৃত্বে ১৯৩৭ সনে গঠিত হয় 'আনজুমান-এ শূরায়ে রহমানিয়া চট্টগ্রাম শাখা'। এরই ব্যবস্থাপনায় এখানে চলতে থাকে ত্বরীকতের প্রচার-প্রসার এবং রহমানিয়া মাদরাসার সহযোগীতা।

হুযূর ক্বেবলা চট্টগ্রাম এসে দেখলেন খারেজী সম্প্রদায়ের উত্তরসূরীরা এখানে বেশ তৎপর। এরা প্রতিনিয়ত নবী-ই আকরামের দুরূদ-সালাম এবং সম্মান বিরোধী বক্তব্য প্রচার করে মুসলমানদের ঐক্য এবং ঈমান আক্বীদা বিনষ্ট করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। কিন্তু এদের এ ঈমান বিধ্বংসী অপতৎপরতা রুখে দেওয়ার মতো যোগ্যতা সম্পন্ন সাচ্চা আলিম বলতে এক ইমামে আহলে সুন্নাত আল্লামা গাযী শেরে বাংলা ছাড়া তেমন কেউ নেই। তাছাড়া, ভ্রান্তমতবাদীদের প্রাতিষ্ঠানিক মোকাবেলার জন্য বিদ্যমান মাদরাসাগুলোও যথেষ্ট নয়। অধিকন্তু চট্টগ্রামের বাঁশখালীর শেখের খিলে তাঁর এক মাহফিলে তিনি ইন্নাল্লা-হা ওয়ামালা-ই-কাতুহু ইয়ুসাল্লূ-না আলান্নবীয়্যি, এয়া আইয়ুহাল্ লাযী-না আ-মা-নূ সাল্লূ- 'আলায়হি ওয়াসাল্লিমূ- তাসলী-মা' এ আয়াতে করীমা তেলাওয়াতের পর সমবেত স্থানীয় অধিবাসীরা দুরূদ শরীফ তো পড়ে নি; বরং বেয়াদবী করেছিলো। এ ঘটনার পরই হুযূর ক্বেবলা দুরূদ-সালাম বিরোধী নবীর এ দুশমনদের বিরুদ্ধে প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে নির্দেশ দেন এবং চট্টগ্রামের ষোলশহরে ১৯৫৪ সনে প্রথমে 'মাদরাসা -এ আহমদিয়া সুন্নিয়া'র বুনিয়াদ স্থাপন করেন এবং পরে ১৯৫৬ সনে একে অপ্রতিদ্বন্দ্বী সর্বোচ্চ দ্বীনি শিক্ষাকেন্দ্র ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার জন্য উক্ত নামের সাথে 'জামেয়া' (অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়) শব্দটি যোগ করেন। সাথে সাথে বেলায়তী কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, 'কাম করো দ্বীন কো বাঁচাও, ইসলাম কো বাঁচাও, সাচ্চা আলিম তৈয়ার করো।' যে দ্বীন ইসলামকে একদিন বাঁচিয়ে ছিলেন হুযূর গাউসুল আ'যম আবদুল কাদের জীলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু (৪৭০-৫৬১হিজরী) আজ আবারো 'দ্বীন কো বাচাও' ঘোষণা করলেন তাঁরই যুগশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি হযরত সৈয়্যদ আহমদ শাহ সিরিকোটী (১২৭৬-১৩৮০হিজরী) প্রায় নয়শত বছর পরে এই চট্টগ্রামে। তিনি আরো ঘোষণা করলেন- 'মুঝেহ দেখনা হ্যায় তো মাদরাসা কো দেখো, মুঝসে মুহাব্বত হ্যায় তো মাদরাসাকো মুহাব্বত করো।' (আমাকে দেখতে চাইলে মাদরাসাকে দেখো, আমার সাথে ভালবাসা রাখতে চাইলে মাদরাসাকে ভালবাসো।)

তিনি শুধু মাদ্‌রাসা বানিয়েই ক্ষান্ত হন নি বরং প্রত্যেকের মুহাব্বতের পূর্বশর্ত হিসেবে মাদ্‌রাসার মুহাব্বতকেও ঘোষণা করে দিয়েছেন, যাতে মুরীদ-ভক্তগণ দ্বীনি খিদমতে ঝাঁপিয়ে পড়ে দ্বীন রক্ষার অতন্দ্র প্রহরী 'সাচ্চা আলিম' তৈরিতে উৎসর্গিত হয়ে যায়। হয়েছিলোও তাই। ফলে আজ এ জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া দেশের শীর্ষস্থানীয় দ্বীনি প্রতিষ্ঠান এবং সুন্নিয়াতের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

১৯৫৬ সনে আঞ্জুমানে শূরা-এ রহমানিয়াকে করা হলো-'আনজুমানে রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া' নামে। এখন থেকে সুন্নিয়াত ও ত্বরীকতের মিশন ব্যবস্থাপনায় মাঠে নামে এই 'আনজুমানে রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া' যার আজীবন সভাপতি স্বয়ং হুযূর ক্বেবলা।

শাহানশাহে সিরিকোট'র ইন্তিকালের পর হতে আজীবন সভাপতির এ দায়িত্বে আসেন তাঁরই সাহেবযাদা, মাতৃগর্ভের ওলী ন্যামে খ্যাত আল্লামা হাফেয সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যেব শাহ। হুযূর ক্বেবলা তৈয়্যেব শাহ্‌কে ১৯৫৮ সনে এই চট্টগ্রামেই জনসম্মুখে খেলাফত দেওয়া হয় এবং আন্‌জুমানের নীতি নির্ধারণী কমিটির প্রধান হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। সে থেকে গাউসে পাকের এই মিশনের লাগাম থাকে গাউসে যামান সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যেব শাহ'র হাতে, যিনি এই প্রতিষ্ঠানকে এবং এর কর্মসূচীকে দিয়েছেন আরো বেশি ব্যাপকতা। তাঁর হাতে ত্বরীকতভুক্ত হন লক্ষ লক্ষ নারী পুরুষ। তাঁর হাতে প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকার মুহাম্মদপুরের ক্বাদেরিয়া তৈয়্যেবিয়া আলীয়া, চন্দ্রঘোনার (চট্টগ্রাম) তৈয়্যেবিয়া অদুদিয়া সুন্নিয়া এবং হালিশহরের (চট্টগ্রাম) তৈয়্যেবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া' সহ অনেকগুলো মাদরাসা, খানক্বাহ এবং মসজিদ। ফলে, দেশব্যাপী ছড়িয়ে থাকা তাঁর লক্ষ লক্ষ মুরীদ

ভক্তদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি হলো মাদ্রাসার খেদমত করার মাধ্যমে 'সাচ্চা আলেম তৈরির নির্দেশ পালনের। হুযূর ক্বেবলা তৈয়্যব শাহর নির্দেশে ১৯৭৬ সনের ১৬ ডিসেম্বরে এক সভায় 'তরজুমান' নামে একটি মাসিক পত্রিকা চালুর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৭৫ সন থেকে তাঁরই নির্দেশে শুরু হয়েছে চট্টগ্রামসহ সারা বাংলাদেশে 'জশনে জুলুছে ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মতো একটি শরীয়ত সম্মত বর্ণাঢ্য মিছিলের কর্মসূচী; যাতে আজ লক্ষ লক্ষ মানুষ শামিল হয়ে এ শতাব্দির শ্রেষ্ঠ সংস্কারকে স্বীকৃতি দিচ্ছে। বিশেষ করে গাউসে পাক'র স্মরণে প্রতি মাসের গেয়ারভী শরীফ এবং খতমে গাউসিয়া শরীফসহ আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি'র যুগান্তকারী মসলকে আ'লা হযরত প্রচার-প্রসারের যে যাত্রা হযরত সিরিকোটী হুযূরের হাতে শুরু হয় তা তাঁর হাতে লাভ করে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা। মোট কথা ১৯৮৬ পর্যন্ত সময়ের মধ্যেই গাউসে পাকের এই কাফেলায় শামিল হয় দেশ-বিদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ। দেশের আনাচে কানাচে চলতে থাকে এ মিশনের কার্যক্রম। এ বিশাল কর্মী বাহিনীকে একটি সাংগঠনিক শৃঙ্খলায় আবদ্ধ করে, দ্বীনের সাহায্যের কাজে নিয়োজিত করে তাদের সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য গাউসে যামান তৈয়্যব শাহ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি ১৯৮৬ সনে নির্দেশ দিলেন 'গাউসিয়া কমিটি' প্রতিষ্ঠা করতে।

এরই বাস্তবায়নে 'গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠিত হলো। দেশব্যাপী এমন কি সুদূর মধ্যপ্রাচ্য পর্যন্ত এটা ব্যাপৃত হলো। বর্তমানে এর লক্ষ লক্ষ কর্মী-সমর্থকদের হাতে এলাকায় এলাকায় পরিচালিত হচ্ছে সুন্নিয়াত প্রচার, বাতিলের পথরোধ এবং ক্বাদেরিয়া ত্বরীকা প্রতিষ্ঠার শান্তিপূর্ণ কর্মকাণ্ড।

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ

একটি সমাজ সংস্কার মূলক অরাজনৈতিক আন্দোলন। সমাজ সংস্কারের পূর্বশর্ত হলো ব্যক্তি সংস্কারমূলক পদক্ষেপ; অর্থাৎ যারা এই সমাজ সংস্কারে নেতৃত্ব দেবে প্রথমে তাদের আত্মশুদ্ধি নিশ্চিতকরণ। এজন্যে গাউসিয়া কমিটির পরিকল্পনা হলো- ১. গাউসুল আ'যম জিলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র সিল্‌সিলাহর কামিল প্রতিনিধির হাতে বায়'আত ও সবক গ্রহণের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির এ পাঠশালায় অন্তর্ভুক্তকরণ। ২. গাউসিয়া কমিটির সদস্য বানিয়ে তাদেরকে এমন প্রশিক্ষণ দেওয়া, যাতে তারা ধীরে ধীরে আমিত্ব, হিংসা বিদ্বেষ, লোভ-লালসা ও অহঙ্কারমুক্ত পরিচ্ছন্ন মানুষ হিসেবে পরিণত হয়। ৩. সুন্নীয়তের আক্বীদা এবং ভ্রান্ত মতবাদ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির সাথে সাথে উভয় বিষয়ে প্রয়োজনীয় মৌলিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে নেতৃত্বের উপযোগী কর্মি হিসেবে গড়ে তোলা।

৪. সুন্নীয়ত ও ত্বরীকতের দায়িত্ব পালনে, বিশেষতঃ মাদরাসা, আনজুমান এবং মুর্শিদে বরহক্বের নির্দেশের প্রতি আস্থাশীল এবং মুর্শিদের বাতলানো পথে নিবেদিত হয়ে নবী প্রেমিক এবং খোদাপ্রাপ্তির পথ সুগম করার অনুশীলনে নিরলসভাবে এগিয়ে চলার শপথ গ্রহণ করা।

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যে গড়ে উঠা গাউসিয়াতের কর্মী বাহিনীর হাতে এ সমাজের পরিশুদ্ধির দায়িত্ব ছেড়ে দিতে পারলেই নিশ্চিত হওয়া যাবে সমাজ সংস্কারের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে যাওয়া। কারণ বর্তমানে এ সমাজ, রাষ্ট্র এবং সমগ্র বিশ্বে অশান্তির পেছনে যে কারণটি প্রধান তা তাহলো অযোগ্য, অশুদ্ধ, লোভী, হিংসুক, অহংকারী এবং দাম্ভিক ব্যক্তিদের নেতৃত্বে সমাজ রাষ্ট্র পরিচালিত হওয়া। বদ-আক্বীদা এবং ক্বোরআন সুন্নাহ বিরোধী শিক্ষা ও চেতনাসম্পন্ন নেতারা সমাজকে ধীরে ধীরে জাহেলিয়াতের দিকেই নিয়ে গিয়েছে। তাই জাহেলিয়াত দূর করে আবারো ইসলামের দিকে এ সমাজকে যারা নিয়ে আসবে, আগে তাদেরকে গড়ে তুলতে হবে আলোকিত মানুষ হিসেবে। এ আলোকিত নেতাদের বাতি থেকে হাজার হাজার বাতি প্রজ্জ্বলিত হয়ে সমস্ত অন্ধকার দূর হবে। তাই, গাউসিয়া কমিটির পরিকল্পনা হলো প্রথমে পরিশুদ্ধ নেতা সৃষ্টি করা এবং পরে তাদের দিয়ে সমাজ শুদ্ধি করণ নিশ্চিত করা।

সিলসিলাহ্‌র মাশায়েখ হযরাত প্রদত্ত ফজর, মাগরিব এবং এশা নামাজান্তে পঠিতব্য সবক জিকির, দরূদ ও সালাতে আওয়াবীন আদায় করা হয় নিজের আত্মার উন্নয়নের জন্য, আর গাউসিয়া কমিটির কর্মসূচি বাস্তবায়নের সবক ও নির্দেশ হলো সমাজের বহুমুখী উন্নয়নে। হযরত সৈয়্যদ আহমদ শাহ সিরিকোটী তাঁর পীর খাজা চৌহরভীর খিদমতে খোদা তালাশের জন্য পাহাড়ে জঙ্গলে ইবাদতে মশগুল হবার অনুমতি চেয়েছিলেন, কিন্তু পান নি; বরং পীর সাহেব ক্বেবলা বলেছিলেন, একা একা খোদা তালাশের চেয়ে সমাজের অন্যান্য মানুষকে পথ দেখানোর কাজে নিয়োজিত থাকা অনেক উত্তম। সাথে সাথে নির্দেশ দেওয়া হলো রেঙ্গুনে গিয়ে মানব সেবা ও দ্বীনি সংস্কারে নেতৃত্ব দিতে। সে নির্দেশ তিনি ১৯২০ থেকে ১৯৫৮ পর্যন্ত রেঙ্গুন ও বাংলাদেশে যথাযথভাবে পালন করেছেন। আর সেই একই মিশনের এক একজন কর্মী হবার সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছে 'গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ'র সদস্যদের। সুতরাং বুঝতে হবে যে, গাউসে পাক শায়খ আবদুল ক্বাদের জীলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যেভাবে দ্বীনের পুনর্জীবনের জন্য শ্রেষ্ঠ মুজাদ্দিদ হিসেবে এসেছিলেন ঠিক তেমনি তাঁর এ মিশনের যুগশ্রেষ্ঠ খলীফা শাহানশাহে সিরিকোটী এবং গাউসে যামান তৈয়্যব শাহ'র আগমনও হয়েছে দ্বীনি সংস্কারের মাধ্যমে এ সমাজ শুদ্ধি আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে। গাউসিয়া কমিটির সদস্যগণ হলেন এ

আন্দোলনের এক এক পর্যায়ের এক এক জন নিবেদিত প্রাণ সৈনিক। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর বন্ধু আউলিয়ায়ে কেরাম সম্পর্কে বলেছেন,

'আলা--- ইন্না আউলিয়া-আল্লাহি লা-খাওফুন 'আলাইহিম ওয়ালা-হুম ইয়াহযানূ-ন, আল্লাযী-না আ-মানূ ওয়া কা-নূ ইয়াত্তাকূন, লাহুমুল বুশরা- ফিল হায়া-তিদ্ দুনিয়া ওয়া ফিল আ-খিরাহ্।

তরজমাঃ জেনে রাখ! নিশ্চয়ই ওলীগণের কোন ভয় নেই এবং দুঃখও নেই। যাঁরা ঈমান এনেছে এবং পরহেযগারী অবলম্বন করেছে, তাদের জন্য দুনিয়া এবং আখিরাতে রয়েছে সুসংবাদ । [আল-ক্বোরআন]

যাদের ঈমান আক্বীদা এবং আমলী যিন্দেগী পরিশুদ্ধ ও উত্তম তাঁরাই আল্লাহর বন্ধু তাঁদের দুনিয়া এবং আখিরাতে রয়েছে অভয়, সুখ আর সুসংবাদ।

গাউসিয়া কমিটি এমন একদল মানুষই সৃষ্টি করতে চায়- যারা ঈমান আক্বীদা, তাক্বওয়া অর্জন এবং প্রতিষ্ঠায় অপ্রকাশ্য শত্রু নাফ্সে আম্মারার এবং সামাজিক শত্রু বাতিল সম্প্রদায়ের সাথে যুগপৎ জেহাদে নিয়োজিত সাহসী সৈনিক হিসেবে কাজ করবে। তারা একদিকে ক্বাদেরিয়া ত্বরিকাভুক্ত এবং অন্যদিকে গাউসিয়াতের সামাজিক আন্দোলনের কর্মী হবার কারণে স্বয়ং গাউসুল আ'যম দস্তগীরের পক্ষ থেকেও অভয় বাণী ও সুসংসাদ পেয়েছেন। গাউসে পাক তাঁর এমন মুরীদদের উদ্দেশ্যে বার বার বলেছেন-মুরীদি লা-তাখাফ' অর্থাৎ 'হে আমার মুরীদ! ভয় করো না'। একদিকে আল্লাহর অভয় বাণী, অন্যদিকে এই মিশনের মহান ইমাম গাউসুল আ'যমের 'অভয়বাণী' সংগঠনের কর্মীদের প্রাণচাঞ্চল্যে এনেছে বাঁধভাঙ্গা জোয়ার। এ জোয়ারই একদিন সব বাতিলের ভিত ভেঙ্গে চুরমার করে দেবে। কারণ, আল্লাহপাক ঘোষণা করেন-

'ওয়াকূল জা----আল হাক্বক্কু ওয়া যাহাক্বাল বাতিল, ইন্নাল বা-ত্বিলা কা-না যাহূ-ক্বা'- ।

তরজমাঃ বলুন! সত্য সমাগত, মিথ্যা অপসৃত, নিশ্চয়ই মিথ্যা অপসৃত হবারই।' [আল-ক্বোরআন]

সত্যের নিশান হাতে এ ক্বাফেলার সফলতা অব্যাহত থাকবে-ইন্শাআল্লাহু তা'আলা। শাহানশাহে সিরিকোট ও হুযূর ক্বেবলা তৈয়্যেব শাহ্ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হিও এ ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন । তা থাকবেও না কেন? এ কাফেলা তো 'গাউসুল আ'যম'-এর কাফেলা । হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নির্বাচিত উজির হিসেবে খোলাফা-ই রাশেদীন, হযরত হাসানাঈন-ই করীমাঈন, হযরত হাসান আসকারী হয়ে হুযূর গাউসুল আ'যম জীলানী দস্তগীর হয়ে ইমাম মাহদীর শুভাগমন পর্যন্ত বরং ক্বিয়ামত পর্যন্ত

'গাউসিয়াত-ই কুব্রার ছায়া ধারাবাহিকভাবে একটি সত্যের কাফেলার উপর থাকবেই । সিহা সিত্তার হাদীস শরীফের ঘোষণানুসারে ক্বিয়ামত পর্যন্ত ওই সত্যপন্থী কাফেলা (জমা'আত)ই সব সময় বিজয়ী থাকবে । [ইবনে মাজাহ শরীফ]

এটা ওই গাউসে আ'যম দস্তগীর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর কাফেলা, যাঁর গর্দান শরীফ আল্লাহর সমস্ত ওলীর গর্দানের উপর, যাঁর পৃষ্ঠ মুবারক হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর রফরফ শরীফ । সুতরাং গাউসিয়া কমিটি যেন ধারাবাহিকভাবে অগ্রসর হয়ে একদিন ইমাম মাহদী আলায়হিস্ সালাম-এর ফৌজ হিসেবে দ্বীন ও মাযহাব প্রতিষ্ঠা করবে, নিরাপদ থাকবে দাজ্জালসহ সব ধরনের ফিৎনা থেকে । বর্তমানে তো 'গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ' নামের এ সংগঠনটির প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় রয়েছেন গাউসে পাকের দু'জন সুযোগ্য নায়েব আমাদের হুযূর কেবলা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ সাহেব ও হুযূর ক্বেবলা সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবের শাহ্ সাহেব ক্বেবলা ।

সুতরাং আসুন, গাউসিয়া কমিটির সদস্য হোন! কমিটির বরকতময় কর্মসূচীগুলো বাস্তবায়ন করুন! এর মাধ্যমে জামেয়া, আঞ্জুমান, অগণিত দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু পরিচালনার নিরেট দ্বীনী কর্মসূচীগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে উভয় জাহানের কামিয়াবী হাসিল করুন!

হুযূর কেবলা তাহের শাহ'র আধ্যাত্মিক প্রেরণা এবং পীর সাবের শাহ্'র মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন নেতৃত্বে এ কাফেলা এগিয়ে চলছে দেশ থেকে দেশান্তরে কাল থেকে কালানান্তরে । তারা নির্ভয়ে এগিয়ে চলবে সকল বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করে, কারণ খোদ্ গাউসুল আ'যম জীলানী তাদের অভয় দিয়েছেন, 'হে আমার মুরীদ ভয় করো না!'

সমাজ ও দ্বীনি সংস্কার

আত্মশুদ্ধি ও আত্ম প্রতিষ্ঠ যোগ্য কর্মিদের নিয়েই খিদমতের মাধ্যমে সমাজের সংস্কারের মহাব্রত পালনে এগিয়ে আসতে হবে। নিজে বাঁচ-তারপর পরিবারকে বাঁচাও, এ কুরআনী নির্দেশ অনুসরণ করে নিজ পরিবার, প্রতিবেশি, আত্মীয়স্বজন সহ সমাজের অন্যান্য মানুষের কাছে সত্য ও শান্তির বানী পৌঁছিয়ে দেওয়াই এই মিশনের লক্ষ্য। এই লক্ষ্যের সর্বোচ্চ অর্জন নির্ভর করে এক ঝাঁক প্রশিক্ষিত 'দায়ী' (দাওয়াত দাতা)'র নিরন্তর প্রয়াস এবং যুগোপযোগি কর্মকৌশল নির্ধারণের উপর। আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু এ সম্পর্কে এরশাদ করেন- 'উদ্‌উ ইলা সাবিলে রাব্বিকা বিল হিকমতে ওয়াল মাউয়েজাতুল হাসানা'-অর্থাৎ তোমরা মানুষকে আল্লাহর রাস্তায় ডাক হিকমত (কৌশল) সহকারে এবং উত্তম উপস্থাপনার মাধ্যমে' (আল-কুরআন)।

আর তাই হিকমত ও উত্তম উপস্থাপনা শিক্ষা দিতে দরকার নিয়মিত কর্মি প্রশিক্ষণ। যে যত বেশি তাই শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ আয়ত্ব করে তা কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ সাফল্য দেখাতে পারবে-তাকে ততবেশি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নেতৃত্বের জন্য মনোনীত করতে হবে। এভাবে সুন্দর কর্মকৌশল ও কর্মসূচির উপর ভিত্তি করে আদর্শ কর্মি বাহিনীর রুটিন ওয়ার্কগুলোর অতিসংক্ষেপ রূপরেখা হবে নিম্নরূপ।

দাওয়াত- দাওয়াতী দায়িত্ব পালনকারীরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত। বলা হয়েছে- 'কুনতুম খায়রা উম্মতি উখরেজাত লিননাস তা মুরুনা বিল মারূফি ওয়াতান হাওনা আনিল মুনকার'। এ আয়াতে এ সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের শ্রেষ্ঠ উম্মত বলা হয়েছে-যারা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎকাজ হতে বিরত রাখার কাজে নিয়োজিত। আর একাজে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ হলেন স্বয়ং আল্লাহর প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম। কুরআনে করিমে যাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে-' ইন্না আরসাল নাকা শাহেদাঁও ওয়া মুবাশ্বেরাঁও ওয়ানাযিরা ওয়া দায়ীয়ান ইলাল্লাহে বেইজনিহি ওয়া সেরাজাম মুনীরা'- অর্থাৎ হে হাবিব! আমি আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী (হাজির-নাজর), সুসংবাদদাতা এবং ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে দাওয়াতদাতা হিসেবে এবং উজ্জ্বল আলোকবর্তিকারূপে।[আল কুরআন]

যুগে যুগে অন্যান্য নবী রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং আহলে বাইত-অলিআল্লাহগণ 'দায়ী'র দায়িত্ব পালন করে এ পৃথিবীতে শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালিয়েছেন। তাই এ দায়িত্ব মূলত নবী আলাইহিস্ সালামগণের দায়িত্ব যা পালনের সুযোগ লাভ আমাদের জন্য সৌভাগ্যই বটে। এজন্য হুজুর ক্বেবলা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ মাদ্দাজিল্লুহুল আলী একবার ঢাকা মুহাম্মদপুরস্থ কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া আলীয়া মাদরাসাস্থ খানকা শরীফের হুজরায়-গাউসিয়া কমিটির খিদমদ সম্পর্কে (এ অধমকে) বলেছিলেন- 'শুকরিয়া আদা করো কে আপ লোক আম্বিয়া আলাইহিস্ সালাম কা ডিউটি মে দাখেল হ্যায়'। অবশ্য এর সাথে সাথে একথাও বলেছিলেন যে-এ দায়িত্বকে যে যতটুকু কদর করবে (সম্মানের সাথে পালন করবে), সে ততটুকু ফায়দা লাভ করবে, আর বেকদরীর পরিণতিতে অর্থাৎ এ সুযোগের সদ্ব্যবহার না করলে তা কেড়ে নিয়ে অন্যকে দেওয়া হবে। শুধু তাই নয়- হুজুর কেবলা তৈয়্যব শাহ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলতেন- 'বাজি আগর চাহে তো সুকনা লাকড়ি সে ভি কাম লে সেকতা'। সুতরাং এ দায়িত্ব পালনকারী কোন নেতা-কর্মির আমিত্ব-অহমিকা বরং তার নিজের জন্যই বিপদজনক হবে। কারণ, আমাদের 'সাহেবে কাশফ' মাশায়েখগণ যে কোন অনুপযুক্ত ব্যক্তি (শুকনা লাকড়ি) কে দিয়ে অধিকতর কাজ আদায়ের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন। তাই এ সংগঠনের দায়িত্ব প্রাপ্ত যোগ্য 'দায়ী' (দাওয়াতদাতা) আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে বদ্ধপরিকর। দাওয়াতের কয়েকটি ধরণ নিম্নরূপ:

গাউসিয়া তারবিয়াতি মজলিস

এ মজলিসে পঠিতব্য সিলেবাসভিত্তিক অনবদ্য গ্রন্থ হলো পবিত্র ক্বোরআনের তাফসীর ও 'কান্‌যুল ঈমান' ও হাদীস শরীফের ব্যাখ্যা মিরআত শরহে মিশ্‌কাত'। তারপর 'গাউসিয়া তারবিয়াতি নেসাব'। স্থানীয় গাউসিয়া কমিটি কিংবা বিদ্যমান পীরভাই বা শুভাকাঙ্খীদের উদ্যোগে ডাকা হবে এ মজলিশ। এতে দাওয়াত দেওয়া হবে সে সমাজের অন্যান্যদের। প্রতি সপ্তাহের সুবিধাজনক দিবস ও সময়ে এ মজলিশ কায়েম করতে সক্ষম হলে এক বা দুই বছরের মধ্যে কোন এলাকায় এই কিতাব খতম করা সম্ভব হবে। কোন এলাকায় এর খতম উপলক্ষে একটি আড়ম্বরপূর্ণ মাহফিলও আয়োজন করা যেতে পারে। এ মাহফিলে সর্বোচ্চ অংশ গ্রহণকারী এবং জ্ঞান আহরণকারী ব্যক্তিদের বাছাই করে পুরস্কৃত করা যেতে পারে। সংগঠনের যে শাখা এ আয়োজনে যতবেশি সাফল্য দেখাতে পারবে তাদের কেন্দ্রীয়ভাবে পুরস্কারের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে- যা এই শিক্ষা প্রশিক্ষণ কর্মশালার সফল বিস্তারের সহায়ক হতে পারে। কর্মিদের মধ্যে যারা এ নেসাব আয়ত্ব করবে তাদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নেতৃত্বে আনার ব্যবস্থা করতে হবে। 'গাউসিয়া তরবিয়াতি নেসাব' পাঠের মজলিশ কী রূপ হবে তা উক্ত গ্রন্থে বর্ণিত আছে-পরিস্থিতি এবং প্রয়োজনানুসারে একে আরো সুন্দরভাবে সাজানো যেতে পারে।

বিশেষ করে, এ সিলসিলাহর প্রতিটি খতমে গাউসিয়া এবং গেয়ারভী শরীফ মাহফিলের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে এ নেসাব পাঠের মজলিশকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। কখনো স্থানীয় মসজিদ, কখনো স্থানীয় খানকাহ্ কিংবা কারো বাড়ি-ঘর এ কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রতিটি মজলিশে প্রশ্নোত্তর পর্ব রাখা যেতে পারে। যা উপস্থিত সকলের জন্য কল্যাণকর হতে পারে।

বছরে কমপক্ষে একবার দাওয়াতী সপ্তাহ বা দাওয়াতী পক্ষ বা দাওয়াতী মাস ঘোষণা করে সে মাসে ব্যাপক মানুষকে এ তরবিয়াতি মজলিশমুখী করার উদ্দ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। রমযানুল মুবারককে আমরা এ কাজের জন্য সুবিধাজনক সময় মনে করতে পারি।

উল্লেখ্য,'গাউসিয়া তারবিয়াতি নেসাব' যাঁর নিদের্শে রচিত হয়েছে -তিনি হলেন হযরত পীর সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবির শাহ্ মাদ্দাজিল্লুহুল আলী। তিনি 'গাউসিয়া তারবিয়াতি মজলিশ' এর দাওয়াত কার্যক্রমকে **দাওরাহ-ই দাওয়াতুল খায়র** (কল্যাণের পথে আহ্বান) নামকরণ করেছেন। তাঁর পরামর্শ অনুসারে গাউসিয়া কমিটির ভাইয়েরা প্রত্যেক বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব মহল্লার কোন মসজিদে এ

মজলিশ আয়োজন করবেন। এবং এ উপলক্ষে উক্ত মসজিদের মুসল্লি এবং মহল্লার সর্বসাধারণকে বাদ আসর থেকে মাগরিবের আজানের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জনে জনে সাক্ষাৎ করে মজলিশে উপস্থিত থাকার দাওয়াত জানাবে এবং কীভাবে উক্ত মজলিশকে সফলকাম করা যেতে পারে সে সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন- এর কিয়দংশ 'গাউসিয়া তারবিয়াতি নেসাব' গ্রন্থটির শুরুতে প্রদত্ত হয়েছে। সুতরাং 'দাওরাহ্-ই দাওয়াতুল খায়র' কে আমাদের সাংগঠনিক জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচনা করে-এ সংক্রান্ত হুজুর কেবলার উপরোক্ত দিক-নির্দেশনাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে এ কাজে ঝাপিয়ে পড়তে হবে।

সেমিনার-ওয়াজ মাহফিল

বিভিন্ন উপলক্ষে বা বিষয়ে আমরা সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম,ওয়ার্কসপ, আলোচনা, ওয়াজ মাহফিল আয়োজন করে ইসলামের মূলধারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত'র চিন্তা-চেতনা, আক্বিদা-আমল, সংস্কৃতি প্রচার প্রসারে ভূমিকা রেখে আসছি। যা অব্যাহতি রাখা প্রয়োজন। বিশেষত আয়োজনগুলো বিষয় ভিত্তিক গবেষণা মূলক আলোচনা হলে বেশি ফলদায়ক হতে পারে।

ত্বরিকতের দাওরা

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো সিলসিলার দাওরা বিশেষত ত্বরিকতের নতুন ভাই বোনদের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ও নসীহতের ব্যবস্থা করা। এ ধরনের অনুষ্ঠান কোন অঞ্চলে হুজুর কেবলা'র মাহফিল এবং বায়াতী কার্যক্রম সম্পন্ন হবার অব্যবহিত পরেই করতে হয় যাতে নবাগত পীর ভাই-বোনরা তাদের জীবনের এ নতুন আধ্যাত্মিক অধ্যায় সুন্দর ও সহজভাবে গ্রহণ করে অগ্রসর হতে পারে। এ মাহফিলে সিলসিলাহ'র সবক নসীহত, দ্বীনি খিদমত, আনজুমানের আনুগত্য করা এবং খতমে গাউসিয়া,গেয়ারভী শরীফ, মাদরাসা-খানকা পরিচিতি সহ প্রয়োজনীয় করণীয়-বর্জনীয় বিষয়ে শিক্ষা-প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। মাহফিলটি একই সাথে নুতন-পুরাতনদের পরিচিতি ও মিলন মেলা হিসেবে পরিণত হতে পারে। একে আমরা পীর ভাই-বোনদের সম্মেলন নাম দিয়ে প্রতি বছর প্রতিটি কমিটির আওতায় অন্তত একবার আয়োজন করা উচিত বলে মনে করি।

সাচ্চা আলেম তৈয়ার করো

এই সিলসিলাহ'র মুরীদদের প্রতি আমাদের মাশায়েখ হযরতে কেরামের প্রধান বাণী হলো-'কাম করো দ্বীন কো বাঁচাও, সাচ্চা আলেম তৈয়ার করো'। তাই সাচ্চা আলেম তৈরীর লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত জামেয়া আহমাদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া মাদরাসা সহ

আনজুমানে রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া পরিচালিত মাদরাসাগুলোর প্রয়োজনে সর্বাত্মক সহযোগিতা দেওয়া সংগঠনের কর্মিদের অপরিহার্য দায়িত্ব। প্রয়োজন ও সামর্থ অনুসারে নুতন মাদরাসা কায়েমের প্রয়াস চালানো আমাদের অন্যতম দায়িত্ব। শাহেন শাহে সিরিকোট রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেছেন,''মুঝেহ দেখনা হ্যায় তো মাদরাসা কো দেখো, মুঝসে মুহাব্বাত হ্যায় তো মাদরাসা কো মুহাব্বাত করো''। সাচ্চা আলেম তৈরী'র এসব মারকাজগুলোকে যে যতবেশি মুহাব্বাত সহকারে লালন পালন করবে সে ততবেশি ত্বরিকতের সুফল লাভ করবে-এতে কোন সন্দেহ নেই।

খানক্বাহ্ প্রতিষ্ঠা

''মাদরাসা সে আলেম নিকেলতে আউর খানকাহ্সে ওলী নিকেলতে হ্যাঁয়'' মাশায়েখ হযরতের এই বাণী'র সফল বাস্তবায়নে আমাদেরকে মাদরাসা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি খানাকাহ্ প্রতিষ্ঠার বিষয়টিকে ও গুরুত্ব দিতে হবে। সম্ভাব্য সকল উপজেলায় অন্তত একটি খানকাহ্ প্রতিষ্ঠা সিলসিলাহ'র কর্মকাণ্ডকে মজবুত এবং দীর্ঘস্থায়ী করে রাখতে অত্যন্ত জরুরি। আজ এখানে কাল ও খানে করে সিলসিলাহ'র নিজস্ব কর্মকাণ্ড ধরে রাখা সহজ নয়। তাই দরকার নিজস্ব আধ্যাত্মিক মারকাজ 'খানকাহ্ শরীফ'। নিয়মিত খতমে গাউসিয়া, গেয়ারভী শরীফ, তরবিয়াতি মজলিশ, পীর ভাই-বোনদের যোগাযোগ রক্ষা, এমনকি সংগঠনের দফতর হিসেবেও এ প্রতিষ্ঠানটির কোন বিকল্প নেই। মনে রাখতে হবে, এই উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে আগত পীর-দরবেশদের প্রথম প্রতিষ্ঠান ছিল খানকাহ্ নামক আস্তানা। তারপরই মসজিদ, তারপর মাদরাসা। আমাদের 'গাউসিয়া তারবিয়াতি মজলিস'র নিয়মিত আয়োজন এ সব খানক্বাহ্ অন্যতম দায়িত্ব হয়ে ওঠতে পারে। খানক্বাহ্গুলো শরিয়ত-ত্বরীকতের শিক্ষা-প্রশিক্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ছিল আদিকালে- এখনও হয়ে ওঠতে পারে সে ঐতিহ্যের পথ ধরে।

আন্জুমানের আনুগত্য

'গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ মূলত আনজুমানে রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়ার অংগ সংগঠন। তাই সর্বক্ষেত্রে আনজুমানের আনুগত্য করা এবং আনজুমান প্রদত্ত নিয়মিত ও অনিয়মিত, তাৎক্ষণিক কর্মসূচি বাস্তবায়নে ঝাঁপিয়ে পড়া আমাদের দায়িত্ব। শাহানশাহে সিরিকোট বলেছেন, ''আনজুমান চালানা হুকুমত চালানা।'' হুযূর কেবলা তাহের শাহ্ মুদ্দাযিল্লুহুল আলী বলেছেন-' হুকুমত কেলিয়ে ফৌজ কা জরুরত হ্যায়- গাউসিয়া কমিটি আনজুমান কী ফৌজ হ্যায়'। তাই বর্তমানে গাউসিয়া কমিটির প্রত্যেকটি কর্মি আনজুমানের একেকজন ফৌজ বা সৈনিক।

ইনশাল্লাহ্, আমাদের জন্য এমন এক শুভদিন অপেক্ষা করছে- যেদিন এই ফৌজরা মিলিত হবে ইমাম মাহদী আলায়হিস্ সালামের ফৌজদের কাফেলায়। হুজুর গাউসে জামান তৈয়্যব শাহ্ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেছেন- 'মেরে বাচ্চে মাহ্দী আলায়হিস্ সালাম কী ফৌজ বনেঙ্গে আউর দাজ্জাল কে সাথ জেহাদ করেঙ্গ'।

সমাজ সেবা

আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত, মানুষের মৌলিক প্রয়োজন- 'অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা'র ব্যবস্থা করবে সরকার। এরপরও মানুষ-মানুষের জন্য । যেহেতু ত্বরীকত -মানব সেবা'র প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালনকে কেউ উপেক্ষা করতে পারে না। আমরা শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদান রেখে আসছি শুরু থেকেই। বিচ্ছিন্নভাবে আমাদের বিভিন্ন কমিটি দাতব্য চিকিৎসা, অন্ন-বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি সহ সম্ভাব্য সব সেবা মূলক কাজে অংশ নিতে হবে। মানুষকে জাগতিক সেবা দিলে তারা সহজেই আধ্যাত্মিক সেবা নিতে অনুপ্রাণিত হবে- এটাই স্বভাবিক।

জশনে জুলূস ও বার্ষিক মাহফিল

এ শতাব্দির শ্রেষ্ঠ সংস্কার 'জশনে জুলুছে ঈদে মিলাদুন্নবী' সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম। আর এর রূপকার হলেন গাউসে জামান সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি-যিনি এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা। চট্টগ্রামে ১২ রবিউল আউলয়াল এবং ঢাকায় ৯ রবিউল আউয়াল অনুষ্ঠিতব্য জশনে জুলূসকে সর্বাত্মক সফল করার দায়িত্ব আমাদের। এজন্য অন্তত: তিন মাস আগে থেকে প্রস্তুতি নেওয়া দরকার প্রত্যেকটি কমিটিকে। সাথে সাথে স্থানীয়ভাবে প্রয়োজন নতুন নতুন জশনে জুলুছ'র জন্ম দিতে হবে। জেলায় জেলায়, শহরে-বন্দরে, গ্রাম-গ্রামান্তরে ছড়িয়ে দিতে হবে এ সংস্কৃতিকে।

এছাড়া ১১ রবিউল আখির গাউসুল আ'যম শায়খ আবদুল ক্বাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি'র ওরস শরীফ- ফাতেহা-ই এয়াযদাহুম, ১১ জিলক্বদ শাহানশাহে সিরিকোট রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি'র ওরস শরীফ, আর ১৫ যিলহজ্ব গাউসে জামান তৈয়্যব শাহ্ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি'র ওরস শরীফসহ সম্ভাব্য ক্ষেত্রে অন্যান্য সব বার্ষিক আয়োজনের প্রয়াস চালাতে হবে। যেমন মহররম মাসে শোহাদায়ে কারবালা স্মরণে, ২২ জুমাদাল আখিরাহ্ ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র স্মরণে মাহফিল আয়োজন করা যেতে পারে।

প্রকাশনাগুলোর প্রচার- প্রসার

আনজুমানের প্রকাশনাগুলোকে মানুষের হাতে হাতে পৌঁছে দেওয়া আমাদের অন্যতম দায়িত্ব-কর্তব্য। গাউসে দাঁওরা খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি'র লিখিত ৩০ পারা দুরূদ গ্রন্থ মজমুয়ায়ে সালাওয়াতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ইসলামি দুনিয়ার এক বিরল সম্পদ। এটি বর্তমানে বাংলায় উচ্চারণসহ তরজমা হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে পর্যায়ক্রমে। ৩০ পারা ক্বোরআন এবং সহীহ্ বুখারী শরীফের পর ৩০পারা সম্বলিত এমন উচ্চাঙ্গের আধ্যাত্মিক খনির আধার সম্পর্কে এখনো ইসলামি জগত বেখবর বলা চলে। অথচ, এ কেতাবের মধ্যে লুকিয়ে আছে আমাদের সিলসিলাহ'র বিশালতা, গভীরতা এবং রূপ-মাধুর্য।

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৬ তারিখে গাউসে জামান তৈয়্যব শাহ্ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'মাসিক তরজুমান' ১ জানুয়ারী ১৯৭৭ থেকে যাত্রা করে অদ্যাবধি ইসলামের মূলধারার প্রচার-প্রসারে বিশেষ অবদান রেখে আসছে।

'গাউসিয়া তারবিয়াতী নেসাব' শরিয়ত ও তরীক্বতের যাবতীয় মৌলিক জ্ঞান, আক্বিদা, আমল ও আখলাক্ব সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে একজন সত্যিকারের মু'মিন-মুসলমান হয়ে কবরে যেতে হতে পারে আমাদের নিত্যসঙ্গী। সিলসিলাহ'র শাজরা শরীফ প্রত্যেক পীর-ভাই বোনদের মুখস্থ থাকা উচিত। 'আওরাদুল ক্বাদেরিয়াতির রহমানিয়া' গ্রন্থটি সিলসিলাহ'র মাশায়েখ হযরাতে কেরামের দৈনিক ওযীফা সংকলন - যা আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির সোপান হিসেবে কাজে লাগতে পারে। এছাড়া রয়েছে আনজুমানের প্রকাশনা বিভাগের অনেকগুলো নিয়মিত-অনিয়মিত গ্রন্থ- যা মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছানোর দায়িত্ব আমাদেরই। এ আখেরী যুগে ঈমান-ইসলামের সংরক্ষণে এপ্রকাশণাগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। সুতরাং এ প্রকাশনাগুলোর স্বাদ গ্রহণ করে প্রথমত আমরা নিজেরা উপকৃত হবো এবং সাথে সাথে অন্যদেরও উপকৃত করার নিরন্তর প্রয়াস চালাতে হবে।

উপরোক্ত কর্মকাণ্ডগুলোর সাথে সাথে আমাদের রয়েছে গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ'র গঠনতন্ত্রে বর্ণিত কর্মসূচিসমূহ। গঠনতন্ত্রে বর্ণিত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কর্মসূচির আলোকে যুগের দাবী এবং যে কোন পরিস্থিতির প্রয়োজনে কেন্দ্রিয় কমিটি এবং আন্জুমান ট্রাষ্ট'র পরামর্শ, নির্দেশ এবং অনুমোদনক্রমে আরো বহু কার্যক্রম গ্রহণের সুযোগ রয়েছে। আমাদের পৃষ্ঠপোষক তথা দরবারে আলীয়া কাদেরিয়া সিরিকোট শরীফের সাজ্জাদানশীন হযরাতে কেরামের নির্দেশ এবং পরামর্শক্রমে এ সংগঠন এগিয়ে যাবে নিত্য-নতুন খিদমত কৌশল গ্রহণ করে।

এ সাথে উল্লেখ্য যে, এই সংগঠনের কেন্দ্রিয় দফতর বাংলাদেশের চট্টগ্রামে অবস্থিত হলেও কর্মপরিধি বর্তমানে বাংলাদেশ অতিক্রম করে মধ্যপ্রাচ্য সহ বিশ্বের বিভিন্নদেশে সম্প্রসারিত হয়েছে। হযরত বড় পীর গাউসুল আ'যম আবদুল কাদের

জিলানী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি'র গাউসিয়্যতের সমগ্র সীমানা জুড়ে এ মিশনকে পৌঁছিয়ে দেওয়া আমাদের মিশন। গাউসে পাক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন,

বেলাদুল্লাহি মুল্কী তাহ্তা হুকমী
ওয়া ওয়াক্বতি ক্বাবলা ক্বাবলী- ক্বাদ সফা-লী

(ক্বসীদা-ই গাউসিয়া)

ইনশাল্লাহ্ একদিন বিশাল রাজ্যব্যাপী চলবে এ দ্বীনি মিশনের কাজ, যার রূহানী নেতৃত্ব আসবে সে পর্বত শীর্ষের সাজ্জাদানশীন হযরাতের পক্ষ থেকে -গাউসিয়্যতের আদর্শবাহী সে পতাকা পত্ পত্ করে উড়ছে সে পর্বতের শিরোপরি। 'ওয়া আ'লা-মী 'আলা- রা'সিল জেবা-লী।' সত্যিই, আজ সে পর্বত চূড়া থেকেই আসছে গাউসিয়াতের এ মহামিশনের আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব। বর্তমানে এ নেতৃত্বে আছেন হযরত কেবলা তাহের শাহ্ (মু.যি.আ.)। তাঁর সাথে এ এ মিশনের অগ্রযাত্রাকে বেগবান করছেন হযরতুল আল্লামা সাবির শাহ্।

এ প্রসঙ্গে হযরত আল্লামা সিরিকোটি রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি'র ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, 'সাবির শাহ পাকিস্তান কা লিডার হোগা আউর বাঙ্গালকা পীর হোগা'। ইসলাম ও গাউসিয়া কমিটির অগ্রযাত্রায় তাঁর বলিষ্ঠ ভূমিকা ইত্যাদি থেকে শাহানশাহে সিরিকোটের এ মহান ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তবায়ন পরিলক্ষিত হচ্ছে।

আসুন 'গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ'র সদস্য হয়ে এ মহামিশনে নিজেকে শামিল করি। নিশ্চিত করি দুনিয়া আখেরাতের উচ্চতর সম্মান-শান্তি ও কল্যাণ। আ-মী-ন! বেহুরমতে সাইয়্যদিল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

---<>---

কিছু বরকতময় খতম শরীফের বিবরণ

খত্মে গাউসিয়া শরীফ

তারতীব বা আদায় করার নিয়ম

১। **দরূদ তাজঃ** একবার

(۱) درود تاج اک بارا

২। **ইস্তিগ্ফার :** ১১১ বার

আস্তাগ্ফিরুল্লা-হাল্লাযী- লা-ইলা-হা ইল্লা- হুওয়াল্ হাইয়্যুল্ ক্বাইয়্যূ-মু ওয়া আতূ-বু ইলায়হি।

(۲) اَسْتَغْفِرُ اللّٰہَ الَّذِیْ لَآاِلٰہَ اِلَّا ھُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَیْہِ

ایک سو گیارہ مرتبہ ۱۱۱

৩। **দরূদ শরীফ : ১১১** (একশত এগার) বার।

আল্লা-হুম্মা সল্লি 'আলা- সাইয়্যিদিনা- মুহাম্মাদিন্ ওয়া 'আলা- আ-লি সাইয়্যিদিনা- মুহাম্মাদিন্ ওয়া বা-রিক্ ওয়া সাল্লিম্।

(۳) درود شریف ایک سو گیارہ بار ۱۱۱

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی
اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکْ وَ سَلِّمْ.

৪। **সূরা ফাতিহা : ১১** (এগার) বার

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম। "আল্হাম্দু লিল্লা-হি রব্বিল্ 'আ-লামী-ন্। আর্ রহ্মা-নির্ রহী-ম্। মা-লিকি ইয়াওমিদ্ দী-ন্। ইয়্যা-কা না'বুদু ওয়া ইয়্যা-কা নাস্তা'ঈ-ন। ইহ্দিনাস্ সেরা-তল্ মুস্তাক্বী-মা; সিরা-ত্বল্লাযী-না আন্-'আম্তা আলায়হিম্, গায়রিল্ মাগ্দূ-বি আলায়হিম্ ওয়ালাদ্- দ্বোয়া----ল্লীন। আ-মীন।"

(۴) الحمد شریف گیارہ بار ۱۱

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ مٰلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ ۝ اِیَّاکَ نَعْبُدُ وَاِیَّاکَ نَسْتَعِیْنُ ۝ اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْھِمْ ۵ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْھِمْ وَلَا الضَّآلِّیْنَ ۝.

৫। **সূরা আলাম্ নাশ্‌রাহ্ : ১১১** (একশত এগার) বার

বিসমিল্লা-হির্ রহমা-নির্ রহী-ম্। আলাম্ নাশ্‌রাহ্ লাকা সদ্‌রাকা, ওয়া ওয়া দ্বোয়া'না- 'আন্‌কা ভিয্‌রাকাল্ লাযী- আন্‌ক্বাদ্দা যোয়াহ্‌রাকা ওয়া রাফা'না- লাকা যিক্‌রাকা। ফা ইন্না মা'আল্ 'উস্‌রে ইয়ুস্‌রান্। ইন্না মা'আল্ উস্‌রে ইয়ুস্‌রান্। ফা-ইযা- ফারাগ্‌তা ফান্‌সাব্। ওয়া ইলা রব্বিকা ফার্‌গাব্।

(۵) سوره الم نشرح لک ایک سوگیاره بار ۱۱۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۝ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ۝ الَّذِيْٓ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۝ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝ فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝ فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۝ وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ ۝

৬। **সূরা ইখ্‌লাস : ১১১১** (এক হাজার একশ'এগার) বার

কুল্ হুয়াল্লাহু আহাদ্। আল্লা-হুস্ সামাদ্। লাম্ ইয়ালিদ্ ওয়ালাম্ ইয়ূ-লাদ্। ওয়ালাম্ ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান্ আহাদ্।

(۶) سورۂ اخلاص ایک ہزار ایک سوگیاره بار۱۱۱۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۝ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝

৭। **কালিমা-ই তাম্‌জীদ : ৫৫৫** (পাঁচশত পঞ্চান্ন) বার

সুব্‌হা-নাল্লা-হি ওয়াল্‌হাম্‌দু লিল্লা-হি ওয়ালা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আক্‌বার্। ওয়া লা-হাওলা ওয়া লা-ক্কুওয়াতা ইল্লা-বিল্লা-হিল্ 'আলিয়্যিল্ 'আযীম্।

(۷) کلمۂ تمجید پانسوپچپن بار ۵۵۵

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ۔

৮। **হাস্‌বুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল্ ওয়াকীল্; নি'মাল্ মাওলা ওয়া নি'মান্ নাসী-র্**
৫৫৫ (পাঁচশত পঞ্চান্ন) বার

(۸) حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ۔ پانچسوپچپن بار ۵۵۵

৯। **সূরা ফাতিহা : ১১** (এগার) বার

(۹) سورۂ فاتحہ (الحمد شريف) گیاره بار ۱۱

১০। **দুরূদ শরীফ ঃ ১১১** (একশত এগার) বার (পূর্বের নিয়মে)

(۱۰) درود شریف مذکوره، ایک سوگیاره بار۱۱۱

১১। **দোয়া (নিম্নোক্ত) ঃ ১১১** (একশত এগার) বার

সাহ্‌হিল্ ইয়া ইলা-হী 'আলায়না- কুল্লা সোয়া'বিম্ বিহুর্‌মাতি সাইয়্যি-দিল্ আবরা-র।

(۱۱) سَهِّلْ يَا اِلٰهِىْ عَلَيْنَا كُلَّ صَعْبٍ بِحُرْمَةِ سَيِّدِ الْاَبْرَارِ. ایک سوگیاره بار ۱۱۱

১২। **ইলাহী বিহুর্‌মাতি হযরত খাজা শায়খ সুলতান সৈয়্যদ আব্দুল্ ক্বাদের্ জিলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু-** ১১১ (একশত এগার) বার

(۱۲) اِلٰهِىْ بِحُرْمَةِ حَضْرَةِ خَوَاجَه شَيْخ سُلْطَان سَيِّدْ عَبْدُ الْقَادِر جِيْلَانِىْ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ. ایک سوگیاره بار۱۱۱

১৩। **বিরাহ্‌মাতিকা ইয়া আর্‌হামার্ রাহিমীন্ ১১১** (একশত এগার) বার

(۱۳) بِرَحْمَتِكَ يَآ اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ. ایک سوگیاره بار۱۱۱

১৪। **আল্লা-হুম্মা আমীন্।** ১১১ (একশত এগার) বার

(۱۴) اَللّٰهُمَّ اٰمِيْن . ایک سوگیاره بار۱۱۱

(۱۵) يَارَبَّ الْعٰلَمِيْن . ا یکبار

১৫। **ইয়া রব্বাল্ 'আলামীন ১** বার

খত্‌মে গাউসিয়া শরীফের উপরিউক্ত নির্ধারিত তাস্‌বীহগুলো আদায়ের পর হুযূর ক্বিব্‌লা রাহমাতুল্লাহি আলায়হির রাহমাহ্‌র ইরশাদ অনুযায়ী নিম্নোক্ত তাসবীহ্‌সমূহ আদায় করবেন-

ختم غوثیہ شریف کی مذکوره بالا تسبیحوں کو ادا کرنے کے بعد حضور قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق مندرجۂ ذیل تسبیحیں پڑھی جاتی ہیں۔

১। আস্তাগ্‌ফিরুল্লা-হাল্লাযী- লা-ইলা-হা ইল্লা হুয়াল্ হাইয়্যুল্-ক্বাইয়্যূম, ওয়া আতূ-বু ইলাইহি। **১১১** বার

(۱) اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ ایک سوگیاره بار۱۱۱

২। সুব্‌হা-নাল্লা-হি ওয়া বিহামদিহী- সুব্‌হা-নাল্লা-হিল্ আলিয়্যিল্ আযী-মি ওয়া বিহাম্‌দিহী- আস্তাগ্‌ফিরুল্লা-হ্। ১১১ (একশত এগার) বার

(۲) سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهٖ اَسْتَغْفِرُ اللّٰه. ایک سو گیارہ بار ۱۱۱

৩। বিস্‌মিল্লা-হিল্লা-যী- লা ইয়াদ্বুররু মা'আ ইস্‌মিহী- শাইউন্ ফিল্ আরদ্বি ওয়ালা-ফিস্‌সামা-ই ওয়াহুওয়াস্ সামী'উল্ 'আলী-মু। ১১১ (একশত এগার) বার

(۳) بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَايَضُرُّ مَعَ اِسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ. ایک سو گیارہ بار ۱۱۱

☆شجرہ شریف ☆শাজরা শরীফ

☆میلاد شریف ☆ মীলাদ শরীফ

☆آخری مناجات ☆আখেরী মুনাজাত

---<>---

شجرہ شریف سلسلۂ قادریہ عالیہ سریکوٹیہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

یا الٰہی اپنی ذات کبریا کے واسطے
کھولدے دروازۂ رحمت گدا کے واسطے

رحمۃ للعالمین ختم رسل جان جہاں
احمد و حامد محمد مصطفٰے کے واسطے

مشکلیں آسان فرما رنج و غم سب دور کر
صاحب جود و سخا شیر خدا کے واسطے

نور چشم فاطمہؓ یعنی حسین ابن علیؓ
سید الشُّہَدا شہید کربلا کے واسطے

مال و دولت ظاہر و باطن عطا کر غیب سے
شاہ زین العابدین شمع ہدا کے واسطے

حضرت باقر امام عارفین و کاملین
جعفر صادق امام پیشوا کے واسطے

وہ عمل سرزد ہو مجھسے جسمیں ہو تیری رضا
موسیٰ کاظم اور شہ موسیٰ رضا کے واسطے

حضرت معروف کرخی صاحب علم و عمل
سرّی سقطی سراج اولیاء کے واسطے

رزق وافر کرعطا محتاج غیروں کا نہ کر
حضرت جنید سب کے رہنما کے واسطے

خواجۂ بو بکر یعنی جعفر الشبلی ولی
عبد الواحد التمیمی پارسا کے واسطے

فرحت دل بخش علم معرفت سے شاد کر
بو الفرح طرطوسی بدر الدجی کے واسطے

قرشی ہنکاری اور مبارک بو سعید
ہو سعادت زادراہ یوم جزا کے واسطے

سید حسنی حسینی یازدہ اسم عظیم
عبد القادر بادشاہ دوسرا کے واسطے

بے نیازوں میں مجھے کر سرفراز و بے نیاز
شاہ جیلاں محی الدین قدم العلی کے واسطے

قبلۂ عشاق حضرت سید عبد الرزاق
خواجہ بو صالح نظر غوث الوریٰ کے واسطے

حضرت سید شہاب الدین احمد ذوالکرم
شرف دیں یحییٰ بزرگ و پارسا کے واسطے

خواجہ سید شمس دیں محمد باوقار
شاہ علاؤ الدین علی مہ لقا کے واسطے

شاہ بدر الدین حسین عارف اکمل ترین
شرف دین یحییٰ فاروق صفا کے واسطے

خواجہ سید شرف دین قاسم بقاباللہ مقام
سید احمد سرگروہ اتقیاء کے واسطے

خواجہ سید حسین نور جان عارفاں
سید عبد الباسط شاہ اسخیاء کے واسطے

سید عبد القادر ثانی ولیِّ نامدار
سید محمود صاحب باحیا کے واسطے

فانی فی اللہ باقی باللہ شاہ عبد اللہ ولی
شاہ عنایت اللہ صاحب باوفا کے واسطے

حافظ احمد بارہ مولی شیخنا عبدالصبور
گل محمد خاص محبوب خدا کے واسطے

عرف ہے کنگال اور ساری خدائی ہاتھ میں
ایک نگاہ مہر بس ہے دوسرا کے واسطے

خواجہ محمد رفیق عالم علم خدا
شیخ عبد اللہ ولی باصفا کے واسطے

شاہ محمد انور شیخ اکابر نور و نور
آں شہ یعقوب محمد ذوالعطا کے واسطے

قطب عالم غوث دوراں عبدالرحمٰن چھوہروی
انکا صدقہ ہاتھ اُٹھاتا ہوں دعا کے واسطے

معاف کردے اے خدائے دوجہاں میرے گناہ
سید احمد شاہ قطب اولیاء کے واسطے

پاک طینت پاک باطن پاک دل کردے مجھے
حضرت طیب شہ شاہ وگدا کے واسطے

جسم طاہر قلب طاہر روح طاہر دے مجھے
سید شہ پیر طاہر باخدا کے واسطے

ہو میرا ایمان کامل اور ہو روشن ضمیر
سید شہ پیر صابر باضیاء کے واسطے

جس نے یہ شجرہ پڑھا اور جس نے یہ شجرہ سنا
بخش دے سب کو تو جملہ پیشوا کے واسطے

ملاحظہ : شجرہ شریف پڑھنے کے وقت سننے والے صرف آمینُ کہے اور تشہد کی طرح بیٹھے

---<>---

শাজরা শরীফ

সিল্সিলায়ে ক্বাদেরিয়া আলিয়া

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

ইয়া ইলাহী আপ্নি যাতে কিব্রিয়াকে ওয়াস্তে
খোল্দে দর্ওয়াযায়ে রহ্মত্ গদা কে ওয়াস্তে।

রহ্মতুল্লিল্ আলামীঁ খত্মে রুসুল জানে জাঁহা
আহ্মদও হামিদ্ মুহাম্মদ মুস্তফাকে ওয়াস্তে।

মুশ্কিলেঁ আ-সা-ন ফর্মা রঞ্জ ও গম্ সব্ দূর কর্
সাহেবে জূ-দ্ ও সখা শের-এ খোদাকে ওয়াস্তে।

নুরে চশ্মে ফাতিমা ইয়া'নী হোসাইন্ ইব্নে আলী
সৈয়্যদুশ শুহাদা শহীদে কার্বালা কে ওয়াস্তে।

মাল ও দৌলত্ যাহের ও বাতিন্ 'আতা কর্ গায়ব সে
শাহে যায়নুল্ আবেদীঁ শম্'এ হুদাকে ওয়াস্তে।

হযরত বাক্বের্ ইমামে আরিফীন ও কামিলীন্
জা'ফার সাদিক্ব ইমাম পেশ্ওয়াকে ওয়াস্তে।

উয়হ্ আমল্ সর্যদ্ হো মুজ্সে জিসমে হো তেরী রেযা
মূসা কাযেম্ আওর শাহ্ মূসা রেযা কে ওয়াস্তে।

হযরত মা'রূফে করখী সাহেবে ইল্মও আমল্
সারিউস্ সাক্বতী সিরাজে আউলিয়া-কে ওয়াস্তে।

রিয্ক্বে ওয়াফের্ কর্ 'আতা মুহ্তাজ গায়রোঁ কা না কর্
হয্রত জুনাইদ্ সব্কে রাহ্নুমাকে ওয়াস্তে।

খাজায়ে বূ বক্র ইয়া'নী জা'ফারুশ্ শিব্লী ওলী
আব্দুল ওয়াহিদ্ আত্-তামীমী পারসাকে ওয়াস্তে

ফর্হাতে দিল্ বখ্শ এল্মে মা'রিফাত্ সে শাদ্ কর্
বুল্ ফারাহ্ তরতূসিয়ে বদ্রুদ্দোজাকে ওয়াস্তে।

কুরশী হাঙ্কারী আওর্ মোবারক বূ-সা'ঈদ
হো সা'আদাত্ যাদে রাহে ইয়াওমে জাযাকে ওয়াস্তে

সৈয়্যদ হাসানী হোসাইনী ইয়াযদাহ্ ইস্মে আযীম
আবদুল কাদের বাদশাহে দো-সরাকে ওয়াস্তে।

বে নেয়াযূঁ মে মুঝেহ্ কর সর্ফরায ও বেনেয়ায
শাহে জীলাঁ মুহীউদ্দিন কুদ্মূল্ 'উলাকে ওয়াস্তে।

ক্বিব্লায়ে ওশ্শাক্ব হয্রত সৈয়্যদ আব্দুর রায্যাক্ব
খাজা বূ- সালেহ্ নযর্ গাউসুল্ ওয়ারাকে ওয়াস্তে।

হযরত সৈয়্যদ শিহাবুদ্দীন আহ্মাদ্ যুল্করম্
শরফুদ্দীন্ ইয়াহ্ইয়া বুযুর্গও পারসাকে ওয়াস্তে।
খাজা সৈয়্যদ শামছুদ্দীন মুহাম্মদ বা ওয়াক্বার
শাহ্ আলাউদ্দীন আলীয়ে মাহ্লেক্বা-কে ওয়াস্তে।

শাহ্ বদুরুদ্দীন হুসাইন আরেফে আকমাল্ তরীন্
শরফে দ্বীঁ ইয়াহ্ইয়া ফারূক্বে সফাকে ওয়াস্তে।

খাজা সৈয়্যদ শরফে দ্বীঁ ক্বাসেম বক্বা বিল্লাহ্ মক্বাম
সৈয়্যদ আহ্মদ্ সর্গোরোহে আত্‌ক্বিয়াকে ওয়াস্তে।

খাজা সৈয়্যদ হুসাইন্ নূরে জানে আরেফাঁ
সৈয়্যদ আবদুল বাসেত শাহে আস্খিয়াকে ওয়াস্তে

সৈয়্যদ আবদুল ক্বাদের সানী ওলীয়ে নামদার
সৈয়্যদ মাহ্মূদ সাহেব বা-হায়াকে ওয়াস্তে।

ফানী ফিল্লাহ্ বাক্বী বিল্লাহ শাহ্ আব্দুল্লাহ্ ওলী
শাহ্ ইনায়াতুল্লাহ্ ছাহেব্ বা-ওয়াফাকে ওয়াস্তে।

হাফেয্ আহ্মদ্ বারাহ মূলী শাইখুনা আব্দুস সবূর
গুল্ মুহাম্মদ খাস্ মাহ্বূবে খোদাকে ওয়াস্তে।

ওর্ফ হ্যায় কাঙ্গাল আওর সারী খোদাঈ হাত মে
এক্ নেগাহে মেহ্রে বস্ হ্যায় দোসরাকে ওয়াস্তে

খাজা মুহাম্মদ রফীক্ব আলিমে ইল্মে খোদা
শাইখ্ আবদুল্লাহ্ ওলীয়ে বা-সফাকে ওয়াস্তে।

শাহ্ মুহাম্মদ আন্ওয়ার শাইখে আকাবের নূরও নূর
আঁ শাহ ইয়া'ক্বুব মুহাম্মদ যুল্ 'আতাকে ওয়াস্তে।

ক্বুত্ববে আলম্ গাউসে দাওরাঁ আব্দুর রহ্মান চৌহ্রভী
উন্কা সদ্ক্বা হাত্ উঠাতা হোঁ দু'আ কে ওয়াস্তে।

মাফ কর্দে আয় খোদায়ে দোজাহাঁ মেরে গুনাহ্
সৈয়্যদ আহ্মাদ্ শাহ ক্বুত্ববুল্ আউলিয়াকে ওয়াস্তে।

পাক্ ত্বীনাত্ পাক্ বাতেন্ পাক্ দিল্ কর্দে মুঝেহ্
হযরত তৈয়্যব্ শাহে শাহ ও গদাকে ওয়াস্তে।

জিস্মে ত্বাহের, ক্বল্বে ত্বাহের, রূহে ত্বাহের দে মুঝেহ্
সৈয়্যদ শাহ্ পীর তাহের বা-খোদাকে ওয়াস্তে।

হো মেরা ঈমান কামেল্ আওর হো রওশন্ যমীর
সৈয়্যদ শাহ্ পীর সাবির বা-যিয়াকে ওয়াস্তে।

জিস্নে ইয়ে শাজ্রাহ্ পড়্হা আওর জিস্নে ইয়ে শাজরা সুনা
বখ্শ দে সব্ কো তূ জুম্লা পেশ্ওয়া কে ওয়াস্তে।

---<>---

বিশেষ দ্রষ্টব্য
শাজরা শরীফ পাঠকালে শ্রোতাগণ শুধু **আ-মীন** বলবেন
এবং তাশাহ্হুদের বৈঠকের মত বসবেন

গেয়ারভী শরীফের ফযীলত

'মিলাদে শাইখে বরহক্ব' বা 'ফযায়েলে গাউসিয়া' নামক কিতাবে বর্ণিত আছে যে, গেয়ারভী শরীফের ফযীলত অগণিত; যার বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। তবে মু'মিন-মুসলমান বিশেষ করে গাউসে পাকের আশেকানের অবগতির জন্য কয়েকটি ফযীলত নিম্নে প্রদত্ত হল :

- ➡ যে ব্যক্তি নিয়মিতভাবে প্রতি চাঁদের ১১ তারিখে গেয়ারভী শরীফ আদায় করবে সে অল্প দিনের মধ্যে ধনী ও স্বচ্ছল হবে এবং তার দারিদ্র দূর হবে। যে ব্যক্তি এটাকে অস্বীকার বা ঘৃণা করবে সে দারিদ্রের মধ্যে থাকবে।
- ➡ "তানায্‌যালুর্ রাহ্‌মাতু ইন্‌দা যিক্‌রিস সোয়ালিহীন্"'র বর্ণনা অনুযায়ী, গেয়ারভী শরীফ যেখানে পালিত হয় রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আল্লাহর রহ্‌মত সেখানে অবতীর্ণ হয়।
- ➡ বর্ণিত আছে যে, হযরত গাউসুল আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ১২ই রবিউল্ আউয়াল্‌কে খুব গুরুত্ব সহকারে পালন করতেন। একদিন স্বপ্নে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন- "আমার বারই রবিউল্ আউয়ালের প্রতি তুমি যে সম্মান প্রদর্শন করে আসছ এর বিনিময়ে আমি তোমাকে গেয়ারভী শরীফ দান করলাম।"
- ➡ যে ব্যক্তি এটা পালন করবে সে খায়র ও বরকত্ লাভ করবে এবং পৃথিবীর পূর্ব হতে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত এটা ক্বিয়ামত অবধি জারি থাকবে।
- ➡ যে ব্যক্তি নিয়মিতভাবে এটা পালন করবে সে বিপদ হতে রক্ষা পাবে; দুঃখ ও চিন্তামুক্ত হয়ে সুখ ও শান্তিতে জীবন যাপন করবে।

অতএব, অযূর সাথে জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে সম্মান সহকারে গেয়ারভী শরীফ পালন করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য।

গেয়ারভী শরীফ আদায়ের নিয়ম

ترتیب گیارھویں شریف

দরুদে তাজ শরীফ পাঠের পর, প্রত্যেক তস্‌বীহ ১১ বার করে পড়বেন

درود تاج شریف پڑھنے کے بعد ہر تسبیح گیارہ مرتبہ پڑھی جائے

১। বিসমিল্লাহির্ রাহ্‌মানির্ রাহিম ১১ বার।

(۱) بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ گیارہ بار!!

২। আস্তাগ্‌ফিরুল্লাহাল্লাযী লা-ইলাহা ইল্লা হুয়াল্ হাইয়্যূল্ ক্বাইয়্যূম্ ওয়া আতূবু ইলাইহি। ১১ বার।

(۲) اَسۡتَغۡفِرُ اللّٰہَ الَّذِیۡ الخ گیارہ بار!!

৩। দরূদ শরীফ (পূর্ব নিয়মে) ১১ বার।

(۳) درود شریف (مذکورہ) گیارہ بار!!

৪। সূরা ফাতিহা ১১ বার।

(۴) سورہ فاتحہ گیارہ بار!!

৫। সূরা ইখ্‌লাস ১১ বার।

(۵) سورہ اخلاص گیارہ بار!!

৬। আস্-সলাতু ওয়াস্ সালামু আলাইকা সাইয়্যেদী ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ১১বার।

(۶) اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیۡکَ سَیِّدِیۡ یَارَسُوۡلَ اللّٰہِ گیارہ بار!!

৭। আস্-সলাতু ওয়াস্ সালামু আলাইকা সাইয়্যেদী ইয়া হাবীবাল্লাহ্ ১১বার।

(۷) اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیۡکَ سَیِّدِیۡ یَا حَبِیۡبَ اللّٰہ گیارہ بار!!

৮। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ১১ বার।

(۸) لَآاِلٰہَ اِلَّا اللّٰہِ گیارہ بار!!

৯। ইল্লাল্লাহ্ ১১বার। (۹) اِلَّا اللّٰہ گیارہ بار!!

১০। আল্লাহো ১১বার। (۱۰) اَللّٰہُ گیارہ بار!!

১১। আল্লাহূ- ১১ বার। (۱۱) اَللّٰہْ گیارہ بار!!

১২। হু-আল্লাহ্ ১১বার। (۱۲) ھُوَ اللّٰہ گیارہ بار!!

১৩। হু- ১১বার। (۱۳) ھُوْ گیارہ بار!!

১৪। হুওয়াল্লাহুল্ লাযী লাইলাহা ইল্লা হুওয়া ১১বার।

(۱۴) ھُوَ اللّٰہُ الَّذِیۡ لَآاِلٰہَ اِلَّا ھُو گیارہ بار!!

১৫। আল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লাহু ১১ বার।

(۱۵) اَللّٰہُ لَآ اِلٰہَ اِلَّا ھُو گیارہ بار!!

১৬। আল্ লা- ইলাহা ইল্লাহু ১১ বার।

(۱۶) اَنْ لَآاِلٰهَ اِلَّا هُو گیارہ بار ۱۱

১৭। আন্তাল্ হাদী আন্‌তাল্ হক্ব, লাইসাল্ হাদী ইল্লাহু-১১বার।

(۱۷) اَنْتَ الْهَادِیْ اَنْتَ الْحَقّ لَیْسَ الْهَادِیْ اِلَّاهُو گیارہ بار ۱۱

১৮। হাস্‌বী রাব্বী জাল্লাল্লাহ্-১১ বার।

(۱۸) حَسْبِیْ رَبِّیْ جَلَّ اللّٰه گیارہ بار ۱۱

১৯। মা-ফী ক্বাল্‌বী গাইরুল্লাহ্- ১১ বার।

(۱۹) مَافِیْ قَلْبِیْ غَیْرُ اللّٰه گیارہ بار ۱۱

২০। নূর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ্ ১১ বার।

(۲۰) نُوْر مُحَمَّدْ صَلَّی اللّٰه گیارہ بار ۱۱

২১। লা-মা'বূদা ইল্লাল্লাহ ১১ বার।

(۲۱) لَامَعْبُوْدَ اِلَّا اللّٰه گیارہ بار ۱۱

২২। লা মাওজূদা ইল্লাল্লাহ্ ১১ বার।

(۲۲) لَامَوْجُوْدَ اِلَّا اللّٰه گیارہ بار ۱۱

২৩। লা মাক্বসূদা ইল্লাল্লাহ্ ১১ বার।

(۲۳) لَامَقْصُوْدَ اِلَّا اللّٰه گیارہ بار ۱۱

২৪। হুওয়াল্ মুসাওভিরুল মুহীত্বো আল্লাহ্ ১১বার

(۲۴) هُوَ الْمُصَوِّرُ الْمُحِیْطُ اَللّٰه گیارہ بار ۱۱

২৫। ইয়া হাইয়্যু, ইয়া কাইয়্যুম্ ১১ বার।

(۲۵) یَاحَیُّ یَاقَیُّوْمُ گیارہ بار ۱۱

২৬। আস্-সলাতু ওয়াস্ সালামু আলাইকা সাইয়্যেদী ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ১১বার

(۲۶) اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ سَیِّدِیْ یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ گیارہ بار ۱۱

২৭। আস্-সলাতু ওয়াস্ সালামু আলাইকা সাইয়্যেদী ইয়া হাবীবাল্লাহ্ ১১ বার

(۲۷) اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ سَیِّدِیْ یَاحَبِیْبَ اللّٰه گیارہ بار ۱۱

২৮ ইয়া শায়খ্ সুলতান সাইয়্যেদ আবদুল কাদের জীলানী শাইআঁল্লিল্লাহ্১১বার

(۲۸) یَا شَیْخ سُلْطَانْ سَیِّد عَبْدُ الْقَادِرْ جِیْلَانِیْ شَیْئًا لِّلّٰهِ گیارہ بار ۱۱

২৯। দুরূদ শরীফ (পূর্ব বর্ণিত নিয়মে) ১১ বার।

(۲۹) درود شریف مذکورہ گیارہ بار ۱۱

৩০। ক্বসীদায়ে গাউসিয়া শরীফ (পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) ১ বার

(۳۰) قصیدۂ غوثیہ شریف ایک بار

৩১। মিলাদ শরীফ (বর্ণিত নিয়মে)

(۳۱) میلاد شریف (حسب ترتیب)

৩২। যিক্‌র শরীফ : (۳۲) ذکر شریف

(ক) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ১০০ বার (الف) لَآاِلٰهَ اِلَّا اللّٰه سو بار ۱۰۰

(খ) ইল্লাল্লাহ্ ১০০ বার (ب) اِلَّا اللّٰه سو بار ۱۰۰

(গ) আল্লাহু ১০০বার (ج) اَللّٰهُ سو بار ۱۰۰

৩৩। শাজরা শরীফ পাঠ (۳۳) شجرہ شریف پڑھنا

৩৪। আখেরী মুনাজাত (۳۴) آخری مناجات

---<>---

বারভী শরীফ আদায়ের নিয়ম

বারভী শরীফ গেয়ারভী শরীফের মতই; তবে বারভী শরীফে উপরিউক্ত প্রত্যেক তাসবীহ্ ১২ বার করে পড়তে হবে।

ترتیب بارھویں شریف

واضح ہو کہ بارھویں شریف کی ترتیب بعینہ گیارھویں شریف کی ترتیب ہے-صرف بارھویں شریف میں ہر تسبیح بارہ (۱۲) مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔

قصیدۂ غوثیہ شریف

السلام اے نور چشم انبیاء - السلام اے بادشاہ اولیاء

سَقَانِی الْحُبُّ كَأْسَاتِ الْوِصَالِ
فَقُلْتُ لِخَمْرَتِی نَحْوِی تَعَالِ
سَعَتْ وَمَشَتْ لِنَحْوِی فِی كُؤُوْسٍ
فَهِمْتُ بِسُكْرَتِی بَيْنَ الْمَوَالِ
فَقُلْتُ لِسَآئِرِ الْاَقْطَابِ لُمُّوْ
بِحَالِی وَادْخُلُوْا اَنْتُمْ رِجَالِ
وَهُمُّوْا وَاشْرَبُوْا اَنْتُمْ جُنُوْدِی
فَسَاقِی الْقَوْمِ بِالْوَافِی الْمَلَالِ
شَرِبْتُمْ فُضْلَتِی مِنْ بَعْدِ سُكْرِی
وَ لَا نِلْتُمْ عُلُوِّی وَاتِّصَالِ
مَقَامُكُمُ الْعُلٰی جَمْعًا وَّلٰكِنْ
مَقَامِی فَوْقَكُمْ مَازَالَ عَالِ
اَنَا فِی حَضْرَةِ التَّقْرِيْبِ وَحْدِی
يُصَرِّفُنِی وَحَسْبِی ذُوالْجَلَالِ

اَنَا الْبَازِیُّ اَشْهَبُ كُلِّ شَيْخٍ
وَمَنْ ذَا فِی الرِّجَالِ اُعْطِی مِثَالِ
كَسَانِی خِلْعَةً بِطِرَازِ عَـزم
وَتَوَّجَنِی بِتِيْجَانِ الْكَمَالِ
وَاَطْلَعَنِی عَلٰی سِرٍّ قَدِيْمٍ
وَقَلَّدَنِی وَاَعْطَانِی سُؤَالِ
وَوَلَّانِی عَلَی الْاَقْطَابِ جَمْعًا
فَحُكْمِی نَافِذٌ فِی كُلِّ حَالِ
وَلَوْ اَلْقَيْتُ سِرِّی فِی بِحَارٍ
لَصَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِی زَوَالِ
وَ لَوْ اَلْقَيْتُ سِرِّی فِی جِبَالٍ
لَدُكَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ
وَلَوْ اَلْقَيْتُ سِرِّی فَوْقَ نَارٍ
لَخَمِدَتْ وَانْطَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِ
وَلَوْ اَلْقَيْتُ سِرِّی فَوْقَ مَيْتٍ
لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلٰی تَعَالِ
وَمَامِنْهَا شُهُوْرٌ اَوْ دُهُوْرٌ
تَمُرُّ وَتَنْقَضِی اِلَّا اَتَالِ

وَتُخْبِرُنِىْ بِمَا يَأْتِىْ وَيَجْرِىْ
تُعَلِّمُنِىْ فَأَقْصِرُ عَنْ جِدَالِ

مُرِيْدِىْ هِمْ وَطِبْ وَاشْطَحْ وَغَنِّ
وَ افْعَلْ مَاتَشَاءُ فَالْاِسْمُ عَالِ

مُرِيْدِىْ لَاتَخَفْ اللّٰهُ رَبِّىْ
عَطَانِىْ رِفْعَةً نِلْتُ الْمَنَالِ

طُبُوْلِىْ فِى السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ دُقَّتْ
وَ شَاؤُسُ السَّعَادَةِ قَدْ بَدَالِ

بِلَادُ اللّٰهِ مُلْكِىْ تَحْتَ حُكْمِىْ
وَ وَقْتِىْ قَبْلَ قَلْبِىْ قَدْ صَفَالِ

نَظَرْتُ اِلٰى بِلَادِ اللّٰهِ جَمْعًا
كَخَرْدَلَةٍ عَلٰى حُكْمِ اتِّصَالِ

وَكُلُّ وَلِيٍّ عَلٰى قَدَمٍ وَّ اِنِّىْ
عَلٰى قَدَمِ النَّبِىْ بَدْرِ الْكَمَالِ

مُرِيْدِىْ لَاتَخَفْ وَاشٍ فَاِنِّىْ
عَزُوْمٌ قَاتِلٌ عِنْدَ الْقِتَالِ

دَرَسْتُ الْعِلْمَ حَتّٰى صِرْتُ قُطْبًا
وَنِلْتُ السَّعْدَ مِنْ مَوْلَى الْمَوَالِ

فَمَنْ فِىْ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ مِثْلِىْ
وَمَنْ فِى الْعِلْمِ وَالتَّصْرِيْفِ حَالِ

كَذَا ابْنُ الرِّفَاعِىْ كَانَ مِنِّىْ
فَيَسْلُكُ فِىْ طَرِيْقِىْ وَاشْتِغَالِ

رِجَالٌ فِىْ هَوَاجِرِهِمْ صِيَامٌ
وَفِىْ ظُلَمِ اللَّيَالِىْ كَاللَّاٰلِ

نَبِىٌّ هَاشِمِىْ مَكِّىْ حِجَازِىْ
هُوَ جَدِّىْ بِهٖ نِلْتُ الْمَوَالِ

اَنَا الْحَسَنِىْ وَ الْمَخْدَعُ مَقَامِىْ
وَ أَقْدَامِىْ عَلٰى عُنُقِ الرِّجَالِ

وَعَبْدُ الْقَادِرِ الْمَشْهُوْرُ اِسْمِىْ
وَجَدِّىْ صَاحِبُ الْعَيْنِ الْكَمَالِ

اَنَا الْجِيْلِىْ مُحِىُّ الدِّيْنِ اِسْمِىْ
وَ أَعْلَامِىْ عَلٰى رَأْسِ الْجِبَالِ

تَقَبَّلْنِىْ وَلَا تَرْدُدْ سُؤَالِىْ
أَغِثْنِىْ سَيِّدِىْ أُنْظُرْ بِحَالِ

فَحَلِّلْ يَا اِلٰهِىْ كُلَّ صَعْبٍ
بِحَقِّ الْمُصْطَفٰى بَدْرِ الْكَمَالِ

السلام اے نورِ چشم انبیاء
السلام اے بادشاہ اولیاء

ক্বসিদায়ে গাউসিয়া শরীফ

بسم الله الرحمن الرحيم

আস্‌সালাম আয় নূরে চশ্‌মে আম্বিয়া

আস্‌সালাম আয় বাদশাহে আউলিয়া

সাক্বানিল্ হুব্বু কা'সাতিল্ ভিসালী
ফাক্বুল্‌তু লিখাম্‌রাতী নাহ্‌ভী তা'আলী। আস্‌সালাম-

সা'আত্ ওয়া মাশাত্ লি নাহ্ ভী ফী কুউসিন,
ফাহিম্‌তু বি সুক্‌রাতী বাইনাল্ মাওয়ালী। আস্‌সালাম-

ফাক্বুল্‌তু লিসা-ইরিল্ আক্বত্বাবি লুম্মূ,
বিহালী ওয়াদ্‌খুলূ আন্‌তুম্ রিজালী। আস্‌সালাম-

ওয়া হাম্মূ ওয়াশ্‌রাবূ আন্‌তুম্ জুনূদী
ফাসাক্বিল্ কাওমি বিল্ ওয়াফিল্ মালালী। আস্‌সালাম-

শারিব্‌তুম্ ফুদ্বলাতী মিম্ বা'দি সুক্‌রী
ওয়ালা নিল্‌তুম্ উলুওভী ওয়াত্তিসালী। আস্‌সালাম-

মক্বামুকুমুল্ 'উলা জ্বাম্‌আওঁ ওয়ালাকিন্,
মক্বামী ফাউক্বাকুম্ মা যা-লা 'আলী। আস্‌সালাম-

আনা ফি হাদ্বরাতিত্ তক্বরীবি ওয়াহ্‌দী,
ইয়ুসার্‌রিফুনী ওয়া হাস্‌বী যুল্ জালালী। আস্‌সালাম-

আনাল্ বাযিয়্যু আশ্‌হাবু কুল্লি শাইখিন্,
ওয়া মান্‌যা ফির্ রিজালী উ'তী মিসালী। আস্‌সালাম-

কাসানী খিল্ আতান্ বিত্‌রাযি আয্‌মিন্,
ওয়া তাওয়াজানী বিতীজানিল্ কামালী। আস্‌সালাম-

ওয়া আত্বলা'আনী আলা সির্‌রিন্ ক্বাদী-মিন্
ওয়া ক্বাল্লাদানী ওয়া আ'ত্বানী সুআলী। আস্‌সালাম- ও য় া

ওয়াল্লানী আলাল্ আক্বতাবি জ্বাম্‌আন্
ফা হুক্‌মী নাফিযুন্ ফী কুল্লি হালী। আস্‌সালাম-

ওয়া লাউ আল্‌ক্বায়্‌তু সির্‌রী ফী বিহারিন্,
লাসা-রাল্ কুল্লু গাওরান্ ফী যাওয়ালী। আস্‌সালাম-

ওয়া লাও আল্‌ক্বায়্‌তু সির্‌রী ফী জিবালীন্,
লাদুক্কাত্ ওয়াখ্‌তাফাত্ বাইনার্ রিমালী। আস্‌সালাম-

ওয়া লাও আল্‌ক্বায়্‌তু সির্‌রী ফাউক্বা নারিন্,
লাখামাদাত্ ওয়ান্ ত্বাফাত্ মিন্ সির্‌রি হালী। আস্‌সালাম-

ওয়া লাও আল্‌ক্বায়্‌তু সির্‌রী ফাউক্বা মায়্‌তিন্,
লাক্বা-মা বিক্বুদ্‌রাতিল্ মাওলা তা'আলী। আস্‌সালাম-

ওয়ামা মিন্‌হা শুহূরুন্ আও দুহূরুন্,
তামুর্‌রু ওয়াতান্‌ক্বাদ্বী ইল্লা আতালী। আস্‌সালাম-

ওয়া তুখ্‌বিরুনী বিমা ইয়া'তী ওয়া ইয়াজ্‌রী,
ওয়া তু'লিমুনী ফা আক্বসির্ আন্ জ্বিদালী। আস্‌সালাম-

মুরীদী হিম্ ওয়াত্বিব্ ওয়াশ্‌তাহ্ ওয়া গান্নি,
ওয়াফ্‌আল্ মা তাশা-উ, ফাল্ ইসমু আলী। আস্‌সালাম-

মুরীদী লা তাখাফ্ আল্লাহু রব্বী,
আত্বানী রিফ্‌আতান্ নিল্‌তুল্ মানালী। আস্‌সালাম-

তুবূলী ফিস্ সামা-ই ওয়াল্ আরদ্বি দুক্বক্বাত্,
ওয়া শা-উসুস্ সা'আদাতি ক্বদ্ বাদালী। আস্‌সালাম-

বিলাদুল্লাহি মুল্‌কী তাহ্‌তা হুক্‌মী,
ওয়া ওয়াক্বতী ক্বব্‌লা ক্বল্‌বী ক্বদ্ সফালী। আস্‌সালাম-

নাযর্‌তু ইলা বিলাদিল্লাহি জ্বাম্'আন্,
কা খার্‌দালাতিন্ 'আলা হুক্‌মিত্ তিসালী। আস্‌সালাম-

ওয়া কুল্লু ওলিয়্যিন্ আলা ক্বদমিউঁ ওয়া ইন্নী,
আলা ক্বদামিন্ নবী বাদ্‌রিল্ কামালী। আস্‌সালাম-

মুরীদী লা তাখাফ্ ওয়াশিন্ ফা ইন্নী,
আযূমুন্ ক্বাতিলুন্ 'ইন্‌দাল্ ক্বিতালী। আস্‌সালাম-

দারাস্‌তুল্ ইল্‌মা হাত্তা সির্‌তু ক্বুত্ববান্,
ওয়া নিল্‌তুছ্ সা'দা মিম্ মাওলাল্ মাওয়ালী। আস্‌সালাম-

ফামান্ ফী আউলিয়া ইল্লাহি মিস্‌লী,
ওয়ামান্ ফিল্ ইল্‌মি ওয়াত্ তাস্‌রীফি হালী। আস্‌সালাম-

কাযা ইব্‌নুর্ রিফা'ঈ কা-না মিন্নী,
ফা ইয়াস্‌লুকু ফী ত্বরীক্বী ওয়াশ্ তিগালী। আস্‌সালাম-

রিজালুন্ ফী হাওয়াজিরি হিম্ সিয়ামুন্,
ওয়া ফী যুলামিল্ লায়ালী কাল্ লাআলী। আস্‌সালাম-

নাবিয়্যুন হাশেমী মক্কী হেজাযী
হুয়া জাদ্দী বিহী নিল্‌তুল্ মাওয়ালী। আস্‌সালাম-

আনাল্ হাসানী ওয়াল্ মাখ্‌দা' মাক্বামী,
ওয়া আক্বদা-মী 'আলা উনুক্বির্ রিজালী। আস্‌সালাম-

ওয়া আবদুল কাদিরিল্ মাশ্‌হুর ইস্‌মী,
ওয়া জাদ্দী সাহিবুল্ আইনিল্ কামালী। আস্‌সালাম-

আনাল্ জীলী মুহিউদ্দীনি ইস্‌মী,
ওয়া আ'লামী আলা রা'সিল্ জিবালী। আস্‌সালাম-

তাক্বাব্বাল্‌নী ওয়ালা তার্‌দুদ্ সুআলী,
আগিস্‌নী সাইয়্যেদী উন্‌যুর্ বিহা-লী। আস্‌সালাম-

ফাহাল্লিল্ ইয়া ইলাহী কুল্লা স'বিন্,
বিহাক্বক্বিল্ মুস্তফা বাদ্‌রিল্ কামালী। আস্‌সালাম-

---<>---

মিলাদ শরীফ

আ'ঊযু বিল্লাহি মিনাশ্ শায়ত্ব-নির্ রজ্বীম্, বিস্‌মিল্লাহির্ রহ্‌মানির্ রহীম

আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহি ওয়া কাফা, ওয়াস্ সালাতু ওয়াস্ সালামু আলা ইবাদিহিল্‌লাযী নাস্‌তাফা, খা-স্‌সাতান্ আলা হাবীবিনা মুহাম্মাদিনিল্ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। **আম্মা বা'দ** ফাক্বদ্ ক্বা-লাল্লাহু তা'আলা ফী কালামিহিল্ মাজীদ, লাক্বদ্ জা-'আকুম্ রসূলুম্ মিন্ আন্‌ফুসিকুম্, আযীযুন্ আলাইহি মা 'আনিত্তুম্ হারীসুন্ আলাইকুম্ বিল্ মু'মিনীনা রঊফুর্ রহীম্। ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইয়ুসল্লূনা আলান্ নবী। ইয়া আইয়্যুহাল্ লাযীনা আমানূ সল্লূ আলায়হি ওয়া সাল্লিমূ তাস্‌লীমা-- দরূদ শরীফ (আল্লাহুম্মা সল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন্ ওয়া 'আলা আলি সায়্যিদিনা মুহাম্মাদিন্ ওয়া বারিক্ ওয়া সাল্লিম্)।

সালাতুন্ ইয়া রাসুলাল্লাহ্ আলাইকুম
সালামুন্ ইয়া হাবীবাল্লাহ্ আলাইকুম্

দো-আলম কেঁউ না হো ক্বোর্‌বাঁ উসী পর্,
খোদা ভী হ্যায় রেযা জোয়ে মুহাম্মদ। **সালাতুন্ ইয়া-**

কতীলে খন্‌ক্বরে বোররাঁ নেহী দিল্,
মগর্ ক্বোরবানে আব্ রোয়ে মুহাম্মদ। **সালাতুন্ ইয়া-**

ফলক হ্যায় যেরে ফর্‌মানে মুহাম্মদ
বড়ী হ্যায় আর্‌শ সে শানে মুহাম্মদ। **সালাতুন্ ইয়া-**

করেঙ্গে আম্বিয়া মাহ্‌শর মে নাফ্‌সী,
উঠেঙ্গে উম্মতী গোয়া মুহাম্মদ। **সালাতুন্ ইয়া-**

খোদা খোদ্ হ্যায় খরীদারে মুহাম্মদ
খোদা মিলতা হ্যায় বাযারে মুহাম্মদ। **সালাতুন্ ইয়া-**

আবূ বকর ও ওমর ওসমান ও হায়দার,
বেলাশক্ চার হ্যাঁয় ইয়ারে মুহাম্মদ। **সালাতুন্ ইয়া-**

মার্‌হাবা ইয়া মার্‌হাবা ইয়া মার্‌হাবা
রাহ্‌মাতাল লিল্ আলামীনা মার্‌হাবা

জ্বল্‌ওয়াগর্‌হো ইয়া ইমামাল্ মুরসালীন্,
জ্বল্‌ওয়াগর্‌হো রাহ্‌মাতাল্ লিল্ আলামীন। **মার্‌হাবা-**

জ্বল্‌ওয়াগর্‌হো গম্‌ঝাদোঁকে দস্তগীর,
জ্বল্‌ওয়াগর্‌হো হাদিয়ে রওশন্ যমীর। **মার্‌হাবা-**

জল্‌ওয়াগর্‌হো জল্‌ওয়ায়ে নূরে খোদা,
জল্‌ওয়াগর্‌হো আয় হাবীবে কিবরিয়া। **মার্‌হাবা-**

ক্বিয়াম

ফেরেশতুঁ কি সালামী দেনে ওয়ালী ফওজ পড়তী থী
হযরতে আমেনা সুনৃতি থী তো ইয়ে আওয়ায আতী থী

ইয়া নবী সালামু আলাইকা, ইয়া রসূল্ সালামু আলাইকা
ইয়া হাবীব সালামু আলাইকা, সালাওয়াতুল্লা-হ্ আলাইকা

বখ্তকা চম্কে সেতারা, হাযেরী কা হো ইশারা
দেখ্ কর্ রওযা পিয়ারা, ফের্ কহে উম্মত তুম্হারা। **ইয়া নবী-**

আপহী মুশ্কিল্ কোশা হ্যাঁয়, খল্ক্ব কে হাজত্ রওয়া হ্যাঁয়
শাফি'ই রোযে জাযা হ্যাঁয়, জো কহুঁ উস্ সে ওয়ারা হ্যাঁয়। **ইয়া নবী-**

রহম্তো-কে তাজওয়ালে, দো জাঁহা কে রাজওয়ালে,
আর্শ কী মি'রাজ ওয়ালে হাম্ আসিয়োঁ কে লাজওয়ালে। **ইয়া নবী-**

জান্ কর্ কাফী সাহারা, লে-লিয়া হ্যায় দর তুম্হারা
খল্ক্বকে ওয়ারিস্ খোদারা, পারহো বেড়া হামারা। **ইয়া নবী-**

বাদশাহে আম্বিয়া হো নূরে যাতে কিবরিয়া হো
খলক্ব কে মুশকিল কোশা হো জো কহুঁ উস সে ওয়ারা হো। **ইয়া নবী-**

জ্বল্ওয়ায়ে খাইরুল্ বশর হো, উন্কা দর আওর মেরা সরহো
ইস্ জাহাঁসে জ্বব্ সফর্ হো, সব্য গুম্বদ্ পর নযর্ হো। **ইয়া নবী-**

বাহ্রে ইস্ইঁয়া মে সফীনা, আ-গায়া মুশ্কিল্ হ্যায় জীনা
পার হোনে কা ক্বরীনা, হো আত্বা শাহে মদীনা। **ইয়া নবী-**

ওয়াসতাহ্ আলে আ'বা কা, সদ্ক্বা-ই- খায়রুন নিসা কা
আওর্ শহীদে কার্বালা কা, গম্ নাহো রোযে জাযা কা। **ইয়া নবী-**
আয্ তোফায়লে গাউসে আ'যম, বাদশাহে হার্ দো আলম
সদ্ক্বা-এ ইমামে আ'যম, দূরহো সভীকে রঞ্জ ও গম। **ইয়া নবী---**

লাখোঁ সালাম

মুস্তফা জানে রহ্মত্ পে লাখোঁ সালাম
শম্'ই বয্মে, হেদায়ত পে লাখোঁ সালাম

মোহ্রে চর্খে নুবূয়ত্ পে রওশন্ দুরূদ,
গুলে বাগে রেসালত্ পে লাখোঁ সালাম। **মুস্তফা-**
রব্বে আ'লা কি নি'মাত পে আ'লা দুরূদ,
হক্ব তা'আলা কী মিন্নত্ পে লাখোঁ সালাম। **মুস্তফা-**
উন্কে মাওলাকে উন্পর্ করোড়োঁ দুরূদ,
উন্কে আসহাব ও ইত্রত্ পে লাখোঁ সালাম। **মুস্তফা-**
গাউসে আ'যম ইমামুত্ তুক্বা ওয়ান্ নুক্বা,
জল্ওয়ায়ে শানে ক্বুদ্রত্ পে লাখোঁ সালাম। **মুস্তফা-**
চৌহ্রভী হযরতে খাজা আব্দুর রহ্মান,
উস্ নগীনে বেলায়ত পে লাখোঁ সালাম। **মুস্তফা-**
মুর্শেদী হযরতে ক্বেব্লা সৈয়্যদ আহমদ,
পেশ্ওয়ায়ে আহ্লে সুন্নাত পে লাখোঁ সালাম। **মুস্তফা-**
মুর্শিদী হযরতে ক্বিব্লা তৈয়্যব শাহ্,
হাদীয়ে দ্বীন ও মিল্লাত পে লাখোঁ সালাম। **মুস্তফা-**
মুর্শিদী হযরতে ক্বিব্লা তাহের শাহ্,
যীনতে ক্বাদেরিয়ত পে লাখোঁ সালাম। **মুস্তফা-**
মুর্শিদী হযরতে ক্বিব্লা সাবির শাহ্,
রওন্কে আহ্লে সুন্নাত পে লাখোঁ সালাম। **মুস্তফা-**
কামেলানে ত্বরীক্বত্ পেহ্ কামেল্ দুরূদ,
হামেলানে শরীয়ত পে লাখোঁ সালাম। **মুস্তফা-**
মেরে উস্তাযো মা বাপো ভাই-বহিন,
আহ্লে ওল্দো আশীরত্ পে লাখোঁ সালাম। **মুস্তফা-**
সৈয়্যদী হযরত ক্বিব্লা আহ্মদ্ রেযা,
উন্ মুজাদ্দিদে দ্বীনও মিল্লাত্ পে লাখোঁ সালাম। **মুস্তফা-**
এক মেরাহী রহমত পে দা'ওয়া নেহীঁ,
শাহ্ কি সারী উম্মত পে লাখোঁ সালাম। **মুস্তফা-**
জান্কর্ কা-ফি সাহারা, লে-লিয়া হ্যায় দর তুমারা,
খল্ক্ব কে ওয়ারীস খোদারা, লো সালাম আব্ তো হামারা **মুস্তফা-**
ইয়া নবী সালামু আলাইকা, ইয়া রসূল সালামু আলাইকা,
ইয়া হাবীব সালামু আলাইকা, সালাওয়াতুল্লাহ্ আলাইকা।

আস্‌সালাম আয় 'মিম' ও-'হা'-ও 'মিম' ও 'দাল'
আস্‌সালাম আয় বে নযীর ও বে মেসাল্
আস্‌সালাম আয় সব্‌যে গুম্‌বদ কে মকীন্,
আস্‌সালাম আয় রাহ্‌মাতাল্ লিল্ আলামীন।

হাবীবী ইয়া রসূলাল্লাহ্

সাল্লাল্লাহু আলাইকা ওয়াসাল্লাম

তু সখী, তেরা সখী দরবার হ্যায়, গর্ করম্ কী জিয়ো তো বে-ড়া পার হ্যায়।
দস্ত বস্তাহ্ হ্যাঁয় খাড়ে হাযের্ গোলাম, পেশ করতে হ্যাঁয় গোলামানা সালাম।
আয় খোদাকে লাড়্‌লে পেয়ারে রসূল, ইয়ে সালামী আজেযানা হো ক্ববুল্।
মদীনে কে চাঁন্দ হাজারোঁ সালাম।
মদীনে কে চাঁন্দ লাখোঁ সালাম।
মদীনে কে চাঁন্দ কোরোড়োঁ সালাম।
মদীনে কে চাঁন্দ বে-হদ্ সালাম।

বালাগাল্ উলা বিকামালিহী কাশাফাদ্ দুজা বিজামালিহি
হাসুনাত্ জামী'উ খিসালিহী সল্লু আলাইহি ওয়া আলিহী।

---<>---

মুনাজাত

যে কোন মুনাজাত বা দো'আর প্রারম্ভে দুরূদ শরীফ পড়া উচিৎ। মুনাজাত করার সময় যেন দ্বীন-দুনিয়া উভয় জাহানের জন্য দো'আ প্রার্থনা করা হয়। এমন দো'আ আল্লাহর দরবারে খুবই পছন্দনীয়। মুনাজাত এভাবে করাটাই সমীচীন-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهِ الطَّيِّبِيْنَ وَاَصْحَابِهِ الطَّاهِرِيْنَ ـ رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ ـ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ

উচ্চারণঃ আল-হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন ওয়াস্ সালাতু ওয়াস্ সালামু আলা সায়্যেদিল আম্বিয়া-ই ওয়াল মুরসালীনা ওয়া 'আলা আলিহিত্ ত্বৈয়্যেবীনা ওয়া আসহাবিহিত্ ত্বাহিরীনা। রাব্বানা যোয়ালামনা- আনফুসানা- ওয়াইল্ লাম তাগফিরলানা- ওয়া তারহামনা লানাকূনান্না মিনাল খা-সিরী-ন। রাব্বানা আ-তিনা- ফিদ্ দুনিয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল আ-খিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়া ক্বিনা আযা-বান্না-র।

অর্থঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সমগ্র জগতের সৃষ্টিকর্তা এবং দুরূদ ও সালাম নবী ও প্রেরিত পুরুষগণের সরদারের প্রতি এবং তাঁর পবিত্র বংশধর ও সম্মানিত সাহাবীগণের প্রতি। হে আল্লাহ্! আমারা নিজেদের উপর অত্যাচার করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা ও দয়া না করেন, তবে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব হে আল্লাহ! আমাদেরকে দ্বীন-দুনিয়া উভয় জাহানে কল্যাণ দান করুন। এবং দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করুন।

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ـ رَبَّنَآ اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيْهِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادِ

উচ্চারণঃ রাব্বানা- লা-তুযিগ্ ক্বুলূবানা- বা'দ ইয্ হাদায়তানা- ওয়াহা লানা- মিল লাদুন্‌কা রহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্‌হাব। রাব্বানা- ইন্নাকা জামে-উন না-সি লিইয়াউমিন্ লা-রায়বা ফীহি। ইন্নাল্লাহা লা-ইয়ূখলিফুল মি'আদ।

অর্থঃ হে আমাদের পরওয়ারদিগার, আমাদেরকে সৎপথ প্রদর্শনের পর আমাদের মনকে বিপথগামী করে দিওনা এবং আপনার নিকট হতে রহমত দান করুন।

নিশ্চয় আপনি মহান দাতা। হে আমাদের রব, নিশ্চয় আপনি (ক্বিয়ামত দিবসে) সকল মানুষকে একত্রিত করবেন। এতে কোন সন্দেহ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা ওয়াদা ভঙ্গ করেন না।

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ وَنُوْرِ عَرْشِهٖ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ـ بِفَضْلِ سُبْحَانَ رَبِّنَا رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ بِحَقِّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ـ

উচ্চারণঃ রাব্বানা- তাকাব্বাল মিন্না- ইন্নাকা আনতাস সামী'উল 'আলীম। ওয়া সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলা খায়রি খালক্বিহী- ওয়া নূরে আরশিহী সায়্যিদিনা- মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আ-লিহি ওয়া আসহা-বিহী আজমা'ঈন। বিফাদ্বলে সুবাহানা রাব্বিনা- রব্বিল ইয্যাতে 'আম্মা ইয়াসিফূন। ওয়া সালামুন 'আলাল মুরসালীন। ওয়াল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন। বেহক্কে লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু মুহাম্মাদুর রাসূ-লুল্লাহ্।

অর্থঃ হে আমাদের রব! আমাদের থেকে (নেক আমলসমূহ) কবূল করুন। নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞানী এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির সেরা ও তাঁর আরশের নূর সাইয়্যেদেনা হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম), তাঁর বংশধর ও তাঁর সাহাবীগণের উপর রহমত বর্ষণ করুন। (হে হাবীব) তারা (কাফিরেরা) যা বলে, ওসব হতে আপনার রব পবিত্র এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য, যিনি সমগ্র সৃষ্টিজগতের প্রতিপালক। হে খোদা! লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্'র ওসীলায় ক্ষমা করুন এবং এ দো'আ কবূল করুন।

---<>---

আরো কতিপয় বরকতময় খতম

বিশেষ প্রয়োজন পূরণ এ বিপদাপদ থেকে মুক্তি লাভ, রোগব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভ, শত্রু দমন এবং আল্লাহর বিশেষ রহমত লাভের জন্য লিম্নলিখিত খতমগুলোও পরিক্ষিত ও ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়েছে।

খতমে জালালী

নিয়মঃ পরহেযগার কয়েকজন আলেম মিলে পাক সাফ অবস্থায় আল্লাহর (اَللّٰهُ) যাতী নাম সোয়া লক্ষবার মুখে পড়বেন ও সঙ্গে সঙ্গে কাগজে লিখবেন। তারপর ময়দার খামীর দ্বারা ছোট ছোট গুটি তৈরি করে একেকটি কাগজের টুকরা একেকটি গুলির ভেতর ভরবেন- যাঁরা লিখবেন তাঁরাই। পরে এ গুলিগুলো কোন মাছওয়ালা পুকুর বা নদীতে এমনভাবে ফেলে দেবেন যেন মাছসমূহ খেতে পারে। এভাবে খতম শেষ করতে পারলে, যে কোন অপূরণীয় আশা আল্লাহ্ তা'আলা পূরণ করে দেবেন।

নদীর ভাঙ্গন ফেরানোর জন্য এ খতম পড়া অতীব ফলপ্রসূ। এ উদ্দেশ্যে পড়লে নদীর ভাঙ্গা পাড়ের ধারে বসে উক্ত নিয়মে এ খতম শেষ করতে হবে।

স্মরণ রাখবেন, এ খতমে কোন জঘন্য পাপী ও নাপাক লোক যোগ দিলে কিংবা খতম শেষ হওয়ার আগে খতমকারীগণ বাজে গল্পগুজব করলে, হিতে বিপরীত হতে পারে। কাজেই খুব ভাবগম্ভীর পরিবেশে নিষ্ঠার সাথে এ খতম শরীফ সম্পন্ন করবেন।

খতমে তাহলীল

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই) কলেমা শরীফ পাঠ করাকে 'তাহলীল' বলা হয়।

আল্লাহর রাসূল এরশাদ করেন, সোয়া লক্ষবার এ কলেমাটি পাঠ করে মৃত ব্যক্তির রূহের বখশিশ করলে আল্লাহ্ তা'আলা তার জীবনের সম্পূর্ণ গুনাহ্ মাফ করে বেহেশতবাসী করে দেন।'

সুতরাং বিশেষতঃ মৃত ব্যক্তির জন্য এ খতমটা পড়া হয়। তাছাড়া, দুরোরোগ্য ব্যাধি, মোকদ্দমার ফ্যাফাদ ও দুর্দম দুশমনের অনিষ্ট থেকে রেহাই পাওয়ার আশায়ও এ খতম পড়ানো অতীব ফলপ্রদ।

রোগীর জন্য এ খতম পড়ানো হলে, এমন স্থানে বসে এ খতম পড়তে হবে, যেন রোগী তা শুনতে পায়। পরহেযগার আলেমগণ পাকসাফ বিছানায় বসে স্পষ্ট উচ্চারণসহ উপরিউল্লিখিত কলেমাটি সোয়া লক্ষবার পাঠ করবেন। ফলে হায়াত থাকলে রোগী রোগমুক্ত হবেই।

খতমে ইয়ূনুস

রোগমুক্তি, পাপমুক্তি, জেলমুক্তি ও যে কোন অত্যাচার ও বিপদ হতে মুক্তিলাভের জন্য এ খতম পাঠ করা ফলপ্রসূ বলে প্রমাণিত হয়েছে।

নিয়মঃ ৩, ৭, ২১ বা একচল্লিশ দিনে নিম্নলিখিত তিন নং দো'আ অর্থাৎ দো'আ-ই ইয়ূনুস সোয়া লক্ষ বার পাঠ করে এ খতম সম্পন্ন করা যায়। কিছু লোক একসাথে বসে এ খতম একবারেও সম্পন্ন করা যায়। দো'আ-ই ইয়ূনুস পাঠের মাধ্যমে এ খতম করা হয় বিধায় এটাকে সংক্ষেপে 'খতমে ইয়ূনুস' বলা হয়। এ দো'আ পাঠ করার পর হযরত ইয়ূনুস আলায়হিস্ সালাম মাছের পেট থেকে মুক্ত হয়ে বের হয়ে এসেছিলেন। সুতরাং যে কোন বিপদাপদ থেকে এ খতম শরীফ সম্পন্ন করলে মুক্তি লাভ করা যায়।

দো'আ-ই ইয়ূনুস

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ

উচ্চারণঃ লা-ইলাহা ইল্লা-আনতা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনায্ যোয়া-লিমীন।
অর্থাৎ (হে আল্লাহ!) আপনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। আপনি পবিত্র, নিশ্চয়ই আমি যালিমদের দলভুক্ত হয়ে পড়েছি।
'দো'আ-ই ইয়ূনুস-এর খতম করার সময় প্রতি একশ'বার পাঠ করে

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذٰلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ

(ফাস্তাজাবনা- লাহু, ওয়া নাজ্জায়না-হু মিনাল গাম্মি ওয়া কাযালিকা নুনজিল মু'মিনীন) পাঠ করতে হয়।
এ শেষোক্ত আয়াতটির অর্থ হচ্ছে- অতঃপর আমি তার ডাক শুনেছি এবং তাকে সেই কঠিন বিপদ থেকে উদ্ধার করেছি। এমনিভাবে আমি ঈমানদারদেরকে উদ্ধার করে থাকি।
বৈশিষ্ট্যঃ রোগীর জন্য এ খতম পড়ালে উপরিল্লিখিত ১নং দো'আটি পাঠ করে নতুন পাতিলে রক্ষিত পানিতে প্রত্যেকে একবার করে ফুঁক দেবেন। খতম শেষে এ পানির কিছুটা রোগীকে পান করতে দেবেন, বাকীটুকু তার শরীরে ছিঁটিয়ে দেবেন। আল্লাহর দয়ায় রোগী ভাল হয়ে উঠবে- ইন্শাআল্লাহ্।

খতমে খাজেগান

কঠিন সঙ্কট, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা, বেকার সমস্যা প্রভৃতি হতে বাঁচার জন্য খতমে খাজেগান অত্যন্ত উপকারী।

নিয়মঃ

১. দুরূদ শরীফ ১০০ বার
২. সূরা ফাতিহা ৭০ বার
৩. সূরা ইখলাছ ১০০ বার
৪. সূরা 'আলাম নাশ্‌রাহলাকা ৭ বার
৫. পুনরায় সূরা ফাতিহা ৭০ বার
৬. পুনরায় দুরূদ শরীফ ১০০ বার
৭. নিম্নোক্ত দো'আটি ১০০ বার।

ফাসাহ্হিল ইয়া ইলাহী কুল্লা সোয়াবিন বিহুরমাতি সাইয়্যেদিল আব্‌রারি সাহ্হিল; বিফাদ্বলিকা ইয়া 'আযীযু।

فَسَهِّلْ يَآ اِلٰهِىْ كُلَّ صَعْبٍ بِحُرْمَةِ سَيِّدِ الْاَبْرَارِ سَهِّلْ بِفَضْلِكَ يَا عَزِيْزُ ـ

অর্থঃ হে আল্লাহ! পুণ্যবানদের সরদার হযরত মুহাম্মদ মোস্তফার ওসীলায় আমার কঠিন কাজ সহজ করে দিন। হে পরাক্রমশালী; আপনার অনুগ্রহে সহজ করে দিন।

৮. তারপর يَا قَاضِىَ الْحَاجَاتِ (ইয়া ক্বা-দ্বিয়াল হাজাত) ১০০ বার।
অর্থাৎ (হে চাহিদা পূরণকারী)
৯. يَا كَافِىَ الْمُهِمَّاتِ (ইয়া কা-ফিয়াল মুহিম্মাত) ১০০ বার
অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিসম্পন্ন করণে যথেষ্ট সত্তা!)
১০. يَا دَافِعَ الْبَلِيَّاتِ (ইয়া দা-ফি'আল বালিয়্যাত) ১০০ বার
অর্থাৎ হে বিপদ দূরকারী
১১. يَا مُجِيْبَ الدَّعْوَاتِ (ইয়া মুজিবাদ্দা'ওয়াত) ১০০ বার
অর্থাৎ হে মুনাজাত মঞ্জুরকারী
১২. يَا رَافِعَ الدَّرَجَاتِ (ইয়া রা ফি'আদ্দারাজাত) ১০০ বার
অর্থাৎ (হে মর্যাদা উন্নীতকারী)
১৩. يَا حَلَّالَ الْمُشْكِلَاتِ (ইয়া হাল্লাহাল মুশকিলাত) ১০০ বার
অর্থাৎ হে সমস্যাবলী সমাধানকারী
১৪. يَا غَوْثُ اَغِثْنِىْ وَاَمْدُدْنِىْ (ইয়া গাউসু আগিস্‌নী ওয়ামদুদনী) ১০০ বার
অর্থাৎ হে ফরিয়াদ শ্রবণকারী! সাহায্যকারী আমার ফরিয়াদ গ্রহণ করুন এবং আমাকে সাহায্য করুন।
১৫. اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ (ইন্না- লিল্লা-হি ওয়া ইন্না- ইলাইহি রাজে'উন) ১০০ বার
অর্থাৎ নিশ্চয় আমরা আল্লাহরই জন্য এবং আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।
১৬. لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ (লা- ইলা-হা ইল্লা-আনতা সুবহা-নাকা ইন্নী কুনতু মিনায্ যোয়ালিমীন) ১০০ বার
অর্থাৎ হে আল্লাহ! আপনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, আপনি পবিত্র, নিশ্চয় আমি সীমাতিক্রমকারীদের দলভুক্ত হয়ে পড়েছি।
১৭. তারপর ১০০ বার যে কোন দুরূদ শরীফ পড়তে হবে।

অতঃপর এ খতমের সাওয়াব সমস্ত নবী-রাসূল, পীর-আউলিয়া, গাউস কুত্বব ও মু'মিন-মু'মিনাতের রূহে বখশিশ করে নিজের আশা পূর্ণ করার জন্য আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করবেন। আল্লাহ্ তা পূর্ণ করে দেবেন। ইন্শাআল্লাহ্।
উল্লেখ্য, উক্ত খতমের সাওয়াব জগতের যাবতীয় পীর-আউলিয়া-ই কেরামের বখশিশ করা হয় বলে এর নাম 'খতমে খাজেগান' বা 'পীরানের খতম' আর এ জন্যই এ খতমের ফল হয় অব্যর্থ। *-সমাপ্ত -*